গ্রন্থাবলী-সিরিজ

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, - - - - - - কলিকাতা

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

সূচী

মাতৃঋণ

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বকথা

"মাতৃঋণ" প্রকাশিত হইল। ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় "মাতৃঋণ" ধারাবাহিকভাবে প্রথম বাহির হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে উপন্যাসখানির আগাগোড়া পরিমার্জ্জনা করিয়াছি; স্থলবিশেষ পুনর্লিখিত হইয়াছে।

"মাতৃঋণ" প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্স্ দোদে রচিত 'জ্যাক' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। মূল গ্রন্থের লাইন ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। সেরূপ অনুবাদ প্রায়ই নির্জ্জীব হয় এবং তাহাতে মূল গ্রন্থের রস একেবারে মারা পড়ে। বর্ত্তমান গ্রন্থে দোদের প্রধান ভাবটিকে ও প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলিকে মাত্র বজায় রাখিয়া নিজের ভাবেই আগাগোড়া লিখিয়া গিয়াছি। এ দেশের পাঠকসম্প্রদায় কতখানি গ্রহণ করিবেন, এবং কোন্ অংশ তাঁহাদের নিকট বিরক্তিকর ঠেকিবে, লিখিবার সময় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। সে জন্য দোদের রচনার অংশ-বিশেষ কোথাও একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়াছি; কোথাও বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছি। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কেহ দোদের প্রতিভাসম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করিয়া বসেন, তাহা হইলে মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব-শক্তিশালী লেখকের প্রতি তাঁহারা অবিচার করিবেন! তবে এ গ্রন্থে দোদের প্রতিপাদ্য কি, তাহা যাহাতে ঢাকা না পড়ে, সে বিষয়ে আমার সাধ্যমত যত্নের ক্রটি করি নাই। সে প্রতিপাদ্য কি, তাহার ইঙ্গিত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুধী পাঠক সহজেই তাহা ধরিতে পারিবেন। সে বিষয়টি আমাদের এ দেশেও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য; অথচ উক্ত বিষয় লইয়া মৌলিক উপন্যাস লেখার সময় এদেশে এখনও বোধ হয় আসে নাই। এ গ্রন্থ-অনুবাদে আমার অগ্রসর হওয়ার ইহাই প্রধান কৈফিয়ৎ।

এই অনুবাদ-গ্রন্থখানির নাম করণের জন্য প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার্-এ্যাট্-ল মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

পরিশেষে আর একটি কথা আছে: 'ভারতী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর আগ্রহে ও অনুরোধেই বিদেশীয় উপন্যাস-অনুবাদে আমি প্রবৃত্ত হই। তিনি যদি 'ভারতী' পত্রিকায় এ গ্রন্থ প্রকাশ না করিতেন, তবে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ আমার ঘটিত না। এজন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এখন কি গড়িতে কি গড়িয়াছি, তাহার বিচার বাঙ্‌লার সুধী পাঠকের হাতে। ইতি

ভবানীপুর,
৩রা আষাঢ়, ১৩২২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবর
সুকবি
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
করকমলেষু

মাতৃঋণ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মা ও ছেলে

শীতের কুয়াশা ঠেলিয়া সূর্য্য তখন আকাশের অনেকখানি উর্দ্ধে উঠিয়াছে। একখানি সুদৃশ্য ব্রুহাম আসিয়া প্রকাণ্ড স্কুল-বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল। একটি বালকের হাত ধরিয়া এক সুন্দরী গাড়ী হইতে নামিল। বালকটি ঈষৎ কৃশ হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী, তাহার পরিচ্ছদেও একটা পারিপাট্য ছিল; বয়স সাত-আট বৎসরের বেশী হইবে না।

রমণী কৃশাঙ্গী। দেহে বহুমূল্য কালো পোষাক, কণ্ঠে পশু-লোমের বেষ্টনী, মাথায় টুপি—জমকালো গাড়ী-ঘোড়া। এ-সকল দেখিয়া তাহাকে রীতিমত বিলাসিনী বলিয়া মনে হয়। সুন্দর কোমল মুখের চারিধারে সোনালি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছে—রমণী সুডৌল বাহু দ্বারা সেগুলি সরাইয়া দিতেছিল। সস্মিত ওষ্ঠ, উজ্জ্বল নীল চক্ষু, গতিতে সুন্দর লীলা-ভঙ্গী, ক্ষুদ্র ললাটে চিন্তার রেখাটি পড়ে নাই, রমণী অপূর্ব্ব সুন্দরী। পুত্রের হাত ধরিয়া সে স্কুল-গৃহে প্রবেশ করিল।

রমণী আসিয়া স্কুলের অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিল। বালকটিকে স্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ হইলে মোটা একখানি খাতা টানিয়া অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলেটির নাম কি ?

—জাক।

অধ্যক্ষ কহিলেন,—জাক।...পদবী ?

রমণী কহিল,—জাক, শুধু জাক। এর ধর্ম্ম-বাপ যিনি, তিনি ছিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে তিনি কাজ করতেন। ভারী নামজাদা লোক, লর্ড পিমবক্! বোধ হয়, নাম শুনে থাকবেন। খুব সম্ভ্রান্ত বংশ! নাচতে গাইতেও ভারী মজবুত! এই সে-বছর সিঙ্গাপুরে তিনি মারা গেছেন! রাজার সঙ্গে বাঘ শিকার করতে গেছলেন! সিঙ্গাপুরের রাজা, মস্ত রাজা, ভারী বীর! নামটা—আহা, ভুলে যাচ্ছি—মনে ছিল। ঐ যে,—রাণা—কি,—রাণা—ভালো—

অধ্যক্ষ কহিলেন,—ক্ষমা করবেন, জাকের পদবীটা ?

রমণী বালকের মুখের দিকে একবার চাহিল। জাকের চোখ ছল-ছল করিতেছিল! 'মা' ছাড়া সে কাহাকেও জানে না—মার সঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য কখনও সে ত্যাগ করে নাই! সে জানে, বোর্ডিংয়ে রাখিবার জন্যই মা তাহাকে আজ লইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে সে কত মিনতি করিয়াছে, কত বলিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া স্কুলে সে থাকিতে পারিবে না, মাকে না দেখিয়া একমুহূর্ত্ত সে বাঁচিবে না! কিন্তু মা সে কথায় মোটে কান দেয় নাই! শেষে স্কুলে আসিবার সময় মা আশা দিয়াছে, ছুটি হইলেই জাক বাড়ী যাইতে পাইবে —মাও মধ্যে মধ্যে স্কুলে তাহাকে দেখিতে আসিবে—কাঁদিলে কিন্তু মা ভারী রাগ করিবে! তাই জাক অনেক কষ্টে চোখের জলটুকু কোনমতে সামলাইয়া রাখিয়াছে, পড়িতে দেয় নাই।

বুড়া অধ্যক্ষের চোখে ধূলি দেওয়া কিন্তু সহজ নয়। স্কুলের কাজে তাঁহার মাথার চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া প্যারি সহরে সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল; উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসের স্রোতে নর-নারী এখানে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে ভালো-মন্দ লোক বাছিয়া লওয়া দায়, এই ধারণাই অধ্যক্ষের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

রমণীর বেশভূষা ও বাচালতা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। রমণীকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার মুখের দিকে কুতূহলী দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন, কহিলেন,—তা হলে নামটা কি লিখবো ?

বৃদ্ধের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিলে রমণী একান্ত সঙ্কুচিত হইল। তাহার গোলাপের মত গণ্ডদ্বয় গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। দৃষ্টি নত করিয়া সে কহিল,—মাপ করবেন —পরিচয় দিতে ভুলে গেছলুম। বলিয়া পকেট হইতে হস্তিদন্তনির্ম্মিত কার্ড-কেস্ বাহির করিয়া তাহা হইতে একখানি সুন্দর কার্ড লইয়া রমণী অধ্যক্ষের হাতে দিল। তাহাতে পরিষ্কার ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল,—

ইদা দ্য বারান্সি।

অধ্যক্ষ মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—নামটা তাহলে জাক

গু বারান্সি? বক্তার স্বরে কেমন-একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। সঙ্কোচ কাটাইয়া রমণী কহিল,—হাঁ।

অধ্যক্ষ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, আমিও তাই বলছি!

কথাটা বলিয়া অধ্যক্ষ কার্ডখানি হস্তে লইয়া উঠিলেন, পরে সম্মুখের সাশি খুলিলেন। বাহিরে গাছপালাগুলার উপর সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মি তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সাশির পশ্চাতে একজন তরুণ শিক্ষক আসিয়া দেখা দিল।

অধ্যক্ষ কহিলেন,—ড্যাফিয়, এই ছেলেটিকে একবার ওধারে নিয়ে যাও—চারিধার দেখিয়ে আনো।

জাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, মাতার সঙ্গ ত্যাগ করাইবার জন্য এ বুঝি একটা ছল! হতাশভাবে সে মার মুখের পানে চাহিল—তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল!

অধ্যক্ষ বুঝিলেন, মিষ্ট স্বরে কহিলেন,—যাও জাক, ভয় কি! তোমার মা এখনই যাচ্ছেন না। ঘুরে এসো। ইনি এখন এখানে কিছুক্ষণ আছেন!

তবু জাক নড়িতে চাহে না। মার পানে চাহিয়া মার গা ঘেঁষিয়া আরও সে সরিয়া দাঁড়াইল। মা বলিল, "যাও—জাক, ছি। লক্ষ্মী ছেলে যে তুমি!"

তখন কোন কথা না বলিয়া জাক শিক্ষকের সহিত চলিয়া গেল।

জাক চলিয়া যাইবার পর কক্ষ-মধ্যে কাহারও মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা ফুটিল না। বাহিরে ছাত্রের দল খেলা করিতেছিল। তাহাদের উল্লাস-চীৎকার কক্ষমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছে। ক্বচিৎ দুই একটা পাখী ডাকিতেছে, সেই সব শব্দ এবং অদূরে পিয়ানোর ঝঙ্কার,—এ-সমস্ত মিলিয়া এক সুমধুর মিশ্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিল! শীতের এই যাতনা-কাতর মুমূর্ষু মলিন রুদ্ধ দিনগুলার মধ্যে যেন ব্যগ্র জীবনের একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে!

অধ্যক্ষই প্রথমে কথা কহিলেন। জাকের কচি মুখ ও শান্ত মধুর ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণে কেমন মায়া জন্মিয়াছিল। তিনি কহিলেন,—ছেলেটি আপনাকে ভারী ভালোবাসে!

মাদাম বারান্সির যেন চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল,—তা আর বাসবে না! এত বড় পৃথিবীতে মা ছাড়া ওর আর কে আছে, বলুন! মা ছাড়া কাকেই বা আর ও জানে? বেচারা জাক!

—আপনি বিধবা?

—হাঁ মশায়! আমার স্বামী আজ দশ বৎসর হলো, মারা গেছেন! সে এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু! যাঁরা উপন্যাস লেখেন, তাঁরা কল্পনার চোখে কত মিথ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে বেড়ান—কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, আমাদের এই সাদা-সিধে জীবনে কি সব অসহ্য দুঃখ-যাতনা আমরা ভোগ করি! তা থেকে তাঁদের দশখানা উপন্যাসের খোরাক জোগানো যেতে পারে। আমার নিজের জীবনই তার মস্ত প্রমাণ! আমার স্বামী কাউণ্ট দ্য বারান্সি তুরেনের এক কত বড় বংশের—

অধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিলেন! কাউণ্ট দ্য বারান্সি! না, না, অসম্ভব! তাঁহার সংশয় বাড়িল—মনের ভাব চাপিয়া তিনি কহিলেন,—তবে এই অল্প বয়সেই ছেলেটিকে স্কুলে দিচ্ছেন কেন? এখনও ও ছেলেমানুষ। তা ছাড়া আপনাকে ছেড়ে যখন থাকতে পারবে না…। এ বিচ্ছেদ ওর সহ্য হবে কি?

রমণী কহিল,—আপনি ভুল কচ্ছেন! জাক এ দিকে তেমন অবুঝ নয়। তা ছাড়া ওর শরীর ভাল, অসুখ-বিসুখ নেই বললেও চলে! একটু রোগা, এই যা! তা এ পারি সহরের বদ্ধ বাতাসে শরীর আর কি হবে, বলুন?

অধ্যক্ষ কহিলেন,—তা ছাড়া দেখুন, আমাদের বোর্ডিংয়ে এখন এত ছেলে রয়েছে যে, নতুন ছেলে নেওয়া আপাততঃ সম্ভব নয়। আস্‌চে বছর সুবিধে হতে পারে—কিন্তু তার জন্য এখন থেকে অবশ্য আমি কথা দিয়ে রাখতে পারি না।

রমণী এ ইঙ্গিতের কিছু বুঝিল, কহিল,—তা হলে আমার ছেলেকে আপনারা রাখবেন না! বেশ, কারণটুকু জানতে পারি?

অধ্যক্ষ বাহিরের দিকে একবার চাহিলেন—চশমা খুলিয়া তাহার কাঁচ দুইখানা রুমালে সাফ করিতে করিতে কহিলেন,—শুনবেন? কিন্তু কারণটুকু না শুনলেই বোধ হয় ভাল হতো! তবে শুনতে যখন চাইছেন, তখন বলতে হবে। শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন বই—

রমণীর মুখ লজ্জায় দুঃখে রাঙা হইয়া উঠিল! অধ্যক্ষের মুখের পানে সতেজে সে চাহিয়া দেখিল। অধ্যক্ষ বলিতে লাগিলেন,—কথাগুলা শুনিয়া রমণী একান্ত কাতর হইয়া পড়িল—বেদনায় সে কাঁদিয়া ফেলিল! হতভাগিনী! ওগো, সত্যই সে হতভাগিনী! কেহ জানে না, এই দুর্ভাগা পুত্রের জন্য কি দুঃখ না তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে!

সত্য! এ কথা খুব সত্য! সত্যই বালকের কোন পদবী নাই। পিতা নাই,—ছিল না! কিন্তু এ কি ছেলের দোষ? পিতা-মাতার কবেকার একটা পাপের ভার মাথায় বহিয়া সারা জীবন তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিবে, এমনই সে দুর্ভাগা! রমণী কাঁদিয়া ফেলিল, চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল,—দয়া করুন—বেচারাকে একটু দয়া করুন আপনি। নিষ্ঠুর হবেন না।

সে স্বরে কি গভীর নিরাশা, কি মর্ম্মভেদী অনুতাপ!

অধ্যক্ষ ব্যথিত চিত্তে কহিলেন,—শান্ত হন, আপনি! কিন্তু কথাটা নিতান্ত চাপা দিবার নয়। অধ্যক্ষ

জানিতেন, তুরেনের এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশ, কি সে কলঙ্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন! সে এক গভীর পাপের সুদীর্ঘ ইতিহাস! বারান্সি পরিবারের প্রতিবেশী এই অধ্যক্ষের আজ আবার নূতন করিয়া সব কথা মনে পড়িল! কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

রমণীকে সান্ত্বনা দিবার কোন কথা নাই! তবু তিনি কহিলেন, এ পাপের শুধু এক প্রায়শ্চিত্ত আছে! আপনি ছেলের মা—নিজের ঘরটিকে ভালো করুন—জীবনের সমস্ত কালি, সমস্ত পাপ দূর করে নতুন মানুষ হবার চেষ্টা করুন—এ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিছু না। প্রাণপণে ছেলেটিকে মানুষ করে তুলুন।

রুমালে চোখের জল মুছিয়া রমণী কহিল,—আমারও জীবনের তাই সাধ। জাক এখন বড় হয়েছে, সেয়ানা হয়েছে। সে এ সব কিছু জানে না। তাই ওকে আমি আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই। আপনাদের সঙ্গে থেকে, আপনাদের কাছে শিক্ষা পেয়ে ও মানুষ হয়, এই আমার সাধ। আজ যদি আপনারা ওকে ঠাঁই না দেন, ওজর-আপত্তি করে তাড়িয়ে দেন, তাহলে ও কোথায় যাবে?—মানুষ হবারই বা ওর সম্ভাবনা কোথায় থাকে?

সে কথাটাও অধ্যক্ষ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন। হতভাগ্য বালক! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, বিকচোন্মুখ ফুলের মত তাহার এই অমল শুভ্র নবীন জীবন, বিধাতার এই অমূল্য দান, এমন অনাদরে অবজ্ঞায় ধূলায় লুটাইবে!

তিনি কহিলেন,—ছেলেটিকে নিতে আমি রাজী আছি। কিন্তু দুটি সর্ত্তে।

রমণী কহিল, কি সর্ত্ত, বলুন।

—প্রথম, যতদিন আপনার জীবনের গতি না শোধরায়, ততদিন জাক আপনার বাড়ীতে যেতে পাবে না—মোটে না। ছুটির সময়ও সে এখানে আমাদের কাছে থাকবে।

—কিন্তু আমাকে না দেখতে পেলে যে ও মরে যাবে! আহা, জাক! আমাকে ছেড়ে ও যে কোথাও কখনও থাকেনি। এই প্রথম!

—কেন? আপনি মাঝে মাঝে এখানে এসে ওকে দেখে যেতে পাবেন। কিন্তু সে দেখা আমার ঘরে আমার সামনে হবে—অন্য কোনো ঘরে নয়, আর কারও সামনে নয়।

রমণী শিহরিয়া উঠিল! ছুটির সময় অপর সকলে আসিয়া যখন তাহাদের পুত্রগুলিকে আদর করিবে, তাহাদের সহিত কত কথা কহিবে—সে তখন আসিতে পাইবে না—আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া অপরের ঈর্ষা উদ্রেক করিতে পারিবে না! আর ইহাতে জাকই বা কি মনে করিবে? সে কি লজ্জা—কি অপমান! ইদা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সারা পারির সম্ভ্রান্ত নব-নারীর চিত্তে আপনার ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখাইয়া ঈর্ষা জাগাইতে পারিবে না, ইহা একেবারে অসহ্য!

রমণী কহিল,—এ বড় নিষ্ঠুর সর্ত্ত! আমি কি করে সহ্য করব—বিশেষ আমি তার মা! আর ছেলেই বা কি মনে করবে?

সেই সময় খোলা সার্শির পশ্চাতে পুত্রকে দেখিয়া ইদা চুপ করিল। পুত্রকে কক্ষে আসিতে সে ইঙ্গিত করিল। জাক আসিল। হাসিয়া মার গা ঘেঁষিয়া সে কহিল,—তুমি এখনও আছ, মা! বাঃ! ওরা বলছিল, আছ, তবু আমি মনে করেছিলুম, তুমি চলে গেছ।

জাকের ছোট হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিয়া ইদা কহিল,—না বাবা—চলো, আমরা বাড়ী যাই! এদের স্কুলে তোমার পড়া হবে না। এঁরা রাখবেন না।

কথাটা বলিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল। খাঁচার পাখীকে বাহির করিয়া দিলে সে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, মার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই স্নেহ-হীন পরুষ কঠিন স্কুলগৃহে থাকিতে হইবে না, ইহা শুনিয়া জাকের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ঠিক তেমনই আনন্দে ভরিয়া উঠিল!

ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে অধ্যক্ষ কহিলেন, আহা, বেচারা ছেলেটি! কথাটা জাকের কাণে গেল। তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

বেচারা? সে বেচারা! কেন?

কথাটা তাহার অন্তরে দীর্ঘ একটা কালির রেখার মত গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অধ্যক্ষ ঠিক বুঝিয়াছিলেন। এই কাউণ্টেস দ্য বারান্সি সত্যই ছদ্ম নাম। এই রমণী মাদাম বারান্সি নহে—ইদাও তাহার প্রকৃত নাম নয়! কে তবে এই রমণী? এক গভীর রহস্যের জাল তাহার চারিধারে বিছানো রহিয়াছে! প্রতিবেশীরা কেহ তাহার পরিচয় জানে না। এই বিলাসিনী চরিত্র-হীনা রমণীর দুর্ভেদ্য অতীত রহস্যের কোনরূপ একটা মীমাংসা এ-পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই! এক-একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট উল্কাপিণ্ড যেমন সহসা অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া কোথায় পৃথিবীর গায়ে ঝরিয়া পড়ে, এ যেন তাহারই মত পারি সহরের বুকে সহসা কোথা হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে!

গাড়ীতে মাতা-পুত্রে কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না! সহসা জাক ডাকিল, মা!

ইদা কহিল, কেন জাক?"

তুমি কথা কইচো না কেন, মা?

ইদা কহিল, তোর জন্য আমার কি কষ্ট, তা তুই

জানিস না, জাক! যেদিন তুই প্রথম এসেচিস্, সেই-দিন থেকেই যে আমি কি যাতনা পাচ্ছি!

ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! জাকের মুখে বিষাদের একটা কালো ছায়া পড়িল। মুখ তুলিয়া সে কহিল, আমি তো কিছু করিনি, মা!

জগতে জাক শুধু একজনকে জানে, একজনকে ভালোবাসে—সে একজন আর কেহ নয়, তাহার এই মা! সেই মার মনে সে ব্যথা দিয়াছে! জাকের বুক যেন ফাটিয়া গেল! ফুঁপাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। মায়ের প্রাণ এ দুঃখে স্থির রহিল না। ইদা বলিল,—ছিঃ, দুষ্ট ছেলের মত কাঁদে কি! আমি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিলুম যে! ছিঃ, চুপ কর—সোনা আমার, মাণিক আমার! না, না, তোমাকে পেয়ে আমি সুখে আছি! বড় সুখে আছি! আর কে আমার আছে, জাক? আমারই দোষ—না,—তুমি কিছু জানো না—ফুলের মতই সুন্দর নিষ্পাপ তুমি!

জাককে বুকের মধ্যে টানিয়া ইদা বারবার তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিল। সে আদরে জাকের সকল কষ্ট, সকল অভিমান নিমেষে দূর হইয়া গেল! মার বুকে মুখ রাখিয়া আনন্দ-গদ্গদ স্বরে জাক ডাকিল, মা—

গাড়ী আসিয়া বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। দাসী কস্তাঁ ছুটিয়া আসিল। জাককে দেখিয়াই তীব্র স্বরে সে কহিল, এ কি! তুমি ফিরে এসেচো? নাঃ, ভারী দুষ্ট হয়েছ, তুমি! পাহারওলা দিয়ে তোমাকে স্কুলে পাঠাতে হবে দেখছি। আর মাও অমনি তেমনই,—কিছু বলবেন না তো! আদর, খালি আদর!

ইদা কহিল,—না, না, কস্তাঁ, ওর কোন দোষ নেই! তারা ওকে স্কুলে নিলে না যে—বুঝতে পাচ্ছিস্? এমনভাবে অপমান করলে—

ইদার চোখ জলে ভরিয়া আসিল! সে ভাবিল, এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে যে তাহার ভাগ্যে এত দুঃখ, এমন লাঞ্ছনা!

জাককে বুকের কাছে টানিয়া কস্তাঁ কহিল,—স্কুলে নিলে না, তাতে কি হয়েছে? আর কি স্কুল নেই? ভাবনা কি! কিন্তু আস্পর্দ্ধা ভাখো একবার! এই সেদিন ডিক বলছিল, যেখানে কাজ করতো, ওর সেখানকার সেই মনিবের ছেলে এক স্কুলে পড়ে,—খাসা স্কুল সে, মাইনে কম। সেই স্কুলের আমি খোঁজ নিচ্ছি। দাঁড়াও তো!

ইদা বলিল,—সে কাল তখন ভেবে দেখা যাবে! এখন খাবার দে, জাকের ক্ষিদে পেয়েছে। অনেক ক্ষণ ও খায়নি। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে। জাক—

—মা—বলিয়া জাক মার কাছে আসিল। মা জাকের মুখে চুম্বন করিয়া আবার ডাকিল,—জাক!

—কেন মা?

—বাবা—

ইদা দুই হাতে জাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখে আর একটি কথা ফুটিল না! সে ভাবিতেছিল, পাপের কি এমনই তেজ যে এ-জগতে তাহার জ্বালা কখনও থামিবে না? এই সুন্দর অবোধ বালক, সে কেন অপরের জন্য কষ্ট পায়? সে তো নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, তবু মানুষের এমন বিচার, এমনি তাহার ন্যায়ের দণ্ড! জাক মার দেহের উপর ভর দিয়াছিল—সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—অল্প তন্দ্রাও আসিতেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নে সে শুনিল, করুণ স্বরে যেন কে বলিতেছে,—আহা বেচারা! বেচারা ছেলেটি!

দ্বিতীয় পর্ব্ব

নূতন স্কুল

পারি সহরের এক প্রান্তে কতকগুলা জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকার পশ্চাতে একটা সরু গলি বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই গলিতে কয়েকখানা কুটীর; কুটীরগুলিতে কুলি, সহিস, কর্ম্মান্বেষী ভৃত্য-সম্প্রদায় এবং দরজী ও শ্রমজীবীদের বাস। সকালে সন্ধ্যায় কুশ্রী কদাকার বালকগুলার খেলার দাপটে ভদ্রলোকের পক্ষে সে পথে চলা দায় হইয়া ওঠে। বড় গাড়ী সে গলির পথে চলিতে পারে না, এবং এ পথে আসিবার প্রয়োজন তাহাদের বড়-একটা ঘটিয়া ওঠে না।

এমনই গলির মধ্যে এক স্কুল-গৃহ। নাম, 'মোরোনভা জিমনাজ।' বাড়ীটি যেমন জীর্ণ, অধিবাসীদের জীবনও তেমনই। প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় যখন নানা-বেশধারী শীর্ণকায় কুৎসিত বালকের দল তাড়াইয়া স্কুলের অধ্যক্ষ গৃহে ফিরিত, তখন তাহাদের চাল-চলনে দর্পের যথেষ্ট আড়ম্বর থাকিলেও ভিতরকার দৈন্যটুকু কিছুতেই ঢাকা পড়িত না। কিন্তু পল্লীর মধ্যে সে দৈন্য বুঝিবার লোক ছিল না, ইহাই ছিল আশ্বাসের কথা! মাদাম বারান্সি স্বয়ং আসিয়া যদি এ স্কুল-গৃহ প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে বেচারা জাক কখনই এই অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইত না! কিন্তু জাককে লইয়া ইদা আজ এখানে আসে নাই, জাকের সঙ্গে আসিয়াছিল, দাসী কস্তাঁ!

বহির্দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল! সহসা দিবা দ্বিপ্রহরে সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া অধ্যক্ষ মোরোনভা বিস্মিত হইয়া উঠিল! সে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইল! এ কি স্বপ্ন! কিন্তু না, ঐ যে দ্বারে কে আবার ঘা দেয়! চাবির গোছা লইয়া মোরোনভা দ্রুত দ্বারের দিকে চলিল।

দ্বার মুক্ত হইলে কর্স্তা ও জাক ভিতরে প্রবেশ করিল।

নদীতে জোয়ার আসিলে ভিতরের জল যেমন স্রোতের বেগে ফাঁপিয়া ওঠে, সারা স্কুলগৃহে তেমনি একটা আনন্দের স্পন্দন বহিয়া গেল।—ড্রয়িং-রুমে আগুন আনো—শব্দে স্কুলগৃহ সহসা কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। জাক ও কর্স্তাকে আনিয়া মোরোন্‌ভা ডয়িং-রুমে বসাইল। এক কৃষ্ণকায় কাফ্‌রি বালক আসিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। বহুদিন পরে জীর্ণগৃহের সংস্কার হইলে চারিধার যেমন একটা নূতন শ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, সকলের মুখে তেমনই একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

কর্স্তার সহিত মোরোন্‌ভার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। 'জিম্‌-নাজ্‌ মোরোন্‌ভা'র নাম শুনিয়া ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয়, এই ভরসায় জাককে মোরোন্‌ভার তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য তাহার আগমন হইয়াছে!

মাদাম মোরোন্‌ভা অত্যধিক আত্মীয়তা দেখাইবার লোভে বলিয়া উঠিল,—ছেলেটির চোখদুটি দেখেছো! একেবারে হুবহু মার মত।

একটা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি মাদামের মুখে স্থাপিত করিয়া জাক বলিল,—ও আমার মা নয়—ও ঝী!

মাদাম মোরোন্‌ভা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল।

তখন দর-দস্তর চলিল। মোরোন্‌ভা কহিল,—এখানে বেশী ছেলে নেওয়া হয় না। নম্বরে বেশী হলে ছেলেদের তেমন তদ্বির হয় না—লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়! তা ছাড়া এখানে মন আর শরীর দুয়েরই শিক্ষা দেওয়া হয় কি না, সে জন্য দাম একটু বেশী পড়ে। বছরে একশ' কুড়ি পাউণ্ড দিতে হবে—তা ছাড়া কাপড়-চোপড় যা লাগে।

তার পর স্কুলের অপূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া হইল। উচ্চারণ দুরস্ত করিতে এবং সর্ব্বপ্রকারে আদব-কায়দা শিখাইতে এমন স্কুল আর দুটি নাই! আর স্নেহ-যত্ন! ছাত্রেরা স্কুল-গৃহটিকে ঠিক বাড়ীর মত মনে করে! স্কুল ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না! মোরোন্‌ভা কহিল,—এক রাজপুত্তুর আবার এখানে পড়ছে!

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কর্স্তা কহিল,—রাজপুত্তুর?

মোরোন্‌ভা কহিল,—হাঁ, রাজপুত্র! বুঝলে জাক, রাজার ছেলের সঙ্গে তুমি পড়বে, এখানে! দাহমির রাজপুত্র! মাদু যখন সে রাজ্যের রাজা হবে, তখন এখানকার শিক্ষার জন্য চিরকাল সে কৃতজ্ঞ থাকবে!

কথাটা শুনিয়া জাক একটু আনন্দিত হইল! রাজপুত্র! মার কাছে সে কত পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছে। রাজপুত্রকে দেখিবার জন্য কত দিন তাহার সাধ হইয়াছে, কিন্তু কখনও দেখা মিলে নাই। এখানে সেই রাজপুত্রের সহিত সে একত্র পড়িবে! না জানি, কোন্ পরীকন্যার স্নিগ্ধ সরস প্রেমের সুন্দর নির্ম্মল ধারায় এই রাজপুত্রের হৃদয়টুকু অভিষিঞ্চিত!

কর্স্তা বলিল, তা হলেও একটি ছোট ছেলের জন্য বছরে এত টাকা!

মোরোন্‌ভা বাধা দিয়া বলিল,—তার জন্য তাড়া কি! এক কিস্তিতে না পারো, দু কিস্তিতে টাকাটা দিলেও চলবে।

কিন্তু তাড়া যথার্থই ছিল!

সমস্ত বাড়ীখানাই সে কি-এক করুণ সুরে সাহায্য চাহিতেছিল। ভগ্ন টেবিল-চেয়ার, জীর্ণ দেওয়াল, ছিন্ন মলিন কার্পেট, মোরোন্‌ভার দারিদ্র্য-জীর্ণ বিশ্রী পোষাক, অর্দ্ধপূর্ণ অন্নের পাত্র দারুণ দুঃখে আশ্রয় মাগিতেছিল। এ দৈন্য ঘুচাইবার উপায়ও ছিল না! যেমন করিয়া হউক, যেখান হইতে হউক, চাই, চাই, সাহায্য চাই, ভিক্ষা চাই!

এই জীর্ণ গৃহ, শিক্ষকগণের দীন-মলিন বেশ, চারিধারে এই বিষম নিরানন্দ ভাব দেখিয়া জাকের প্রাণ কেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! তাহার বরাবর মনে পড়িতেছিল, সেই স্কুল-বাড়ীর কথা—যেখানে মার সহিত সেদিন সে গিয়াছিল। শিক্ষকদের সস্মিত প্রফুল্ল মুখ, সুন্দর সজ্জিত বাড়ী, সঙ্গী ছাত্রগণের মুক্ত স্বচ্ছ আনন্দ-কোলাহল, সে কি মধুর! কেন সে সেখানে থাকিতে পাইল না?

মোরোন্‌ভা তখন একখানি বাঁধানো মোটা খাতা লইয়া কি লিখিতে বসিল। কর্স্তা মাদাম মোরোন্‌ভার সহিত কথা কহিতে কহিতে জাকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কর্স্তার কথা শুনিতে শুনিতে মাদাম মোরোন্‌ভা বলিতেছিল,—আহা, বেচারা,বেচারা ছেলেটি!

বেচারা ছেলে! ইহারাও বলে, সেই কথা! কেন,—কেন? সে কি করিয়াছে যে পৃথিবীর সকল প্রাণীর নিকট আজ সে এতখানি করুণার্হ হইয়া পড়িয়াছে! এ অযাচিত করুণা, এই অনাহুত সহানুভূতি জাক চাহে না! তবু কেন এ বিড়ম্বনা!

কর্স্তা পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া মোরোন্‌ভার হাতে দিল। চারিধারে শিক্ষকগণের চক্ষু হইতে একটা লোলুপ অধীর দৃষ্টি নোটগুলার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। কর্স্তার সহিত শিক্ষকগণের আলাপ-পরিচয় হইল। ইনি আচার্য্য লাবাস্যান্দ্র্‌ সঙ্গীত-শিক্ষক! ইনি ডাক্তার হারূজ্‌ বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—মুখখানা কুকুরের মত দীর্ঘ; কুশ্রী, চক্ষু চশমার আবরণে মণ্ডিত, শীর্ণ দেহ! ইনি আর্জান্ত—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি, নিভৃতে শিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—সাহিত্যের অধ্যাপক।

দলের মধ্যে দেখিতে যদি কেহ সুশ্রী থাকে, তবে সে এই আর্জান্ত! কিন্তু ইহাকে দেখিয়া জাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল! তাহার চোখে যেন হিংসার তরল প্রবাহ বহিতেছে! জাকের মনে হইল, এ যেন কোন্ ভীষণ শত্রু—পরী-কাহিনীর সেই দৈত্যের সম্মুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে!

হায়, জীবনের কত দুর্দ্দিনে তাহাকে এই আর্জান্তর চোখের বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে! সুদূর ভবিষ্যৎ ক্ষিপ্র একটা বিদ্যুৎচমকের মত জাকের সমস্ত অন্তর চিরিয়া তাহার রেখাপাত করিয়া গেল!

মোরোন্‌ভা জাকের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিলেন,—তাহলে এসো জাক!

কস্তাঁ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া জাকের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল! কস্তাঁর উপর তাহার এতটুকু টান ছিল না, কিন্তু তবু জাকের মনে হইতেছিল, কস্তাঁ বাড়ী যাইবে। সেই বাড়ী,—যেখানে মা আছে, কত আদর-স্নেহের সম্ভার লইয়া মা বসিয়া আছে, কস্তাঁ সেই মার কাছে ফিরিয়া যাইবে! কিন্তু সেই মার কাছে যাইবার তাহার আজ আর কোন পথ নাই! সে স্নেহ-ভরা ভবনের দ্বার তাহার সম্মুখে আজ রুদ্ধ! সে আনন্দ-উল্লাসের সহিত সকল সম্পর্কই তাহার ফুরাইয়াছে! আহা, সে যদি জাক না হইয়া কস্তাঁ হইত। এখানে মিষ্ট কথা বলিতে কেহ নাই, আদর করিতে কেহ নাই! চারিধারেই বিচারকের অপ্রসন্ন অকরুণ মুখ—না আছে ভালোবাসা, না স্নেহ!

কস্তাঁর হাত ধরিয়া জাক বলিল,—কস্তাঁ, মাকে আসতে বলো—

—তা বলবো। মা আসবেন। কিন্তু তাই বলে তুমি কেঁদো না, জাক!

জাকের চোখে বান ডাকিয়াছিল। কিন্তু এতগুলা লোক ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ইহাদের বিদ্রূপ ও হীন কৌতুকের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিবে, এ কথা মনে হইতে আপনাকে সে সম্বরণ করিল। কস্তাঁ চলিয়া গেল।

বাহিরে অবিশ্রাম তুষার বর্ষণ হইতেছিল।

মোরোন্‌ভা আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া নিত্যই আদালতে যাইত, কিন্তু মক্কেলের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ তাহার বড়-একটা ঘটিয়া উঠিত না! একদিন সহসা এক মক্কেল আসিয়া মোরোন্‌ভার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কাগজ-পত্র ও বক্তব্য ঠিক করিয়া হাকিমের সম্মুখে উঠিয়া যখন সে বক্তব্য সুরু করিল, তখন হাকিম ও সহযোগী উকিলের দল তাহার অভূতপূর্ব্ব ভঙ্গী দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া এমন শ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, পরদিন হইতে আদালতের ভূমি স্পর্শ করিতে মোরোন্‌ভার সাহসে কুলাইল না! তার পর সহসা সে একদিন সাহিত্য-সেবা দ্বারা নাম ও অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিল। কিন্তু সে পথও নিতান্ত কঠিন দেখিয়া ত্যাগ করিতে হইল! তাহার পর কি করিবে ভাবিয়া যখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তখন একটা ছোট স্কুলে তাহার শিক্ষকতা জুটিল।

দে কস্তেয়ার বংশের তিন ভগ্নীর পরিচালিত এক স্কুলে আসিয়া একদিন সে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিল এবং অচিরকাল-মধ্যে কনিষ্ঠাটির প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। বিবাহের পর অপর দুইটি ভগ্নী স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করিলে মোরোন্‌ভা ও মাদাম মোরোন্‌ভা স্কুলের স্বত্বাধিকার পাইল। স্কুলের নাম হইল, জিম-নাজ্ মোরোন্‌ভা। ক্রমে জীর্ণ দেওয়ালে রঙ ফিরাইয়া, বিজ্ঞাপনের জমক লাগাইয়া স্কুলের উন্নতি-সাধনে তাহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। মোরোন্‌ভার কয়েকটি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু,—কবি-বৈজ্ঞানিকের দল আসিয়া ক্রমে সে স্কুলে যোগ দিল। জানজিবার, মরক্কো প্রভৃতি দেশ হইতে বিস্তর ছাত্র বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া জিম-নাজে আসিতে লাগিল। কিন্তু জিম-নাজের পরিচয় যখন একটু প্রকাশিত হইল, তখন ছাত্রের দল আবার কমিতে লাগিল; এবং কমিয়া শেষে ক্রমে আটটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আটটি ছাত্র লইয়া স্কুল যখন আর চলিতে চাহে না, ঠিক এমনই দুর্দ্দিনে জাক আসিয়া মুমূর্ষু স্কুলে নবজীবনের সঞ্চার করিল।

মোরোন্‌ভা কহিল,—নূতন ছেলের খাতিরে আজ ছুটি! রাত্রে ভোজ।

করতালি ও আনন্দধ্বনির সহিত সকলে নূতন ছাত্রের মঙ্গল কামনা করিল।

সে রাত্রে আলোকের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ও আহারের প্রাচুর্য্য-ঘটায় স্কুল-গৃহে যে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল, তাহার স্পর্শে বহুদিন-সঞ্চিত দৈন্যের কালিমা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। জিম-নাজ্-বাসী বহুদিন এমন আহার, এমন আনন্দের স্বাদ পায় নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগ্যচক্র

প্রকাণ্ড একতলা বাড়ী—কোথাও একটা জানালা নাই—উপরে কাঁচের সার্শি-ঘেরা আলোক-পথ—এইটিই ছিল, জিমনাজ্ মোরোন্‌ভার ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের পার্শ্বে ভাড়াটিয়া গাড়ী-ঘোড়ার এক আস্তাবল। দিবারাত্র

তথায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠিতেছে—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। মধ্যে মধ্যে উতলা বাতাসে একটা উৎকট দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসে! ঘরটায় পূর্ব্বে এক ফটোগ্রাফারের আড্ডা ছিল, এখন ভিম-নাজ্ মোরোন্‌ভার অধ্যক্ষগণের হাতে পড়িয়া ইহা এক অপূর্ব্ব শিক্ষা-নিকেতনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তেজ এবং শীতের রাত্রে হিমের উৎপাত, ইহার কোনটা হইতে নিষ্কৃতি ছিল না! ছাত্রের দলকে দুইটা অসুবিধা সমানে ভোগ করিতে হইত। উপায়ান্তর ছিল না!

এই ঘরে কুড়িখানি খাটিয়া পাতা, তাহার মধ্যে দশটিতে বিছানা পড়িয়াছে। দ্বারের নিকট একখণ্ড জীর্ণ কার্পেট বিছানো! মোরোন্‌ভা বলিত, ইহার অধিক ব্যবস্থা ঠিক হইবে না, কারণ, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই সঙ্গত।

কিন্তু এতখানি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বালকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল দাঁড়াইল না। স্যাঁৎসেতে ঘরে পোকা-মাকড়ের যথেষ্ট উপদ্রব ছিল। তাহার উপর হিম ও রৌদ্রের নিরবচ্ছিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। বাত, কাশি, জ্বর ছাত্রদের শরীরে লাগিয়াই আছে—তাহার উপর ঘোড়ার খুরের শব্দে সুনিদ্রারও উপায় ছিল না। অসহায় ছাত্রের দল এ-সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করে।

প্রথম রাত্রে জাকের চোখে ঘুম আসিল না। বাড়ীতে তাহার সেই শীতাতপিত সু-উষ্ণ আলোকোজ্জ্বল সজ্জিত ছোট ঘরখানি! তাহার তুলনায় এ যেন অন্ধকারময় এক ভীষণ গহ্বর।

বালকের দল শয়ন করিলে এক কাফ্রী বালক আসিয়া কক্ষের আলো লইয়া গেল। সকলে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু জাকের চোখে ঘুম আসিল না।

তুষারকণা-পরিব্যাপ্ত কাচের মধ্য দিয়া যেটুকু ক্ষীণ আলো আসিতেছিল, তাহারই সাহায্যে জাক দেখিল, পাশাপাশি খাটিয়াতে কতকগুলা যেন কম্বলের পুঁটুলি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে নিশ্বাস ও নাসিকার ধ্বনি এবং থাকিয়া থাকিয়া কাসির শব্দ জাগিয়া উঠিতেছে। সে যেন মানব-জীবনের এক করুণ কাহিনীর শোচনীয় পৃষ্ঠা!

জাকের শীত বোধ হইতেছিল। এই অনভ্যস্ত জীবনের প্রবেশ-দ্বারে এক বিচিত্র কৌতূহল তাহাকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে দিনের ঘটনাগুলা তাহার যেন স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল! মোরোন্‌ভার সাদা টাই, হার্‌জের প্রকাণ্ড চশমা এবং মলিন জামা, এবং সর্ব্বোপরি 'শত্রুর' সেই গর্ব্বিত বিষদৃষ্টি—জাকের প্রাণটাকে ত্রাসিত করিয়া তুলিল। মার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ তাহার অধীর আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় দূরের ঘড়িতে এগারোটা বাজিল। মা এখন কি করিতেছে? নিশ্চয় এখন থিয়েটারে। না, বোধ হয় নাচে! কিন্তু এখনই ফিরিয়া আসিবে—গলায় সেই ফারের বেষ্টনী, মাথার টুপিতে লেশের ঝালর!

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া জাকের বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া মা ডাকিত,—জাক, ঘুমিয়েছ!

কি মিষ্ট, মধুর, সে স্বর! নিদ্রাতেও মার উপস্থিতি কেমন সহজে বুঝিতে পারিত! মার স্পর্শে তাহার যেন দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত—এবং স্বপ্নে-জাগরণে মার কোমল সুন্দর মুখখানি তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকিত। মা চলিতেছে-ফিরিতেছে, চতুর্দ্দিকে যেন দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য, বাল-সূর্য্যের একটা স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! স্বর্গ হইতে যেন কোন্ দেবী নামিয়া আসিয়াছে! কিন্তু আজ?

দিনের বেলা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের অতিরিক্ত মনোযোগ ও অভ্যর্থনার ঘটায় বাড়ীর অভাব জাককে ততখানি কাতর করিতে পারে নাই। তাহার উপর নূতন সহচরগণের সহিত খেলা-ধূলায় সময়টুকু বেশ কাটিয়া গিয়াছে।

এখন একটা কথা জাকের মনে পড়িল। রাজপুত্র,—দাহমির রাজপুত্র! কোথায় সে? ছুটীতে বাড়ী গিয়াছে কি? রাজপুত্রের সহিত একবার দেখা হইলে জাক তাহার সহিত তখনই ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবে—বন্ধুত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আপনাকে ধরা দিবে। বিছানায় শুইয়া জাক কেবলই ভাবিতেছিল, কোথায় এই রাজপুত্র!

রুদ্ধ বাটীর অপর কক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে বাদ্যের একটা ঝঙ্কার উঠিতেছিল! লাবাস্যান্দ্রে অর্গিণ বাজাইতেছে—পার্শ্বে অশ্বের খুরোত্থিত শব্দে ঘরের দেওয়াল অবধি কাঁপিয়া উঠিয়াছে। জাক বিছানায় শুইয়া তাহাই শুনিতেছিল। ক্রমে চারিধার নিস্তব্ধ হইয়া আসিল!

এমন সময় সেই কাফ্রী বালক লণ্ঠন-হস্তে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। জাক মাথা তুলিয়া দেখিতেই কাফ্রী বালক কহিল,—এ কি, তুমি ঘুমোও নি?

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া জাক বলিল,—না, ঘুম আসছে না!

বিজ্ঞের মত সুরে কাফ্রী বালক কহিল,—নিশ্বাস ফেলচো! নিশ্বাস ফেললে দুঃখ অনেকটা কমে বটে। গরীব লোকে যদি এই নিশ্বাসটুকু না ফেলতে পারতো, তা হলে দুঃখে বোধ হয় তাদের বুকখানা ফেটে যেত!

লণ্ঠন রাখিয়া কাফ্রী বালক জাকের শয্যার পার্শ্বে একটা কম্বল বিছাইল, পরে তাহাতে বসিয়া সে কহিল,—উঃ, বাইরে কি ভয়ঙ্কর বরফ পড়ছে!

জাক কহিল,—তুমি এখানে শোবে? ঐ শুধু কম্বলের উপর? চাদর?

কাফ্রী বালক উত্তর দিল,—না—আমি কালো মানুষ। চাদরের দরকার নেই।

কথাটা বলিয়া কাফ্রী বালক মৃদু হাসিল। পরে বুকের মধ্য হইতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া সসম্ভ্রমে সেটিতে চুম্বন করিয়া সে শুইয়া

জাক কহিল,—বাঃ—মেডেলটা তো ভারি মজার দেখতে!

কাফ্রী বালক কহিল,—এ মেডেল নয়—এ আমার গ্রিগ্রি।

"গ্রিগ্রি"র অর্থ জাকের ঠিক বোধগম্য হইল না। সে ভাবিল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিবার জন্য বুঝি কোনরূপ একটা মন্ত্র-পূত মাদুলি!

বালক কহিল, দেশ ছাড়িয়া আসিবার সময় পিশি ক্যারিকা তাহার কণ্ঠে এই মাদুলি পরাইয়া দিয়াছে। পিশি ক্যারিকা—তাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড সে থাকিতে পারিত না—যে ক্যারিকা মাতৃহীন কাফ্রী বালককে একান্ত স্নেহে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিল—এবং আবার একদিন লেখাপড়া শেষ করিয়া এই ক্যারিকার কাছেই সে ফিরিয়া যাইবে!

জাক কহিল,—আমিও মার কাছে ফিরে যাবো।

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে নিস্তব্ধ হইল। উভয়েই ক্যারিকার কথা ভাবিতেছিল! কি স্নেহশীলা এই নারী—তিনি এখন কোথায়? কি করিতেছেন? প্রবাসী বালকের কুশল মাগিতেছেন, নিশ্চয়!

জাক বলিল,—তোমার দেশ খুব ভালো, না? সে এখান থেকে কতদূর? সে দেশের নাম কি?

কাফ্রী বালক উত্তর দিল,—দাহমি!

জাক বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, সাগ্রহে কহিল,—ওঃ! তাহলে—তাহলে তুমি তাকে নিশ্চয় জান! তার সঙ্গেই বুঝি তুমি ফ্রান্সে এসেছ?

—কার সঙ্গে?

—রাজা—দাহমির রাজপুত্রের সঙ্গে!

—আমিই সে। বলিয়া কাফ্রী বালক আবার হাসিল।

জাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। রাজা! রাজপুত্র! যাহাকে সে সারাদিন নানা ফরমাস খাটিতে দেখিয়াছে, ঝাঁটা লইয়া চারিধার যে পরিষ্কার করিয়াছে, টেবিলে খাবার পরিবেষণ করিয়াছে, প্লেট, গ্লাস, সব সাফ করিয়াছে, সেই ভৃত্য—এই কালো কাফ্রী বালক—দাহমির রাজপুত্র! আশ্চর্য্য! কিন্তু না, কথাটা তামাসা নয় তো! বালকের চোখে-মুখে কেমন একটা স্বচ্ছ সরল ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে! সে বুঝি কোন্ সুদূর দেশের সুন্দর অতীতের সুখের দিনগুলির কথা ভাবিতেছে!

জাক বিস্ময়ের সহিত কহিল,—কি রকম?

কাফ্রী বালক কহিল—এই রকম! বলিয়াই সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া আলো নিবাইয়া দিল, কহিল,—সারা রাত আলো জ্বললে কাল মার খেতে হবে আবার। তার পর নিজের বিছানা জাকের বিছানার কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—তুমি ঘুমোবে না? দাহমির কথা মনে পড়লে আমার ঘুম আসে না—আজ আর ঘুম আসবে না। দাহমির গল্প শুনবে তুমি?

—শুনবো!

তখন সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সুনিবিড় অন্ধকারে কাফ্রী বালক জাককে তাহার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলিতে লাগিল। উৎসাহে তাহার চোখ হইতে যেন একটা আনন্দের দীপ্তি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শ্রোতার প্রাণ আগ্রহে পূর্ণ হইয়া উঠিল!

বালকের নাম মাদু। বিখ্যাত যোদ্ধা রাক-মাদু ঘেজোর সে একমাত্র পুত্র!

রাক-মাদু ঘেজোর বীরত্বের কথা কে না জানে! তাহার অসংখ্য সুবৃহৎ কামান, অগণ্য বীর সৈন্য, তীর-ধনু প্রভৃতি নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র, সুশিক্ষিত রণহস্তী, বাদ্যকর, পুরোহিত, নর্ত্তকী, দুই শত স্ত্রী—এ সকলই রাক-মাদুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের চূড়ান্ত পরিচয়! তাঁহার উচ্চ প্রাসাদ শাণিত বর্শায় সুরক্ষিত, বিচিত্র শঙ্খ-রত্নে খচিত, অসংখ্য নর-কপালে সজ্জিত। এই প্রাসাদে মাদুর জন্ম হয়। সূর্য্যের কিরণে চারিধার তখন ঝলমল করিতেছিল—প্রাসাদ-চূড়ায় পতাকা-শ্রেণী অধীর পবনে মৃদু-মন্দ কাঁপিতেছিল। শৈশবে মাদুর মা তাহাকে ছাড়িয়া গেল। পিশি ক্যারিকা ছোট মাদুকে বুকে তুলিয়া লইল। মাদু যেন মাকে আবার ফিরিয়া পাইল। ক্যারিকার হৃদয়ে যেমন স্নেহ, বাহুতে তেমনই শক্তি! হাতে-পায়ে তবলকীর মালা আঁটিয়া মুক্তকেশী ক্যারিকা মস্তকে হরিণের শৃঙ্গ-রচিত মুকুট লাগাইয়া যখন রণক্ষেত্রে নামিত, তখন বলবান শত্রুর হৃদয়েও ত্রাসের সঞ্চার হইত। সেই ক্যারিকার আদরে লালিত মাদু যখন একটু বড় হইল, তখন তাহার বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দেশে সে সুবিধা নাই—কাজেই তাহাকে বিদেশে আসিতে হইল।

দেশে সে কি সুখে দিন কাটিত! ক্যারিকার সহিত মাদু বনে শীকারে বাহির হইত। কি নিবিড় জঙ্গল! গাছের পাতায় কোথাও ফাঁক নাই! আকাশ দেখা যায় না,—কোনো দিক দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না, মাথার উপর আগাগোড়া কে যেন পত্ররচিত সুবিস্তৃত চাঁদোয়া খাটাইয়া রাখিয়াছে! কথা কহিলে প্রতিধ্বনি গম্ভীর স্বরে রণিয়া ওঠে! ফল-ফুলের অন্ত নাই—বর্ণে-গন্ধে সে এক অপরূপ লীলা! কোথাও পায়ের কাছ দিয়া নিরীহ

সাপ সরিয়া যাইতেছে, কখনও কাহাকে আঘাত করে না! পাখীর দল নানা সুরে গান গাহিতেছে, বানরগুলা এ-গাছে ও-গাছে লাফাইয়া বেড়াইতেছে, ফুলগাছের আশে-পাশে ভ্রমরের দল ঘুরিয়া ফিরিতেছে! কোথাও প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—আকাশের এতটুকু ছায়া তাহার বুকে প্রতিবিম্বিত হয় না, যেন বনদেবীর সুবৃহৎ দর্পণের মত পড়িয়া রহিয়াছে,—যেন সবুজ রঙের প্রকাণ্ড একখানা খোলা কাচ!

জাক বলিল,—বাঃ, বেশ!

—হ্যাঁ, সুন্দর।

তার পর মাদু শৈশবের কথা বলিতে লাগিল—অতি-রঞ্জনের ফলে কাহিনীটি পরীর দেশের কাহিনীর মত সুন্দর উপভোগ্য হইয়া উঠিল। গল্প বলিতে বলিতে মাদু অতীতের দিনগুলিকে এক নূতন চক্ষে দেখিতেছিল। অতসী কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, অতীতের এই দৃশ্যটুকুও তেমনই বিচিত্র মধুর রঙে ভরিয়া উঠিল।

দল বাঁধিয়া সকলে শীকারে বাহির হইত। বনের মধ্যে চারিধারে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই মধ্যে বসিয়া দুর্দ্দান্ত পশুর আক্রমণ হইতে সকলে আত্মরক্ষা করিত। কি সুখ! সে কি আনন্দ! তাই মাদুকে এ-সব ছাড়িয়া যেদিন ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বনফিলের স্কুলে আনা হইল, সেদিন তাহার প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল! এ যেন গহ্বরের মধ্যে কে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে! কোথায় গেল স্বাধীনতার সে অপূর্ব্ব আনন্দ, সরল সঙ্গিবর্গের সে প্রাণ-খোলা উল্লাস চীৎকার!

এখানে বাঁধা নিয়মে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়াশুনা করিতে হয়! সকলের সঙ্গে দলে মিশিয়া পরিমিত আহার, ভ্রমণ, খেলা—দুই দিনেই এ সব তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল! শেষে মাদু একদিন সকলের অজ্ঞাতে স্কুল ছাড়িয়া চম্পট দিল!

কিন্তু বেচারার ভাগ্য অপ্রসন্ন ছিল। তাই সে চট্ করিয়া ধরা পড়িয়া গেল! আবার স্কুলে ফিরিতে হইল। এবারে কড়া পাহারা বসিল! নিত্য সেই বই খুলিয়া বি, এ—বে; বি আই—বাই করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, পড়ার চেয়ে বুঝি মৃত্যুও ভালো! নীল আকাশের দিকে মাদু চাহিয়া থাকিত—এই আকাশ তাহার দেশেও ঠিক এমনি! পাখী উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মাদু ভাবিত, সে হয়তো দাহমিতেই চলিয়াছে! সে যদি মাদু না হইয়া পাখী হইত তো কঠিন দেওয়ালের আড়ালে বসিয়া এমনভাবে দুঃখে পিষিয়া তাহাকে মরিতে হইত না—পিশি ক্যারিকার কাছে কবে সে উড়িয়া যাইত!

একদিন সকলে মিলিয়া সমুদ্রের তীরে জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। জাহাজে উঠিয়া মাদুর মনে হইতেছিল, এক দিন এই সুবৃহৎ জলের পাখীটা পিঠে তাহাকে বসাইয়া যেমন এখানে বহিয়া আনিয়াছে—আজ আবার তেমনই ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে না কি? সকলের চোখ এড়াইয়া জাহাজের খোলে সে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। তার পর যখন জাহাজ বহুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে ক্ষুধায় কাতর মাদু তখন আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না! জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কারের লোভে মাদুকে বনফিলের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল। বনফিল তখন আপনার নিকট তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া মাদুকে জিম-নাজ মোরোনভায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

প্রথম-প্রথম এখানে তখন সে কি আদর, কি অভ্যর্থনা! জাকের আদর-অভ্যর্থনার চেয়ে ঢের বেশী! রাজপুত্র আসিয়াছে—চারিধারে একটা ধূম বাধিয়া উঠিল! মোরোনভার সহিত এক টেবিলে বসিয়া মাদু আহার করিত, অপর বালকের দল ঈর্ষায় তাহার পানে চাহিয়া থাকিত! মোরোনভা প্রায়ই বলিত,—মাদু যখন রাজা হবে, স্কুলটা তখন দাহমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাবো, সরকারী বৃত্তিতে সেখানে আর কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না—মনের মত করে লেখাপড়া শিখিয়ে দাহমিকে স্বর্গ বানিয়ে ছাড়বো।

হার্‌জও তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনার প্রতিভা খেলাইতে পারিবে! নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিলে তাহার পরখের কোন সুবিধা এখানে নাই—ঔষধ খাইয়া যদি কেহ মরিয়া যায় তো পুলিশের টানাটানি, প্রাণ যাইবার উপক্রম! মাদুর রাজ্যে সে নিত্য নূতন ঔষধের পরীক্ষা চালাইবে, পুলিশ তখন কিছু করিতে পারিবে না!

লাবাস্যান্দ্র্ সমুন্নত করিবে দাহমির বর্ব্বর সঙ্গীত-শাস্ত্র! সকলেই ভবিষ্যতের আশায় মাদুকে আদর করিত, সম্মান করিত। সকলেই আশা করিয়া বসিয়াছিল, মাদু একবার রাজা হইলে হয়—চক্ষের পলকে সব দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এখন তাহাদের প্রতিভার আলো অন্যায় দ্বেষের ভস্মে যেমন প্রচ্ছন্ন আছে, তখন অনুকূল পবনে সে ভস্মের রাশি উড়িয়া গেলে কি তীব্র তেজে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে!

এমন সময় সহসা সংবাদ আসিল, আশান্তিরা দাহমি অধিকার করিয়াছে, মাদুর পিতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, পিশি ক্যারিকা নিরুদ্দিষ্টা! লোক-মুখে পিশি শুধু একটা সংবাদ পাঠাইয়াছিল, মাদু যেন মাদুলিটিকে সযত্নে রক্ষা করে, তাহারই সাহায্যে নষ্ট রাজ্য আবার সে ফিরিয়া পাইবে,—দৈবজ্ঞের দল এ-কথাটা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে!

এ সংবাদের পর মাদুর আদর একটু কমিলেও তেমন কিছু অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হইল না। কিন্তু যখন এক বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল, মাদুর হইয়া

কেহ অর্থ দিল না, তখন স্কুলের ভৃত্যটিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। ভৃত্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ রীতিমত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল—এবং সেই ভৃত্যের স্থান অধিকার করিল, রাজপুত্র মাদু! মাদুকে একেবারে বিদায় দেওয়া হইল না; কারণ, তাহা হইলে "রাজপুত্র এখানে পড়িতেছে" বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে না!

এ অপমানে মাদু কিন্তু সায় দিল না। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নানা ভাবে সে বুঝাইতে লাগিল,এতখানি হীনতা সে সহ্য করিবে না! কিন্তু বেতের ঘায়ে নিত্য জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে-দাসত্বে সে নামিয়া পড়িল। কোথায় রহিল তখন অত আদর, অত যত্ন! কর্পূরের মত যেন সব উবিয়া গেল।

এখন ভোরে উঠিয়া মাদু বাজার করিতে যায়, ঘর পরিষ্কার করে, অর্থাৎ ভৃত্য ও পাচকের সকল কাজ তাহার দ্বারা সারিয়া লওয়া হয়।

হায় ক্যারিকা—পিশি ক্যারিকা—কোথায় তুমি? তোমার কত সাধের, কত আদরের মাদু—আজ এখানে অধম ভৃত্য হইয়া দিন কাটাইতেছে! একবার যদি সে রাজ্য ফিরাইয়া পায় তো, মনের যত কিছু আক্রোশ—কিন্তু না, খুব মিষ্ট কথায় আদর-অভ্যর্থনা করিয়া জিম-নাজের এই দলটিকে সে দাহমিতে লইয়া যায়! তার পর এই মোরোন্‌ভা-হারুজের দলকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া এ দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লয়।

এই ভীষণ লাঞ্ছনা! থাকিয়া থাকিয়া মাদুর বুকখানা যেন জ্বলিয়া ওঠে! এই আগুনে মোরোন্‌ভার দলকে যদি সে পুড়াইয়া মারিতে পারে, তবেই মনের ঝাল মিটে! ভগবান্ কি সে দিন দিবেন না?

মাদুর চোখ দুইটা বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছিল। জাকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। মাদুর কাহিনী শুনিয়া তাহার দুঃখ হইতেছিল! আহা, রাজপুত্র মাদু—সামান্য চাকরের মত আজ সে খাটিয়া সারা হইতেছে! দুর্ভাগ্য, নিতান্তই সে উপায়হীন, অসহায়!

মাদু কহিল,—তোমার মা বেশ বড় লোক, না? অনেক টাকা আছে তাঁর?

জাক কহিল,—হ্যাঁ।

মাদু কহিল,—তাই এরা তোমায় এত আদর করছে! টাকা না থাকলে এরা ভারী অত্যাচার করে! দেখছ তো, আমাকে!

জাক কিছু বলিল না। তখন দুই নূতন বন্ধুতে মিলিয়া আরও কত গল্প করিল। গল্প করিতে করিতে শেষে কখন্ যে উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। স্বপ্নের ঘোরে জাকের মুখে প্রসন্নহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিল,মাদুকে লইয়া যেন সে মার কাছে ফিরিয়া গিয়াছে, মা মাদুকে কত আদর করিতেছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যিক মজলিস

মানুষ ঠেকিয়া শিখিতে চায়, দেখিয়া নয়। শিশু-প্রকৃতিতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

মাদুর কাহিনী শুনিয়া জাকের প্রথমটা ভারী ভয় হইয়াছিল, কিন্তু মোরোন্‌ভার আদরে আর শিক্ষকদের সুমধুর ব্যবহারে সে ভয় দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল।

প্রথম কয়েক মাস জাক এতখানি আদর-সোহাগ ভোগ করিল যে সে ভুলিয়া গেল, অভাগা মাদুর ভাগ্যেও একদিন এমনি আদর-সোহাগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু বেশী দিন রহে নাই!

লাবাস্যান্দ্র্, হারুজ্, আর্জান্ত সকলেই জাকের সুখের জন্য শশব্যস্ত! ভোজের টেবিলে মোরোন্‌ভার পার্শ্বে তাহার আসন! ছাত্রেরা খেলা-ধূলা করে, গান গাহে, সে সব শুধু জাকের তৃপ্তির জন্য!

জিমনাজ্-বাস কাজেই জাকের সহিয়া গেল।

জাকের এই অবস্থা দেখিয়া মাদুর ভারী দুঃখ হইত। জাকের পানে মাঝে মাঝে কেমন এক করুণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত! সে চাহনির অর্থ, হারে অবোধ, এ সুখ, এ সোহাগ, কয় দিনের জন্য? অমন আদর-যত্ন আমিও একদিন পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ।

এমনই ভাবে কয় মাস কাটিয়া গেল।

জাকের মা প্রায়ই জাককে দেখিতে আসিত। সে সময় ইদার কি খাতির! তাহার তুচ্ছ একটা কথা জিম-নাজের সকলে নিবিষ্ট মনে শুনিতে বসিত!

সহিসের ছেলেরা সেদিন দল বাঁধিয়া খেলা করিতে-ছিল। ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া জাক সেই খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় মোরোন্‌ভা আসিয়া ডাকিল,—জাক্, জাক্, তোমার মা এসেছেন!

মা! জাক লাফাইয়া মোরোন্‌ভার নিকট আসিল, সাগ্রহে কহিল,—কোথায় মা?

সুবেশা ইদা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি ছোট ঝুড়ি—মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ। ইদা ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল! শীর্ণকায় জীর্ণবেশ বালকের দল সম্মুখে আসিলে ইদা মুঠি ভরিয়া সকলকে বিস্কুট-কেক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিল! ছাত্রের দলে আমোদের ঘটা পড়িয়া গেল। মার কোলের কাছে দাঁড়াইয়া জাক্ অপূর্ব্ব গর্ব্বোল্লাসে এই বিরাট ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল

এমনই ব্যাপারে যখন-তখন ইদা অত্যন্ত অর্থ ব্যয় করিত। মোরোন্‌ভার সারা দেহ ক্ষোভে জ্বালায় রি-রি করিতে থাকিত। অনর্থক এই সব বাজে খরচ! এই অর্থ যদি কোন সুযোগ্য সদাশয় ব্যক্তির হস্তে—যেমন

মোরোন্‌ভা এক জন—তুলিয়া দেওয়া হইত, অবশ্য তাহার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্য! বেচারার মাথায় সদ্ব্যয় ও সদনুষ্ঠানের কত কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! শুধু টাকার অভাব বৈ তো নয়!

অনেক সময় মোরোন্‌ভার ইচ্ছা হইত, মনের ভাবটা ইদাকে সে খুলিয়া বলে। কিন্তু সাহসে কুলাইত না! তাহার চোখেমুখে সে ভাব দিব্য ফুটিয়া থাকিত। তাহাই যে ইদার বুঝিবার পক্ষে কেন যথেষ্ট হইতেছে না, ইহা সে স্থির করিতে পারিত না। পারিত না বলিয়া মোরোনভার কেমন রাগ হইত!

বহু দিন হইতে মোরোনভার সাধ একখানি মাসিক-পত্র বাহির করে! নিজেদের দলের একখানা কাগজ না থাকিলে কি স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা যায়! না, পাঁচজনের কাছে পরিচিত হওয়া যায়!

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রায়ই মোরোনভা এই কাগজ বাহির করিবার কথা পাড়িত। শুনিয়া সকলেই তাহাকে উৎসাহ দিত,—বেশ কথা বলিয়াছ! একখানা কাগজ বাহির করিতে পারিলে চমৎকার হয়! কত নূতন ভাব, নূতন চিন্তা নিত্য সকলের মাথায় আসে—এ পর্য্যন্ত যাহা কাহারও মাথায় ধরা দেয় নাই—প্রকাশ করা দূরের কথা। আহা, শুধু নিজেদের একখানা কাগজের অভাবে শুধু সে সব ভাব চাপা পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।

মোরোনভার মনে একটা ধারণা কেমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল—যদি তাহারা কাগজ বাহির করে তো তাহার ব্যয়-ভার জাকের মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে! কিন্তু তাই বলিয়া ইদার নিকট মোরোনভা চট করিয়া কথাটা তুলিতে পারিল না। তাহার মৎলবটা যদি ইদা কোন-রূপ সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাহা হইলে সব মাটী। ধীরে ধীরে সে আপনার কাজ গুছাইয়া লইবে, স্থির করিল।

মোরোনভার স্ত্রী নানা কথার পর ইদাকে ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিল,—মোরোনভার একটা অনুরোধ আছে। কিন্তু কথাটা তুলতে তিনি একটু কুণ্ঠিত হচ্ছেন—

ইদা সাগ্রহে বলিল,—কি? কি কথা?

ইদার স্বরে এতখানি আগ্রহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, মোরোনভার ইচ্ছা হইল, কাগজের জন্য একেবারে কিছু টাকা চাহিয়া বসে! কিন্তু সে বিলক্ষণ চতুর, ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া তবে কাজ করে! সুতরাং আসল কথার কিছুই সে আপাততঃ ভাঙ্গিল না, ইদাকে শুধু কহিল,—আমাদের একটা সাহিত্য-সভা আছে, এই রবিবারে তার একটা অধিবেশন হবে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আসেন—

ইদা জিজ্ঞাসা করিল,—সভায় কি হবে?

—প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি, গান—

—আর কে কে আসবেন?

মোরোনভা একটু কাশিয়া উত্তর দিল,—আরও অনেক ভদ্রলোক আসবেন। বিস্তর মহিলারও নিমন্ত্রণ হয়েছে!

ভদ্রসমাজে মিশিবার একটা উৎকট বাসনায় এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ইদা এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করিল না।

মোরোনভা অত্যন্ত খুশী হইল। সভাগৃহ সাধ্যমত ভাল করিয়া সাজানো হইল। ফটকের সম্মুখে দুইটি রঙিন আলোর ব্যবস্থা হইল। বাতিদান কয়টা মাদ্ ঘসিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল! কক্ষের সমস্ত আসবাব-পত্র অবধি মাদ্ যথাসাধ্য মার্জ্জিত করিল। রাত্রি আটটায় মজলিস বসিবে!

মোরোনভার জীবনে আজ এক মহা উৎসব। তাহার পরিচিত যত ব্যর্থ কবি, ব্যর্থ শিল্পী সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

আটটার সময় বালকের দল বেঞ্চে আপনাদিগের আসনে আসিয়া বসিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রিত লোকেরাও দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। সে দলে কবি, শিল্পী, চিত্রকর, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই আছে, তবে ভাগ্যলক্ষ্মী যে কাহারও প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই, তাহা তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না! বাণীর যত অনাদৃত উপেক্ষিত পুত্র! নিতান্ত বেচারা! তাহাদের শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বেশ, কোটর-গত চক্ষু, বিষণ্ণ ভাব দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়! প্রতিভাসত্ত্বেও লোকে যে তাহাদের কদর বুঝিল না, এই দুঃখ যেন তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে!

সকলে আসিয়াছে। কিন্তু জাকের মা ইদা কৈ? যাহার জন্য মোরোনভার আজ এত আয়োজন!

ইদার বিলম্ব দেখিয়া মোরোনভা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; দলের সকলে ক্ষুণ্ণ হইল।

সকলের কাছে গিয়া মোরোনভা চুপি-চুপি বলিতে লাগিল,—কাউণ্টেসের জন্যই একটু অপেক্ষা করছি শুধু, না হলে সময় হয়েছে ঠিক।

অবশেষে অনেক দেরী হইয়া গেলে ইদার আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আর্জান্ত্‌কে তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করা হইল।

আর্জান্ত্‌ তখন এক বিচিত্র ভঙ্গীতে স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল! রচনা যেমন জঘন্য, আবৃত্তির ভঙ্গী ঠিক তাহার অনুরূপ। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়! ঘন ঘন করতালি-বৃষ্টি হইতে লাগিল! কেহ বলিল,—বাহবা! কেহ বলিল,—চমৎকার!

এইরূপে প্রশংসিত হইয়া আর্জান্ত্‌ আরও উৎফুল্ল চিত্তে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

এমন সময় ধীরে ধীরে ইদা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

আর্জান্ত'র দৃষ্টি তখন ঊর্দ্ধে, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কাব্য-লোকে—কাজেই ইদাকে সে লক্ষ্য করিল না। কিন্তু ইদা তাহাকে দেখিল—নূতন চোখে, নূতন দৃষ্টিতে! সেই মুহূর্ত্তে ইদার ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার সারা জীবনের সকল সাধ, সকল কামনা আজ ঐ মানুষটির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে! এক মুহূর্ত্তে ইদা আপনাকে তাহার পায়ে সঁপিয়া দিল!

ইদাকে দেখিয়া জাক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মোরোনভা শশব্যস্তে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। আর্জান্ত' ছাড়া কক্ষস্থ সকলেরই চিত্ত ইদার সে মধুর লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইদা কাহারও পানে চাহিল না; সে শুধু তন্ময় হইয়া আর্জান্ত'কে,—তাহার জীবনের স্বপ্ন—সুখের সাধের স্বপ্ন, কবি আর্জান্ত'কে দেখিতেছিল!

মোরোনভা ইদাকে কহিল,—আপনার জন্যই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম······সময়টা নেহাৎ আড়ষ্ট ঠেকবে বলেই কাউণ্ট আর্জান্ত'র কবিতা শোনা যাচ্ছিল!

ইদা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল—কাউণ্ট! বাঃ!

সলজ্জ বালিকার মত তরল কণ্ঠে ইদা আর্জান্ত'কে কহিল,—থামলেন যে আপনি! বেশ হচ্ছিল!

আর্জান্ত' কিন্তু সম্মত হইল না। কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশটি আবৃত্তির সময় ইদার আগমনে বাধা পাইয়া সে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিল। আর্জান্ত' কহিল,—আর নেই। শেষ হয়ে গেছে।

ইদার প্রিয় কবি ইদার পানে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অন্যান্য লোকের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। ইদা মরমে মরিয়া গেল। প্রথম দর্শনেই সে তাহার প্রিয়তম কবির বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে! ইদার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল!

তার পর সভায় কত কাজ হইয়া গেল—ইদার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না! সে শুধু তাহার কবিকে দেখিতেছিল!

কি সুন্দর দাঁড়াইবার ভঙ্গী! কি উদাস, আহা, তাহার চোখের দৃষ্টি—কবির যোগ্য বটে! এ জগতে যেন তাহার মন নাই! কোন্ সুদূর কল্পনা-স্বর্গে তাহার চিত্ত-চকোর কি অপার্থিব সুধার আশায় তখন ঘুরিয়া ফিরিতেছে! আর্জান্ত'র প্রতি ইদা ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাহার পর কখন্ যে সভার প্রবন্ধ-পাঠ, গান প্রভৃতি বিধি-অনুযায়ী হইয়া গেল, ইদা তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন আবার আর্জান্ত'র পালা আসিল।

ইদা তৃষিত চিত্তে শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে মুগ্ধভাবে সে মোরোনভার পানে চাহিল!

মোরোনভা বিজয়-গর্ব্বে ঈষৎ হাসিল। ইদা মোরোনভাকে কহিল,—এমন লোক আপনার সভার সভ্য? আপনি ভাগ্যবান!

আবৃত্তি শেষ হইলে ইদা জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ কোন্ কাগজে এঁর কবিতা ছাপা হয়?

—কোথাও নয়। কেউ ছাপে না। কেন ছাপবে? হিংসেয় সব সারা হয়ে যাচ্ছে। এঁদের কবিতা ছাপলে তাঁদেব গুলি আর বাজারে বিকোবে না।

ইদা ঠিক একেবারে মোরোনভার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। মোরোনভার ভারী সুযোগ মিলিয়াছে। বর্ত্তমান রুচির সে অজস্র নিন্দা করিল; আরও কহিল,—সাহিত্যের আজকাল এমন দুর্দ্দশা হয়েছে যে ভালো লেখা এখন আর সম্পাদকদের পছন্দ হয় না! যত পচা লেখার আদর! প্রতিভার যুগ চলে গেছে। এখন শুধু সুপারিশ আর তোষামোদ, এই বৈ নাই! সকলে দল পাকিয়ে বসে আছে, বাইরের কারুকে মাথা তুলতে দেবে না।

কথাটা শেষ করিয়া মোরোনভা একটা নিশ্বাস ফেলিল। হায় রে, আজ যদি নিজেদের একখানা কাগজ থাকিত!

ইদা কহিল,—আপনাদের নিজেদের একখানা কাগজ থাকা খুব দরকার কিন্তু।

—নিশ্চয়ই!

—বার করেন না কেন?

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া মোরোনভা কহিল,—টাকা কোথায়?

—টাকার ভাবনা কি? সে যেমন করে হোক জোগাড় হবে'খন! এমন সুন্দর জিনিষগুলো তা বলে চেপে রাখা ঠিক নয়!

—কখনই নয়!

মোরোনভা ভাবিল, আর ভাবনা নাই, এইবার সে কাজ বাগাইতে পারিবে!

মোরোনভা তখন আর্জান্ত'র সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ইদার চিত্তকে লুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল। মুগ্ধ চিত্তে ইদা আর্জান্ত'র কথা শুনিতে লাগিল। এমন সময় জাক ডাকিল,—মা—

মা বিরক্ত হইল, বলিল,—আঃ ছি, চুপ করো—জাক,—দুষ্টুমি করো না!

আর্জান্ত' প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে তাহারই বিষয় লইয়া মোরোনভার সহিত ইদার কথা এমন জমিয়া উঠিয়াছে! যখন তাহা জানিল, তখন আপনাকে আরও জাহির করিবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিল। অপরের সহিত যখন সে কথা কহিতেছিল, তখন তাহার দিকে ইদার দুই তৃষিত নেত্র যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট রহিয়াছে, এ-টুকু বেশ লক্ষ্য করিল।

ইদাও এখন এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার উপর আর্জান্তঁর মোটেই লক্ষ্য নাই, এমন নহে!

আর্জান্তঁর কথাবার্ত্তা ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতেছিল,—সুন্দর! এমনটি আর দেখা যায় না! আর ইদা? সে কি ভাবিতেছিল? সে অভাগিনী তখন আপনাকে বিকাইতে বসিয়াছে।

সে দিন অনেক রাত্রে সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মজলিসের জের

পরদিন মোরোন্‌ভার নিকট মাদাম বারান্সির এক চিঠি আসিয়া হাজির। তাহার গৃহে সস্ত্রীক মোরোন্‌ভার নিমন্ত্রণ। চিঠির তলায় ছোট একটি 'পুনশ্চ'তে কবি আর্জান্তঁকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া আর্জান্তঁ কহিল,—আমি তা বলে যাচ্ছি না, সেখানে!

মোরোন্‌ভা একটু বিরক্ত হইল, জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি! যাবে না কেন, শুনি।

—ও রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমি রাজী নই—বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া দূরের কথা।"

—নাঃ, তুমিই দেখচি আমার সব মতলব মাটী করবে! নিমন্ত্রণে যেতে দোষ কি! মাদাম দ্য বারান্সিকে তুমি যা ভেবেচ, তা নয়, আর যদি তাই হয়, তবু আমার খাতিরে তোমায় যেতে হবে! বুঝচো তো—কাউণ্টেসকে না বাগাতে পারলে আমাদের কাগজখানা বার করার কোন সম্ভাবনা নেই।

অনেক বলা-কহার পর আর্জান্তঁ যাইতে রাজী হইল।

হারুজের উপর জিম্-নাজের ভার দিয়া মোরোন্‌ভা সস্ত্রীক ইদার বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কবি আর্জান্তঁ বলিল,—তোমরা এগোও, আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হবো!

মোরোন্‌ভা জিজ্ঞাসা করিল,—ঠিক যাচ্ছ?

—হাঁ।

সাতটার সময় আর্জান্তঁর পৌঁছিবার কথা! সাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি তাহার দেখা নাই! ইদা অস্থির হইয়া উঠিল! মোরোন্‌ভাকে বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—কৈ, এখনও এলেন না যে! অসুখ-বিসুখ হল না তো তাঁর? যে শরীর!

মোরোন্‌ভারও বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল, আর্জান্তঁ না আসিলে কাগজের কথা তোলা যাইবে না!—নাঃ, আর্জান্তঁ সব মাটী করিল!

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আর্জান্তঁ আসিয়া উপস্থিত!

তাহাকে দেখিয়া ইদার প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। মোরোন্‌ভা বলিল,—এত দেরী হল যে?

—হঠাৎ একটা কাজে দেরী হয়ে গেল।

ইদার বাড়ী দেখিয়া আর্জান্তঁ অবাক হইয়া গিয়াছিল—বেশ সাজানো ঘরগুলি! ঘরের আসবাব-পত্র দেখিয়া মোরোনভার মত মুখে অজস্র প্রশংসা না করিলেও আর্জান্তঁ মনে মনে ঈষৎ খুশী হইল এবং পূর্ব্বের মত গম্ভীরভাবে বসিয়া না থাকিয়া দুই একটা করিয়া কথা-বার্ত্তা ক্রমে সুরু করিয়া দিল।

কথাবার্ত্তায় আর্জান্তঁ যে নিতান্ত অপটু, তাহা নহে, কিন্তু নিজের কথা ছাড়া আর-কিছু কহিতে তাহার বড় ভালো লাগে না। ইদার আবার এমনই স্বভাব যে কাহারও আত্মকথা বড় অধিকক্ষণ সে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারে না। শ্রোতার এই বিষম অধৈর্য্যে আর্জান্তঁ আরও বিষম চটিয়া যায়! আর্জান্তঁর কথার মাঝে ইদা অনেক বার আপনার অজ্ঞাতে তাহাকে বাধা দিয়া ফেলিল। আর্জান্তঁ এক প্রকার বিরক্ত দৃষ্টিতে ইদার পানে চাহিল। ইদা সঙ্কুচিতা হইয়া গেল, ভাবিল, আর্জান্তঁ অমন করিয়া চাহিল কেন? বিরক্ত হইয়াছে কি?—কেন? ইদার বুকের মাঝে এক ঝলক রক্ত উথলিয়া উঠিল। আর্জান্তঁর বিরক্তি আজ ইদার কাছে মৃত্যুরও অধিক। ইদার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ডাক ছাড়িয়া সে কাঁদিয়া ওঠে!

ভোজনান্তে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া সকলে বসিল। মোরোন্‌ভা ভাবিল, কাগজের কথাটা তুলিবার পক্ষে এইটাই ঠিক সময়! সে বলিল,—দেখুন কাউণ্টেস্, আপনি যে সেই একখানা কাগজ বার করবার কথা বলে-ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমি ভেবে দেখেছি। খরচ যত পড়বে, ভেবেছিলুম, ততখানি ঠিক লাগবে না!

অন্যমনস্কভাবে ইদা উত্তর দিল,—হ্যাঁ।

—তা দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা খুব দরকার হয়ে পড়েছে!

কথাটা ইদার কানে পৌঁছিল কি না সন্দেহ! সে আর্জান্তঁর কথা ভাবিতেছিল। কেন কবি অমন চিন্তিত-ভাবে পায়চারি করিতেছে!

ইদার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া মোরোন্‌ভা তাহার পত্নীর পানে চাহিয়া একটু হাসিল। এ হাসির অর্থ, ইস্, একেবারে বিভোর!

এদিকে ইদা ভাবিতেছিল, কি করিয়া সে আর্জান্তঁর মন পাইবে। কেমন করিয়া? সহসা একটা মতলব তাহার মাথায় আসিল! ইদা আর্জান্তঁকে কহিল,—দয়া

করে আপনার সেই কবিতাটা একবার শোনাবেন—আমার বড় ভালো লেগেছিল!

আর্জাস্তঁর চিত্ত টলিয়া গেল। এমন কথায় কোন্ কবির না টলিয়া থাকে? সে বলিল,—বলুন, কোন্ কবিতাটা আপনি শুনতে চান। অসংখ্য কবিতা লিখেছি কি না—তাই—

—সেই যে, যে কবিতাটি জিম্‌নাজে পড়েছিলেন—প্রথম লাইনটা তার, কি, ঐ যে—

—প্রেম বিভুসম পূজার যোগ্য! সে নহে ক্ষুদ্র, হীন!

আর্জাস্ত তাহার এই একনিষ্ঠ ভক্তটির প্রতি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে বলিল,—আমার কবিতার লাইন পর্য্যন্ত আপনি মনে রেখেছেন, দেখছি—ধন্যবাদ!

আনন্দে ইদার মুখে ক্ষণেকের জন্য কথা ফুটিল না! মুহূর্ত্ত-পরে আত্ম-ভাব সংযত করিয়া ইদা কহিল,—সে কবিতাটি আমার বড় ভালো লেগেছিল—ভালো কবিতার লক্ষণই হচ্ছে, পাঠক বা শ্রোতার মনে একেবারে যেন গেঁথে যায়।

ইদার এই অতিরিক্ত প্রশংসায় আর্জাস্তঁর সমস্ত মুখে একটা গৌরব-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল। তাহার অর্থ—তবু সম্পাদকের দল তাহার লেখা ফিরাইয়া দেয়, কাগজে ছাপে না!

জিম্‌-নাজে ফিরিবার পথে মোরোন্‌ভা আর্জাস্তঁকে বলিল,—খ্যাখো, যদি আমাদের একখানা কাগজ বেরোয়, তবে তোমাকে তার সম্পাদক হতে হবে!

মোরোন্‌ভা ভাবিয়াছিল, আর্জাস্তঁকে সম্পাদকীর লোভ না দেখাইলে তাহার ততটা চাড় হইবে না, আর আর্জস্তঁ ছাড়া কাউণ্টেসের নিকট হইতে টাকা বাহির করিবার সাধ্য কাহারও নাই!

মোরোন্‌ভার কথায় আর্জাস্তঁ কোন উত্তর দিল না! কাগজের কথা সে একটুও ভাবে নাই। তাহার জীবনে নিমেষের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছিল। এ পর্য্যন্ত কোন নারী তাহার মনে এতটুকু রেখা টানিতে পারে নাই। কিন্তু সহসা আজ এই নারী কি করিয়া তাহার মনের বাঁধন এমন সহজে শিথিল করিয়া দিল?

সেই দিন হইতে ইদার প্রতি বাহিরে কোনরূপ ভাবান্তর না দেখাইলেও তাহার হৃদয়ের নিভৃত পটে যে একখানি নারীমূর্ত্তি দিন দিন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আর্জাস্তঁ নিজে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল!

আর্জাস্তঁ জাককে নানা কথার মধ্য দিয়া তাহার মায়ের কথা, বাড়ীর অনেক কথা নিত্যই প্রায় জিজ্ঞাসা করিত। আর্জাস্তঁর আদরে জাক গলিয়া গিয়া তাহাদের বাড়ীর ছোট-খাট সকল কথাই একে একে তাহাকে বলিয়া যাইত! এক দিন জাক কথায় কথায় বলিল,—আমার বন্ধু আমায় খুব ভালো বাসেন।

আর্জাস্তঁ জিজ্ঞাসা করিল—বন্ধু!—তিনি কে?

জাক আশ্চর্য্য হইল।—বন্ধুকে আপনি চেনেন্ না? ...তা চিন্‌বেন কেমন করে? তিনি তো এখানে কখনও আসেন নি!

—তিনি কত বড়? কি নাম?

—কি নাম, তা জানি না। আমি তাঁকে বন্ধু বলে ডাকি। তিনি ঢের বড়—আপনার চেয়েও বড়। আর তাঁর অনেক টাকা!

—তোমার মা তাঁকে কি বলে ডাকেন?

—মা?—মাও কৈ তাঁর নাম ধরে ডাকে না—ম্যসিয়ো—ম্যসিয়ো কবে।

—তোমাকে ভালবাসেন তিনি?

—খুব ভালবাসেন! যখন-তখন আমাদের দেখতে আসেন, মাঝে মাঝে থাকেন। আর যখন আসতে না পারেন, তখন কত ফল-টল পাঠিয়ে দেন। আমিও তাঁকে খুব ভালবাসি!

—তোমার মাও তাঁকে ভালবাসেন?

—বাসে বই কি!

জাক সরলভাবেই উত্তর দিল। কিন্তু এই কথায় ভরিয়া আর্জাস্তঁর মনে কে যেন খানিকটা তীব্র বিষ ঢালিয়া দিল। সেই দিন হইতে বন্ধুর কথা আর্জাস্তঁর মোটে ভাল লাগিত না। তাহার বন্ধুর উপর আর্জাস্তঁর কেন এমন ভাব হইল, জাক তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আর্জাস্তঁকে জাকও ক্রমে আর দেখিতে পারিত না! ইহার উপর জাকের মা আবার আর্জাস্তর সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিতেছে দেখিয়া জাক জ্বলিয়া যাইত! ক্রমে আর্জাস্তঁ জাকের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল।

ছুটির সময় জাক বাড়ী আসিলে ইদা জিজ্ঞাসা করিত,—তোর মাষ্টার-মশায় আর্জাস্তঁ তোকে ভালোটালো বাসেন রে?

জাক মুখ ভার করিয়া বলিল,—ছাই!

মাসে দুইটি বৃহস্পতিবার জাক হাফ্‌-ছুটি পাইত! সেই দুই দিন সে মায়ের কাছে থাকিত, খাওয়া-দাওয়া করিত। একটা বৃহস্পতিবারে জাক দেখিল, খাইবার ঘরটি বেশ সাজানো হইয়াছে—ফুলদানীগুলা বিচিত্র বর্ণের ফুলে ভরা! ঘরে তিন জনের খাইবার আসন। জাক মহা আনন্দিত হইল। সে ভাবিল, বুঝি, বন্ধু আজ তাহাদের সঙ্গে ভোজন করিবেন।

এমন সময় মাকে দেখিয়া জাক জিজ্ঞাসা করিল,—মা, আর একটা জায়গা কার হয়েছে?

—বল দেখি—যদি বল্‌তে পারো—তবে তোমার

একটা খুব ভাল খেল্‌না দেব। বলো দেখি, কে আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন?

জাক ভাবিয়াছিল, সে ঠিক বলিতে পারিবে! তাই সে ঠোঁট দুইটি ঈষৎ ফুলাইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—বলি? বন্ধু আসবেন!

জাকের মা হাসিতে হাসিতে বলিল, হলো না—তোমাদের মাষ্টার মশায় আর্জান্ত'!

আর্জান্ত'!

পলকে জাকের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। ইদা ভাবিল, পুরস্কার-লাভে হতাশ হইয়া জাকের মুখ অমন হইয়া গেল! সে জাককে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, না—না—খেল্‌না পাবে!

তার পর তিন জনে খাইতে বসিল। আজ জাকের মনে এতটুকু সুখ নাই! ইদা ও আর্জান্ত' গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিল। তাদের কোন কথা জাকের কানে গেল না। তাহার আর এক দণ্ড সেখানে থাকিবার প্রবৃত্তি ছিল না! তাহার প্রাণ কেমন শিহরিয়া উঠিতেছিল! এ কোথা হইতে কে আসিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আজ লুটিয়া লইবার উদ্যোগ করিয়াছে!

আহার শেষ হইলে ইদা ও আর্জান্ত' দুই জনে বসিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিল! আর্জান্ত' তাহার অতীত জীবনের যত সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল, আর ইদা তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেছিল। বেচারা জাক দূরে একখানা ছবির বহি খুলিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে ঈষৎ তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল।

ইদা কহিল,—যাও জাক,—এখানে ঘুমিও না—কন্‌স্তাঁকে ডাকো।

জাক করুণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা, আর একটু সে মায়ের কাছে থাকে!

ইদা কহিল,—ছি, যাও। কথা শোনো। না হ'লে মাষ্টার মশায় বক্‌বেন!

জাক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিল।

ইদার সহিত আর্জান্ত'র ঘনিষ্ঠতা যত গাঢ় হইতে লাগিল, ততই জাক আর্জান্ত'র চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। ইদা আর্জান্ত'র জন্য সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু জাক—তাহার আদরের জাক—আহা, তাহার লাঞ্ছনা ইদার বুকে শেলের মত আঘাত করে! জাককে ছাড়িয়া বরং সে থাকিতে পারে, কিন্তু জাকের কষ্ট চোখে দেখা—অসহ্য!

আর্জান্ত'র বিষ-দৃষ্টি হইতে জাককে দূরে রাখিবার ইচ্ছায় ইদা একদিন স্পষ্টই আর্জান্ত'কে কহিল,—চল, আমরা অন্য কোথাও যাই। আমার নগদ কিছু আছে, তা ছাড়া আমি খাট্‌তে পারব।

আর্জান্ত' সম্মত হইল না। সে বলিল,—এত শীঘ্র! না, আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। আমার এক আত্মীয়া আছেন, তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে—শীঘ্রই কিছু দাঁও মারা যাবে! বুঝলে কি না।

ইহা বলিয়া আর্জান্ত' ভবিষ্যতের এক মিলন-চিত্র আঁকিতে বসিল। ইদা মুগ্ধ হইল।

এইরূপে শীত কাটিয়া গেল!

একদিন জাক ম্লান-মুখে জানালার পাশে বসিয়া বসন্তের নীল আকাশের পানে চাহিয়া আছে। সেদিন বৃহস্পতিবার। জাক আর বড়-একটা স্কুলের বাহির হয় না! বসন্তের বাতাসে শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে। জাক ভাবিতেছিল, এই সময় অন্য কোথাও যদি সে যাইতে পাইত!

এমন সময় হঠাৎ কে ডাকিল,—জাক!"

জাক ফিরিয়া দেখে,—তাহার মা। তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছে!

জাকের আহ্লাদ দেখে কে! সে তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করিবার জন্য তাহার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ মাদুর সঙ্গে দেখা।

মাদুকে দেখিয়া জাক ইদাকে কহিল,—মা, মাদুকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না!

ইদা কহিল,—মাদুকে কি এঁরা যেতে দেবেন?

—হ্যাঁ মা, তুমি বল্‌লেই দেবে!

জাকের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া ইদা প্রস্তাব করিল। মাদু যাইবার অনুমতি পাইল। জাক তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল, বলিল,—মাদু, মাদু, শীগ্‌গির সব ঠিক করে নাও।

গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে জাক জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন মাদু, বেশ, না?

মাদু চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল,—বেশ!

সমুদ্র-ধারের একটা হোটেলে আহারাদি করিয়া ইদা বলিল,—চল, এখানকার চিড়িয়াখানা দেখে আসা যাক্!

শুনিয়া জাক আনন্দে লাফাইয়া উঠিল,—বাঃ—বাঃ, বেশ! মাদু কখনও চিড়িয়াখানা দেখে নি—তারও দেখা হবে!

এতক্ষণ মাদু জাকের খাতিরে পড়িয়া বলিতেছিল, তাহার আমোদ হইতেছে। কিন্তু চিড়িয়াখানা দেখিয়া বাস্তবিক সে প্রীত হইল! কত দেশের কত শত পশুপক্ষী বন্দী হইয়া রহিয়াছে। কেন?—শুধু মানুষের সুখের জন্য! চিড়িয়াখানার উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া জিম্‌নাজের উঁচু দেওয়াল তাহার মনে পড়িল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মাদু ভাবিল,—তাহার অবস্থাও এই সকল জন্তুর মত! সেও মানুষের হাতে বন্দী—ইহারাও

তাই! অসহায় পশু পক্ষীর নীরব বেদনাটুকু মাহু অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিল।

হঠাৎ মাহু দেখিল, এক প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে চড়িয়া কয়টি নরনারী মাহুর দিকে আসিতেছে! সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণ পড়িয়া তাহাদের ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল।

হাতী দেখিয়া দেশের কথা মাহুর মনে পড়িল। স্বদেশের স্মৃতির সঙ্গে অতীত সৌভাগ্যের কথা মাহুর মনে আসিল। অতীতের স্মৃতি মাহুর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা যেন আরও জাগাইয়া তুলিল। মাহু কেমন হইয়া গেল। জাক বলিল,—মাহু—মাহু, কি হয়েছে তোমার?

মাহু কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর যখন সে শুনিল, সেও ইচ্ছা করিলে হাতীর পিঠে চড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, তখন তাহার মুখের বিষণ্ণ ভাব কতকটা কাটিয়া গেল।

জাক বলিল,—তুমি তবে হাতীতে চড়, আমি মার কাছে থাকি।

মাতা-পুত্রে দুই জনে মাহুর হাতীর পিঠে চড়া দেখিতে লাগিল। কি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতিতে মাহু হাতীর পিঠে উঠিয়া বসিল!

হাতীর পিঠে চড়িয়া মাহুর মেজাজ ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন আবার দেশে ফিরিয়া গিয়াছে··তাহার নিজের রাজত্বে! পলকে চোখের সম্মুখে দাহমির রাজপ্রাসাদ ছবির মত ফুটিয়া উঠিল—রণবাদ্য যেন কাণে আসিয়া পৌঁছিল। সে যে মোরোন্‌ভা-জিম্-নাজের একজন লাঞ্ছিত ছাত্র, এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেল।

হাতীর পিঠে চড়িয়া মাহু অনেকক্ষণ বেড়াইল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। হাতী হইতে নামিতে হইল। আবার যে মাহু—সেই মাহু!

বাড়ী ফিরিবার সময় হইল; জাকের মনে আর সে আনন্দ নাই! ইদাও বিমর্ষ-চিত্ত! কি যেন সে বলিবে-বলিবে করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। এমনইভাবে কিছুক্ষণ কাটিল।

অবশেষে ইদা ডাকিল,—জাক!

জাক মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—কি—মা?

ইদা জাকের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে বলিল,—তোমায় একটা কথা··বলবো। শুনে তোমার দুঃখ হবে। কিন্তু···

জাক শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—না মা,···তবে থাক্—বলো না!

—না জাক, আমায় বলতেই হবে। কথাটা হচ্ছে,—কিছু দিনের জন্য আমায় একটু দূরে যেতে হবে। বিদেশে—

—কোথায়?

—ছি—কেঁদো না! আমি তোমাকে চিঠি লিখবো—আর বেশী দিনও থাকবো না? বলিয়া ইদা জাককে সান্ত্বনা দিল।

জাক শুধু পাষাণের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল; চোখের দুই কোণে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সমগ্র বিশ্ব যেন এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। চারিধার স্তব্ধ হইয়া আসিল।

ইদার কোলের কাছে বসিয়াও জাকের মনে হইতে লাগিল, আজ সে জগতে মাতৃহীন, একা, নিতান্ত অসহায়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র

ইহার কিছুকাল পরে জিম্-নাজে মোরোন্‌ভার নামে আর্জান্তঁর এক পত্র আসিল।

মোরোন্‌ভাকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছে,—অকস্মাৎ এক আত্মীয়ার মৃত্যু হওয়ায় তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাজেই আর স্কুলে অধ্যাপনার কার্য্য করা তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এজন্য নিতান্ত দুঃখের সহিত এ পবিত্র ব্রত পালন করিতে সে অক্ষম হইতেছে ইত্যাদি। পত্রের নীচে 'পুনশ্চের' জের ছিল। তাহাতে কয়েক ছত্রে লেখা ছিল, মাদাম বারান্সিও সহসা প্যারিতে চলিয়া আসিয়াছেন, পুত্র জাককে পিতার মত স্নেহপরায়ণ অধ্যক্ষ মোরোন্‌ভার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, এমন বিশ্বাস মাদামের আছে। মোরোন্‌ভা যে জাককে পিতার মত স্নেহ করিবেন, মাদাম এ আশাও রাখেন। জাকের অসুখ-বিসুখ হইলে সে সংবাদ আর্জান্তঁকে দিলেই চলিবে, আর্জান্তঁ তখনই সে সংবাদ মাদাম বারান্সিকে প্রেরণ করিতে এতটুকু বিলম্ব করিবে না।

পিতার মত স্নেহপরায়ণ! কি অসহ্য বিদ্রূপ! আর্জান্তঁ কি মোরোন্‌ভাকে জানে না? জাকের মা এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—জাকের তরফ হইতে একটি কপর্দ্দক পাইবার সম্ভাবনা যখন ফুরাইয়াছে, তখন মোরোন্‌ভার নিকট জাক কেমন ব্যবহার পাইবে, তাহা আর্জান্তঁ বিলক্ষণ বুঝে! তবুও সে এ কথা লিখিয়াছে। বিদ্রূপ!

পত্র পাঠ করিয়া রোষে ক্ষোভে মোরোন্‌ভার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল! সে অনলের তাপ জিম্-নাজ-বাসী সকলেই সে দিন অল্পাধিক অনুভব করিল।

মাদাম চলিয়া গিয়াছে? সেই ভিখারী কদর্য্য লোক-টার সহিত চলিয়া গিয়াছে? লোকটার না আছে বুদ্ধি,

না আছে নিজের এতটুকু সামর্থ্য! একটা দাম্ভিক, মূর্খ অপদার্থ জীব! আর সেই নারী? সে এতটুকু দ্বিধা করিল না! স্বচ্ছন্দে ছেলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কি হৃদয়-হীনা, পাষাণী!

পত্রখানা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে মোরোন্‌ভা একটা ক্রূর হাসি হাসিল, ভাবিল, বাপের মত যত্ন করিব আমি! বটে! বাপের মত যত্ন! হুঁ!

সম্ভাবিত মাসিক-পত্রের সকল আশা লুপ্ত হইল বলিয়াই যে মোরোন্‌ভার এতখানি আক্রোশ হইয়াছিল, তাহা নহে। এ আক্রোশের প্রধান কারণ ছিল, হিংসা! আর্জান্ত ও ইদা,—এ দুইটি প্রাণী প্রথম সাক্ষাৎ-অবধি আপনাদিগকে যেমন একান্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনই উভয়ের চতুর্দ্দিকে তাহারা এমন একটি দুরধিগম্য অন্তরাল রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার মধ্য দিয়া ভিতরকার এতটুকু গোপন রহস্য মোরোন্‌ভার সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই! এমন করিয়া চতুর মোরোন্‌ভার চক্ষে উভয়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবে এবং এত শীঘ্র—মোরোন্‌ভা তাহা কল্পনা করে নাই!

আর জাক! সে জিম্‌-নাজেই থাকিবে! কিন্তু তাহার টাকা জোগাইবে কে? টাকা! মোরোন্‌ভা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সংবাদ লইতে গিয়া কন্‌সর্তার মুখে শুনিল, মাদাম বারান্সি এখানকার বাস একরূপ উঠাইবারই সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা বড়-একটা নাই!

জিম্‌-নাজে ফিরিয়া আসিয়া মোরোন্‌ভা স্থির করিল, আর একটা মাস শুধু জাক এখানে স্থান পাইবে। টাকা আসে, ভালো—নহিলে উদার আকাশের তলে সে আপনার আশ্রয় খুঁজিয়া লউক।

সে দিন জাক আহারের সময় মোরোন্‌ভার পাশে স্থান পাইল না! আহার্য্য যাহা মিলিল, নিতান্ত নিকৃষ্ট ধরণের। জীবনে এমন আহার্য্যের সহিত জাকের কখনও পরিচয় ঘটে নাই। তাহার উপর মোরোন্‌ভার দৃষ্টি আজ কি ক্রূর, কি ভীষণ!

মাদুর কাছে আসিয়া জাক ডাকিল,—মাদু!

মাদু তখন আপনার মনে কি ভাবিতেছিল। জাক কহিল,—তুমি গান গাইচো না কি, মাদু?

মাদু কহিল,—না—একটা কথা আমি ভাবছিলুম!

জাক মাদুকে তখন আপনার কাহিনী খুলিয়া বলিল। তাহার মা,—যে মা ছাড়া জগতে সে আর কাহাকেও জানে না,—সেই মা তাহাকে এখানে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আর ফিরিবে কি না, তাহার কোন স্থিরতা নাই!

বন্ধুর নিকট মাদু তখন আপনার মতলব খুলিয়া বলিল। এতক্ষণ ভাবিয়া এই মতলবই সে ঠিক করিয়াছে।

মাদু স্থির করিয়াছিল, সে জিম-নাজ ত্যাগ করিবে। নিশ্চয়! অনেক দিন হইতে কথাটা সে ভাবিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প পূর্ব্বে হইতে পারে নাই। অন্ধকার জীবনে এখন সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। এ কষ্ট, এ দাসত্ব আর সহ্য হয় না। সেদিন চিড়িয়াখানায় গিয়া সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে। মুক্ত বায়ুর সে স্পর্শ কি স্নিগ্ধ, কি মধুর! সে স্পর্শে প্রাণ তাহার নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে! বাহিরের মিষ্ট বায়ু সেদিন যাহা ভোগ করিতেছিল, পিঞ্জরাবদ্ধ বেচারা পশুগুলা তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার, সে কি কষ্টের! তাই সে স্থির করিল, যেমন করিয়া পারে, দাহমিতে ক্যারিকার কাছে সে ফিরিয়া যাইবে! চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? জাক যদি রাজী হয়, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে মাদু প্রস্তুত। পথে কোন ভয় নাই, গ্রি-গ্রিস প্রসাদে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।

জাক কিন্তু রাজী হইল না! প্রখর সূর্য্যকিরণে তপ্ত মাদুর সে বনের গৃহের চেয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘেরা জিম-নাজের এ বায়ু ও আলোক-হীন ঘরও ঢের ভালো।

মাদু কহিল,—বেশ, তুমি তবে এখানেই থাকো। আমি একলাই যাবো।

জাক কহিল,—কখন্ যাবে, তুমি?

মাদু কহিল,—কাল ভোরে।

পরদিন বেলা অধিক হইলে জিম-নাজে একটা রব উঠিল। ভোরে মাদু বাজারে গিয়াছে; বেলা এগারোটা বাজে, এখনও তাহার দেখা নাই। এখনও কেহ খাইতে পায় নাই। মাদাম মোরোন্‌ভা কহিল,—নিশ্চয় পথে তার কোন বিপদ ঘটেছে।

মোরোন্‌ভা কিছু বলিল না। দীর্ঘলাঠি হাতে অধীর আগ্রহে মধ্যে মধ্যে জিম-নাজের দ্বারে আসিয়া মোরোন্‌ভা দেখিতেছিল, কখন্ সে কাফ্রীটা ফিরিয়া আসে!

কিন্তু কাফ্রী ফিরিল না। মাদাম মোরোনভা অবশেষে নিকটের একটা দোকান হইতে আহার্য্য আনিয়া জিম্‌-নাজকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিল। আহারাদির পর মোরোন্‌ভা কহিল,—তার কাছে টাকাকড়ি কত ছিল?

—পনেরো ফ্রাঙ্ক!

—পনেরো ফ্রাঙ্ক! তা হলে নিশ্চয় সে পালিয়েছে।

ডাক্তার হারুস্ক কহিল,—পনেরো ফ্রাঙ্কে তো আর দাহমি যাওয়া যায় না!"

মোরোন্‌ভা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া মাথায় টুপি উঠাইয়া থানায় চলিল!

যেমন করিয়া হউক, এই মাদুকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মার্শেল অবধি যেন সে না যায়! বনফিলদের কাণে যেন এ কথা না ওঠে! দুনিয়ার চারি দিকে

কেবল ঈর্ষা, কেবলই গভীর ষড়যন্ত্র। রাজপুত্র জিম-নাজের নিন্দা করিলে নিষ্কর্ম্মা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগুলা এখনই কুকুরের মত চীৎকার করিয়া উঠিবে। জিম-নাজের প্রতিপত্তি নিমেষে অমনি টুটিয়া যাইবে! কাজেই সকলের মুখে চাপা দেওয়া দরকার! ভিতরকার রহস্য এতটুকুও না প্রকাশ হইয়া পড়ে!

পুলিশের নিকট মোরোন্‌ভা যে বিবরণ লিখাইল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—মাতু অনেক টাকা-কড়ি লইয়া জিম-নাজ হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু সেজন্য মোরোন্‌ভা কাতর নহে। হতভাগা, বিদেশী রাজপুত্র,—আহা, বয়সে বালকমাত্র,—পথে কত বিপদে পড়িতে পারে। তাই—

কথাটা বলিয়া মোরোন্‌ভা রুমালে চোখ মুছিল। ইনস্পেক্টর আশ্বাস দিল,—ভাবনা কি, ম্যাসিয়ো, নিশ্চয় আমরা তাকে খুঁজে বার করবো!

মোরোন্‌ভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইনস্পেক্টরের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল,—তাকে খুঁজে দাও। বেচারা রাজ-পুত্র! চিরদিন তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

চারিধারে সন্ধান চলিতে লাগিল। পারি সহরের সমুদয় ফটকে প্রহরীর দল সতর্ক রহিল। কষ্টমের কর্ম্ম-চারীর কাছে কাফ্রী বালকের আকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখিয়া পাঠানো হইল। জিম-নাজের বালকের দলকে লইয়া মোরোন্‌ভা-হার্জ্‌ সকালে-সন্ধ্যায় নানা পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোন ফল হইল না।

রাত্রে ঘরে ফিরিয়া জাক ভাবিতে লাগিল, মাদু এতক্ষণে কত—কত দূর গিয়াছে! তাহার মাথার উপর এই যে অসীম অনন্ত আকাশ, মাদুর মাথার উপরও সেই একই আকাশ! আকাশ তাহাদের দুইজনকে দেখিতেছে, অথচ মাদু ও জাকের মধ্যে কি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান! কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

রাত্রে মাদুর শূন্য বিছানা দেখিয়া জাক ভাবিল, মাদু পলাইয়াছে। এখনও চলিয়াছে! কে জানে, কোন্ পথে! সে পলাইতেছে! পলাও, পলাও, মাদু—প্রাণপণে ছুটিয়া পলাও!

তার পর জাক নিজের কথা ভাবিতে লাগিল! মা—কোথায় মা? আর কি কখনও জীবনে মা'র দেখা মিলিবে না? দারুণ দুঃখে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। চোখে অশ্রুর সাগর বহিল।

এমন সময় কড়্‌কড়্ শব্দে বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ঝম ঝম্ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। শিলা ও ঘন তুষারপাতের বিরাম নাই! জাক ভাবিল, আহা, এই জলে পথে মাদুর কতই কষ্ট হইতেছে! পরে মাদুর কথা ভাবিতে ভাবিতে জাক কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারিল না। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, কি সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে মাদু পলাইতেছে—ঐ মাদু, ঐ যায়! সহসা এক বিকট উল্লাস-চীৎকারে চমকিয়া জাক জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া সে শুনিল, বাহিরে একটা বিপুল কলরব উঠিয়াছে! জাক বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একজন কহিল, মাদুকে পাওয়া গেছে, জাক!

জাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। ধরা পড়িয়াছে—এঁ্যা! বেচারা মাদু! আহা, নিতান্ত অভাগা!

জিম-নাজের ছাত্রের দল সার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধ্যাপকের দল বসিয়া, আর মোরোন্‌ভার সম্মুখে কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়াইয়া বেচারা মাদু! তাহার চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ শুষ্ক, পোষাক কাদা-মাখা, স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে! এই মাদু! কয়দিনে তাহার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

মাদু জাকের পানে চাহিল! উভয়ের চোখে নীরব বেদনার কি ভাষা যে ফুটিয়া উঠিল, তাহা তাহারাই বুঝিল। সে ভাষা বুঝিবার অপর লোক জিম-নাজে ছিল না।

পুলিশের লোক চলিয়া গেলে মাদুর শাস্তি আরম্ভ হইল! তীব্র তিরস্কারের সহিত পৃষ্ঠের উপর মোরোন্‌ভার কশার তীব্রতর আঘাত পড়িল,—এক, দুই, তিন, চার। মাদু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল। জাক কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ালে ভর দিয়া কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া রাখিল।

পরদিন জাক মাদুকে আর একটি বারও দেখিতে পাইল না। রাত্রে তাহারই পাশে বিছানায় মাদু শুইয়া-ছিল; নিকটে মোরোন্‌ভা, মাদাম মোরোন্‌ভা ও ডাক্তার হার্জ্‌।

মোরোন্‌ভা কহিল,—অসুখটা কি বড় বেশী, ডাক্তার?

মাদাম কহিল,—ভয় আছে?

হার্জ্‌ কহিল,—ভয় আবার কি! এ কাফ্রী-ব্যাটাদের প্রাণ লোহার মত শক্ত!

তাহারা চলিয়া গেলে, জাক আসিয়া মাদুর পার্শ্বে বসিল, ডাকিল,—মাদু—

কে? জাক—

জাক কহিল,—হাঁ, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, মাদু! অসুখ করেছে কি?

মাদু আর বাঁচবে না, জাক। তার গ্রি-গ্রি কোথায় হারিয়ে গেছে।—

জাক স্থির অবিচল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মাদু ডাকিল,—জাক!

—কেন, মাদু?

—দাহমিতে আর আমার যাওয়া হলো না!

এক ফোঁটা গরম জল মাদুর কপালের উপর পড়িল।

মাত্থ কহিল,—জল পড়লো কোথা থেকে? তুমি কাঁদচো জাক?

—না ভাই, ঘুমোও মাত্থ। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি! কেমন? জাকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। চোখ সজল হইল।

—না, না,—তুমি যাও জাক! মোরোন্‌ভা যদি দেখে, তোমাকেও আস্ত রাখবে না! এদের তুমি চেনো না —এরা মানুষ নয়, রাক্ষস!

সকালে মাত্থর অবস্থা আরও খারাপ হইল। চেতনা কেমন থাকিয়া থাকিয়া লোপ পাইতেছে—ভুল বকুনি সুরু হইয়াছে! ডাক্তার হারুজ নিজের মৌলিকতা জাহির করিবার জন্য মাত্থর চিকিৎসায় নূতন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিল। বাগানে গাছের তলায় মাত্থর জন্য খড়ের বিছানা পড়িল। তার পর হারুজের নানাবিধ উদ্ভট ঔষধ-প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। শেষ রাত্রে মাত্থর সকল দুঃখের অবসান হইল! মাত্থ মরিয়া ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিল।

মোরোন্‌ভা আদেশ দিল, খুব ঘটা করিয়া কবরের ব্যবস্থা করিতে হইবে!

এমন ঘটা সে দরিদ্র পল্লীতে কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই!

অজস্র সাদা ফুলে কফিন্ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অধ্যাপক ও ছাত্রের দল শবের পশ্চাতে নত মস্তকে মিছিল করিয়া পথে বাহির হইল। এ শব রাজপুত্রের। তাই শোক-যাত্রার আয়োজনও সাধ্যাতিরিক্ত হইল! মিছিলের চটকে বিজ্ঞাপন জাহির করা যাইবে যে। সারা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া এক নিভৃত বন-প্রান্তে মাত্থর দেহ সমাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে জিম-নাজে ফিরিল।

ফিরিবার সময় পথে জাক ইচ্ছা করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নিবিড় হইয়া আসিল, তখন একটা গলির মোড় বাঁকিবার সময় সকলের অলক্ষ্যে সে সেই অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল!

তীর ছাড়িয়া অনাদৃত অসহায় বালক জগতের বিপুল কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দিল। সে স্রোতের বেগে ভাসিয়া সে কোথায় যাইবে, সে কথা মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাবিয়া দেখিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতৃ-সান্নিধ্যে

দৌড়িলে পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে জাক দৌড়িল না, ধীরে ধীরে চলিল।

গতি ধীর হইলেও কিছুমাত্র বিঘ্নের আশঙ্কা দেখিলেই যাহাতে ছুটিয়া পলাইতে পারে, সে বিষয়ে কিন্তু সে সতর্ক রহিল। খানিকটা পথ এইরূপে চলিয়া তাহার মনে হইল, এইবার একবার সে ছুট দেয়! ধীরে চলিবার পক্ষে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আর বশ মানিতেছিল না। উদ্বেগে অধীরতা ক্রমেই অসহ্যভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তবু সে ছুটিল না, ধীরেই চলিল। গৃহের পানে সে চলিয়াছিল।

সেখানে গিয়া কি দেখিবে? শূন্য—শূন্য ঘর! মা নাই! তাহা হইলে সে কি করিবে? মার সংবাদ কোথায় পাওয়া যাইবে! কি করিলে পাওয়া যাইবে!

না পাওয়া যাক, তবু জিম-নাজে সে আর ফিরিবে না! ফিরিবার উপায়ও সে রাখিয়া আসে নাই! সেখানে ফিরিবার কথা, মুহূর্ত্তের জন্য তাই জাকের মনে উদয় হইল না। যদি বা হইত, মাত্থর পৃষ্ঠে কশার সেই তীব্র আঘাত, মাত্থর সেই সকাতর ক্রন্দন, প্রচণ্ড শাস্তি—সে কথা মনে পড়িতে তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

ঐ সে বাড়ী—আলো জ্বলিতেছে! মা তবে আছে! খোলা জানালার মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি বাহিরে পথে পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া জাকের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা না থাকিলে গৃহের প্রতি কক্ষে এত আলো জ্বলিবে কেন? তবে মা আছে! নিশ্চয় আছে! কিন্তু যদি এখনই কেহ বলে, বাহির হইয়া যাও? জাক দ্রুত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ কি! বাড়ীতে এত ভীড় কেন? চেয়ার, টেবিল, সোফা, কৌচ, ছবি, আলনা প্রভৃতি হল্-ঘরে বিক্ষিপ্ত স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। ব্যাপার কি? নানা লোকে নাড়া-চাড়া করিয়া জিনিষপত্র লইয়া—ও কি করিতেছে! ভিড় ঠেলিয়া জাক একেবারে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল! মার শয্যা, খাট, এ-সবের এমন অবস্থা কেন? তাহার নিজের বিছানাও মাথায় বহিয়া কে ও বাহির হইয়া যায়?

জাক তাহার হাত ধরিল, সবেগে কহিল,—আমার বিছানা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! এ আমার বিছানা!

জাক বিছানা ধরিয়া টানিল।

লোকটা সবিস্ময়ে জাকের মুখের পানে চাহিল। এমন সময় কনস্তাঁ আসিয়া কহিল, এ কি, জাক যে! তুমি কোথা থেকে? স্কুল থেকে বুঝি? কার সঙ্গে এলে?

মা কৈ, কন্‌স্তাঁ? নম্র স্বরে জাক জিজ্ঞাসা করিল, মা—?

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা আশঙ্কা জড়িত ছিল। উত্তরে না জানি, কি শুনিবে?

মা এখানে নেই, জাক! তা বুঝি তুমি জানো না?

মা কোথায়? এরা কি কচ্ছে? কারা এরা?

দিনের বেলায় এ-সব নিলেম হয়ে গেছে—তখন যারা জিনিষ-পত্তর নিয়ে যেতে পারেনি, এখন তারা এসে নিয়ে যাচ্ছে। এসো, তুমি ভিতরে এসো, রান্নাঘরে এসো। সেইখানেই কথা হবে।

রান্নাঘরের পথে পুরাতন ভৃত্যের দল জাককে ঘিরিয়া ফেলিল। পাছে ইহারা তাহাকে ধরিয়া জিম নাজে বাঁধিয়া আসে, এই ভয়ে জাক কাহাকেও খুলিয়া বলিল না যে, সেখান হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, ছুটি পাইয়া মাকে একবার দেখিবার জন্য সে বাড়ী আসিয়াছে।

কন্‌স্তাঁ কহিল,—মা এখানে নেই—কোথায় গেছে, তা—

—কথা বাধিয়া গেল। কন্‌স্তাঁ আবার বলিল,—আহা, এমন ছেলে ফেলে চলে গেল! এর কাছে লুকোতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! না, না, জাক, মা কোথায় গেছে,—বলছি। পারি ছাড়িয়ে এতিয়োল্ বলে যে গাঁ আছে—মা সেইখানে।

—সে কি অনেক দূরে?

—হ্যাঁ। এখান থেকে প্রায় বারো ক্রোশ।

এতিয়োল্—এতিয়োল্! জাক মনে মনে বারবার ঐ নাম উচ্চারণ করিল। এতিয়োল! নামটা সে মুখস্থ করিয়া ফেলিল।

কন্‌স্তাঁ কহিল,—ছোট-খাটো কতকগুলো বাগান আছে—তারই কাছে ছোট একখানি বাড়ী। সুন্দর বাড়ীটি,—বাড়ীর নাম আরাম-কুঞ্জ। মা সেইখানে আছে।

একান্ত আগ্রহে জাক কথাগুলি শুনিল। এখান হইতে যে পথ ব্যার্সি গিয়াছে—সেই পথ ধরিয়া চলিয়া ব্যার্সি, শারান্তঁ, বিলেন্যুভ্-স্যাঁ-জর্জ্জ পার হইলে একটা বড় পার্ক দেখা যাইবে। তাহারই বাঁয়ে লায়নের পথ—সে পথে না গিয়া ডাহিনে যে পথ করবেই গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া সিন্ নদীর ধার দিয়া বরাবর গেলে সেনার্টের জঙ্গল; সেই জঙ্গল পার হইলেই এতিয়োল!

দূরত্বের কথা শুনিয়া জাক ভয় পাইল না। সারা পথ সে হাঁটিয়া যাইবে। আজ রাত্রে সে চলিতে আরম্ভ করিবে! এখনই। আজ সারা রাত্রি, তার পর কাল সারা দিন চলিলেও কি এতিয়োল্ পৌঁছানো যাইবে না? পথে কত লোক চলিতেছে—অনাথ, আতুর, ভিখারী—তাহাদের ত গাড়ী চড়িবার পয়সা মিলে না, হাঁটিয়া তাহারা দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে জাকই বা কেন হাঁটিয়া এতিয়োলে পৌঁছিতে পারিবে না? যেমন করিয়া হউক, এতিয়োলে সে যাইবেই, মাকে সে দেখিবেই! কিসের ভয়!

জাক বলিল,—তবে আমি স্কুলে চললুম, কন্‌স্তাঁ। আর-একটা কথা জানিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, একবার সে জিজ্ঞাসা করে, সেই আর্জ্জান্তঁও কি এতিয়োলে আছে? সেই শত্রুটাই কি মাতা-পুত্রের মধ্যে এ ব্যবধান ঘটাইল? কিন্তু কথাটা জাকের মুখে বাধিয়া গেল—বাহির হইল না।

—তবে, এস জ্যাক,—রাত হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে কেউ যাক, না হয়!

—না, না, কোন দরকার নেই।

বালকের মনে একটা দুর্জ্জয় অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল! একটা দারুণ দাহ! মা—যে মার জন্য জাকের মনে এতটুকু শান্তি নাই! যে মাকে দেখিবার জন্য জাকের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, যে মার সংবাদ একদণ্ড না পাইলে জাকের বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না—সেই মা, তাহাকে ভুলিয়া, তাহার কোন সংবাদ না লইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে রহিয়াছে। জাক ভাবিল, মার কাছে গিয়া মার কোলে মাথা রাখিয়া যদি সে এখন মরিতে পারে, তবেই মার এই অবহেলা-অনাদরের চূড়ান্ত শোধ লওয়া যায়! তাহারও অশান্ত প্রাণ চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া বাঁচে। আঃ, কি সে গভীর তৃপ্তি!

কন্‌স্তাঁ ও ভৃত্যবর্গের নিকট বিদায় লইয়া জাক পথে বাহির হইল।

চারিধার তখন কুয়াশায় ভরিয়া গিয়াছে। সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে পথের আলোগুলা উপরে আকাশে দীপ্তি-হীন পাণ্ডু নক্ষত্রের মত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। এক অজানা ভয়ে জাকের বুক মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল! কত—কত দূর—তাহাকে যাইতে হইবে! কত পথ চলিতে হইবে! উপায় নাই! চলিতেই হইবে! না হইলে সেই দুর্দ্দান্ত মোরোন্‌ভার হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না! প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, এখনই বুঝি ধরা পড়ে! পথে কোনো কনষ্টেবলের লণ্ঠন দেখিলে জাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া ওঠে, বুঝি, সন্ধান পাইয়া তাহাকেই সে ধরিতে আসিতেছে। দূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে জাক কাঁপিয়া ওঠে—মনে হয়, কে যেন তাহারই সন্ধান বলিয়া দিতেছে। জাক ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিল। মনে হইল, সারা আকাশ নিস্তব্ধভাবে যেন তাহারই গতি লক্ষ্য করিতেছে। দেখি, কোথায় যায়! যেমন সে বিশ্রাম

করিতে বসিবে, অমনই সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া জিম-নাজে চালান করিয়া দিবে! নিস্তব্ধ বাড়ীগুলা, নিস্তব্ধ আকাশ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি,—সকলে মিলিয়া যেন তাহারই বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে! ঐ না কে বলে, ধরো, ধরো, জাককে ধরো—ঐ সে পলায়!

সারারাত্রি ধরিয়া জাক পথ চলিল। যখন ভোর হইল, তখন দেহ তাহার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবু বিরাম নাই। চলিয়াছে, সে চলিয়াছে! এ দীর্ঘ পথে একটা যন্ত্রের মত শুধু সে চলিয়াছে! উদাস দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ—যেন প্রাণহীন, মনহীন একটা পুতুলকে দম দিয়া কে পথে ছাড়িয়া দিয়াছে!

পথে আরও কত লোক চলিয়াছে। কম্প-চক্রের ঘর্ঘর-রবে চারিদিক মুখরিত। সে শব্দে সকলেই নিজের মনে দিশাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহাদের সকলের দৃষ্টি যে জাক এড়াইয়া চলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! জাকের শুষ্ক মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও কাহারও ছিল না!

ক্রমে রৌদ্র পড়িয়া আসিল। এখন নদীর ধার দিয়া পথ—জাক সেই পথে চলিল। অপরাহ্নের বায়ু তখন সূর্য্যের শেষ রশ্মিকণাগুলিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া ছুটিয়া ফিরিতেছে। দিনের গান শ্রান্ত হইয়া থামিয়া আসিতেছিল! কর্ম্ম ক্লান্ত ধরণীর তপ্ত নিশ্বাস নদীর জলে মিশিয়া যাইতেছিল! প্রকৃতি যেন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে। আলোকের রেখার উপর ধীরে ধীরে কে একখানি সূক্ষ্ম কালো পর্দ্দা টানিয়া দিতেছিল। ক্রমে চারিদিকে আঁধার নামিল।

দীর্ঘ সারা রাত্রি, সারা দিন ধরিয়া জাক পথ চলিয়াছে। এখন যেন পা দুইখানা আর চলিতে চাহে না! অবশ হইয়া আসিয়াছে! জাকের মনে হইল, আর না,—এইবার ভূমিতে দেহভার লুটাইয়া দি, জন্মের মত এ পথ-চলার বিরাম হইয়া যাক! কিন্তু না। মা—মা—কোথায় মা! মাকে দেখিতে হইবে!

বিশ্রাম করিতে বসিলে এখন চলিবে না—বিলম্ব হইবে! যেমন করিয়া হউক, মার কাছে পৌঁছিতে হইবে। যদি মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়? না, না, এখন নয়,—ওগো জীবন, মার কোলে দুর্ভাগা বালককে একটিবার শুধু টানিয়া লইয়া চলো গো। তার পর ছাড়িয়া দিয়ো! হে বন্ধু, আর কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকো!

তখন গভীর রাত্রি। গ্রামের পথে ক্বচিৎ আলো দেখা যায়! অন্ধকারে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে! গ্রামের পথে জন-মানবের চিহ্ন নাই, সে-ই শুধু চলিয়াছে। একবার সে বসিল; বসিয়া আকাশের পানে চাহিল। তাহার জিভ শুকাইয়া আসিয়াছিল—পা দুইটা বিষম ভারী বোধ হইতেছিল! এ ভার টানিয়া লইয়া যাইবার শক্তি বুঝি ফুরাইয়াছে! এমন সময় সহসা সে দেখিল, দুইটি আলোক-রশ্মি তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!

আলোক-রশ্মি ক্রমে সম্মুখে আসিল। একখানা গাড়ী।

জাক চীৎকার করিয়া ডাকিল,—মশায়—

তাহার জিভ জড়াইয়া গিয়াছিল। স্বর প্রথমে বাহির হইল না। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাক আবার ডাকিল,—মশায় গো, একবার গাড়ী থামান।

গাড়ী ঈষৎ অগ্রসর হইয়াছিল; থামিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল,—কে তুমি?

—আমায় গাড়ীতে নিন, আমি আর চলতে পাচ্ছি না। সারা রাত হেঁটেছি। আর পাচ্ছি না।

—কোথায় যাবে তুমি?

—সেনার্টে!

—বেশ। এসো আমার সঙ্গে—আমি এতিয়োলে যাচ্ছি! পথেই সেনার্ট।

গাড়ীতে উঠিয়া আরোহীর প্রশ্নে জাক শুধু এইটুকু বলিল, সে একটা স্কুলের বোর্ডিংএ থাকে। সেনার্টে মার অসুখ হইয়াছে শুনিয়া প্রত্যুষের প্রতীক্ষায় থাকিতে না পারিয়া হাঁটিয়াই সে সেখানে চলিয়াছে! মা ছাড়া জগতে তাহার আর কেহ নাই।

লোকটি কহিল,—আমার যাবার পথেই সেনার্ট, তার পর একটা জঙ্গল পার হয়েই এতিয়োল। আমি এতিয়োলে যাবো। তোমায় সেনার্টে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন, এস।

জাকের মনে অনুতাপ হইল। কেন সে মিথ্যা বলিল? সত্য করিয়া কেন সে বলিল না, যে সে-ও এতিয়োলে যাইবে! সেনার্টে তাহাকে নামাইয়া দিলে আবার বাকী পথটুকু হাঁটিয়া যাওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে? সে শক্তি তাহার নাই। হায়, হায়, কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল? সে ভাবিল, এখন শুধরাইয়া লইয়া সত্য কথাটা বলিবে কি? কিন্তু না! তাহা হইলে ইহার মনে সন্দেহ হইবে। কি জানি, তখন রাগ করিয়া আবার যদি নামাইয়া দিয়া যান! সত্য বলিবার সাহস—না, জাকের আজ তাহা নাই! কি দুর্ভাগা সে!

গাড়ী চলিতেছিল, জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সহসা জাক শুনিল,—এই তোমার সেনার্ট—নামো।

জাকের মনে হইল, কে যেন তাহাকে নিরাপদ আশ্রয়-নীড় হইতে টানিয়া সহসা এক অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কি ভয়ঙ্কর! এবার নামিতে হইবে! হাঁ, নামিতেই হইবে। অন্ধকারে জাককে নামাইয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

অবসন্ন চিত্তে পথের প্রান্তে সে বসিয়া পড়িল। গাড়ীর আলো ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে মিলাইয়া গেল! শীতল বায়ু বহিতেছিল। সুগভীর ক্লান্তিতে জ্যাকের অনুভব করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার চারি পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রগুলা নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া রহিয়াছে! গাছের পাতা কাঁপাইয়া বায়ু বহিতেছে—নৈশ প্রকৃতির বিরাট গানে প্রান্তর মুখরিত—ইহার মধ্যে বসিয়া জ্যাক কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারিল না!

সহসা ভীষণ শব্দে চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে চাহিয়া সে দেখে, একটা সুদীর্ঘ আলোকপুচ্ছ-ধারী রাক্ষস সশব্দে অদূরস্থ বনপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দীপ্ত লোহিত চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছে! পরক্ষণে বাঁশীর শব্দ শুনিয়া সে বুঝিল, না, ওটা রাক্ষস নহে, অদূরে লৌহ-পথ দিয়া একখানা ট্রেণ সবেগে চলিয়া গেল!

এখন কয়টা বাজিয়াছে? সে কোথায়? কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? কিছুই জানে না! ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়াছে, মাতুর কবরের উপর মাথা রাখিয়া যেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাতু তাহার শ্রান্ত শিরে হাত বুলাইতেছিল। সেই হিম-শীতল স্পর্শে তাহার দেহের সমস্ত রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। মাতুর দিকে ফিরিয়া চাহিতে চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল, এ কি,—মাতু না মরিয়া গিয়াছে! ভয়ে কাঁপিয়া তাই সে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে মাতুর কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় জ্যাকের ভয় বাড়িয়া উঠিল। এখন নিদ্রা গেলে স্বপ্নে মাতু আসিয়া যদি আবার দেখা দেয়! মাতুর সে মূর্ত্তি মনে করিতে অঙ্গ তাহার শিহরিয়া উঠিল!

আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। আরও কত পথ চলিলে বনের শেষ মিলিবে! কি সুদীর্ঘ যাত্রা এ,—অফুরান পথ!

এমন সময় অদূরে একটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। আকাশের পিছনে ঊষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারই ভূষণের হেমচ্ছটা আকাশের কালো পর্দ্দা ভেদ করিয়া ঝিক্-ঝিক্ করিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধভাবে ঊষার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কোথায় ঊষা? এসো তুমি, তোমার কিরণে জগতের এ নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া দাও। শ্রান্ত অসহায় বালককে আশা ও উত্তাপ দিয়া এ হিম হইতে পরিত্রাণ কর! তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সে দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল হইয়া রহিয়াছে!

সহসা সম্মুখে এতিয়োলের পথে দুই হাতে আঁধারের পর্দ্দা ঠেলিয়া ঊষা আসিয়া জগতে দেখা দিল! প্রথমে সুদীর্ঘ সূক্ষ্ম একটা পীত রশ্মি তুলির মত দেখা গেল। তাহার পর কে যেন সেই রঙ্গিন তুলিটা আকাশের গায়ে চতুর্দ্দিকে বুলাইয়া দিল! কুয়াশার আবরণের মধ্য দিয়া তখন এক বিচিত্র বর্ণ ঝলমল করিয়া ধরণীর বুকে গড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার স্নিগ্ধ কোমল নিশ্বাস ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। ক্রমে পাখীর গানে স্তব্ধ প্রকৃতি সাড়া দিয়া উঠিল!

সম্মুখেই জ্যাক চাহিয়া দেখে, পরিচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহের একটি বাতায়ন মুক্ত হইতেছে—বাতায়নের মধ্য দিয়া আন-মনে-গাওয়া কাহার মৃদু সঙ্গীতের স্বর ভাসিয়া আসিল। পরিচিত কণ্ঠে পরিচিত গান, ও কে গায়? জ্যাক চাহিয়া দেখিল।

বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া, কে, ও? এ কি স্বপ্ন! না, না! জ্যাক দুই হাতে চোখ মুছিল, আবার চাহিয়া দেখিল—না, এ স্বপ্ন নয়! স্বপ্ন নয়! মা! মা-ই ত!

জ্যাক ডাকিল,—মা!

তাহার ক্ষীণ স্বর বাতাসে মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন-পার্শ্বে রমণী বিস্ময়ে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল! তাহার কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত থামিয়া গেল—পথের ধারে সে চাহিয়া দেখিল।

তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইতেছে! রমণী দেখিল, সূর্য্যের লোহিত আলোক-রাগে স্নাত এক বালক বাতায়নের নিম্নে সোপানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। বালকের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে। রমণীর দেহ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল—সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল! সে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—জ্যাক!

সোপানের নিম্নে জ্যাকের শ্রান্ত শরীর ঢলিয়া পড়িতেছিল, ইদা আসিয়া তাহাকে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল—মাতৃ-হৃদয়ের সযত্ন-সঞ্চিত স্নেহের তাপে হিম-শীতল মুমূর্ষু পুত্রকে সে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। একটা সুগভীর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মার বুকে মাথা রাখিয়া জ্যাক ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরাম-কুঞ্জ

—না জ্যাক্, তোমার এখন কোন ভয় নেই। আর তোমাকে ভিম-নাজে পাঠাবো না—কখনও না! তারা তোমার গায়ে হাত তোলে—এমন আস্পর্দ্ধা! বেশ করেচো তুমি পালিয়ে এসেচো! ছি, এখনও কি কাঁদতে আছে? ভয় কি! আর কখনও তোমায় আমি কাছ-ছাড়া করছি

না। এ বেশ দেশ—এখানে কোন গোলমাল নেই—না গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, না লোকজনের ভিড়। কিছু না। বাড়ীতে আমি কত কি পুষেছি দেখো'খন—পায়রা, খরগোশ, মুরগী, ছাগল, গাধা। ভালো কথা, এখনও তারা খাবার পায় নি আজ। আমি সব ভুলে গেছি। তোমাকে দেখে আর কিছুই মনে নেই। তুমি স্বরুয়া খেয়ে একটু ঘুমোবে, চলো। সারা রাস্তা হেঁটে তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। আহা, কাল যখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিলুম, তখন বাছা আমার সেই অন্ধকার রাত্রে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েচো! কি ভয়ঙ্কর কথা, জাক! ঐ শোনো, পায়রাগুলো ডাকছে—আমি তাদের খাওয়াইগে। তুমি স্বরুয়াটুকু খেয়ে এখন একটু ঘুমোও। কেমন?

ইদা চলিয়া গেল।

জাকের চোখে ঘুম আসিল না। একটু বিশ্রাম,—তার পর স্নান শেষ করিয়া পাচিকা আর্শার হাতের তৈয়ারী স্বরুয়া পান করিতে তাহার ক্লান্তি যেন অনেকখানি ঘুচিয়া গেল। মাকে পাইয়া, নূতন দেশ দেখিয়া কিশোর হৃদয় সহজে প্রফুল্ল হইল। গত রাত্রের সমস্ত ক্লেশ নিমেষে সে ভুলিয়া গেল। মুগ্ধ নেত্রে সে দেখিল, কি অপূর্ব্ব শান্তি, অভাবনীয় বিরাম এখানে চারিধার ভরিয়া রাখিয়াছে!

তাহার ছোট ঘরটি সূর্য্যের কিরণে ঝলমল করিতেছিল! বাহিরে পল্লীর কি সরল, অনাড়ম্বর শোভা! বৃক্ষের শ্রেণী চলিয়াছে! তাহার পত্র-ঘন শাখায় বসিয়া পাখীর ঝাঁক কাকলী তুলিয়াছে, ছাদে অসংখ্য পারাবতের কলরব—সকলের উপর মাতার মিষ্ট কণ্ঠস্বর,—চারিদিকেই বিপুল মাধুরী নির্ঝরের মত সহস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! চারিধারে যেন কি এক মহা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে! জাকের চিত্ত এক পরম নিশ্চিন্ত আরামে বিভোর হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ আনন্দেও বিঘ্ন ঘটিল! সহসা সে দেখিল, মাতার শয়ন-কক্ষে দেওয়ালের গায়ে আর্জান্তঁর এক সুবৃহৎ তৈল-চিত্র ঝুলিতেছে! মুখে সেই বিকট দম্ভ, চোখে হিংসার জলন্ত বহ্নি—শত চেষ্টাতেও চিত্রকর এগুলা ঢাকিতে পারে নাই।

জাক ভাবিতে লাগিল, কোথায় সে? এই শয়তান,—সে কি এইখানে থাকে? তবে দেখা নাই কেন? অবশেষে ছবিখানার সম্মুখে দাঁড়ানো অসহ্য বোধ হওয়ায় জাক মার কাছে গেল।

ইদা তখন মুরগীগুলাকে আহার দিতেছিল। অন্নদায়িনী সেবা-পরায়ণা নারীর মুখ কি এক মহিমার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জাক সগর্ব্বে মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আর্শা আসিয়া কহিল,—এইটি ছেলে? বেশ ছেলেটি! বাঃ!

নয় আর্শা? আমি বলেই ছিলুম।

"ছেলেটি ঠিক মার মত হয়েছে—বাপের মত কোনখানটাই নয়। যেমন মুখ-চোখ, গড়নটুকুও তেমনই নধর নিটোল!

বাপের মত! কথাটা শেলের মত জাকের প্রাণে বিঁধিল! বাপ! কে বাপ?

—ঘুম হলো না, বুঝি, জাক? তবে এসো, সব দেখবে, এসো। বলিয়া ইদা জাককে লইয়া ঘর-দ্বার দেখাইতে চলিল।

গ্রামের প্রান্তে ছোট বাড়ীখানি,—ছবির মতই সুন্দর। চারিধারে ছোট-খাট বন। অদূরে একটা শীর্ণ নদী বহিয়া চলিয়াছে। জানালা দিয়া তাহারই ক্ষীণ স্রোত রূপালি সূতার মত দেখা যায়। নদীর পরপারে ঝোপের মধ্য দিয়া সরু পথ জাগিয়া রহিয়াছে—সে যেন কোন্ অজানা স্বপ্নরাজ্যের সীমানায় গিয়া মিশিয়াছে!

একটি সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইদা কহিল,—এই ঘরে উনি কাজ-কর্ম্ম করেন।

উনি! উনি কে? যিনিই হোন্, পরিচয় লইবার জন্য জাক কিন্তু এতটুকু ঔৎসুক্য জানাইল না। শুধু তাহার মর্ম্মস্থল হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ইদার অজ্ঞাতে বায়ু-তরঙ্গে নীরবে মিলাইয়া গেল।

মৃদু স্বরে ইদা কহিল,—উনি বেড়াতে গেছেন। নানা দেশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। শীঘ্রই ফিরবেন। আমি তাঁকে তোমার আসার কথা আজই লিখব। শুনে তিনি ভারী খুশী হবেন। তাঁর মেজাজটা একটু রুক্ষ হলেও এ-ধারে লোক তিনি বড় ভালো। তোমায় তিনি খুবই ভালোবাসেন। তুমিও তাঁকে ভালোবেসো, জাক! বাসবে তো? তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা না হলে আমার মনে একতিল স্বস্তি থাকবে না।

কথাটা বলিয়া দেওয়ালে লম্বিত আর্জান্তঁর তৈল-চিত্রখানার দিকে ইদা একবার চাহিয়া দেখিল; তার পর কহিল,—বলো জাক, তুমি এঁকে ভালোবাসবে? বলো, তা শুনলে তবে আমি ঠাণ্ডা হবো। বলিয়াই ইদা সহসা জাককে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

ইদার কণ্ঠস্বরে মিনতির এক করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। জাক সরিয়া মার মুখের দিকে চাহিল, ধীর স্বরে কহিল,—বাসবো।

তার পর উভয়েই সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেদিনকার প্রফুল্ল উজ্জ্বল আকাশ হইতে মেঘের এই কৃষ্ণবিন্দুটুকুকে কোনোমতে মুছিয়া ফেলা গেল না।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ রিভাল বেড়াইতে আসিল।

এতিয়োল গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার রিভাল। গ্রামের ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকই রিভালের সদাশয়তায় তাহার গুণমুগ্ধ। রিভাল আসিয়া জাকের সহিত আলাপ করিল; তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সস্নেহে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্নেহের ভিখারী বালক বৃদ্ধের ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল। তার পর রাত্রে যখন ঝিল্লীর গানে চারিধার ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন জাককে বিছানায় ঘুমাইতে পাঠাইয়া ইদা আর্জান্তঁকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। জাক আসিয়াছে—সে সংবাদ দিয়া, জাকের প্রতি আর্জান্তঁর একটু স্নেহ ও সহানুভূতি সে কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিল। বেচারা জাক—তাহার জন্য আর কিছু নয়—শুধু একটু করুণা। এতটুকু স্নেহ। সে নিতান্ত অভাগা! তাহাকে দেখিবার কেহ নাই!

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল।

সে উত্তরে মাতার দুর্ব্বলতার প্রতি বক্র ইঙ্গিত ও তজ্জন্য তিরস্কার; এবং বালকের শিক্ষার অভাবের কথা মোটেই বাদ পড়ে নাই। তবু ইদার মনে হইল, ইহাতে রূঢ়তা নাই। আর্জান্তঁ লিখিয়াছে, মোবোন্‌ভার স্কুলে অনর্থক কতকগুলা অপব্যয় হইতেছিল। কারণ, স্কুলের দশা আর তেমনটি নাই। তথাপি সেখান হইতে জাকের পলাইয়া আসা কোনমতে সমর্থন করা যায় না—কাজটি খুবই গর্হিত হইয়াছে। যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই! তবে বালকের ভবিষ্যতের ভার আর্জান্তঁ লইতে প্রস্তুত আছে। এতিয়োলে ফিরিয়া—আর এক সপ্তাহ পরেই সে ফিরিবে—এ সম্বন্ধে আর্জান্তঁ কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া ফেলিবে।

এই সাতটি দিন জাকের যেরূপ সুখে কাটিয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহার সমস্ত জীবনে—এমন সুখ অদৃষ্টে আর কখনও মিলে নাই। গৃহে মাতার সঙ্গ, বাহিরে বন, বাগান, নদী—ঘরে-বাহিরে যত ইচ্ছা, ঘুরিয়া বেড়াও! সর্ব্বত্র সমান অধিকার! বাহিরে মুক্ত আনন্দে ছুটিয়া বেড়ানো, গৃহে মার প্রচুর স্নেহ! সহস্র আদর-আবদারে ডুবিয়া থাকা, প্রাণ খুলিয়া হাসির তুফান তোলা! জাকের জন্যই যেন পৃথিবীর যত কিছু আনন্দ-উল্লাস বিধাতা উদার হস্তে চারিধারে আজ ছড়াইয়া দিয়াছেন! শুধু তুলিয়া লইলেই হয়!

আর্জান্তঁর নিকট হইতে আর একখানি পত্র আসিল—কাল সে এতিয়োলে আসিয়া পৌঁছিবে।

জাককে স্নেহ ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবে বলিয়া আর্জান্তঁ পত্রে স্বীকার করিলেও ইদার মন কিন্তু একদণ্ড সুস্থির ছিল না। ষ্টেশনে যাইবার সময় ইদা জাককে সঙ্গে লইয়া গেল না, পথে কাতর অনুনয়ে একবার সে আর্জান্তঁর মন ভিজাইবার চেষ্টা করিবে! সহসা জাককে দেখিলে যদি আর্জান্তঁ জ্বলিয়া ওঠে—এই ভয়ে শুধু জাককে গৃহে রাখিয়া আর্জান্তঁর অভ্যর্থনার জন্য ইদা গাড়ী লইয়া একাকী ষ্টেশনে গেল। জাককে সে বলিয়া গেল, "তুমি বাগানে থেকো—ফশ্ করে ওঁর সামনে এসো না। আমি ডাকলে তবে এসো। কি জানি—"

কথাটা শেষ না করিয়াই ইদা চলিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া জাক দমিয়া গেল। তাহার পর কখন্ যে গৃহ-দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সহসা সে মার স্বর শুনিল,—মা ডাকিতেছে,—জাক, এদিকে এসো!

জাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এইবার! কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোনমতে আর্জান্তঁকে অভিবাদন করিয়া জাক স্থির হইয়া দাঁড়াইল! আর্জান্তঁ তাহার বক্তৃতাটুকু সংক্ষেপে সারিয়া লইল। বক্তৃতায় উপদেশের সহিত যে একটু শ্লেষ মিশানো না ছিল, এমন নহে।

আর্জান্তঁ কহিল,—জাক—তোমাকে মানুষের মত হতে হবে, কাজ করতে হবে। বুঝলে? কাজ! কাজ ছাড়া মানুষের থাকা চলে না। জীবনটা ধুলোখেলা নয় তো! তবে বেশী কিছু করতে হবে না তোমায়। শুধু আমি যা বলবো, তাই করে যাবে, সেই হলে আমিও ভালোবাসবো, বুঝলে! আর সকলেই তাহলে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবো। আমি এখন এইটুকু চাই—আমার নিজের যথেষ্ট কাজ আছে—অবসর খুবই কম—তবু তোমাকে মানুষ করে তোলবার জন্য তোমার দিকে একটু মন আমাকে দিতেই হবে। দু'ঘণ্টা আমি তোমার জন্য খরচ করতে পারি, আর করতে হবেও, দেখছি—তোমার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য। যদি আমার মতে চলতে পারো—তবেই একদিন আমার মত কাজের লোক হতে পারবে—সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি হবে! নাহলে যেমন অপদার্থ আছ, চিরকাল তেমনই থেকে যাবে! কোন উন্নতি হবে না।

—শুনছ জাক? শোন! পুত্র-স্নেহাতুরা মঙ্গলার্থিনী মাতা সাগ্রহে সানন্দে কহিল,—তোমার জন্য উনি নিজের কত ক্ষতি করছেন, বুঝছ তো, জাক?

—হাঁ, মা।

—থাম, শার্লৎ—আর্জান্তঁ কহিল,—আগে আমি জানতে চাই—আমার কথা থাকবে কি না! আমি বেণা-বনে কথা ছড়াই না। অবশ্য আমি বাধ্য করছি না যে এ-রকম ভাবে চলতেই হবে।

—বলো, জাক, পারবে তো?

মাকে আর্জান্তঁ শার্লৎ বলিয়া ডাকিল দেখিয়া জাক কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল! সে তাই চট করিয়া

কথাটার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সহসা চমক ভাঙ্গিলে সে বলিল,—পারব। বলিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্রুত সে নীচে নামিয়া গেল! তাহার বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল, মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল। নীচে আসিয়া একটা শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে জাক দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধা একটা কাগজ ঝুলিতেছে। কাগজে কবির আঁকাবাঁকা অক্ষর ছড়ানো রহিয়াছে। নিকটে আসিয়া জাক দেখিল, খুব মোটা অক্ষরে লেখা আছে,—

রুটিন

নীচে তাহার জীবনের একটা গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পড়া-শুনা কাজ-কর্ম্মের ধারা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দিনের মুহূর্ত্তগুলাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করা হইয়াছে—ছয়টায় শয্যা-ত্যাগ।

ছয়টা হইতে সাতটা—প্রাতর্ভোজনাদি।

সাতটা হইতে আটটা—পড়া।

আটটা হইতে নয়টা—ইত্যাদি।

প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র করিলে সেই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বায়ু যেমন প্রচুরভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, আলোক-প্রবেশেও যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে, তেমনই-ভাবে দিনটাকে যেন অসংখ্য টুকরায় ভাগ করা হইয়াছে! লাটিন, গ্রীক, বীজগণিত, জ্যামিতি, দেহতত্ত্ব, ব্যাকরণ প্রভৃতির নামে সে টুকরাগুলা পরিপূর্ণ! সকল বিষয়েই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তারপর এই বিক্ষিপ্ত টুকরা-গুলাকে হৃদয় কোন্ সুদূর শুভ মুহূর্ত্তে এক অখণ্ড জ্ঞানের স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবে! জাক একেবারে সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিবে!

কিন্তু এ ধরা-বাঁধা নিয়মে চলা বালকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত জিনিষ ধরিবার মত স্থান ছিল না! কাজেই তাহার চিত্ত স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল!

অপরাহ্ণে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিলে যখন সে বইয়ের রাশির মধ্যে আপনাকে মগ্ন রাখিত, ছাপার অক্ষরের দিকে কেবলই ঝুঁকিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সেগুলা ক্রমে তাহার চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন বাহিরে মুক্ত বায়ু ও আনন্দ লাভের জন্য চিত্ত তাহার নিতান্তই কাতর অস্থির হইয়া উঠিত! তাহার মনে হইত, একবার যেমন জিমনাজ হইতে পলাইয়াছিল, আবার তেমনই করিয়া সে কোথাও পলাইতে পারিলে বাঁচে।

খোলা জানালার মধ্য দিয়া বসন্ত তাহার অজস্র পুষ্পের স্নিগ্ধ সুরভি বহিয়া আনিত, প্রকৃতি আপনার মসৃণ আসনখানি বিছাইয়া কোল পাতিয়া শ্রান্ত বালককে সস্নেহে যেন আহ্বান করিত, জাক তখন বহি বন্ধ করিয়া চোখ মেলিয়া শুধু বাহিরের পানে চাহিয়া থাকিত। কখনও দেখিত, কোমল পুচ্ছ তুলিয়া কাঠবিড়ালীর দল এ-গাছে ও-গাছে মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই-তেছে! বাহিরে সারা বন যখন অজস্র ফুটন্ত গোলাপে ভরিয়া লালে-লাল হইয়া গিয়াছে, তখন ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, "Rosa—The Rose—গোলাপ" এ নীরস পাঠ মুখস্থ করা কি দারুণ কষ্টকর। আর কোন কথা তখন জাকের মনে জাগিত না—শুধু সে ভাবিত, কেমন করিয়া এই মুক্ত রৌদ্রালোকে, অজস্র বায়ুতে আপনাকে অবাধে সে ছাড়িয়া দিবে!

কিছুদিন পরে "অপদার্থ—বোকা" বলিয়া আর্জান্ত জাকের হাল ছাড়িয়া দিল। ইদা করুণ দৃষ্টিতে জাকের পানে শুধু একবার চাহিল, মুখে কোন কথা ফুটিল না! জাক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতদিন যেন কয়েদীর মত গারদে সে বন্দী ছিল—আজ ছাড়া পাইয়াছে! মুক্তি! মুক্তি! সে আজ মুক্ত, স্বাধীন!

ছাড়া পাইয়া জাক বনের দিকে ছুটিল। পাখীর গানে আকাশ তখন ভরিয়া গিয়াছে,—ফুলের গন্ধে চারি-দিক মাতিয়া উঠিয়াছে—নদীতে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে,—প্রজাপতির দল বিচিত্র পাখা মেলিয়া ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে, জাক নৌকা দেখিয়া প্রজাপতি ধরিয়া পরম স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগে সময় কাটাইয়া দিল!

সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলে গৃহের নিস্তব্ধতায় প্রথমটা যেন তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল। ইদা তাড়াতাড়ি আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল,—চুপ, গোল করো না যেন। উনি কাজ করচেন। বই লিখছেন।

অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া জাক শব্দ করিয়া ফেলিল, ছোট টেবিলটা সঙ্গে সঙ্গে উল্টাইয়া গেল! ইদা আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, আঃ, শান্ত হয়ে থাকো জাক—শব্দ করো না!

হাঁ, খুব সাবধান! আর্জান্ত বহি লিখিতেছে—কাজ করিতেছে। গোল হইলে এখনই সব মাটী হইয়া যাইবে! প্রতিভা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে!

প্রকাণ্ড খাতা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নাম "ফষ্টের কন্যা" সুবৃহৎ অক্ষরে আঁকা-বাঁকা ছাঁদে লিখিয়া ভাব-সংগ্রহের জন্য আর্জান্ত কক্ষমধ্যে উদ্বিগ্ন চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! এত করিয়াও এক ছত্র লেখা বাহির হয় না! কি বিড়ম্বনা! জানালার ধারে আসিয়া আকাশ, মাঠ, বাগান, নদী প্রভৃতির পানে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার হৃদয় ভাবের বন্যায় কাণায় কাণায় ভরিয়া ওঠে, কিন্তু কলমটি যেমনই হাতে লয়,

অমনই সে বিপুল ভাবস্রোত কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার কোন সন্ধান মিলে না! খাতার পৃষ্ঠা যেমন শূন্য, তেমনই শূন্য থাকে! জীবনের চারি ধারে কি প্রচুর কাব্য মুঞ্জরিত রহিয়াছে—কিন্তু তাহাদের কঠিন পণ, আর্জান্তঁর সহিত যেন তাহারা শত্রুতা সাধিয়া বসিয়া আছে, কোনমতে তাহার কাছে ধরা দিবে না।

গ্রামের প্রান্তে লতা-পাতা-ঘেরা এমন কুটীরে থাকিয়াও যদি গ্রন্থ লেখা না যায় তো সে দুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই নাই।

ইদা আসিয়া বলিল,—কি লিখলে? কতখানি হলো?

আর্জান্তঁ বলিল,—এসেছ তুমি। বেশ হয়েছে! আচ্ছা, বসো চুপ করে।

ইদা কহিল,—হাঁ, আমি জানতে এলুম, নভেলটা কতখানি লেখা হলো। পড়বার জন্য মনটা এমনি উতলা হয়ে রয়েছে!

ফষ্টের কথা? ওঃ! তুমি জান, ফষ্টখানি লিখতে গেটের কত বছর লেগেছিল। দশটি বছর। একেবারে পাক্কা দশ বছর! তবু তিনি যে যুগে বাস করতেন, সেটাকে কাব্যের সত্যযুগ বল্লেও বলা যায়! লোকের মনে তখন এতটুকু নীচতা ছিল না, হিংসা দ্বেষ কাকে বলে, তা কেউ জানত না—সহানুভূতিতে সকলের মন ভরা ছিল। আর এখন? চারিধারে সকলে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, প্রতিভাশালী নতুন লেখকদের মাথা তুলতে দেবে না, যেন লাঠি উঁচিয়ে আছে। যেমন করে হোক, নিষ্ঠুর সমালোচনা করে, ঠাট্টা করে, উৎসাহ না দিয়ে—একদম্ দমিয়ে দেবে!

খাতা খুলিয়া আর্জান্তঁ ভাবের সন্ধান না পাইয়া শেষে খপরের কাগজ পড়িতে বসিল। এমনই সে নিত্য করিয়া থাকে। নিত্য এই এক আয়োজন। একই অনুযোগ। কল্পনা যেন তাহার সহিত নিষ্ঠুর ছলনা করিয়া ফিরে। কলমের কালি কলমে শুকাইয়া যায়—ভাবের একটা কণা সে ঝরাইয়া তুলিতে চাহে না। সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসিয়া কবি তাহার প্রথম ছত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাকরের নামটি অবধি—কোন কথা বাদ দেয় না। যেরূপ আগ্রহের সহিত সে তাহাতে মনোনিবেশ করে, সহসা দেখিলে মনে হয়, যেন কবি তাহার অপ্রকাশিত উপন্যাসের সমালোচনার সন্ধান করিতেছে, কিম্বা কল্পিত নাটকের চরিত্রানুশীলন পাঠ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাহার অসন্তোষ বাড়ে বই কমে না! দেশের এই লক্ষীছাড়া কাগজপত্রগুলা এত লোকের সংবাদ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না, শুধু তাহার সন্ধান লইতে হইলেই সকলের সর্ব্বনাশ ঘটে! সন্ধান রাখিবার জন্য আগ্রহ কাহারো এতটুকু নাই!

এ জগতে সকলে সুখী, সকলে ভাগ্যবান! তাহাদের রাশি রাশি নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে—অথচ কি কদর্য্য সব নাটক! তাহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—তাহারও হাজার হাজার পাঠক জুটিতেছে! অথচ—কি-ই বা গ্রন্থ! শুধু তাহারই গ্রন্থগুলা চিরদিন অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়! শুধু কি তাই? কোন একটি ভাব তাহার মাথার মধ্যে দেখা দিয়া যখনই প্রকাশের অবসর খুঁজিয়া ফিরে, তখন অপরে কি না সেই ভাবের সহিত কোনমতে পরিচয় ঘটাইয়া অবাধে গ্রন্থ ছাপিয়া ফেলে। প্রকাশ করিয়া কাহারও নিকট সে আপনার ভাবের কথা না বলিলেও লোকগুলা তাহার মন হইতে ভাবগুলাকে কেমন করিয়া যে ছিনাইয়া লইয়া যায়, ইহা ভাবিয়া সে ব্যথিত হইয়া উঠিত! কোন বই পড়িতে বসিলে তাহার মনে হইত, হায়, হায়, এই কথাগুলা তাহারও মনে যে উঁকি দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল! শুধু তাহার লিখিবার অবসর ঘটে নাই! আর ইহারা—এই সব নির্লজ্জ গ্রন্থকার—সেই কথাগুলাই মন হইতে কখন্ আত্মসাৎ করিয়া বই ছাপাইয়া বসিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে সে দেখিত, তাহারই মনের কথা, মনের যত নূতন ভাব কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়া এই সকল হতভাগা গ্রন্থকার দিব্য আসর জমাইয়া তুলিয়াছে—নাম জাহিরের ব্যবস্থা করিয়াছে!

সে একদিন ইদাকে কহিল,—স্থাখ, কাল ফ্রাঙ্ক থিয়েটারে এক খানা বইয়ের অভিনয় দেখে এলুম,—হুবহু একেবারে সেটা আমার "আত্লাতাঁর আপেল" নাটকখানার নকল।

—কি ভয়ঙ্কর! তোমার বই চুরি করেছে! তা তোমার বইখানা গেল কোথায়? নালিশ করে দাও।

—এখনও অবশ্য সেটা লেখা হয় নি—ভাবটা সবেমাত্র মাথায় আসছিল,—লিখব লিখব, ভাবছিলুম—তা,—নাঃ, লিখতে আর এরা দিলে না দেখছি, আমায়।

নিষ্ফল আক্রোশে যখন নির্লজ্জ গ্রন্থকারদের দুঃসহ চৌর্য্যবৃত্তির প্রাবল্য ও ঈর্ষাপরায়ণ সমালোচকগুলার কটূক্তির উল্লেখ করিয়া আর্জান্তঁ আপনার প্রতিভা-স্ফুরণের সহস্র বিঘ্নের কথায় ভোজন-অবসরটুকু সরগরম করিয়া দেয়, ইদা তখন একান্ত অসহায় করুণভাবে তাহার প্রিয় কবির মুখের পানে চাহিয়া থাকে, এবং জাক নত মুখে নিঃশব্দে আপনার ভোজন ব্যাপার শেষ করিয়া যায়। কিন্তু সে সময় দৈবাৎ যদি কখনও আর্জান্তঁর দৃষ্টির সহিত জাকের দৃষ্টি মিলিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে শিহরিয়া উঠিত। নিষ্ফলতার দারুণ আক্রোশে কবির রোষের মাত্রা যখন উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন জাক একদিন স্পষ্ট

বুঝিল, তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য এ অগ্নি জ্বলিবার আর বড় বিলম্ব নাই। সামান্য একটু ছল পাইলেই তাহা ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া, পুড়াইয়া তাহাকে ছাই করিয়া ফেলিবে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

বন্ধু-লাভ

সেদিন অপরাহ্নে অলস অবসর-যাপনের অন্য উপায় না দেখিয়া আর্জান্ত ও ইদা কবরেই বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। আকাশে তখন একটু একটু করিয়া মেঘ জমিতেছে। ক্রমে সেই মেঘ বাড়িয়া উঠিয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। আকাশ যেন তামার বর্ণ ধারণ করিল। ঝড় আসন্ন বুঝিয়া জাক বনের দিকে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আর্শার কাছে আসিয়া বসিল, বলিল,—একটা গল্প বলো না, আর্শা।

আর্শা গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। গল্প বলিতে বলিতে জাকের কৌতূহল-প্রশ্নে আর্শার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে নিষ্কৃতি-লাভের উদ্দেশ্যে আর্শা বলিল,—ওহো, তাই তো জাক, বৃষ্টি নামতে এখনও দেরী আছে—তুমি দৌড়ে দোকান থেকে খরগোসগুলোর জন্য যদি কিছু খাবার কিনে আনো তো ভাল হয়। আমার মনে ছিল না, আহা, কাল সকালে বেচারারা কি খাবে, তার ঠিক নেই। আমি বুড়ো মানুষ, অত তাড়াতাড়ি আনতেও পারবো না—পথেই বৃষ্টি এসে পড়বে হয়তো—তুমি যদি যাও! লক্ষ্মীটি! আমি ততক্ষণ বাড়ীর জিনিষ-পত্তরগুলো তুলে ফেলি—জানলা-টানলাগুলো বন্ধ করে দি।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছোট একটা ঝুড়ি লইয়া জাক দোকানের দিকে ছুটিল।

ঘন পাতার ছায়ায় ঢাকা শ্যামল পথে নিবিড়তর হইয়া তখন আঁধার নামিতেছে। পথে লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ। আসন্ন ঝড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য গ্রাম্য কৃষকের দল পূর্ব্বাহ্ণেই সব বাসায় ফিরিয়াছে। জন-কোলাহল-হীন পথ নিরালা। জাক দোকান হইতে গৃহের দিকে ফিরিতেছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময় অদূরে সে শুনিল, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে,—টুপি—চাই ভালো টুপি!

পশ্চাতে ফিরিয়া জাক দেখিল, অসংখ্য টুপির বোঝা পিঠে ফেলিয়া এক ফিরিওয়ালা—বোঝার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—সেইদিকে আসিতেছে। শ্রান্তিতে বেচারার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—দারিদ্র্যের সঘন মলিন রেখা তাহার মুখে-চোখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে! জাক থমকিয়া দাঁড়াইল। ফিরিওয়ালা তাহার নিকটে আসিয়া হাঁকিল,—টুপি—চাই ভালো টুপি!

জাক দাঁড়াইল। এ কোথায় চলিয়াছে? এই দুর্য্যোগের রাত্রে কোথায় তাহার আশ্রয় মিলিবে—? কোথায়ই বা একটু ঘুমাইয়া বেচারা দিনের ক্লান্তি ঘুচাইবে! এই বোঝা বহিয়া কত পথই না সে ঘুরিয়াছে—কাহার জন্যই বা এ নির্জ্জন পথে এ সময় এখন চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে! কে তাহার টুপি কিনিবে? শুধু গতিহীন প্রাণহীন দূরত্ব-নির্দ্দেশক পাষাণ-স্তূপগুলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আর বৃক্ষ-শাখায় পাখীগুলা নিতান্ত নির্জীবের মত ঝড়ের ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছে। এখানে কে তাহার টুপি কিনিবে?

টুপিওয়ালা একটা বৃক্ষতলে আসিয়া বোঝা নামাইয়া বসিল। জাক তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। টুপি-ওয়ালা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আর কতদূর গেলে গাঁ মিলবে, বলতে পারো?

আকাশের বুক চিরিয়া সশব্দে একটা লোহিত বিদ্যুৎ-শিখা ছুটিয়া গেল। পথের ধূলি উড়াইয়া কেমন যেন একটা কম্পন ফুটিল—গাছগুলা সে শব্দে শিহরিয়া উঠিল।

জাক কহিল,—আর পনেরো মিনিট হেঁটে গেলেই পাবে।

—পনেরো মিনিট! তবেই মুস্কিল দেখছি। তাহলে আর গাঁয়ে পৌছতে পারা যাবে না—টুপিগুলো সব ভিজে মাটী হয়ে যাবে—তাই তো! এতগুলো টুপি!

করুণ সহানুভূতিতে জাকের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—আমাদের বাড়ী এই কাছেই। সেখানে তুমি আসবে?

হতভাগ্য টুপিওয়ালা যেন অকূলে কূল পাইল। কৃতজ্ঞতায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উভয়ে দ্রুত চলিল। টুপিওয়ালা কষ্টে পথ চলিতে-ছিল। জাক কহিল, - তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

—হাঁ—এই পায়ে কি কম লাগছে! হয়েছে কি, জানো, আমার পা হচ্ছে বড়। জুতো—তা সে যে জুতোই কিনি, পায়ে কেমন কসা হয়। পয়সা তো আর নেই যে, বায়না দিয়ে ঠিক পায়ের মাপে এক জোড়া জুতো তোয়ের করাবো।

বকিতে বকিতে টুপিওয়ালা জাকের সঙ্গে চলিল। গৃহে পৌছিয়া জাক টুপিওয়ালাকে ভোজন-কক্ষে বসাইল; কহিল,—বসো তুমি। আগে কিছু একটু খাও! আরাম পাবে।

টুপিওয়ালা রাজী হইল না, কহিল,—না, না। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

কিন্তু জাক ছাড়িবার পাত্র নহে। আর্শা এই অসভ্য

লোকটাকে দেখিয়া বিষম চটিয়া গিয়াছিল—তবু মুখের কথায় সে বিরক্তি প্রকাশ করিল না। জাকের আদেশে মদ ও কিছু খাবার সে লইয়া আসিল।

জাক বলিল,—খানিকটা মাংস দাও তো আর্শা।

আর্শা কহিল,—মাংস বেশী নেই! তা ছাড়া জাক, বুঝলে, কর্ত্তা এ সব পছন্দ করেন না—জানতে পারলে বকবেন!

—আচ্ছা, সে যখন বকবেন, তখন দেখা যাবে। এখন তো তুমি দাও!

নিতান্ত বিরক্তির সহিত আর্শা এক টুকরা মাংস লইয়া আসিল।

জাক কহিল,—কেমন খাচ্ছ?

টুপিওয়ালা কহিল, চমৎকার। খাসা।

চারিধার কাঁপাইয়া আবার বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। ভীষণ শব্দে ঝড় নামিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি! মুষলধারে বৃষ্টি।

জাক কহিল,—তোমাকে অনেক দূর ঘুরতে হয়, না?

—হাঁ। আমি নান্তেঁয় থাকি—আমার বোনের বাড়ী সেখানে। সেইখানে আমি থাকি। মস্তাক্র, অর্লিন, তুবেঁ, আঁজু, সব জায়গায় ঘুরতে হয়। বাড়ীতে খেতে পরতে অনেকগুলি লোক—বুড়ো বাপ, বিধবা বোন্, চার-পাঁচটি ভাই—সকলের আহার জোগানো সোজা ব্যাপার নয়!

—তোমার বড় কষ্ট হয় তাহলে?

—হয় বৈ কি—তা কষ্ট যা কেবল ঐ জুতোর জন্মে। জুতোজোড়া খুলে ফেললে তবে একটু আরাম পাই! কিন্তু তবু ঐ যে বললুম, আরামই বা কোথা? রাত্রে বিছানায় শুয়ে যখন ভাবি যে আবার সকালে সেই জুতো পায়ে দিয়ে বেরুতে হবে, তখনই আবার প্রাণটা কেঁপে ওঠে।

জাক কহিল,—তা তোমার ভায়েরা বেরোয় না, কেন?

—তারা বেরুবে কি! সব যে ছেলেমানুষ! এত ঘুরতে পারবে কেন? আর এমন কিছু আমার কষ্ট নয়—তবে যদি ঠিক এই পায়ের মাপে একজোড়া জুতো পেতুম।

এমন সময় বহির্দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। জাক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল! টুপিওয়ালা কহিল,—কি হলো?

—ওরা এসেছে!

বাহিরে আর্জাস্তঁর গলা শুনা গেল! আর্জাস্তঁ কহিল,—এস লোলি, একেবারে খাবার ঘরে এসো! আর্শা, খাবার দাও!

আর্জাস্তঁ ভিতরে প্রবেশ করিয়া ব্যাপার দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি এ সব? কি হচ্ছে?

জাকের মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে যদি তাহার মাথায় বজ্রপাত হয় তো সে বাঁচিয়া যায়! ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া জড়িত অস্পষ্ট স্বরে সে যে কি বলিল, আর্জাস্তঁ তাহা শুনিয়াও শুনিল না!

আর্জাস্তঁ কহিল—দেখে যাও লোলি, তোমার জাক বাহাদুরের কাণ্ড দেখে যাও। তিনি এখানে আসর জমকে বসেছেন। বন্ধু নিয়ে দরবার করছেন!

ইদা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কহিল,—এ-সবের মানে কি জাক?

টুপিওয়ালা নিতান্ত অপ্রতিভভাবে কহিল,—এঁকে কিছু বলবেন না, ঠাকরুণ। আমি নিজেই—

আর্জাস্তঁ ক্রোধে কাঁপিতেছিল, সশব্দে দ্বার খুলিয়া তীব্র স্বরে কহিল,—চুপ করে থাক্, বেয়াদব, অসভ্য কোথাকার—লোকের বাড়ী চড়াও হবার মজা টের পাওয়াচ্ছি তোকে! বেরো, এখনই এখান থেকে বেরো!

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া টুপিওয়ালা উঠিয়া দাঁড়াইল! এমন ব্যবহার—তাহার নিকট মোটেই নূতন নয়! এমন লাঞ্ছনা আরও কত স্থানে তাহার অদৃষ্টে মিলিয়াছে! ইহাতে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না।

আপনার টুপির বোঝা পিঠে তুলিয়া লইয়া জাকের পানে একবার সে কৃতজ্ঞভাবে চাহিয়া দেখিল। জাক নত মস্তকে বসিয়া ছিল—ভয়ে মুখ তাহার সাদা হইয়া গিয়াছে! তার পর সেই বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে টুপি-ওয়ালা পথে বাহির হইয়া গেল।

জাকের চৈতন্য যেন লোপ পাইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা সে শুনিল, বাহিরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দূরে কে হাঁকিতেছে,—টুপি—চাই ভালো টুপি।

জাক ভাবিল, আহা, বেচারা—বেচারা টুপিওয়ালা! এই জলে যথাসর্ব্বস্ব তাহার ভিজিয়া নষ্ট হইয়া গেল!

আর্জাস্তঁ কহিল—ওঃ, আমি দেখিনি। হ্যাম—হ্যাম খাওয়ানো হচ্ছিল বন্ধুকে।

ইদা কহিল,—কিন্তু ওটা সে খায়নি, বোধ হয়!

আর্শা কহিল,—তখনই আমি বারণ করেছিলুম—তা কি শুনলে? বললুম, সব রাগ করবেন, তা গ্রাহ্য করলে না! যাই হোক, ছেলেমানুষ না বুঝে একটা কাজ করেছে!

—থামো তুমি। আর্জাস্তঁ গর্জ্জিয়া উঠিল!

জাক এতক্ষণে বুঝিল, সে কি দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে। উঠিয়া গাঢ় স্বরে সে কহিল,—এবারটি আমায় মাপ করুন—আর কখনও এমন কাজ করবো না—

—মাপ? বটে! বলিয়া আর্জাস্তঁ জাকের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিল, কহিল, —এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! তুমি জানো, ও জিনিষে তোমার কোন অধিকার নেই! যে বিছানায় তুমি শোও, যে খাবার তুমি খাও, সে সমস্ত তোমাকে শুধু অনুগ্রহ করে ব্যবহারের জন্ত দেওয়া হয়েছে! তোমাকে দয়া

কথা আমার অন্যায় হয়েছে দেখছি! কে তুমি আমার? কেউ নও—কোথাকার নোঙরা পথের কুকুর। তোমার ব্যবহার দেখে আমি বিষম অবাক হয়ে পড়েছি! ছোট-লোক, পাজী।

ইদার করুণ দৃষ্টি, কাতর অনুনয়ে আর্জান্ত জাককে সেদিনকার মত ক্ষমা করিল।

পরদিন আর্জান্তর প্রবল জ্বর দেখা দিল। পীড়া কঠিন বুঝিয়া ইদা অস্থির হইয়া উঠিল। তখন আরাম-কুঞ্জে ডাক্তার রিভালের ডাক পড়িল। প্রত্যহ দুইবেলা ডাক্তার রিভাল আসিয়া রোগী দেখিতে লাগিলেন। ইদা কহিল,—ডাক্তার, কবিকে তুমি শীঘ্র আরাম করে দাও—কবির লেখাপড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—সমস্ত জগতের যে কি ক্ষতি হচ্ছে।

—কোন ভয় নেই—মাদাম আর্জান্ত, তবে দুদিন সময় লাগবে! রোগীর মন ভালো রাখো। জাক কোথায় গেল? তাকে ডেকে দাও দেখি।

—না, না—এখনই সে গোল করবে!

—আহা, করুক একটু গোল! ছেলেমানুষ—তাদের গোলমালে তো আর বিরক্তি ধরে না, বরং সে ভালোই লাগে! বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! বাপের অসুখ হলে ছেলে-পিলের মন ভালো থাকে কখনও। তুমি তাকে ডেকে দাও দেখি। বেশ ছেলেটি—আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে সে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। আমাকে দাদা-মশায় বলে ডাকে—কে তাকে শিখিয়ে দিলে, বলো? সে জানে, যখন আমার পাকা চুল আর পাকা দাড়ী আছে, তখন আমি দাদামশায় না হয়ে যাই কোথায়।

রিভাল তখন বসিয়া আপন দৌহিত্রী সেসিলের কথা বলিল—জাকের চেয়ে সে দুই বৎসরের ছোট। তাহার দৌরাত্ম্যে বৃদ্ধের এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে না। আবার এ দৌরাত্ম্য বৃদ্ধের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কোন দিন তাহা বাদ পড়িলেও একটা দারুণ অস্বস্তি ঘটে! তাহার মন ভিজাইয়া মান ভাঙ্গাইয়া নূতন করিয়া দৌরাত্ম্যের সৃষ্টি করাইতে হয়।

ইদা কহিল,—তাকে একদিন এনো না ডাক্তার, জাকের সঙ্গে খেলা করবে বেশ!

—না—সেটি হবার জো নেই! তার দিদিমা তাকে চোখের আড় করতে চায় না। একদণ্ড কাছ-ছাড়া হলে বুড়ী অমনি অস্থির হয়ে ওঠে। সে দুর্ঘটনার পর থেকে বুড়ী ওকে নিয়েই কোনমতে আপনাকে খাড়া রেখেছে কি না!

কন্যার মৃত্যু-ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াই বৃদ্ধ দুর্ঘটনার কথা তুলিলেন। একমাত্র কন্যা মাতৃহীন যেদিন শিশু সেসিলকে রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিল, সেদিন বৃদ্ধের জীবন কি ভীষণ অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছিল! আলোর কণাটুকু পাইবার আর কোন আশা ছিল না! কিন্তু সেসিল আবার নূতন করিয়া সে অন্ধকারে ছোট একটি দীপ জ্বালিয়া দিয়াছে! সেসিলকে পাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সে দুঃখ আবার ভুলিতে বসিয়াছে! সে দুঃখের কথা শুধু আর্শী জানে, আর কেহ না।

আর্জান্তকে আনন্দ দিবার জন্য, তাহার সম্মতি লইয়া ইদা এক মিলনীর আয়োজন করিল। পুরাতন বন্ধু ছিল—লাবাস্যাঁন্দ্র, মোরোনভা ও ডাক্তার হারুজ্। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হইল।

একদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জাক দেখিল, বাড়ী সাজাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চীনা লণ্ঠন, বিচিত্র বর্ণের ফুল, কাগজের নিশান রাশি রাশি আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার কি?

ইদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া জাক কহিল,—মা, কি হবে মা?

ইদা তখন গৃহসজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত। সে কহিল, চুপ, লক্ষ্মী হয়ে থাকো। দুরন্তপনা করো না—বাড়ীতে আজ অনেক বড় বড় লোক আসবেন। ভোজ আছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে দুই একজন করিয়া অতিথি দেখা দিতে লাগিল। আপনার শয়ন-কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া তাহারই ফাঁক দিয়া জাক দেখিল, মোরোনভা ও ডাক্তার হারুজের দল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভয়ে তাহার শরীরের রক্ত হিম হইয়া উঠিল। এই শত্রুগুলা যদি আবার তাহাকে টানিয়া জিম-নাজে লইয়া যায়। কি হইবে? তাহা হইলে সে কি করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যার সময় যত সখের থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার, অভিনেতা ও গ্রন্থপ্রকাশক, সকলে দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। রন্ধনশালা হইতে বিবিধ ভোজ্যের বিচিত্র সুরভি উত্থিত হইয়া ক্ষুধাতুর নিমন্ত্রিতগণকে মুহুর্মুহু উত্তেজিত করিয়া তুলিল। জাক মাতার পাশে থাকিয়া কফি, চা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিল। মাঝে মাঝে লাবাসাঁান্দ্র্ ও হারুজের বীভৎস চীৎকার এবং হাস্যের শব্দে তাহার শির অবধি ঝন্-ঝন্ করিতেছে।

অবশেষে ডাক্তার রিভাল আসিলেন। রোগীর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া রিভাল ইদাকে কহিলেন,—দেখচো, আমোদ-আহ্লাদে আর্জান্তর চেহারা অবধি ফিরে গেছে।

ডাক্তার হারুজ কহিল,—আপনি ডাক্তার?

আর্জান্ত তখন উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিল।

নানা গল্পে, হাস্য-কৌতুকে সে রাত্রিটা বেশ আনন্দে কাটিল। ইদারও প্রফুল্লতার সীমা ছিল না। আর্জান্তর আনন্দের মধ্যে একটু তীব্র বিষ মিশানো ছিল। আপনার ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে প্রতিভার এই দরিদ্র হতভাগ্য বরপুত্রগণের মনে সে যে একটা তীব্র

বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহা সে বুঝিল। মোরোনুভা-হারজের দল সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া একটু ঈর্ষান্বিত হইল। আহার্য্যের বৈচিত্র্য ও ঘটা দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল,—আর্জান্ত তো তোফা আছে। দিব্যি বাগিয়েছে। অবস্থা খাশা ফিরিয়ে ফেলেছে।

গভীর রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিলে অভ্যাগতের দল গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিল। মোরোনুভা-হারজের দল একটু অস্থিরতা অনুভব করিল। এমন পরিপাটী আরাম ছাড়িয়া কোথায় এ রাত্রে হিম-জর্জ্জর পথে বাহির হইবে! তাহার পর জিম-নাজের সেই ছিন্ন শয্যায় অপ্রচুর গরম কাপড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি পোহাইতে হইবে,—ইহা ভাবিয়া যখন তাহাদের বক্ষ জমিয়া উঠিবার উপক্রম হইল, তখন আর্জান্ত কহিল,—এত রাত্রে আর কোথায় সব ফিরবে, আজ? ‍দুদিন এখানে থেকে আমোদ-আহ্লাদ করো,—তারপর যেয়ো। কেউ তখন ধরে রাখবে না।

কি অভয়-প্রদ, নিশ্চিন্ত এ আশ্বাস! হারজের দল তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেসিল

পরদিন গির্জ্জা হইতে জাককে লইয়া ইদা যখন গৃহে ফিরিতেছিল, তখন ফটকের নিকট ডাক্তার রিভালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া রিভাল দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেয়েটির রঙ গোলাপের মত রাঙা—চোখেও বেশ একটি শান্ত দীপ্তি ফুটিয়া রহিয়াছে! ললাটের উপর প্রভাতের সূর্য্য-কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে, বায়ু-স্পর্শে কুঞ্চিত অলকের কয়েকটি গুচ্ছ সেই সূর্য্য-কিরণে কখনও লুটাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা আবার সরিয়া যাইতেছে! মেয়েটিকে দেখিলেই কেমন ভালোবাসিতে ইচ্ছা হয়।

ইদা কহিল,—ডাক্তার, এটি বুঝি তোমার নাতনী?

মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া ডাক্তার রিভাল বলিল,—হাঁ—এই হচ্ছে, সেসিল আমার দিদি। এ দিকে এসো জাক, সেসিলের সঙ্গে ভাব কর!

তারপর কয়জনে মিলিয়া পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল! গৃহ বেশী দূরে নহে। রিভাল কহিল,—সেসিল আর কোথাও বড়-একটা যায় না—বাড়ীতেই থাকে। শুধু এই গির্জ্জায় তার দিদিমার সঙ্গে রবিবার সকালে একবার করে যা আসে। আজ ওর দিদিমা আসতে পারে নি, কাজেই আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে।

এখানে আসিয়া অবধি সমবয়সী সাথী না পাইয়া জাক কেমন একটা নিঃসঙ্গ বিজনতা বোধ করিত! আর্শার সঙ্গে গল্প করিয়া, বনে কাঠুরিয়া বা কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিত না, নিতান্ত তৃষিত চিত্তে এমন একজন সঙ্গীর অভাব সে অনুভব করিতেছিল, যাহার সহিত দুই দণ্ড প্রাণ খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বাঁচে! কিন্তু এমন সঙ্গী মিলিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই তাহার মনের দুঃখ মনেই থাকিয়া যাইত।

গৃহে বৃদ্ধ মাতামহ, মাতামহী ও দাসী ভিন্ন সেসিলও কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না। রবিবার প্রভাতে একবার করিয়া গির্জ্জায় আসিয়া বাহিরে বালক-বালিকাগণের এই অজস্র হাস্য-কৌতুক দেখিয়া সে এক অজানা স্বপ্নরাজ্যের পরিচয় পাইত! উহারা কি কথা কয়, কেন হাসে, জানিবার জন্য অনভিজ্ঞা বালিকার মনে যে কৌতূহল জাগিত, তাহার তৃপ্তির কোন আশা না দেখিয়া সে কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তাই আজ জাক ও সেসিল যখন দুই জনে প্রথম মিশিতে পাইল, তখন জাকের মনে হইল, বনে সে পক্ষিশাবক ধরিয়া সানন্দে যে মুঠি ভরিত, এ হস্তের স্পর্শও ঠিক তেমনই মধুর, তেমনই কোমল!

ইহার পর হইতে জাককে যখনই বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, তখন বনের দিকে আর কেহ তাহার সন্ধান লইতে ছুটিত না। সকলে বুঝিত, ডাক্তার রিভালের গৃহে হয় সে সেসিলের সহিত বসিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর নিকট গল্প শুনিতেছে, নয় সেসিলের জন্য কাগজের ফুল, নৌকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তে একটা বাগানের ধারে ডাক্তারের গৃহ। গৃহখানি একতলা, নিতান্তই সাদা-সিধা ধরণের। বাহিরে একটা পিতলের পাতে ডাক্তারের নাম লেখা। লেখাগুলা কতক অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সেই পিতলের পাতের পাশেই 'রাত্রি-ঘণ্টা' ঝুলানো! গৃহটি পুরাতন। নূতন কেতায় যে তাহাকে গড়িয়া তুলিবার এককালে চেষ্টা হইয়াছিল, স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। দ্বারের সম্মুখে গাড়ী-বারান্দা, তাহার থামগুলা শুধু খাড়া রহিয়াছে, উপরে ছাদ বসিলেই কাজটুকু সারা হইয়া যাইত, কিন্তু ছাদ আর হইয়া ওঠে নাই! ফটক হইতে গৃহের প্রবেশ-দ্বার অবধি পথটায় এক সময় কাঁকর ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর অমনোযোগে সেই কাঁকর-ফেলা পথে মধ্যে মধ্যে এখন প্রচুর ঘাস জন্মিয়া উঠিয়াছে। সে ঘাস আর তুলিয়া ফেলা হয় নাই, স্থানে স্থানে আগাছায় পথের কাঁকর ঢাকিয়া গিয়াছে। দুই-একটা দেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর,—নূতন সার্শি খড়খড়ি বসাইবার আয়োজন হইতেছিল, পরে আর তাহা বসানো হয় নাই! যদি কেহ বলিত, কাজটুকু শেষ হইয়া যাক, তাহা হইলে

তাহার উত্তরে মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিত,—আর দরকার কি, এ সবে?

গ্রামের লোক গৃহস্বামীর এ ঔদাসীন্যের কারণ জানিত। বৃদ্ধ ডাক্তার বড় সাধেই জীর্ণ বাটীর সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—বাড়ীখানিও বেশ ছবির মত সজ্জিত সুন্দর হইয়া উঠিত, যদি না সেই দুর্ঘটনা বৃদ্ধের জীবনকে একেবারে দলিত চূর্ণ করিয়া দিত! একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে বৃদ্ধের সংসারের সকল সাধ মিটিয়া গেল! ডাক্তার-গৃহিণী এ শোক জীবনে ভুলিতে পারিলেন না। সেই দুর্ঘটনার পর হইতে গৃহিণী বাহিরের পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বসিলেন। সকলে ভাবিল, বৃদ্ধা এ শোকের বেগ বুঝি সামলাইতে পারিবেন না! তাহাই ঘটিত, যদি সেসিল সহসা এ সংসারটিকে নব আশ্বাসের বাণীতে মুখরিত করিয়া না তুলিত!

বাহিরে কর্ম্ম-কোলাহলের সংস্রবে আসিয়া ডাক্তার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন বটে—কিন্তু পূর্ব্বেকার সে সহজ প্রফুল্লতাটুকু তাঁহার হৃদয় হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল। সারাদিন রোগী দেখিয়া পীড়িতের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিয়া বৃদ্ধ আপনাকে সেসিলের হাতে সম্পূর্ণভাবে সঁপিয়া দিতেন! সে যাহা করিয়া যেমন করিয়া সুখ পায়, বৃদ্ধ তাহাই করেন। সেসিলের সহিত এইরূপ খেলা-ধূলা করিয়াই বৃদ্ধ কন্যার শোক ভুলিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এই বিষণ্ণ গৃহে শোকের মধ্যে থাকিয়া সেসিল যেন কি এক দারুণ বিজনতা অনুভব করিত। তাহাদের ছোট গৃহখানি কবরের মতই স্তব্ধ, রুদ্ধ! বাহিরের কোন কোলাহল এখানে পৌঁছিতে পারে না—বাহিরের সহিত তাহার কোন সম্পর্কও নাই! ঐ আকাশ, এই বাতাস, ঐ পাখী, এই ফুল—ইহারাই তাহার সর্ব্বস্ব, ইহাদের লইয়াই তাহার সমস্ত পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে! বাহিরের লোকজন—সে যেন কোন্ স্বপ্নের দেশে তাহারা থাকে—তাহাদের সহিত সেসিলের কি সম্পর্ক! এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে অহর্নিশি বাস করায় সেসিলের মুখে এমন একটা করুণ বিষণ্ণ রেখাপাত হইয়া গিয়াছিল যে সেটুকু সহজেই লোকের চোখে পড়িত।

জাক ও সেসিলকে লইয়া রিভাল যখন গৃহে পৌঁছিলেন, তখন জাককে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন,—এ ছেলেটি কে?

রিভাল কহিলেন,—আর্জান্তঁদের ছেলে। বেশ ছেলেটি! সেসিল বেচারী একলা থাকে—ও-ও একলা থাকে, দুজনে একসঙ্গে খেলা করবে, তাই আমি নিয়ে এলুম!

গৃহিণী গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—কিন্তু ওরা—ঐ আর্জান্তঁরা কেমন লোক, তা কে জানে! কোথায় বাড়ীঘর, তাও কেউ জানে না।

—ওরা বেশ লোক। আমি নিজে জানি! কর্ত্তাটি কেবল খামখেয়ালি—একটু বদমেজাজী। তা সে লোকটা হলো কবি—কবিটবি হলে মেজাজ অমন হয়ে থাকে! ওর মা কিন্তু বড় ভালো মানুষ, আহা, নেহাৎ বেচারী। তবে ওরা যে বেশ ভদ্রলোক, তার আর পরিচয় নেবার দরকার করে না—সে ওদের ব্যবহারেই বোঝা যায়।

গৃহিণী মাথা নাড়িলেন। স্বামীর নিশ্চিন্ততায় তাঁহার কেমন বিশ্বাস ছিল না। গৃহিণী কহিলেন,—কিন্তু তুমি জানো তো—সেবার—

নিতান্ত অপরাধীর মত রিভাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন; পরে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—কোন ভাবনা নেই তোমার। জাক ছেলে মানুষ, তোমার সেসিলও তাই। কোন, ভয়ের কারণ নেই।

অবশেষে গৃহিণী নিরাপত্তিতে জাককে দৌহিত্রীর ক্রীড়া-সঙ্গিত্বে গ্রহণ করিলেন। জাক সেসিলের সঙ্গে খেলা করিবার অধিকার পাইল।

তখন জাক জীবনে এক মধুর পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। প্রথমটা এই পরিবারে খাপ খাইতে জাকের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল—সে সঙ্কোচ শীঘ্রই কাটিয়া গেল; এবং জাক নিত্য এখানে অতিথি হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, যে রাত্রে শয়ন ও আহারের সময় ভিন্ন সর্ব্বক্ষণই সে রিভাল-গৃহে থাকিয়া সেসিলের সঙ্গে খেলা করিত, গল্প করিত। বাড়ীর কথা তাহার আর মনে পড়িত না।

একদিন রিভাল-গৃহিণী কহিলেন,—জাক, তুমি স্কুলে যাও না?

—না।

—পড়া-শোনা করো না?

বালক আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,—আমি—আমি রাত্রে বাড়ীতে মা'র কাছে পড়ি।

বেচারী শার্লৎ! লেখাপড়া শিখানো কি তাহার কাজ! এ ঝক্কি কি তাহার পোষায়!

রিভাল-গৃহিণী স্বামীকে কহিলেন,—ওরা ছেলেটাকে আদপে দেখে না—সারাদিন এখানে খেলা করে বেড়ায়, দেখি।

ডাক্তার কহিলেন,—উপায় নেই! ছেলেকে ওরা এঁটে রাখতে পারে না, তা ছাড়া জাকের মাথা তেমন নেই।

—বুঝেছি। ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ধারালো নয়—আর ও-ও নিজের বাপ নয় তো। আহা! মার প্রথম পক্ষের ছেলে। এমন জায়গায় ছেলেদের প্রায়ই কোন যত্ন হয় না!

রিভাল কহিলেন,—ত্যাখো, আমার মাথায় একটা মতলব আসছে।

—কি ?

—আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার কাছে দুজনেই ওরা একটু-আধটু পড়ুক !

—বেশ তো ! ডাক্তার-গৃহিণী সম্মত হইলেন।

পরদিন জাক ও সেসিলের পাঠের ব্যবস্থা হইল। বিভাল-গৃহিণীর কাছে উভয়ে পড়িতে আরম্ভ করিল। এমন আদর, এতখানি যত্ন করিয়া জাককে পূর্ব্বে কেহ কখনও পড়ায় নাই ! পড়িতে বসিলে সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইত। পঠিত বিষয় মনে থাকিত না—পূর্ব্বে এ দোষের জন্য তিরস্কার ও প্রহারের অন্ত ছিল না। প্রহার খাইয়া সে আরও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত; ভয়ে তাহার স্বর ফুটিত না ! তিরস্কারের তীব্রতায় সব কেমন গোল হইয়া যাইত—সহজ কথা মনে থাকিত না ! এখানে বিভাল-গৃহিণীর সস্নেহ অধ্যাপনার গুণে জাকের পড়াশুনা শুধু যে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা নহে; পড়াশুনার দিকে মনটা ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

বিভালের সহানুভূতি-পূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারে সমস্ত গ্রামের লোক তাঁহার বশীভূত ছিল। জ্ঞান হওয়া অবধি জাক জীবনে কখনও বাহিরে লোকের মুখে এমন মিষ্ট কথা শুনে নাই, সুতরাং সে যে বিভালের একান্ত বশীভূত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

বৃদ্ধ ডাক্তার যখন আপনার ছোট টমটমখানি জুতিয়া রোগি-দর্শনে বাহির হইতেন, তখন জাক ও সেসিল তাঁহার সঙ্গে যাইত। পথে পাখী দেখিয়া সেসিল বলিত,—ওটা কি পাখী, বলো তো জাক,—জাক সঠিক উত্তর দিতে পারিত না। সেসিল হাসিয়া তাহার ভুল শুধরাইয়া দিত। পথের পাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কে যেন সবুজ শস্পের শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে,—বায়ুস্পর্শে শস্যশীর্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইত। দেখিলে মনে হয়, মাঠের গা বেড়িয়া যেন একটা সবুজ ঢেউ ছুটিয়াছে। তাহা দেখিয়া সেসিল জিজ্ঞাসা করিত, —কি গাছ বল দেখি,—জাক,—ধান, না যব না গম ? জাক আবার ভুল করিয়া বসিত,—সেসিল হাসিয়া সে ভুল ঠিক করিয়া দিত।

এমনই নিত্য সাহচর্য্যে, শৈশবের সরল হাসি-খেলার মধ্য দিয়া বালক-বালিকা পরস্পরে পরস্পরকে প্রাণ ঢালিয়া ভালো বাসিতেছিল। শৈশবের সে ভালবাসা যেমন অনাবিল, তেমনই স্নিগ্ধ, সুন্দর !

বৃদ্ধ রোগীর বাড়ী রোগী দেখিতে যান্—বালক-বালিকা গাড়ীতে বসিয়া থাকে। বৃদ্ধেরই অনুগত পল্লীর দুই-চারি জন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে কত ফুল-ফল দিয়া যাইত—বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। বৃদ্ধের গাড়ী কোন পল্লীতে আসিলে সহজে সে স্থান হইতে মুক্তি পাইত না। রাজ্যের লোক আসিয়া সেখানে জমায়েৎ হইত। বুঝি, কোন সম্রাট আসিলেও তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক ছুটিয়া ঘরের বাহির হয় না ! ইহাদের সকলেই প্রায় নানা অনুযোগ-আব্দার লইয়া আসিত। কেহ বলিত,—আমার মেয়েটি আর কত-দিনে সেরে উঠবে ডাক্তার ? কেহ বলিত,—ছেলেটি আমার আজ একটু ভালো আছে, কাশি কম—সেই ওষুধটাই কি আবার দেবো ? তা হলে বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। আবার কেহ-বা বলিত, যে গুঁড়োটা দিয়েছেন, সেটা খাওয়াতে হবে—না, গায়ে ঘসবার জন্য ?

ডাক্তার সকলের কথা আগ্রহের সহিত শুনিতেন, সকলের ঔষধ-পথ্যাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন, সকলকেই হাসিমুখে আশ্বাস দিতেন,—কেহ কখনও নিরাশ হইয়া ফিরিত না। পরে ডাক্তার গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে দুই হাত তুলিয়া সকলে বলিত, বেঁচে থাকো বাবা, দীন-দুঃখীর মা-বাপ, তুমি—ভগবান তোমার ভালো করুন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া জাকের রুদ্ধ মনের দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল। কাজেই লেখাপড়ায় তাহার অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। গৃহে মাতার নিকট সে বহির পাতা খুলিত না—বিভালের গৃহে পড়াশুনার কথা মাকে সে কোন দিন জানিতে দেয় নাই ! আপন ইচ্ছা-মত সে গৃহে আসিত, আর্শার কাছ হইতে খাবার চাহিয়া আহার করিত,—আবার কখন্ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না।

ইতিমধ্যে আবার একদিন আরাম-কুঞ্জে ভোজের ধূম বাধিল। বাড়ী সাজানো দেখিয়া আশ-পাশের লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। আবার তারা সব আসচে রে !

শার্লৎ আসিয়া আর্শাকে কহিল,—শীঘ্র নাও আর্শা, অনেক ভদ্রলোক আসছেন আজ রাত্রে। আর একটা খরগোস মারো। একটা ? না, না, দুটো—কতকগুলো মমলেট তৈরি করা চাই।

বৈকালে আবার লাবাস্যাঁদ্র্ হারজের দল আসিয়া দেখা দিল। আর্জান্ত বিজয়-গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। রীতি-মত বড়মানুষি কেতায় সকলকে সে অভ্যর্থনা করিল। হারজের দল জমক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

তার পর প্রতি সপ্তাহে এমন ভোজ, এমনই সমা-রোহ চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে নব সুখ, নব আনন্দ, নূতন লোক। তবে—লাবাস্যাঁদ্র্ ও হারজ প্রতি ভোজেই উপস্থিত থাকিত। তাহাদের নিমন্ত্রণ কখনও বাদ পড়িত না।

ডাক্তার রিভাল প্রথমটা এই ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া ভাবিতেন, এত কেন ? পরে তাঁহার রীতিমত বিরক্তি ধরিল ! একদিন তিনি কহিলেন,—ছেলেটাকে দেখবার

এদিকে এতটুকু অবসর হয় না, দিবারাত্রি শুধু আমোদ আর মজলিস্ চলেছে!

অভ্যাগতের দল একদিন জাককে দেখিয়া কহিল,—ছেলেটির পড়া শোনা হচ্ছে কেমন? শার্লতের মন পাইবার আশায় একজন জাককে দুই-চারিটা বানান ও গণিতের সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। জাক যখন তাহার নির্ভুল উত্তর প্রদান করিল, তখন আর্জান্তও বিস্মিত হইয়া গেল। ডাক্তার রিভাল কহিলেন, দ্যাখো, ছেলেকে আমি কেমন শিখিয়েছি, এই ক'দিনে। কথাটা বলিয়া ইদার মুখের পানে ডাক্তার একবার চাহিলেন। ইদার মুখে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার একটা রেখা পড়িল, ডাক্তার তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিলেন।

দুই-চারিজন তারিফ করিয়া কহিল,—বাঃ, বেশ ছেলেটি? চমৎকার বুদ্ধি-শুদ্ধি!

লাবাস্ত্যাঁদ্র কহিল,—বাগানে ঐ বাদাম গাছটার ডালে একটা কি কল খাটানো দেখলুম। ওটা কি?

জাক তাড়াতাড়ি বলিল,—ও, ওটা কাঠ-বিড়ালী ধরবার জন্য।

লাবাস্ত্যাঁদ্র কহিল,—বটে! কে তৈরি করলে?

—আমি। বিজয়-উল্লাসে জাকের চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

সকলে বলিয়া উঠিল,—এ্যাঁ, তুমি! চমৎকার হয়েছে তো! খাশা মাথা!

লাবাস্ত্যাঁদ্র কহিল,—তাইত! ওকে তা হলে কল-কারখানার কাজ শেখাও হে, কল-কারখানার কাজ শেখাও। কারিকুরীতে ওর বেশ মাথা খেলবে।

ডাক্তার রিভাল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর মজলিস্ ভাঙ্গিলে ধীরে ধীরে তিনি প্রস্থান করিলেন।

আর্জান্ত কহিল,—ঠিক! আমি আজ এক বছর ওর ভাবগতিক লক্ষ্য কচ্ছি—পড়া-শোনায় মোটে ওকে বাধ্য করিনি। ভাবছিলুম, কোন্ দিকে ওর ঝোঁক আছে, দেখি। হাঁ, ঠিক বলেছ তুমি, লাবাস্ত্যাঁদ্র, কল-কব্জা তৈরি করায় ওর মাথা বেশ খেলবে বটে!

তখন কারখানার মিস্ত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোচনায় লাবাস্ত্যাঁদ্রের দল অনেকখানি সময় ও কথা ব্যয় করিয়া ফেলিল। সমস্ত পৃথিবী যে আর পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এই সকল মিস্ত্রীর অনুগ্রহের উপর আপনার অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য নির্ভর করিবে, তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে! যদি সমগ্র পৃথিবীর আর্থিক উন্নতি হয় তো সে উন্নতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য বা ধর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইবে না, সে উন্নতির মূলে জানিয়ো, কার-খানার মিস্ত্রীসমূহের অদ্ভুত কৌশল ও অপূর্ব্ব মস্তিষ্ক-বল!

আর্জান্ত কহিল,—আমি ওকে কারখানায় কাজ শিখতে পাঠাবো বলেই ঠিক করেছি তো। তবে তেমন ভালো কারখানার সন্ধান পাচ্ছি না, এইজন্যই পাঠানো হচ্ছে না!

লাবাস্ত্যাঁদ্র কহিল, তাহলে ছেলেটির উন্নতি আর দেখতে হয় না। এদিকে ওর বেশ প্রতিভা আছে।

আর্জান্ত কহিল,—এই। প্রতিভা আছে! প্রতিভা! প্রতিভা কি সকলের এক রকম হয়? না, এক বিষয়ে খেলে? কারও সাহিত্যে, কারও বিজ্ঞানে, কারও বা এই সবে প্রতিভা ফুটে ওঠে!

লাবাস্ত্যাঁদ্র কহিল,—তবে ওকে কারখানাতেই দাও। আমার জানা বেশ ভালো কারখানা আছে। বলো যদি তো আমি সন্ধান নিতে পারি।

—বেশ—আর্জান্ত কহিল,—তুমি আজই সেখানে চিঠি লিখে দাও, সন্ধান নাও। আর দেরী করা ঠিক নয়। যত শীঘ্র কাজে ঢোকানো যায়, ততই ওর ভালো!

শার্লৎ কহিল,—কিন্তু ওর শরীর তেমন মজবুত নয়। একে ভারী রোগা ছেলে—তার উপর এই বয়স! সেখানকার কষ্ট সহ্য করতে পারবে কেন?

হারুজ কহিল, খুব সহ্য হবে! কেন? ওর শরীর তো মন্দ নয়!

আর্জান্ত কহিল, মেয়েদের—ঐ তো দোষ! ভারী অবুঝ সব! কিসে কার ভাল হবে, তা বুঝবে না—ছেলেদের কোলে বসিয়ে রেখে দেখে শুধু—কাজের জন্য ছেড়ে দেবে না! তোমার চেয়ে ডাক্তার হারুজ শরীর-সম্বন্ধে ঢের বেশী বোঝেন, নিশ্চয়। তোমরা শুধু মানুষের উন্নতির পথে বাধা দাও বই তো নয়!

অপ্রতিভ হইয়া শার্লৎ শুধু জাকের পানে চাহিয়া দেখিল! এই বালক,—এত গুরু শ্রম, তাহার শরীরে সহিবে কেন? তাহার চোখে জল আসিল। কিন্তু কি করিবে সে? এতগুলা লোকের তর্ক-জালের সম্মুখে তাহার কাতর অশ্রু টিঁকিবে কেন? সে যে অসহায়, নিতান্ত অসহায়!

জাক মার সকাতর নয়নের দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় প্রাণ তাহার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মনটাকে সুস্থির করিবার আশায় জাক রিভালের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

'এ জীবন নহেক স্বপন'

ইহার কয় দিন পরে সহসা এক সন্ধ্যায় কবি আর্জান্তর নিকট জাকের ডাক পড়িল। সে আসিল। শার্লৎ তখন পাশে বসিয়া একখানা কাগজে কি লিখিতে-ছিল। আর্জান্ত বলিল,—জাক, তোমাকে অনেকবার

আমি বলেছি, এ জীবন ধূলাখেলা নয়। কবিও কি বলেন, জানো, 'এ জীবন নহেক স্বপন!' জীবনটা শুধু সংগ্রাম, শুধু যুদ্ধ! দেখচো তো আমাকে,—কি রকম যুদ্ধ করচি! কখনও একটু কাবু হয়েচি? কখনও না। জয়ের সম্ভাবনা এবার দেখা দিয়েছে। এখন তোমার পালা। তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নও—বড় হয়েচো!

জাকের বয়স এখন বারো বৎসর মাত্র। হতভাগা বালক!

আর্জাস্ত বলিতে লাগিল,—এখন তুমি মানুষ হয়েছ। শুধু মাথায় আর চেহারাতেই যে বেড়েচো, তা নয়, তোমার ভিতরটাও বেড়েছে—এটা কাজ-কর্ম্মেও তোমায় এখন দেখাতে হবে! এতদিন তোমার মনকে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠবার জন্য আমি যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি! প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে তুমি শিক্ষা পাবে বলেই আমি পড়াশুনার জন্য একটুও ধরা-বাঁধা করিনি। কঠিন মেনে চললে মানুষের মন স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি পায় না, কাজেই তার গড়ে ওঠবার অবকাশও তেমন ঘটে না, আমি জানি। বুঝতে পাচ্ছ, এইজন্যই শুধু তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম আমি—কোন কথা কইনি, তোমাকে কোন বাধা দিইনি! এখন তুমি বেশ গড়ে উঠেছ—ঠিক আমার মনের মত দাঁড়িয়েছ। কর্ম্মক্ষেত্রে ঢোকবার পক্ষে এইটিই হচ্ছে তোমার এখন উপযুক্ত সময়।

ডাক্তার হার্‌স্ত ও লাবাস্যাঁন্দ্র আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। একখানা চিঠি বাহির করিয়া লাবাস্যাঁন্দ্র কহিল,—এই ছাখো, আমার সেই বন্ধু কদিক চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে যে, জাককে তার কারখানায় কাজ শেখাবার জন্য সে নিতে পারে, শুধু আমার খাতিরে! ওরা কি বাইরের লোককে কাজ শেখাতে চায়, সহজে? শুধু আমার খাতিরেই সে জাককে নেবে, লিখেছে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই জাককে তা হলে অ্যাঁদ্রেয় যেতে হয়! সেখানেই তার প্রকাণ্ড কারখানা কি না!

জাকের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সকলের অর্থ কি? তাহার মনে পড়িল, শৈশবে সে একবার দেখিয়াছিল, তাহারই পালিত ক্ষুদ্র একটি মেষ-শিশুকে কশাইরা যখন কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, তখন সেই অসহায় মেষ-শিশু আপন মাতার পানে কি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—নিষ্ঠুর কশাই কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য না করিয়া অকাতর চিত্তে মেষ ও শাবকের মধ্যে দারুণ ব্যবধান ঘটাইয়া দিল। জাকের মনে হইল, আজ তাহারও অবস্থা, সেই মেষ-শাবকেরই মত! তেমনই অসহায়, সে তেমনই নিরুপায়!

মার বুক হইতে ছিনাইয়া কোথায় তাহাকে ইহারা লইয়া যাইবে? জাক মার দিকে চাহিল। শার্লৎ লেখা বন্ধ রাখিয়া কখন গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছে, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। মার দৃষ্টিটুকু বাহিরের দিকে নিবদ্ধ,—যেন একান্ত আগ্রহে কি মহা-দর্শনীয় পদার্থই সে লক্ষ্য করিতেছে! জাক বুঝিল, এ চাহিয়া থাকার আর কোন অর্থ নাই, শুধু অন্তরের বিপুল বেদনাকে কোনমতে চাপিয়া রাখিবার জন্য এ একটা ছল! আহা, জগতে কেহ যদি আপনার জন থাকে তো সে মা। কোথাও যদি নিরাপদ স্থান থাকে তো সে মায়ের কোল! সেই মায়ের কাছ হইতে ইহারা তাহাকে কাড়িয়া লইবে? সে কি আর তাহা হইলে একদণ্ড বাঁচিবে? না, না, সে যাইবে না! কখনও না! যাইতে পারিবে না সে!

আর্জাস্ত কহিল,—শুনছ জাক, তোমার বরাত ভালো, তাই কদিকদের কারখানায় তুমি ঢুকতে পাচ্ছ! চার বছর পরে তুমি দেখবে, কি মস্ত পাকা কারিকর তুমি হয়ে উঠেচ। কি মহান্, উচ্চ পদ! এই দাসত্ব আর পরনির্ভরতার যুগে তুমি স্বাধীন, আত্ম-বলে-বলীয়ান্ এক মহিমময় পুরুষ হবে। শেষ দিকটা বলিবার সময় আর্জাস্তর চোখ দুটা আবেশে মুদিয়া আসিল!

কারিকর! কারখানা! এ সব কি কথা? বাজের হুঙ্কারেও বুঝি বালক এতখানি কাঁপিত না। পারিসে থাকিতে সে কত কারিকর দেখিয়াছে,—কালি-ঝুলি-মাখা যত কুৎসিত লোক, তৈলসিক্ত ছিন্ন জামা গায়ে দিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলিয়াছে। সুরা-জড়িত কর্কশ তাহাদের চীৎকারে চারিধার মুখরিত! কি কদর্য্য বীভৎস লোক সব! জাক তাহাদেরই মত সেই লক্ষ্মীছাড়া কারিকর হইবে। কি ভয়ানক কথা!

লাবাস্যাঁন্দ্র কহিল,—সাত দিনের মধ্যেই তাহলে সেখানে যেতে হবে। এর ভিতর সব গোছ-গাছ করো, আমিই না হয় গিয়ে রেখে আসবো। বলে-কয়ে আসতে হবে তো অমনি—যেন একটু বিশেষ যত্ন করে শেখায়!

বালক সভয়ে প্রশ্ন করিল,—আমাকে যেতে হবে?

আর্জাস্ত কহিল,—হাঁ! যেতে হবে বৈ কি! আর সাত দিনের মধ্যেই!

জাকের চোখের সম্মুখে সমস্ত আলো মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল! আর এক দণ্ড সে সেখানে দাঁড়াইল না—একেবারে ছুটিয়া ডাক্তার রিভালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

রিভাল কহিলেন,—কি? ব্যাপার কি, জাক? এমন করে ছুটে আসছ যে! কি হয়েছে? হাঁপাচ্ছ যে তুমি। ইঃ, বসো, বসো! ছি, পড়ে যেতে যদি, তাহলে কি হতো বল দেখি! এমন করেও ছোটে!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দম লইয়া জাক রিভালের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। আর্জাস্তর উপদেশ, লাবাস্যাঁন্দ্রের অনুগ্রহ, কোন কথা সে গোপন রাখিল না।

শুনিয়া রিভাল কহিলেন,—কারিকর হবে তুমি! ওরা

তোমায় কারখানায় পাঠাবে? এই বুঝি শেষ মতলব করেছে! সেদিন একটা কথা শুনেছিলুম বটে,—আমি ভেবেছিলুম, তামাসা! তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎকে এমনভাবে ওরা মাটি করে দেবে,—ক'জনে মিলে? এঁ্যা? না, কখনও না! আমি তা হতে দেবো না। এখনই গিয়ে এ বিষয়ে আমি কথা কইবো, জাক! কারিকর হবে তুমি? কারখানার ছোটলোক কারিকর! এই চেহারা, এই বুদ্ধি নিয়ে? না, না, কখনও তা হবে না।

ডাক্তার আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আরাম-কুঞ্জে ছুটিলেন। পথে ডাক্তারের গতির ক্ষিপ্রতা দেখিয়া পথিকের দল ভাবিল, কাহারও বুঝি কোন কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া ডাক্তার ছুটিয়া দেখিতে চলিয়াছেন, তাই এখন আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর নাই!

রিভাল আসিয়া যখন আর্জান্তঁর কক্ষে উপস্থিত হইলেন, তখনও কবি-সভার মজলিস ভাঙ্গে নাই।

রিভাল কহিলেন,—ম্যাসিয়ো আর্জান্তঁ, একটা কথা আমি জানতে চাই—

আর্জান্তঁ কহিল,—বসো, বসো ডাক্তার। হাঁপাচ্ছ যে একেবারে! একটু চা খাবে? আর্শা, চা—

—না, না, চা নয়। কিছু খাবো না। খেতে আসিনি আমি। শোনো, তোমরা না কি ঐ ছুধের ছেলেটাকে কারখানায় ছোটলোকগুলোর সঙ্গে ইতর কাজ শেখাবার জন্য পাঠাচ্ছ? ভদ্রলোকের ছেলের যোগ্য কি সে সব কাজ, না, সে স্থান? যত কুৎসিত সঙ্গ, লক্ষ্মীছাড়া কাজ! ছি, ছি, এমন চমৎকার বুদ্ধি-শুদ্ধি ওর, সে সব এমন করে নষ্ট করে দিতে হয়?

আর্জান্তঁ কহিল,—কেন, এমন কিছু অভদ্র কাজ তো নয়। এঁরা সব জানেন—

—জানেন? কিছু জানেন না—না হয় জেনেও গোপন করেছেন!

ডাক্তারের স্বরে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। চট্ করিয়া কেহ উত্তর দিতে পারিল না। শার্লৎ তখন কথা কহিল; সে কহিল,—কিন্তু আর্জান্তঁ, আসল কথা হচ্ছে কি—জাক—

—শার্লৎ! আর্জান্তঁর স্বরের তীব্রতায় ইদা চুপ করিয়া গেল।

আর্জান্তঁ কহিল—বলো ডাক্তার,কি বলবে তুমি, বল।

রিভাল কহিলেন,—জাক আমায় বলছিল, তোমরা না কি ওকে কারখানায় পাঠাতে চাও,—কারিকর হতে! যত কামারের কাজ, ছোট লোকের কাজ, এই সব শেখাবার জন্য! এ কথা কি সত্য?

—হাঁ!

—সত্য! কি বলচো, আর্জান্তঁ! ওর বংশ, ওর শিক্ষা, এ সব কি ওকে কামারের কাজের যোগ্য করে গড়েছে? এমন বুদ্ধি—আরও বিশেষ ওর স্বাস্থ্য! ওর শরীরে এ-সব সহ্য হবে কেন?

ডাক্তার হার্‌জ্ কহিল,—কেন, শরীর ওর বেশ মজবুত!

রিভাল তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। পরে ইদার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—তুমি শোনো, তুমি মা, তোমাকে বলি। তোমার ছেলের শরীর তেমন মজবুত নয়। সেখানে বড় কষ্ট। সে কষ্ট ওর সহ্য হবে না। ও মারা যাবে—এ আমি বলে রাখছি! শরীরের কষ্ট যদি ছেড়ে দি, তা হলেও মন। মনের কষ্ট—ভদ্রলোকের ছেলে, সেই সব ছোট লোকের সঙ্গে বেড়াতে হবে, তাদের দলে মিশে কাজ করতে হবে—এতে ওর মন একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তা ছাড়া সেই সংসর্গ থেকে তুমি মা তোমার এ জাককে আর ফিরে পাবে না। এ নিশ্চয় জেনো। কিছু দিন তাদের সঙ্গে বাস করলেই জাক যা হবে, তা দেখে, তুমি ত মা হচ্ছ, লজ্জায়, ঘৃণায়, তুমিও তোমার ছেলের দিকে চাইতে পারবে না। শক্ত হাত, কালো কর্কশ চেহারা, মুখের কথা নিতান্ত অভদ্র, মনের গতি কদর্য্য, নীচ—এ সব নিয়ে তার মার কাছে এসেও সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না!

আর্জান্তঁ ক্রোধে ফুলিতেছিল। সে কহিল,—ডাক্তার, এ সব অনধিকার চর্চ্চা করবার তোমার কোন দরকার দেখি না আমি। আমার যা খুশী, আমি তাই করবো। আমার বাড়ীতে আমিই কর্ত্তা। আর কারও কর্ত্তামি এখানে আমি সহ্য করবো না, তার প্রশ্রয়ও দেবো না। তোমার পরামর্শ আমি চাইতে যাইনি, তবে তোমার এ মাথা-ব্যথা কেন?

রিভাল তীব্র স্বরে কহিলেন,—তোমায় আমি কোন কথা বলতে আসিনি, আর্জান্তঁ! জাক তোমার কে? কেউ নয়! তার ভালে-মন্দে তোমার কি এসে-যায়? কিছু না! আমি তার মাকে বোঝাতে এসেছি, জাকের মাকে। তাকে শুধু সাবধান করে দিচ্ছি যে, রাক্ষসদের মতে সায় দিয়ে ছেলেটাকে যেন জবাই না করে! সে মা, মাকে আমি তার ছেলে হারাতে দেবো না—তাই তার কাছে এ কথা আমি বলতে এসেছি, তোমাকে নয়। তুমি চুপ করে থাকো।

আর্জান্তঁ কহিল,—বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে এসে আমারই দিকে চেয়ে তুমি চোখ রাঙাও! ডাক্তার, এ সব আমি সহ্য করবো না। এখনই এই দণ্ডে তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।...যাও।

—চলে যাবো? তাই যাবো, আর্জান্ত-সাহেব, এখানে আমি থাকতে আসিনি। ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে একবার আর্জান্তের পানে চাহিলেন, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—চলেই যাচ্ছি—তবে যাবার আগে জাকের মাকে আর একবার আমি বলে যাই,—সাবধান মা, এমনভাবে ছেলেটার সর্ব্বনাশ করো না, করো না! ওর এমন বুদ্ধি, এই বয়স, এমন করে তার সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়ো না।

কথাটা শেষ করিয়া রিভাল গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন ফল হইল না। জিনিষ-পত্র গুছানো চলিতে লাগিল। জাককে যাইতে হইবে। যে দিন তাহার যাইবার দিন স্থির হইল, তাহার পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় জাক আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, করুণ সুরে কহিল,—মা, আমি কারখানায় যাবো না, যাবো না মা। কারিকর হতে পারবো না আমি! আমায় এমন করে তাড়িয়ে দিয়ো না, মা। আমি তোমাদের খেতেও চাই না, পরতেও চাই না—শুধু একটি কোণে পড়ে থাকবো। তাতেও কি তোমরা—? জাকের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

—জাক—ইদার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আর কোন কথা বাহির হইল না।

—মা—। বলিয়া জাক কাঁদিয়া ফেলিল।

ইদা কহিল,—শোন, জাক। ছি,—কথার অবাধ্য হয়ো না, বাবা। আমি কি সাধ করে তোমাকে সেখানে পাঠাচ্ছি? তুমি মানুষ না হলে আমার যে একদণ্ড সোয়াস্তি নেই, জাক। কেন, কারিকরের কাজ মন্দ কি?

—তবে তুমিও আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও, মা?

—ও কি কথা, জাক? বালাই! আমি তোমায় তাড়িয়ে দেবো! কেন? তা কি সম্ভব? আমি না তোমার মা? তুমি কাজ শিখে মানুষ হও, তোমারই ভালো হবে। তুমি জানো না, জাক,—এখনও সব কথা জানবার তোমার বয়স হয়নি—তুমি ছেলেমানুষ! এর পর এক দিন সব বুঝতে পারবে তুমি! কি দুঃখে তোমাকে পাঠাচ্ছি, তখন বুঝবে। তোমার জন্ম-কথা—সে এক গূঢ় রহস্যে ঢাকা! বড় হলে সব জানতে পারবে! আমার যে কি দুঃখ, সে দিন তুমি বুঝবে! কেন তোমাকে প্রাণ ধরে আমার কাছ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছি,—আমার প্রাণ কি রকম কাঁদছে—সেই দিন তুমি জানতে পারবে, জাক! আজ আর কিছু বলবো না, বুঝবে না তুমি। তবে শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, যত দিন না তুমি মানুষ হতে পারছ, যত দিন না তুমি আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছ—তত দিন আমার এ কষ্ট কিছুতে যাবে না! আমার সুখের জন্য কি এ কষ্টটুকু তুমি সহ্য করবে না জাক? তুমি মানুষ হলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। কারখানায় গেলে চার বছরেই তুমি মানুষ হতে পারবে, কিন্তু লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে সে অনেক দেরী! এই চার বছর আমার মুখ চেয়ে—তোমার মার দুঃখ ঘোচাবে, শুধু এই ভেবে তুমি কাটিয়ে দিতে পারবে না? ইদার চোখে জল আসিল।

জাক মার বুকে মুখ রাখিয়া বলিল,—না মা, কেঁদো না, তুমি! কেঁদো না, মা। তোমার কষ্ট যাবে? কিন্তু বলো মা, এর পর আমায় দেখে তুমি ঘৃণা করবে না—এমনই আদর করেই আমাকে বুকে টেনে নেবে? বলো—এমনই ভালোবাসবে?

জাক—জাক—তোকে আমি ভালোবাসব না! এ তুই কি বলছিস? তুই ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কে আছে, জাক? ইদা জাককে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল!

অবশেষে যাইবার দিন আসিল। যাইবার পূর্ব্বে জাক রিভালের সহিত একবার দেখা করিতে গেল। এ কয় দিন সে দিকে সে মোটে পা দেয় নাই। মা বারণ করিয়া দিয়াছিল। জাকও মার নিষেধ অমান্য করে নাই।

জাক বলিল,—দাদামশায়, আমি যাচ্ছি!

রিভাল কহিলেন,—যাচ্ছ, দাদা! ওরা শুনলে না? কিছুতে শুনলে না! তোমাকে যেতেই হলো! কি করবে, বলো, দাদা? তবে এসো, ভাই। কিন্তু একটা জিনিস তোমাকে আমি দিচ্ছি—সেটি যত্নে রেখো! তোমার পড়বার জন্য এক বাক্স বই আমি বেছে রেখেছি, জাক! জেনো, এমন বন্ধু জগতে আর কেউ নেই! এমন সুখ কেউ দিতে পারে না। দুঃখে-শোকে এই বইয়ের মধ্য থেকে তুমি আশ্চর্য্য সান্ত্বনা পাবে। সে সান্ত্বনা মানুষকে মানুষ দিতে পারে না, জাক! এই বইগুলিকে যত্নে রেখো, পড়ো। সেখানকার নীচ লোকগুলোর সঙ্গে মিশো না—তাদের কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদেও কখন যোগ দিয়ো না। যেটুকু অবসর পাবে, তাতে বইগুলি পড়ো। যদি সব বুঝতে না পারো, ক্ষতি নেই—তবু পড়ো। পড়তে পড়তে এক দিন সব বুঝতে পারবে, জাক! কেমন, বলো, পড়বে?

—পড়বো, দাদামশায়।

—ঐ যে বাক্স—একেবারে ভরা আছে। এই নাও চাবি। এগুলি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি লোক দিয়ে বাক্সটা তোমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। হাঁ, সেসিলের সঙ্গে যাবার আগে তোমার একবার দেখা হলো না! সে তার দিদিমার সঙ্গে পাহাড় দেখতে গেছে, তা আমি তাকে সব বলবো'খন!

—তবে আসি, দাদামশায়। সেসিলকে বলো, দেখা হলো না বলে সে যেন রাগ না করে!

সাগ্রহে রিভাল বালককে আলিঙ্গন করিলেন। বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে বেদনা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল! এ নিষ্ঠুর দারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখে বুক তাঁহার তোলপাড় করিতেছিল। জাকের ললাটে চুম্বন করিয়া রিভাল কহিলেন,—তা হলে এসো, দাদা।

জাক চলিয়া গেল। আরাম-কুঞ্জের সম্মুখে তখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিনিস-পত্র বোঝাই হইতেছে। জাক মার কাছে গেল। ইদা জাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। এমন সময় বাহির হইতে ডাক পড়িল,—এসো, জাক। দেরী কিসের?

বাহিরে গাড়ীর নিকট লাবাসাঁন্দ্র দাঁড়াইয়াছিল। জাক বাহিরে আসিল। ইদা লাবাসাঁন্দ্রকে কহিল,—তাদের বলে দেবেন, জাককে যেন তারা খুব যত্ন করে! নেহাৎ ছেলেমানুষ ও, কিছু বোঝে না!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! সে কথা আবার বলে দিতে হবে, আমাকে?

—জাক—

—মা—

শার্লৎ কোনমতে আর উথলিত অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না! জাকের চোখেও একবিন্দু অশ্রু ছিল না—আপনাকে সে কঠিন দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল। মার দুঃখ ঘুচাইতে চলিয়াছে সে, ইহাতে কি গৌরব, কি সুখ! কাঁদিবে কেন? এ বিচ্ছেদ-কষ্ট ত ক্ষণিকের! তারপর? সে মানুষ হইয়া ফিরিলে মার যে আর কোন কষ্ট থাকিবে না! ইহাতে কি তাহার ক্রন্দন শোভা পায়! জাকের মনে একটা গর্ব্ব হইতেছিল—মার জন্য সে আজ আপনাকে বলি দিতে চলিয়াছে! ধন্য সে। সার্থক তাহার জীবন!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইদা কহিল,—জাক, চিঠি লিখো, আমাকে।

মোড় বাঁকিয়া গাড়ী যখন অন্য পথে পড়িল, তখন জাক পিছনে ফিরিয়া দেখিল, দূরে ঐ লতা-গুল্মের অন্তরালে তাহাদের বাটীর জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক নারী! জাক নিমেষে তাহাকে চিনিল—সে তাহার মা ইদা।

তীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অ্যাঁদ্রে

অদূরে কলকারখানার গগনস্পর্শী চূড়া দেখিয়া উচ্ছ্বাসভরে দুই বাহু বিস্তার করিয়া দিয়া লাবাসাঁন্দ্র জাককে ডাকিয়া কহিল,—দেখেচো জাক—চারিধার কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

উভয়ে তখন নৌকারোহণে লয়ার নদী পার হইতেছিল। ল্যাবাসাঁন্দ্রের স্বরে কৃত্রিমতা থাকিলেও সম্মুখেই অ্যাঁদ্রের কলকারখানা একটা অস্ফুট কলরবের সহিত জাকের চক্ষে এক অপরূপ নূতন জগৎ ফুটাইয়া তুলিল!

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িতেছে—তাহারই ক্ষীণ রশ্মি তরল রক্ত-ধারার মত নদী-বক্ষে ঝরিয়া পড়িয়াছে! বাতাসে একটা কাঁপন লাগিয়াছে! সেই কম্পিত বায়ুতরঙ্গের অন্তরালে সম্মুখস্থ নগরীকে কুহেলিকাচ্ছন্ন মায়াপুরীর মত মনে হইতেছিল।

নদী-বক্ষে অসংখ্য ষ্টীমার, নৌকা। কোন ষ্টীমার ময়দার বস্তা বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তীরের নিকট জেটিতে বাঁধা কোন ষ্টীমারে লবণ বোঝাই হইতেছে, পুরুষ ও রমণী কুলিদিগের বিচিত্র পোষাকে লবণের টুকরা লাগিয়াছে, তাহাতে রৌদ্র-কিরণ পড়ায় সেগুলি চুমকির মত ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। বাঁশী বাজাইয়া জাকের নৌকার পাশ দিয়া কত ষ্টীমার চলিয়া গেল! চারিধারেই একটা ব্যস্ততার সাড়া!

জাক কহিল,—আর কতদূরে—অ্যাঁদ্রে?

এই তো অ্যাঁদ্রে।

নৌকা তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অস্পষ্ট তীর স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল! জাক দেখিল, সম্মুখে বড় বড় বাড়ী, তাহাতে চিমনির সারি। চিমনিগুলা হইতে কয়লার ধূম নির্গত হইয়া সারা আকাশকে কালো করিয়া তুলিয়াছে। লোহা-পেটার শব্দ, কলের ঘড়ঘড়ানি, লোকের চীৎকার, ষ্টীমারের বাঁশী, সমস্ত মিলিয়া একটা বিরাট কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে!

ক্রমে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। ঘাটে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাবাসাঁন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল,—আরে, রুদিক যে!

—এই যে, লাবাসাঁন্দ্র, এসেচো!

লাবাসাঁন্দ্র ও রুদিক—দুই ভাই। দুজনের মুখে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও রুদিকের দেহ পরুষ ও বলিষ্ঠ, লাবাসাঁন্দ্র সুশ্রী না হইলেও তাহার অবয়ব কতকটা কোমল ধরণের।

লাবাস্যাঁন্দ্র কহিল,—বাড়ীর খপর কি? ক্লারিস্, জেনেদ, সব ভালো আছে?

—সবাই ভাল আছে। এটি বুঝি সেই ছোকরা—কাজ শিখতে এসেছে? এর শরীর তেমন শক্ত নয় তো!

কে বললে, নয়? দেখতে এমন রোগা হলে কি হয়— প্যারিব ডাক্তাররা অবধি বলেছে, শরীর ওর ভারী মজবুত!

—তা হলেই ভালো! নইলে আমাদের যে-রকম কাজকর্ম্ম—তাতে শরীর বেশ মজবুত না হলে চলে না মোটে! এসো এখন। তোমার নাম কি, বাবা?

জাক কহিল,—আমার নাম জাক!

"জাক্! বাঃ, বেশ নাম! এস জাক, এস লাবাস্যাঁন্দ্র, এখনই কারখানায় গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নি, তারপরে বাড়ী যাওয়া যাবে। পথেই ম্যানেজারের আপিস।

সকলে কারখানার দিকে চলিল। দুই ধারে ছোট, বড়, মাঝারি, নানা আকারের গাছ—তাহারই মধ্য দিয়া সরু পথ। দুই ধারে কারখানা-বাড়ীর বিভিন্ন ঘর, মাঝে মাঝে দূরে-অদূরে কোথাও জানালায় জামা শুকাইতেছে, কোথাও বা শিশুর ক্রন্দন, মাতার ঘুমপাড়ানি গান শুনা যাইতেছে! এগুলা না থাকিলে জাকের মনে হইত, এ যেন এক পরিত্যক্ত জন-মানব-হীন গ্রামপ্রান্তে সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে একটিও লোক চলিতেছিল না।

লাবাস্যাঁন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল,—ঐ যে নিশেন নামানো রয়েছে! ওঃ, আগে এই নামানো নিশেন দেখলে কি ভয়ই না হতো!

জাককে তখন নিশান নামাইয়া রাখার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। কারখানা খুলিবার পর পাঁচ মিনিট অবধি নিশান তোলা থাকে, তারপর নামাইয়া দেওয়া হয়! নিশান নামানো হইলে আর কোন কারিকরকে কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কারিকরদের বিলম্ব হইলেই বিপদ—প্রথম অপরাধে সেদিনকার হাজিরা লওয়া হয় না, পরে আর দুই-একবার কারখানায় আসিতে বিলম্ব ঘটিলে তাহাকে একেবারে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সকলে ইতিমধ্যে কারখানার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাক দেখিল, এ যেন লৌহ-নির্ম্মিত এক বিরাট নগর! কত লোক কাজ করিতেছে। বড় বড় লোহার গম্বুজ পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও একটা এঞ্জিনের চারি ধারে বসিয়া অসংখ্য কারিকর এঞ্জিনের অতিকায় দেহে ছোট বড় পেরেক আঁটিতেছে। মৃত্যুর দূত অসংখ্য পুরাতন মরিচা-ধরা কামানের সারি মেরামতের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে!

এই সকল দেখিয়া জাক কেমন স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি বিরাট ব্যাপার! অমানুষিক কাণ্ড! এ যেন গল্প-শ্রুত সেই কোন্ দৈত্য মহা-সমারোহে নরমেধ-যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য লৌহ-কটাহ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে অসংখ্য কারিকর নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে! জাক দেখিল, একপাশে একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘর—ভিতরে মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে,—যেন দৈত্যের ক্ষুধাতুর লোল রসনা আহার মাগিতেছে! আর সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলা ছোট ছোট দৈত্য কি এক মহা ষড়যন্ত্রে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রুদিক কহিল,—এই ঘরে লোহা পেটা হচ্ছে।

অবশেষে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া রুদিক কহিল,—এইটে হলো ম্যানেজারের ঘর। এসো, যাওয়া যাক—পরে লাবাস্যাঁন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল,—তুমিও আসছ তো?

—আমি! আচ্ছা, চলো—একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করা যাক। সে তো আমায় বলেছিল, আমার দ্বারা কারখানার কাজ-কর্ম্ম চলবে না! এখন শুধু গান গেয়েই আমার অবস্থা কেমন হয়েছে, তাকে একবার দেখিয়ে তারিফ আদায় করতে দোষ কি! গর্ব্বে লাবাস্যাঁন্দ্রের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

তিন জনে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল,—কে—রুদিক। খবর কি?

রুদিক কহিল,—আজ্ঞে, সেই ছেলেটিকে এনেছি—এখানে সে কাজ শিখতে চায়!

—বটে! বলিয়া ম্যানেজার জাকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, পরে কহিল,—এর শরীর তেমন মজবুত দেখছি না। এসো। কি, তুমি কারখানায় কাজ শিখবে? বেশ।

রুদিক কহিল,—না—ও বেশ শক্ত আছে।

লাবাস্যাঁন্দ্র কহিল,—বেশ শক্ত।

ম্যানেজার তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল,—এই যে, তোমায় চিনি-চিনি বোধ হচ্ছে যেন!

লাবাস্যাঁন্দ্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, এবার সে পরিচয় দিবে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে অযোগ্য বলিয়া এখান হইতে যাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলে, এই ছয় বৎসরে শুধু গান গাহিয়া সে কেমন প্রভূত যশের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—প্রতিভা তাহার কেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, একবার চাহিয়া ছাখো! কিন্তু ম্যানেজার তাহার প্রতি আর লক্ষ্য করিল না। লাবাস্যাঁন্দ্রের রাগ হইল। এ কি অবজ্ঞা!

ম্যানেজার রুদিককে কহিল,—তোমার ছাত্রকে তাহলে আজ তুমি নিয়ে যাও, রুদিক! তোমার হাতেই ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, জেনো। ওকে মানুষ করে তোলো। ছেলেটি ভালো ঘরের—চেহারা দেখে বুঝচি।

তারপর তিনজনে গমনোদ্যত হইলে ম্যানেজার রুদিককে আহ্বান করিল। তখন নিভৃতে দুইজনে কি কথা-বার্ত্তা হইল। পরে রুদিক বাহিরে আসিলে লাবার্স্যান্দ্র্ কহিল,—কি বল্লে ম্যানেজার? আমার সম্বন্ধে কোন কথা হলো না কি? যাই বলো, লোকটার কিন্তু ভারী অহঙ্কার!

রুদিক কহিল,—না, না, তোমার কথা কিছু হয়নি। ও আমাদের চার্লির কথা হচ্ছিল। সবাইকে সে ভারী কষ্ট দিচ্ছে কি না! চার্লি রুদিকের খুড়তুতো ভাই, বয়সে রুদিকের চেয়ে অনেক ছোট।

লাবার্স্যান্দ্র্ কহিল,—চার্লি কষ্ট দিচ্ছে! কেন, ব্যাপার কি?

"ব্যাপার গুরুতর। খুড়িমা মারা যাবার পর থেকে সে একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। জুয়া খেলে, মদ খেয়ে বিস্তর দেনা করেছে। ডিজাইনের কাজও বেশ জানে! দু পয়সা তাতে বেশ পায়! ডিজাইনের কাজে এ সহরে ওর তুল্য লোক আর একটিও পাবে না তুমি! তা দু পয়সা আনলে কি হবে—যা পায়, সবই নেশায়-জুয়ায় ফুঁকে দেয়। তাকে শোধরাবার জন্য ম্যানেজার, তবে গে, আমি, আমার স্ত্রী, আমরা কম চেষ্টা করেছি! ও শুধু কাঁদে, আর বলে, আর কোন রকম বদখেয়ালি করবে না—তার পর যেমন আবার মাইনে পাওয়া, অমনি যে-কে সেই! ওর বিস্তর দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি! কিন্তু কাঁহাতক আর পেরে উঠি, বলো? আমার মেয়ে জেনেদ্ রয়েছে, বড় হয়েছে সে—তার বিয়ের জোগাড় দেখতে হবে,—তাতেও বেশ মোটা রকম খরচ আছে তো! এক সময় আমি ভেবেছিলুম, চার্লির সঙ্গেই ওর বিয়ে দেবো, কিন্তু এখন বুঝছি, চার্লিকে দেওয়া যা, মেয়েটার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দেওয়াও তাই! তা তো দিতে পারিনে! তাই আমরা স্থির করেছি—কোনরকমে এ দেশ থেকে এই বদ সঙ্গীগুলোর কাছ থেকে ওকে যদি একবার দূরে পাঠাতে পারি তো ওর শোধরাবার কিছু আশা থাকে। তাই ম্যানেজার আমায় ডেকে বলছিলেন যে, নেভারে তার জন্য একটা ভাল কাজের তিনি জোগাড় করেছেন—উপার্জ্জনও এখানকার চেয়ে ঢের বেশী হবে। আমরা তো নাচার, এখন তুমি একবার ওকে বুঝিয়ো! দেখি—তোমার কথা শুনলে হয়তো শুনতে পারে!

লাবার্স্যান্দ্র্ সগর্ব্বে উত্তর দিল,—নিশ্চয়, বোঝাবো বৈ কি! তার জন্য ভাবনা নেই!

সকলে মিলিয়া রুদিকের গৃহের দিকে চলিল। পথে বিস্তর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লাবার্স্যান্দ্রের পুরাতন সঙ্গীর দল পরিচয় পাইয়া অক্লান্ত কৌতূহল ও আগ্রহ লইয়া তাহার পানে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল—সে ছিল ইহাদের একজন! এখান হইতে ছিটকাইয়া গিয়া শুধু প্রতিভার জোরে কেমন আজ অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। আর তাহারা…?

হায়, বেচারা কারিকরের দল! তাহারা জানে না, লাবার্স্যান্দ্রের স্বরূপ মূল্য কি! তাহার অবস্থা যে এই কারিকরগুলার অবস্থার চেয়ে একটুও ভালো নহে, বরং—যাক্ সে কথা! কারিকরদের অন্ন-চিন্তা নাই—কিন্তু লাবার্স্যান্দ্রের তাহা বিলক্ষণ আছে! তাহার এই পরিচ্ছন্ন কায়েমী পরিচ্ছদের মধ্যে কি ভীষণ দৈন্য ঝি-ঝি করিতেছে, লাবার্স্যান্দ্রের সৌভাগ্য, তাহা লক্ষ্য করিবে, কারিকরগুলার এমন দিব্য দৃষ্টি ছিল না!

লাবার্স্যান্দ্র্ ও জাককে আনিয়া রুদিক আপনার গৃহ-সংলগ্ন ছোট বাগানটিতে বসাইল। বাগানটি ছোট হইলেও পরিচ্ছন্ন! তথায় এক ধারে একটি টেবিল ও তাহার চারি পার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ার। একখানা চেয়ার ধরিয়া এক সুশ্রী তরুণী দাঁড়াইয়াছিল। রুদিক কহিল, —ঐ আমার স্ত্রী ক্লারিস্!

পথেই রুদিক লাবার্স্যান্দ্র্কে বলিয়াছিল, তাহার প্রথমা পত্নী জেনেদের মাতার মৃত্যু হইলে ক্লারিস্কে সে বিবাহ করিয়াছে।

ক্লারিস্ সুন্দরী। তাহার মুখে এমন একটি কমনীয়তা মাখানো আছে, যাহা এই কর্ম্ম ও দৈন্য-পীড়িত পল্লী-সমাজে একান্ত বিরল। জাকের মনে হইল, এই নিরানন্দময় বীভৎস দৈত্য-পুরীর মধ্যে ক্লারিস্ যেন কাহিনী-বর্ণিতা, দৈত্য-গৃহে বন্দিনী সেই রূপসী পরী-কন্যা! আকাশে সন্ধ্যা-সমাগমে এই যে দিব্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে যেন এই পরী-কন্যার রূপচ্ছটা! বৃক্ষ-পত্র দুলাইয়া এই যে স্নিগ্ধ ধীর সমীর বহিয়া চলিয়াছে, সে যেন এই রূপসী পরী-কন্যার শান্ত মৃদু নিশ্বাস! রুদিক কহিল,—ক্লারিস্কে দেখতে খাশা, নয়?

—চমৎকার—তোমার স্ত্রী-ভাগ্য এবার ভাল হয়েচে, দেখচি।

স্ত্রীর সহিত রুদিক সকলের পরিচয় করাইয়া দিলে যথারীতি অভ্যর্থনাদি হইল। পরে লাবার্স্যান্দ্র্ গান ধরিল,—ওগো, পূত-শান্তিভরা চারু নিবাস—

সঙ্গীত থামিবার পূর্ব্বেই কে কহিল,—এই যে দাদা—তুমি কখন্ এলে!

সে চার্লি।

পরে চার্লি ও লাবার্স্যান্দ্রের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা সুরু হইল। ক্লারিস্ আসিয়া জাককে কোলের কাছে টানিয়া কহিল,—তোমার নাম কি?

—জাক।

রুদিক কহিল,—জেনেদ্—জেনেদ্ কোথায়? জানো, লাবার্স্যান্দ্র্, জেনেদ্ এক দর্জীর দোকানে কাজ করছে!

জামা, ফ্রক, এ সব সে এমন খাশা তৈরি করতে শিখেছে আর পারেও বেশ—মাহিনা মন্দ পাচ্ছে না!

মৃদু হাসিয়া লাবার্স্যান্দ্র্ কহিল,—বটে, কোথায় সে?

ক্লারিস্ কহিল,—ঐ যে, আসছে!

ক্লারিসের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে উদ্যান-মধ্যে এক নারীমূর্ত্তি দেখা দিল। এই নারী জেনেদ্।

জেনেদের শরীরখানি কিছু স্থূল—মুখে একটুও কমনীয়তা নাই, গড়নও সুশ্রী নহে! চোখে কেমন একটা পরুষ ভাব! বাহু ও পেশীগুলি পুরুষোচিত কঠিন। তবে জেনেদ্কে দেখিলে মনে হয়, তাহার নিজের বেশ একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কর্ম্ম-জীবনে সকল প্রকার বজ্র-ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে সবলভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য তাহার বিলক্ষণ! তাহার পাশে তাহার বিমাতা ক্লারিস্কে দেখিলে মনে হয়, ক্লারিস্ যেন একান্ত পরমুখাপেক্ষিণী! লতার মত সে কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়! আশ্রয় নহিলে সে দাঁড়াইতে পারে না।

জেনেদ্ আসিয়া তাহার ছুঁচ-সুতা ও লেস-কাঁচিভরা ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিল; পরে চার্লিকে দেখিয়া কহিল,—এই যে চার্লি! তোমার ম্যানেজার বলছিল, তোমাকে নিয়ে সে ভারী জ্বালাতন হয়ে পড়েছে। তোমার বদখেয়ালি তুমি ছাড়বে না কিছুতে!

চার্লি কহিল,—ম্যানেজার আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

বাধা দিয়া রুদিক বলিল,—না, না, চার্লি,ম্যানেজারের কোন দোষ দিয়ো না! তিনি তোমায় যথেষ্ট ভালোবাসেন! তোমার জন্ম নেভারে একটা ভাল চাকরির তিনি যোগাড় করেছেন, তা জানো?

—নেভাবে?

—হাঁ—নেভাবে! সেখানে তোমার সব দিকে উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে।

—বেশ—যাবো! আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্ম যখন তোমাদের সকলের এত সাধ, তখন আমি যাবো।

রুদিক কহিল,—তাড়ানোর কথা নয়। তোমার ভালোর জন্যই বলা। যা হোক, এখন রাত হয়ে আসচে, চলো ভিতরে যাই! ক্লারিস্, খাবার তৈরী হয়েছে?

—হাঁ।

রাত্রে আহারে বসিয়া লাবার্স্যান্দ্র্ কারিকরদিগের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা ফাঁদিয়া দিল।

লাবার্স্যান্দ্র্ কহিল, "জাক, এখন তুমি একজন নগণ্য লোক, কেউ তোমায় জানে না, চেনে না—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখবে, জগতে তুমি একজন সর্ব্বে-সর্ব্বা হয়ে দাঁড়িয়েছ।

হাসিয়া রুদিক কহিল,—"হাঃ, সর্ব্বে-সর্ব্বা! দু'বেলা পেট ভরে খেয়ে বুড়ো বয়সে মরবার সময় কিছু জায়গা-জমি যদি কেউ করে যেতে পারে তো, সে আপনাকে খুব ভাগ্যবান্ বলে মনে করবে! সর্ব্বে-সর্ব্বা! কি যে বলো তুমি, লাবার্স্যান্দ্র্?...ক্লারিস্, খাওয়া হলে জেনেদের ঘরের পাশের ঘরটায় জাকের জন্ম বিছানা করে দিয়ো—কাল ভোরে পাঁচটার সময় ওকে আবার ডেকে দিতে হবে। ওর জন্ম ছোট-খাট পোষাক একটা জোগাড় করে দিতে হবে। আছে বোধ হয়,—একটা দেখে-শুনে তুমি ঠিক করে রেখো। কাল ভোরেই ওকে কারখানায় নিয়ে যাবো।

আহারের পর আপনার নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরটিতে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া জাকের মনে হইতে লাগিল, ঐ যে পথে আসিবার সময় অসংখ্য কুশ্রী কুৎসিত কারিকরগুলাকে সে চক্ষে দেখিয়াছে, সে-ও তাহাদের একজন হইবে! এই নির্ব্বাসনে থাকিয়া কি দুঃসহ জীবনই না তাহাকে বহন করিতে হইবে! ইহার চেয়ে মোরোন্ভার স্কুল—সে-ও লক্ষগুণে ভালো ছিল। সেখানে কত সঙ্গী ছিল। মাদু,—আহা, সে যদি এখানে থাকিত!

জাক আবার ভাবিল, উন্নতি! তাহারই বা আশা কোথায়! এ কোথায় সে আসিয়া পড়িল! গৃহ হইতে কত দূরে! কত নদ-নদী পার হইয়া কোন্ অপরিচিত রাজ্যে সে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! হায় মা—কোথায় মা!

মার কথা জাকের মনে পড়িল! সে কারিকর হইলে মার দুঃখ ঘুচিবে, মার আনন্দ হইবে। মার সুখের জন্ম এ কষ্টটুকু সে আর সহ্য করিতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে! এ দুঃখ, এ কষ্ট, সে গ্রাহ্যও করিবে না! নিজের সুখের কথা,—সে আর ভাবিবে না।

তবু বিছানায় পড়িয়া বার বার মার কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মার মুখ, মার হাসি, মার স্নেহ! এ জীবনে আর কি সে-সব সে ফিরিয়া পাইবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের মধ্যে নিশ্বাস যেন চাপিয়া আসিতেছিল।

বাহিরে লাবার্স্যান্দ্র্ তখন উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে,

"চলো ধীর বায়ে নীরে তরী বেয়ে,
চলো গো ফ্রান্সে, গান গেয়ে গেয়ে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রুদিক-গৃহে

কারখানায় আসিয়া জাক অস্থির হইয়া পড়িল। চারিধারে অবিরাম ভীষণ কোলাহল,—পাশের লোকের মুখের কথাটি শুনা যায় না। তিন শ' বড় মুগুরে ঘা পড়িতেছে, তাহার সহিত তিন-শ' লোকের

উৎসাহোদ্দীপক উচ্চ চীৎকার,—ইহার উপর কোনোখানে অবিশ্রাম গতিতে ঘড়-ঘড় করিয়া অসংখ্য চাকা ঘুরিতেছে—কোনোখানে বাষ্প-নির্গমনের ভীষণ শব্দ—মুহূর্ত্ত সে-সবের বিরাম নাই!

কারখানার মধ্যে যত রুক্ষকেশ মলিন-বেশ কুৎসিত কারিকরের দল—কেহ চাকায় তৈল দিতেছে, কেহ চাকা ঘুরাইতেছে—কেহ-বা হাতুড়ি পিটিতেছে। ইহাদের সহিত একত্র বসিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া জাক তাহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল! তাহার মাথা বহিয়া ললাট বহিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে—হাতে-মুখে কালি, বেশ-ভূষা নিতান্ত বিশ্রী! এই দূরত্বের ব্যবধান ভেদ করিয়া শার্লতের দৃষ্টি যদি আজ জাকের উপর এখন নিক্ষিপ্ত হয় তো সে আপনার ছেলেকে চিনিতে পারিবে না! এ সেই জাক?

এক শীর্ণ মলিন বালক, হাতের উপর ছিন্ন জামার আস্তিন গুটানো, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, চোখ-দুইটা আফিমের ফুলের মতই লাল হইয়াছে, গলার ভাঁজে ভাঁজে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া! মনে হয়, কে যেন সেখানে কালির দাগ টানিয়া দিয়াছে! জাকের এ মূর্ত্তি দেখিলে শার্লৎ নিশ্চয় শিহরিয়া উঠিবে!

জাকের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল, লেবেস্কো নামে এক সর্দ্দার কারিকরের উপর। লেবেস্কোর প্রকৃতি ছিল উগ্র, কর্কশ! জাকের এই শান্ত নিরীহ ভাব, কারখানার কঠোর কাজের পক্ষে তাহার এই অপটুতা, লেবেস্কোর প্রাণে সহানুভূতি ও করুণার পরিবর্ত্তে শুধু ঘৃণা ও বিরক্তি জাগাইয়া তুলিত! তাহার কঠিন পরুষ দৃষ্টির সম্মুখে বালক যেন কেমন ভড়কাইয়া যাইত। তবু সে সাধ্যমত আপনার কর্ত্তব্য করিবার চেষ্টা পাইত। হাতে ফোস্কা পড়িয়া ছিঁড়িয়া গেলেও আদেশ-মত কার্য্য করিতে সে কুণ্ঠিত হইত না। আপনাকে সে এই কারখানার প্রকাণ্ড প্রাণহীন যন্ত্রগুলার অংশ ভাবিয়া সেইরূপে কাজ করিয়া যাইত। এই যন্ত্রগুলার যেমন কোন সুখ, দুঃখ, অনুরাগ বা বিরাগ নাই, মানুষের আদেশ-মত ঘোরা-ফেরা করিয়া মানুষের কাজটুকু সুসম্পন্ন করিয়া তোলাই তাহাদের ব্রত, কখনও কোন অনুযোগ-অভিযোগের ধার ধারিতে হয় না, ধারিলেও কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না, তাহার অবস্থা ঠিক তেমনই! তাহারও আজ আর নিজের কোন সুখ নাই, দুঃখ নাই, সর্দ্দারের আদেশ-মত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার কার্য্যই তাহাকে করিয়া দিতে হয়! তাহার আবার অনুযোগ কি? অভিযোগই বা কি থাকিতে পারে?

দুর্ব্বিষহ জীবন! বিশেষ গত দুই বৎসরের মুক্ত স্বাধীন জীবন-প্রবাহের পর কি এ কঠোর বন্ধন! নিতান্ত অসহ্য! হোক অসহ্য, তবু মুক্তি নাই—পরিত্রাণ নাই!

প্রত্যূষে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে রুদিক তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত, "সময় হলো, জাক, উঠে পড়ো।" নিদ্রিত নিস্তব্ধ গৃহের দেওয়ালে-দেওয়ালে সে শব্দ প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিত! এক টুকরা রুটি দ্রুত নিঃশেষ করিয়া, ক্লারিসের দেওয়া জলে কোনমতে গলা ভিজাইয়া রুদিকের সহিত সে পথে বাহির হইয়া পড়িত। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা সবেমাত্র তখন জগতে নামিবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে—ভোরের পাখী বাসা হইতে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছে! চারিধারে আকাশ, নদী ও নিখিলের বুকে জীবনের স্পন্দন ধীরে ধীরে আবার অল্প সূচিত হইবার উপক্রম করিতেছে! অদূরে কারিকরদলের শান্তি ভাঙ্গাইয়া প্রাণ কাঁপাইয়া কারখানার ঘণ্টা ভীম বোল তুলিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্যে সচকিত করিয়া সাড়া দিতেছে!

কারখানায় নির্দ্দিষ্ট হাজিরা-সময়ের দশ মিনিট পরে ফটক বন্ধ হয়—ঘণ্টা থামিয়া যায়! এই সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে না পারিলে প্রথম অপরাধে জরিমানা, দ্বিতীয়-বারে মাহিনা কাটিয়া লওয়া হয়—তৃতীয়বার যে এ অপরাধ করে, তাহাকে কারখানা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়! জাকের মনে হইত, আর্জান্তঁর নিয়ম যত কঠিন, যত নির্দ্দয় হোক, ইহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে!

একটা বিষয়ে জাকের বড় ভয় ছিল, পাছে কোনদিন ঠিক সময়টুকুতে কারখানায় সে হাজিরা দিতে না পারে! সেজন্য সময়ের কিছু পূর্ব্বে—অপর কারিকরদের সেখানে পৌঁছিবার প্রাক্কালেই সে কারখানার প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত! একদিন শুধু কয়টা কারিকরের দুষ্টামিতে তাহার দেরী হইয়াছিল। সেদিন ভোরে বাতাস বেশ একটু জোরে বহিতেছিল। পথে জাকের টুপিটা হঠাৎ সে বায়ুর বেগে উড়িয়া যায়। পিছনে আর-কয়েকটা কারিকর আসিতেছিল—তাহারা মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া টুপিটাকে লোফালুফি করিতে করিতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল—বেচারা জাক বহু কষ্টে টুপি উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, কারখানার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেদিন আর তাহার কষ্টের সীমা ছিল না। বেচারা ফটকের সামনেই বসিয়া পড়িল। চোখের জল বাধা মানিল না। সে ভাবিল, সে কি করিয়াছে? এই কারিকরগুলার কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, মনেও সে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, তবুও ইহারা তাহাকে লইয়া এত জ্বালাতন করে, কেন? চারিধার হইতে অজস্র ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, কেন তাহার শিরে বর্ষিত হয়? সে যে নিতান্তই অভাগা, পরিত্যক্ত, ভাগ্যলক্ষ্মীর একান্ত উপেক্ষিত, কাহারও অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না—কাহারও সুখের মাত্রা

হইতে তিলার্দ্ধও বঞ্চনা সে কামনা করে না—তবু কেন, হা ভগবান, ইহাদের বক্র দৃষ্টি হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই? এক শ্রেণীর তরুলতা যেমন আপনার জীবন-ধারণের জন্য একান্তভাবেই উত্তাপের মুখাপেক্ষা করে, জাকও তেমনই আপনার জন্য একটু স্নেহ, একটি মিষ্ট কথা বা আদর-বচনের মুখ চাহিয়া থাকে, সেটুকু না হইলে তাহার চলেই না! কিন্তু এখানে না আছে সে ভালবাসা, না আছে স্নেহ! একটি বিন্দুও নাই!

আসল কথা, কারখানার লোকগুলা জাককে বড় পছন্দ করিত না। এই নিরীহ, নম্র, শান্ত বালক তাহার নারী-সুলভ মুখশ্রী লইয়া এখানে কি করিবে? এখানে চাই, পরুষ বলিষ্ঠ দেহ, অশান্ত উগ্র প্রকৃতি! কিন্তু জাকের তাহা কিছুই ছিল না, কাজেই তাহার পক্ষে কারখানার সহিত খাপ খাওয়া একান্তই অসম্ভব! প্রত্যহ তাহাকে লইয়া কারিকর-দলে রীতিমত শ্লেষ-বিদ্রূপ চলিত। অত্যাচার-নির্য্যাতনও কি অল্প ছিল! একদিন একটা তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া এক সঙ্গী কারিকর আসিয়া তাহাকে কহিল, "এইটে একবার ধর ত, জাক, আমায় সর্দ্দার ডাকছে, চট করে শুনে আসি।" বেচারা জাক সরলভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এমনভাবে হাত পুড়াইয়া ফেলিল যে, তাহার ফলে এক সপ্তাহ তাহাকে হাঁসপাতালে বাস করিতে হইল! তাহার উপর এমন দিন ছিল না, যে দিন একটা ঘুসি বা চড় তাহার অঙ্গে কেহ বর্ষণ না করিত!

কিন্তু সপ্তাহে এক দিন ছিল, যে-দিন জাকের অদৃষ্ট ইহারই মধ্যে সুপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিত, যেদিনটি তাহার ভাগ্যে আনন্দ ও বিশ্রাম বহিয়া আনিত,—সেদিন রবিবার। এই রবিবারে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া ডাক্তার রিভালের দেওয়া বইয়ের গোছা হইতে দুই-একখানি বই বাছিয়া লইয়া সে নদীর ধারে চলিয়া যাইত। নিরালায় বসিয়া বই খুলিয়া তখন সে এক নূতন জগতের পরিচয় লাভ করিত! ভগ্ন জনহীন ঘাটের প্রান্তে সে বই খুলিয়া বসিত,—অদূরে ঘাটের পদতলে নদীর ঢেউ আসিয়া উছলিয়া পড়িতেছে—যেন কোন্ দেবীর স্নিগ্ধ সান্ত্বনা-বাণী সে! জাকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইত, শীতল আশ্বাসে ভরিয়া উঠিত। আপন মনে সে বহির পাতা উল্টাইয়া যাইত, কতক তাহার বুঝিত, কতক বা বুঝিতও না—তবুও অজানা জগতের অস্ফুট রহস্যালোকে সে কিসের সন্ধান পাইত, তাহা সেই-ই জানিত! ইহার মধ্যেই সে মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, বন্ধুর অমল সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় লাভ করিত। বহি দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্ত আবেশে ভরিয়া আসিত, মানস-চক্ষের সম্মুখে সমস্ত বহির্জ্জগৎ মিলাইয়া যাইত—মার মুখের বাণী, ডাক্তার রিভালের আদরের স্বর, সেসিলের সুমধুর কল-হাস্য, সমস্ত মিলিয়া জাকের প্রাণে এক আনন্দ-নির্ঝরের সৃষ্টি করিত! নির্ব্বাসিত উপেক্ষিত বালক সেই দুর্লভ সুধাস্পর্শে সপ্তাহের অতীত ছয়টা দিনের সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। আপনাকে অপূর্ব্ব সুখে সুখী ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইত।

অবশেষে বর্ষা নামিল। হিম-শীতল বায়ুর বেগ বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত! তখন নদী-তীরস্থ শান্তি-কুঞ্জ এই মহাতীর্থে আসিবার তাহার আর কোন উপায়ই রহিল না! রবিবারের অবসর-মুহূর্ত্তগুলা নিতান্তই নিরানন্দে কাটাইতে হইবে ভাবিয়া অগত্যা সে রুদিক-গৃহেই বহি খুলিয়া বসিল।

বালকের শান্ত প্রকৃতিতে রুদিক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্লারিস্ জেনেদও তাহাকে ভাল-বাসিত। সকল রকম ফরমাস খাটিয়া সে জেনেদের হৃদয়টিকে ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই নিরীহ বালকটির উপর রুদিক-পরিবারের প্রকৃতই একটা মায়া পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। জাকের কর্ম্ম-সঙ্গীগুলা তাহার অক্ষমতা লইয়া যখন রুদিকের নিকট অনুযোগ করিতে আসিত, রুদিক তখন মৃদু হাসিয়া জাকের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিত, "বড় ভালমানুষ, আহা, বেচারা!"

রুদিক ভাবিত, লেখাপড়া লইয়া থাকিতেই বালক ভালবাসে—এ সব কঠিন কাজ উহার শক্তিতে কুলাইবে কেন? কারখানায় না আসিয়া সে যদি স্কুলের মাষ্টার কি পাদ্রী হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ লেখা-পড়া ছিল ভাল! কিন্তু কারখানায় কাজ করিয়াই যখন তাহাকে জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, তখন এ লেখাপড়ার অনুরাগ কিছু কমাইলেই ভাল হয়! জাককে একবার এ বিষয়ে সে আভাসও দিয়াছিল, জাক তাহাতে কাতর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া করুণ স্বরে বলিয়াছিল, "আমি ত আর কোন সময় বই পড়ি না, শুধু ছুটির দিন একটু পড়ি—মার জন্য মন কেমন করে তাই—" জাকের স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার বক্তব্যটিকে শেষ করিতে দিল না। রুদিকের প্রাণে সে কাতর দৃষ্টি, সে করুণ সুর, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার ন্যায়ই বিঁধিয়া ছিল! ইহার পর জাককে সে আর দ্বিতীয়বার গ্রন্থ-পাঠ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায় নাই।

সেদিন বর্ষার মেঘে-ঢাকা রবিবার যখন ম্লান বেশে আসিয়া দেখা দিল, চারিধারে একটা নিরানন্দ অবসাদ ফুটিয়া উঠিল, তখন ক্লারিস আসিয়া জাককে কহিল, "ওখানা কি বই পড়ছ, জাক?"

জাক বলিল, "এ একটা গল্প!"

"চেঁচিয়ে পড় না—আমি শুনি!"

জাক তখন তাহার এই নবাগত শ্রোত্রীটির চিত্ত-বিনোদনের জন্য গল্প পড়িয়া যাইতে লাগিল। কত বিচিত্র, সে হর্ষ-বেদনার কাহিনী—কত আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া, কত প্রমোদ-স্বপ্ন, যৌবন-গীতির অপূর্ব্ব উন্মাদনা বহিয়া চলিয়াছে। গল্প শেষ হইলে জাক দেখিল, কাহিনী-বর্ণিত নর-নারীর দুঃখে শ্রোত্রী তাহার কাঁদিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে!

ইহার পর হইতে যখনই জাক বহি পড়িত, তখনই ক্লারিস্ আসিয়া সাগ্রহে তাহার বহি শুনিতে বসিত। এই মুগ্ধা অনুরক্তা শ্রোত্রীটির উপর জাকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বে সে বহি পড়িত, শুধু নিজের সুখের জন্য—এখন হইতে ক্লারিস্‌কে গল্প পড়িয়া শুনাইয়া তাহার যে সুখ হইতে লাগিল, তাহা অপূর্ব্ব!

ক্লারিসের প্রকৃতিতে কেমন একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল! রুদিক-গৃহ যেন ঠিক তাহার বাসের যোগ্য স্থান বলিয়া জাকের মনে হইত না। সে যেন কোন্ স্বপ্নলোক হইতে এই রুদ্র তপ্ত কর্ম্মলোকে তারার মত ঝরিয়া পড়িয়াছে! এখানকার এই পরুষতার মধ্যে তাহার কান্ত কোমল শ্রী দেখিলে মনে হইত—সে যেন এখানকার কেহ নহে! তাহার পরিচ্ছন্ন সুশ্রী বেশ, কমনীয় হাব-ভাব কেমন এক বিশেষত্বে মণ্ডিত! ইহা লইয়া পল্লীর অলস সমাজে একটা কাণাঘুষা চলিত। নিন্দুকের দল রুদিককে একটু করুণার চক্ষেও দেখিত—ভাবিত, আহা, বেচারা রুদিক! যে স্ত্রীকে একান্ত বিশ্বাস করিয়া আপনার ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, সেই স্ত্রী—

নিন্দুকের কথাগুলায় কি কিছু সত্যও নিহিত ছিল? কে জানে! নিন্দুকের নিন্দায় ক্লারিসের সহিত শেষে চার্লির নামটাও জড়াইয়া পড়িয়াছিল! এ নিন্দা রুদিকের কাণে আসিয়াও পৌছিয়াছিল; কিন্তু সে সরল বিশ্বাসীর চিত্তকে এতটুকুও নাড়া দিতে পারে নাই।

ক্লারিসের স্বপক্ষে এইটুকু শুধু বলা যাইতে পারে, যে, সে নাস্তেকে বিবাহের পূর্ব্বে হইতেই চিনিত। পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু প্রীতি-মধুর বন্ধনেরও সৃষ্টি হইয়াছিল! ক্লারিসের পিতৃ-গৃহে নাস্ত্ নিত্য অতিথি ছিল—তাহার বহু অলস অবসর এককালে ক্লারিসের সহিত সুখ-দুঃখের গল্পে কাটিয়া গিয়াছে; এবং রুদিক যদি আজ তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না করিত, তাহা হইলে নাস্তের সহিত তাহার বিবাহও যে না হইতে পারিত, এমন নহে। কিন্তু রুদিকের সহিত ক্লারিসের বিবাহের পূর্ব্বে নাস্ত্ ঠিক বুঝিতে পারে নাই, ক্লারিস্ এমন সুন্দরী! নাস্ত্ পূর্ব্বে দেখে নাই, ক্লারিসের সজ্জিত সুন্দর দেহে এমন লাবণ্যের রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে! সে দেহে এত মাধুরী! কি অন্ধ, নির্ব্বোধ, হতভাগা সে!

বিবাহের পর ক্লারিস্ ও নাস্তের বন্ধুত্ব হ্রাস না মানিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল! রুদিক নিদ্রিত হইলে কত অম্লান জ্যোৎস্না-রাত্রি দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। পাড়ার লোকে রুদিকের কাণে এ কথা তুলিলে রুদিক বলিত, "দোষ কি! নাস্ত্ আমার ভাই!" পাড়ার লোক হাসিয়া মুখ ফিরাইত, পরস্পরের গা টিপিয়া বলিত, "নেহাৎ আহাম্মক রে!"

নিন্দুকের নিন্দায় একজন শুধু বিচলিত হইয়াছিল, সে জেনেদ্! জেনেদ্ অলক্ষ্যে উভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। তাহার সমস্ত প্রাণ একটা দানবী হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত। নিষ্ফল আক্রোশে প্রাণের জ্বালা প্রাণের মধ্যেই সে চাপিয়া রাখিত, ভাবিত, "কি এ গ্রহ—এ কি পাপ!"

তাই যখন ম্যানেজারের চেষ্টায় নাস্ত্ এ গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরে চাকরি করিতে গেল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইল, জেনেদের! বিজয়ীর গর্ব্ব অনুভব করিয়া জেনেদ্ তখন মনে মনে ভাবিল, চমৎকার হইয়াছে। তাহার পিতার গৃহ এ নির্লজ্জ ঘৃণিত প্রেমলীলার হাত হইতে এবার নিস্তার পাইল! কি আনন্দ!

সেদিন রবিবার। জাক কাব্য পাঠ করিতেছিল। এবার ক্লারিস্ একেলাই শুধু তাহার শ্রোত্রী ছিল না—রুদিক ও জেনেদ্‌ও বসিয়া কাব্য শুনিতেছিল। দুই-এক ছত্র শুনিতে না শুনিতেই রুদিক ঢুলিয়া পড়িল। ক্লারিস্ ও জেনেদ্ একান্ত আগ্রহে নিস্পন্দ মনোযোগে কাব্য শুনিতেছিল! সেদিন পড়া হইতেছিল, ফ্রান্সেসকারিমিব করুণ গাথা! জাক যখন পড়িতেছিল,—

> "দুঃখ এসে বক্ষ চেপে ধরে,
> প্রতি শিরা গ্রন্থি উঠে দহি!
> পূর্ব্ব সুখের মর্ম্মরে যে স্মৃতি,
> সে দুঃখ হায়, কেমন করে বহি!"

ক্লারিসের প্রাণ তখন শিহরিয়া উঠিল,—ঠিক কথা! দুঃখ কোনমতে সহ্য হয়, কিন্তু দুঃখের দিনে অতীত সুখের স্মৃতিগুলা যখন প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠে, তখনকার সে দুঃখ—কি দিয়া তাহা রোধ করি? সে যে একান্ত অসহ্য!

জাক পড়িয়া চলিয়াছিল। কবির ছত্র হইতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল। এই যে বাসনার তীব্র উচ্ছ্বাস, নিরাশার ভগ্ন তান জাকের কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল, ক্লারিসের মনে হইতেছিল, সেগুলা শুধু কথা নহে—সেগুলা যেন জীবন্ত, জ্বলন্ত অনল-কণা,—গৃহের চারিধারে যেন তাহারা দারুণ দাহ ছড়াইয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে!

ক্লারিসের চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। প্রেমের এই করুণ কাহিনী তাহার চিত্তকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কাহিনী শেষ হইলে

জেনেদ্ কহিল, "কি বদ্ ঐ মেয়ে মানুষটা—এঁ্যা! এমন করে নিজের পাপের কথা প্রকাশ করতে এতটুকু লজ্জা হল না—সতেজে বলে গেল।"

ক্লারিস্ কহিল, "আহা, বদ্ হোক, যাই হোক, বড় দুঃখী সে।"

জেনেদ্ কহিল, "দুঃখী! ও কথা বলো না মা। এই ফ্রান্সেস্কার জন্য তোমার দুঃখ হয়? আপনার স্বামীর ভাইকে ভালবাসে সে—এত বড় পাপ—"

"কি করবে বল সে! কোন উপায় ছিল না বেচারীর! বিয়ের আগে থেকেই দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল যে,—জোর করে মা-বাপ শুধু আর-একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলে বই ত না! অত ভালবাসা—"

"চুপ কর, জোর করে হোক, যে করেই হোক, যখন বিয়ে হয়ে গেল, তখন সেই মুহূর্ত্ত থেকেই মেয়েমানুষ তার স্বামীর দাসী—স্বামীকেই সে ভালবাসবে! বইয়ে আছে, তার স্বামী বুড়ো,—বুড়ো বলেই ত স্ত্রীর উচিত, স্বামীকে আরও বেশী ভক্তি করা, ভালবাসা, যাতে অপরে তার জন্য তার স্বামীকে কোন রকম কুৎসিত কথা বলবার সুযোগ না পায়! তার জন্য তার স্বামীর মাথা হেঁট না হয়! বুড়ো স্বামী দুজনকে মেরে ফেলে বেশ কাজ করেছে। তাদের পাপের ঠিক শাস্তি হয়েছে। দ্বিচারিণী স্ত্রী, বিশ্বাস-ঘাতক ভাই,—ছিঃ! স্ত্রী তার নিজের কর্ত্তব্য প্রেম, ভালবাসা, এমন করে দু' পা দিয়ে থেঁৎলাবে! কি ভীষণ প্রবৃত্তি! শুধু রূপ আর যৌবনের মোহেই এত বড় নির্লজ্জ পাপ করবে! এ যে ভয়ানক কথা!"

ক্লারিস কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া বাহিরের পানে সে চাহিয়া রহিল। সহসা কদিকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, খাসা গল্প—চমৎকার!"

জাক এক বিচিত্র মোহে বিভোর ছিল! তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার এক প্রাচীন কবির গাথায় এ কি সুর আজ জাগিয়া উঠিয়াছে! কোথায় পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত, দরিদ্রের এক ক্ষুদ্র কুটীর—তাহারই নিরালা কোণে সহসা এ কি সত্য আজ সাড়া পাইয়া উঠিয়াছে! ধন্য কবির নিপুণতা,—রচনার সার্থকতার কি অপূর্ব্ব প্রমাণ এ! কোন্ বহু অতীত যুগের অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিয়া কবি সত্যের এক অপরূপ ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। নির্ম্মল রাত্রে সুদূর আকাশে বসিয়া চাঁদ যেমন পৃথিবীর নর-নারী, পথ-ঘাট, গৃহকোণটি অবধি আপনার অবাধ অজস্র কিরণে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, কবিও তেমনই কোন্ এক গোপন অন্তরালে বসিয়া তুলির একটি রেখাপাতে নরনারীর মনের ভিতরকার লুকানো হর্ষ-বেদনা ও ভাবরাশি কি বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণে সূচিত স্ফুটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উন্মাদ-স্পর্শে এখানে এতগুলি প্রাণী আজ বিহ্বল অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে!

সহসা জাক উঠিয়া দাঁড়াইল। "নিশ্চয় সে—" বলিয়া সে দ্রুত রাস্তার দিকে ছুটিল। তখন বাহিরে পথে কে হাঁকিতেছিল, "টুপি—চাই ভাল টুপি!"

জাক পথে আসিতে বহির্দ্বারের সম্মুখে দেখিল, ক্লারিস গৃহমধ্যে ফিরিতেছে! ইহার মধ্যে ক্লারিস বাহিরেই বা আসিল কখন্? আশ্চর্য্য! কেনই বা আসিল সে?

টুপিওয়ালা তখন খানিকটা পথ চলিয়া গিয়াছে; জাক দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ডাকিল, "বেলিসেয়ার, ও বেলিসেয়ার।"

টুপিওয়ালা জাকের পূর্ব্ব-পরিচিত—তাহার নাম বেলিসেয়ার। বেলিসেয়ার ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "কে, মাষ্টার জাক যে!"

জাক কহিল, "হাঁ, আমি! তুমি এখানে এলে কোথা থেকে?"

"আমি এই টুপি বেচে দিন-গুজরাণ করি কি না! এখানে এই কিছুকাল হল এসেছি! ভগ্নীপতির অসুখ হল—সে দেশে রোজগারও তেমন সুবিধা-মত হচ্ছিল না—তাই এখানে চলে এলুম! তা এখানে দুপয়সা হচ্ছে, মন্দ নয়! মোদ্দা, তুমি এখানে যে—!"

জাক তখন আপনার কথা খুলিয়া বলিল। বেলিসেয়ার কহিল, "তুমি কারখানায় কাজ শিখছ! এঁ্যা! অমন সুন্দর বাড়ী তোমাদের, অত পয়সা, আর তুমি শেষে কি না কারিকর হবে?"

জাক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। লজ্জায় সে যেন মাটীতে মিশিয়া যাইবার মত হইল। বেলিসেয়ার তাহা লক্ষ্য করিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিবার মানসে বলিল, "সে রাত্রে হ্যামটা বেশ ছিল—আর তিনি, সেই মেয়েমানুষটি, তিনি তোমার মা, না? তোমার মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের বেশ মিল আছে, আমি ঠিকই আঁচ করেছি,—কেমন, না?"

মার নাম শুনিয়া জাকের চিত্ত বিষণ্ণ হইল। জাকের ইচ্ছা হইল, বেলিসেয়ারকে লইয়া কিছুক্ষণ সে গল্প করে। বেলিসেয়ার কহিল, "আজ আমি আসি, কাজ আছে। আর একদিন এসে তখন গল্প করব। এখন তুমি এখানেই আছ ত। প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হবে, ভাবনা কি!"

উভয়ে করকম্পন-করিয়া বিদায় লইল। বেলিসেয়ার চলিয়া গেলে জাক গৃহ-মধ্যে ফিরিল।

দ্বারের নিকট উদ্বেগাকুল হৃদয়ে ক্লারিস দাঁড়াইয়াছিল। জাক ফিরিতেই অধীর আগ্রহে সে প্রশ্ন করিল, "ও কি বলছিল তোমায় জাক?"

ক্লারিসের স্বরে অনেকখান আশঙ্কা জড়ানো ছিল।

সদ্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে জাক তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

জাক কহিল, "আমার সঙ্গে ওর এতিয়েনে জানা-শোনা ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হল—তাই কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা কচ্ছিল!"

জাকের দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্লারিস জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু বলেনি? আর কোন কথা, নয়? আমার সম্বন্ধে কোন কথা নয়?"

জাক সরলভাবে উত্তর দিল, "না, এ-ছাড়া আর কোন কথা হয়নি!"

পরম আশ্বাসে ক্লারিস নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ফেলুক নিশ্বাস, তবু সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া তাহার বুকে যেন একখানা পাথর চাপিয়া রহিল। এক অজানা ভয়, নূতন ভাবনা! শত চেষ্টাতেও বুকের সে পাথরখানাকে ক্লারিস ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৌতুক

কারখানার লোকগুলা যখন এই রুদিক-পরিবার সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিয়া কৌতুক-হাস্যে ফাটিয়া পড়িবার মত হইত, জাক তখন নীরবে শুধু একধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ সকল কুৎসিত রঙ্গ-রহস্য তাহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকিত। নিষ্ফল রোষে শরীর তাহার জ্বলিয়া উঠিত। নাস্ত্ ও ক্লারিসের অবৈধ প্রণয়-ব্যাপার কাহারও অগোচর ছিল না। ম্যানেজার এই কুৎসার মূল উৎপাটন করিবার মানসেই নাস্ত্‌কে লয়ারে চাকুরি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই ক্রমে ক্লারিসের দ্রুত পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

নাস্ত্ যতদিন অ্যাঁদ্রের ছিল, ততদিন ক্লারিসের মোহ একটা গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ছিল। নাস্তের প্রতি আকর্ষণও তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। প্রত্যহ দুই-চারিটা গল্প ও কৌতুক করিয়া ক্লারিস বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিত—সেটা নিত্যকার প্রার্থিত বস্তু ছিল। বায়ু ও আলোর মতই তাহা সহজ, অনায়াস-লভ্য—জীবন-যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে হইত। সে সম্বন্ধে যে কোথাও কোন অনুযোগ উঠিতে পারে—এ কল্পনাও তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। কিন্তু আজ এই দূরত্বের ব্যবধান তাহার প্রাণে এক দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ অবসরগুলা এখন যেন আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। নাস্তের সহিত বসিয়া কত গল্প, ক্ষণিকের সে কত মান-অভিমান, কলহ-প্রণয়ের কত সে খেলা—বিচিত্র স্মৃতির তরঙ্গ তুলিয়া এখন তাহার প্রাণটাকে বার বার নাড়া দিতে থাকে! উতলা বাতাসে মনটাও হু-হু করিয়া উঠে। আজ কোথায় নাস্ত্! ক্লারিসের কর্ম্মহীন সমস্ত অলস অবসরটুকু যে সে জুড়িয়া বসিয়া ছিল! তাই আজ জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া ক্লারিস যখন হৃদয়-মধ্যে একটা দারুণ শূন্যতা অনুভব করে, অদূরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে নাইটিংগেল মধুর সঙ্গীতে চারিধার ভরাইয়া তুলে, তখন নাস্তের অভাব অনুভব করিয়া ক্লারিস আকুল কাতর হইয়া উঠে! কোথায় নাস্ত্—কোথায় সে? এ অভাব আজ কে মিটাইবে? এ শূন্যতা কে পূর্ণ করিবে?

অবশেষে এ বিচ্ছেদ ক্লারিসের অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে নাস্ত্‌কে চিঠি লিখিতে বসিল। নাস্ত্‌ও বেশ গুছাইয়া-বানাইয়া সে চিঠির জবাব দিল। তারপর হইতে উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার নিয়মিত ভাবেই চলিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ গোপনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পক্ষেও বিঘ্ন রহিল না।

বাস্যাঁদ্রেয় উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইত। বাস্যাঁদ্রে অ্যাঁদ্রের অপর পারে অবস্থিত—মধ্যে একটি নদীমাত্র ব্যবধান। বাস্যাঁদ্রে হইতে লয়ার দুই ঘণ্টার পথ। ইচ্ছা করিলেই নাস্ত্ এক বেলার ছুটি লইতে পারিত—সে বিষয়ে নিয়মের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না।

ক্লারিসও জিনিস-পত্র কিনিবার ছল করিয়া মধ্যাহ্নে নদী পার হইয়া বাস্যাঁদ্রেয় আসিত।

অ্যাঁদ্রেয় ক্রমে এ সংবাদ আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না—এ বিষয় লইয়া স্পষ্টই সকলে জল্পনা জুড়িয়া দিল। মধ্যাহ্নে যখন রুদিক, জাক প্রভৃতি সকলে কারখানায় থাকিত, ক্লারিস সেই অবসরে পথ দিয়া ষ্টীমার-ঘাটের অভিমুখে চলিত। রাস্তার লোক-গুলার চোখে চোখে অমনি একটা ইসারার ঘটা পড়িয়া যাইত! তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই একটু বক্র হাসি হাসিয়া লইত! গৃহ-বাসিনী রমণীরাও পরস্পরের গা ঠেলিয়া অবজ্ঞার সুরে বলিত, "মাগীর কি মোটে লজ্জা নেই, হায়া নেই গা!"

সত্যই ক্লারিসের এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না! পথে রাজ্যের লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞা কুড়াইয়া অবাধে সে চলিয়া যাইত! সে যেন এক দুর্জ্জয় শক্তির বশে চলিত, কোনমতে নিজেকে দমন করিতে পারিত না। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া শঙ্কিত ত্রস্ত চরণে ধীরে ধীরে সে ষ্টীমারে উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া, সুগন্ধি রুমালে ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া থাকিত! রৌদ্র মাখিয়া রূপালি ঢেউ তুলিয়া নদী তখন ছুটিয়া চলিয়াছে—বহু ঊর্দ্ধে আকাশের গায় দুই-চারিটা পাখী ছোট কৃষ্ণ বিন্দুর মতই ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে—তীরের কারখানার চিমনি হইতে ঘন-কৃষ্ণ ধূম উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিবার জো করিয়াছে! এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যের প্রতি কিন্তু ক্লারিসের কোন লক্ষ্য থাকিত না—সে শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে পরপারে তীর-রেখার পানে চাহিয়া রহিত। মধ্যে মধ্যে এক অজানা শঙ্কায় বুক তাহার কাঁপিয়া উঠিত, তথাপি বার্স্যান্তেয় যাইতে হইবে। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই—দুর্ব্বল চিত্তকে দমন করিবার এতটুকু শক্তিও তাহার নাই।

জাক এ সমস্তই জানিত। এই গোপন অভিসার-যাত্রা তাহার নিকট এতটুকু গোপন ছিল না। কারখানায় প্রবেশ করিয়া তাহার চোখ ফুটিয়াছিল। তাহার সম্মুখেই কারখানার লোকগুলা রুদিকের দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত। এ সকল ব্যাপার লইয়া রঙ্গ-রহস্য তাহাদের নিকট পরম উপভোগের বিষয় ছিল!

জাক এ রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিত না। নির্ভর-শীল সরল-হৃদয় পত্নীপ্রেমিক এই বৃদ্ধের দুঃখে প্রাণ তাহার সমবেদনায় ভরিয়া উঠিত। আর এই বুদ্ধিহীনা নারী—তাহার দুর্ব্বলতায় সে একান্তই বেদনা বোধ করিত। তাহার মনে হইত, একবার সে ক্লারিসকে সতর্ক করিয়া দেয়,—সাবধান, সাবধান নারী, যে পথে তুমি চলিয়াছ, সে পথ ত্যাগ কর—নহিলে কোথায় কোন্ নরকের অন্ধ গহ্বর-তলে নিজেকে নিক্ষেপ করিবে, তাহার ঠিকানা নাই! আর নাস্ত্? নাস্তের একবার দেখা পাইলে, তাহাকে সে রীতিমত শিক্ষা দেয়—তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বলে, দূর হ, পামর, এই দুর্ব্বলা অভাগিনী নারীর সম্মুখে আর তোর এ কুহক-জাল বিস্তার করিস্ নে—তার সর্ব্বনাশ করিস্ নে!

কিন্তু সব চেয়ে তাহার ক্ষোভ হইত, যখন সে দেখিত, তাহার বন্ধু বেলিসেয়ার প্রেমের এই পৈশাচিক লীলা-অভিনয়ে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। এই ফিরিওয়ালা নাস্ত্ ও ক্লারিসের পত্র-বাহকের কাজ করিত। বেলিসেয়ারকে গোপনে বহুবার রুদিক-গৃহে সে আসিতে দেখিয়াছে; আসিয়া মাদাম রুদিকের হাতে পত্রও সে দিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়াই সে চূড়ান্ত আপ্যায়িত! তাহার বন্ধু যে এই কদর্য্য পাপাচরণে সহায়তা করিতেছে,—ইহা ভাবিয়াই জাক কাতর হইয়া পড়িল। আতিথ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া বেলিসেয়ার জাকের মাতার প্রশংসায় প্রায়ই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত, জাক কিন্তু সে প্রশংসায় তৃপ্তি পাইত না। সে ভাবিত, একবার বেলিসেয়ারকে স্পষ্ট সে শুনাইয়া দিবে যে, এরূপ গর্হিত কাজ করিয়া তাহার প্রীতি-আকর্ষণ করিবার এ চেষ্টা নিতান্তই মিথ্যা হইতেছে। কিন্তু মুখ দিয়া সে কথাটা কিছুতেই বাহির হইত না।

একদিন রুদিকের গৃহের সম্মুখে ক্লারিসকে দেখিতে না পাইয়া বেলিসেয়ার জাককে চুপি চুপি ডাকিয়া নিভৃতে তাহার হাতে একখানি নীল খামে মোড়া চিঠি দিয়া বলিল, "মাদাম রুদিককে এখানা দিয়ো—সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে, আর কারও হাতে দিয়ো না যেন!"

জাক মোড়কের পানে চাহিয়া দেখিল,—উপরে মাদাম রুদিকের নাম—আর সে নাস্তেরই হস্তাক্ষর। দেখিয়া সে রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বেলিসেয়ারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শাণিত বচনে কহিল, "খবরদার! আমাকে এমন নীচ মনে করো না তুমি যে, তোমার এই হীন কাজে আমি একটুও সাহায্য করব? আমি যদি তুমি হতুম, তাহলে এ রকম হীন কাজ করে পয়সা রোজগারের কথা একদণ্ডের জন্যও আমার মনে উদয় হত না—এতে যদি আমায় অনাহারে মরতে হত, তবুও না।" বেলিসেয়ার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

জাক কহিল, "তুমি জান বেলিসেয়ার, এ চিঠি কোথা থেকে আসছে—কে দিয়েছে—আর এ চিঠির মানেই বা কি! আমিও যে জানি না, তা ভেবো না—আমি কেন, এ কথা দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে! এই বুড়ো মানুষের চোখে এভাবে ধূলো দিতে তোমার এতটুকু লজ্জা হয় না?"

বেলিসেয়ার জাকের দিকে চাহিল; অবিচলিতভাবে কহিল, "এটা অন্যায় বলছ তুমি, মাষ্টার জাক! বেলিসেয়ারের নাড়ীনক্ষত্র যারা জানে, তারা হলপ করে বলতে পারে যে, সে জীবনে কখনও কারও সঙ্গে ঠকামো করে নি—সে কথা তার মনেও কখনও ঠাঁই পায় না! আমার হাতে কতকগুলো কাগজ দেয়—আমি সেগুলো পৌঁছে দি—ব্যস্, খালাস! তাতে কি বৃত্তান্ত থাকে, সে আমি কি জানি? আমার তা জানবার দরকারই বা কি? তুমি আমার অবস্থা জান—তোমায় কতবার বলেছি ত! বাড়ীতে অনেকগুলি পুষ্যি—আমার রোজগারই তাদের একমাত্র ভরসা। তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে ত আমি নিজে খেতে পারিনে। তার উপর আবার ভগ্নীপতিটির অসুখ—তার আর একটি পয়সা রোজগার করবার সামর্থ্য নেই! টাকার বাজার কেমন, দেখছ ত! নিজের পায়ের মাপে এক জোড়া জুতো এ পর্য্যন্ত তৈরি করাতে পারলুম না। যদি ঠকাবার ইচ্ছা থাকত জাক, তাহলে এতদিনে আমি একটা মস্ত লোক হয়ে যেতুম!"

বেলিসেয়ার বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাটা বলিল। স্বরে এতটুকু কম্পন ছিল না—দৃষ্টিও চাঞ্চল্য-হীন। জাক তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, এরূপ চিঠি বহিয়া বেড়ানো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। রুদিকের স্ত্রী ?

নাস্তের মধ্যে এই যে গোপন পত্র-ব্যবহার চলিতেছে, তাহা একান্ত অনুচিত—তাহা পাপ! স্ত্রীর উপর বৃদ্ধ রুদিকের অগাধ বিশ্বাস—সে বেচারা স্ত্রীকে এতটুকুও সন্দেহ করে না, এক্ষেত্রে যদি, ইত্যাদি। কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল! বেলিসেয়ারের মাথায় এ সকল কথা কিছুতেই প্রবেশ করিবে না! টাকার বাজার অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, গৃহে তাহার পোষ্য অনেকগুলি, ভগ্নী-পতির ব্যারাম, তাহার উপার্জ্জনের উপরই সকলের অন্ন নির্ভর করিতেছে, এ যুক্তির বিরুদ্ধে জাকের কোন কথাই খাটিতে পারে না! সে জানে, সে কাহারও সহিত প্রতারণা করিতেছে না, কোন পাপেরই সহায়তা করিতেছে না,—সৎপথে থাকিয়া গতর খাটাইয়া সে এ পয়সা রোজগার করিতেছে!

জাক তখন অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সে আজ রুদিক-পরিবারেরই একজন! তাহার চোখে জল আসিল। বেলিসেয়ারকে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে আসিয়া সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। রুদিক যে এই ভীষণ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিত না, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না! সারা জীবনটা তাহার কারখানায় কাটিয়াছে। কারখানার সঙ্গিবর্গ সকলেই এই বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল। এমন স্নেহ-সরল আত্মভোলা লোক,—তাহার সম্ভ্রমটুকু বাঁচাইয়া তাহার অগোচরেই সকলে কানা-ঘুষা করিত। কিন্তু জেনেদ্—? জেনেদ্ ত সমস্তই জানে! সে কেন ইহার প্রতিকারে মনোযোগ অর্পণ করে না! সে কি এ-সকল কিছু দেখিতে পায় না? কোন ইঙ্গিত, কোন আভাস? সহসা কি সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে? কোথায় সে? রুদিক-গৃহ কি সে তবে ত্যাগ করিয়াছে?

না। জেনেদ্ রুদিক-গৃহ ত্যাগ করে নাই। আজ এক মাস হইল, কাজে সে অবসর লইয়াছে! দৃষ্টি তাহার বেশই তীক্ষ্ণ ছিল, বরং সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এখন আরও বাড়িয়াছে—একটা বিপুল সুখসম্ভাবনায় সে দৃষ্টি সম্প্রতি উচ্ছ্বসিত! তাহার বিবাহের দিন-স্থির হইয়া গিয়াছে! কষ্টম-হাউসের এক তরুণ কর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। পাত্রের নাম মাঁজ্যাঁ। সবুজ রঙের পোষাক, সৈনিকের মত সুগঠিত দেহ ও দীর্ঘ গুম্ফে মাঁজ্যাঁর রূপ যেন উছলিয়া উঠিয়াছে! কষ্টম-হাউসে এমন সুশ্রী যুবা আর দুইটি দেখা যায় না—অবশ্য জেনেদের চক্ষে! তাহাকে স্বামিরূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য জেনেদের মিলিয়াছে, ধন্য সে! সার্থক তাহার জীবন! বিবাহে পণের টাকা কিছু বেশী দিতে হইবে! রুদিকের সঞ্চিত অর্থের সর্ব্বস্বই প্রায় এ পণ গ্রাস করিয়া ফেলিবে! নগদ চারি হাজার দুই শত মুদ্রা! পণ কমাইতে গেলে মাঁজ্যাঁ সরিয়া পড়ে! দুর্ম্মূল্য হইলেও মাঁজ্যাঁকে চাই, নহিলে জেনেদ্ সুখী হইবে না! নগদ মূল্য পাইলেই মাঁজ্যাঁর চক্ষে জেনেদের কুৎসিত দেহ অপরূপ লাবণ্যে ভরিয়া উঠিবে, শ্যাম বর্ণ পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইবে। এই পণের জন্যই শুধু অপরিণীতা সহস্র কিশোরীর পাণি পরিত্যাগ করিয়া জেনেদ্কে কৃতার্থ করিতে মাঁজ্যাঁ রাজী হইয়াছে। সারা অ্যাঁত্রে ও নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ কোন প্রদেশের কোন কন্যারই এ মূল্য-প্রদানে সামর্থ্য ছিল না! রুদিক প্রথমে এ পণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "এত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ো বয়সে খাব কি? আমি চক্ষু মুদ্‌লে ক্লারিসের উপায়ই বা কি হবে? ক্লারিসের ছেলে-মেয়ে হলে তাদেরই বা কি সংস্থান থাকবে?" শুনিয়া জেনেদের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া ক্লারিস সাগ্রহে বলিল, "আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না! এখনও তোমার যে শক্তি আছে, রোজগার কর, বুঝে সংসার করলে আবার টাকা হতে কত দিন? মাঁজ্যাঁর সঙ্গেই জেনেদের বিয়ে দাও। দিতেই চাও। জেনেদ্ ওকে অত ভালবাসে, না হলে ও বেচারীর মনের সুখ চিরদিনের জন্য উবে যাবে।"

ভালবাসা! কি কুহক মন্ত্র জান, তুমি! এই ভালবাসার পায়েই ক্লারিস আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে।

মাদাম মাঁজ্যাঁ হইবার আশা জেনেদের পক্ষে যখন আর দুরাশা রহিল না, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। নিভৃতে বসিয়া সে সহস্র সুখের কল্পনা করিত,—মাঁজ্যাঁর হাত ধরিয়া নদীর তীরে বেড়াইতেছে, কত সুন্দরী কিশোরীর লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে। ঈর্ষায় সব জ্বলিয়া যাইতেছে! নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া মাঁজ্যাঁর বুকে শির রাখিয়া সে কত দেশের গল্প শুনিতেছে! সন্ধ্যার পাখী বাসায় ফিরিতেছে! ক্রমে সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল, চাঁদ উঠিল, চারি ধার স্তব্ধ হইয়া আসিল, সেই নির্জ্জন-তার মধ্যে তাহারা দুই জনে বসিয়া,—জগতে যেন আর কেহ নাই, শুধু দুইটি নর-নারী—প্রাণের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে! ভাবের রাশি আজ ছাড়া পাইয়া সাড়া দিয়া উঠিয়াছে,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই! এ কি সুগভীর পরিতৃপ্তি, বিশ্ব-প্লাবী সুখ! জেনেদ্ ভাবিত, সে কুরূপা! এই তুচ্ছ অর্থগুলার জন্যই শুধু সে মাঁজ্যাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—নহিলে সে কোথায় থাকিত! মাঁজ্যাঁ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না! তুচ্ছ অর্থটাই কি সর্ব্বস্ব হইল? এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিবিড় প্রেম,—ইহার কি কোন মূল্য নাই! ইহার দিকে মাঁজ্যাঁ চাহিয়া দেখিবে না? নাই দেখিল—একবার শুধু মাঁজ্যাঁ তাহাকে গ্রহণ করুক, তার পর সে মাজ্যাঁকে বুঝাইবে, তাহার প্রেমের মহিমা

কতখানি! মঁাজ্যাও তখন বুঝিবে, মণি-মাণিক্যের জ্যোতি ম্লান করিয়া কি রত্ন তাহার বুকে সঞ্চিত রহিয়াছে! সে দিন জেনেদের কত সুখ!

ক্লারিসের প্রতি জেনেদের শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সে যদি রুদিককে বুঝাইয়া এই পণে সম্মত না করাইত, তাহা হইলে—তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত! আর নাস্ত্ অঁ্যাজ্রে ছাড়িয়াছে, বিবাহের সম্ভাবনা লইয়া সেও রীতিমত ব্যস্ত! এই সকল কারণেই ক্লারিসের প্রতি জেনেদের পূর্ব্বেকার সে সতর্ক দৃষ্টি এখন কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ক্লারিস আবার স্বহস্তে জেনেদের বিবাহের পোষাক তৈয়ার করিতেছিল। কাজেই ইদানীং ক্লারিসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জেনেদ ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়াও পড়িয়াছিল।

আর পনেরো দিন পরেই বিবাহ। আসন্ন সমারোহের একটা আভাস ইতিমধ্যেই রুদিক-গৃহটিকে ঘা দিয়াছে। আত্মীয়-বন্ধু ও অনুগতবর্গের নিকট হইতে প্রত্যহই কিছু উপহার আসিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আত্মীয়বন্ধুর আনাগোনায় পরামর্শেরও ধুম লাগিয়াছে। কুরূপা হইলেও জেনেদকে অনেকে ভালবাসিত, কাজেই উপহারেরও ঘটা ছিল।

জেনেদকে তাহার এই শুভপরিণয় উপলক্ষে কি উপহার দিবে, তাহা ভাবিয়া জাক একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইদা তাহাকে এজন্য আপনার সঞ্চয় হইতে গোপনে ষাট টাকা পাঠাইয়াছিল! কবি আর্জান্তঁ অবশ্য এ সংবাদ জানিত না।

ইদা জাককে লিখিয়াছিল, "তোমাকে আজ ষাট টাকা পাঠাচ্ছি, জাক! এই টাকায় জেনেদের বিয়েতে তার জন্য কিছু উপহার কিনে তুমি দিয়ো। কোন একটা ভাল পোষাক যদি কিনতে পার ত ভাল হয়! তুমিও বিয়েতে একটু ভাল সাজ-গোজ করো! তার জন্য তোমার নূতন পোষাকও চাই, বোধ হয়? অনেক দিন ত তুমি পোষাক-টোষাক কিছু কেনোনি। যা ছিল, সেগুলোও এতদিনে পুরনো হয়ে গেছে! নিজের জন্য একটা ভাল পোষাকও তুমি কিনো! এ টাকা সম্বন্ধে আমায় চিঠিতে কোন কথা লিখো না। রুদিকদের কারও কাছেও এ টাকা পাঠানোর কথা বলো না। টাকাটা আমি তোমায় লুকিয়ে পাঠাচ্ছি। ইনি এ টাকার কথা জানেন না, জানলে রাগ করবেন। এখানে এঁর শরীর এখন ভাল যাচ্ছে না, টাকারও বড় টানাটানি, কাজেই ওঁর মেজাজটা কিছু রুক্ষ হয়েছে। সে জন্য ভয় হয়, পাছে এ টাকার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হন, বলেন, 'এত নবাবি কেন?' তাই তোমায় এত করে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ত বলো, এ টাকা তুমি নিজের রোজগার থেকে জমিয়েছিলে।

আর দেখ, এ দেশের লোকগুলো কি হিংসুকে। এঁর বিরুদ্ধে সবাই মহা ষড়যন্ত্র করে বসে আছে! কিছুতেই এঁকে মাথা তুলে সাহিত্য-সমাজে দাঁড়াতে দেবে না, অথচ এঁর লেখবার শক্তি কত!"

আজ দুইদিন জাক এই টাকা কয়টি পাইয়াছে। পাইয়া সে মনে মনে যথেষ্টই আনন্দ-গর্ব্ব উপভোগ করিতেছিল। এ বিবাহে যে তাহাকে নিতান্তই উপহার-হীন রিক্ত হস্তে দাঁড়াইতে হইবে না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ হইতেছিল! আবেগে মার পত্রখানা সে বুকে চাপিয়া ধরিল।

উপহারের জন্য এখন সে কি কিনিবে? কাহার সহিতই বা সে বিষয়ে পরামর্শ করে? সন্ধ্যার পর বাগানে বসিয়া সেদিন সে শুধু এই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিয়া সে স্থির করিল, জেনেদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে, তাহার কি পছন্দ! সে জেনেদের খোঁজে চলিল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঘরে আলো ছিল না। যেমন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, অমনই কাহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। চমকিয়া মুহূর্ত্তের জন্য জাক দাঁড়াইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সে ব্যক্তি কোন উত্তর দিল না, নীরবে চলিয়া গেল। লোকটি ফটকের নিকট আসিলে বাহিরের ক্ষীণ আলোকে জাক তাহাকে চিনিল,—সে বেলিসেয়ার!

জাক ডাকিল, "বেলিসেয়ার—"

কেহ উত্তর দিল না। জাক ফিরিয়া দেখিল, অদূরে ক্লারিস দাঁড়াইয়া আছে। পাশের ঘর হইতে একটা ক্ষীণ আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোয় জাক স্পষ্ট দেখিল, ক্লারিস দাঁড়াইয়া একখানা চিঠি পড়িতেছে। তাহার মুখে গভীর উত্তেজনার চিহ্ন। জাকের চট্ করিয়া মনে পড়িল, নাস্তের কথা! কারখানায় সেই দিনই সে শুনিয়াছিল, জুয়ায় নাস্ত্ বিস্তর পয়সা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি বা উপায় নাই। বোধ হয়, এ পত্রে নাস্ত্ ক্লারিসকে সেই সংবাদই জানাইয়াছে।

ভিতরের কক্ষে মঁাজ্যা ও জেনেদ বসিয়া সান্ধ্য অবসরটুকু নানা কথায়-গল্পে রীতিমত উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার জন্য সার্টিফিকেট আনিবার জন্য রুদিক সেদিন সহরে গিয়াছিল—পরদিন ফিরিবার কথা। কাজেই এমন সুন্দর সঙ্কোচ-হীন অবসরটুকু নবীন প্রণয়ি-যুগলের পক্ষে নিতান্তই অনায়াস-লভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মঁাজ্যা বসিয়া গল্প করিতেছিল। গম, কয়লা, নীল, কডলিভার প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানিতে মাশুলের হার কত, ইহাই ছিল গল্পের বিষয়। ভাল না বুঝিলেও, কথাগুলি প্রণয়-কাকলীর মতই জেনেদের মিষ্ট লাগিতে-ছিল।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে। সেই দুর্জ্জয় সুমহান্ শক্তি, প্রেম—সেই সুচতুর কুহকীর সুমোহন কুহকের ফাঁদে যে ধরা দিয়াছে, সেই জানে, প্রেমের কাছে সকল শক্তি, সকল তেজ কেমন অভিভূত হইয়া পড়ে! স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া লোকে প্রেমের পায়ে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসে, বিশ্বের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তর হইতে অমর অক্ষরে সে তথ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে! এই তুচ্ছ গল্পও তাই আজ জেনেদের কাছে এতখানি তৃপ্তিপ্রদ!

এমন সময় জাক আসিয়া দেখা দিল। ক্লারিসও আসিল, আসিয়া কহিল, "বেশী দেরি করে কাজ কি মাঁর্জ্যা? নটা বাজে, আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। যে মেঘ করে আসছে—যদি ঝড়-বৃষ্টি নামে—"

জাক স্থির দৃষ্টিতে ক্লারিসের পানে চাহিল, মনে মনে ভাবিল, ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে, নিশ্চয়! হায়, দুর্ভাগিনী নারী!

রাত্রি-ভোজনের পর মাঁর্জ্যা বিদায় লইলে ক্লারিস কহিল, "তোমরা শুয়ে পড়—বেশী রাত্তির জাগা ঠিক নয়, জেনেদ,—তাতে অসুখ হতে পারে! জাক, তুমিও সারাদিন খেটেছ খুটেছ, রাত্রে এখন শুয়ে একটু ঘুমোও—না হলে শরীর থাকবে কেন?"

তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারিলে ক্লারিস যেন বাঁচে—এমনই ভাবখানা তাহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল; জাক সেটুকু লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, এ অধীরতার অর্থ কি!

জেনেদ বসিয়া মাঁর্জ্যার কথাই ভাবিতেছিল। সে এখন কতদূর গিয়াছে! বোধ হয়, নদীর তীরে নৌকার সন্ধান করিতেছে—না, বোধ হয়, এতক্ষণ নৌকায় উঠিয়াছে! নাচিয়া নাচিয়া নৌকা তীর ছাড়িয়া চলিয়াছে। মাঁর্জ্যা কি ভাবিতেছে? বোধ হয়, তাহারই কথা—জেনেদের এত প্রেম, এত ভালবাসা—জেনেদ কি মাঁর্জ্যার সমস্ত হৃদয়খানি এতদিনেও জুড়িয়া বসে নাই? কেন বসিবে না? জেনেদের হৃদয়ে ত এখন আর কোন চিন্তা নাই—সে যে আজ মাঁর্জ্যা-ময়। শয়নে স্বপনে মাঁর্জ্যা আজ জেনেদের সমস্ত মনটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তবে জেনেদই বা কেন মাঁর্জ্যার হৃদয়ে এমন স্থান করিয়া লইতে পারিবে না! সে রূপহীনা? ছাই রূপ! এত প্রেম—তাহার কাছে রূপ ত অতি তুচ্ছ! জেনেদ্ আবার ভাবিল, কত রাত্রি হইয়া গিয়াছে—বাহিরে কন্‌কনে শীত! না জানি, এ শীতে তাহার কত কষ্ট হইতেছে! আহা!

ঘড়িতে দশটা বাজিল। ক্লারিস ডাকিল, "জেনেদ, এস শুইগে আমরা।"

অভ্যাস মত জাক সদর-দ্বার বন্ধ করিবার জন্য উঠিলে ক্লারিস ব্যস্তভাবে তাহাকে নিবারণ করিল, কহিল, "থাক্, থাক্, তোমায় আর যেতে হবে না, দোর আমি বন্ধ করে এসেছি। সব ঠিক আছে। কোন ভয় নেই—চল, উপরে চল—সব শুয়ে পড়ি।"

জেনেদ তখনও মাঁর্জ্যার চিন্তায় বিভোর ছিল, জাককে কহিল, "মাঁর্জ্যাকে কেমন দেখলে, জাক? বেশ সুপুরুষ না? চায়ের মাশুল কত পড়ে, শুনলে ত,—মনে আছে, তোমার?"

মাদাম রুদিক পরুষ কণ্ঠে কহিল, "জেনেদ, শোবে, না, বসে বসে এমন পাগলামি করবে?" ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জেনেদ তখন উঠিল। ক্লারিস কহিল, "ওঃ, আমার এমন ঘুম পেয়েছে যে, মাথা তুলে বসতে পারছি না!"

জেনেদ নিজের ঘরে আসিল। জাক ভাবিল, পরামর্শ করিবার পক্ষে ইহাই এখন ঠিক ক্ষণ! দিনের বেলায় সময় অল্প, যেটুকুও বা পাওয়া যায়, তাহাতে পরামর্শ করিবার সুবিধা হয় না—বন্ধুবান্ধবের ভিড় লাগিয়া থাকে। তাই সে জেনেদের ঘরে আসিল। টেবিলের উপর অজস্র উপহার-সামগ্রী ছড়ানো রহিয়াছে। ফটো, সোণার কাঁটা-চামচ, চা-দানি, এসেন্স, চিত্র-বিচিত্র করা রঙ্গিন চিঠির কাগজ, ইয়ারিং, আংটি, ঘড়ি, ব্রেসলেট, কড়ির খেলানা, কত রকমের অসংখ্য সামগ্রী! জাক আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল।

জেনেদ কহিল, "কি? সব দেখছ, জাক? এ'ত বাইরে যা আছে—যা তুলে রেখেছি, তা'ও তোমায় দেখাচ্ছি! দেখ একবার।"

জেনেদ তখন আলমারি খুলিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। এইটা ফুলশয্যার পোষাক, অনেক দাম—তাহার দূরসম্পর্কীয়া এক মাতুলানি উপহার পাঠাইয়াছে। এই 'ট্রসো' তাহার সখী নেলির স্বহস্ত-রচিত প্রীতি-উপহার! এই স্বর্ণ-হার তাহার পিতার আশীর্ব্বাদী!

পরে একটি ক্যাস বাক্স বাহির করিয়া জাকের সম্মুখে জেনেদ্ তাহা খুলিয়া ধরিল। ভিতরে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রায় চারি হাজার দুই শত টাকা—ইহাই তাহার যৌতুক! এ যৌতুক মাঁর্জ্যাকে উপহার দিতে না পারিলে তাহার পায়ে আজ জেনেদের স্থান হইত না! জেনেদ্ কহিল, "এই আমার বিয়ের যৌতুক! আমার সর্ব্বস্ব—আমার সাধনা! এরই সাহায্যে মাঁর্জ্যাকে পেয়েছি! নগদ চার হাজার দু'শ টাকা। বাবা আমায় একেবারে বড়লোক করে দিয়েছে—এ যৌতুকের কথা মনে হলে আমার এমন আহ্লাদ হয়—"

এমন সময় বাহির হইতে দ্বারে কে আঘাত করিল; কহিল, "জেনেদ্, জাককে কি তুমি আজ ঘুমোতে দেবে

না?—এ্যাঁ? এ কি হচ্চে তোমার! দিনের বেলা এ-সব কথাবার্ত্তা হতে পারে না? ও বেচারা সারাদিন খেটে খুটে এল—!"•

এ স্বর ক্লারিসের—স্বর ঈষৎ কম্পিত। ক্লারিস কক্ষে প্রবেশ করিল।

লজ্জিত হইয়া জেনেদ্ তখন জাককে বিদায় দিল। জাকও গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল! জেনেদকে উপহারের কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত গৃহ গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হইল। বাহিরে তখন মৃদু তুষার-বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে! এই রাত্রের নিস্তব্ধতায় অন্য গৃহগুলির মত রুদিক-গৃহও নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু বাহিরের ছদ্মাবরণে মানুষ যেমন আত্মগোপন করিয়া অপরকে প্রতারণা করে, গৃহও যে সেরূপ প্রতারণা করিতে না পারে, এমন নহে। রুদিক-গৃহ অন্যান্য গৃহগুলির মত রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়ন লইয়া বাহির হইতে নিদ্রাচ্ছন্ন বোধ হইলেও আজ সে আপনার বক্ষে এক দারুণ মর্ম্মভেদী নাটকের অভিনয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল।

নিম্নতলে আলোক-হীন এক ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইজনে মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিল। সমুখস্থ চিমনির জ্বলন্ত কয়লাস্তূপ হইতে অস্পষ্ট আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল, সেই আলোয় বেশ বুঝা যায়,—তাহাদের একজন পুরুষ, অপরটি নারী।

নারীর কপোল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল! নারী দাঁড়াইয়া ছিল,—পুরুষ তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

পুরুষ কহিল, "তোমায় আমি মিনতি কচ্ছি,—যদি আমায় ভালবাস, এক বিন্দুও ভালবাস—"

মিনতি! তবে সে কি চায়? ক্লারিসের দিবারই বা আর আছে কি? সে তাহার সর্ব্বস্বই ত নাস্তের হাতে তুলিয়া দিয়াছে—আপনার কিছুই রাখে নাই! সে ত তাহারই—কায়মনোবাক্যে নাস্তেরই! একটি জিনিস শুধু সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, স্বামীর গৃহ! সে আশ্রয়টুকু তাহাকে ছাড়িতে বলিয়ো না, নাস্ত্! বেচারা, বেচারা রুদিক—সে কি অপরাধ করিয়াছে যে—

সেদিন সন্ধ্যার সময় নাস্ত্ পত্র পাঠাইয়াছিল, "দোর যেন খোলা থাকে, আজ রাত্রে আমি যাব—খুব দরকার আছে।" সে জানিত, রুদিক সে রাত্রে গৃহে থাকিবে না।

ক্লারিস্ শুধু দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না; গৃহের পরিজনবর্গকে ঘুম পাড়াইয়া অবধি রাখিয়াছে! সকলে ঘুমাইলে ক্লারিস্ আপনাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিল! যে পরিচ্ছদটি নাস্তের চোখে ভাল দেখায়, সেইটি সে পরিল। যেমন করিয়া কেশবিন্যাস করিলে নাস্তের ভাল লাগিবে, তেমনই ভাবে আপনার কেশবিন্যাস করিল। কোথাও কোন ত্রুটি রাখিল না! আজ সে নাস্তের জন্য নিতান্তই নির্লজ্জা নায়িকার মত অপরূপ সাজে আপনাকে সজ্জিত করিল।

নাস্ত্ আবার কহিল, "এত করে মিনতি কচ্ছি, ক্লারিস্, তবুও তোমার দয়া হচ্ছে না? শোন তবে—শুধু দুদিনের জন্য—আমার সাড়ে তিন হাজার টাকার দরকার হয়েছে। দু হাজার দেনা আছে, সেইটে শুধে ফেলব—তার পর বাকীটা দিয়ে শেষবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব—এই শেষ! দু-চার বাজি খেললেই সব একেবারে ফিরে পাব।"

ক্লারিসের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—নাস্তের হাত ছাড়াইয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে কহিল, "না, না, নাস্ত্,—এ আমি পারব না।"

"পারবে না? না পারলে হবে কেন, ক্লারিস্? আমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে যায়!"

"না—এ হবে না, পারব না আমি। তার চেয়ে অন্য কোন উপায় বরং ঠাওরাও।"

"আর কোন উপায় ত দেখছিনে, আমি!"

"শোন। শাতোব্রিঁয়ায় আমার এক বন্ধু আছে—খুব বড়লোকের মেয়ে সে! স্কুলে দুজনে আমরা একসঙ্গে পড়তুম। আমি তাকে আমার দরকার বলে লিখে দিচ্ছি—সাড়ে তিন হাজার টাকা এখনই আমার চাই—ধার অবশ্য—"

নাস্ত্ কহিল, "অসম্ভব। এ হতেই পারে না—কালই আমার এ টাকা চাই।"

ক্লারিস্ কহিল, "তা হলে বরং ম্যানেজারের সঙ্গে তুমি দেখা কর। তিনি তোমায় ভালবাসেন; সাহায্যও অনায়াসেই করতে পারেন—"

"ম্যানেজার! এ কথা জানতে পারলে ম্যানেজার সেই দণ্ডেই আমার চাকরিটুকু শেষ করে দেবে। এই লাভ হবে! আর আমি যা বলছি, তা কত সহজ, বল দেখি। কেউ জানতে পারবে না। দুদিন পরে নিশ্চয় এ টাকা আমি দিয়ে যাব। কোনমতে তার অন্যথা হবে না।"

"তুমি বল কি নাস্ত্—দুদিন পরে যে তুমি—"

"হাঁ—দেবই এ টাকা। এর আর নড়চড় হবে না—আমি শপথ করে বলতে পারি।"

ক্লারিস্ কোন কথা বলিল না। দুই হাতে সে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, দারুণ ঝড়! সে ঝড়ে তাহার চেতনা অবধি লোপ পাইবার উপক্রম করিল।

নান্তু কহিল, "আমি গর্দ্দভ, তাই তোমার কাছে এত ভূমিকা ফাঁদতে বসেছি। তোমায় না বলে নিজেই এ টাকা যদি বার করে নিয়ে যেতুম, তাহ'লে আর এত গোল হত না—"

ক্লারিস্ নান্তুর হাত চাপিয়া ধরিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "না, না, তুমি জান না, নান্তু, জেনেদ নিজে এখন তার বাক্স খুলে রোজই ঐ যৌতুকের টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—একে-তাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, কতবার করে গুণছে। আজ রাত্রেই সে জাককে নিজের বাক্স খুলে দেখাচ্ছিল—"

"তাই না কি! জাককে দেখাচ্ছিল?"

"হ্যাঁ। আহ্লাদে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এতে সে মরে যাবে, একদণ্ড বাঁচবে না। তা ছাড়া চাবি সে কোথায় রাখে, আমি জানিও না।"

কথার বাহুল্যে ক্লারিসের যুক্তিগুলা ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সে-ও বুঝিতেছিল! ক্রমে সে স্থির হইল! ক্লারিস্ নান্তুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, ইহাই ছিল আরও দুঃখের কারণ। এই বাক্-যুদ্ধের অন্তরালে উভয়ের অধরে অধরে নয়নে-নয়নে যে ইঙ্গিত চলিতেছিল, তাহা রোধ করিবার শক্তি ক্লারিসের মোটেই ছিল না!

"তবে আর আমার কোন আশা নেই? উপায়ও নেই?" বলিয়া নান্তু অবোধ শিশুর মতই কাঁদিয়া উঠিল।

ক্লারিসের চিত্তে করুণার বান ডাকিল! উপায় কি? উপায়? সে কি করিবে? কেমন করিয়া নান্তুকে আজ সে সাহায্য করিবে! সে যে দুর্ব্বলা নারী—তাহার কি শক্তি আছে? ভাবিয়া নিরুপায় চিত্তে সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া নান্তু কহিল, "তা হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে না? বেশ! তবে চললুম, ক্লারিস্। আমি জানি, আমার এখন এক পথ আছে—এক উপায় আছে, দেখি—"

"কি উপায়?"

"মৃত্যু! এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে লোকের সামনে মুখ দেখাব, ভেবেছ? আমি তা পারব না!"

নান্তু ভাবিল, এবার সে ক্লারিসকে বিচলিত করিয়াছে—এবার—না, ক্লারিস কিন্তু তেমনই অটল রহিল। কিন্তু সে শুধু ঐ মুহূর্ত্তের জন্য।

পর-মুহূর্ত্তেই ক্লারিস আসিয়া নান্তুর সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, "তুমি আত্মহত্যা করবে? বেশ, আমারও এখন সেই এক পথ! এ জীবনে আমার আর কোন সাধ নেই! এ কলঙ্ক, এ মিথ্যা, এ পাপ, এই গোপনতা আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে! আর না—আমিও এ সব শেষ করে দিতে চাই।" ক্লারিস্ ফোঁপাইতে লাগিল।

নান্তু ক্লারিসের হাত ধরিল, কহিল, "সে কি? তুমি আত্মহত্যা করবে! কি ভয়ঙ্কর! এ দুর্ব্বুদ্ধি আবার তোমার মাথায় চাপল কেন? না, ক্লারিস—তুমি আত্মহত্যা করতে পাবে না। কেন করবে?"

নারীর দুর্ব্বল চিত্ত সহসা আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নান্তুর পক্ষে আত্মসম্বরণ করা দুরূহ হইয়া পড়িল। একটা পাপ-বাসনা তাহার মস্তিষ্কটাকে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

"অসম্ভব!" বলিয়া নান্তু সিঁড়ির দিকে চলিল!

ক্লারিস্ তদ্দণ্ডেই ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, তুমি?"

"যেখানেই যাই, বাধা দিয়ো না, ক্লারিস্, টাকা আমার চাইই!"

ক্লারিস্ সজোরে নান্তুর হাত ধরিয়া কহিল, "না, না, আমার কথা রাখ—"

কি এক উন্মাদনা তখন নান্তুকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সে ক্লারিসের হাত ছাড়াইয়া লইল।

ক্লারিস্ কহিল, "সাবধান নান্তু—তুমি যদি আর এক পা উপরে ওঠ, তাহলে এখনই আমি চীৎকার করে সকলকে জাগাব।"

"জাগাবে? জাগাও তুমি। বেশ—সকলে স্পষ্টই আজ জানুক, তোমার দ্যাওর নান্তু তোমার প্রণয়ী—আর সেই প্রণয়ী চোর, চুরি করতে এসেছে।"

কথাগুলা নান্তু মৃদু স্বরেই কহিল। উভয়েই মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিল—পাছে কাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে উভয়েই সতর্ক ছিল।

চিমনির আলোর তেজ কমিয়া আসিতেছিল—সেই উজ্জ্বল বঙ্কিম আলোকে আজ নান্তুর প্রকৃত মূর্ত্তি সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ক্লারিসের চোখে ধরা পড়িয়া গেল! এই দুর্বৃত্ত দস্যুর জন্য ক্লারিস ইহ-জগতের সমস্ত ধর্ম্ম, পুণ্য, স্বামী,—সব ত্যাগ করিয়াছে! হা রে বুদ্ধিহীনা নারী,—এই পাপিষ্ঠকে তুই কাহার আসনে বসাইয়াছিলি? রুদিক, সরল, প্রেমানুরক্ত রুদিক—কি বলিয়া ক্লারিস আজ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? তাহার মত অভাগিনী কে আছে?

বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছে—দুর্য্যোগ নামিয়াছে। এ অবৈধ প্রণয়-লীলা-অভিনয়ের পক্ষে এমন প্রলয়-রাত্রিই যোগ্য অবসর।

সহসা দারুণ অনুতাপে ক্লারিসের সমগ্র চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কি করিয়াছে—কি হারাইয়াছে? নান্তু যখন সিঁড়ি বহিয়া সতর্ক পদে উপরে উঠিতেছিল, চির-পরিচিত গৃহে চোরের মতই নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছিল, ক্লারিস্ তখন হল-ঘরে সোফার উপর ঝটিকাহতা ছিন্ন লতার মতই লুটাইয়া পড়িল। তাহার

চোখ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত বাধা ঠেলিয়া সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রাণ ভরিয়া সে আজ কাঁদিল। পাছে উপরকার পাপ-অভিনয়ের কোন সাড়া তাহার শ্রুতির মূলে লাগিয়া এ ক্রন্দনে বাধা দেয়, অন্তরের এই আকুল অনুতাপকে কালিমা-জর্জ্জরিত করে, এই ভয়ে দারুণ দুঃখেও সে দুই হাত দিয়া আপনার কাণ দুইটাকে চাপিয়া রাখিতে ভুলিয়া যায় নাই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসংযম

তখনও ঘড়িতে ছয়টা বাজে নাই। অ্যাঁদ্রের পথ-ঘাট তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুই-একটা রুটি ও মদের দোকানের সাশি ভেদ করিয়া ক্ষীণ আলোকচ্ছটা পথে পড়িয়াছে। একটা সরাইয়ে টেবিলের সম্মুখে রুদিকের ভ্রাতা নাস্ত্ ও জাক বসিয়াছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর মদের বোতল ও গ্লাস।

নাস্ত্ কহিল, "এস মাষ্টার জাক, এক গ্লাস নাও।"

জাক সসঙ্কোচে কহিল, "আমায় ক্ষমা কর, ম্যসিয়ো, আমি মদ খাই না। ছুঁতেও ভয় হয়।"

হাসিয়া নাস্ত্ কহিল, "আরে বাঃ! এমন ছেলে-মানুষও দেখিনে ত! সহুরে ছেলে তুমি, মদ ছোঁও না? না, না, এক গ্লাস খাও। ওরে, এখানে আর একটা গ্লাস দিয়ে যা।"

কথামত ভৃত্য আর একটা গ্লাস রাখিয়া গেল। গ্লাসটা কানায় কানায় মদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া নাস্ত্ কহিল, "নাও, খেয়ে ফেল।"

জাক অসম্মতি জানাইতে সাহস করিল না। নাস্তের মত একজন মাতব্বর লোকের অনুরোধ বারবার কি বলিয়া সে এড়াইবে? নাস্ত্‌কে জাক যে একটু সম্ভ্রমের চক্ষে না দেখিত, এমন নহে! এই শিল্পীটি পূর্ব্বে যখন রুদিক-গৃহে থাকিত, তখন জাককে ডাকিয়া একদিনের জন্যও সে তাহার সহিত কথা কহে নাই! নাস্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রুদিক-পরিবারের সকলেই কতখানি ব্যস্ত থাকিত, ম্যানেজারও নাস্তের মঙ্গলের জন্য কতটা সচেষ্ট ছিল, জাক তাহা বেশই জানিত! সেই নাস্ত্ ডাকিয়া আনিয়া বারবার তাহাকে এতখানি অনুরোধ করিতেছে—সে অনুরোধ রক্ষা না করা ভাল দেখায় না! অগত্যা জাক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্লাসটি নিঃশেষ করিল।

জাকের পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া নাস্ত্ কহিল, "হাঁ, এই ত মানুষের মত কাজ। কেমন লাগল, বল দেখি! আর একটু নাও।"

জাক আবার নাস্তের অনুরোধ রক্ষা করিল! নাস্ত্‌কে তাহার মন্দ লাগিল না! বেশ আমুদে লোকটি! আহা, বেচারা নাস্ত্! জুয়াখেলা ছাড়িয়া সৎপথে আসিলে সে কি ভালই হয়! জাক ভাবিল, একবার সে অনুরোধ করিবে—নাস্ত্ যাহাতে জুয়াখেলা ছাড়ে।

আবার গ্লাস আসিল—নাস্তের প্রাণ স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল। জাক কহিল, "আমার একটা অনুরোধ আছে, ম্যসিয়ো নাস্ত্—সে অনুরোধ রাখতেই হবে।"

"অনুরোধ? বল, কি তোমার অনুরোধ? রাখব বৈ কি,—কেন রাখব না?"

"জুয়াখেলা তোমায় ছাড়তে হবে! এতে ক্রমাগতই ত লোকসান হচ্ছে, দেখছ, এবার থেকে সাবধান হও।"

"এই কথা! খাসা বলেছ, মাষ্টার জাক!" নাস্ত্ আবার জাকের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিল।

"আর একটা কথা—"

এমন সময় সরাইয়ের অধ্যক্ষ আসিয়া কহিল, "কারখানার ঘণ্টা বাজছে!"

জাক কহিল, "তাহলে আজ আসি, ম্যসিয়ো—"

পকেট হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া জাক অধ্যক্ষের হাতে দিল। নাস্ত্ কহিল, "সে কি! তুমি দাম দিচ্ছ কি?"

'এবারকার দামটা আমিই দিই, ম্যসিয়ো—তুমি এত খরচ করলে!"

স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া অধ্যক্ষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কারখানার একটা সামান্য শিক্ষানবীশ ছোকরা—সে স্বর্ণমুদ্রা বাহির করে! নাস্ত্‌ও বিস্মিত হইল। তবে কি জাকও জেনেদের যৌতুকের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে না কি? তাহাদের বিস্ময় বুঝিয়া জাকের আনন্দ হইল। সে কহিল, "অবাক হয়ে যাচ্ছ! এই দেখ, আরও কত মোহর আছে।" বলিয়া সে চারি-পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিল। পকেটে সেগুলা রাখিয়া সে আবার কহিল, "জেনেদের জন্য একটা কিছু উপহার কিনে দিতে হবে।"

মৃদু হাসিয়া নাস্ত্ কহিল, "বটে।"

অধ্যক্ষ মুদ্রাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

জাক কহিল, "চটপট্—এখন বিদেয় কর! আমার এখন কারখানায় যেতে হবে! ঘণ্টা বাজছে!"

যথার্থই কারখানার ঘণ্টা বাজিতেছিল। কর্ম্মচারী-দিগকে সচকিত করিয়া ডাকিবার ঘণ্টা।

সরাইয়ের বাহিরে আসিয়া নাস্ত্ কহিল, "তাই ত জাক, এখনই তোমায় যেতে হবে! দুটো কথা কওয়া হল না! তোমায় আমার বেশ লাগছিল। তোমার

অনুরোধ আমি রাখব—দেখে নিয়ো, ঠিক বলছি।” ক্রমে কথায় কথায় নাস্ত্ জাককে নদীর তীর অবধি আকর্ষণ করিয়া আনিল। জাক কোন আপত্তি করিল না, বাধা দিল না। সরাইয়ের সেই বদ্ধ উষ্ণ বায়ুর মধ্যে বসিয়া কেমন ক্লান্তি ধরিয়াছিল, বাহিরের এই শীতল বায়ুর স্পর্শ দিব্য লাগিতেছিল! চলিতে চলিতে জাকের গতি মন্থর হইয়া পড়িল, পা কেমন জড়াইয়া আসিতেছিল! নাস্তের হাত ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল!

কিয়দ্দূর আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, “এ কি, ঘণ্টা থেমে গেছে!”

“না!”

উভয়েই পিছনে ফিরিল। রাত্রির অন্ধকার দুই হাতে সরাইয়া তখন দিনের আলো নামিতেছে! চিমনিগুলার মাথার উপর তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের একটা ঢেউ খেলিতেছিল! কারখানার নিশান,—কৈ দেখা যায় না ত! আজ এই প্রথম জাক কারখানায় পৌছিতে পারিল না! ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু নাস্ত্ যখন করুণ স্বরে কহিল, “আমার দোষ! আমারই দোষ! আমারই দোষে শুধু এটা ঘটল, জাক! ম্যানেজারের কাছে আমি নিজে যাব—তাঁকে বলব যে, আমারই জন্ম তুমি সময়ে কারখানায় পৌছুতে পারনি!”

জাক কহিল, “বয়ে গেল! একদিন কামাই হলে আর কি এসে যাবে? লেবেস্কোর সঙ্গে সে আমি বোঝাপড়া করে নেব'খন। চল, যখন যাওয়া হল না, তখন তোমায় ষ্টীমারেই তুলে দিয়ে আসি।”

এই লেবেস্কোর সহিত বুঝা-পড়া করাটাকেই জাক সব-চেয়ে ভয় করিত। কিন্তু আজিকার এই সদ্য-লব্ধ আনন্দোল্লাসে সে ভয়ের উগ্রতাও সে ভুলিয়া গেল!

দুই জনে গল্প করিতে করিতে নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল। তীরে তখন কে যেন কুয়াশার পর্দ্দা বিছাইয়া রাখিয়াছে। পরপারের কোন চিহ্ন দেখা যায় না! ষ্টীমার-ঘাটের ক্ষুদ্র বিশ্রাম-কক্ষে আসিয়া দুইজনে বসিল। প্রাণটাকে জাকের আজ বড় লঘু মনে হইতেছিল। সে নানা কথা কহিতে লাগিল। জেনেদের বিবাহ, সরল ও সাধু-হৃদয় বৃদ্ধ রুদিকের অগাধ স্নেহ, কোমল-হৃদয়া ক্লারিস—কি এক বিষাদের ঘন ছায়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে,—এমনই কত কথা!

জাক কহিল, “আজ সকালে ক্লারিসের মুখ এমন ফেঁকাশে হয়ে গেছে! মরার মত সাদা মুখ! আসবার সময় দেখলুম—”

কথাটা বলিবার সময় জাক লক্ষ্য করিল, নাস্তের দৃষ্টি সহসা কেমন স্থির হইয়া গিয়াছে! নাস্ত্ কহিল, “তোমায় ক্লারিস্ কিছু বলেছে আজ?

“না।”

“কিছু না?”

“না। জেনেদ্ তাকে কি বলছিল, তা, তার সে কোন জবাব দেয়নি কিন্তু! বোধ হয় কিছু অসুখ করেছে—তার মুখ দেখে তাই মনে হল!”

“বেচারী ক্লারিস!” বলিয়া নাস্ত্ এক সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জাকের মনে হইল, এইবার সে বেলিসেয়ারের কথা তুলিবে! কিন্তু নাস্তের মুখের ভাব দেখিয়া কেমন তাহার অনুকম্পা হইল। সে ভাবিল, “আজ থাক্, আর একদিন বলব।” নাস্তের মুখে দুঃখের একটা ছায়া পড়িয়াছিল।

সহসা নাস্ত্ কহিল, “জাক, তোমার কথা আমি রাখব। জুয়াখেলা ছেড়ে দেব।”

এমন সময় কুয়াশা ভেদ করিয়া বংশীর ধ্বনি উঠিল। স্যাঁ-নাজেয়ারের ষ্টীমার আসিতেছে। এবার বিদায় লইতে হইবে।

করকম্পন করিয়া নাস্ত্ বিদায় গ্রহণ করিলে জাক নিঃসঙ্গতা অনুভব করিল। কারখানায় যাইতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আনন্দের উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিল, আজ যখন একটা দিন অবসর মিলিয়াছে, তখন জেনেদের উপহারটা কিনিয়া ফেলা যাক্!

নৌকায় নদী পার হইয়া জাক ষ্টেসনে আসিল। দুপুরের পূর্ব্বে ট্রেন নাই। কি করিয়া এতখানি সময় কাটান যায়? ওয়েটিং রুমে কেহ ছিল না। বাহিরে বায়ুর প্রকোপ বাড়িয়াছিল, শীতল বায়ু বহিতেছিল। পথের পার্শ্বে ছোট একটা হোটেল ছিল, জাক গিয়া তথায় বসিল।

এই প্রভাতেই হোটেলে কারিকর ও কুলিদের ভিড় জমিয়াছিল। মদের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। উল্লাস-চীৎকারের বিরাম নাই। ভিতরে ঢুকিয়া জাকের বিরক্তি ধরিল। সে বাহিরে আসিবে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, “কি, মাষ্টার জাক যে!”

জাক কহিল, “কে? গাস্কঞ্।”

গাস্কঞ্ অ্যাঁদ্রের কারখানায় কাজ করিত। অতিরিক্ত পানদোষের জন্ম পূর্ব্বদিন কারখানা হইতে সে বরখাস্ত হইয়াছে। একটা টেবিলের ধারে বসিয়া তিন-চারিটা সঙ্গীর সহিত সে মদ খাইতেছিল।

গাস্কঞ্ কহিল, “মাষ্টার জাক, পালাচ্ছ কোথা? আমাদের সঙ্গে দু' এক গ্লাস খাবে, এস।”

এই পিশাচগুলার হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন উপায় ছিল না। তাহারা সাগ্রহে সকলে জাককে আপনাদের দলে টানিয়া বসাইল। পাত্রের পর পাত্র

আসিল। মদের প্রবাহ ছুটিল। পরে সকলে কহিল, "কিছু খাওয়াও, মাষ্টার জাক!"

আহারাদির পর একজন সঙ্গী কহিল, "নৌকা চড়ে একটু বেড়ানো যাক—প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। মাথা বেজায় গরম হয়ে উঠেছে।"

তাহাই হইল। সকলে গিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল। মৃদু গতিতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। উভয় তীরে অস্পষ্ট গ্রাম-সীমা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তীরে ধীবরদিগের ক্ষুদ্র কুটীর, রজক ও রাখালের মেলা,—চির-পরিচিত শান্ত পল্লীশ্রীতে মণ্ডিত তটভূমি! জাকের কল্পনা-কাতর চিত্ত কাব্য ও সৌন্দর্য্যের আবেশে ভরিয়া উঠিল। মাথার উপর আকাশ কোথাও সুন্দর নীলিম, কোথাও বা চিমনির ধূমে গাঢ় কৃষ্ণ! দুই-চারিটা পাখী বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার মনে পড়িতেছিল, কাহিনী-শ্রুত রবিন্সন ক্রুসোর গল্প! সেও যেন জগতের সহিত, পরিচিতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত নবীন সৌন্দর্য্য-লোকের পানে ক্রুসোর মতই তরী ভাসাইয়া চলিয়াছে! পানোন্মত্ত সঙ্গীগুলা তখন বীভৎস কণ্ঠে চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছে, সেদিকে জাকের মনোযোগ এতটুকুও আকৃষ্ট হইল না। দূরে অদূরে প্রকাণ্ড জাহাজগুলার গগনস্পর্শী মাস্তুলের চূড়া দেখিয়া কোন্ স্বপ্ন দৃষ্ট সুদূর মায়ালোকের কল্পনায় তাহার লুব্ধ চিত্ত বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল।

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, নৌকা তীরে লাগিয়াছে! সে কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কিছুই তাহার মনে ছিল না। অল্পে অল্পে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল! জেনেদের পরিণয়-উপহার কিনিতে হইবে, তাহারই জন্য সে সহরে আসিতেছিল! তার পর—? একটা বিরাট অনুশোচনায় তাহার মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইল। এই নীচ সঙ্গীগুলার সহিত এমন নির্লজ্জভাবে মিশিয়া হীন আমোদে মাতিয়া সে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে বসিয়াছে! সঙ্গীগুলার উপর পৈশাচিক ক্রোধে সে জ্বলিয়া উঠিল! কেমন করিয়া ইহাদের হাত হইতে এখন নিস্তার পাওয়া যায়!

সঙ্গীর দল তীরে উঠিল। জাকও তাহাদের অনুসরণ করিল। সঙ্গীগুলা তীরে বসিয়া আমোদের পরামর্শে মন দিল! কেহ বলিল, আর একটু মদ চাই, কেহ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না, কিছু খাবার! এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যে জাক সতর্কভাবে নিঃশব্দে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিল। তাহার পা টলিতেছিল, মাথা দপ্-দপ্ করিতেছিল। দেহটাকে টানিয়া বেড়াইবার এতটুকুও আর শক্তি ছিল না। একটু শুইতে পাইলে যেন বাঁচিয়া যায়! কিন্তু শুইবার স্থান কোথায় মিলিবে? যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই সে পা দুইখানা টানিয়া নিতান্তই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতে লাগিল।

খানিকটা পথ সে চলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পাশ দিয়া কে ছুটিয়া গেল—লোকটা জাকের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সহসা আরও একজন ছুটিয়া আসিল। সে গাস্কএ্।

গাস্কএ্ কহিল, "মাষ্টার জাক, সর্ব্বনাশ হয়েছে—ঝগড়া-মারামারি করে একটা লোককে ওরা জলে ফেলে দিয়েছে, পুলিশ আমাদের পাছু নিয়েছে—এখন কোথায় পালাই! তুমি পুলিশকে কোন পরিচয় দিয়ো না, আমাদের। যদি তারা তোমায় জিজ্ঞাসা করে ত বলো, আমাদের মোটে চেনোই না তুমি।"

গাস্কএ্ ছুটিয়া পলাইল।

জাক আবার চলিল। সহসা সে শুনিল, কে হাঁকিতেছে, "টুপি? চাই টুপি?" একটা সম্ভাবিত আশায় জাকের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে জাক ডাকিল, "বেলিসেয়ার—"

"কে? মাষ্টার জাক! তুমি এখানে!"

জাক কহিল, "হাঁ, আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, বেলিসেয়ার! আমায় অ্যাঁদ্রেয় রুদিকদের বাড়ী কোনমতে তুমি পৌঁছে দিতে পার?"

"তাই ত! তা এস, মাষ্টার জাক—ষ্টেশন এই কাছেই। ভাগ্যে আমি এ পথে এসেছিলুম, না হলে কি হত, বল দেখি!"

জাককে লইয়া বেলিসেয়ার ষ্টেশনে আসিল। সন্ধ্যায় ট্রেন। অবসন্ন শরীরটাকে ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে জাক লুটাইয়া দিল। ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসিয়াছিল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইল, তাহার কোন ঠিকানা নাই। সহসা প্রবল ধাক্কায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া সে দেখে, পুলিশের লোক তাহাকে ধাক্কা দিতেছে! জাক সভয়ে উঠিয়া বসিল, কহিল, "কি? কি হয়েছে? তোমরা কি চাও?"

পুলিশের লোক কহিল, "চাই,—তোমাদের দুজনকে। ভারী চালাক হয়েছ! পুলিশের চোখে ধূলো দেবে? ওঠ—"

বেলিসেয়ার পাশেই ছিল। সে কহিল, "কোথায় যেতে হবে?"

"আপাততঃ অ্যাঁদ্রেয়! তারপর জেলের ঘরে পাকা বন্দোবস্ত করে দেব'খন।"

ভয়ে বেলিসেয়ার কাঁদিয়া ফেলিল। জাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার প্রাণের স্পন্দনটুকুও থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল! এ কি এ ব্যাপার? সে কি করিয়াছে যে, পুলিশ আসিয়া এমনভাবে লাঞ্ছনা করিতেছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুঃসংবাদ

পরদিন প্রভাতে যখন জ্যাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও তাহার শরীরের গ্লানি ঘুচে নাই। মদের এমনই পরিণাম! তীব্র তৃষ্ণায় জ্যাকের বুক অবধি পুড়িয়া যাইতেছিল, শরীরের সর্ব্বত্র সুগভীর বেদনা, মাথায় যেন কে গুরু ভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর দারুণ লজ্জা, তীব্র অনুতাপ! মানুষ হইয়া পশুর মত ব্যবহার করা,—কি ঘৃণা, কি পরিতাপের কথা!

এক অন্ধকার ঘরে জ্যাককে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র বায়ুপথ দিয়া প্রভাতের আলো ক্ষীণ ধারে ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেছিল। পাশে আর একজন কে ও পড়িয়া আছে! জ্যাকের মনে পড়িল, সে বেলিসেয়ার! ঠিক, বেলিসেয়ারই ত!

জ্যাক ডাকিল, "বেলিসেয়ার—"

গাঢ়স্বরে উত্তর হইল, "কেন?" সে স্বর গভীর হতাশে পূর্ণ!

জ্যাক কহিল, "আমরা কি করেছি বেলিসেয়ার যে, এমন করে চোরের মত এরা আমাদের আটকে রেখেছে!"

"তুমি কি করেছ না করেছ, তা আমি বলতে পারি না,—তবে আমি ত কিছুই করিনি—শুধু পথে টুপি বিক্রী কচ্ছিলুম! সেটা কি করে দোষের হল, তা ত ভেবে ঠাওরাতে পাচ্ছি না!" তাহার পর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বেলিসেয়ার আবার কহিল, "টুপিগুলো কি আর আছে! সব নষ্ট হয়ে গেছে! তার দাম এখন কে দেয়? গরিব আমি, আমার রোজগারের সর্ব্বনাশ করে দিলে! তুমি ওদের বলবে ত জ্যাক যে, আমার কোন দোষ নেই,—তোমায় এতটুকু সাহায্যও আমি করিনি?"

"আমায় সাহায্য? কেন, আমি কি করেছি?"

"সে কি, ওরা যে বলছিল, তুমি শোন নি? তা ছাড়া তুমি নিজে ত জানছ, কি করেছ—"

"কিছু জানি না আমি, বেলিসেয়ার, যথার্থ বলছি! ওরা কি বলছিল, বল—"

"ওরা বলছিল, তুমি চুরি করেছ—"

"চুরি করেছি? কি চুরি করেছি?"

"রুদিকের মেয়ে জেনেদের বিয়ের টাকা।"

"কি ভয়ানক কথা, বেলিসেয়ার! তোমায় কি—" জ্যাকের কথা বাধিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বেলিসেয়ার কোন উত্তর দিল না। সারা সহরময় তখন রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জ্যাক চোর! চুরি করিয়া অ্যাঁদ্রে ছাড়িয়া সে পলাইতেছিল। সন্ধান করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় পুলিশ তাহাকে ষ্টেশনে ধরিয়া ফেলিয়াছে। চুরির কথা ভোরেই জেনেদ জানিতে পারে। তখনই পুলিশে খপর দেওয়া হয়। চুরির রাত্রে জ্যাক গৃহে ছিল, এবং ঠিক চুরির পর হইতেই সে অদৃশ্য হইয়াছে। সকালে কারখানাতেও তাহাকে কেহ দেখে নাই। সমস্ত ঘটনাই জ্যাকের বিরুদ্ধে তাহার অপরাধ প্রমাণ করিতেছিল। তাহার পর অ্যাঁদ্রের দুই-চারিজন কারিকর তাহাকে সরাইয়ে মদ খাইতে দেখিয়াছে, মদ খাইয়া অধ্যক্ষের হাতে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছে সে, তাহাও সকলে দেখিয়াছে। তাহার মত অবস্থার ছোকরা কোথা হইতে স্বর্ণমুদ্রা পাইতে পারে? তাহার উপর কতকগুলা বদ সঙ্গী লইয়া নৌকায় সে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছে! জ্যাক যদি চুরি করে নাই, তবে কে করিল? টাকার সন্ধান অপরে কোথা হইতে পাইবে? জ্যাক জানিত, জেনেদের বিবাহের টাকা সে কোথায় রাখে! পূর্ব্ব-রাত্রে জেনেদ স্বয়ং তাহাকে আলমারি খুলিয়া টাকার বাক্স দেখাইয়াছে! এবং পরদিন ভোরেই সে টাকা উড়িয়া গেল; অথচ টাকার ত ডানা ছিল না!

সে যে চুরি করিয়াছে এ বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবে একটা বিষয় ঠিক বুঝা যাইতেছিল না! সাড়ে তিন হাজার টাকা এক রাত্রে অদৃশ্য হইল, তাহার মধ্যে জ্যাকের পকেটে কয়টারই বা সন্ধান মিলিয়াছে,—বাকী সে কোথায় লুকাইল? বেলিসেয়ারের স্কন্ধেও তাহার বিক্রীত টুপির মূল্য-বাবদ সামান্য পয়সাই পাওয়া গিয়াছে! এই অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা কোথায় তাহারা রাখিয়া আসিল?

যেখানেই রাখিয়া আসুক, সন্ধান করিয়া এই টাকা আদায় করিতেই হইবে।

ম্যানেজারের নিকট অপরাধী দুইজনের তলব পড়িল। জ্যাকের তরুণ বয়স, ভদ্র বংশ ও নম্র শান্ত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ম্যানেজার পুলিশের কাছে অনুরোধ করিল, আসামীকে আদালতের হাতে না দিয়া তাহার নিকট আনিয়া দিলে সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা হইতে পারে! জেলে কয়েদীদের দলে পড়িলে জ্যাকের আর শোধরাইবার কোন উপায় থাকিবে না। সারা জীবনটাই তাহার নষ্ট হইয়া যাইবে!

জ্যাক ও বেলিসেয়ার ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল। সে কক্ষে ম্যানেজার, রুদিক ও পুলিশের দুইজন কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ ছিল না।

ম্যানেজার কহিল, "শোন, জ্যাক। তোমার বয়স অল্প, ভদ্র বংশের ছেলে তুমি, আর তোমার শান্ত স্বভাবের জন্য তোমায় আমি ভালবাসতুম! সেজন্য আমিই অনুরোধ করে আদালতের হাতে তোমায় তুলে না দিয়ে এখানে আনিয়েছি। এখানে অসঙ্কোচে তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করতে পার, বাইরের লোক সে কথা

জানবে না। বেশী কথারও দরকার নেই—শুধু বাকী টাকাটা—"

জাক মাথা তুলিয়া কহিল, "মিছে কথা—আমি টাকা চুরি করিনি—"

"চুপ কর, মিথ্যে বলো না, জাক। সাড়ে তিন হাজার টাকা যে তুমি নিয়েছ, এ বেশ জানা যাচ্ছে। এক দিনে এত টাকা তুমি খরচ করতে পার না অবশ্য, আর তা করওনি। কিছু করেছ,—তা যাক্! বাকী যা আছে, ফেরত দাও। আমরা সকলেই তোমায় এবার মাপ করব, তবে এর পর এখানে আর তোমার থাকা সম্বন্ধে অন্য কথা—বাড়ীতে তোমার মার কাছে ফিরে যাওয়াই এখন বোধ হয় ঠিক।"

"আমি কিছু জানি না, মশায়—" বলিয়া বেলিসেয়ার কাঁদিয়া উঠিল।

"চুপ কর্, তুই পাজী—" ম্যানেজার পরুষ কণ্ঠে কহিল, "তুইই যত নষ্টের মূল! এই ভাল মানুষ ছোকরা যে এ নোংরা কাজ করেছে, এ শুধু তোরই পরামর্শে, তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই!"

বেলিসেয়ার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কম্পিত স্বরে রুদিক কহিল, "আপনি ঠিক বলেছেন, মশায়। এরই সঙ্গে মিশে জাক খারাপ হয়ে গেছে। না হলে জাকের মত শান্ত ছোকরা কারখানায় এর পূর্ব্বে আমি দুটি দেখিনি। আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, বাড়ীর সকলেই ওকে ভালবাসে। জাককে আমি নিজের ছেলের মত দেখি—শুধু এরই সঙ্গে মিশে যে জাক এই কাজ করেছে, আমারও তাই বিশ্বাস।"

বেলিসেয়ার ভাবিল, না, তাহার আর কোন আশা নাই। কি অশুভ ক্ষণেই সে দিন সে টুপি বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছিল! যদি সে ক্ষুণাক্ষরেও ইহার আভাস পাইত!

জাক কহিল, "ম্যাসিয়ো রুদিক, এই গরীব টুপিওলার কোন দোষ নেই। কাল যখন পুলিস আমায় ধরে, তার একটু আগেই পথে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিল বলে ওরই সাহায্যে আমি অ্যাঁদ্রেয় ফিরব মনে করেছিলুম,—তাই ও শুধু আমার কথায় আমায় সাহায্য করতে এসেছিল! ও কোন দোষ করে নি।"

ম্যানেজার কহিল, "তবে তোমার একলারই কাজ এ?"

"কিন্তু আমি ত কিছুই করিনি, মশায়। চুরি সম্বন্ধে কিছু জানি-ও না। আমি চোর নই।"

ম্যানেজার কহিল, "সাবধান জাক। এখনও বলছি, দোষ স্বীকার কর! বাকী টাকা ফিরিয়ে দাও, আমরা তোমায় ছেড়ে দেব। তোমার দোষ এত স্পষ্ট যে তা প্রমাণের জন্য সাক্ষী-সাবুদের দরকার হয় না। সে রাত্রে শুতে যাবার সময় জেনেদ্ তোমায় তার টাকা দেখিয়েছিল ত, কেমন? টাকা সে কোথায় রাখে, তাও তোমায় বলেছে? কেমন, নয় কি? তার পর বেশী রাত্রে তুমি তার ঘরে ঢুকে যখন আলমারি খোল, তখন জেনেদ্ জান্‌তে পেরে তোমায় ডেকেছিল, তুমি কোন সাড়া দাওনি! বল, এ সব কথা ঠিক কি না! তুমি ছাড়া বাড়ীতে অন্য লোকও সেদিন আসে নি যে—"

বাধা দিয়া জাক কহিল, "আমি বেশী রাত্রে ও ঘরে যাই নি, আর এ চুরিও আমি করি নি, চুরির কিছু জানিও না।"

"চুরি কর নি তুমি! তবে রাস্তায় অত নবাবি করে যে বেড়িয়েছ, তার দরুণ টাকা, কোথায় পেলে তুমি?"

জাক বলিতে যাইতেছিল, সে টাকা তাহার মা পাঠাইয়াছিল,—কিন্তু সহসা মার সে নিষেধ-বাণী মনে পড়িয়া গেল! মা লিখিয়াছে, যদি কেহ টাকার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে সত্য কথাটা যেন সে না বলে। শুধু বলে, এ টাকা সে জমাইয়াছে! নিজের উপার্জ্জন হইতে জমাইয়াছে। জাক তাহাই বলিল। মা যদি বলিয়া দিত, বলিয়ো, এ টাকা চুরি করিয়াছি, তাহা হইলে জাক সে কথাও নিঃসন্দেহ বলিতে পারিত। মার উপর টান তাহার এমনই প্রবল!

ম্যানেজার কহিল, "জাক, এই কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বল? পাঁচ পেনী রোজের চাকরি থেকে আর এই অল্প সময়ে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছ তুমি,—যে, মদের দাম দিতে মোহর বার কর! না, না, এ-সব চালাকি খাটছে না, জাক, মিথ্যা কথা বলো না, তাতে তোমার বিপদই তুমি আরও ডেকে আনবে। তার চেয়ে মুক্ত কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার কর, আমরা তোমায় ক্ষমা করব!"

জাক কোন কথা বলিল না। কি বলিবে আর? নূতন করিয়া বানাইয়া কিছু ত বলিতে পারে না। তাই সে শুধু নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

রুদিক অগ্রসর হইয়া জাকের মাথায় আপনার কম্পিত শীর্ণ হাত রাখিল, কম্পিত স্বরেই কহিল, "জাক, বল, এ টাকা কোথায়, কার কাছে তুমি রেখেছ। কোন ভয় নেই! জেনেদের কথা ভাব একবার! তার সমস্ত জীবন ঐ টাকার উপর নির্ভর করছে। বিশ বছর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এ টাকা জমিয়েছি আমি! অনেক কষ্ট সহ্য করে, সব রকম ভোগ-বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে জমিয়েছি! ঐ টাকার উপর আমার একমাত্র সন্তানের সুখ, জীবন—সব নির্ভর করছে। তা নিয়ে এমন নিষ্ঠুরতা করো না। তুমি ভাল মানুষ, শরীরে দয়া-মায়াও আছে—তুমি এ কাজ

করতে পার বলে এক দণ্ডের জন্যও আমার মনে হয় নি। কিন্তু পৃথিবীতে প্রলোভন বিস্তর, তার মায়া এড়াতে পারে, এমন মানুষ অল্পই আছে! এক মুহূর্তের দুর্ব্বলতায় একটা মন্দ কাজ যদি করেই থাক, তাতে লজ্জা কি? সে দোষ গোপন করো না, তা প্রকাশ করায়, স্বীকার করায় বরং মনুষ্যত্ব আছে। মুহূর্তের প্রলোভনে মন্দ কাজ করে ফেলা আশ্চর্য্য নয়—তা স্বীকার করলে লোকে ঘৃণা করে না, বরং সে মুক্তকণ্ঠতার জন্য তাকে শ্রদ্ধাও করতে পারে। এস জাক, বল, সে টাকা কোথায়! ও টাকা আমার বুকের রক্ত, পাঁজরার হাড়। এ বুড়ো বয়সে আর উপার্জ্জনেরও আমার শক্তি নেই। দাও, আমার টাকা দাও। না হলে জেনেদ্ মরে যাবে, আমি—"

রুদিকের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। এ কথা শুনিলে নিতান্ত নির্ম্মম যে দস্যু, বুঝি, তাহারও প্রাণ টলিয়া যায়। বেলিসেয়ার কহিল, "জাক, টাকাটা দিয়ে ফেল, যথার্থই এ টাকা বুড়ো মানুষের বুকের রক্ত।"

হতভাগ্য জাক! যদি তাহার নিজের টাকা থাকিত, সে সমস্তই এখনই সে রুদিকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিত! কিন্তু সে কি করিবে—কি করিয়া সে ইহাদের বুঝাইবে যে, সে চোর নয়, জেনেদের বিবাহের টাকা সে চুরি করে নাই। চুরি যদি হইয়াই থাকে, তবে সে চুরির সে কিছুই জানে না। সে বলিল, "যথার্থ বলছি মশায়, আমি চুরি করিনি। ভগবান জানেন—"

রোষে ম্যানেজার জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "যথেষ্ট হয়েছে! আর ভগবানকে এর মধ্যে টেনে এনো না। রুদিকের এ কথা শুনেও যখন তোমার প্রাণ গলে গেল না, তখন বুঝছি, একেবারে অধঃপাতে গেছ, তুমি! থাক্, তবু তোমায় কিছু সময় দিলুম, আরও। ভেবে দেখ।" পরে কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিল, "এদের উপরে রেখে এস কেউ। নিজের মনে বেশ করে সব ভেবে দেখ, জাক, দোষ স্বীকার করবে কি না। না হলে পুলিশ ত আছেই।"

পুলিশের কর্ম্মচারী কহিল, "তাহলে দুজনকে একসঙ্গে রাখবেন না, মশায়। এই টুপিওলাটা ওকে বোধ হয় কোন রকম ইসারা করে দোষ স্বীকার করতে বারণ করে দিয়েছে!"

ম্যানেজার কহিল, "ঠিক কথা। দুজনকে দু' ঘরে রাখ।"

তাহাই হইল। দুইজনকে দুইটা ঘরে রাখা হইল। নির্জ্জন ঘর। ঘরে আসিয়া জাক ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। বিরামদায়িনী, বিস্মৃতিদায়িনী নিদ্রা, কোথায় তুমি, হতভাগ্য বালককে তোমার কোলে তুলিয়া লও। সে নিশ্চিন্ত হউক। আর ভাবাও যায় না।

অপরাহ্নে জেনেদ্ আসিয়া ডাকিল, "জাক!"

কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। জাক কহিল, "জেনেদ, তোমারও বিশ্বাস যে আমি চোর? তোমার টাকা চুরি করেছি?"

জেনেদ্ কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "জাক, আমার মত কুৎসিত স্ত্রীলোক তুমি কখনও চোখে দেখেছ কি? আমি জানি, আমি কুৎসিত। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজের উপরই আমার রাগ হয়। জগতে সবাই সুন্দর, আমিই শুধু রাজ্যের কদর্য্যতা নিয়ে বেঁচে আছি। জাক, আমার মত মন্দ বরাত এ জগতে আর কার? আমার মাঁজ্যাঁ, আমার প্রিয়তম, আমার মত কুশ্রীকে বিয়ে করতে যে রাজী হয়েছে, সে শুধু ঐ টাকার জন্য। ঐ টাকাই আমার সর্ব্বস্ব, ঐ টাকাই আমার রূপ, আমার প্রাণ, আমার ভালবাসা! ঐ টাকার জন্যই শুধু আমি মাঁজ্যাঁর পায়ে ঠাঁই পাচ্ছি! যদিও আমার এ বিশ্বাস আছে, একদিন আমার ভালবাসায় মাঁজ্যাঁকে আমি বশ করব, একদিন আমি তাকে বোঝাব যে, আমার হৃদয়ের কাছে এ টাকার রাশি কত তুচ্ছ! কিন্তু তার আগে এই টাকা না হলে মাঁজ্যাঁকে পাবই না যে! সেই টাকা লুকিয়ে রেখে আমার পৃথিবীর সব সাধ, সব আশা কেড়ে নিয়ো না! জাক, ভাই, দয়া কর। আমার বিয়ের টাকা ফিরিয়ে দাও—তোমার এ উপকার জীবনে কখনও আমি ভুলবো না!"

জাক কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দিবে সে? সে যে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, স্বপ্নেও এমন চিন্তা তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই, এ কথা কেমন করিয়া সে ইহাদের বিশ্বাস করাইবে? ডাগর চোখ দুইটিতে মিনতি ভরিয়া জাক জেনেদের পানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, জেনেদ, একবার তুমি আমার মনের মধ্যে প্রবেশ কর—মনটাকে ঘাঁটিয়া-ঘুঁটিয়া দেখ, সেখানে শুভ ইচ্ছা ভিন্ন আর কোন চিন্তা স্থান পায় কি না! কিন্তু মুখে তাহার কোন কথা ফুটিল না।

জাককে কাঁদিতে দেখিয়া জেনেদ্ কহিল, "কাঁদছ তুমি জ্যাক? তাহলে দয়া হয়েছে? আমি ত জানি, তুমি নিষ্ঠুর নও! যে জেনেদের সুখের সম্ভাবনায় অত তুমি সহানুভূতি দেখিয়েছিলে, সেই জেনেদের সর্ব্বনাশ তুমি করতেই পার না—জাক—" জেনেদ সস্নেহে জাকের হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল, তাহার নত মস্তক তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "জাক, ভাই, টাকাটা তবে দাও—"

"কিন্তু জেনেদ, যথার্থ বলছি, আমি তোমার টাকা নিই নি!" জাকের দুই গাল বহিয়া অশ্রু নামিল।

"না, না, ও কথা বলো না, জাক। আমি মরে যাব, মরে যাব, তাহলে। বল, চুপি চুপি বল, কার কাছে রেখেছ! কিছু খরচ করে ফেলেছ,—তার জন্য লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।"

"জেনেদ্, কি করে তোমাদের বিশ্বাস জন্মাব? যথার্থ বলছি, আমি টাকার কথা কিছুই জানি না! আমি চুরি করি নি! তোমরা ভুল করছ! আমি চোর নই। কি করলে তুমি বিশ্বাস করবে, আমি চোর নই! তোমরা সকলে এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে কেন আমায় চোর বলে সন্দেহ কচ্ছ?"

জেনেদ্ যেন উন্মাদের মত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "দেখ, আমার বিয়ের আশা নির্ম্মূল হবে। তোমার পায়ে ধরি জাক—"

জেনেদের নয়নে বর্ষার বন্যা নামিল। অজস্র মিনতি ও অনুরোধে জাককে সে কাতর, পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু জাক—হতভাগ্য জাক—সে কি করিবে। বহুক্ষণ ধরিয়া অনুরোধ মিনতি করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন জেনেদ্ গর্জ্জিয়া উঠিল, "এততেও তুমি স্বীকার করবে না! তবে সাজা পাও! জগতে সকলের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃসহ জীবন নিয়ে তুমি বেঁচে থাক—আমি তোমায় আজ এই শাপ দিলুম।"

জেনেদ্ তখন নামিয়া ম্যানেজারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল, "কি হল?"

জেনেদ্ কোন উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি হইতে হতাশার এমন একটা গভীর হাহাকার ঠিকরাইয়া পড়িল যে, ম্যানেজার তাহা দেখিয়া সমস্তই বুঝিল।

ম্যানেজার কহিল, "জেনেদ্, স্থির হও, কেঁদো না। পুলিশের হাতে ওকে দেবার পূর্ব্বে টাকা আদায়ের চেষ্টা একবার আমরা করি। রুদিকের কাছে শুনেছি, ওর মার হাতে অনেক টাকা আছে। তাকে সব ঘটনা খুলে লেখা যাক। যদি ভাল লোক হয় ত ছেলের এ কীর্ত্তির কথা শুনে তোমার টাকা নিশ্চয়ই তারা দিয়ে দেবে।"

একখণ্ড কাগজ লইয়া ম্যানেজার তখন পত্র লিখিতে বসিল,

"মাননীয়াসু,—

আপনার ছেলে জাক রুদিকের কন্যার বিবাহ-পণের সঞ্চিত সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। পুলিশের হাতে এখনও তাহাকে সঁপিয়া দিই নাই। এই টাকার কতক সে খরচ করিয়াছে, বাকী কোথায় রাখিয়াছে, তাহা বহু চেষ্টাতেও কবুল করাইতে পারিলাম না। কাজেই আপনাকে লিখিতেছি, যদি এ টাকা আপনি পাঠাইয়া দেন, তবেই আপনার পুত্রকে রুদিকরা ক্ষমা করিবে, নচেৎ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এই টাকার উপরই বেচারা রুদিকের একমাত্র কন্যার জীবন নির্ভর করিতেছে। এই টাকা বেচারা বৃদ্ধ পিতার আজীবন পরিশ্রমের সঞ্চয়। তিন দিন আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকিব। রবিবার কিম্বা সোমবার বেলা দশটার মধ্যে যদি আপনার উত্তর না পাই, তাহা হইলে আসামীকে অগত্যা পুলিশের হাতে দিতেই বাধ্য হইব। ইতি ম্যানেজার।"

পত্রের নীচে ম্যানেজার নিজের নাম সহি করিল।

বৃদ্ধ রুদিক কহিল, "বড় দুঃখের কথা! এ চিঠি পড়ে মার বুক একেবারে ভেঙ্গে যাবে। আহা!"

জেনেদ্ ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল, "যাক ভেঙ্গে! তার ছেলে আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছে—মা এখন তা পুষিয়ে দিক!"

হায় যৌবন! হায় প্রেমের অন্ধ নির্ম্মমতা! পুত্র-কৃত এই দারুণ দুষ্কর্ম্মের সংবাদ মার প্রাণে কতখানি আঘাত দিবে, সে ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্যও জেনেদের মনে স্থান পাইল না। বেচারা রুদিকের চিত্ত করুণা ও সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া আসিল—এমন সংবাদ শুনিলে রুদিক যে কখনও প্রাণে বাঁচিত না, ইহা নিশ্চয়।

রুদিকের মনে এইটুকু শুধু আশা রহিল, এ চিঠি জাকের মার কাছে না পৌঁছিতেও পারে! ক্ষুদ্র এক টুকরা কাগজ, কতটুকু তাহার জীবন! অসংখ্য কত চিঠি-পত্রের সহিত একত্র সে যাইবে—পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ ঘটিতে পারে! পৌঁছিবার সম্ভাবনা অল্পই! এমন কত-শত ক্ষুদ্র পত্র প্রায়ই ত পথে হারাইয়া যায়।

কিন্তু রুদিক ভুল বুঝিয়াছিল। ম্যানেজার যে পত্র আজ ইদার নামে লিখিয়া পাঠাইল, অন্যান্য পত্রের সহিত সেখানি যাত্রা আরম্ভ করিবে, নিশ্চয়! পিয়ন পত্র বাছিয়া ব্যাগে পুরিবে। সেই ব্যাগ ষ্টীমারে উঠিয়া, ট্রেণে চড়িয়া বহু ব্যাগের সহিতই ট্রেণের ডাক-কেরাণীর হাতে পড়িবে। পরে বিস্তর পত্রের সহিত এ পত্র পোষ্ট-অফিসে গিয়া জমা হইবে—তার পর পারিতে পৌঁছিবে! সেখানে পত্রখানি কেহ ছিঁড়িবে না, হারাইবে না, পোড়াইবে না! ঠিকানায় মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য হরকরার হাতে তুলিয়া দিবে। এ চিঠি নষ্ট হইবে না। হইতে পারে না—কারণ, এ চিঠি যে দুঃসংবাদ বহিয়া চলিয়াছে। দুঃসংবাদবাহী পত্রগুলার জীবন আশ্চর্য্য টিঁকিয়া থাকে। পথে তাহাদের বিনাশ ঘটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না; বিনাশ ঘটেও না।

এ পত্র-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিল। ট্রেণে উঠিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া কেরাণীর হাতে ঘুরিয়া পিয়নের ব্যাগে ফিরিয়া একদিন প্রভাতে এতিয়েন্নের পরিচ্ছন্ন কুটীরে ম্যানেজারের পত্র আসিয়া পৌঁছিল। কুটীর-সম্মুখে ফটকের প্রাচীরে একখানি ফলক,—তাহাতে লেখা আছে, "আরাম-কুঞ্জ—" বৃষ্টির জল ও রৌদ্র মাখিয়া অক্ষরগুলা শুধু ঈষৎ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রহস্য ভেদ

আজিকার প্রভাতে "আরাম-কুঞ্জ" নামটি প্রকৃতই সার্থক মনে হইতেছিল। বহির্জগতের সকল প্রকার অশান্তি ও কোলাহল হইতে বর্জ্জিত, বিহঙ্গ কূজন-মুখরিত এই নির্জ্জন পল্লীবাস-ভূমিটিকে আজ এ স্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রভাতে সত্যই একখণ্ড মায়ালোক বলিয়া মনে হইতেছিল।

ইদা দ্রাক্ষাগুচ্ছ হইতে শুষ্ক ফলগুলা বাছিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। অতিথি ডাক্তার হাবৃজের এখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল, "চিঠি!"

"অ্যাঁদ্রের চিঠি" বলিয়া আর্জাস্ত পত্রখানা সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া খপরের কাগজের মোড়ক খুলিল। চিঠিখানা ইদাকে দিল না। ইদা নিকটে আসিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে চিঠিটার পানে চাহিয়া রহিল।

আর্জাস্ত তাহা লক্ষ্য করিল। চিঠিখানা ব্যগ্র ইচ্ছা সত্ত্বেও যে ইদা শুধু তাহারই ভয়ে হাতে লইতে পারিতেছে না, ইহা সে বুঝিল। বুঝিয়া অন্তরে সে এক বিকট আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া প্রকাশ্যে সে বলিল, "আঃ, আবার এ কি একটা নতুন বই বেরল! ভিক্টর হিউগোর লেখা দেখছি! কি যে সব ছাই-পাঁশ লেখে, মানেও কিছু বোঝা যায় না! অবিশ্রামই লিখছে! এতে কখনও ভাল লেখা বার হতে পারে? কত ভেবে চিন্তে তবে একখানি বই লিখতে হয়! এই যে আমি আজ ক'বছর ধরে শুধু ভাবছি— এক ছত্রও লিখিনি! একেই ত বলে সাধনা!"

এ কথাতেও ইদার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। অ্যাঁদ্রের পত্র আসিলে তাহার মাতৃত্বের সকল গর্ব্ব নিমেষে যেন দৃপ্ত হইয়া উঠে,—অপর কোন বিষয়ে আর লক্ষ্য থাকে না। আর্জাস্তর কবি-যশের বিচিত্র স্বপ্নে তখন আর কিছুতেই তাহাকে ভুলানো যায় না! পুত্রের এক ছত্র হাতের লেখায় তাহার চোখে বাহ্যজগৎ একেবারেই মিলাইয়া যায়! এইটুকু আর্জাস্ত কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। হিংসায় তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে থাকে! নানাভাবে কঠিন নিষ্ঠুর হইয়াও সে কিন্তু ইদার মনের বেগ সামলাইতে পারে না। শুধু এই জন্যই জাককে সে দূরে—বহুদূরে পাঠাইয়াছে। নাহলে জাক লেখাপড়া শিখিল, কি কারখানার কারিকর হইয়া উঠিল, তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া-যায় না!

কিন্তু এই দূরত্বের ব্যবধান মার প্রাণখানিকে ছেলের প্রাণের আরও কাছে টানিয়া আনিয়াছিল। স্নেহের সুগভীর আকর্ষণে বাহিরের সব ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছিল। অন্তরে বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে জাক এখন অহর্নিশিই মার মনে জাগিয়া থাকে।

জাক চলিয়া যাইবার পর ইদার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। কেমন করিয়া সে প্রাণ ধরিয়া থাকিবে? আর্জাস্তর সম্মুখে ইদা জাকের নামও উচ্চারণ করিত না —কবি ইহাতে বিরক্ত হইত! কিন্তু আর্জাস্ত সহস্র বাধা দিলেও ইদা জাককে একদণ্ডের জন্যও ভুলিতে পারিল না। ভিতরের অনুরাগ প্রবলতর হইয়াই উঠিতেছিল।

আর্জাস্ত ইহা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল; এবং ইহাতেই জাকের প্রতি তাহার বিরক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। পরে যখন রুদিক খপর দিল, কাজ-কর্ম্মে জাকের তেমন মনোযোগ নাই, তখন একটা পৈশাচিক আনন্দে মাতার মর্ম্মে আঘাত দিয়া সে বলিল, "দেখ, তোমার কেমন তৈরী ছেলে! কোন ক্ষমতা নেই! কারখানার কাজেও মাথা খেলে না! এমন অপদার্থ!"

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে! জাককে সে পদে পদে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইত। ইদার চোখে জাকের অক্ষমতা ও অপদার্থতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে তাহার আগ্রহের যেন সীমা ছিল না। ইহাতে সে আনন্দ লাভ করিত। আজ শেষে অ্যাঁদ্রের চিঠি খুলিয়া পড়িবার লোভ-সম্বরণে অক্ষম হইয়া সেখানা খুলিয়া ফেলিল— খুলিয়া যাহা পাঠ করিল, তাহাতে আনন্দে তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল! পত্রখানা ইদার দিকে ছুড়িয়া আর্জাস্ত কহিল, "দেখ, ছেলের কাণ্ডখানা দেখ! এ রকম যে হবে, তা আমি আগে থেকেই জানতুম!"

কি নির্ম্মম আঘাত! নিষ্ঠুর বেদনা এ! মাতার গর্ব্বে মাতার স্নেহে আহত হইয়া বেচারী ইদা কাঁদিয়া ফেলিল! কম্পিত স্বরে সে কহিল, "কিন্তু তুমি, তুমিই এর জন্য দায়ী! কেন তুমি তাকে তাড়িয়ে দিলে?"

যাক্‌, যেমন করিয়া হৌক, জাককে এখন রক্ষা করিতেই হইবে। কাঁদিয়া ফল কি! কিন্তু, কি উপায়ে? কি উপায়ে রক্ষা করা যায়! এত টাকা সে কোথায় পাইবে? তাহার কোন সঙ্গতি নাই—সে যে একেবারে রিক্ত নিঃস্ব! গৃহের আসবাবপত্র গাড়ীঘোড়া প্রভৃতি বেচিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, কবির সাহিত্যিক মজলিস প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতেই যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

কে এখন অর্থ দিয়া তাহার জাককে উদ্ধার করিবে? অকস্মাৎ সেই 'বন্ধুর' কথা ইদার তখন মনে পড়িয়া গেল! বিদায়ের পূর্ব্বে বন্ধু তাহাকে কিছু উপহার দিতে চাহিয়াছিল, সে তাহা গ্রহণ করে নাই। অতীত ভালবাসার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বন্ধু সাগ্রহে উপহার দিতে আসিয়াছিল, পাছে আর্জাস্তর সম্মানে আঘাত লাগে, ইহা ভাবিয়াই প্রেমের সে

অযাচিত দান সে উপেক্ষা করিয়াছে। আজ ইদা নিঃস্ব! দুই-চারিখানা অলঙ্কার যাহা আছে, তাহা বিক্রয় করিলেও এত টাকা মিলিবে না! কবির নিকট এ দুঃখ নিবেদন করা, মিথ্যা! তাহার প্রকৃতি ইদার বেশই জানা ছিল। প্রথমতঃ কবি জাককে ঘৃণা করে, তাহার উপর সে মহা-কৃপণ! সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও হীন মাৎসর্য্যে যাহার হৃদয় ব্যাকুল, মাতৃহৃদয়ের এ আগ্রহ সে বুঝিবে না, বুঝিতে সে পারে না! তাই সে স্থির করিল, কবির কাছে কোন সাহায্যে সে চাহিবে না! তবে কে এমন সুহৃৎ আছে, কে এমন উদার পরোপকারী—?

আর্জান্ত কহিল, "ও ছেলেকে আর এখন শোধরাবার চেষ্টা করা মিছে! এতদূর যে উচ্ছন্ন গেছে—"

কথাটা ইদা শুনিয়াও শুনিল না। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, একটা কথা! তিন দিনের মধ্যে টাকার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে—তিন দিনের মধ্যে না দিলে তাহার প্রাণের জাক জেলে যাইবে।

আর্জান্ত আবার কহিল, "ছি, ছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার মাথা হেঁট হল! লোকের এত খোসামোদ করেছি, আমি, এই ছেলেকে মানুষ করে দেবার জন্য! আমার চূড়ান্ত শিক্ষা হল—"

ইদা কহিল, "এ তিন দিনের মধ্যে যেমন করে পারি, আমি এ টাকার যোগাড় করে পাঠাব—না হলে জাককে তারা জেলে দেবে।"

আর্জান্ত কহিল, "এ কলঙ্কের হাত এড়ানো দরকার বটে। কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবে তুমি, শুনি?"

"তুমি যদি দয়া করে—"

আর্জান্ত বাধা দিল, বুঝিল, টাকা দিবার জন্য ইদা তাহাকে অনুরোধ করিবে। রাগে সে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "আমি দয়া করব? জানি, তুমি শেষ আমাকেই ধরবে। আমার খরচটা ভারী সামান্য কি না! আমার টাকার গাছ আছে! তুমি আমার অনেক টাকা দেখেছ, না? দু বছর তাকে খাইয়ে আমার যা খরচ হয়েছে, তা কোন সৎকার্য্যে দিলে দেশের কত উপকার হত! একখানা বই ছাপালেও জগতে একটা জিনিস থাক্‌ত! এখন আমি তার চুরির খেসারত দেব? চুরির সাড়ে তিন হাজার টাকা,—বড় সহজ জিনিস কি না!"

ইদার মুখ রাক্তম হইয়া উঠিল। দৃঢ় স্বরে সে কহিল, "তোমার কাছে এক পয়সাও আমি সাহায্য চাইছি না—তোমায় কিছু করতে হবে না, তার জন্য। শুধু—"

"তবে তুমি এত টাকা পাচ্ছ, কোথায়? কে এত টাকা দেবে?"

এতটুকু সঙ্কোচ-বাধা না মানিয়া ইদা তখন বন্ধুর নাম করিল। তিনি—তিনি এ টাকা এখনই দিবেন। নিশ্চয়!

প্রেমে, স্নেহে ইদাকে পরম আদরে একদিন যে গ্রহণ করিয়াছিল—যাহার আশ্রয়, নিতান্ত দুর্ভাগিনী সে, মুহূর্ত্তের ভুলে ত্যাগ করিয়া এ পথে আসিয়াছে, তাহার সেই উদার-হৃদয়, উপেক্ষিত বন্ধুর নিকট গিয়াই সে কাঁদিয়া পড়িবে! যাহাকে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে পাপিষ্ঠা সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই বন্ধু এ বিপদে কখনও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ইদা সেই বন্ধুর কাছেই যাইবে।

শুনিয়া আর্জান্ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। অনুমানে সে ইহাই বুঝিয়াছিল।

ইদার অতীত জীবন গভীর রহস্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। শান্ত, সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার প্রাণ যৌবনের উন্মেষে যে উদ্দাম চপল প্রেমের তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীর পরিমিত আদর-ভালবাসায় তৃপ্তি লাভ করে নাই! স্বামীর এক কর্ম্মচারীর কুহকে পড়িয়া অভাগিনী আপনার নারী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিপথ-গামিনী হয়! উদার-হৃদয় স্বামীর সে মহত্ত্ব, ইদা জীবনে ভুলিবে না! তাঁহার করুণারও কি সীমা ছিল! তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তার পর যে পাপিষ্ঠ ইদাকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া আনে, সে যখন তাহার গহনাপত্র, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া ভিখারিণীর মত পথে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন এই বন্ধুই তাহাকে আশ্রয় দেন! স্বামীর সহিত মিলন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইদা এই বন্ধুর নিকট হইতেও যে ভালবাসা লাভ করিয়াছিল, অনেক স্ত্রীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। ইদা যাহাতে কোন কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে বন্ধুর সুদৃঢ় লক্ষ্য ছিল। দীর্ঘকাল বন্ধুর আশ্রয়ে কাটাইয়া ইদা তাহাকেও শেষে ত্যাগ করিল! তাহার পর নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আর্জান্তর সহিত নূতন করিয়া ইদা সংসার পাতিয়াছে—কিন্তু সুখশান্তি স্বামীর আশ্রয়ের সহিতই সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল! দুর্ভাগিনী নারী জীবনে আর কখনও সে সুখের স্বাদ পায় নাই! পাইবার আশাও নাই আর! বিপথে একবার আসিলে মুক্তি নাই—মুক্তি নাই! গড়াইতে গড়াইতে কোথায় গিয়া শেষ তলাইয়া পড়িবে, তাহারও কোন ঠিকানা নাই!

আর্জান্ত কহিল, "তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? এখন তুমি আমার—"

ইদা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "কিন্তু তাঁর বন্ধুত্বের উপর একটু শুধু দাবী—"

আর্জান্ত কহিল, "বেশ, তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না! তবে তুমি একলা যেতে পাবে না—আমি সঙ্গে যাব।"

ইদা সবিস্ময়ে কহিল, "তুমিও যাবে! বেশ—তাহলে

ত ভালই হয়। ওখান থেকে বরাবর অমনি আমি অ্যাঁঞ্জেয় যাব, কেমন ?"

আর্জান্ত জানিত, ইদা ভুরেনে যাইবেই! বন্ধুর নিকট হইতে এ অর্থ ভিক্ষা করিতে সে এতটুকু দ্বিধা করিবে না। কোন বাধাই সে মানিবে না! তথাপি অতীত ইতিহাস তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল! পুরাতন প্রেম যদি আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। ইদা সেখানে কত সুখে, কত আদরে ছিল! যে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বহুদিন সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া, তাহারই বিচিত্র মোহ যদি ইদাকে আজ আবার লুব্ধ করিয়া তুলে! তাহারই মায়ায় ইদা যদি আর্জান্তকে ত্যাগ করে! এখানে পরুষ নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন একটা মিষ্ট কথাও ত তাহার ভাগ্যে মিলে না। তাই ইদাকে একা যাইতে দিতে আর্জান্তর মন সরিল না।

এদিকে যে ইদাকে নহিলে আর্জান্তর চলেও না। তাহার এই দম্ভে দর্পে সায় দিয়া যাইবে, এমন লোক ইদা ভিন্ন পৃথিবীতে আর দুইটি মিলিবে না! অক্ষম লেখকের গর্ব্ব-আস্ফালন—এই নিরীহ মুগ্ধ ভক্ত ভিন্ন কেহই যে সহ্য করিবে না। তাহা ছাড়া তাহার মাথায় যে নূতন একখানা নাটকের কল্পনা সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভ্রমণে তাহা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া নিমেষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, এ আশাও তাহার মনে বিলক্ষণ জাগিতেছিল।

ডাক্তার হার্জের উপর গৃহ-রক্ষার ভার দিয়া আর্জান্ত ও ইদা তুরেন যাত্রা করিল।

আর্জান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি, টাকা পেলে ?"

"হ্যাঁ। ইনি ঠিক করেছিলেন, জাককে একেবারে কিছু দান করবেন—নগদ দশ হাজার টাকা। এঁর বড় সাধ, জাক ফৌজে ঢোকে! সে সংসারী হলেই দশ হাজার টাকা উনি তাকে দেবেন, এমনই ইনি ঠিক করেছিলেন! তা যখন দরকার, তখন আজই সে দশ হাজার টাকা ইনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সাড়ে তিন হাজার ত অ্যাঁঞ্জেয় দিতে হবে, আপাততঃ। বাকীটা, ইনি বলছেন, জাকের যাতে ভাল হয়, ভবিষ্যতে উন্নতি হয়, এমনভাবে যেন খরচ করা হয়।"

"বেশ হয়েছে। বাকী সাড়ে ছ' হাজার আমি খাটিয়ে কারবারে দেব'খন। এখানে শুনছিলুম, অল্প বয়সে চুরি করে' যে সব ভদ্রলোকের ছেলে-পিলেরা গোল্লায় যায়, তাদের শোধরাবার জন্য, তাদের মানুষ করবার জন্য একটা সভা আছে, জাককে সেইখানে দি, কি বল? এতে পরে তার ভাল হবে।"

চুরি—চোর। কথাটা ইদার মরমে বিঁধিল। জাক চুরি করিতে পারে, এমন চিন্তাও যে তাহার মনে স্থান পায় না! চোখে দেখিলেও যে ইহা বিশ্বাস হয় না! কিন্তু সেই চিঠিখানা—কি নিষ্ঠুর ভীষণ সংবাদই সে বহিয়া আনিয়াছে! সত্যই কি এ চিঠিখানা আসিয়াছে, না, এ একটা শুধু দুঃস্বপ্ন? ইদা স্বপ্ন দেখিতেছে?

ইদা কহিল, "সে ভেবে চিন্তে পরে স্থির করা যাবে! এখন ত আগে অ্যাঁঞ্জেয় যাওয়া যাক।"

আনন্দে গর্ব্বে কবির চোখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতগুলা টাকার উপর আধিপত্য করিবে, সে—পথে সে জাকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কল্পনা ফাঁদিয়া বসিল! অতীতের ইতিহাস মন হইতে মুছিয়া জ্যাককে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, কি উপায়ে,—তাহারই বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সে রীতিমত বক্তৃতা দিয়া চলিল—ইদার অন্ধ মাতৃস্নেহের প্রতিও দুই চারিটা বক্র ইঙ্গিত করিতে ছাড়িল না। ইদার দোষেই, ইদার স্নেহের আতিশয্যে, শাসনের অভাবেই শুধু জাক মাটি হইতেছে, বিবিধ তর্ক ও যুক্তি তুলিয়া এই কথাটাই আর্জান্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। পরিশেষে, "হয় তাকে এবার আমি বশ, নয় চূর্ণ করব" এই কথা বলিয়া আর্জান্ত আপনার বক্তব্যের মাত্রা শেষ করিল।

ইদা কোন জবাব দিল না। পুত্রকে যে কারার যন্ত্রণা হইতে সে মুক্তি দিতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াই তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না। আর্জান্ত ইদাকে বুঝাইল, সে একাই অ্যাঁঞ্জেয় যাইবে, ইদাকে সেই নীচ লোকগুলার বিদ্রূপ-দৃষ্টির সম্মুখে কিছুতেই সে দাঁড়াইতে দিবে না—দিলে, ইদার মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন ত হইবেই, তাহার উপর জাকও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইতে পারে—হইবেও। সে দারুণ অপমান হয় ত বেচারা সহ্য করিতে পারিবে না! শেষে স্থির হইল, আর্জান্ত টাকা লইয়া ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া জাককে মুক্ত করিয়া আনিবে,—ইদা ষ্টীমারে তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিবে! এ ব্যবস্থায় ইদা সহজেই সম্মত হইল।

সেদিন রবিবার। পথে ঘাটে বিশ্রামের এক অপূর্ব্ব আনন্দ, বিরামের এক গভীর তৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। নদীবক্ষে, ষ্টীমারে, নৌকায় নাবিকের দল গান ধরিয়াছিল। তীর হইতে কুলি ও কারিকরদের হর্ষ-উল্লাসের উচ্ছ্বাসতরঙ্গ ভাসিয়া আসিতেছিল। আর্জান্ত নামিয়া গেলে ষ্টীমারে বসিয়া ইদা শুধু তাহার জাকের কথা ভাবিতেছিল! সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও জাক তাহার ছেলে! কত দুঃসহ মুহূর্ত্তে জাক তাহার প্রাণে পরম শান্তি বহিয়া আনিয়াছে, তাহার তপ্ত প্রাণ স্নিগ্ধ সরল স্নেহে জুড়াইয়া দিয়াছে, জগতে তাহার একমাত্র আপনার, জগতে তাহার সর্ব্বস্ব, সেই প্রাণাধিক পুত্র জাক—ইদা কি কখনও তাহাকে ত্যাগ করিতে

পারে ? না। ইহজগতের সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও জাককে সে ত্যাগ করিবে না, করিতে পারে না !

শৈশবের সেই গাল-ভরা হাসি, মার আদরে সেই পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—নির্ম্মল একখানি ছবির মতই ইদার মনে আজ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। অঁ্যাদ্রে যাইবার সময় সেই কাতর নয়নের বাক্‌হীন বেদনা কাঁটার মতই আজ ইদার মর্ম্মে বিঁধিতেছিল ! সেই জাককে নির্ম্মম হৃদয়ে সে বিদায় দিয়াছে ! কারখানার কঠিন কাজে জাকের স্বাস্থ্য, না জানি, কতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বিভালের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে ! কেন সে জাককে দুই হাতে চাপিয়া বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিল না ! কোন্ প্রাণে ছেলেকে সে মা হইয়া এখানে পাঠাইল। আজিকার কথা ইদা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল ?

চারিদিককার এই অভদ্র উল্লাস-চীৎকারে তাহার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল ! ইহারাই জাকের কর্ম্মসঙ্গী—! ইহাদের সঙ্গেই জাক আজ দুই বৎসর বাস করিতেছে ! মনটাকে বিক্ষিপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইদা আর্জাস্ত-কথিত সেই সভার ছাপানো বিবরণী-পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল,—

"বালক-চরিত্র-সংশোধনী সভা

শাসন-আলয়। নির্জ্জন কারাবাস-ব্যবস্থায় দুষ্ট বালকগণকে শিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহে বন্দী রাখিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না—মেশা ত দূরের কথা।

চূড়ান্ত আয়োজন ! পরীক্ষা প্রার্থনীয় !"

আর্জাস্ত ইতিমধ্যে তীরে নামিয়া রুদিক-গৃহের খোঁজ করিয়া তাহারই অভিমুখে চলিয়াছিল। আপনার ক্ষমতা দেখাইবার আজ তাহার কি চমৎকার সুযোগই না মিলিয়াছে ! অপরাধীকে বক্তৃতার বাণীতে কিরূপ সে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ম্যানেজারের নিকট কি ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, পথে সে তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল !

একজন বৃদ্ধা রমণী আর্জাস্তকে রুদিকের গৃহ দেখাইয়া দিল। তাহার নির্দ্দেশ-মত আর্জাস্ত আসিয়া যখন রুদিক-গৃহের সম্মুখে পৌঁছিল, তখন সে শুনিল, ভিতরে গান চলিয়াছে ! গান থামিলে কে হাঁকিল, "আরে, এদিকে এস, মাষ্টার জাক—"

এ কি ! জাক তবে হাজতে নাই—এখানে ! কবি বিস্মিত হইল।

দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কবি দেখিল, সম্মুখের ছোট দালানে রীতিমত মজলিস জমিয়াছে। সাত-আটজন বালিকার হাত ধরিয়া জাক মহাস্ফূর্ত্তিতে নৃত্য লাগাইয়াছে, এবং অদূরে দেওয়ালে পিঠ দিয়া টুলের উপর বসিয়া, এক দীর্ঘকায়া নারী ! এ আনন্দ-উৎসবের অর্থ কি ? ব্যাপার——!

ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

জাকের মাকে ম্যানেজার যেদিন পত্র লিখিল, তাহার পরদিন মাদাম রুদিক উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারের অফিসের দিকে ছুটিল। বাহিরের কোন বাধা-বিদ্রূপে বিচলিত না হইয়া একেবারে আসিয়া সে ম্যানেজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মশায়, আমি জানি, বেচারা জাক কোন দোষে দোষী নয়। এ চুরির সে কিছুই জানে না—! জেনেদের টাকা সে চুরি করে নি !"

ম্যানেজার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, "কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে !"

"প্রমাণ ! কোথায় প্রমাণ। কে দিয়েছে, প্রমাণ ? স্বামী সেদিন বাড়ী ছিলেন না, জাক একা ছিল,—এইতেই কি যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল ? কিন্তু এ প্রমাণ আমি মিথ্যা বলে দেখাতে এসেছি। জাক একাই যে সেদিন বাড়ী ছিল, তা নয়—আর একজন লোকও ছিল—"

"আর একজন ? কে—সে ? নাস্ত্—?"

"হাঁ, নাস্ত্ !" ক্লারিসের স্বর এতটুকু কাঁপিল না। তাহার মুখে বিষাদের একটা গভীর ছায়া পড়িয়াছিল।

"নাস্ত্ই তবে এ টাকা চুরি করেছে ?"

ক্লারিসের পাণ্ডু মুখে দ্বিধার একটা রেখা পড়িয়া মুহূর্ত্তেই তাহা সরিয়া গেল। অবিচলিত স্বরে সে কহিল, "না, নাস্ত্ চুরি করে নি ! নাস্ত্ চোর নয়। আমিই তাকে এ টাকা নিজের হাতে চুরি করে এনে দিয়েছি !"

"দুর্ভাগিনী নারী—"

"সত্যই দুর্ভাগিনী ! সে বললে, দুদিনের মধ্যেই এ টাকা সে শোধ করে দেবে। আমি দু'দিন অপেক্ষা করলুম—এ দু'দিন আমার স্বামীর দুঃখ, জেনেদের চোখের জল, নির্দ্দোষ বেচারা জ্যাকের লাঞ্ছনা, এ সব আমি এই চোখে দেখে সহ করেছি ! সে কি কষ্ট ! কিন্তু কৈ, নাস্ত্ এল না ত ! কাল তাকে আমি চিঠি দিয়েছি, লিখেছি, আজ ভোরের মধ্যে যদি সে টাকা দিয়ে না যায়, তা হলে সব কথা আমি প্রকাশ করে দেব—! তবু সে এল না—তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

"তাই তুমি এসেছ। কিন্তু আমি কি করতে পারি ?"

"কি করতে পারেন ! যথার্থ যে চোর, যথার্থ যে দোষী, তাকে ধরিয়ে দিন, নির্দ্দোষ যে, তাকে মুক্ত করে দিন !"

"কিন্তু তোমার স্বামী—বেচারা রুদিক! এ কথা শুনলে সে মরে যাবে—"

"ভালই হবে! আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব! আমার মত পাষাণীর মরাই উচিত! পৃথিবীর পাপের ভার কম হবে।"

ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে কহিল, "তোমার মৃত্যু হলেই যদি জেনেদের টাকা পাওয়া যেত ত, তোমার মরণ কায়মনোবাক্যে আমি প্রার্থনা করতুম। কিন্তু এ আত্মহত্যায় নিজেই তুমি শুধু মুক্তি পাবে! ব্যাপার সমানই থাকবে। বরং আরও ভীষণ দাঁড়াতে পারে।"

"তবে কি করব, বলুন।" উত্তেজনায় ক্লারিস হাঁপাইতেছিল। তাহার মুখে-চোখে এ কয়দিনে কে যেন ঘন ঘন কালীর একটা কালো দাগ টানিয়া দিয়াছে।

ম্যানেজার কহিল, "এ টাকার কিছু বোধ হয় এখনও তার হাতে পড়ে আছে—সেটা প্রথমত উদ্ধার করতে হবে! সব বোধ হয় একেবারে খরচ হয়ে যায় নি?"

ক্লারিস ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কে জানে! এই দুর্দ্দমনীয় জুয়া-খেলার নেশা নাস্তকে ভূতের মত চাপিয়া ধরিয়াছে, তাই ভয় হয়—

ম্যানেজার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইল। সে আসিলে ম্যানেজার তাহাকে বলিল, "এখনই স্যাঁ-নাজেয়ারে দু-চারজন লোক সঙ্গে করে তুমি নিজে যাও। নাস্তের সঙ্গে দেখা কর। নাস্তকে বলবে, এখনই যেন সে আমার কাছে আসে। তাকে না নিয়ে তোমরা ফিরবে না।"

কর্ম্মচারী কহিল, "নাস্ত্ ত অ্যাঁদ্রেতেই আছে। এইমাত্র তাকে রুদিকের বাড়ীর কাছে আমি দেখে আসছি—"

"বেশ, তবে শীঘ্র যাও। মাদাম রুদিক যে এখানে আছে, সে কথা তাকে বলো না—! সাবধান! সে যেন এতটুকু সন্দেহও না করতে পারে! যাও।"

কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে ম্যানেজার শূন্য মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্লারিস্ স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরে কারখানায় তখন কাজ চলিয়াছে। বাষ্প-নির্গমের শব্দেও যেন কখনও মিনতি, কখনও অনুযোগের সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে! লোহপেটার দুমদাম ভীষণ শব্দ চলিয়াছে! কিন্তু ক্লারিসের অন্তরে আজ যে নানা ভাবের সংগ্রাম-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহার কাছে বাহিরের এ কোলাহল কিছুই নয়!

দ্বার খুলিয়া নাস্ত্ ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সে কহিল, "আমায় ডেকেছেন, আপনি?"

সহসা পার্শ্বস্থিতা ক্লারিসের পানে নাস্তের নজর পড়িল। ক্লারিসের বিষণ্ণ ম্লান মুখ, ম্যানেজারের রুক্ষ দৃষ্টি—ব্যাপার বুঝিতে নাস্তের আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। ক্লারিস্ আপনার কথা রাখিয়াছে তবে,—ম্যানেজারের কাছে সই কথাই সে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

নিমেষের জন্য নাস্তের শরীরে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল—একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এখনই এই দুর্ব্বল নারীটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, ম্যানেজারকে তাহার এই অনধিকার-চর্চ্চার সমুচিত শাস্তি দিয়া সে পলাইয়া যায়! কিন্তু ক্লারিসের রক্তহীন বিবর্ণ মুখের পানে আর একবার চাহিতেই সে প্রবৃত্তি তাহার অন্তর্হিত হইল। অনুতাপে চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমায় ক্ষমা করুন।" নাস্ত্ চোখের জল রোধ করিতে পারিল না।

ম্যানেজার কহিল, "কান্না, ক্ষমা,—ও সব রেখে দাও, নাস্ত্! কাজের কথা কও। এই স্ত্রীলোক, শুধু তোমার জন্য, তোমারই অনুরোধে, আপনার স্বামি-কন্যার সর্ব্বস্ব চুরি করেছে। দুদিনের মধ্যে তোমার এই টাকা দেবার কথা ছিল—"

কৃতজ্ঞতায় নাস্ত্ অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ক্লারিসের পানে আর একবার চাহিল। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিয়া ক্লারিস্ নিজেই এ চোরের অপবাদ মাথায় লইয়াছে! ক্লারিস্ নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল—নাস্তের পানে মুখ তুলিয়া একবারও সে চাহিল না! সেই ভীষণ রাত্রে নাস্তের সহিত সকল সম্পর্ক সে চুকাইয়া দিয়াছে! আর নূতন করিয়া বন্ধনের কোন প্রয়োজন নাই!

ম্যানেজার কহিল, "কৈ, সে টাকা?"

"এই যে আমি এনেছি—"

যথার্থই নাস্ত্ টাকা আনিয়াছিল। গৃহে ক্লারিসকে না দেখিয়া সে তাহারই সন্ধান করিতেছিল, এমন সময় ম্যানেজারের কর্ম্মচারী গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনে!

ম্যানেজার কহিল, "এতে পুরো তিন হাজার আছে?"

"না, চারশ কম—"

"বুঝেছি। এ চারশ টাকা আজ জুয়া খেলবার জন্য তুমি রেখেছ!"

"না, যথার্থ না! এ টাকা আমি হেরে গেছি। কিন্তু শীঘ্রই তা দিয়ে দেব।"

"বেশ! আপাততঃ আমিই না হয় এ টাকা পূরিয়ে দিচ্ছি—পরে তুমি এ চারশ' টাকা দিয়ো। বেচারী জেনেদের বিয়েরও আর দেরী নেই—তোমার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। যাই হোক, রুদিককে জানানো চাই, কেমন করে এ টাকা চুরি গেছে! এখানে বসে সংক্ষেপে তুমি আগাগোড়া সব কথা লিখে দাও—"

কি লিখাইয়া লইবে,—ম্যানেজার তাহাই ভাবিতেছিল। নাস্ত্ কোন কথা না বলিয়া বসিয়া কলম ধরিল। ক্লারিস্ একবার মথা তুলিল! সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল!

কি পত্র লিখাইয়া লইবে, এ পত্রের উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে যে!

ম্যানেজার কহিল, "নাও, লেখো—ম্যানেজার মশায়, রুদিকের আলমারিতে জেনেদের যে যৌতুকের টাকা ছিল—তা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা যা চুরি গেছে, —তা আমিই নিয়েছি। অন্য লোককে তার জন্য দোষী করবেন না।"

নাস্ত্ একবার আপত্তি করিল, কিন্তু ক্লারিসকে তাহার ভয় ছিল। অথচ অন্য উপায়ও নাই। কাজেই সে ম্যানেজারের কথামত লিখিতে লাগিল,—

"এ টাকা আমি ফেরত দিলাম! রাখিতে পারিলাম না। এ টাকা আমার সমস্ত মনকে তাতাইয়া তুলিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আমি শান্তি পাইতেছি না। যে নিরীহ, নির্দ্দোষ বেচারাদের উপর এই চুরির জন্য নির্য্যাতন চলিতেছে, তাহাদিগকে এই দণ্ডে মুক্তি দিন। তাহারা চুরির কিছুই জানে না। রুদিককে বলিবেন, তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি কারখানা ত্যাগ করিলাম। লজ্জায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। যদি কখনও চরিত্র সংশোধন করিতে পারি, ঐকান্তিক পরিশ্রমে কখনও যদি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, করিয়া মানুষ হই, তবেই আবার ফিরিয়া সাধু-চরিত্র রুদিকের সঙ্গে দেখা করিব, আঁদ্রের মুখ দেখাইব, নহিলে চির-বিদায়।"

লেখা হইলে ম্যানেজার কহিল, "নাও, সই কর।"

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে নাস্ত্ পত্রের তলদেশে নাম স্বাক্ষর করিল। ম্যানেজার কহিল, "এখন তুমি যেতে পার! গোরক্রীতে যেতে পার—সেখানে আমি তোমার কাজেরও জোগাড় করে দিতে পারি! মানুষ হবার চেষ্টা কর, নাস্ত্। আর মনে রেখো, আঁদ্রের বদি আর কখনও তোমায় কেউ দেখে, তবে সেই মুহূর্ত্তেই চোর বলে তোমায় ধরিয়ে দেব! তোমার এই চিঠিই তখন তোমার অপরাধের সাক্ষ্য দেবে।"

নাস্ত্ চলিয়া গেল। ম্যানেজার কহিল, "ঘরে যাও, মাদাম রুদিক। তোমার স্বামীর জন্যই শুধু এ কাজ করলুম আমি—সত্য কথা জানতে পারলে বেচারার প্রাণে দারুণ ঘা লাগবে—"

"সে ঘা না লাগুক! আমি আমার স্বামীকে এবার সমস্ত বেদনা থেকে মুক্তি দেব, স্থির করেছি—"

"তার মানে?"

"এ প্রাণ ত্যাগ করব। জীবনটাকে নানাভাবে আমি জড়িয়ে ফেলেছি—এ বাঁধন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত বাঁধন কেটে তাকে আমি মুক্তি দিতে চাই।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার একটা দারুণ আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। আশ্বাসের স্বরে ম্যানেজার কহিল, "মাদাম রুদিক, মনে সাহস আনো। এ চিঠি রুদিকের হাতে পড়লে তার মনে কতখানি কষ্ট হবে, ভাব দেখি! তার উপর যদি তুমি আত্মহত্যা কর ত, সে আঘাতের বেদনা রুদিকের প্রাণে কতখানি বাজবে—তা ভাবছ কি? তাকে শান্তিতে জীবনের এ শেষ কটা দিন থাকতে দাও—আর অভিভূত করো না। যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই। ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো করে গড়ে তুলতে পারো, তারই চেষ্টা কর। সকলকে সুখে রাখবার চেষ্টা কর—নিজে সুখ পাবে, শান্তিও মিলবে।"

"আপনার কথা রাখবার চেষ্টা পাব—" বলিয়া মাদাম রুদিক ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিল।

রুদিক এ পত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল। নাস্ত্ চুরি করিয়াছিল? নাস্ত্,—তাহার ভাই? সে চোর! অথচ তাহার পত্নী ক্লারিস এই নাস্ত্কে কত ভালবাসে! যৌতুকের অর্থ ফিরাইয়া পাইয়া অত্যধিক আনন্দে জেনেদ্ তাহার সকল কষ্টই ভুলিয়া গেল।

আর জাক? বেচারা জাক? তাহার জয়ধ্বনিতে রুদিক-গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ম্যানেজার স্বহস্তে জাককে নির্দ্দোষিতার বিবরণ লিখিয়া কারখানার সর্ব্বত্র সকলের নিকট তাহা পড়াইয়া শুনাইল। অন্যায় লাঞ্ছনার জন্য জাককে ডাকিয়া ম্যানেজার তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আর রুদিক-গৃহের ক্ষমা ও আদরের আতিশয্যে জাক অভিভূত হইয়া পড়িল।

বেলিসেয়ার মুক্তি পাইয়া নিমেষেই কোথা অদৃশ্য হইয়া গেল।—কাহারও সহিত সে সাক্ষাৎ করিল না।

জাকের জন্যই বিশেষ করিয়া আজ রুদিক-গৃহে নাচের আসর বসিয়াছিল। রুদিক সহস্রবার ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া কবিকে সকল কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল। কয়েকটা প্রমাণ নিতান্তই জাকের বিরুদ্ধে ছিল—নহিলে মনের মধ্যে একবারও সে জাককে অপরাধী ভাবিতে পারে নাই!

তথাপি আর্জাস্ত শাসনের গম্ভীর বাণীতে জাককে পীড়িত করিয়া তুলিল। বাছা বাছা কথা দিয়া যে বক্তৃতাটুকু সে ঠিক করিয়া আনিয়াছিল, তাহার অব্যবহার ত হইতেই পারে না। কাজেই আর্জাস্তকে কোন-মতে নিরস্ত করা গেল না। রুদিক বারবার বলিতে লাগিল, "ওকে বলবার কিছু নেই—সাহেব। আমরা বারবার ক্ষমা চাইলেও আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।" তথাপি আর্জাস্তর মুখে যখন ভাব ও ভাষার বান ডাকিয়াছে, তখন তাহাকে রোধ করে, এমন সাধ্য সেখানে কাহারও ছিল না!

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার একটা ছত্রও জাকের হৃদয়ঙ্গম হইল না—শুধু এইটুকু সে বুঝিল, তাহারই মুক্তির জন্য

করি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, শুধু আসা না,—সঙ্গে টাকাও আনিয়াছে! এ অর্থ কে দিল, আর্জান্ত তাহা মোটেই ভাঙ্গে নাই। জাক ভাবিল, আপনার অর্থ দিয়া আর্জান্ত তাহার মুক্তি ক্রয় করিতে আসিয়াছে! এমন হৃদয়বান লোককে বরাবর সে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে! কি অন্যায় সে করিয়াছে। সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় আজ আর্জান্তর পায়ে জাকের মন লুটাইয়া পড়িল! আর্জান্ত এত মহৎ!

দুষ্ট ঘোড়াকে বশে আনিতে পারিলে সওয়ারের যেমন আনন্দ হয়, জাকের এই ভাব দেখিয়া আর্জান্তরও ঠিক ততখানি আনন্দ হইল। সে ভাবিল, "এবার আমি ছোকরাকে বশ করেছি।"

পরে উভয়ে পথে বাহির হইল। মার সংবাদ পাইয়া জাকের প্রাণে আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। আর্জান্তর প্রতি তাহার বিশ্বাস আজ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, জাক কহিল, "কারখানার কাজ আমার মোটে ভাল লাগে না! কারিকর হতে পারব না, আমি! এই নির্জ্জনতার মধ্যে থেকে, কাকেও না দেখে, মাকে না দেখে, আমার মন কেমন ভার হয়ে থাকে, কাজ করতে মোটেই ভাল লাগে না! কাজ যে খুব শক্ত, তা নয়, তবে যাতে মাথা খাটানো যায়, এমন কাজই আমার পছন্দ। এখানে যে কাজ, এ সব গায়ের জোরের—নিতান্তই কলের কাজ! মোটে মাথা খেলাতে হয় না, এতে সুখও এতটুকু নেই—"

গভীর নিশ্বাসে জাক আর্জান্তর হাতখানা আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। আর্জান্ত হাত টানিয়া লইল। সে ভাবিতেছিল, ইদা এখানে আসিয়াছে, এ সংবাদ জাককে সে দিবে কি না! মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ—? কিন্তু না, কিছুতেই তাহা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইদা জাককে বুকে চাপিয়া ধরিবে। জগতে জাক ছাড়া ইদা কাহাকেও তেমন অন্তরের সহিত চাহে না—! সাক্ষাৎ হইলে আর্জান্তর কথা ইদা একবারও মনে করিবে না—জাককে লইয়াই সে অস্থির হইয়া উঠিবে। আর টাকার কথাও বাহির হইয়া পড়িবে। এ আনন্দ আর্জান্তর প্রাণে সহ্য হইবে না। ঈর্ষায় তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহা হইলে এই যে মহত্ত্বের নিশানটা উড়াইয়া দেওয়া গেল, তাহার দশা কি হইবে। সত্য কথাটা জাহির হইলে তখনই সে নিশান ছিঁড়িয়া যাইবে যে! তাই সে স্থির করিল, না, ইদার সহিত জাকের সাক্ষাৎ ঘটিতে দেওয়া কিছুতেই বুদ্ধির কাজ হইবে না!

জাকের কথার উত্তরে আর্জান্ত কহিল, "তোমার এ কথা শুনলে তোমার মার মনে বড় কষ্ট হবে। তাঁর বড় সাধ, তুমি কারিকর হও। যেমন করে পার, যত কষ্টই হোক, কারিকর হওয়া তোমার চাই-ই! তোমায় ত কতবার বলেছি, জাক—এ জীবন নহেক স্বপন!—কথাটা চিরদিন মনে রেখো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনও কষ্ট পাবে না।"

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। হতভাগ্য জাকের প্রাণ মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে জানিল না—আর কয়েক পদ দূরেই তাহার মা একান্ত উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তাহারই মুখখানি দেখিবার জন্য অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। হায়, ইঙ্গিতেও যদি এ কথা সে জানিতে পারিত!

ষ্টীমারে প্রতীক্ষা করা অসহ্য হইয়া উঠায়, ইদা তীরে নামিয়া ব্যাকুলভাবে জাকের পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল! আজ দুই বৎসর পরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! আঃ! এমন সময় আর্জান্ত ফিরিয়া আসিল! ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "জাক?"

আর্জান্ত কহিল, "কোন ভাবনা নেই। সে ছাড়া পেয়েছে। লজ্জায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে না—এত বললুম আমি। আর লজ্জা তার হতেও পারে,—এ রকম একটা অন্যায় করে ফেলেছে! ছাড়া পেয়েই কোথায় যে ছুটে পালিয়ে গেল! তারপর আমিও ভাবলুম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে হয়ত মন খারাপ হতে পারে, কাজে মন বসতে আবার কিছুদিন লাগবে—এখন দেখা করতে চাচ্ছে না যখন, তখন থাক্ না হয়! কাজেই আর পেড়াপেড়ি করলুম না,—সন্ধানও নিলুম না—"

ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। একটা অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

আজ এত কাছে আসিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর পরেও, পুত্রের সহিত দেখা হইল না! এত কাছে, যে, একবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনা যায়! কে জানে, কবে আবার দেখা হইবে! মাতার অতৃপ্ত হৃদয়ের কাতর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-যাত্রা

দুঃখের দিন দীর্ঘ বোধ হইলেও, কোনমতে কাটিয়া যায়। জাকের দিনও কাটিয়া যাইতেছিল।

উক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জেনেদ বিবাহের পর স্বামীর গৃহে গিয়াছে। এ দুই বৎসরে জাক আপনার দুর্ব্বল বাহু দুইটাকে কারখানার কাজে দড় করিয়া তুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে।

তাহার শিক্ষানবীশীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে কারখানায় কাজ করিয়া বেতন পায়। বেতন সামান্য—কাজের অনুপাতে অপর কারিকরের মত জাক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে পারে না; হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার হাত ভারিয়া যায়, সর্ব্ব দেহ হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়ে। কাজ করিয়া তাহার করতল দুইটা কঠিন পরুষ হইয়া উঠিয়াছে; হাতে কড়া পড়িয়াছে। দিনের শেষে দেহটাকে কোনমতে টানিয়া সে রুদিকের গৃহে ফিরে, তার পর আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়ে। আবার ভোরেই গাত্রোত্থান করিয়া কারখানায় ছুটিতে হয়। কাহারও সহিত মিশিতে বা গল্প করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। জীবনটা নিতান্তই স্ফূর্ত্তিহীন, লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রুদিক-গৃহেও ইদানীং কেমন-একটা স্তব্ধতা বিরাজ করিত। জেনেদ চলিয়া যাওয়ায় তাহার ঘর খালি পড়িয়া রহিয়াছে। মাদাম রুদিকও আর ঘরের বাহির হয় না, বা কাহারও প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যেও সে বসিয়া থাকে না! পর্ব্বত-গাত্র-নিঃসৃত নির্ঝরিণী যেমন আপনার বেগে আপনিই বহিয়া যায়, কোনদিকে লক্ষ্য রাখে না, মাদাম রুদিকের জীবনটাও তেমনইভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। কোন দিকে আর তাহার লক্ষ্য ছিল না, জীবনে বৈচিত্র্যও ছিল না। রুদিক আপনার কর্ত্তব্য পথে তেমনই অচপল স্থির লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিল। এই শান্ত ক্ষুদ্র পরিবারটির উপর দিয়া সদ্য যে একটা উদ্দাম ঝড় বহিয়া গিয়াছে, গৃহখানির প্রতি একটু মনোযোগ-দৃষ্টি স্থাপন করিলে সহজেই তাহা বুঝা যায়।

জাকের জীবনে ইতিমধ্যে ছোট একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটনাটি নিতান্ত সামান্য হইলেও প্রভাব তাহার যথেষ্ট ছিল। এবার শীতটা প্রচণ্ড পড়িয়াছিল, বর্ষাও রীতিমত নামিয়াছিল। সহরের পথ-ঘাট বহুদিন জলমগ্ন ছিল। কাজ-কর্ম্ম তাহারই মধ্যে সারা হইতেছিল।—সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া জাকের অতিরিক্ত সর্দ্দি-কাসি হইয়া পড়িল। সপ্তাহাধিক কাল জ্বর-গায়ে কারখানায় তাহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল-- তার পর একেবারে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। সামান্য জ্বর ও কাসি লাগিয়াই রহিল; মধ্যে মধ্যে বাড়িত। মার কাছ হইতে পত্রাদিও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মার চিঠিতে জাক জানিয়াছিল, আর্জান্তঁর কাজের ভিড়ে পত্র লিখিবার বিজন অবসর তাঁহার একরূপ দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি জাকের চিন্তা তাঁহার মনে অহরহই জাগিয়া আছে। জাক যেন পূর্ব্বের মতই নিয়মিত পত্রাদি লিখিয়া মাতার ভাবনা দূর করে! কবি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া "কষ্টের কন্যা" নাটকের রচনা শেষ করিয়াছেন। প্রকাণ্ড পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকখানি কয়েকটি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে দেখানও হইয়াছে, কিন্তু এই সব স্বার্থ-সর্ব্বস্ব দুর্বৃত্ত লোকগুলা আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা দেখাইয়া বহিখানি ফেরত দিয়াছে। কবি তাহাতে একান্তই কাতর মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রতিভার বাণী একবার যাহার হৃদয়ে সাড়া দিয়াছে, এ সকল তুচ্ছ অবহেলা কি কখনও তাহাকে বাধা দিতে পারে? কবি তাই মোরোন্‌ভা প্রভৃতির সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। যেদিন সে সাধনার কথা জগতে প্রচার হইবে, সেদিন একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলে শুধু সারা পারির অধিবাসী নহে, সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত চকিত হইয়া উঠিবে! সে শুভদিনও আসন্নপ্রায়!

মোরোন্‌ভা, মাড, জিম্‌-নাজ! সে আজ কতদিনের কথাই বা! তত দুঃখের মধ্যেও সে কি সুখে দিন কাটিত! জিম্‌নাজের জাক ও কারখানার জাক, দুইজনে কত প্রভেদ! জিমনাজের জাক—সে এক শান্ত, সুসভ্য কোমল ভদ্র বালক আর কারখানার জাক—হাড়গুলা উঠিয়া পড়িয়াছে, হাত কড়া কঠিন হইয়াছে, অগ্নির তাপে থাকিয়া দেহের বর্ণ মলিন কদর্য্য হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার রিভালের কথাই আজ বর্ণে বর্ণে ফলিয়া উঠিয়াছে! সামাজিক সম্পর্কই মানুষে-মানুষে বিভিন্নতা আনে, ব্যবধানের সৃষ্টি করে!

রিভাল গৃহের স্মৃতিতে সহসা জাকের চিত্ত আজ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। আর্জান্তঁর সহস্র নিষেধ-সত্ত্বেও রিভালকে সে ভুলিতে পারে নাই। জাকের জীবনের একাংশে যাহা কিছু শুভ্র উজ্জ্বল ছিল, তাহা রিভালের স্নেহ কিরণ-স্পর্শেই! প্রতিবর্ষের প্রথম দিনটিতে রিভাল-পরিবারের শুভ কামনা করিয়া জাক রিভালকে পত্র লিখিত। তাহার উত্তরও আসিত। সে কি মধুর আশ্বাস-পরিপূর্ণ স্নেহের উচ্ছ্বসিত বাণী! এ বৎসর কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই! কেন? তাহারা কুশলে আছে ত? কে জানে! আর সেসিল! সেসিলের নাম মনে পড়িবামাত্র জাকের নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল!

এই সুগভীর হতাশার মধ্যে একটি কথা শুধু জাকের প্রাণে শক্তির সঞ্চার করিত। সে তাহার মাতার কাতর অনুরোধ!—মা লিখিয়াছিল, "জাক, আপনার দিন কিনিয়া নাও, মানুষ হও, রোজগার-ক্ষম হও। যেদিন তুমি আমার ভার লইতে পারিবে, সেই দিন আমি সুখী হইব—সেই দিন আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।"

কি করিয়া মার দুঃখ ঘুচাইবে সে? মাহিনা অতি সামান্য, কাজ করিবার শক্তিও তাহার অল্প; সুতরাং বেতন-বৃদ্ধির আশা নিতান্তই ক্ষীণ! শান্ত নম্র প্রিয়দর্শন

হইলে কি হইবে! কাজ চাই! কাজ কর, মাহিনা মিলিবে, মাহিনা বাড়িবে। সেরূপভাবে কাজ করিবার শক্তিই বা দুর্ব্বল জাকের কোথায়! লাবাস্থান্দ্রের আশ্বাস-সত্ত্বেও জাক তেমন কর্ম্মঠ হইয়া উঠিল না—সে সম্ভাবনাও মোটে ছিল না। এই সত্তেরো বৎসর বয়সে শিক্ষানবীশীর যুগ কাটাইয়া সে দৈনিক আধ ক্রাউনের বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিত না। এই আধ ক্রাউনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে বাসা-খরচ জোগাইতে হইবে, তাহার উপর কাপড়-চোপড় এবং রোগ হইলে পথ্যাদিও আছে! অসম্ভব! অসম্ভব! এ জীবনে উন্নতির কোন আশা নাই। মা আজ যদি সহসা লিখিয়া বসেন, "জাক, আমি তোমার কাছে যাইতেছি—?"

রুদিক একদিন জাককে ডাকিয়া কহিল, "এ কাজে এসে তুমি ভাল করনি, জাক! ভদ্রলোকের ছেলের কি এ কাজ পোষায়? উন্নতির আশা ত কিছু দেখছি না, তোমার। আমি হলে এখানে পড়ে না থেকে অন্য কোনদিকে চেষ্টা দেখতুম। এক কাজ করবে, জাক—? সিদনু জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার সেদিন একটি লোকের কথা বলছিলেন—এঞ্জিনের জন্য তাঁর একজন লোক চাই। দিনে পাঁচ সিলিং মাহিনা। সারা পৃথিবী ঘুরবে,—খাওয়া-দাওয়াও আলাদা পাবে! কাজটা প্রথমে শক্ত বোধ হবে, কিন্তু একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ভবিষ্যতে উন্নতির এতে খুবই সম্ভাবনা আছে! চাই কি, একদিন জাহাজের কাপ্তেনও হতে পার। করবে, এ কাজ?"

সানন্দ চিত্তে জাক সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মাসিক সাড়ে সাত পাউণ্ড মাহিনায় আরম্ভ! সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ! জাকের চিত্ত উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। মাতুর নিকট হইতে অজানা কত দেশের কত বিচিত্র কাহিনী সে শুনিয়াছিল। শৈশবে দুই-চারিটা রূপকথায় পরীর দেশের সুমধুর স্বপ্নের কাহিনী শুনিয়া কি মোহে তাহার চিত্ত মাতিয়া উঠিত, আজ জাকের তাহাই মনে পড়িল। প্রথমে এঞ্জিনে কয়লা দিবার কাজ করিতে হইবে—তাহাতে কি আসিয়া যায়! পরিশ্রম এখানকার চেয়ে লঘু হইবে ত। উন্নতিরও আশা আছে!

চারি বৎসর পরে একদিন প্রভাতে মাদাম রুদিকের কাছ হইতে বিদায় লইয়া রুদিকের সহিত জাক অঁ্যাদ্রে ত্যাগ করিল। সেদিনকার প্রভাত কি স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল!

ছোট ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া জাক চারিধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া ষ্টীমারের বিপরীত দিকে চলিয়াছে। ক্রমেই তাহার বিস্তারিত দেহ চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে। বায়ু নির্ম্মল, জল পরিষ্কার, আকাশ রৌদ্রে রঞ্জিত! দূরে তীর-প্রান্তে বৃক্ষগুলার উচ্চতা ক্রমেই হ্রস্ব হইতেছে, পরস্পরের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া একটা দীর্ঘ শ্যামল দেওয়ালের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে কর্ষিত ক্ষেত্রের পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন জলাভূমি। কোথাও নদীর তীরে সারি সারি মিলের চিমনি হইতে ঘন-কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইয়া একদিককার আকাশটাকে মসী-নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। বায়োস্কোপের ছবির মতই একটির পর আর একটি বিচিত্র দৃশ্য আসিয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে! নদী ছাড়িয়া ষ্টীমার ক্রমে সাগরের মুখে আসিয়া পড়িল। তরঙ্গের কি এ উদ্দাম উন্মাদ নৃত্য! দুরন্ত শিশুর মতই বায়ু সহর্ষে সে নৃত্যলীলায় যোগ দিয়াছে! জল লইয়া মহানন্দে সে লোফালুফি সুরু করিয়াছে!

জাক পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখে নাই। জল, জল! চারিধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই জল! অনন্ত অসীম পারাবার। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন বিপুল হর্ষ ঠিকরিয়া উঠিতেছে। ভ্রমণের নেশা জাককে বিভোর উন্মাদ করিয়া তুলিল।

ক্রমে অদূরে দক্ষিণে পর্ব্বতের ক্রোড়ে স্যাঁ-নাজেয়ারের গৃহ-চূড়াগুলা ফুটিয়া উঠিল। অগণিত মাস্তুল-শির! দেখিলে মনে হয়, কে যেন আকাশের গায়ে কালির অজস্র রেখা টানিয়া দিয়াছে। ষ্টীমার আসিয়া একটা জেটিতে লাগিল। জেটির কাছে আশে-পাশে প্রকাণ্ড সব জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল,—এক-একটা যেন বিরাট দুর্গ, যেমন সুন্দর, তেমনই দৃঢ়।

রুদিক ও জাক জেটিতে নামিল। সেখানে উভয়ে শুনিল, সিদনু জাহাজ সেই দিনই দুই-তিন ঘণ্টা পরে জেটি ছাড়িবে। জাককে লইয়া রুদিক তখন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত দেখা করিল। জাককে দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার কহিল, "ছোকরাটির শরীর তেমন মজবুত নয়, বোধ হচ্ছে, রোগা দেখছি ত।"

রুদিক কহিল, "সম্প্রতি ওর জ্বর হয়েছিল। জাহাজে থাকতে থাকতেই এটা সেরে যাবে। সমুদ্রের হাওয়ায় স্বাস্থ্যও ভাল হবে।"

"বেশ! বেশী কথা কবার এখন আর সময় নেই, রুদিক! মাহিনার সম্বন্ধে কথা হয়ে গেছে ত? আপাততঃ পাঁচ শিলিং। আর কাজ—"

"হাঁ, সে সব কথা আমি বলেছি।"

"বেশ, ছোকরার নাম কি?"

"জাক!"

জাককে জাহাজে রাখিয়া রুদিক বিদায় লইল। জাহাজ দেখিয়া জাক বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অসংখ্য লোকজন! সকলেই দারুণ ব্যস্ত! ভিতরে কল-কব্জারও সংখ্যা নাই। কি, এ ব্যাপার!

জাককে সঙ্গে লইয়া ইঞ্জিনিয়ার অনেকগুলা সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নতলে এঞ্জিন-কক্ষে আসিল, একটা

কৃষ্ণগহ্বর দেখাইয়া কহিল, "এখানে কয়লা আছে। এটা বয়লার, এতে কয়লা জোগাতে হবে। এই তোমার কাজ!"

বয়লার! চাহিয়া জাক দেখে, এ যেন এক সুদীর্ঘ অগ্নির হ্রদ! অনলের লেলিহান রসনা ভীষণ দৈত্য-রসনার মতই লক্-লক্ করিতেছে! সেখানে যাহারা কাজ করিতেছে,—তাহাদের মুখ, নগ্ন বুক ও পোষাক কয়লার গুঁড়ায় বিকট কালো! দেখিয়া মনে হয়, ইহারা যেন একটা ভীষণ প্রলয়-সাধনের চেষ্টায় এই নরকের মধ্যে গোপনে কি ষড়যন্ত্র লাগাইয়া দিয়াছে।

সর্দ্দারকে ডাকিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া দিল, "এই ছোকরা তোমার এখানে কাজ করবে—এর নাম, জাক।"

সর্দ্দার কহিল, "খুব সময়ে এসেছে—কয়লা দেবার জন্য এখনই আমাদের একজন লোক চাই। এস জাক।"

জাক কাজে লাগিয়া গেল। বড় খোন্তার সাহায্যে ভস্ম-স্তূপের সহিত দগ্ধ কয়লার রাশি বয়লার হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। পরে ঝোড়ায় বহিয়া, সেই কয়লা ডেকে উঠাইয়া আনিয়া, সেখান হইতে সাগর-বক্ষে তাহা ফেলিয়া দেওয়া,—এই তাহার কাজ! কাজটি কঠিন। ঝোড়ায় বোঝাই যাহা দেওয়া হয়, তাহা রীতিমত ভারী, সোপান-শ্রেণীও দীর্ঘ এবং সরু। তাহা ছাড়া উপরকার মুক্ত শীতল বায়ু ছাড়িয়া এই অন্ধকূপে বদ্ধ উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে নামিয়া আসবার সময় নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে। এক বার, দুই বার জাক ঝোড়া বহিল। তৃতীয় বার পা আর তাহার উঠিতে চাহে না। ঝোড়া তুলিতে না পারিয়া ক্লান্তভাবে সে বসিয়া পড়িল। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস সজোরে বহিতেছে। একজন সহকর্ম্মী আসিয়া কহিল, "নাও, একটু ব্রাণ্ডি খাও দেখি—"

জাক কহিল, "আমি ব্রাণ্ডি খাই না।"

"খাও না? তবেই এখানে কাজ করেছ, তুমি। এ খাটুনি তবে সইবে, কি করে? কখনও খাও না?"

"না!" জাকের পেশীগুলা একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। চেষ্টা করিয়া কোন মতে সে কয়লার ঝোড়া পৃষ্ঠে তুলিয়া আবার উঠিল।

ডেকের শোভা তখন পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র বেশ-ধারী যাত্রীর দল ডেকে সমাগত হইয়াছে। তাহাদের আনন্দ দেখিয়া জাকের মনে হইল, এই প্রকাণ্ড জাহাজ যেন একটা ভূখণ্ড,—কত দেশের কত জাতির লোক এখানে একত্র আসিয়া মিলিয়াছে। কাহারও মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, কাহারও বা আসন্ন বিদায়-দুঃখে বিষণ্ণ, মলিন।

জাক তন্দ্রাবিষ্টের মত শূন্য ঝোড়া হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মুখ দিয়া এক নারী সুন্দর পরিচ্ছেদে ভূষিত এক বালকের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। দেখিয়া জাকের এক অতীত দিনের কথা মনে পড়িল,—যখন সে মার হাত ধরিয়া নির্ম্মল প্রফুল্ল চিত্তে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত! নারীটি যেন তাহার মার প্রতিবিম্ব। আর এই বালক যেন অতীত দিনেরই সেই সজ্জিত সুন্দর জাক! বালকের পরিচ্ছদ জাকের গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া নারী বালককে ভৎর্সনা করিয়া উঠিল, "দেখে চল্‌তে পারিস্‌নে। এখনই এই খালাশিটার গায়ের সমস্ত কয়লা পোষাকে লাগিয়েছিলি আর কি!"

মুহূর্ত্তে জাকের চেতনা হইল। নিমেষে সে দেখিল, কোথায় তাহার স্থান। তাহার স্পর্শও আজ কতখানি অবজ্ঞার, কি হেয়। হায় ধিক, এ হীন জীবনে!

জাহাজের কাপ্তেন হাঁকিয়া উঠিল, "দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখছ হে ছোকরা? যাও, নিজের কাজে যাও।"

জাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে আপনার কাজে নীচে নামিয়া গেল। সেই আবর্জ্জনাময় অনল-কুণ্ডই এখন তাহার যোগ্য স্থান!

জাকের জীবন-ইতিহাসে এ এক নূতন পৃষ্ঠা আজ খুলিয়া গেল। কালি-ঝুলমাখা সঙ্গীদের সহিত কালি-ঝুলি মাখিয়া এই অনল-গহ্বরে বসিয়াই তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে। অন্য উপায়ই বা কি আছে? মিছা দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই! মনে শক্তি আনিয়া জাক কাজ করিতে লাগিল। কাজ করিতে করিতে তাহার মনে হইত, সে যেন অন্ধ বধির হইয়া গিয়াছে, জীবন-শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে! শুধু একটা যন্ত্রের মত দম খাইয়া সে কাজ করিয়া চলিয়াছে! অপরে যাহা করে, তাহা দেখিয়া সেইরূপেই সে কাজ করিয়া যায়! শ্রান্ত হইলে সকলে একটা নলের ধারে গিয়া সবলে নলটা টিপিয়া ধরে এবং উপর হইতে বাহিরের মুক্ত বায়ুর একটা ঝলক্ আসে। সেইটুকু পরম তৃপ্তির সহিত সকলে উপভোগ করে! সেও সেইরূপ করিত! আঃ, কি সুন্দর! সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া যায়! তার পর ব্রাণ্ডি! একটু পান না করিলে চলে না, সত্যই ক্লান্তি ঘুচে না। অগত্যা জাককে ব্রাণ্ডি পান করিতে হইল। পান করিয়া সে যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিত।

এই ঘনান্ধকার জীবনে আলোর ক্ষুদ্র বিন্দু মাঝে মাঝে অন্তরে তাহার জাগিয়া উঠিত। সে তাহার মার চিন্তা! মাকে ইদানীং সে দেবীর মত আপনার হৃদয়-মন্দিরে একান্ত ভক্তির সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করিত! মাকে সুখী করিতে হইবে—ইহা ভাবিয়াই জাক আপনার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতে না। মার দুঃখ কিছুও যদি সে ঘুচাইতে পারে ত সে কি সুখ!

বন্দরে জাহাজ থামিলেই জাক একখানি করিয়া মার চিঠি পায়! অমনই তাহার সকল শ্রান্তি ঘুচিয়া

যায়। জাকের পত্র এক্ষণে সুদূর ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইদা প্রায়ই অনুযোগ করিত। কিন্তু জাক সত্যই অবসর পাইত না। ইদার পত্র আর্জান্তঁর সংবাদেই পূর্ণ থাকিত। ইদা এভিয়োল ছাড়িয়া পারিতে গৃহ লইয়াছে। পারিতে বাস করিবার প্রয়োজনও হইয়াছে। মোরোনভা প্রভৃতির সাহায্যে একটি নূতন সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোরোনভা প্রভৃতি তাহার তত্ত্বাবধান করে। তদ্ভিন্ন ইদা লিখিয়াছে, "এতদিনে দেশের এক গুরুতর অভাব মোচন হল। বন্ধু-বান্ধবদের নিতান্ত আগ্রহে আর্জান্তঁ একখানা মাসিকপত্র বার করছেন। কাগজখানা দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ থাকবে! নতুন প্রতিভাশালী লেখকদের উৎসাহ দেওয়াই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য! যে সব বিখ্যাত মাসিক পত্র আছে, তাদের অহঙ্কার বড় বেশী, আর তা-ছাড়া তাদের সব সম্পাদকরা এমন পরশ্রীকাতর যে নতুন লেখকদের কোনরকম উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, তাদের দমিয়ে হঠিয়ে দেবার জন্যই সর্ব্বদা সব প্রস্তুত। এতে কবিরও একটা উপকার হবে। তাঁর লেখা এবার থেকে লোকে পড়বে, তাঁকে সবাই চিনবে! কি অমূল্য সম্পদ সাহিত্যে তিনি দান করছেন, এবার তারা বুঝবে! আমিও এ বিষয়ে যতটুকু পারি তাঁকে সাহায্য কচ্ছি। মোরোনভা বেশ একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি এখন "ফষ্টের কন্যা" নাটকখানা নকল কচ্ছি। কাগজ বেরুলেই তোমায় পাঠাব। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি—বড় দেখবার ইচ্ছা হয়। সুবিধামত তোমার একখানা ছবি তুলিয়ে আমায় পাঠিয়ো—তা দেখেও আমার প্রাণ কতক ঠাণ্ডা হবে।"

ইহার কয়দিন পরে জাহাজ যখন হাভানায় আসিয়া নোঙর ফেলিল, তখন পোষ্ট অফিস হইতে জাক এক প্রকাণ্ড প্যাকেট পাইল। মোড়ক খুলিয়া জাক দেখে, একখানি দীর্ঘাকৃতি গ্রন্থ,—আর্জান্তঁর সম্পাদিত মাসিক-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। লেখা আছে,

ভবিষ্য জাতির আলোচনা
মাসিক-পত্র
কবিবর আর্জান্তঁ সম্পাদিত
সূচী

বিষয়	লেখক
আমরা যাহা আছি, এবং যাহা হইব	··
ফষ্টের কন্যা—নাটক—প্রস্তাবনা	কবি আর্জান্তঁ
উপনিবেশে শিক্ষাবিস্তার	এভারিস্ত মোরোনভা
ভবিষ্য যুগের কারিকর	··· লাবাস্যান্দ্র্
পুষ্প-সুরভির সাহায্যে রোগ-চিকিৎসা	ডাক্তার হারুজ
অপেরা হাউসের ম্যানেজারের প্রতি একখানি পত্র	··· এল্।

জাক একবার পাতাগুলা উল্টাইয়া গেল। পড়িয়া সে কিছুই বুঝিল না। কতকগুলা দুর্ব্বোধ কথার সমষ্টিমাত্র। কালির অক্ষরে কে যেন শুধু হেঁয়ালির জাল বুনিয়া গিয়াছে। কভারটা বেশ রঙ্গিন কালীতে পরিপাটী করিয়া ছাপা হইয়াছে।

সূচীতে লেখকদের নাম পড়িয়া রাগে জাকের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দারুণ অভিসম্পাতে লেখকগুলাকে অভিশপ্ত করিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড সব! আমার জীবনটাকে এরাই ক'জনে মিলে একেবারে নষ্ট করে দিলে!" তখনই তাহার মনে হইল, এ অভিসম্পাতে ফল কি? তাহাদের ইহাতে এতটুকু ক্ষতি হইবে না—যন্ত্রণায় শুধু তাহারই বুকের অস্থি-পঞ্জরগুলা চূর্ণ হইয়া যাইবে! মাসিক-পত্রখানা ছিঁড়িয়া পাকাইয়া সজোরে সে জলে ফেলিয়া দিল।

তার পর যত দিন যাইতে লাগিল, আপনাকে যতই নিরুপায় অসহায় বলিয়া জাক বুঝিতে পারিল, কাজের দিকে ততই তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে শরীরে শক্তিও আসিয়া জুটিতেছিল। কাজ করিতে করিতে ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন-কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিত, তাহার টাকা হইয়াছে, ছোট একখানি কুটীরে সে বাস করে, মা আসিয়াছে,—আর,—আর একটি মুখের সুধা-মাখা কথায়,স্নিগ্ধ-হাস্য-কিরণ-পাতে সে ঘরখানি মধুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ সেসিলের!

এমনই স্বপ্নে জাহাজের সেই রুদ্ধ অন্ধ-কূপে একদিন যখন সে বিভোর ছিল, সহসা তখন এক প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত জাহাজ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। উপর হইতে একটা ভীত চকিত কোলাহল নামিয়া আসিল। তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অন্ধকূপস্থ লোকগুলার কর্ণে প্রবেশ করিল। জাকও তাহা শুনিল।

ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য উদ্গ্রীবভাবে সকলে উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন সময় উপরে সোপানের সম্মুখেই —ইঞ্জিনিয়ারের বজ্রগম্ভীর বাণী ধ্বনিয়া উঠিল,"খবরদার, উপরে আসবার চেষ্টা করেছ কি, এই পিস্তলের গুলিতে মাথা উড়িয়েছি!" ইঞ্জিনিয়ারের হাতে পিস্তল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন কহিল, "কি হয়েছে?"

"একখানা মার্কিণ জাহাজ আমাদের জাহাজের উপর এসে পড়েছিল। ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে গেছে—ডুবছে। শীঘ্র যাও, কসে দম দাও—ডাঙ্গার দিকে যতটা পৌঁছুতে পারি! ডাঙ্গাও বেশী দূরে নয়।"

সকলে আপন আপন স্থানে ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে কল চলিতে লাগিল। এঞ্জিন-কক্ষ ভয়ানক তপ্ত হইয়া উঠিল। কয়লা, কয়লা, কয়লা দাও! কয়লা দাও! আবার দাও! ক্রমে উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। রক্তের মত লাল আগুন দাউ দাউ করিয়া

জ্বলিতে লাগিল। চালাও কল, চালাও, পুরা দমে চালাও!

জাক ভাবিতেছিল, মরিতে হইবে, কিন্তু কি এ মৃত্যু! আকাশ নাই, বাতাস নাই, এই রুদ্ধ অনল-গহ্বরে বসিয়া কি শোচনীয় অসহায়ভাবেই মৃত্যুর হাতে আজ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। দুই ধারে লৌহ-নির্ম্মিত সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর—আত্মহত্যার চেয়েও যে এ মৃত্যু ভীষণ নিষ্ঠুর!

সব শেষ! পম্প্ আর চলে না। আগুন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে! লোকগুলার কাঁধ অবধি জল উঠিয়াছে। জাহাজ দ্রুত জল-গর্ভে নামিয়া পড়িতেছে—এমন সময় সোপান-সম্মুখ হইতে ইঞ্জিনিয়ার চীৎকার স্বরে হাঁকিল, "ছুটে এস, উঠে এস, নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাও।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

পারিতে কে দে জোগীর্ত্ত্যার মধ্য দিয়া যে দীর্ঘ সরু গলি গিয়াছে, তাহার দুই ধারে নূতন ও পুরাতন বিস্তর বইয়ের দোকান। সেই দোকানের সারির মধ্যে থাম-ওয়ালা এক প্রাচীন অট্টালিকায় "ভবিষ্য জাতির আলোচনা" মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়।

অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া এই বাড়ীটিই কার্য্যালয়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এ পাড়ায় নূতন মাসিক-পত্রের কার্য্যালয় খাড়া করা পারি সহরের চির-প্রচলিত রীতি। ইহাতে সুবিধাও বিস্তর। সহরের ঠিক বুকের উপর নানা বিচিত্র অক্ষরে নব-প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মন-ভুলানো বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে গ্রন্থ-পিপাসু পাঠ-কের সম্মুখে প্রলোভনের জাল পাতিয়া রাখিলে লাভের আশা বিলক্ষণ, তাই মোরোনুভা-আর্জাস্ত কোম্পানি পত্রিকার কার্য্যালয়স্থাপনের জন্য এই স্থানটিই নির্ব্বাচন করিয়াছিল।

"ভবিষ্য-জাতির আলোচনার" কর্ত্তৃপক্ষগণ পুরোহিত। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার দ্বার নূতন লেখকগণের সম্মুখে অবারিত ছিল। দেশের প্রাচীন মাসিকপত্রগুলা ক্রূর হিংসা ও অবজ্ঞার সহিত যাহাদের রচনা দূরে নিক্ষেপ করিত,তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়াই মোরোনুভা-আর্জাস্ত কোম্পানির প্রধান ব্রত ছিল। কার্য্যালয়টি মাসিক-পত্রের গৌরব-ঘোষণার পক্ষেও যথেষ্ট অনুকূল ছিল—বালি-ঝরা দেওয়াল, অপরিচ্ছন্ন ঘর-দ্বার, জীর্ণ মোটা থাম, সেঁতো জমি কাগজের একটা মিশ্র দুর্গন্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার পারিপাট্যের অভাব কাগজখানির সম্ভ্রম-রক্ষার উপযোগী বলিয়া কর্ত্তৃকপক্ষের ধারণা থাকিলেও কাগজের গ্রাহক জুটিতেছিল না। অক্ষম, বিতাড়িত লেখকগণের কোলা-হলে কার্য্যালয় সারাদিন গম্-গম করিত। "মশায় আমার পদ্যটা কবে ছাপাবেন?" "আমার গল্প?" "আমার প্রবন্ধটা দেখবেন? পঁচিশ বছরের মধ্যে কারও মাথা থেকে এমন লেখা বেরোয়নি।" এইরূপ শব্দে সারাদিন কার্য্যালয়-গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। মলিন মুখে, জীর্ণ বেশে, ছিন্ন পকেটে প্রকাণ্ড পাণ্ডুলিপি লইয়া কত শত লেখক যে কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহ-বচন-সুধার স্বাদ-গ্রহণে ধন্য হইয়া ফিরিত, তাহার সংখ্যা ছিল না।

"ভবিষ্য জাতির আলোচনার" স্বত্বাধিকারী ছিল দুইজন—জাক ও আর্জাস্ত। জাকের অর্থে,—যে দশসহস্র মুদ্রা বন্ধু তাহাকে দান করিয়াছিলেন,—সেই অর্থে ও আর্জাস্তর উদ্যোগে এই পত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। শার্লৎকে কবি বুঝাইয়া দিয়াছিল, এমন লাভের ব্যবসা আর দুইটি নাই! টাকাগুলা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিলে কি-ই বা এমন সুদ মিলিবে। তাহার চেয়ে এই মাসিক-পত্র বাহির করা যাক্—আশ্চর্য্য লাভ দেখাইয়া দিব। এত লাভের না হইলে কি ইহাতে আমারও টাকা আমি ঢালি। জাকের দশ হাজার, আর আমার দশ হাজার, মূলধন এই বিশ হাজার। দেখ না, পাঁচ বৎসরে বিশ লক্ষে তুলিয়া তবে ছাড়িব।"

কিন্তু লাভের অঙ্কে শূন্য পড়িলেও, ছয় মাসে আর্জাস্তর প্রায় বারো হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। বাড়ী-ভাড়া, লেখকদের পারিশ্রমিক, ছাপাখানার বিল—তাহারা ছাড়িবে কেন? কার্য্যালয়ের চতুর্থ তলে কবি আপনার বাসের জন্য ঘর লইয়াছিল। উপরের ঘর হইতে মুক্ত নির্ম্মল আকাশ—চারিধারে নগরের বিচিত্র শোভা চক্ষু ভরিয়া দেখা যায়। একবার বসিয়া ঊর্দ্ধে কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেই হইল, সে অমনি ভাবের পাহাড় বহিয়া ফিরিবে। কি সুন্দর আয়োজন! রচনার পর রচনা ঝরিয়া পড়িবে, মাসিক পত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া সে রচনা নর-নারীর চিত্ত দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবে। চূড়ান্ত হইয়াছে! বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে! ছয় বৎসর ধরিয়া বিজন পল্লীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া এত মাথা খুঁটিয়াও যে গ্রন্থ শেষ হয় নাই, এখানে আসিয়া নিমেষেই সেই বড় সাধের "ফষ্টের কন্যা" নাটকের 'যবনিকা পতন' হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প নিত্য লেখা হইতেছে—যেন পাহাড়ের গা বহিয়া বিপুল বেগে খরতোয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। বিরাম নাই, বাধা নাই! আবার পাণ্ডুলিপিতে পৌঁছিয়াই সে রচনার গতি-রোধ হইতেছে না! ছাপাখানায় কম্পোজিটরের দল তাহা দেখিয়া একটির পর একটি করিয়া অক্ষর বসাইয়া চলিয়াছে—কি তাহাদের যত্ন, কি সে আগ্রহ!

মুদ্রাকর তাহা লইয়া দ্রুত ছাপিয়া চলিয়াছে —দপ্তরী সে রচনা গাঁথিয়া দিতেছে। ছাপার অক্ষরে জ্বল-জ্বলে হইয়া আর্জান্তের রচনা নক্ষত্র-পুঞ্জের মত ফুটিয়া উঠিতেছে! এ কি কম সুখ!

নিত্য বহু রচনা লিখিতে হইলে আর একজনের সাহায্য চাই। সে সাহায্যের লোক মিলিয়াছিল,—শার্লৎ! আর্জান্ত বলিয়া যাইত, আর শার্লৎ পাশে বসিয়া তাহা লিখিয়া লইত। কবির এই সাহিত্য-সাধনায় সে যে এতটুকুও সহায়তা করিতে পারিতেছে, ইহা ভাবিয়া অন্তরে সে বিরাট গর্ব্ব অনুভব করিত! সার্থক তাহার জীবন। একদিন যখন আর্জান্তের সাহিত্য-সেবার ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন সে পৃষ্ঠায় তাহার নামটিও যে স্থান পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহ! ফরাসী সাহিত্য, আর্জান্ত ও শার্লৎ—এই তিনটি নাম একসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে গাঁথা থাকিবে। এ কি কম সৌভাগ্য!

সেদিন সন্ধ্যার সময় কবির প্রাণে ভাব আসিয়াছিল। টেবিলের উপর কাগজের বোঝা ফেলিয়া শার্লৎ লিখিতে বসিয়াছিল। কবি বাতায়ন-পার্শ্বে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিয়া আকাশের দিকে ভাবোন্মাদনায় চাহিয়াছিল! ভাব আসে-আসে আসে না। যেন কবির সহিত সে একটা লুকাচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিষ্ঠুর খেলা!

সহসা কবি কহিল, "নাও—লেখ।—বড় করে মাঝা-মাঝি লেখ—'প্রথম পরিচ্ছেদ'—হল, প্রথম পরিচ্ছেদ?"

শার্লৎ কহিল, "প্রথম পরিচ্ছেদ।" তাহার স্বর গম্ভীর, কণ্ঠ আর্দ্র। কবি বিরক্ত চিত্তে শার্লতের দিকে একবার চাহিল, পরে কহিল, "নাও, এবার আরম্ভ কর—'পিরেণিসের সুদূর উপত্যকায়—সহস্র কাহিনীর গৌরব-মণ্ডিত। পিরেণিসের প্রশস্ত উপত্যকাভূমে—" এরূপ পৌনঃপুনিক উক্তিই আর্জান্তের রচনার বিশেষত্ব। ইহাতে রচনাটুকু একেবারে পাঠকের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করে—একটা বিরাট সূচনার আভাস দেয়, ইহাই কবির ধারণা।

কবি কহিল, "লিখলে, পিরেণিসের সেই সাধের উপত্যকাভূমে—;"

"হাঁ—" বলিয়া শার্লৎ সহসা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কবি কহিল, "ও কি, কাঁদছ। নাঃ, জ্বালালে তুমি! যেদিন আমার একটু লেখবার আগ্রহ হবে, সেই দিনই তুমি একটা-না-একটা গোল বাধাবে। এ সব মুহূর্ত্ত চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নাও, হল কি আবার? ওঃ,—সিন্ধুমু জাহাজের খপর পাওনি, বুঝি, তাই? ও একটা বাজে গুজব শুধু—কোথায় কি, তার ঠিক নেই। খপরের কাগজওলাদেরও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—একটা উড়ো খপর নিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দিচ্ছে! এ রকম ত হয়েই থাকে! জাহাজ-টাহাজের খপর অমন মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না—এ ত নিত্যকার ঘটনা! তা ছাড়া ডাক্তার হারুজ্ নিজে কষ্ট করে আজ ওদের অফিসে গেছেন খপর আনবার জন্য। আগে তিনি ফিরুন—তার পর তাঁর মুখে যদি শোনো, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন না হয়, যত পারো, কেঁদো। নাও, এখন লেখো। কতটা হল? আবার সেই হারিয়ে গেল, আমার। আঃ, পড় দেখি, যতটা লিখলে!"

চোখের জল মুছিয়া আর্দ্র স্বরে শার্লৎ পড়িল, "প্রথম পরিচ্ছেদ।"

কবি কহিল, "থাক্, ওটুকু আর পড়তে হবে না। তার পর থেকে যতটা লিখলে, পড়।"

শার্লৎ পড়িল, "পিরেণিসের সুদূর উপত্যকাভূমে—সহস্র কাহিনীর গৌরবমণ্ডিত পিরেণিসের প্রশস্ত উপত্যকাভূমে—পিরেণিসের সেই সাধের উপত্যকা-ভূমে—"

কবি কহিল, "পড়ে যাও—থামলে কেন?"

শার্লৎ কহিল, "আর ত নেই—এইটুকুই লেখা হয়েছে!"

"এইটুকু!" কবি বিস্মিতভাবে কহিল, "মোটে এইটুকু লিখেছ। অতখানি যে আমি বলে গেলুম—"

কবির মনে হইল, এ কি ছলনা! অন্তরে এতখানি ভাব জমিয়া গিয়াছিল—শুধু এইটুকু তাহার বাহির হইয়াছে! দুই ছত্র মাত্র!

না, এ শার্লতের দোষ। তাহার কলম কবির মনের ভাবের সহিত সমানে দৌড়িতে পারে না কেন!

কবির বিরক্তি ধরিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, "শুধু তোমার দোষ! নিজেকে ভাবতে হচ্ছে না, কিছু না—শুধু লিখে যাবে—তাও পার না, এ রকম করলে ত আর পারা যায় না!"

শার্লৎ কহিল, "যেটুকু শুনেছি, সেইটুকুই লিখেছি। এমন ত নয় যে, ভুলে গেছি—"

কবি কহিল, "আবার তর্ক করছ! লজ্জা হচ্ছে না? মাথায় ভাবের একেবারে বান ডেকে গেল, আর আমি এইটুকু বললুম! জানো, কল্পনার পিছনে আবার কতখানি মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে! উঃ, তার উপর মাথাটাও আজ বেজায় ধরে আছে! কত ভাবব? নাঃ, আর পারা গেল না, দেখছি। আমারও হয়েছে যেমন, বেণা-বনে মুক্তো ছড়ানো!"

কবি উঠিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তার হারুজ ও লাবাস্তান্দ্র্ আসিয়া সকল দায় হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিল।

শার্লৎ ব্যগ্রভাবে কহিল, "কি—কি খপর, ডাক্তার হারুজ্ ?"

কবি আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, "আহা, লোককে একটু জিরুতে দাও! তোমরা ভারী স্বার্থপর। কেবল আপনাদের সুখটাই বোঝ!"

ডাক্তার হারুজ্ কহিল, "নতুন খপর কিছু নেই! ঐ সেই একই কথা!"

"ওরা কি বলে ?"

"বলবে আর কি!" লাবাস্ত্যান্দ্র্ কহিল, "সিদনু জাহাজ ডুবে গেছে। বার্দে'র কাছে আর একখানা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে—সমুদ্রের উপর ধাক্কা—সিদনু ডুবে গেছে, তার লোক-জনের কোন খপরই পাওয়া যাচ্ছে না—"

"এঁ্যা! পাওয়া যাচ্ছে না!" শার্লৎ কাঁদিয়া বাণবিদ্ধা হরিণীর মতই লুটাইয়া পড়িল। সেই জাহাজে তাহার জাক, তাহার সর্ব্বস্ব জাক যে ছিল! সে তবে কোথায় গেল? কোথায়? হা ভগবান, কাহার পাপে আজ এ সর্ব্বনাশ ঘটিল! জাক, জাক, ওরে বাছা আমার—কোথায় তুই? শার্লতের চোখে বান ডাকিল।

কবি কহিল, "অনেকক্ষণ ঘরে বসে পরিশ্রম করা গেছে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক!"

লাবাস্ত্যান্দ্র্ কহিল, "যাবে, কিন্তু ভয়ানক মেঘ করেছে—ঝড়বৃষ্টি যা হোক্ একটা খুব দাপটে শীগ্‌গিরই নামল বলে!"

হারুজ্ কহিল, "কেঁদে আর কি হবে, বলুন? সবই ভবিতব্য!"

এ সময় বাহিরে যাওয়াই মঙ্গল! এই শোকাতুরা নারী এখনই কাঁদিয়া রসাতল বাধাইয়া তুলিবে! কবি, লাবাস্ত্যান্দ্র্ ও হারুজ কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেল। শার্লৎ তখন প্রাণ খুলিয়া শোকের পশরা নামাইয়া দিল। তাহার জাক, শত দুঃখে শত কষ্টেও যে জাকের মুখ চাহিয়া সে সব সহ্য করিয়াছে, করিতেছেও,—আজ তাহার এ কি হইল? মা হইয়া শুধু পাঁচজনের কথায় তাহাকে দেশান্তরে পাঠাইতে সে এতটুকু দ্বিধা করে নাই, আর আজ সেই সন্তান কি না সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ দিল! না, না, ইহা কি সম্ভব! জাক নাই—না, না, তাহা হইতেই পারে না! তাহার জাক, প্রাণের জাক! ওরে বাছা আমার, অনাদৃত, অবহেলিত, উপেক্ষিত দুঃখী পুত্র আমার, কোথায় তুই! আয় জাক, ফিরিয়া আয়, মার বুকে ফিরিয়া আয়। আর তোকে দূরে পাঠাইব না, আর তোকে চোখের আড় করিব না, তুই ফিরিয়া আয়! ওরে আয়, আয়!

সহসা চারিধার কাঁপাইয়া প্রবল বেগে ঝড় বহিল! ঘর-দ্বার নড়িয়া উঠিল! হা-হা হো-হো শব্দে মুক্ত বাতায়ন-পথে বায়ু উদ্দাম অট্টহাস্য করিয়া নাচিতে লাগিল।

রাত্রির আঁধার ক্রমে নিবিড়তর হইয়া আসিল! মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্! সমস্ত চরাচর যেন একটা গাঢ় বিপুল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শার্লৎ তখনও বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল! আয় জাক, নয়নের মণি আমার, হৃদয়ের আনন্দ আমার, আশা আমার, ভরসা আমার, ওরে সর্ব্বস্ব আমার, ফিরিয়া আয়!

এমন সময় কে ডাকিল, "মা!"

কে ও? জাক কি তবে ফিরিয়া আসিল? কিন্তু না, কোথায় কে? মনের ভ্রম, শুধু! এ স্বপ্ন!

আবার কে ডাকিল, "মা!" ক্ষীণ হইলেও স্পষ্ট স্বর!

শার্লৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বাহিরে আসিল—সম্মুখেই সোপান নামিয়া গিয়াছে। পাশের দেওয়ালটুকু অবধি দেখা যায় না, এমন অন্ধকার! শার্লৎ আসিয়া আলো জ্বালিল; লণ্ঠন হাতে লইয়া আবার সে বাহিরে আসিল। সিঁড়ির রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া আলোর সাহায্যে সে দেখিল, একটা ছায়ামূর্ত্তি দেওয়ালে পিঠ দিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। শার্লতের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, "জাক—"

"মা—"

হাঁ, ঐ ত জাক! ভুল নয়, স্বপ্ন নয়! সত্যই জাক! আলো রাখিয়া শার্লৎ ছুটিয়া গেল; জাককে বুকে চাপিয়া ধরিল—জাকের অবসন্ন দেহ তখন সিঁড়ির কোণে দেওয়ালের গায় লুটাইয়া পড়িতেছিল!

কথা নাই, আদর নাই—কিছু না! জাকের মাথায় মুখ রাখিয়া শার্লৎ কাঁদিতে লাগিল। আঃ—এ তপ্ত স্পর্শ আবার যে ফিরিয়া পাইবে, ইহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল?

রাত্রে ফিরিবার সময় আর্জাস্তঁর আশঙ্কা হইতেছিল, গৃহে ফিরিয়া আবার সেই কান্নাকাটির মধ্যে বুঝি পড়িতে হয়! কিন্তু ফিরিয়া সে দেখিল, শার্লৎ বেশ স্থির হইয়াই বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শার্লৎ ধীরভাবে কহিল, "চুপ, গোল করো না—একটু ঘুমুচ্ছে ও—"

"ও! ও কে?"

"জাক। আমার জাক। সে ফিরে এসেছে! আজ আমার কি সুখ হচ্ছে যে, তা আর কি বলব? জাহাজ ডুবি হয়ে ওর খুব চোট লেগেছিল। অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছে। রায়োজেনিরো থেকে আসছে। সেখানে দুমাস হাঁসপাতালে পড়েছিল, এমন হয়ে গেছে যে, জাককে আমার চেনা যায় না মোটে!"

আর্জাস্তঁ মৃদু হাসিল; কহিল, "যাক, বাঁচা গেল! জাক ফিরেছে—আঃ!"

সত্যই আর্জান্তঁর উল্লাস হইয়াছিল! জাকের প্রতি স্নেহ এ উল্লাসের কারণ নয়। জাক মরিলে শার্লতের কান্নাকাটির মধ্যে সে কি দারুণ অশান্তিতে ঘরে বাস করিতে হইত! সেই অশান্তি যে ভোগ করিতে হইবে না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ হইল।

আবেগোচ্ছ্বাসের আতিশয্যে প্রথম কয়টা দিন কাটিয়া গেলেও জাকের প্রতি আর্জান্তঁর ব্যবহার এবার তেমন কঠিন হইল না। তাহাদের নিত্যকার সাহিত্যিক মজলিসে জাকের জন্যও এক কোণে একটি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নূতন অভ্যাগত কেহ আসিলে শার্লৎ সাগ্রহে পুত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিত, "এই জাক! এই জাক! এটি আমার ছেলে, বেচারা বড় ভুগেছে। ওকে যে আবার ফিরে পাব, তা মনেই ছিল না।" সকলেই জাকের দিকে একটু করুণার চোখে ফিরিয়া চাহিত!

জাক কোণের আসনে বসিয়া দেখিত, মজলিসে সব কয়টিই আসিয়া জমিয়াছে, জিমনাজের সেই পুরানো দলটি! এই সকল ভক্ত উপাসক মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত না থাকিলে আর্জান্তঁর চলেও না। সে বলে, "একসঙ্গে মিশে আমরা একটা দল করি, এস—।" দলের প্রধান কাজ,—যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক তাহাদিগকে আমল দিতে চাহে না, ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেই সব লেখকের ব্যক্তিগত কুৎসা-রচনা! যে সকল মাসিক-পত্রের সম্পাদক তাহাদের রচনা আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে, তাহাদের নীচ ঈর্ষ্যা-প্রবৃত্তিকে অভিশাপ-দান ও সেই সকল মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিকট সমালোচনা করা! সে কুৎসা-রচনা, সে সমালোচনার ভঙ্গীই বা কি সে বিজ্ঞোচিত! আর্জান্তঁ কোম্পানি প্রকৃতই বুঝিতে পারিত না, তাহাদের রচনা কেন এই সকল সম্পাদক ছাপিতে চাহে না—নিজেরা পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া যায়—অথচ তাহাদের এতটা বিরূপ হইবার কারণ কি! কেহ বলিত, 'আমাদের আমোল দিলে—আমাদের লেখার তেজে ওঁরা আর ওঁদের রচনা যে একেবারে ছাই হয়ে যাবে!' কেহ বা বলিত, 'শুধু তাই নয়—ওদের একটি দল আছে—সেই দলে বাহিরের লোক ভিড়াতে সাহসে কুলায় না!' জাক এক পাশে বসিয়া এই সকল অলস জল্পনা কখনও শুনিত, কখনও বা সে আগাগোড়া আপনার জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিত। এ সকল কথা তাহার কাণেও পৌঁছিত না। এমনভাবে তাহার জীবনটা নষ্ট হইয়া গেল! কেন, কাহার দোষে? ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রার ঘোরে সে ঢুলিয়া পড়িত। ভোজন-কাল আসিলে শার্লৎ সস্নেহে তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিত, "জাক, জাক।" জাকের চমক হইত। বন্ধুগণ চাহিয়া দেখিত—আর্জান্তঁ দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রোষ চাপিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিত, "একটা আস্ত জানোয়ার যেন!"

কিন্তু না—জাক জানোয়ার নহে! বহু দিন পরে মাতার স্নেহ ও নির্ম্মল বায়ুর স্বাদ পাইয়া তাহার প্রাণের রুদ্ধ কবাট আবার ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া আসিতেছিল, স্বাধীন বায়ুতে ধীরে ধীরে তাহার লুপ্ত চেতনা আবার সে ফিরিয়া পাইতেছিল। আর কেহ কথা কহিলে তাহার চিত্ত সে দিকে বড় একটা আকৃষ্ট হইত না। শুধু মার কথাগুলাই তাহার দগ্ধ হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধার কাজ করিত। মার সহিত দুইদণ্ড নিরালায় কথা কহিতে পাইলে সে যেন বর্ত্তাইয়া যাইত। অধীর পিপাসিত ব্যক্তি যেমন আকুল আগ্রহে শীতল বারি পান করে, তেমনই ভাবে মার প্রতি কথাটি নিবিষ্ট চিত্তে সে পান করিত! এ যেন কোন্ নন্দনের বিস্মৃত সঙ্গীত, স্বর্গের স্মৃতি!

একদিন সে মাকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, ছেলেবেলায় কি কখনও আমি জাহাজে চড়েছিলুম?"

সহসা এ প্রশ্নে শার্লতের প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন জাক?"

"প্রথম যেদিন মা সিন্দ্রে জাহাজে আমি পা দিলুম—সে আজ তিন বছরের কথা, তখন আমার কেমন-যেন কি মনে হল! মনে হল, এ সব যেন আমার কাছে নতুন নয়—কবে যেন কোথায় আমি জাহাজে চড়ে সমুদ্রে গিয়েছিলুম! হাঁ মা, সেটা কি স্বপ্ন তবে?"

"না, জাক, স্বপ্ন নয়, সত্য। তোমার বয়স তখন তিন বছর—আমরা আলজিরিয়া থেকে আসছিলুম। তিনি মারা গেলে আমরা তুবেনে ফিরছিলুম!"

"তিনি কে, মা? বাবা?"

"হাঁ জাক।"

"বাবার নাম কি ছিল মা?"

এ কি কৌতূহল! শার্লৎ মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল, পরে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিল, "সে কথা এত দিন তোমায় বলিনি, জাক! পাপিনী আমি, ছেলের কাণে এ বিষ ঢালবো,—তাই কখনও বলিনি। কিন্তু তোমায় না বলা আমার অন্যায়। তিনি ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন; পিমবক্‌দের আত্মীয়। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে অকূলে ভেসেছিলুম! সিঙ্গাপুরের রাজার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল, তাঁর সঙ্গেই আলজিরিয়ায় বেড়াতে গেছলুম আমরা। সেইখানেই তিনি মারা যান—"

"তাঁর নাম কি ছিল?"

"মার্কি দ্য লে পাঁ।"

জাক তবে সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র! বিপথগামিনী

মাতার পাপে—না, মা,—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার বিচার করিবার অধিকার জাকের নাই! কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র হইয়া জাহাজে সে সামান্য খালাসির কাজ করিয়াছে!

এমন সময় আর্জান্ত আসিয়া কহিল, "শার্লং, একটা কথা আমি ভাবছিলুম। জাক ত এখন ভালো হয়েছে—একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা দেখা উচিত, ওর। এ বয়সে কুড়ের মত বসে থাকাটা ঠিক নয়—ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে যাবে, তা হলে। তা ষ্টীমারে কাজ করতে বলছি না, আমি! রেল-এঞ্জিনের কাজে বিপদের তেমন ভয় নেই, তাই লাবাস্যান্দ্র্ বলছিল—"

আবার সেই লাবাস্যান্দ্র্। জাক কোন কথা বলিল না। শার্লং পুত্রের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "কিন্তু তুমি দেখছ ত, জাক এখনও কি রকম দুর্ব্বল! চার তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতেই হাঁপিয়ে অবশ হয়ে পড়ে, রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না। আর দেখেছ, কেমন খুকখুকে কাশী হয়েছে, তা সে কাশীও ত কৈ কিছুতে সারছে না। তুমি বরং এই কাগজেরই একটা কাজ ওকে দাও! পারবে না? তাহলে বড ভাল হয়।"

"বেশ। মোরোনভার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি, তাহলে।"

পরামর্শান্তে স্থির হইল, মন্দ নহে! জাকের দ্বারা কাগজের আর কোন উপকার না হউক, কাগজ মোড়া ও ভাঁজা, ছাপাখানায় এবং দপ্তরীর তাগাদা করা, প্রুফ বহা প্রভৃতি কাজগুলা ত চলিতে পারে। কাগজের আয় ত কিছুই নাই, ব্যয় প্রচুর, একটি মাত্র গ্রাহকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইয়াছে! সে গ্রাহকটি আর কেহই নহে, শার্লতের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই বন্ধু, যাঁহার দত্ত অর্থে কাগজের প্রতিষ্ঠা! এ ক্ষেত্রে কাগজের বৈতনিক বেহারাকে বিদায় দিয়া তাহার স্থলে জাককে নিযুক্ত করিলে একটু তবু ব্যয়-সংক্ষেপ হয়!

তাহাই ঘটিল। কাগজের স্বত্বাধিকারী জাক বেহারার হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সে নিজে জানিত না যে, সে স্বত্বাধিকারী! শার্লং জানিলেও আর্জান্তর নিকট সে কথা তুলিবে, এমন সাধ্য তাহার ছিল না।

সপ্তাহান্তে আর্জান্ত বিরক্তভাবে কহিল, "নেহাৎ অপদার্থ! এ কাজও ওর দ্বারা চলবে না!"

শার্লং ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "ক্রমে ক্রমে শিখতে পারবে না কি?"

অবজ্ঞার সহিত আর্জান্ত কহিল, "আর কবে পারবে? ভারী ত কাজ! আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে ও মোটেই খাপ খাবে না। দেখছ না, ওর ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার সব ছোটলোকের মত, কারখানার মিস্ত্রী-মজুরের ধরণের! তা ছাড়া ওর স্বভাব অবধি বিগড়ে গেছে। ও মদ খায়, দেখনি? ওর মুখে বিশ্রী মদের গন্ধ!"

শার্লং কাঁদিয়া ফেলিল! সে-ও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু কাহার দোষে জাক আজ ইতর হইয়াছে, মদ ধরিয়াছে! তাহারাই কি ঠেলিয়া জাককে এই অধঃপতনের পথে গড়াইয়া দেয় নাই? জাকের দোষ কি!

আর্জান্ত কহিল, "শোন শার্লং, এও আমি বুঝছি, আপাততঃ ওর যেমন স্বাস্থ্য, তাতে ওর কাজ-কর্ম্ম করা পোষাবে না, এখন! আর কিছুদিন জিরুক। তা সহরের এই ভিড়ে না থেকে ও কেন এতিয়োলে যাক্ না। আমাদের সে বাড়ীর কবুলতির মেয়াদও ত এখন দশ বছর বাকী আছে—সেখানে থেকে ও বাড়ীটা ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করুক। মাসে মাসে ওর খরচের টাকা এখান থেকে পাঠাব'খন! সেখানে পাড়াগাঁয়ে ভালো হাওয়ায় নির্জ্জনে কিছুদিন থাকলে শরীরে বলও পাবে, তা-ছাড়া বাড়ীটাও শুধু শুধু ফেলে রেখে ভাড়া গুঁজি কেন? তার জন্য একটা ভাড়াটে ঠিক করে জাক্ আবার এখানে ফিরে আসবে! কি বল!"

শার্লং সন্তুষ্ট চিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

পরে এক দিন শরতের এক শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতে জাক এতিয়োলে আসিল। শরতে সারা প্রকৃতি সেদিন ঝলমল করিতেছিল। চারিধারে সবুজ প্রাচুর্য্যের ঘন শোভা। স্থলে জলে জীবনের মৃদু কম্পন! কোন কোলাহল নাই,—নিস্তব্ধ শান্ত গ্রাম। সবুজ পাতার রাশিতে গাছ ভরিয়া রহিয়াছে, ক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে—যেন কে একখানি বিস্তীর্ণ হরিদ্রা বর্ণের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। গাছের আড় হইতে পাখী গান গাহিয়া সারা আকাশ-বাতাস মিষ্ট স্বরের প্লাবনে ভরাইয়া তুলিয়াছে। ফলে ফুলে, নদীর জলে, পাখীর গানে পল্লী-জননীর সুমধুর স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। জননী যেন দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাপ-দগ্ধ জাককে সাদরে আহ্বান করিতেছেন, আয় বাছা, আয়, আমার কোলে আয়! এখানে কোন কোলাহল নাই, কোন জ্বালা নাই, আমার শীতল স্নেহের স্পর্শে, আয়, তোর সকল দুঃখ নিবারণ করি—সব দাহ জুড়াইয়া দিই!

জাক যখন পরিত্যক্ত কুটীর-সম্মুখে আসিল, তখন কুটীর-গাত্র-সংলগ্ন লতায়-পাতায় রৌদ্র-কিরণ ঝরিয়া পড়িয়াছে! সেই আলোক-স্পর্শে কুটীর-গাত্র-ক্ষোদিত ফলকটি পাতার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বর্ণ-বর্ণে তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "আরাম-কুঞ্জ।" চারিধারে এই অমল শোভার মধ্যে দাঁড়াইয়া ফলকের অক্ষরগুলা জাক একবার পড়িল, "আরাম-কুঞ্জ।" সত্যই "আরাম-কুঞ্জ!" এখানে জাক সকল দুঃখ ভুলিবে, যথার্থই সে আরাম পাইয়া বাঁচিবে!

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেসিল

"কি! আগাগোড়া তোমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে বেড়িয়েছে—আর তা-ও কি রকম মিথ্যে! চোর অপবাদ! পাঁচ বছর আমি এই খপর নিয়ে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি। কি ভয়ানক লোক! তাই এত আগ্রহ করে এ খপর আমায় দিতে এসেছিল,—বটে! তার পর যখন তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হল, তখন ত কৈ সে খপরটুকু দিতে এল না। দাও ত দেখি, তোমার ম্যানেজারের সার্টিফিকেটখানা।"

"এই নিন, ডাক্তার বিভাল।"

"বাঃ চমৎকার! ম্যানেজারটিকে খুব ভাল লোক বলতে হবে। দেখে আমার বড় আনন্দ হল, জাক! আমি এ পাঁচ বছর ধরে কেবলই ভেবেছি,—আমার হাতে-গড়া জাক চোর হবে! টাকা চুরি করবে, সে! কখনও নয়। অসম্ভব! দেখ দেখি, হঠাৎ যদি আজ আর্শাম্বোর এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হত, তাহলে ত এ ভুল ধারণা, এ মিথ্যা সন্দেহ ত আমার মন থেকে কখনও দূর হত না!"

আর্শাম্বোর ক্ষুদ্র কুটীরে ডাক্তার বিভালের সহিত জাকের আবার বহুদিন পরে দৈবাৎ আজ সাক্ষাৎ হইয়াছিল!

আজ দশদিন জাক এতিয়োলে আসিয়াছে। তপস্যারত ব্রাহ্মণের মতই এ কয়দিন নির্জ্জনে সে নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিতেছিল। প্রকৃতির বিশাল মুক্ত প্রান্তর শরতের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করিতেছে—চারিধারের এই শান্ত শোভার মধ্যে অতীতের সুমধুর স্মৃতিতে মণ্ডিত থাকিয়া জাক ধীরে ধীরে হৃত স্বাস্থ্যসম্পদ্ ফিরিয়া পাইতেছিল! শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়—হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হয়,—নৈরাশ্যের হাহাকার ঘুচে। মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, উজ্জ্বল আলোক-রাশিতে পরিপূর্ণ—সে আলোকের স্নিগ্ধ বিমল ধারায় জাকের অন্তরের গ্লানি-পঙ্কিলতাও ক্রমে ধুইয়া মুছিয়া আসিতেছিল।

একদিন এই একান্ত নিঃসঙ্গতা নিতান্তই অসহ্য বোধ হওয়ায় পুরাতন বন্ধু আর্শাম্বোর কুটীরে সে বেড়াইতে আসিল। আর্শাকে দেখিলে জাকের মাকে মনে পড়ে। গৃহ-কর্ম্মে মাতার সে সঙ্গিনী ছিল—তাই আর্শার কুটীরে আসিয়া পুরাতন স্নেহ লাভ করিয়া সে যেন আবার তাহার অতীত দিনগুলিকেই কুড়াইয়া পাইল।

আজ জাক আর্শার বাটীতে আসিয়া দেখিল, আর্শার স্বামী বাতের যন্ত্রণায় শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। রোগীর পার্শ্বে শুভ্রশির এক বৃদ্ধ বসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই বৃদ্ধই ডাক্তার রিভাল। বহুদিন পরে এই নূতন দর্শনে উভয়েই একটু বিচলিত হইয়া পড়িল! জাক আপনার সামাজিক অধঃপতনের কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ইহারই জন্য সে কোনদিন ডাক্তারের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। ডাক্তারের সঙ্কোচের কারণ, জাককে দেখিতেই রুদিক-গৃহের সেই চুরির কথা তাঁহার নূতন করিয়া মনে পড়িল! জাক আজ চোর—সেই জাক!

এখন জাকের কলঙ্ক-মুক্তির সংবাদ পাইয়া ডাক্তারের প্রাণ শান্ত হইল। ডাক্তার কহিলেন, "এখন তুমি এখানে এসেই যখন বাস করতে লাগলে, তখন আমাদের বাড়ী যাবার আর কোন সঙ্কোচ রেখো না। ওরা কজনে মিলে তোমার জীবনটা একেবারে নয়-ছয় করে দিলে! তোমার শরীর যা দেখছি, তাতে রীতিমত এখন যত্ন নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ী তুমি তেমনই ভাবে আবার আসা-যাওয়া কর, এই আমি দেখতে চাই। সবই সেই রকম আছে, জাক, কেবল আমার স্ত্রী শুধু নেই। আজ চার বছর তিনি মারা গেছেন! শোকেই বেচারী মারা গেল! সেসিল এখন আমার বাড়ীর গিন্নী। সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে—তোমায় দেখলে ভারী খুসী হবে, সে! তোমার কথা প্রায়ই বলে। তুমি আসবে ত, জাক?"

জাক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। একটা দ্বিধায় তাহার কথা সরিতেছিল না! রিভাল তাহা বুঝিলেন! বুঝিয়া তিনি কহিলেন, "কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, জাক! সেসিলকে কিছু বোঝাতে হবে না—কোন কৈফিয়ৎ নয়! রুদিকদের বাড়ীর চুরির কথা সে কিছু জানে না—শুধু আমিই এ খপরটুকু জানতুম। কাউকে বলিনি। কাজেই আসতে তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আসছ ত—বল? আজ আর থাক্! কতক্ষণই বা থাকবে? রাত্রে আবার কুয়াশা নামবে—কুয়াশা লাগানোটা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। কাল বরং এসো। আমাদের বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করবে—তোমার নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, আসবে ত?"

কৃতজ্ঞতায় জাক ডাক্তারের পানে চাহিল। সস্নেহে

জাকের কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তার কহিলেন, "না এলে আমি গিয়ে ধরে নিয়ে আসব, তা কিন্তু বলে রাখছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে চিমনির ধারে বসিয়া জাক অনেক কথা ভাবিল। আপনার জীবন-নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠার উপর দিয়া সে দৃষ্টিটা একবার বুলাইয়া লইল! সেই মধুর কৈশোর-প্রারম্ভে ডাক্তারের স্নেহে সে কি এক বিচিত্র সুখের অধিকারী হইয়াছিল! হাস্য-কৌতুকময়ী ক্রীড়া-সঙ্গিনী সেসিলের সহিত এককালে সে কি সোনার দিনগুলি কাটিয়াছে! তার পর কোন্ দৈত্যের অভিশাপ লাগিল—জীবনটা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল! সে ক্ষতের দাহ যেমন ভীষণ, তেমনই গভীর! সে ক্ষতচিহ্ন কি এ জীবনে কখনও মিলাইবে?

পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে জাক আসিয়া রিভালের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। এক দাসী আসিয়া কহিল, "ডাক্তার সাহেব বাড়ী ফেরেননি। মাদামোসেল একলা আছেন।"

দাসীটি নবাগতা; জাককে সে চিনিত না। ভিতরে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নিমেষে কুকুরটা লাফাইয়া জাকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরাতন বন্ধুকে কুকুরটা দেখিয়াই চিনিল! জাকের পদলেহন করিয়া, তাহার গায়ে গা ঘসিয়া, ল্যাজ নাড়িয়া বাক্‌হীন পশু বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিল। দেখিয়া জাক অভিভূত হইয়া পড়িল! দুইদিন চোখের আড় হইলে বন্ধুকে মানুষ অনেক সময় চিনিতে পারে না, কিন্তু এই বাক্‌হীন ইতর পশু, সে হৃদয়-হীন নহে—স্নেহের মর্য্যাদা-রক্ষায় তাই তাহার কোনই ত্রুটি হইল না!

ভিতর হইতে সুমধুর স্বরে কে ডাকিল,—"এস জাক।" যেন স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল! এ কণ্ঠ সেসিলের—কি মধুর, কি প্রাণারাম! জাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিশোরী সেসিল! যৌবন-স্পর্শে সেসিলের সুগঠিত তনুখানি লাবণ্যে ভরিয়া রহিয়াছে—পুষ্প-তরু যেন আজ কুসুম-স্তবকে সাজিয়া উঠিয়াছে! অমল তাহার শোভা, বিচিত্র তাহার বর্ণ!

সেসিল নিকটে আসিয়া জাকের হাত ধরিল। উভয়ে যাইয়া তখন ভিতরে বসিল। সেসিল কহিল, "তোমার জীবনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে,—দাদা মশায়ের কাছে আমি শুনেছি, সব। আমাদেরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে,জাক। দিদিমা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন! তোমার কথা প্রায়ই তিনি বলতেন।"

জাক কোন কথা কহিল না। তাহার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল! এই পবিত্র দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে আপনার লাঞ্ছিত শির তুলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বিপুলতার সম্মুখে আপনার রিক্ত দৈন্যের কঙ্কাল-সার মূর্ত্তিটা খাড়া করিয়া সে দারুণ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছে! এই স্বর্গের সুধা-সমুদ্রের তীরে পূতিগন্ধময় নরকের আবর্জ্জনা যেন সে টানিয়া আনিয়াছে,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়! হাত দুইটা কর্কশ, কঠিন দেহের হাড়গুলা অবধি বস্ত্রের আবরণ ভেদ করিয়া একটা কুৎসিত বীভৎসতা প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। বসন্ত-শ্রীর পার্শ্বে হিম-জর্জ্জর শুষ্ক প্রকৃতির শীর্ণতা যেমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার সৃষ্টি করে, সেসিলের পার্শ্বে জাকও আজ ঠিক তেমনই হেয়, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য!

এমন সময় দাসী আসিয়া সেসিলের হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া কহিল, "ওষুধ চাই—লোক এসেছে।"

বিদ্যুৎ-শিখার মতই ক্ষিপ্র গতিতে সেসিল কাগজ-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে টেবিলের উপর শিশিতে কয়টা বোতল ছিল। সে উঠিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে লাগিল। হাঁপ ছাড়িয়া জাক তখন একবার সেসিলকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর পাইল। কি সুন্দর—এই সেসিল। যৌবন তাহার বিচিত্র মায়া-তুলি বুলাইয়া সেসিলের দেহটিকে ললিত রাগে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কোথাও এতটুকু খুঁত নাই! সজ্জিত সুন্দর বেশে, তাহারই অনুরূপ ভাস্বর মূর্ত্তি! অপূর্ব্ব মধুরিমার চরম বিকাশ!

জাকের আত্মা আজ প্রবুদ্ধ হইতেছিল, অশ্রু স্নাত হইয়া নীরবে পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিতেছিল,—সে নিজে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে একবার ভাবিল, কেন এখানে আসিল! আসিল যদি ত, এখন পলাইবে কি করিয়া! এখানে তাহার অবস্থান যে একান্তই অশোভন, নিতান্ত বিসদৃশ! সেসিলের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় জাকের চিত্ত আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্রমে দুই-চারি জন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ঔষধ চাই, পুরিয়া চাই, মালিশ চাই। সেসিলের অভ্যস্ত করে কোন কর্ম্মই বাধিল না।

এক কৃষক-রমণী ঔষধ লইয়া চলিয়া যাইবার সময় জাকের সম্মুখে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাহর করিয়া তাহাকে দেখিল। দেখিয়া কহিল, "বাঃ, এই যে রেজস্‌ত দের জাক সাহেব গো! এবার তবে ডাক্তারের নাতনীর বিয়ের ব্যবস্থা হল! এঁ্যা! পাত্তর স্বয়ং হাজির—এতদিন ধরে জাক সাহেবের জন্য ডাক্তার 'হা-পিত্যেশ' করে বসেছিল! এবার বাঁচল!"

জাক বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেসিল দেবী—জাক তাহাকে গ্রহণ করিবে, এমন স্পর্দ্ধা নিমেষের জন্যও জাকের মনে উদয় হয় নাই! সেসিলও ঈষৎ বিচলিত হইয়া পড়িল! কোনমতে সে চাঞ্চল্যটুকু গোপন করিয়া

সেসিল ডাকিল, "ক্যাথরিন, দাদা আসছে, খাবার তৈরি ত সব?"

যথার্থই ডাক্তার রিভাল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন, "জাকের শরীরটা একেবারে গেছে—দেখেছ, সেসিল, ওকে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না।"

সেদিন ডাক্তার-গৃহ হইতে বাহির হইয়া জাক যখন পথ চলিতেছিল, তখন যদি কেহ জাকের পানে চাহিত ত সে ভাবিত, তাহার গৃহে বুঝি কাহারও সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে, তাই ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া ব্যস্তভাবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে আবার সে দ্রুত ফিরিয়া চলিয়াছে। গতি তাহার এমনই অস্বাভাবিক চঞ্চল!

পথে চলিতে চলিতে সমস্ত জগতের উপর জাক চটিয়া সারা হইল। কারিকর—কারিকর! সারা জীবনটা যেন কে কালো কালিতে দাগিয়া দিয়াছে! আর্জাস্তঁ ঠিক বলে। অসভ্য, বেয়াদব, আমি—আমার উচিত, আমার সমযোগ্য লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা—ভদ্রসমাজে আমার ঠাঁই হইবেও না! উত্তেজনায় জাকের প্রাণ আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু তরঙ্গাহত নদীর জল যেমন পরতে পরতে অজস্র চন্দ্রের ছবি আপনার বুকে প্রতিফলিত করে, তাহার ক্ষুব্ধ পীড়িত চিত্ত তেমনই চিন্তার পরতে পরতে সেসিলের মধুর ছবিটিকেই বিম্বিত করিয়া তুলিতেছিল। সেসিল, সেসিল! পবিত্র, সুন্দর, নির্ম্মল সেসিল! দেবী তুমি, অভাগা মলিন দীন জাককে পবিত্র নির্ম্মল করিয়া তোল! তোমাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা শক্তি তাহার নাই—তাই বলিয়া তোমার করুণার কণা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়ো না, যেন! কৃষক-রমণীটা ও কিসের ইঙ্গিত করিল? সেসিলের সহিত জাকের বিবাহ! না, না,—অসম্ভব! দুষ্ট-রসনা নারী, এ বিষম কথা উচ্চারণ করিতে তোর জিভ খসিয়া পড়িল না?

সেসিলের সহিত তাহার মিলনের কোন আশাই নাই,—কোন সম্ভাবনা নয়। এই একটি মাত্র চিন্তা জাকের সমগ্র চিত্তটুকুকে সেদিন প্রবলভাবে নাড়া দিতে লাগিল! অবশেষে সন্ধ্যার পর চারিধার যখন অন্ধকারে ছাইয়া গেল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জাক আসিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার বাতাস তাহার চিন্তা-তপ্ত ললাটে মাতার স্নেহাঞ্চলের মতই আরাম বহিয়া আনিল। নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল,—অস্ফুট গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিল, ভগবান, ভগবান, আমাকে পাগল করিয়া দাও, চিত্তকে অবশ করিয়া দাও! এ অধৈর্য্য, এ চাঞ্চল্য যে আর সহ্য হয় না, প্রভু!

সামাজিক সহস্র বিঘ্ন আজ এ মিলনের পথে অন্তরায়! সে কারিকর, নীচ কারিকর মাত্র, ছোটলোক,—ভদ্র সমাজে কি বলিয়া আজ সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে? তাহার উপর মাতার চরিত্র-দোষ! না, অসহ্য, অসহ্য এ জ্বালা! দারুণ যন্ত্রণা!

সেল্‌ফের উপর একটা বোতল ছিল। জাক তাহা হইতে একটা তরল পদার্থ গ্লাশে ঢালিল। পরে গ্লাশটা টেবিলের উপর রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে আবার কি ভাবিতে বসিল—সমস্যা! চারিদিকে সমস্যা! এ বিপুল সমস্যা-সমাধানের কি উপায় আছে! কি উপায়! ভাবিতে ভাবিতে জাক ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন স্বপ্ন তাহার নিদ্রাতুর চিত্তে কত বিচিত্র চিত্র ফুটাইয়া তুলিল! প্রকাণ্ড কারখানা—অজস্র লোকের কোলাহল! নদীর নীর,—নদীতে তরী বহিয়া সে চলিয়াছে! নদীর জল ছল-ছল করিয়া তরীর কাণে কাণে যেন কত কি গোপন কথা বলিয়া চলিয়াছে! কোথায়, যেন কে ঐ গান গায়—ঢালো, সুরা ঢালো, আরও ঢালো! বিস্মৃতি গভীর বিস্মৃতির সাগরে ডুব দাও—কিছু চাহি না—চাহিবার আর কিছু নাই! কোন কামনা নাই! শু বিস্মৃতি আনিয়া দাও!

ঐ যে তরল রূপ উছলিয়া উঠিয়াছে! ঢল ঢল নয়নে, ওরে পিয়ালা, চাহিয়া তুই ও কি দেখিতেছিস্? শান্তি আনিয়াছিস? বিস্মৃতি আনিয়াছিস? কৈ, দে, দে, দে পিয়ালা! না, না, ও কে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,—সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, করে কনক-দণ্ড? এ যে সেসিল! মধুর সুরে ও কি গান গাহিতেছ, তুমি?—জাক, তুমি মদ খাও? ছি!

জাকের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! কোথায় কে! তরী, নদী, দেবী—কোথায় কি? কেহ নাই, কিছু নাই,—শুধু সেই পিয়ালাটা! সর্ব্বনাশী, কুহকিনী, দূর হ', তুই!

সজোরে জাক সুরাপূর্ণ কাচের গ্লাশটা বাহিরে ছুড়িয়া দিল! ঝন্ ঝন্ শব্দে গ্লাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! দুই হাতে চোখ মুছিয়া জাক তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তাই হবে, সেসিল, দেবী, তাই হবে। তোমার কথাই থাকবে! এ জীবনে জাক আর কখনও সুরা স্পর্শ করবে না!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরোগ্য-লাভ

তাহার পর জাক কতদিন রোগ ভোগ করিল, ডাক্তার হারজ্ আসিয়া তাহার চিকিৎসা-ভার লইয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বার-সান্নিধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং কি করিয়া ডাক্তার রিভাল আসন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া, জোর

করিয়া জাককে আপনার গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে আরোগ্য দান করিলেন, সে সকল কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আরোগ্য-লাভের পর জাক ডাক্তারের গৃহেই স্থান লাভ করিল। সেসিলের অক্লান্ত শুশ্রূষা, ডাক্তারের সস্নেহ সেবা—কেবল ইহারই গুণে জাক এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

দুঃখ যেন তখন আবার চিরদিনের মত বিদায়-গ্রহণের উপক্রম করিল। মধুর সাহচর্য্যে শীর্ণ মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিও ফিরিয়া আসিতেছিল। সেসিল বহি পড়িত, জাক শুনিত—কখনও বা জাক পড়িত, সেসিল শুনিত। এমনই উপায়ে জাক ও সেসিলের হৃদয় দুইটি এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়িতেছিল। কে জানে, ইহার পরিণাম কি! ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিলেও তাহাতে বাধা দিলেন না। তাঁহার মনে কি গভীর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনিই জানেন।

রিভালের গৃহে জাক বাস করিতেছে শুনিয়া আর্জান্ত রোষে জ্বলিয়া উঠিল। রিভাল,—রিভালের গৃহে—কেন? আর্জান্তর কি পয়সা নাই, না, গৃহ নাই? ইহাতে তাহাকে দস্তুরমত অপমান করা হইতেছে! তাহার মাথা হেঁট হইতেছে!

অগত্যা শার্লৎকে পত্র লিখিতে হইল। শার্লৎ লিখিল, "তুমি ওখানে থাক, সেটা এঁর পছন্দ নয়। লোকে মনে ভাবতে পারে, আমরা তোমায় কিছুই দিই না বা তোমাকে দেখি না। এতে আমাদের অপমান হয়।" তাহার পর, 'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে—এটুকু কবির হস্তাক্ষর,—কবি স্বয়ং লিখিয়াছে,—"তোমার চিকিৎসার জন্য হারুজ্‌কে পাঠাইলাম, কিন্তু নবাবিষ্কৃত, গবেষণাপ্রসূত, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তোমার মনঃপূত হইল না। পাড়াগাঁয়ের একটা হাতুড়ে ডাক্তারই তোমার ইষ্টদেবতা হইল! তোমার এ ব্যবহারে আমি যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছি—তাহার উপর, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াও শুনিতেছি, রিভালের বাড়ীতে আছ। এখন আর তোমার সেখানে থাকা ভাল দেখায় না। দুই দিনের মধ্যে তুমি নিজের বাড়ীতে আসিবে, নহিলে আমাদের সহিত তুমি সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাও, আমরা ইহাই বুঝিব। এখন বুঝিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয়, সেইমত কার্য্য করিয়ো। ইতি—"

তথাপি যখন জাক রিভাল-গৃহ ত্যাগ করিল না, তখন শার্লৎকে আসিতে হইল। ডাক্তার রিভাল সাদরে আর্জান্ত-গৃহিণীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর জাকের কথা উঠিলে ডাক্তার বলিলেন, "আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে ফিরতে দিইনি, মাদাম। ওর শরীর যে রকম খারাপ, তাতে খুব কড়া তদারকে ওকে না রাখলে তুমি ওকে কোনমতেই ধরে রাখতে পারবে না। হারুজ্‌ এসে কতকগুলো মৃগনাভি আর উগ্র বিষ দিয়ে ওর মাথা গরম করে দিয়েছিল—সে অবস্থায় আর দু'তিন দিন থাকলে জাককে আর তুমি চোখেও দেখতে পেতে না! ভাগ্যে আমি সময়-মত ওকে নিয়ে এসেছিলুম! এখন বিপদটা কেটে গেছে বটে; তবে এখনও ওর অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। ওকে আর কিছুদিন আমার কাছে রেখে যাও। তার পর যখন আমি বুঝব, ও বেশ সেরে উঠেছে, তখন আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে পাঠিয়ে দেব—তার জন্য কোন কথা আর ওকে লিখতে হবে না। ছেলেকে বাঁচাতে চাও যদি ত, লোকের কথায় কাণ দিয়ো না।"

জাক কহিল, "মা, আমায় তা হলে নিয়ে যাবে, তুমি?"

"না, না, জাক, যেখানে তুমি ভাল বোঝ, সেইখানেই থাক। ডাক্তার রিভাল তোমার ধাত বোঝেন, তাঁর চিকিৎসায় নিশ্চয় তুমি উপকার পাবে।"

মাকে ছাড়িয়া জাক যে কখনও সুখী হইতে পারিবে, এখানে এই সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে আসিবার পূর্ব্বে জাক নিজেই তাহা ভাবিতে পারে নাই। এ সুখের কল্পনাও তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই।

সেসিলকে আদর, ডাক্তারকে ধন্যবাদ ও পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া দুইদিন পরে শার্লৎ বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় পুত্রকে একান্তে ডাকিয়া শার্লৎ কহিল, "জাক, তুমি আমায় নিয়ম-মত চিঠি লিখো। যখন কিছু চাইবার দরকার হবে, তখন পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় আমার নামে চিঠি দিয়ো, আমি তা গোপনে পাবার ব্যবস্থা করব। অনেক সময় তোমাকে যে সব কথা লিখি, তা বাধ্য হয়েই লিখতে হয়—সে আমার মনের কথা নয়, জাক। উনি যা বলেন, সামনে বসে আমাকে তাই লিখতে হয়। এবার থেকে সে-রকম চিঠির তলার কোণে একটা লাইন টেনে দেব। লাইন-টানা চিঠি পেলে তুমি জেনো, সে চিঠি আমি ওঁর কথামতই শুধু লিখেছি। তার জন্য মিছে মন খারাপ করো না।"

শার্লৎ আপনার অবস্থা আর গোপন রাখিতে পারিল না। এ দাসত্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাহা হইতে মুক্তি-লাভের এখন আর কোন উপায় নাই। কি ভার-গ্রস্ত জীবন! তবুও বহিতে হইবে,—গত্যন্তর নাই।

শার্লৎ চলিয়া গেলে ডাক্তার একদিন বন-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল, জাক ও সেসিল প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে, রোগী দর্শনান্তে ডাক্তার আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিবেন।

সেদিন সমস্ত জড়তা ত্যাগ করিয়া পৃথিবী প্রভাতে

তখন জাগিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে, সূর্য্যের আলোয়, যামিনীর নিরানন্দ ভাব ঘুচিয়া চারিধারে একটা আনন্দ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। এমনই সময়ে জ্যাক ও সেসিল পথে বাহির হইল। গ্রামের পথ ক্রমে ফুরাইয়া আসিল,—মাঠের বুক চিরিয়া সীঁথির মত সরু পথ চলিয়া গিয়াছে, জ্যাক ও সেসিল ক্রমে সেই পথে চলিল। কৃষকের দল তখন ক্ষেতে চলিয়াছে, কারিকরের দল ব্যস্তভাবে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে,—ধীরে ধীরে কর্ম্ম-কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে! ক্রমে তাহারা ক্ষেত ছাড়িয়া, পাহাড় ঘুরিয়া নদীর ধার দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া পৌঁছিল।

ফুলের রাশিতে বর্ণ-গন্ধ উৎসারিত, বিহঙ্গের কল-কাকলীতে চারিধার মুখরিত,—এ যেন দ্বিতীয় নন্দন! জ্যাকের মনে হইল, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে জ্যাক ও সেসিল ছাড়া কোথাও আর কোন নর-নারী নাই, তাহারা যেন সেই আদি-কালের আদম ও ঈভ্। এ সৌন্দর্য্য, এ শোভা,যেন তাহাদেরই চিত্ত-বিনোদনের জন্য। এমন স্থান, এমন ক্ষণ, এমন আবেশ-কম্পিত মিলন-প্রার্থী দুইটি তরুণ তৃষিত প্রাণ! সেসিল মৃদু দৃষ্টিতে শ্যামল প্রান্তরের পানে চাহিয়াছিল। জ্যাক ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিল—সমস্ত দেহে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "সেসিল—"

"জ্যাক—"

কাহারও মুখে আর কথা সরিল না! জ্যাকের দুই হাতের মধ্যে সেসিলের হাত—উভয়ের হাতই কাঁপিতেছিল। কি এক আনন্দের মূর্চ্ছনায় উভয়েরই প্রাণ তুর্-তুর্ করিয়া উঠিল। এ কি মোহ। প্রাণের ভিতর এ কি দারুণ উত্তেজনা। ভাবোদ্বেল চিত্ত যেন আজ সকল বন্ধন ছিন্ন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে।

সেসিলের গৌর হস্তের কোমল অঙ্গুলিগুলির দিকে জ্যাক চাহিয়া রহিল। কচি কিসলয়ের মত এই অঙ্গুলির মোহন স্পর্শে কি তাহার বুকের দারুণ ক্ষতের দাহ শান্ত হইবে না? ইহা কি নিতান্তই দুরাশা, ভগবান! একটা লালিমা ফুটিয়া উঠিয়া সেসিলের সুন্দর মুখখানিকে লাল-রক্ত, সদ্য-বিকশিত গোলাপের মতই ললিত মনোরম করিয়া তুলিল।

বহু চেষ্টায় সেসিলের মুখে কথা ফুটিল। স্বর গাঢ়, কম্পিত। সেসিল কহিল, "কেন জ্যাক, বল—কি বলবে, বল। তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?"

জ্যাকের ললাটে স্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। জ্যাক কহিল, "কষ্ট! না, সেসিল, এ অপূর্ব্ব সুখ! এমন সুখ জীবনে কখনও আমি উপভোগ করি নি, কল্পনাও করি নি।"

তাহার পর আবার উভয়ে নীরব রহিল। এমনই ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা অদূরে ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে উভয়ের চমক ভাঙ্গিল! উভয়ে ত্রস্তভাবে কানন-কুটীরে আসিল।

তখন তিনজনে নানা বিষয়ে কথা হইল। সুন্দর দৃশ্য, চারিধারে অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা!

ভোজনের পর ডাক্তার কহিলেন, "তোমার কোন অসুখ কচ্ছে না ত জ্যাক?"

অসুখ! না,—অসুখ নয়, তবে অস্বস্তি! এমন মধুর দিন—হায়, কেন ফুরায়? এমন স্বপ্নময় ভাবময় মুহূর্ত্ত অবিরাম নয় কেন?

জ্যাক আজ স্পষ্ট বুঝিয়াছে, সেসিলকে সে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসার পরিণাম কি! তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান! কিন্তু সেসিল কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বৈ কি! নহিলে তাহারও মুখে কথা সরিতেছিল না, কেন? তবে কি সেসিলকে—?

না, তাহা হইবে না। সরলা বালিকার সরল হৃদয়ের সহিত আর এ নিষ্ঠুর খেলা সঙ্গত নহে! তাহার অদৃষ্টে যত দুঃখ আছে, পূর্ণ মাত্রায় সে তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু বেচারী সেসিল—তাহার পায় কুশাঙ্কুরটিও সে বিঁধিতে দিবে না! সেসিলের সম্মুখে জ্যাক আর মোহের জাল বিস্তার করিবে না! ভাল থাক, সুখে থাক, তুমি সেসিল, নন্দনের অপ্সরী, স্বর্গের দেবী, —তোমার কেশাগ্র স্পর্শ-করিতে-অযোগ্য, হতভাগা জ্যাক আর তোমার সুখের পথে দাঁড়াইবে না। তোমার জীবনে সে কোন ঝড় তুলিবে না! সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে, দূরে—দূরে—বহু দূরে চলিয়া যাইবে!

তাহাকে যাইতেই হইবে যেমন করিয়া হৌক, সে চলিয়া যাইবেই!

একদিন প্রভাতে রিভালের নিকট আসিয়া জ্যাক আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

রিভাল কহিলেন, "ঠিক বলেছ, জ্যাক। এখন তুমি আরাম হয়েছ, কাজ করবারও বল পেয়েছ, আর তোমার বসে থাকা উচিত নয়। পুরুষ-মানুষ,—একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখা দরকার!"

মুহূর্ত্তের জন্য জ্যাক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তারের দৃষ্টিতে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া সে কেমন বিচলিত হইল!

সহসা ডাক্তার বলিলেন, "আমাকে আর কিছু বলবার নেই, জ্যাক?"

জ্যাকের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তবে,—তবে কি ডাক্তার—? সে কহিল, "না, আর কিছু নয়—"

"কিন্তু জ্যাক, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে আরও কিছু তোমার বলবার আছে। আমি ছাড়া ত

সেসিলের আর কেউ নেই! তার সম্বন্ধেও কোন কথা আমাকে বলবার নেই? বল, সঙ্কোচ কিসের?"

জাক কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ডাক্তার সস্নেহে কহিলেন, "কেঁদো না, জাক—কোন জিনিসই অসম্ভব বলে মনে করো না! বল!"

জাক কহিল, "তা কি সম্ভব দাদামশায়? আমার মত একটা লক্ষ্মীছাড়া কারিকর—ছোটলোক—"

"এত অধীর হচ্ছ কেন, জাক? চেষ্টায় কি না হয়? পরিশ্রম কর, জীবনের গতি ফেরানো শক্ত নয়! যদি বল, কিসে আবার উঠতে পারবে—আমার মত চাও যদি—?"

বাধা দিয়া জাক বলিল, "না না, শুধু তা নয়—দাদামশায়। আপনি জানেন না, কি গভীর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আমাদের দুজনের মধ্যে—। আমি—আমি—আমার মা—"

শান্ত অটল অকম্পিত স্বরে ডাক্তার কহিলেন, "জানি জাক, সে আমি সবই জানি—"

"তবে,—তবে—?"

"তবে—! তবে আর এক নতুন কথা শোন, জাক! সেসিলের ভাগ্যও তোমারই মত,—না, বরং আরও মন্দ! তবে শোন, তার জন্ম-বৃত্তান্ত—সে এক শোচনীয় কলঙ্কের মর্ম্মভেদী ইতিহাস।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতন কাহিনী

ডাক্তার রিভালের পড়িবার ঘরে উভয়ে আসিয়া বসিল—জাক ও ডাক্তার রিভাল। জানালা খোলা ছিল। তাহারই মধ্য দিয়া বহুদূর-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছিল,—শরতের শান্ত উজ্জ্বল শোভায় ঝলমল করিতেছে! প্রান্তরের শেষে গ্রামের জীর্ণ কবরভূমির প্রাচীন দেওয়াল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝাউ গাছের উচ্চ শিরগুলা রৌদ্র-কিরণে রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ভগ্ন দেওয়ালের অন্তরালে দুই-চারিটা কবরের ক্রুশ-দণ্ড বিরাট গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রিভাল বলিলেন, "ঐ যে গোরস্থান দেখা যাচ্ছে, ওখানে বোধ হয়, তুমি কখনও যাওনি, জাক! গেলে দেখতে, একটা গোরের উপর একখণ্ড সাদা পাথরে শুধু 'মাদ্‌লীন' নামটি লেখা আছে। মাদ্‌লীন আমার মেয়ে—সেসিলের মা—ওটি তারই গোর। আমাদের বংশের আর কারও গোর ওখানে নেই।"

ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "সেই কথাই তোমায় সব বলছি, শোন।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "মৃত্যুর পর তাহাকে যেন একান্তে নিভৃতে কবর দেওয়া হয়, কাতরভাবে বার বার সে এই অনুরোধ করিয়াছিল। রিভাল কি অপর কোন নামের সংস্পর্শ যেন তথায় না থাকে, শুধু লেখা থাকিবে, 'মাদ্‌লীন'। তাহার নাম-সংযোগে তাহার বাপের বংশে যেন এতটুকু কালিমা না লিপ্ত হয়! অভাগিনী কন্যা আমার! তাহার আত্ম-সম্মান, তাহার নারী-গর্ব্ব এ সঙ্কল্প অটল রাখিয়াছিল।

"সে কি দুঃখের দিন, জাক, যেদিন তাহার বিকচোন্মুখ নবীন জীবন অকালে পুষ্পের মতই ঝরিয়া গেল। আমরা তাহা সহ্য করিলাম,—ঐ নির্জ্জনে মাটীতে শয্যা রচনা করিয়া তথায় তাহাকে শয়ন করাইলাম। হৃদয় না পাষাণ—রেখাই শুধু পড়ে, ভাঙ্গে না!

"সে কোথায় যাইবে? আজও আমার এই শীর্ণ অস্থিগুলার মাঝে, এই জীর্ণ বুকে মাদ্‌লীনের কোমল সুন্দর মুখ যে জাগিয়া আছে—সে মুখ কি ভুলিবার? কিন্তু সে কথা যাক্! এ নির্জ্জনবাস, মৃত্যুর পর এ ঈপ্সিত নির্ব্বাসন কেন? কিসের জন্য? কি অপরাধ করিয়াছিল সে? কিছু না! যদি অপরাধ কাহারও থাকে, তবে সে আমার! এই নির্ব্বোধ, মূর্খ বৃদ্ধ—তাহার অপরাধের শাস্তি, অভাগিনী আপনার শিরে সে বহন করিল!

"একদিন,—সে আজ আঠারো বৎসরের কথা—এই নভেম্বর মাসেই হঠাৎ বাহিরে আমার ডাক পড়িল,—এখনই যাইতে হইবে! একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! একদল শিকারী আসিয়াছিল—এমন প্রায়ই আসে—তাহাদের মধ্যে একজনের বন্দুক ফাটিয়া পায় গুলি লাগিয়াছে—বুঝি বা প্রাণ-সংশয়!

"তখনই ছুটিলাম! আর্শার গৃহে এক শয্যার উপর লোকটি শুইয়া ছিল—সুন্দর, সুশ্রী, তরুণ যুবক, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না! বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ, তরল চক্ষু, দীর্ঘ পক্ষ্ম, নির্ভীক হৃদয়!

"গুলি বাহির করিলাম। আশ্চর্য্য অকম্পিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল! আমাকে সে ধন্যবাদ দিল—বেশ পরিষ্কার বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায়! তেমন অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা যায় না, কাজেই আর্শার গৃহে সে রহিল। আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। ক্রমে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বন্ধু শিকারীদের নিকট হইতে তাহার নাম শুনিলাম, কাউন্ট্‌ নাদিন—জাতিতে সে রুশ, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়!

"আঘাতটা কঠিন, তবে স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলিয়াই নাদিন সে যাত্রা শীঘ্র সারিয়া উঠিল। আর্শার সে কি সেবা-যত্ন! ক্রমে দুইএক পা করিয়া সে চলা সুরু

করিল। একদিন আমি বলিলাম, 'এ নির্জ্জনে একা থাকিতে কষ্ট হয় ত আমার ওখানে মাঝে মাঝে আসিতে পার।' সে সানন্দে ধন্যবাদ দিল।

"রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় আমার গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া লইতাম। আমাদের সহিত একত্রে সে ভোজন করিত। যেদিন বৃষ্টি কি অতিরিক্ত কুয়াশা নামিত, সেদিন রাত্রে এখানে সে থাকিয়াও যাইত।

সত্য বলিতে কি, এই পাপিষ্ঠটাকে আমি ভালবাসিতাম—তাহার প্রতি একটা প্রগা অনুরাগ জন্মিয়াছিল, একটা আন্তরিক স্নেহ। বুঝিতাম না, এত কথা, এত বিদ্যা সে কি করিয়া জানিল, কোথা হইতে শিখিল! কিন্তু সে যেন সব জানিত, সব বুঝিত! সে নাবিকের কাজ জানিত, সৈনিকের দলেও ছিল, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছে, ঔষধ-পথ্যাদি লইয়াও আমার স্ত্রীর সহিত তর্ক করিত—মাদলীনকে গান শিখাইত! এত বিদ্যা! এত জ্ঞান! একটা অদ্ভ মোহে সে আমাদের সকলকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। আমার ত দ্বিতীয় চিন্তাই ছিল না, ঝড়-বৃষ্টির মধ্য দিয়া অন্ধকার রাত্রে যখন গৃহে ফিরিতাম, তখন পথের কষ্ট মনেই আসিত না, শুধু দীপ্ত আশায় বুক ভরিয়া উঠিত, গৃহে ফিরিয়া দেখিব, আমার সহিত গল্প করিবার জন্য, আমারই পথ চাহিয়া নাদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! দারুণ দুর্য্যোগেও অশ্বের গতি বাড়াইতাম,—কখন্ পৌঁছিব, সপরিবারে বসিয়া নাদিনের গল্প শুনিব! এ বিরাট মোহ অনুরাগ দেখিয়া স্ত্রী প্রায়ই বকিতেন। একটা অপরিচিত বিদেশীকে লইয়া এতখানি মাখামাখি করা তাঁহার বড় মনঃপূত হইত না। থাকুক না প্রণয়, তাই বলিয়া এতটা বাড়াবাড়িই কি করিতে হয়! নিত্য একত্র ভোজন, এক গৃহে শয়ন! এত কেন? আমি সে কথা উড়াইয়া দিতাম, বিদ্রূপ করিয়া বলিতাম, মেয়েমানুষের এমনই ছোট মন! দুনিয়ার লোককে সন্দেহ, অবিশ্বাস,—ছিঃ! স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া নীরব হইতেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি জাগিয়া যে তাঁহাকে যথেষ্ট পীড়িত করিয়া তুলিত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। বুঝিয়াও আমি সে দিকে মন দিতাম না!

"ক্রমে নাদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল,—চলিতে ফিরিতে বেশ মজবুত। কিন্তু তাহার নড়িবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! এই অনাড়ম্বর পল্লীগ্রামে তাহাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু শুধুই কি পল্লীগ্রাম, না, আর কিছু? সে প্রশ্ন মনেও উঠে নাই!

"শেষে একদিন স্ত্রী আমার চোখ ফুটাইলেন! স্ত্রী বলিলেন, 'ওগো, শুনছ?'

"আমি বলিলাম, 'কি?'

"স্ত্রী বলিলেন, 'দেখ, নাদিনের মতলব কি, তা সে স্পষ্ট খুলে বলুক! পাড়ার লোকে নাদিন আর মাদলীনের নামে কাণা-ঘুষা আরম্ভ করেছে—এ ত ভাল নয়!'

"আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম,—কহিলাম, 'কেন? মাদলীন আবার কি করেছে?'

"আমার ধারণা ছিল, আমার সঙ্গে গল্প করিবার জন্য, আমারই সাহচর্য্য ভোগ করিবার জন্য নাদিন সুস্থ হইয়াও বিদায় লইতে পারিতেছে না, এখানে রহিয়াছে! আমরা যে সন্ধ্যার সময় একত্র খেলা করি, গল্প করি,—সেই খেলা-গল্পের জন্যই শুধু! মূঢ় আমি! আমার কন্যা মাদলীনের দিকে কখনও চাহিয়া দেখি নাই। নাদিন আসিলে তাহার মুখ কি আনন্দে উজ্জ্বল রাঙা হইয়া উঠিত, সরমে তাহার কথা ও গতি কেমন বাধিয়া যাইত, নাদিন না আসিলে মলিন মুখে আকুল নেত্রে পথের পানে সে চাহিয়া থাকিত, এ সকল লক্ষ্য করিবার আমার অবসরই ছিল না, অথচ মাদলীনের এ ভাবান্তর দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিত, এতটুকু গোপন রহিত না—আমি অন্ধ, তাই কিছু দেখি নাই।

"যাহা হউক, দেখিতে বিলম্ব হইল না। প্রমাণও মিলিল,—মাদলীন তাহার মাকে বলিয়াছে, নাদিনকে সে ভালবাসে, নাদিনও তাহাকে ভালবাসে—গভীর সে ভালবাসা, তাহা মুছিবার নহে, ভুলিবার নহে, মিলাইবার নহে! আমি কাউন্টের নিকট ছুটিলাম—কি তাহার অভিপ্রায় জানিতে চাই! এখনই, আর বিলম্ব নহে!

"নাদিন স্বীকার করিল—তাহার স্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে, সে কথা মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। নাদিন মাদলীনকে ভালবাসে, সে তাহার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী। এ মিলনে বাধা কি, তাহাও সে খুলিয়া বলিল। অভিজাত বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, পিতা জীবিত, বংশাভিমান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল,—তাঁহার মন পাওয়া কঠিন ব্যাপার। মত না পাইবারই আশঙ্কা। তথাপি সে বলিল,—পিতার ক্রোধের ভয়ে সে হটিবে না। মাদলীনকে না পাইলে সে বাঁচিবে না। সে সাবালক, নিজেও কিছু বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছে—পিতার অর্থে বঞ্চিত হইলেও সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিবে, এমন সংস্থানও তাহার আছে! পরিপূর্ণ স্বচ্ছলতা না হইলেও মাদলীনকে কোন দিন কষ্ট পাইতে হইবে না। শুধু সে আমার মতাপেক্ষী—আমার উপর শুধু তাহার নহে—দুইটি প্রাণীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

ডাক্তার স্থির হইলেন। বাহিরে একটা বৃক্ষ শাখা হইতে বায়ুতাড়নে সহসা একটা শুষ্ক পত্র চ্যুত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া পড়িতেছিল, ক্রমে সেটি মাটিতে পড়িয়া গেল—ডাক্তার সেই পত্রটার প্রতি চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন। জাক কহিল, "তার পর?"

ডাক্তারের যেন চমক ভাঙ্গিল ডাক্তার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ—তার পর ভবিষ্যৎ জামাতার সমস্ত গৌরব আদর লইয়া, একদিন সে আমার গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমার মনে হইতেছিল, কেমন চট করিয়া যেন সব হইয়া যাইতেছে, অত্যন্ত ত্বরিতভাবে—আমার মাদলীনের সমগ্র জীবনের সুখ ইহার উপর, এই বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছে! স্ত্রী বলিলেন, 'ও যা বললে, তাই মেনে নিলে! কোন খোঁজ-খবর নেবে না? বিদেশী লোক, কোথায় ঘর, কি বৃত্তান্ত; ঠিক নেই। মেয়েটাকে অমনি রাস্তার লোকের হাতে তুলে দেবে?' তাঁহার-সন্দিগ্ধতায় আবার আমি হাসিলাম; লোকটির প্রতি আমার এমনই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল,—তবু একদিন ব-বিভাগের ম্যানেজারের নিকট কথাটা পাড়িলাম। তিনি বলিলেন, কাউন্ত নাদিনের সম্বন্ধে তিনি এমন কিছুই জানেন না—তবে শুনিয়াছেন বটে, সে বড় বংশে জন্মিয়াছে এবং লেখাপড়াটাও ভাল শিখিয়াছে। কিন্তু মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে রুশ রাজদূতের অফিসে সংবাদ লওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাটাও তিনি বার বার আমাকে বলিয়া দিলেন, কারণ তাহাদের অফিসে বড় বড় বংশগুলির সম্বন্ধে সকল সংবাদই পাওয়া যাইবে।

"তুমি ভাবিতেছ, জাক, এ কথা শুনিয়া আমি রাজদূত অফিসে সংবাদ লইয়াছিলাম! না। সেদিকে আমার কোন চেষ্টাই ছিল না, এমনই অলস আমি! সারা জীবনে আমার এ রোগ সারিল না—যাহা করা উচিত মনে ভাবিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেকগুলাও যদি করিতাম! স্ত্রী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, 'খোঁজ নাও, খবর নাও'—আমি মিথ্যা বলিয়া সকল দায় এড়াইলাম। স্ত্রীকে বলিলাম, 'খোঁজ পাইয়াছি—নাদিনের কথা খাঁটি সত্য!'

"স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন। হায়, সরলা, বিশ্বস্তহৃদয়া নারী! কিন্তু একটা কথা এখন বুঝিয়াছি,—আমি পারিতে সংবাদ লইতে চলিয়াছি ভাবিয়া পাষণ্ড কি ভয়াকুল হইয়া উঠিত! কিন্তু তখনও কিছু বুঝি নাই! ভবিষ্যতের সুখের কল্পনায় আমি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার মাদলীন সুখে থাকিবে! আরামে থাকিবে! আর কি চাই!

"শীতের শেষে কাউন্তের নিকট অসংখ্য পত্র আসিতে লাগিল। সেও পত্র লেখায় অসম্ভব মন দিল। শুনিলাম, পিতার সহিত তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিয়াছে। সে আমাকে পত্র দেখাইত, কতকগুলা চিত্র-বিচিত্র-করা দুর্ব্বোধ বিদেশী ভাষা, আমি তাহার বিন্দুও বুঝিতাম না। যত না বুঝিতাম, বিশ্বাস ততই প্রবল হইতেছিল। কতকগুলা নাম শুধু বুঝিতাম, আইভানোভিচ, ষ্টিফানোভিচ—এমন কত নাম। মাদলীন হাসিয়া কহিত, তোমার এতগুলা নাম নাকি? তাহার নাম শুধু মাদলীন রিভাল। হ্যাঁ জাক্‌—সে পাষণ্ডের সত্যই অসংখ্য নাম ছিল। শেষে একদিন শুনিলাম, নাদিনের পিতা বিবাহে মত দিয়াছে। আমি যেন বাঁচিলাম। পিতার অভিশাপ ও রোষ মাথায় লইয়া নবীন জীবন আরম্ভ করিবে, এই চিন্তাটা কাঁটার মত আমার প্রাণে বিঁধিতেছিল। বিবাহে আপত্তি নাই! আমি মনে অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম।

"বিনা আড়ম্বরে একদিন এতিয়োলে বিবাহ হইয়া গেল। ঐ গির্জ্জাঘরে—এদিকে আসিতে ডাহিনে ঐ যে ছোট গির্জ্জাটা! কি আনন্দ, সে কি সুখের দিন! শুধু পিতার প্রাণই সে আনন্দ বুঝিতে পারে। কম্পিত হস্তে কন্যার কম্পিত কর ধরিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল! সেদিনকার গির্জ্জার অর্গিনে যে সুর বাজিয়াছিল, তেমন সুর জীবনে আর কখনও শুনি নাই। সে যেন স্বর্গের বীণা—সে সুর এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে!

"তার পর তাহারা হাসিমুখে বিদায় লইল। বিদায়ের সময় আমার বুক কি বেদনার ভাবে ভরিয়া উঠিয়াছিল! মুখে কথা ফুটিতেছিল না, চোখের কোণে শত চেষ্টাতেও জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু মাদলীনের মুখ সে বিদায়ের ক্ষণেও একটা অপূর্ব্ব হর্ষের দীপ্তিতে পূর্ণ, উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আমরা আশীর্ব্বাদ করিলাম,—সুখী হও, সুখে থাক, বাছা আমার!

"তাহারা চলিয়া গেল। এমনভাবে যাহারা যায়, সত্যই তাহারা সব হাসি, সব আলো, সব আনন্দটুকুই সঙ্গে লইয়া যায়, রাখিয়া যায় শুধু বিষাদ, বেদনা, আর স্মৃতির দুর্ব্বহ ভারের রাশি! এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার পর আমরা স্বামি-স্ত্রীতে শূন্য গৃহে দীপ জ্বালিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তাহাদেরই কথা ভাবিতাম! গৃহের সে দারুণ নিঃসঙ্গতা, সে একান্ত অপরিহার্য্য নিঃসঙ্গতা, বিরাট লৌহের মতই আমাদের বুকে বাজিত! শুধু আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত, কথা ফুটিত না। তবু আমি দিনের বেলায় রোগী দেখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কতকটা অন্যমনস্ক হইতে পারিতাম। কিন্তু স্ত্রী! এই ক্ষুদ্র নিরালা গৃহের প্রত্যেক কোণটি অবধি যেন অসহ্য বেদনা-ভার লইয়া বেচারীর বুক চাপিয়া ধরিত!

কন্যার বিরহ-দুঃখ যেন সজীব মূর্ত্তি লইয়া তাহার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। নারীর ভাগ্যই এমন! তাহাদের সকল হর্ষ, সকল বেদনা গৃহকোণটিকে কেন্দ্র করিয়া গর্জ্জিতে থাকে, চারিধারে অগ্নির দাহ জাগাইয়া তুলে—তাহারই মধ্যে পড়িয়া অভাগিনী নারীজাতি নিতান্ত অসহায় নিরুপায়

ভাবে সে দাহের যন্ত্রণা ভোগ করে—নীরবে সব সহ্য করে! এই জানালা, ইহারই সম্মুখে মাদলীন দাঁড়াইত, এই চেয়ার—ইহাতে সে বসিত—এই খেলানা, ইহা লইয়া সে খেলা করিত—এই দোলা, শিশু অবস্থায় ইহারই ক্ষুদ্র ক্রোড়টিতে বসিয়া শুইয়া মাদলীন দোল খাইত! এই বই—সে পড়িতে ভালবাসিত—এই শয্যা, ঐ দেরাজ, এই পরদা, ঐ গাছপালা, প্রত্যেকটিতে তাহার কোমল হস্তের ললিত স্পর্শ যেন মাখানো রহিয়াছে! মাদলীন, মাদলীন, কোথায় তুমি! এস, এস, এ বিরহ যে আর সহ্য হয় না।

"কিন্তু এই দুর্ব্বল মানুষ অসহ্য বেদনাও সহ্য করে! করিতে হয়। আমরাও ক্রমে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতাম। তাহারা এখন পিসায়, কাল ফ্লোরেন্সে যাইবে। তারপর—? শুধু প্রেম, শুধু প্রীতি সূর্য্যকিরণের মত তাহাদের পথ আলোকিত করিয়া রাখুক! পত্র আসিত, তাহারা কতদূর চলিয়াছে! ক্রমে তাহারা ফিরিবার সঙ্কল্প জানাইল। আমরা ঘর-দ্বার সাজাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। এক একটি দিন যাইত, আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম—তাহারা আসিতেছে।

"সেদিন রাত্রে রোগী দেখিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। স্ত্রী শয়ন করিয়াছিলেন। আমি একাই ভোজন করিতেছিলাম! সহসা বাহিরে বাগানে একটা ত্বরিত পদশব্দ শুনিলাম। উদ্গ্রীবভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দ্বার খুলিয়া গেল। এ কে! মাদলীন! এ কি মূর্ত্তি! একমাস পূর্ব্বে দেববালার মত অপূর্ব্ব কান্তিময়ী যে কন্যাকে হাসি ও অশ্রুর মধ্যে বিদায় দিয়াছি, এ কি সে-ই! বর্ণ মলিন, দেহ শীর্ণ, পাণ্ডু, উন্মাদের মত জীর্ণ বেশ, হাতে একটি ব্যাগমাত্র, চোখের কোণে কালির রেখা পড়িয়াছে, সারা দেহে শোকের এক করুণ ছবি! মনের উপর দিয়া যেন প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে,—কি এ মূর্ত্তি! করুণ স্বরে মাদলীন কহিল, 'বাবা, আমি এসেছি।'

"আমি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, ব্যগ্রস্বরে কহিলাম, 'ব্যাপার কি, মাদলীন? নাদিন কোথায়?'

"সে উত্তর না দিয়া চক্ষু মুদিল। সে কাঁপিতেছিল। কি ভীষণ কম্পন! আমি তাহার মাথায় হাত রাখিলাম। আমার দুঃখ! তখন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া বলিলাম, 'বল, মাদলীন, তোমার স্বামী কোথায়?'

"আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে সে কহিল, 'নেই। ছিলও না।'

"তাহার পর আমারই পাশে বসিয়া সে আমায় সব কথা খুলিয়া বলিল। সে এক ভীষণ, মর্ম্মভেদী কাহিনী—বিলাপের মতই তাহা গভীর, করুণ! সে কাউণ্ট নহে! তাহার নামও নাদিন নহে। দক্ষিণ রুশবাসী একজন ইহুদী সে—নাম, য়্যাসক্। একটা হতভাগা জালিয়াত—কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া জাল-জুয়াচুরি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছিল। পূর্ব্বে রিগায় একটা বিবাহ করিয়াছিল—সেণ্টপিটার্সবার্গেও একটা,—তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার কাগজ-পত্র জাল—সে নিজের হাতে জাল করিয়াছিল। রুশে সে ইদানীং নোট জাল করিয়া খাইত! তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, টিউরিনে সে ধরা পড়ে।

"ভাব, জাক, আমার মেয়ের কথা,—একা, সেই বিদেশে—স্বামীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে বিচ্যুতা, পরিত্যক্তা মাদলীন, সহস্র কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে একটা জালিয়াতের স্ত্রীরূপে,—স্ত্রীই বা কোথা, জাক্? ধরা পড়িয়া সব কথা নাদিন স্বীকার করিয়াছিল।

"একটা কথা তখন শুধু মাদলীনের মনে জাগিতেছিল,—জগতে তাহার যে একটি মাত্র আশ্রয় আছে, তাহার পিতার গৃহ, মাতার ক্রোড়, সেখানে সে ফিরিবে—যেমন করিয়া পারে। তাই অতি কষ্টে ষ্টেশনের এক তরুণ কর্ম্মচারীর কৃপায় কোনমতে সে গৃহে ফিরিয়াছে। সে পাপিষ্ঠ তাহাকে যাহা-কিছু দিয়াছিল, সব সে একটা হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছে, কিছুই লইয়া আসে নাই। বলিতে বলিতে মাদলীনের চোখে বান ডাকিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম, কহিলাম, 'স্থির হও, মাদলীন, চুপ কর, তোমার মাকে ডাকি।' আমার কঠিন চোখেও জল আসিয়াছিল!

"পরদিন স্ত্রী সব কথা শুনিলেন। তিনি তিরস্কার করিলেন না—শুধু আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, বলিলেন, "গোড়া থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল—এ বিষয়ে একটা কিছু অঘটন ঘটবেই।' লোকটাকে প্রথম দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে কেমন এক আতঙ্ক জাগিয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া আমরা গর্ব্ব করি! কিন্তু এই অশিক্ষিতা নারীর অন্তরে যে ভাব গুমরিয়া উঠিয়াছিল—যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিজ্ঞান,—তাহার কাছে আমাদের শিক্ষা-গর্ব্ব লজ্জায় মাথা হেঁট করে! আমার কন্যার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাড়ায় পরদিনই রাষ্ট্র হইয়া গেল।

"সকলেই আসিয়া উঁকি দিল। ব্যাপার কি? তোমার মেয়ে ফিরিল যে! জামাই কোথা—খবর কি তার, ভাল আছে ত? জীবনে কখনও রূঢ় হই নাই—কিন্তু সেই একদিন রূঢ় স্বরে সকলকে বিদায় দিলাম। মাদলীন ও আমার স্ত্রী কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন না—পল্লীর কৌতূহল দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিলেন।

"তখনও আমি বিপদের সবটুকু জানিতে পারি নাই।

মাদলীন্ সে কথা আমাকে খুলিয়া বলে নাই যে, এই হেয় মিথ্যা বিবাহ অভিনয়ের ফলে সে অন্তঃস্বত্বা! সে কি বিষাদে আমাদের মন আচ্ছন্ন হইল! জারজ সন্তান প্রসব করিবে—মাদলীন? হা ভগবান! মাদলীন্ নীরবে বসিয়া লেপ-কাঁথা সেলাই করিত, ছোট পোষাক তৈয়ার করিত সন্তানের জন্য! হউক জারজ—তবু সে সন্তান,—মাতার সে আনন্দ, গর্ব্ব, সান্ত্বনা! বেচারা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল—তাহার মুখে শীর্ণ পাণ্ডুতা বাড়িয়াই চলিয়াছিল! সর্ব্বদাই সে কি ভাবিত!

"আমার স্ত্রী বলিলেন, 'সারা দিন-রাত ও মন গুমরে থাকে, কাঁদে। সে লক্ষ্মীছাড়াটাকে ও ভুলতে পারে নি, ভালও বাসে!'

"যথার্থই মাদলীন সে পাষণ্ড বর্ব্বরটাকে ভালবাসিত। আমার স্ত্রী তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে মাদলীন নিবারণ করিত। মৃদু ভাবে কম্পিত স্বরে শুধু বলিত, 'কি হবে, আর ভেবে, মা! সব আমার অদৃষ্ট! কি করবে তোমরা?' সে পাপিষ্ঠকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই দারুণ অনুশোচনায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, সে মরণের পথে চলিয়াছিল—এবং সেসিলকে আমাদের শীর্ণ বুকে তুলিয়া দিবার অল্পদিন পরেই সে একদিন আপনার দুর্ব্বহ বেদনা-ভার হইতে মুক্তি লাভ করিল।

'তাহার মৃত্যুর পর তাহার শয্যাতল হইতে একখানি পত্র বাহির হইল—পত্রখানি শত-ভাঁজে মলিন, ছিন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সে পত্র নাদিনের—প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া মাদলীনকে এই পত্র-দ্বারাই পাপিষ্ঠ প্রলোভনের জাল পাতিয়াছিল। মাদলীন এই পত্রখানিকে কেবলই পড়িত—বুকে করিয়া রাখিত! আহা, বেচারী! বেচারী মাদ্‌লীন!

"তুমি অবাক হইতেছ, জাক—একটা ক্ষুদ্র পল্লীর এক প্রচ্ছন্ন কোণে এত বড় একটা হৃদয়-ভেদী নাটকের অভিনয় হয়—ইহা কি সম্ভব! ইহাকেই বলে, অদৃষ্টের পরিহাস! লতাপাতার আড়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র কুটীরেও এ ঘটনা ঘটে! যুদ্ধের সময় মাঠের প্রান্তে কর্ম্ম-রত দরিদ্র হতভাগা কৃষক কিম্বা স্কুল-ফিরতি কোন নিরীহ বালকের গায় সহসা রণক্ষেত্র হইতে গোলা ছুটিয়া তাহাকে যেমন মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া দেয়, এও যেন ঠিক তেমনই—তেমনই নৃশংস, তেমনই বর্ব্বর!

"সেসিলকে লইয়া সান্ত্বনা পাইলাম। গাঢ় অনুতাপের জ্বালায় পলে পলে জ্বলিয়াও সেসিলের মুখ দেখিয়া বাঁচিতে হইল। নহিলে মাদলীনকে হারাইয়া বাঁচিবার কথা নয়। আমাদের একমাত্র যত্ন হইল, সেসিল যেন এ সব কথা জানিতে না পারে—এ বাজ তাহার বুকে না পড়ে। এই জন্যই সেসিলকে কখনও পথে বাহির হইতে বা কাহারও সঙ্গে মিশিতে দিতাম না। তোমার সঙ্গে মিশিতে দিতেও আমার স্ত্রীর আশঙ্কা জন্মিয়াছিল—পাছে তাহার মার মত সেও কোনদিন ভুল করিয়া বসে! কিন্তু যখন তোমার পরিচয় পাইলাম যে, তুমিও তাহারই মত দুর্ভাগা—তখন তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিতে আমারও ইচ্ছা হইল—যদি কোনদিন তোমার হাতে সেসিলকে সঁপিয়া দিতে পারি! নহিলে আর কাহার হাতে দিব? যদি সেসিলকে সে অশ্রদ্ধা করে, সম্মানের চোখে না দেখে, এমনই ভাবে পরিত্যাগ করে! এই জন্যই তোমাকে যখন উহারা কারখানায় পাঠাইতেছিল, আমি রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলাম—মনে হইয়াছিল, তোমাকে উহারা আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইতেছে—আমার নিতান্ত আপনার জন তুমি—তোমার উপর উহাদের কিসের অধিকার! তুমি আমার, তুমি আমার সেসিলের!

"তাহার পর হইতে বরাবর আমি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—কবে তুমি আসিয়া আমার হাত হইতে সেসিলকে চাহিয়া লইবে। সেসিল আসিয়া নতশিরে কম্পিত কণ্ঠভাবে বলিবে, দাদামশায়, জাককে আমি ভালবাসি! সে দিন আজ আসিয়াছে, জাক। দুটি অভাগা তোমরা একসঙ্গে মিলিয়া সুখী হও। চুরির সংবাদে আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—কিন্তু তোমার কথায় যেদিন সে রহস্য ভেদ হইল, সেদিন যেন আবার আমি নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিলাম! জাক—এখন শোন, তুমি সেসিলকে ভালবাস, সেসিলও তোমায় ভালবাসে। তাহাকে জয় কর, বন্দী কর। এ দুইমাস তোমাকে আমি লক্ষ্য করিতেছি—এখন সুস্থ হইয়াছ, শরীরে বল পাইয়াছ। একটা মতলবও আমার মাথায় আসিয়াছে। তুমি প্যারিতে যাও—ডাক্তারী শেখো—চার বৎসর সময় লাগিবে! তার পর আমার জায়গায় তোমায় বসাইব। সুখে স্বচ্ছন্দে তোমাদের দিন কাটিবে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এখানে আসিবে—সেসিলকে দেখিবে, শক্তি পাইবে, আশা পাইবে। দিনে কাজ-কর্ম্ম কর, রাত্রে পড়। চার বৎসর পরে মানুষ হইয়া উঠিবে, তখন সেসিলের ভার লইতে পারিবে। নাও জাক, খাটো—কাজ কর, সেসিল তোমার এ দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার।"

কাহিনী শুনিয়া জাক অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যাহা শুনিল, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই মর্ম্মভেদী!

কিন্তু একটা সংশয়, একটা আশঙ্কা তাহার মনে জাগিতেছিল। সেসিল হয়ত তাহাকে ভগ্নীর মতই ভালবাসে! তাহা ছাড়া চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিতে কি সে সম্মত হইবে?

রিভাল কহিলেন, "সে বিষয়ে সেসিলের সঙ্গে তুমি কথা কও! সে উপরে আছে—যাও, তাকে বলগে।"

কাহাকে বলিবে! এ যে বড় কঠিন কাজ! হৃদয় একটা গভীর উত্তেজনায় মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল—বুঝি, এখনই বিদীর্ণ হয়।

উপরে ঘরে বসিয়া সেসিল কি একটা লিখিতেছিল। জ্যাকের চোখে সেসিল সেদিন অপরূপ মোহিনী-মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সেসিলের দেহে এত রূপ! সে রূপে এমন মোহ! কৈ, জ্যাক আর কোনদিন ত ইহা লক্ষ্য করে নাই। কি এ সুমধুর পরিবর্ত্তন!

জ্যাক কম্পিত স্বরে ডাকিল, "সেসিল—"

সেসিল মুখ তুলিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শান্ত স্বরে কহিল, "কেন, জ্যাক?" তাহার মুখ এক অজানা সরম-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

জ্যাক কহিল, "আমি আবার যাচ্ছি, সেসিল, কাজ করতে, মানুষ হতে! এখন আমার জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করেছি,—অবলম্বন পেয়েছি। তোমার দাদামশায় আমায় অনুমতি দিয়েছেন—তাই, কোন দিন যা তোমায় বলতে সাহস হয়নি, আজ তা বলতে এসেছি—"

"কি সে, জ্যাক?" লজ্জায় সেসিলের নয়ন-পল্লব কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

"যে আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি, সেসিল। তোমাকে যাতে জয় করতে পারি, যাতে তোমার যোগ্য হতে পারি, তার জন্যই আজ আমি কঠোর সাধনায় রত হতে চলেছি!"

জ্যাকের স্বর কম্পিত হইতেছিল, থমকিয়া যাইতে-ছিল। তবু সে সব কথা বলিল। সেসিল সব কথা স্পষ্ট শুনিল। সে জানিত, এ প্রেমকে, বহু প্রতীক্ষা, বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়া গভীর সুদৃঢ় হইতে হইবে! জ্যাকের কথা শেষ হইলে, আবেগে সেসিল জ্যাকের হাত দুইটি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। পরে দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে সে কহিল, "জ্যাক, আমি এ চার বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকব। চার বৎসর কেন, জ্যাক? যদি চিরকাল, সারা জীবন আমায় এমনই প্রতীক্ষা করে কাটাতে হয়, তা'ও কাটাব। জ্যাক, প্রিয়তম আমার··· এ তুমি নিশ্চয় জেনো!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলিসেয়ার

তখনও সন্ধ্যা নামিতে কিছু বিলম্ব আছে। পারির এক প্রান্তে ঈসেনডেকের প্রকাণ্ড লোহার কারখানা। কার-খানার লোকজন কোলাহল তুলিয়া পথে চলিয়াছে। কেহ সঙ্গীর পিঠে হাত রাখিয়া গাহিয়া—কেহ বা জনতার পাশ কাটাইয়া সঙ্গিনীকে একান্তে টানিয়া হৃদয়ের গোপন বেদনার আভাষ দিতে দিতে চলিয়াছে! কাজের মধ্য হইতে ছাড়া পাইয়া সকলেরই মন লঘু, উল্লসিত—তাহা-দের হর্ষকোলাহলে সারা পথ মুখরিত।

এই সকল লক্ষ্য করিতে করিতে জ্যাকও পথ চলিয়া-ছিল। আজ তাহার মনে আর এতটুকু বেদনা নাই! ভবিষ্যতের আশায় প্রদীপ্ত চিত্ত লইয়া সে চলিয়াছিল! দৃষ্টিপথের দুই পাশের বাড়ীর দিকে,—যদি ভাড়ার জন্য কোনটায় খালি ঘর পাওয়া যায়!

কারখানার কিশোরী কারিকরগুলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যাকের সুন্দর মুখের পানে চাহিতে ভুলে নাই! "দেখ্ ভাই—কেমন লোকটি—কেমন আপনা-ভোলা—বেশ, না?" পরস্পরের মধ্যে এমনই একটা অস্ফুট আলাপ চলিয়া-ছিল। জ্যাকের কিন্তু সে দিকে কান দিবার অবসর ছিল না।

সহসা একটা জুতার দোকানে প্রকাণ্ড এক ঝুড়ির পানে জ্যাকের নজর পড়িল—ঝুড়িটায় অসংখ্য ছোট-বড় টুপি! বেলিসেয়ারের নয় ত! টুপির সহিত বেলিসেয়ারের সম্পর্কের স্মৃতি জ্যাকের মনে এমন সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল যে, দোকানের মধ্যে তখনই কৌতূহল দৃষ্টি পড়িল! বেলিসেয়ারই ত! খুব তন্ময় হইয়া সে জুতা-ওয়ালার সহিত একজোড়া ছোট জুতার দর করিতেছিল—তাহার পাশে একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া—বয়স তাহার পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না!

বেলিসেয়ার বলিতেছিল, "পায়ে লাগছে না ত? বেশ করে দেখ!" বেলিসেয়ারের কথায় জ্যাকের হাসি পাইতেছিল। সে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি, বেলিসেয়ার যে!"

"আরে, মাষ্টার জ্যাক! তুমি এখানে!"

"ভাল আছ, বেলিসেয়ার? তা এটি কে সঙ্গে? তোমার ছেলে না কি?"

অপ্রতিভভাবে বেলিসেয়ার কহিল, "না, না, আমার ছেলে কেন? মাদাম ওয়েবারের ছেলে, এটি!" তার পর দোকানদারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি একবার দেখ দেখি, বেশ করে—পায়ে কোথায় আঁট হচ্ছে কি না। জুতো বরং একটু বড় হওয়া ভাল। ফোস্কা হবার কোন ভয় থাকে না। কশা জুতোর দুঃখের চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই—বুঝেছ! আমি একজন ভুক্তভোগী কি না, তাই বলছি।"

কথাটা বলিয়া বেলিসেয়ার আপনার পায়ের পানে একবার চাহিল! কবে ঠিক নিজের পায়ের মাপে একজোড়া জুতা ফরমাস দিয়া তৈয়ার করাইবার সামর্থ্য তাহার হইবে?

পরে ছেলেটিকে প্রায় বিশবার ধরিয়া প্রশ্ন করিয়া

যখন বেলিসেয়ার জানিল, জুতা তাহার পায় আঁট হয় নাই, ঠিক খাপ খাইয়াছে, তখন আশ্বস্ত চিত্তে পকেট হইতে একটি লাল রঙের ছোট থলি বাহির করিয়া জুতাওয়ালার হাতে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা গণিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া বেলিসেয়ার জাককে কহিল, "তুমি কোন্ দিকে যাবে, জাক?"

"কেন, বেলিসেয়ার?"

"কেন! তুমি যেদিকে যাবে, আমি ঠিক তার উল্টো পথে যাই আর কি তা হ'লে! তোমার সঙ্গে এক পথে আর আমি পা বাড়াচ্ছি না। খুব শিক্ষা হয়েছে—হাঁ।"

জাকের মনে একটা আঘাত লাগিল। মনের ভাব মনে চাপিয়া জাক বলিল, "আমি ঈসেনডেকের কারখানায় যাব—সেখানে আমি কাজ করব।"

"ঈসেনডেকের কারখানায় ঢোকা বড় সহজ নয়! ভাল সার্টিফিকেট চাই—না হলে ওরা ভর্ত্তিই করে না।" কথাটা বলিবার সময় বেলিসেয়ার জাকের পানে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রিভালের মত বেলিসেয়ারও আঁাদ্রের সেই চুরির ব্যাপার সম্বন্ধে জাকের প্রতি একটা ভ্রান্ত ধারণা পুষিতেছিল। জেনেদের টাকা জাকই চুরি করিয়াছিল বলিয়া বেলিসেয়ারের বিশ্বাস। কিন্তু জাক যখন তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল এবং আরও বলিল যে সে ঈসেনডেকের কারখানায় কাজ করিবে স্থির হইয়া গিয়াছে; নিকটেই একটা ঘর ভাড়া লইয়া তথায় সে বাস করিবে, তখন বেলিসেয়ারের সন্দিগ্ধ মন প্রসন্ন হইল। সে তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত বলিল, "আরে তাই না কি! তাহলে এই সন্ধ্যার সময় আর কোথায় এখন বাড়া খুঁজে পাবে, জাক? তার চেয়ে বরং আমার সঙ্গে এস। আমার বাসায় প্রকাণ্ড ঘর—তাতে খুব ঠাঁই হবে'খন! তারপর আমার মাথায় একটা মতলব আছে। খাবার সময় বলব—এস, আমার বাসায় এস, জাক!"

পথে বেলিসেয়ার জাককে মাদাম ওয়েবারের পরিচয় দিল! মাদাম ওয়েবার এক বিধবা নারী—রুটি বেচিয়া দিন-গুজরান করে। এই একটি ছেলে শুধু তাহার সমস্ত দুঃখ ভুলাইয়া রাখিয়াছে। ছেলেটিকে সে ঘরের বাহির হইতেই দেয় না। বেলিসেয়ারের সঙ্গে বলিয়াই বেচারা ছেলেটি পথের বাহির হইতে পাইয়াছে। মাদাম ওয়েবার ভোর পাঁচটায় রুটি বেচিতে যায়; বেলা এগারো-বারটার সময় ঘরে আসে, তাহার পর আহারাদি সারিয়া 'বেকারি'তে যায়, রুটি তৈয়ার করিতে; সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া আবার গৃহে ফিরে—বেলিসেয়ার বাটীতে থাকিলে ছেলেটি তাহার কাছে থাকে, না হয় ত পাড়ার কোন স্ত্রীলোক দয়া করিয়া ছেলেটিকে দেখে। যখন দেখিবার কেহ না থাকে, তখন চেয়ারের সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া মাদাম ওয়েবার বাহিরে যায়। কি জানি, একেলা থাকিলে যদি ছেলেমানুষ দিয়াশলাই লইয়া খেলা করিতে করিতে গায় আগুন লাগাইয়া পুড়িয়া মরে!

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া বেলিসেয়ার বলিল, "এই আমাদের বাড়ী!" জাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দীর্ঘ ত্রিতল বাড়ী—দেওয়ালের গায় অসংখ্য ছোট জানালা—বাহির হইতে দেখিলে কতকটা পায়রার খোপের মতই বোধ হয়। জাক বেলিসেয়ারের গৃহে প্রবেশ করিল। মাদাম ওয়েবার তখনও ফিরে নাই।

তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটিকে একটা বড় চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া বেলিসেয়ার জাককে লইয়া পাশে আপনার ঘরে আসিল। বাতি জ্বালিতে জ্বালিতে বেলিসেয়ার বলিল, "ভারী মজা হবে, জাক! ছেলের পায়ে নতুন জুতো দেখে মাদাম ওয়েবার একদম অবাক হয়ে যাবে! কে কিনে দিলে, বুঝতেও পারবে না! সে যা মজা হবে—হাঃ হাঃ—হাঃ!"

জাক কহিল, "তুমি একলা এখানে থাক, বেলিসেয়ার? আর তোমার বোন?"

বেলিসেয়ার কহিল, "না—বোনটি বিধবা হয়েছে! অত বড় পরিবার পোষা কি আমার কাজ! তা ছাড়া দিন-রাত ঝগড়া-কিচিমিচি! খেটে-খুটে এসে সে সব কি বরদাস্ত হয়! কাজেই এখানে বাসা নিয়েছি। মাদাম ওয়েবার আমায় খুব সাহায্য করে—ঘরকন্না দেখা-শুনা—বলতে গেলে আমার সবই সে করে দেয়। নৈলে কি আমার দ্বারা এ-সব পোষায়। বড় ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, বালাই নেই—পরের জন্যেই শুধু বেঁচে আছে! বাসার সকলেই মাদামের ভারী বাধ্য,—ভারী যশ মাদামের!"

বলিতে বলিতে টেবিলের উপর সে একখানা খবরের কাগজ বিছাইয়া দিল, তাহার উপর কাচের থালা-বাটি আনিয়া রাখিল—এবং অতিথি জাকের জন্য খাবার লইয়া আসিল। পরে বলিল, "তোমাদের বাড়ী সেই যে হ্যাম খেয়েছিলুম, জাক, আঃ, জীবনে তার স্বাদ কখনও ভুলব না! বলব কি, অমন জিনিস আমি আর কখনও খাইনি! চমৎকার! এ কি আর খাবার!"

বেলিসেয়ার যাহাই বলুক, জাকের কিন্তু এ আহার মন্দ লাগল না। সিদ্ধ আলু অনেকগুলা ছিল, সবগুলাই সে প্রায় খাইয়া ফেলিল—রন্ধনটুকুও পরিপাটী! রন্ধনের সে সুখ্যাতি করিলে বেলিসেয়ার কহিল, "এ-সব মাদাম ওয়েবার নিজে রেঁধে রেখে গেছে! তার গুণ কখনও ভুলব না, আমি! আঃ, কি রান্নাই রাঁধে! তার জন্য আমার ঘরকন্না নিজেকে আর দেখতেও হয় না। সব সে

ঠিক করে রাখে। এই জিনিষপত্তর যা দেখছ,—এর কতক ত মাদাম ওয়েবারেরই—আমায় ধার দেছে, ব্যবহার করব বলে! হুঁঃ, কটা দিনের জন্তেই বা এ ধার! এর পরে ত সব আমাদের দুজনেরই হবে।"

কৌতুহল-চিত্তে জাক প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মাদাম ওয়েবারের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে—তা বুঝি জান না? হাঃ হাঃ হাঃ···"আনন্দের আতিশয্যে কথাটা বলিয়া ফেলিলেও ঈষৎ লজ্জায় বেলিসেয়ারের গাল দুটা তখনই লাল হইয়া উঠিল! "বিয়ের সবই প্রায় ঠিক। আমি ত বলছি, দেরী করে আর কাজ কি? তা মাদাম ওয়েবার বলে, না, এ আয়ে কুলাবে না। ভারী হিসেবী লোক কি না! সে বলে, একজন সঙ্গী পাও যাতে, তা দেখ,—এক-সঙ্গে থাকবে—বাড়ীর ভাড়া আর খাওয়ার জন্য কিছু ধরে দেবে,—এমন লোক! তাহলে খরচেরও অনেকটা সাশ্রয় হয়। কথাটা খাঁটি বটে! কিন্তু এমন লোক যে পাচ্ছি না—বিয়ে হয়নি, কি, স্ত্রী মারা গেছে, এমন একটি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ পাই, ভাল বিশ্বাসী লোক হয়, তবেই না! মাদাম ওয়েবার ভারী কষ্ট পেয়েছে। তার প্রথম স্বামীটা বেজায় মাতাল ছিল—ভারী বদমায়েস! মদ খেয়ে এসে মাদাম ওয়েবারকে কি বকাই বকৃত। আবার কি তাই শুধু? বেদম মারতও! হাত তুলত জাক, সত্যি ওর গায়ে হাত তুলত! আস্পর্দ্ধাটা বোঝ একবার! অমন ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার, তার গায়ে হাত তোলে—পাজী, বদমায়েস কোথাকার! আমি বলে দিচ্ছি, জাক, তুমি বরং দেখো, বিয়ে হয়ে গেলে কখনও ওর গায়ে আমি হাত তুলব না—কখনও না! বরং ও যদি তুলতে চায় ত আমি পিঠ বাড়িয়ে দেব। এখন আসল বিপদ হচ্ছে, কি জান? এই লোক নিয়ে—কোথায় যে পাই, এমন লোক,—বুঝছ কি না?"

"লোক খুঁজছ তুমি? তা আমায় রাখতে কোন আপত্তি আছে তোমার?"

বেলিসেয়ারের মনেও এই কথাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু নিজে হইতে এ কথা পাড়িতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তাই সে একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া কহিল, "তুমি! তুমি থাকবে, জাক?"

"হাঁ, আমি! আমিই থাকব। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, বেলিসেয়ার?"

"আমরা গরীব—তার উপর টানাটানি করে ভাই, সংসার চালাই—খাওয়া-দাওয়া ত তেমন যুৎসই-গোছ নয়! তোমার ভাল খাওয়া অভ্যাস—তুমি—"

"না বেলিসেয়ার—আমি বেশ থাকব, এখানে। তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে—"

"আপত্তি! এ'ত পরম সৌভাগ্যের কথা!"

"আমিও খরচ-পত্তর টেনেটুনে করতে চাই—আমিও বিয়ে করব কি না—"

"তুমিও বিয়ে করবে? আরে বাঃ—কবে? কবে বিয়ে কর্ব্বে, শুনি।"

"সে এখন অনেক দেরী আছে, বেলিসেয়ার,—চার বচ্ছর দেরী। এখানে আমি দিনের বেলায় ঈসেনডেকের কারখানায় কাজ করব, আর রাত্রে পড়াশুনা করব! ডাক্তারী শিখব।"

এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। বেলিসেয়ার কহিল, "মাদাম ওয়েবার আসছে!"

পরমুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া সহাস্য মুখে মাদাম ওয়েবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কোনদিকে না চাহিয়াই সে বলিল, "এ নিশ্চয় তোমার কাজ, বেলিসেয়ার, এই ছেলেটাকে জুতো কিনে দেওয়া—" সহসা তাহার দৃষ্টি নবাগত তরুণ লোকটির প্রতি পড়াতেই মাদাম ওয়েবার থমকিয়া থামিয়া গেল। বেলিসেয়ার তখন জাকের পরিচয় প্রদান করিল। জাক যে অর্থ দিয়া তাহাদের বাসায় থাকিতে ইচ্ছুক, সে কথাও এক নিশ্বাসে সে বলিয়া ফেলিল। মাদাম ওয়েবার তাহা শুনিয়া জাককে কৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে ত্রুটি রাখিল না।

পরদিন সঙ্গীর বাসের সুবিধার জন্য মাদাম ওয়েবার ও বেলিসেয়ার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। বড় ঘরের একধারে একটা বিছানা পড়িল। তাহারই পাশে একটা পুরাতন টেবিলের উপর মাদাম ওয়েবার রিভালের দেওয়া জাকের বইগুলি স্তুপাকারে সাজাইয়া রাখিল। কিছুদিন পরে তাহারা নূতন বাসা ভাড়া করিবে—কারখানার নিকটেই বাসা লইবে, তাহা হইলে জাকের পথের কষ্টও অনেকটা লাঘব হইবে, এ আশ্বাসও বেলিসেয়ার জাককে দিতে ভুলিল না!

রাত্রে মাদাম ওয়েবার শিশুটিকে শয্যায় শয়ন করাইয়া জাকের গৃহে আসিয়া জাকের বাসন-পাত্র ঠিক করিয়া রাখিত, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ সাবান-জলে ধুইয়া সাফ করিয়া দিত, জাকেরই বাতির আলোয় জাকের পাশে বসিয়া বেলিসেয়ার টুপি তৈয়ার করিত, আর জাক বহি খুলিয়া তাহারই মধ্যে আপনার সমগ্র চিত্ত একাগ্রভাবে নিক্ষেপ করিয়া দিত। এই অনলস পরিশ্রমী সচ্চরিত্র লোক দুইটির সঙ্গ তাহার মুহূর্ত্তের জন্য দুঃসহ ঠেকিত না! বরং তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার অবসন্ন মন বিপুল শান্তিতে ভরিয়া উঠিত!

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সে এতিয়োলে ছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তুচ্ছ লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সে এমন পরিপূর্ণ আগ্রহে আবার একদিন কারখানার কাজে হাত দিতে পারিবে! আজ নূতন করিয়া আবার যখন সে কারখানায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার

চিত্তে আর এতটুকু বেদনা নাই, এতটুকু ক্ষোভ নাই। এই নীচ সঙ্গ-- সত্যই নীচ—কিন্তু এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে তাহার আজ আর কোন আপত্তি ছিল না। কারণ, নরকের এই পথের পরই ঐ যে দূরে স্বর্গলোকের সুগভীর আনন্দ-মাধুরীর আভাষ পাওয়া যাইতেছে, আশ্বাস মিলিতেছে—সেই কাম্য স্বর্গে দেবী সেসিল জাকের গলে বিজয়-মাল্য দিবার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে!

কারখানার কাজ কঠিন ছিল। সেই বায়ু-হীন অগ্নি-গহ্বর! নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে—তথাপি সেসিলের চিন্তা মুহূর্ত্তেই শত বেদনা ভুলাইয়া দেয়, প্রাণে নব শক্তি সঞ্চারিত করে!

কারখানায় কাহারও সহিত সে মিশিত না। পুরুষ-গুলা কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও জাকের গাম্ভীর্য্য টলাইতে না পারিয়া শেষে তাহার বশ মানিয়াছিল। আর নারীর দল দীপ্ত যৌবনের সহস্র প্রলোভনেও জাককে ভুলাইতে পারিল না! তাহাদের চটুল চাহনি, মৃদু হাস্য, সমস্তই এই কর্ত্তব্য-কঠোর তরুণ যুবকের বুকে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত—সকল চেষ্টাই তাহাদের ব্যর্থ হইত! কারখানায় সকলে জাককে 'হুজুর' বলিয়া ডাকিত—জাক তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইত না। ঘরে-বাহিরে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে নিজের কাজ সারিয়া চলিয়াছিল।

কাজের পর কোথাও জাক মুহূর্ত্তের জন্য বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিত। পথ দীর্ঘ ছিল—তার মনে হইত, সে উড়িয়া যায়! কতক্ষণে এই সব কালি-ঝুলিমাখা পোষাক খুলিয়া দূরে ফেলিয়া স্নানের পর পরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশ পরিয়া নিজের অস্তিত্ব সে ফিরিয়া পাইবে! পাঠে আগ্রহ বাড়িয়াই উঠিত। কত রাত্রি একেবারে নিদ্রাহীন কাটিয়া গিয়াছে। সহসা চোখে প্রভাতের আলো লাগায় তাহার চমক ভাঙ্গিয়াছে! মাদাম ওয়েবার কত ভর্ৎসনা করিয়াছে, "মাষ্টার জাক, সারা দিন কাজ, আর সারা রাত্রি পড়া—একদণ্ড জিরেন নেই—চোখে এতটুকু ঘুম নেই—এমন হলে বাঁচবে কেন?" জাক শুধু তাহার পানে সহাস দৃষ্টিতে চাহিত। কি বলিবে, এমন কথা সে খুঁজিয়া পাইত না। একবার মনে হইত, সত্যই ত! এমন করিলে শরীর যে থাকিবে না! আবার তখনই মনে হইত, না, সাধনা—কঠোর সাধনা চাই—নহিলে সিদ্ধি মিলিবে কেন?

সপ্তাহে একদিন শুধু সে পৃথিবীর পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পাইত; একদিন সে সুখী হইত। সেদিন রবিবার। ভোর পাঁচটা বাজিলে সহস্র কাজ ফেলিয়া স্নান সারিয়া ভাল পোষাক পরিয়া তাহাকে সাজিতেই হইবে। দেহের কালি ভাল করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া মনের ময়লা সাফ করিয়া মাদাম ওয়েবারের স্বহস্তে দেওয়া পোষাকে ভূষিত হইয়া জাক যখন এতিয়োলের পথে বাহির হইত, তখনকার তাহার সেই বেশ, সেই প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া কারখানার কারিকরেরা ভাবিত, এ তাহাদের সে জাক নহে, যেন কোন্ রাজপুত্র। কোন্ পরী-কাহিনীর সুশ্রী সুরূপ রাজপুত্র—পরীর দেশে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার চিত্ত হরণ করিবে বলিয়াই এমন বেশে সাজিয়া চলিয়াছে!

তাহার জন্য এতিয়োলে সে কি স্বর্গ-সুখ সঞ্চিত আছে। রবিবারটি যেন অন্য দিনগুলার মত দণ্ড-প্রহরে বিভক্ত নহে—সে যেন একটা অবিভক্ত, অখণ্ড শুভ মুহূর্ত্ত।

মলিন মর্ত্ত্যে স্বর্গের এক কোণ যেন খসিয়া পড়িয়াছে! রিভালের গৃহ কি এক বিচিত্র শোভায় সাজিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্যই যেন দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল আগ্রহে দাঁড়াইয়া থাকে! ডাক্তারের প্রসন্নতা, সেসিলের সরম-জড়িত সুগভীর আবেগ—এমন কাম্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর কি আছে! সপ্তাহে জাক কতখানি পড়িল, রিভাল তাহার হিসাব লইতেন, নূতন পাঠ বলিয়া দিতেন, বুঝাইয়া দিতেন। তার পর অপরাহ্নে সকলে ভ্রমণে বাহির হইত। কোন-দিন নদীর ধারে, কোনদিন বা বনের দিকে! ডাক্তার আপনার গতির বেগ কমাইয়া দিতেন—জাক ও সেসিল অনেকটা আগে চলিয়া যাইত! যাইতে যাইতে তাহাদের কত কথা হইত—কি করিয়া দিন কাটি-তেছে, কেমন সব লোকজন! কিন্তু তাই বলিয়া, হৃদয়ের গোপন কোন কথার এতটুকু আভাষও কেহ দিত না। সে বিষয়ে দুইজনে সতর্ক থাকিত—কিন্তু কথা বলিতে বলিতে এমন ঘটিত, উভয়েই সহসা স্তব্ধ হইয়া পড়িত। যে কথা চাপিয়া রাখিবার জন্য এত চেষ্টা, এই স্তব্ধ নীরবতা, তাহাই যেন মুখরিত করিয়া তুলিত! ব্যক্ত ভাষা যাহা ফুটাইতে পারে না, অনেক সময় নির্ব্বাক নীরবতায় তাহা ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতির ইহা এক বিচিত্র কৌশল সন্দেহ নাই!

সেদিন বনের পথে যাইতে যাইতে একটা উগ্র কটু গন্ধ সকলের নাসিকায় প্রবেশ করিল। ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "নিশ্চয় ডাক্তার হার্ষ্ এসেছে—সমস্ত বন পুড়িয়ে বিষের সৃষ্টি করছে—নিশ্চয় এ ডাক্তার হার্য্।"

সেসিল দ্রুত আসিয়া ডাক্তারের মুখ চাপিয়া ধরিল, "আঃ দাদা, আস্তে। শুনতে পাবে!"

সেসিলের হাত সরাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "শুনুক না। ওকে কি আমি ভয় করি, সেসিল? জাককে যেদিন ওর হাত থেকে কেড়ে আনি, সেইদিনই ও আমার

পরিচয় পেয়েছে। এ বুড়ো হাড়ে কত বল, তা ও সেদিন খুব বুঝেছে !"

তথাপি 'আরাম-কুঞ্জে'র সম্মুখ দিয়া চলিবার সময় জাক ও সেলিল উভয়েই নীরব হইত। তাহাদের মনে হইত, ঐ বুঝি ডাক্তার হাবৃজ্‌ জানালার অন্তরাল দিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে। অথচ কেন এ ভয় ? জাক ত আর্জাস্তঁর সহিত সব সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছে ! আজ তিন মাস কেহ কাহারও মুখ দেখে নাই ! আর্জাস্তঁর প্রতি জাকের ঘৃণা দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছে। কিন্তু সে মাকে ভালবাসিত ! তবুও যেদিন সে সেসিলকে ভালবাসিয়াছে, সেদিন সে বুঝিয়াছে, কি অমূল্য সম্পদ এই ভালবাসা। কি শ্রদ্ধা ও গৌরবের সামগ্রী, এই প্রেম ! এই প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিয়াছে বলিয়াই আর্জাস্তঁর প্রতি ইদার এই নির্লজ্জ আত্মগত্য, এই হেয় দাস্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত মন দারুণ লজ্জায় ভরিয়া উঠিত ! হায়, অভাগিনী নারী, কি এ অন্ধ মোহ ! এ কি বিরাট ভ্রমের মধ্যে পড়িয়াছ, তুমি। কিন্তু—এই ইদা, আবার তাহার মা ! তাই ইদার প্রতি ঘৃণার উদয় হইলেও করুণা ও অনুকম্পার মাত্রাটাই জাকের চিত্তে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিত

এই তিনি মাসে ইদার সহিত জাকের কয়েকবার সাক্ষাৎও হইয়াছিল। ইদাকে জাক পত্র লিখিত, তাই ইদা তাহার সংবাদ পাইত। দুই একবার গাড়ী করিয়া কারখানার দ্বারে আসিয়া ইদা জাকের সহিত সাক্ষাৎও করিয়া গিয়াছে—সাক্ষাতে অপর কথা যত হউক না হউক, আর্জাস্তঁর কবি-যশের দীপ্ত বর্ণনায় ইদা পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত।

কারখানার দ্বারে এত বড় গাড়ী দাঁড়াইতে ও মজুর জাককে সেই গাড়ীর আরোহিণী এক সুবেশা সুরূপা নারীর সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া কারখানার কারিকরদের মনে জাকের প্রতি একটা সম্ভ্রম জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে যখন দুই-চারিটা কাণাঘুষা জাকের কানে পৌঁছিল, তখন সে মাকে নিষেধ করিয়া দিল—কারখানায় কাজের সময় বাহিরে আসিয়া সে আর দেখা করিতে পারিবে না —কারখানার কর্ত্তৃপক্ষেরও তাহা মনঃপূত নহে, তখন কখনও সাধারণ উদ্যানে, কখনও-বা গির্জ্জাঘরে সন্ধ্যার সময় মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হইত।

একদিন এমনই ভাবে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ইদা জাককে বলিল, "জাক, আমি এক বিপদে পড়েছি। তুমি—" কথাটা ইদার মুখে বাধিয়া গেল।

জাক কহিল, "আমি কি ? বল, মা।"

"না, এই বলছিলুম কি—এ মাসটায় আমার এত বেশী খরচ হয়ে গেছে যে, হাত একেবারে খালি—কিছু নেই, জাক ! তাই বলছি কি—ওঁকে টাকার জন্য কিছু বলতেও পারি না আমি, বিশেষ এখন ওঁর সময়টা বড় ভাল যাচ্ছে না—কাজেই মেজাজও একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে ! তাই বলছিলুম, তুমি যদি দিন-কতকের জন্য আমায় কিছু ধার দিতে পার—ধার অবশ্য ! এ টাকা শীঘ্রই আমি শোধ করে দেব।"

জাক বলিল, "শোধ দেবার কোন দরকার নেই। তুমি মা, আমার কাছ থেকে টাকা নেবে তুমি, সে ত আমার ভাগ্য। আর কারও কাছ থেকে তুমি টাকা নিয়ো না, মা,—যখনই দরকার হবে, আমায় বলো—যেমন করে পারি, আমি তোমায় দেব।" বলিয়া পকেটে যে কয়টি মুদ্রা ছিল, তাহার সমস্তই জাক ইদার হাতে দিল। সেদিন সে কারখানায় বেতন পাইয়াছিল।

ইদা কম্পিত হস্তে মুদ্রা কয়টি গ্রহণ করিল।

জাক কহিল, "মা, তোমার ওখানে অসুবিধা হচ্ছে, না ? বল, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে ! তা যদি হয় ত, আমি আছি, মা—আমার ঘর আছে। এস, আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকবে, এস। তা হলে আমার যে কি সুখ হবে—"

"না, জাক—ওঁর এখন সময় বড় খারাপ যাচ্ছে, এ সময় ওঁকে এমনভাবে ফেলে চলে আসা ঠিক হবে না—ভারী অধর্ম্ম হবে।" বলিয়া ইদা কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। জাক অভিভূতভাবে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুত্র-গৃহে

জুন মাস। উষার প্রাক্কাল। বাতি জ্বালাইয়া জাক বহি পড়িতেছিল। বেলিসেয়ারেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। উঠিয়া সে কালি মাখাইয়া আপনার জুতা সাফ করিতেছিল। জুতা সাফ করিতে সে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, পাছে তাহার শব্দে জাকের গ্রন্থ-মগ্ন চিত্তে কোন ব্যাঘাত লাগে !

জানালা খোলা ছিল। তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের আকাশ দেখা যাইতেছিল। নীল আকাশের তলে আলোর মৃদু তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া নীচে নামিতেছিল।

অদূরে দুই চারিটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছিল। সহসা পথে শুনা গেল, "রুটি নাও গো, রুটি !" এ স্বর মাদাম ওয়েবারের। মাদাম ওয়েবার আপনার রুটির বাক্স লইয়া পথে বাহির হইয়াছে।

দরিদ্র পল্লীতে মাদাম ওয়েবারের প্রথম আহ্বানটি ঠিক ঘড়ির কাজ করিত। তাহার স্বর শুনিলেই সকলে ধড়মড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িত। ঐ ডাক পড়িয়াছে! বিশ্রামের অবসর ফুরাইয়াছে! এখনই আবার উদরের তৃপ্তি-সাধনের চেষ্টায় জীবন-যজ্ঞে ছুটিতে হইবে, কাজের সন্ধানে ঘুরিতে হইবে। আর আলস্য নয়! ঔদাস্য নয়! ছুটিয়া চল, ছুটিয়া চল।

এ শুধু মাদাম ওয়েবারের ডাক নয়; এ ক্ষুধার ডাক! উদরের ডাক! ঘুমাইয়া-থাকিলে উদর ছাড়িবে, কেন? সে তাহার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে! যতক্ষণ তাহার দাবী না চুকাইবে, ততক্ষণ মুক্তি নাই। বিচার নাই। প্রভাতের আহ্বানে শিশুর দল জাগিয়া উঠিতেছে। আহার নাই। নহিলে তাহারা অশান্তির রোল তুলিবে! ভাগ্যলক্ষ্মীর উপেক্ষিত দুর্ভাগার দল তাই প্রভাতের সাড়া পাইলে শিহরিয়া উঠে। অভাবের বিকট মূর্ত্তি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে—নির্ম্মম অনশন লোল জিহ্বা মেলিয়া নিতান্তই অকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

বাতি নিবাইয়া বহি বন্ধ করিয়া জাক উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল! পথ-পারে প্রকাণ্ড বাসাবাটীর জানালাগুলি একে একে মুক্ত হইতেছিল। ভিতরকার দারিদ্র্যও অমনই তাহার দারুণ জীর্ণতা লইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। কোন কক্ষে এক বৃদ্ধা নারী সেলাইয়ের কল লইয়া বসিয়া গিয়াছে, পাশে দাঁড়াইয়া ছোট নাতনীটি বস্ত্রখণ্ড অগ্রসর করিয়া দিতেছে! কোথাও কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য কোন কিশোরী চট্‌পট্‌ পোষাক পরিয়া লইতেছে— আবার কোনখানে বা সেবা-রতা নারী দারুণ উদ্বেগে দীর্ঘ রাত্রি যাপনের পর রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া জানালার পাশে আসিয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরে তপ্ত ললাট জুড়াইয়া লইতেছে!

গৃহ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া জাক চারিধার লক্ষ্য করিতেছিল। ব্যথিত পল্লীর কাতর দীর্ঘনিশ্বাস প্রভাতের বায়ু-তরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইতেছিল। কি শান্ত, করুণ সে দৃশ্য!

রবিবার আসিতে এখনও তিন চারিদিন বিলম্ব আছে। জাকের মনে পড়িল, লতা-পাতা-ঘেরা এতিয়োলের সেই স্নিগ্ধ গৃহখানির কথা! ফটকের প্রাচীর জড়াইয়া আইভির লতা উঠিয়াছে—ইতস্ততঃ দুই-চারিটা ডালিম ও ন্যাশপাতি গাছের অন্তরালে বন্য গোলাপ ও হানিসাকলের ঝাড়। তাহা পার হইয়া গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে দেওয়ালে ডাক্তারের ছোট ঘণ্টাটি ঝুলানো! আরাম যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এতিয়োলের সেই শান্ত রম্য গৃহকোণটিতে! ভাবিতে জাকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল—পাঠ ও জাগরণের ক্লান্তি ঘুচিয়া গেল। তাহার নেত্র-সমক্ষে ডাক্তার রিভালের গৃহ আপনার পরিপূর্ণ মাধুরী লইয়া জাগিয়া উঠিল এবং একটি পুষ্পিত দেহ-লতার স্নিগ্ধ সুরভি ও রেশমী কাপড়ে খস্‌খস্‌ শব্দ নিমেষে তাহাকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করিয়া ফেলিল!

"ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরোও।" সহসা বেলিসেয়ারের স্বরে জাকের চমক ভাঙ্গিল। কফি তৈয়ার করিতে করিতে মাথা তুলিয়া বেলিসেয়ার কহিল, "ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরোও!"

বাহিরের দ্বারে কে চাবি ঘুরাইতেছিল। আবার শব্দ হইল, খুট্‌! খুট্‌! খুট্‌!

বেলিসেয়ার হাঁকিল, "ডান দিকে—আঃ, ডান দিকে গো।" তবু চাবি বাম দিকেই ঘুরিল! কফি-দানটা হাতে লইয়াই অধীরভাবে উঠিয়া বেলিসেয়ার দ্বার খুলিয়া দিল! দ্বার-সম্মুখে এক নারী দাঁড়াইয়া ছিল।

বেলিসেয়ারকে দেখিয়া নারী কহিল, "মাপ করবেন! আমি ভুল ঘরে এসেছি।"

সে স্বরে জাক কিন্তু চমকিয়া উঠিল। দ্বারের দিকে চাহিয়াই সে অগ্রসর হইল, কহিল, "না মা, ভুল নয়। এ ঘর আমারই—"

সে নারী, ইদা।

জাককে দেখিয়া ইদা ঝড়ের মত বেগে কক্ষে প্রবেশ করিল। অত্যন্ত অধীর আবেগে সে জাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া কম্পিত স্খলিত স্বরে কহিল, "জাক, জাক, আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও! এত তার আস্পর্দ্ধা, এত দূর সাহস যে, আমায় সে অপমান করে! যার জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি—আমার গর্ব্ব, আমার ধর্ম্ম, আমার একমাত্র ছেলে—সব আমার—কারও পানে, কিছুর পানে চেয়ে দেখিনি, সে—সেই পাষণ্ড আমার গায়ে হাত তুলেছে! হাঁ, জাক, সত্যই সে আমায় মেরেছে! দুদিন দু-রাত্তির বাহিরে কোথায় কাটিয়ে, কাল শেষ রাত্রে যখন সে বাড়ী আসে, তখন আমি বিরক্ত হয়ে সেই কথাই বলেছিলুম, তাই, তাই সে আমায় মেরেছে—মেরেছে, জাক! এই দেখ, আমার হাতে রক্ত জমে রয়েছে—গলার কাছে ছড়ে গেছে—এই তার নখের দাগ।"

অভাগিনী নারীর চোখে অশ্রুর সাগর বহিল। ইদা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া বেলিসেয়ার কখন্ সরিয়া পড়িয়াছিল। পারিবারিক ব্যাপারে অনধিকার-প্রবেশের এতটুকু অপ্রীতিকর সম্ভাবনা না রাখিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল।

মার মুখের পানে জাক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্ষোভে রোষে তাহার সমস্ত প্রাণ গর্জ্জিতে লাগিল। একটা দারুণ দাহে মন জ্বলিয়া উঠিল। মাথার মধ্যে রক্ত যেন নাচিয়া ছুটিল। এত স্পর্দ্ধা! পাষণ্ড, কাপুরুষ! দুর্ব্বল

নারীর শরীরে আঘাত কর! তাহার মনটাকে ত দলিত, ছিন্ন, মর্দ্দিত করিয়া দিয়াছ—তাহাতেও তৃপ্তি পাও নাই, শেষে তাহার দেহেও আঘাত করিয়াছ! দুর্ব্বৃত্ত! নরাধম! জাকের হাত নিশপিশ করিতে লাগিল—একবার যদি তাহাকে কাছে পাওয়া যাইত! একবার!

চোখের জল মুছিয়া ইদা কহিল, "এ দশ বছর আমি কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি! পদে পদে অবহেলা, লাঞ্ছনা, কি না সহ্য করেছি! কিন্তু রাক্ষস, রাক্ষস সে। প্রাণে তার এতটুকুও মনুষ্যত্ব নেই, জাক। হোটেলে সরাইয়ে যত নীচ সঙ্গী আর লক্ষ্মীছাড়া মাগীর সংসর্গেই তার মনের মত হয়েছে! সেখানেই এখন তাদের কাগজের আড্ডা হয়েছে। তার ফল হাতে হাতে ফলছেও। গেল মাসের কাগজখানা যদি দেখতে, কি জঘন্য হয়েছে! যাক, বেশ হয়েছে! শোন জাক, সে শয়তানের সব কথা খুলে বলি! তুমি জান, ও অ্যাঁদ্রেয় গেছল, সেই কলঙ্কের সময়! আমিও সঙ্গে গেছলুম। আমায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, ছল করে নদীর ধারে ফেলে গেছল। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, এ তার সহ্য হত না। কি পিশাচ সে, ভাব একবার। তারপর এই যে টাকা নিয়ে কাগজ বের করেছে, এ সব তোমার টাকা। বন্ধু তোমায় দিয়েছিলেন। সেই সব টাকা সে কাগজ বাব করে উড়িয়ে দেছে, তোমায় বলে নি, আমাকেও বলতে দেয়নি। আমায় কি ভরসা দিয়েছিল, জান? বলেছিল, কাগজের কারবারে ভারী লাভ। ঐ টাকার চারগুণ তুলে দেবে বলে সে আমায় লোভ দেখিয়েছিল! আমারও বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, তাই সে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলুম। আমায় যাদু করেছিল সে, আমায় যাদু করে রেখেছিল। তার অবহেলা কাল রাত্রে আমার অসহ্য বোধ হয়—তোমার টাকা চেয়েছিলুম কাল রাত্রে, তা সে কি বললে জান, জাক?"

ইদা মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল। পরে উত্তেজিত দেহভার সম্মুখস্থ চেয়ারে রক্ষা করিয়া আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল, "সে এক ফর্দ্দ আমার সামনে ফেলে দিলে, লম্বা ফর্দ্দ। দিয়ে বললে, তোমার পিছনে সেই টাকার দেড়গুণ তার খরচ হয়েছে। এতিয়োলে আর রুদিকদের ওখানে তোমার ঠাঁই আর খোরাক-পোষাকের জন্য এই টাকা খরচ হয়েছে। তোমার টাকাতে তার সব শোধ না হলেও বাকীটা আমার খাতিরে মাপ করতে তার আপত্তি নেই, তা-ও সে বলেছে। এই সব অন্যায় কথায় আমার রাগ বেড়ে উঠল। বেশ কড়া দু-চারটে কথা আমিও তাকে শুনিয়ে দিলুম—কথার তার জবাব দিতে পারলে না, সে—তাই আমায় মেরেছে, মেরেছে সে!"

জাক ডাকিল, "মা—"

ইদা কহিল, "তাই আমি তোমার কাছে এসেছি, জাক। আমায় আশ্রয় দাও। আর আমার কে আছে, কার কাছে যাব, বল? কে আমায় ঠাঁই দেবে?"

ইদার বুকে মুখ রাখিয়া জাক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে মাথা তুলিয়া সে কহিল, "বেশ করেছ, মা, তুমি আমার কাছে এসেছ। আমার জীবনে এই এক দুঃখ ছিল, এক অভাব,—সে এই যে, তোমায় পাই নি। আজ আমার সে দুঃখ ঘুচে গেছে—তোমায় পেয়েছি! তুমি এসেছ! এখানেই থাক—আর কখনও আমায় ছেড়ে যেয়ো না। যতদিন আমি আছি, তোমার জাক বেঁচে আছে, ততদিন তোমার কোন অভাব হবে না, কোন দুঃখ নয়—এ তুমি ঠিক জেনো। কিন্তু আর তুমি সেখানে যেয়ো না যেন, কখনও না।"

"আবার যাব। আমি! সেখানে! তার কাছে! না, জাক! এখন শুধু তুমি আর আমি! এই আমাদের জগৎ, আর কেউ নয়—তৃতীয় প্রাণীটি নয়। তোমায় বলেছিলুম, জাক, মনে আছে, একদিন এমন দিন আসবে, যেদিন তোমার কাছে আসব? আজ সেই দিন এসেছে।"

পুত্রের অভয় স্নেহে নীড় পাইয়া ইদার চঞ্চল প্রাণ শান্ত হইল। ইদা কহিল, "তুমি দেখো, জাক—তোমায় আমি কত ভালবাসি! আমার এত স্নেহ, এবার তা সব তৃপ্ত করব। তোমার কাছে আমি ঋণী আছি, জাক, এবার সে ঋণ শোধ করব!"

জাক কহিল, "না মা, ও কথা বলো না! তুমি আমার কাছে ঋণী নও। ঋণী আমি,—ছেলে! মার সুখের জন্য ছেলে যদি কখনও আপনার সুখ, আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তবেই তার মাতৃঋণ শোধ হয়। ছেলের কাছে মার আবার ঋণ কি! ছেলের জন্য কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না, অসহায় ছেলেকে মানুষ করে তোলে, কে? সে মা! সে-ই মা, ঋণী—? তা কি কখনও হতে পারে, মা?"

জাকের কথা ইদার কানেও গেল না। চাহিয়া ইতিমধ্যে সে একবার চারিধার দেখিয়া লইল। ইদা কহিল, "চমৎকার থাকব, এখানে দুই মায়ে-পোয়ে চমৎকার থাকব। তবে ঘরটা বড় বিশ্রী, জাক, যেন আঁস্তাকুড় হয়ে আছে। ছোট্ট, আলো নেই, হওয়া নেই, কি এ! এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে কেন? আমি যখন এসেছি, তখন আর কোনখানে কোন খুঁত রাখছি না।"

ঘরটি ছোট হইলে কি হয়, বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবারের কতখানি স্নেহ-যত্ন এ ঘরে মাখানো রহিয়াছে! মার মুখে সেই ঘরের নিন্দা শুনিয়া জাকের প্রাণে ঈষৎ বেদন বোধ হইল। এই ঘরখানির উপর বেচারা বেলিসেয়ারের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে!

কারখানায় যাইতে জাকের আর আধঘণ্টা বিলম্ব ছিল—ইহার মধ্যে মাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত কি করিয়া হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া জাক কাতর হইয়া পড়িতেছিল। ইদাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে বেলিসেয়ারের কাছে গেল—বেলিসেয়ারকে সব কথা খুলিয়া বলিল, "মা ত এখানে থাকতে চান, বেলিসেয়ার। কি রকম বন্দোবস্ত এখন করা যায়, বল দেখি।"

কথাটা শুনিয়া বেলিসেয়ার চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাই ত! সে ভাবিল, তবেই ত জাক আর তাহাদের সহিত এক-খরচে থাকিবে না, স্বতন্ত্র বাসা লইবে! তাহার বিবাহের দিনও বুঝি আবার কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের অন্তরালে সরিয়া পড়ে! কিন্তু আপনার নৈরাশ্যের বেদনা গোপন করিয়া সে জাককে সাহায্য করিতে তৎপর হইল। তাহাদের ঘরটি ছিল বড়—সেইটাই জাক ও তাহার মার জন্য ছাড়িয়া দিয়া জাকের ছোট ঘরে তাহারা আশ্রয় লইবে, ইহাই স্থির করিয়া সে জিনিস-পত্র টানিতে সুরু করিয়া দিল।

জাক বেলিসেয়ারকে মাতার নিকট পরিচিত করিয়া দিল। বেলিসেয়ার ইদাকে সহজেই চিনিতে পারিল—এতিয়োলের সেই পরিচ্ছন্ন গৃহটির পরিচ্ছন্না কর্ত্রী-ঠাকুরাণী!

এখন অতিরিক্ত একটা শয্যা, দুইখানা চেয়ার ও জলের পাত্র প্রয়োজন। জাক ড্রয়ার খুলিয়া মূল্য বাহির করিয়া বেলিসেয়ারের হাতে দিয়া ইদাকে কহিল, "রান্নাটা তা হলে মাদাম ওয়েবারই করে দেবে, কি বল, মা? বড় ভাল লোক, এই মাদাম ওয়েবার।"

"না, না, জাক, তাকে কষ্ট দেবার কি দরকার? আমিই রাঁধব। তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, তুমি। বেলিসেয়ার আমায় দোকান দেখিয়ে দিক—আমি নিজে গিয়ে বাজার করে আনছি—নিজেই রাঁধব। কেন, শুধু শুধু কতকগুলো বাজে খরচ করবে? তুমি ফিরে এসে দেখবে,—সব ঠিক থাকবে।"

জাক পোষাক পরিয়া কারখানায় চলিয়া গেলে ইদা গায়ে একখানা শাল ফেলিয়া বেলিসেয়ারের সহিত বাজারে বাহির হইল।

মাতাকে আপনার গৃহে আপনার আয়ত্তে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিয়া জাকের প্রাণ আজ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, আজিকার জগৎ যেন সেই চিরদিনকার পরিচিত পুরাতন জগৎ নহে—নূতন আনন্দ-পরিপূর্ণ। আজিকার প্রভাতে আনন্দের যেন এক বিচিত্র সুর জাগিয়া উঠিয়াছে—আকাশে বাতাসে অপূর্ব্ব রাগিণী! নির্জীব প্রকৃতি যেন কাহার ললিত স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে! কাজের মধ্যেও সে আজ নূতন আনন্দ পাইল— অন্যদিন কারখানার কাজ শুধু সে কর্ত্তব্যের দায়ে করিয়া যাইত মাত্র; তাহার হাত-পা নড়িত, প্রাণহীন যন্ত্রের মতই সে চলিত, ফিরিত। কাজের মধ্যে আজ প্রথম তাহার প্রাণটা সাড়া দিয়া উঠিল। দ্বিগুণ উৎসাহে সে কারখানার কাজ চালাইল। তাহার সে উৎসাহ সঙ্গী কারিকরদিগের দৃষ্টি এড়াইল না। সকলে কাণাঘুষা করিল, "হুজুরের আজ একবার ফূর্ত্তিটা দেখেছ হে! প্রাণের ধন মিলেছে বুঝি, আজ!"

জাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিক ধরেছ, বটে।"

কাজের শেষে লঘু চিত্ত লইয়া জাক গৃহে ফিরিল। না, গৃহে নহে, মার কোলে! মা গৃহে আছে ত? ইদার সঙ্কল্প যত দৃঢ় হউক, চিত্ত তাহার অত্যন্ত চপল! কে জানে ইহার মধ্যে আবার যদি তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে? যদি সে আবার সেখানে ফিরিয়া গিয়া থাকে! জাক চিন্তিত হইয়া পড়িল।

গৃহে পৌঁছিয়া আপনার কক্ষের দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইতেই জাক স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহার সেই ছোট আঁস্তাকুড়, এ কি পরিপাটী সজ্জায় সুন্দর শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে!

বেলিসেয়ারের মোট-ঘাট সরাইয়া ফেলা হইয়াছে! একধারে শুভ্র কোমল শয্যা। মধ্যে ছোট একটি টেবিলে সুদৃশ্য ফুলদানি, তাহাতে নানা ফুল-পল্লবে রচিত সুবৃহৎ তোড়া! আর এক কোণে, বড় টেবিলে কাচের প্লেট-গ্লাস প্রভৃতি সজ্জিত! ঘরের কোণে সুদৃশ্য হোয়াট্‌নটে উৎকৃষ্ট মদের বোতল ও বিবিধ আসবাব। ইদার বেশটিও দিব্য পরিচ্ছন্ন।

জাককে দেখিয়া ইদা কহিল, "কি জাক, ঘর কেমন সাজানো হয়েছে?"

"চমৎকার হয়েছে, মা!"

"বেল আমায় খুব সাহায্য করেছে অবশ্য—আমাদের বেলিসেয়ার। খাসা লোক, বেল।" জাকের আনন্দ হইল। বেলিসেয়ার মাতার এতটা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নামের সাদর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অবধি বাহির হইয়া গিয়াছে!

ইদা কহিল, "আমি রাত্রে ওদের নিমন্ত্রণ করেছি। বেল আর মাদাম ওয়েবার দুজনেই এখানে খাবে।"

"কিন্তু এত ডিস পাবে কোথায়, মা?"

"তার জন্যে ভেবো না জাক, কতকগুলো কিনে এনেছি, আর কিছু লেভ্যান্দ্রদের কাছ থেকে ধার পাব!"

লেভ্যান্দ্র জাকের প্রতিবেশী। ইদা আসিয়া ইতি-মধ্যেই তাহার সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছে!

"তা ছাড়া আরও শোন, জাক। খাবার-দাবারও চমৎকার হয়েছে। কেক-টেকগুলো প্লা দি লা বোঁ থেকে এনেছি। সেখানে দরে সাত পেনি সস্তা পেয়েছি।

অনেক দূরে দোকান, কাজেই আসবার সময় গাড়ী ভাড়া করতে হয়েছিল, আমাকে! আঠারো পেনি ভাড়া।"

জাক হাসিল। ইদার যোগ্য কাজই বটে! সাত পেনি দাম বাঁচাইবার জন্য আঠারো পেনি গাড়ীভাড়া! তবে জিনিষ-পত্র যাহা আনা হইয়াছে, সমস্তই উৎকৃষ্ট। রোলগুলা ভিয়েনা বেকারির, কফি ও অন্যান্য জিনিবও প্যালে রোয়াইয়াল্ হইতে আমদানি!

জাক কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ইদা তাহা লক্ষ্য করিল।

ইদা কহিল, "বড্ড খরচ করে ফেলেছি, না, জাক?"

"না, না। কে বললে, মা?"

"তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু কি করব বল, জাক? কিছুই ত ব্যবস্থা ছিল না। এত কষ্ট করে তুমি থাক্‌বে, মা হয়ে কোন্ প্রাণে আমি তা দেখি, বল। যাহোক, ভবিষ্যতে সাবধান হব। এত খরচ আর হবে না।"

পরে সুদীর্ঘ একখানা খাতা টানিয়া ইদা কহিল, "একটা খরচের খাতাও কিনে আনলুম। খরচ-পত্তরের হিসেব না রাখলে সব বড় এলোমেলো হয়ে পড়ে। নয় কি? হিসেবটা রাখা ভারী দরকার। লেভেকের দোকান থেকে খাতা আনলুম—এই পাশেই তার দোকান। ওর একটা লাইব্রেরী আছে—তাতেও কিছু চাঁদা দিয়েছি—বইটা-কাগজটা পড়তে পাব। মাসিক সাহিত্যের সংগ্রহটা আমি রাখতে চাই—না হলে চলে কখনও? টেঁকা যাবে কেন? তুমিও একটু আধটু পড়ো।"

এমন সময় বেলিসেয়ারের আগমনে মাতা-পুত্রের হিসাব-নিকাশে বাধা পড়িল। বেলিসেয়ারের পশ্চাতে পুত্র-ক্রোড়ে মাদাম ওয়েবারও আসিয়া উপস্থিত হইল। ইদা তখন অকুণ্ঠিতভাবেই আদেশ-অনুরোধ করিয়া তাহাদের দ্বারা গৃহ-সজ্জার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলি সারিয়া লইল।

এই দ্বিধাহীন তৎপরতায় ইদার রীতিমতই অভ্যাস ছিল, কাজেই তাহার এতটুকু অপ্রতিভ হইবার কারণ ছিল না—জাক কিন্তু মার ব্যবহারে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার যেরূপ সন্তোষের সহিত ইদার ছোটখাট আদেশগুলি পালন করিতেছিল, তাহাতে অবশ্য জাকের সঙ্কোচ কাটিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

তাহার পর যথাসময়ে টেবিলে কাপড় বিছানো হইল। প্লেট-কাঁটার সংমিশ্রণে, আহার্য্যের সুবাসে ও টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট নর-নারী-চতুষ্টয়ের আনন্দ-কলরবে একটা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার জীবনে কখনও এমন সুখাদ্যে রসনা তৃপ্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। মাতার পার্শ্বে ভোজনে বসিয়া শৈশবের ক্ষীণ স্মৃতি জাকের মনটিকে আজ উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। এ অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্বাদ পাইয়া অতীত বহু দুর্দ্দিনের কথা বেচারা ভুলিয়া গেল। এ কি উজ্জ্বল শুভ মুহূর্ত্ত জাকের মলিন জীবনটাকে ক্ষণপ্রভার বিপুল দীপ্তিতে আজ ভরাইয়া দিয়াছে! হে শুভ, হে উজ্জ্বল, অভাগা জাককে আর তুমি ত্যাগ করিয়ো না। জাকের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কগুলা এমনই মধুর আলোকরশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল রাখিয়া যবনিকা নিক্ষেপ করিয়ো—আর দুঃখ নয়, ভাবনা নয়, দ্বন্দ্ব নয়!

আহারাদির পর বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার বিদায় গ্রহণ করিলে ইদা শয্যা রচনা করিল। জাক কহিল, "তুমি শোও, মা।"

"আর তুমি?"

"আমি পড়ব।"

ভোজন-টেবিলের উপর বাতি খাড়া করিয়া জাক বহির গোছা নামাইল। ইদা কৌতূহল-চিত্তে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এ সব কি বই, জাক? কি হবে পড়ে?"

"আমি ডাক্তারী পড়ছি, মা। ডাক্তার হব, তখন সব দুর্দ্দশা ঘুচে যাবে—আর লোহা পিটে বেড়াতে হবে না।"

তখন সেই বাতির অনুজ্জ্বল আলোকে বসিয়া জাক মাতার নিকট আপনার সঙ্কল্প বিবৃত করিল—আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ সুন্দর ভবিষ্যতের পরিচয় দিল। জীবনে তাহার লক্ষ্য মিলিয়াছে—সেই চরম লক্ষ্যের অভিমুখে অবিচলিত চিত্তে সে আপনার জীবনতরীখানি এখন বাহিয়া চলিয়াছে! কোন বাধাই বাধা বলিয়া আর সে মানিবে না। বিপদের কোন তরঙ্গ তাহাকে ভীত, চ্যুত করিতে পারিবে না! সেসিল তাহার জীবনের লক্ষ্য, কাম্য! সেসিল তাহার ধ্রুবতারা! সেই সেসিল যেদিন সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন তাহার সকল কষ্ট সকল শ্রম চরম সার্থকতা লাভ করিবে!

এ কথা এতদিন সে মার কাছে প্রকাশ করে নাই। যদি মা সে কথা আর্জান্তঁর কাছে বলিয়া ফেলে! আর্জান্তঁর দল যে সেসিলের প্রেম লইয়া বিদ্রূপ-কৌতুকে মাতিয়া উঠিবে, এ কথা মনে করিতেও তাহার মাথায় রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিত। জানিলে বর্ব্বরের দল এ সুখে বাধা না দিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিবে না! এই কয়টা বর্ব্বরে মিলিয়াইত তাহার জীবনটাকে এই বিপথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আজ যখন সুযোগ পাইয়া সে পথ হইতে ফিরিয়া রূপ পথ সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তখন এ পথ হইতে আর সে হঠিবে না—সহস্র মুগ্ধ প্রলোভনেও নহে!

তাহার পর গদ্গদ ভাষায় জাক আপনার প্রেমের

কাহিনী বলিয়া চলিল। ইদা শুধু থাকিয়া থাকিয়া রীতিমত সাহিত্যিক ধরণে, "বাঃ, চমৎকার ত! ঠিক যেন সেই গল্পের নায়ক-নায়িকার মতই। বাঃ!" বলিয়া টিপ্পনী দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে জ্যাকের কাহিনীর মুক্ত প্রবাহ বাধা মানিল না। বিপুল উচ্ছ্বাসে বাঁধ-মুক্ত তটিনীর মতই সে আপনার কাহিনী বলিয়া চলিল। যখন তাহার কাহিনী শেষ হইল, তখন ইদা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সত্যি জ্যাক—এ নিয়ে বেশ একখানা নভেল লেখা যায়। ঘটনা-গুলো খাসা জমে এয়েচে ত।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইদার দুঃখ

মাতা-পুত্রে মিলিয়া একদিন এতিয়োল-ভ্রমণে আসিল। মনে আনন্দ হইলেও, একটা দুশ্চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে জ্যাকের মর্ম্মে বিঁধিতেছিল। মাকে যে সম্পূর্ণ আপনার আয়ত্তে ফিরিয়া পাইয়াছে, ইহাতে মাঝে মাঝে অন্তরে গর্ব্বও সে অনুভব করিত, কিন্তু মাতার প্রকৃতির সহিত তাহার যেটুকু পরিচয় ছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল, মাকে সেসিলের সহিত মিশিতে দিলে বিপদেরও আশঙ্কা আছে। মা হইলে কি হয়, এমন চটুলভাষিণী প্রগল্‌ভা নারী জ্যাক জীবনে দুইটি দেখে নাই। কোন্ কথাটা বলিলে কি ফল হয়, কোন্ কথার কি মূল্য, ইদা তাহার কিছুই বুঝিত না।

জ্যাকের ভাবনা হইল, এই প্রগল্‌ভতায় মাতার সম্বন্ধে সেসিল কি ধারণা করিবে! হয়ত ইদার প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞায় সেসিলের প্রাণ ভরিয়া উঠিবে! তাহার উন্মুখ চিত্তে সহসা দারুণ বাধা পাইয়া হয়ত ভবিষ্যতের সুখের আশায় সে একান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িবে! তখন জ্যাক কি লইয়া মাতার গর্ব্ব করিবে? মাতার নামের উল্লেখেই যে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু উপায় নাই! মাকে সেসিলের সহিত মিশিতে দিতেই হইবে। সে স্থির করিল, যখনই সে মাকে উদ্দাম গল্পে উদ্যত দেখিবে, তখন যেমন করিয়াই হউক সেই উদ্দাম গল্পের স্রোতে সে বাধা দিবে!

সেসিলের সহিত প্রথম আলাপে মা তাহাকে কন্যা সম্বোধন করিল দেখিয়া জ্যাক কতকটা আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাহার কথার মধ্য দিয়া বিলাস-কৌতুক-প্লাবিত সমাজের সুরই ধ্বনিয়া উঠিতেছিল, তাহা যে শুধু আড়ম্বর-প্রিয় সর্ব্ব-সারল্যবর্জ্জিত মজলিস-সভার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, জ্যাকের কাছে তাহা ধরা পড়িতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিল না।

ইদা যে সকল গল্প বলিত, সেগুলা অত্যন্ত চমকপ্রদ, কাজেই শ্রোতার চিত্ত বিপুল কৌতূহলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ভোজের টেবিলে কথায় কথায় পিরেনিসের প্রসঙ্গ উঠিলে ইদা বলিল, আহা, পিরেনিস! পাহাড়ের গা বহিয়া গলিত তুষারের ধারা ছুটিয়াছে! কি সুন্দর সে স্থান! পনের বৎসর পূর্ব্বে সে পিরেনিস ভ্রমণে গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল, স্পেনের একজন ডিউক। লোকটার পয়সা অগাধ থাকিলে কি হইবে—মস্তিষ্কের বিকার ছিল; উন্মাদ বলিলেও চলে। চার ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিয়াছিল। সে কি আমোদ! গাড়ীতে অসংখ্য শ্যাম্পেনের বোতল ছিল। বোতল যটা নিঃশেষ করিয়া ডিউক ত ক্ষেপিয়া যাইবার মত হইল! পরে কাণ্ড যাহা ঘটিল—ইত্যাদি।

সেসিল সমুদ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ইদা বলিল, "সমুদ্র! ঠিক বলেছ মা—কিন্তু ঝড়ের সময় সমুদ্রের মূর্ত্তি যে কি দাঁড়ায়, তা ত জান না। আমি জানি। পামার কিছু দূরে অগাধ সমুদ্রে তখন আমাদের জাহাজ ছুটেছে। হঠাৎ ঝড় এল। কি সে ঝড়—ভয় হল, বুঝি বা সব যায়, প্রলয় উপস্থিত। কোন মতে একটা কেবিনে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলুম। কাপ্তেন এসে আমার সেবায় লেগে গেল। যেমন মেঘের ডাক, তেমনি বিদ্যুতের চমক! জাহাজে ছিল কোথাকার,—বুঝি পিনাঙ্গের—রাজা। রাজা নিজে আমার মুখে ব্রাণ্ডির পর ব্রাণ্ডি ঢেলে যত মূর্চ্ছা ভাঙ্গায়, ততই আবার ঘন ঘন মূর্চ্ছা! ওঃ, কি করে যে রাত কাটল, তা কিছুই জানতে পারলুম না।"

এই সকল অসম্বদ্ধ গল্পগুলার সূত্র জ্যাক অন্য নানাবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া মাঝামাঝি কাটিয়া দিতেছিল। তথাপি সেই সকল গল্পের খণ্ডিত অংশগুলা দ্বিখণ্ডিত সর্পদেহের মতই নাচিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। খণ্ড হইলেও তাহার প্রত্যেকটা যেন জীবন্ত, পরিপূর্ণ! সেসিল নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতেছিল। জ্যাকের আকস্মিক বাধা-দান লক্ষ্য করিলেও তাহার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

অপরাহ্ণে বই খুলিয়া জ্যাক ডাক্তার রিভালের সম্মুখে পড়িতে বসিলে সেসিল ইদাকে কহিল, "এস মা, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।" সহর্ষ সম্মতি দান করিয়া ইদা সেসিলের অনুসরণ করিল। জ্যাক চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পাঠ-রত মনও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এখনই মা না জানি কি অসম্বদ্ধ গল্প জুড়িয়া দিবে—মার তারল্য এখনই সেসিলের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি বহি বন্ধ করিয়া সে ডাক্তারকে কহিল, "পড়াটায় আজ কেমন মন লাগছে না—একটু বেড়ানো যাক্, দাদা!"

ডাক্তার কহিলেন, "বেশ!"

জাক বাহির হইল। আসিয়া সেসিলের একখানা হাত সে আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। মধুর স্পর্শ! এ স্পর্শে যেন কি যাদু আছে! জাকের সকল দুঃখ—সকল অবসাদ এ স্পর্শে নিমিষে কোথায় ঝরিয়া যায়! পাল তুলিয়া দিলে অনুকূল বায়ুর মুখে বোঝাই নৌকাও যেমন নদীর খর বেগ কাটিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, সেসিলের স্পর্শে তাহারও ভাবগ্রস্ত চিত্ত তেমনি সকল বাধা-বিপত্তি, দুশ্চিন্তা-অনিশ্চিততার বেগ কাটিয়া সমুজ্জ্বল সিদ্ধি-ভবনের অভিমুখে ক্ষিপ্র ছুটিয়া চলে। আশার উন্মাদনায় প্রাণ ভরিয়া উঠে—কানের কাছে কে যেন মুহুর্মুহু আশ্বাস দেয়, ভয় নাই, ভয় নাই! সমস্ত দুঃখ-যাতনা নির্ভয়ে দলিয়া যাও। কঠিন সিদ্ধি মধুর বাঁধনে ধরা দিবে রে, ধরা দিবে!

আজ মা উপস্থিত ছিল বলিয়া জাকের আনন্দ কেমন বাধা পাইতেছিল। জাক ও সেসিলকে লক্ষ্য করিয়া ইদা ডাক্তারকে বলিল, "দুটিতে যেন ঠিক সেই পরীর গল্পের নায়ক-নায়িকা!" কথাটা জাকের কানেও পৌঁছিয়াছিল—ডাক্তারের মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিল, কথাটা তাঁহার বড় রুচিকর ঠেকে নাই! তথাপি কোলাহলহীন নির্জ্জন বনে সেসিলের সাহচর্য্যে জাক একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বনে কোথাও নানা বর্ণের অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহারই দলে মৌমাছি ও প্রজাপতির বিচিত্র সভা বসিয়াছে! কোথাও ওকের শাখায় বসিয়া একটা পাখী সুরের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়াছে। চারিধারেই আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন! তাহার মধ্যে এই সকল শোভা, সকল বর্ণ, সকল সুরের বাণী সেসিল তাহার পার্শ্বে! আলোকের এমন বিপুল সমারোহের মধ্যে অন্ধকার কোথায় রহিবে! কাজেই জাকের চিত্তাকাশ আজ মুক্ত, নির্ম্মল, উজ্জ্বল!

বেড়াইতে বেড়াইতে চারিজনে আর্শার কুটীরে আসিল। অভ্যর্থনা করিয়া আর্শা সকলকে বসাইল। পুরাতন মনিব ইদাকে আতিথ্যে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে সে সাধ্যমত আয়োজন করিল। ইদা কিন্তু নাসা কুঞ্চিত করিয়া তাহার এক টুকরা স্পর্শ করিল মাত্র —দেখিয়া জাক ঈষৎ বিমর্ষ হইল। তাহার পর সকলে 'আরাম-কুঞ্জ' দেখিবার জন্য উঠিল।

কুঞ্জ-গৃহের চূড়াটি বৃক্ষলতায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহের আপাদ-মস্তক আইভি লতায় ছাইয়া ফেলিয়াছে! -চাবুক্, এখন এখানে ছিল না, দ্বার-জানালা সমস্তই বন্ধ! ফটকের সম্মুখস্থ সরু পথটি বহুকাল মানুষ্য-চরণ-স্পর্শ-লাভে বঞ্চিত থাকায় আগা-ছায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ইদা গৃহের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। পুরাতন সহস্র স্মৃতি তাহার চিত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চারিদিককার এই মূক প্রস্তরখণ্ডগুলা যেন সহসা মুখর হইয়া উঠিয়া তাহার কর্ণে কত কথা কহিয়া গেল। চারিধারে অজস্র ক্লিমেটিসের গাছ—নক্ষত্রের মত সহস্র শাদা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ক্লিমেটিসের একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া লইয়া ইদা তাহা নাসিকায় ধরিল, পরে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জাক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, মা?"

"কিছু না, জাক! মনের একটা খেয়াল, এ শুধু! আর কিছু নয়—ওঃ, আমার জীবনের অনেকগুলো দিন এখানে ঘুমিয়ে পড়ে আছে!"

সত্যই চতুর্দ্দিকে সুপ্তির একটা সুনিবিড় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। দ্বার-পার্শ্বে ফলকে লাটিনে লিখিত আরাম-কুঞ্জের অক্ষরগুলা লতা-পাতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নিস্তব্ধ গৃহটিকে উচ্চ স্তম্ভ-শোভিত কবরের মতই স্তব্ধ-গম্ভীর মনে হইতেছিল। ইদা ধীরে ধীরে রুমালে চোখ মুছিল। তাহার সকল সুখের সীমায় সে-দিনকার মত কে যেন পরদা ঢাকিয়া দিল। অতীতের চিন্তায় মন একান্ত ভাবগ্রস্ত বোধ হইল—বুকের উপর কে যেন পাষাণ চাপিয়া ধরিল। সেসিল শুনিয়াছিল, দুর্ব্যবহারে ইদা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কাজেই সে এই বিমর্ষতা দূর করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিল—জাক মাতার সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধরিল; তথাপি সকলই বৃথা হইল।

অগত্যা সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল। পথে ইদা জনান্তিকে সেসিলকে কহিল, "দেখ মা, এবার থেকে যখন তোমরা এখানে আসবে, আমায় আর সঙ্গে নিয়ো না। আমার মন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। তোমাদেরও আমোদের ব্যাঘাত হয়।" ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

ইতর পশুর মত তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পঙ্কে সবলে যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখনও সে পাপিষ্ঠকে ইদা তবে ভুলিতে পারে নাই, ভালবাসে! হা রে দুর্ব্বল-হৃদয়া নারী!

ইহার পর অনেকগুলি রবিবার আসিল, গেল—ইদা আর এতিয়োলের পথে পদার্পণ করিল না। কাজেই জাক ছুটির অবসরগুলা ভাগ করিয়া লইল; অর্দ্ধেক অবসর সে সেসিলের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইত এবং সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলা বনে প্রান্তরে ভ্রমণে কাটাইবার পরিবর্ত্তে পারি ফিরিবার পথে ট্রেণেই তাহায় অতিবাহিত হইত! সারাদিনের আনন্দ-প্রমোদের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া ট্রেণের শূন্য কক্ষে সে দেহভার এলাইয়া দিত ---পথিপার্শ্বস্থ কুটীর-বাসী নর-নারী বা পান্থজনের আনন্দ-কলরবের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু তাহার

কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত—চারিধারেই হর্ষের তরল স্রোত ছুটিয়াছে—সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সে এতিয়োল ছাড়িয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিত। আসিয়া সে প্রায়ই দেখিত, মা ঘরে নাই, হয় লেভ্যান্দ্রের কুটীরে, নয় লেভেকের লাইব্রেরীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

এত অবজ্ঞা-লাঞ্ছনাতেও ইদার মনে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্থান, কাল বা পাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনা এই নারী একটা তুচ্ছ ইঙ্গিতে আপনার হৃদয়ের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিত—এবং বিদ্রূপ বা গ্লানির আশঙ্কা কিছুমাত্র না রাখিয়া ধন-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর বর্ণনায় ও চটুল আলাপে আসর মাতাইয়া তুলিত। লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না—লোকের ছিন্ন বস্ত্রাদিতে তালি দিয়া রিপু করিয়া তাহার দিন-গুজরাণ হইত, সে বেচারী যৎকিঞ্চিৎ-প্রাপ্তির আশায় একান্ত ধৈর্য্যে আগ্রহের ভাণ করিয়া ইদার কাহিনী শুনিত। এমনভাবে মন জোগাইয়া চলিলে যদি কোন দিন ইদা অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনিয়া দেয়। কিন্তু সত্বরই সে বুঝিল, ধন-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর মুখের বাণীতে যত সহজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, হাত হইতে তেমনভাবে কখনই বাহির হয় না! মুখ এতখানি বকিলে কি লাভ, হাত যে অত্যন্ত কৃপণ! যখের মত সর্ব্বদা সে চাপিয়া আঁটিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে ভুলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি জাকের গৃহে লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর ভোজের নিমন্ত্রণটা মধ্যে মধ্যে বাদ পড়িত না, সেইটাই ছিল তাহার পক্ষে পরম লাভ! তাই তাহার ধৈর্য্য উৎপীড়িত হইলেও উদ্বাস্ত হইবার সে কোনই লক্ষণ দেখাইল না। এমন নিমন্ত্রণ না পাইলেও লেভেক কিন্তু মন্দ গুছাইয়া লয় নাই। ইদার মত উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ-পরিহিতা নারী যে তাহার লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিয়া গৃহ ও গৃহস্বামিনীটিকে কৃতার্থ করিতেছে, ইহাতে পল্লীর পাঠক-পাঠিকামহলে লাইব্রেরীর প্রতি সম্ভ্রম বাড়িয়া গিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে ছিন্ন মলিন গ্রন্থ ও পুরাতন সুলভ সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র জীর্ণ গৃহ আপনার আর্থিক অবস্থাও কতক ফিরাইয়া লইয়াছিল।

এই সঙ্গ হইতে মাতাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জাকের সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া জাক প্রত্যহই প্রায় দেখিত, জানালার পার্শ্বে ইদা একখানা বহি লইয়া বসিয়া গিয়াছে। সে বহি উত্তেজক ঘটনাপূর্ণ কোন ডিটেক্‌টিভের কাহিনী, নয়, প্রেমের বর্ণনা-বহুল কোন অপাঠ্য উপন্যাস! বহির পৃষ্ঠায় মলিন হস্তের সহস্র ছাপ—কোনখানে বা মাখনের দাগ—পেন্সিলের ঘন রেখায় বহুস্থল কণ্টকিত—পার্শ্বে বিচিত্র ছাঁদের অক্ষরে নানাবিধ মন্তব্য। ইতিপূর্ব্বে যে গ্রন্থখানি বহু অলস কারিকর ও নারীর হস্তে ফিরিয়াছে, তাহারই সহস্র নিদর্শন বহিখানির সারা অবয়বে সুস্পষ্ট সূচিত রহিয়াছে!

একদিন সে মাকে বহির পৃষ্ঠায় একান্ত নিবিষ্ট-চিত্তা দেখিয়া ললাটের উপর পতিত আপনার কেশের রাশি সরাইয়া মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার উপর পল্লীর নির্ম্মল আকাশে গোধূলির স্বর্ণরশ্মিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—শান্ত মৃদু বায়ু লতায়-পাতায় দোল দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—এমন সময় ইদা অলসভাবে কতকগুলা কদর্য্য রচনা পড়িয়া সময় কাটাইতেছে! বাহিরের পানে চাহিলে চিত্ত জুড়াইয়া যায়, মনে শান্তি আসে—বিধাতার কি বিরাট বিচিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা সম্মুখে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে—বিবিধ রসে পরিপূর্ণ। সে গ্রন্থ অবহেলা করিয়া অন্ধকূপবাসী কোন্ অক্ষম লেখকের মসী-জর্জ্জর কদর্য্য রচনার রসাস্বাদ ইদা গ্রহণ করিতেছে!

জাক একবার ইদার পানে চাহিল। ইদা তখন বই বন্ধ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল! দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে—বহির পৃষ্ঠার অক্ষর ভাল লক্ষ্যও হয় না। ইদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে কি ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল সে! কবি কোথায়? কি করিতেছে? আশ্চর্য্য—তিন মাস দেখা নাই, তবু একখানা চিঠিও কি তাহার লিখিতে নাই? ইদা সেই কথাই ভাবিতেছিল! সহসা বহিখানা তাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল! ইদার চমক ভাঙ্গিল—বহিখানা কুড়াইয়া লইয়া সে দেখিল, ওধারে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, জাক! জাক ইদার পানে চাহিয়া ছিল। তাহার চোখ দুইটা যেন বাঘের চোখের মতই জ্বলিতেছিল! এ কি ঈর্ষা—? না, অভিমান? না, আর-কিছু?

ইদা কহিল, "আমার শরীরটা আজ ভাল ঠেকছে না, জাক। তোমার জন্য রান্নাবান্নাও হয়ে ওঠেনি। কি করি—তাই ত!"

জাক নিমেষে বুঝিল, এ পীড়া কোথায়! শরীরে নহে, এ পীড়া মনে! যে কীট ইদার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে তবে মরে নাই—দিনে দিনে বেশ সে বাড়িয়া উঠিতেছে! দেহ-মন সে বিষে জর্জ্জরিত হইলেও ইদার আজ মুক্তি নাই! করুণ সমবেদনায় জাকের প্রাণ ভরিয়া উঠিল! অভাগিনী, অভাগিনী ইদা!

জাক বলিল, "কেন মা, তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না, আমার কাছে? কি কষ্ট হচ্ছে, বল!"

"না জাক, এ কিছু নয়—শুধু একটু মাথা ধরেছে। তুমি ভেবো না! তোমাকে বুকে করে রয়েছি, আর আমার কিসের দুঃখ থাকতে পারে, জাক?"

ইদা উঠিয়া জাককে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল—

তাহার শিরে চুম্বন করিয়া কহিল, "তুমি ভেবো না, জাক, এ কিছু নয়!"

"তবে চল মা, বাহিরে কোথাও বেড়িয়ে আসিগে!"

ইচ্ছা না থাকিলেও আপত্তি করিতে ইদার সাহস হইল না। তখন মাতা পুত্রে হোটেলের অভিমুখে চলিল। জন-বহুল পথ। ভিড় ঠেলিয়া উভয়ে চলিল। পথে কেহ কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার জন্ম উভয়ের অন্তরই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু কি কথা প্রথমে কহা যায়? বহু বর্ষের বিচ্ছেদ মাতা-পুত্রের মধ্যে সত্যই একটা সুগভীর ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। উভয়ের জীবন-গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে গিয়াছিল। একদিকে আনন্দ, বিলাস, প্রমোদ, অপর দিকে কাজ, কাজ, কাজ—তাহাও যত অভদ্র নীচ সঙ্গীর দলে মিশিয়া! জাক কয়দিনে এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মার মনে পূর্ব্বেকার মত অসঙ্কোচ স্থান-লাভের আশা তাহার পক্ষে এখন দুরাশামাত্র! ইদা এখন তাহার শত্রু আর্জান্তঁর ভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তাহার জীবনের রাহু, তাহার সুখের কণ্টক আর্জান্তঁ ইদাকে আপনার ছায়ায় এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, কোন নিপুণ ভাস্করও বুঝি কোমল মৃত্তিকার সাহায্যে এমন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না! দাম্ভিক কবির যত মিথ্যা দর্প ও দম্ভ আজ ইদার মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে! ইদা এখানে যেন আর্জান্তঁরই একটা প্রতিবিম্ব-মাত্র!

একদিন সন্ধ্যায় ইদাকে লইয়া জাক ভ্রমণে বাহির হইল। সুমোর পর্ব্বতের নিম্নেই বিস্তীর্ণ কানন-প্রান্তর,—কুঞ্জ, ক্রীড়া-পর্ব্বত, সেতু, বাদ্য-বেদী প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানে তাহা সুসজ্জিত! কাননের সীমা বেড়িয়া সুদীর্ঘ দেবদারু শ্রেণী চলিয়াছে! কানন দেখিয়া ইদার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। বাদ্য-বেদীতে সঙ্গীর দল নানা রাগিণীর সাহায্যে ঐক্যতান জাগাইয়া তুলিয়াছে। দেবদারুর শির রক্তচ্ছটায় রাঙাইয়া তুলিয়া সূর্য্য এই কিছুক্ষণ অস্ত গিয়াছে—আকাশের গায় লাল আভাটুকু তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। একটা বেঞ্চে বসিয়া ইদা ও জাক ঐক্যতান সঙ্গীত শুনিতেছিল। সহসা কাহাকে দেখিয়া জাক উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে ম্যাসিয়ো রুদিক!

সত্যই রুদিক! দেহ বাঁকিয়া গিয়াছে, বার্দ্ধক্য ঘনাইয়া আসিয়াছে! রুদিকের পার্শ্বে তাহারই হাত ধরিয়া এক বালিকা এবং পশ্চাতে একটি বালক! বালিকার মুখে কে যেন জেনেদের মুখখানি অবিকল বসাইয়া দিয়াছে! সহসা তাহাকে দেখিলে মনে হয়, জেনেদই যেন আবার বালিকা-মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কথা কহিবার জন্ম যেমন জাক অগ্রসর হইবে, অমনিই তাহার দৃষ্টি জেনেদের প্রতি পতিত হইল। জেনেদ ও মাঁজ্যাঁ পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া রুদিকের পশ্চাতে আসিতেছিল। রুদিকের কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না—জেনেদ্ নিমেষে জাককে চিনিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে মৃদু ইঙ্গিত করিল। জাক আসিলে জেনেদ্ কহিল, "একসঙ্গে একটু বেড়ানো যাক্, এস। অনেক কথা আছে—বলব। বাবাকে একটু এগিয়ে যেতে দাও। উনি কে?"

"আমার মা।" বলিয়া জাক মাতার সহিত জেনেদের পরিচয় করাইয়া দিল।

মাঁজ্যাঁ ইদাকে কহিল, "এরা দুজনে পুরানো বন্ধু; নিজেদের সব কথা কবে। আমি আপনার সঙ্গে বেড়াই আসুন।" মাঁজ্যাঁ ও ইদা একত্রে চলিল! জাক ও জেনেদ গতি মৃদুতর করিয়া পিছাইয়া পড়িল।

জাক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহিত জীবনে জেনেদ অভীষ্ট সুখের অধিকারিণী হইয়াছে কি না। উত্তরে জেনেদ কহিল, এত সুখ যে পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই ছিল না। তাহার স্বামীর মত স্বামী আর কাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে! যেমন গভীর প্রেম, তেমনই অসীম উদার তাঁহার হৃদয়। জেনেদ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে—এ স্থানের বিনিময়ে সে আজ স্বর্গকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে! মাঁজ্যাঁ তাহার সেবায় সুখী—সে নিজে বলিয়াছে, জেনেদের এত গুণ আছে পূর্ব্বে জানিলে তুচ্ছ যৌতুকের জন্ম মাঁজ্যাঁ এতটকুও লোভ করিত না—বিনা যৌতুকেই তাহাকে আপনার বুকে সে তুলিয়া লইত। এ স্বামীর ভালবাসায় জেনেদের আজ কোন দুঃখ নাই—কোন অভাব নাই। তাহার দুই সন্তান—একটি পুত্র, একটি কন্যা! দুইটিই রত্ন!

জেনেদের সুখের কথা শুনিয়া জাকের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল! দাম্পত্য জীবনের সুখ কি, তাহা ইহারা যেমন বুঝিয়াছে, এমন যদি সকলে বুঝিত!

জাক কহিল, "আর সব খবর কি? মাদাম ক্লাবিস্—"

জেনেদ কহিল, "মারা গেছেন, আজ দু বছর হল—লয়ার নদীতে ডুবে মারা গেছেন! ভারী বিপদের কথা সে।"

"ডুবে! সে কি?"

"আমরা মুখে বলি, ডুবে গেছেন, অবশ্য সে শুধু বাবাকে ভোলাবার জন্য—আর উনিও তাই জানেন। কিন্তু আসলে তা নয়! তিনি আত্মহত্যা করেছেন! নান্তের সঙ্গে দেখা বন্ধ হয়ে গেল—কাজেই—! যাক্—তাঁর মত অদৃষ্ট যেন কারও না হয়! এ যে কি বদ্ নেশা, লোকে একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি মান-সম্ভ্রম সব হারিয়ে ফেলে!"

নেশাই বটে! কথাটা জাকের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল! কিন্তু জেনেদ তাহা লক্ষ্য করিল না

জেনেদ বলিতে লাগিল, "আমরা ভেবেছিলুম, এ শোকের পর বাবাকে আর বাঁচাতে পারব না। আসল কাণ্ড যে কি, তা উনি এখনও জানেন না। তার পর ইনিও পারিতে বদলি হলেন, বাবা একলাটি কার কাছে থাকেন, তাই ওঁকে এখানে নিয়ে এলুম! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে গল্প-সল্প করে তবু যাহোক শোক একটু ভুলে আছেন! শরীর কি হয়ে গেছে, দেখছ ত! আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বড় একটা কন্ না। তুমি কাল এস, জাক—তোমায় দেখলে হয়ত একটু ভাল থাকতে পারেন। তোমাকে ভালও বাসেন, প্রায়ই তোমার কথা বলেন। চল, এখন ওঁর কাছে যাই, বেশীক্ষণ আবার দেখতে না পেলে ভাববেন, বুঝি আমরা ওঁরই কথা কচ্ছিলুম।"

ইদা মাঁর্জ্যার সহিত রীতিমত উৎসাহে গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। সে বলিতেছিল, "চমৎকার লোক! যেমন কথায় বার্ত্তায়, তেমনি আমোদে! প্রতিভাবান পুরুষ বটে!" জাক ও জেনেদ্ আসিয়া পড়ায় সে কথা বন্ধ হইল। আকস্মিক রসভঙ্গে ইদা ঈষৎ বিরক্তি বোধ করিল। ইদার কথার শেষ অংশটুকু জাকের কানে গিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তে বুঝিল, মাঁর্জ্যার সহিত ইদার আর্জাস্তঁর সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল। ধিক্, নির্লজ্জা নারী!

সত্যই আর্জাস্তঁর কথা হইতেছিল।

মাঁর্জ্যা ইদার নিকট হইতে তাহার স্বামীর সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিল—এবং ইদাও উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল! কবির প্রতিভা, অপরের নীচ হিংসা ও বিদ্বেষের সহিত তাঁহার অক্লান্ত সংগ্রাম, সাহিত্য-জগতের কত উচ্চে তাঁহার আসন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে নাটক, উপন্যাসের কি বিচিত্র আখ্যান গুমরিয়া মরিতেছে, সে সমস্ত কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ইদা এতটুকু ত্রুটি রাখে নাই। কোন বিষয়ে মনান্তর হওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাহারা স্বতন্ত্রভাবে বাস করিবে, সেই জন্য শুধু উভয়ে সাধ করিয়া এ বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। দীর্ঘ মিলনের অন্তরালে ক্ষুদ্র একটু বিরহ রচনা করিলে প্রেম গভীরতর হয়, এমন মন্তব্যও বাদ পড়ে নাই। এমন সময় জাক আসিয়া কাহিনীর কোন্ অসমাপ্ত ছত্রে ছেদ টানিয়া দিল।

জাক ভাবিল, ইহাদের সহিত মাতার যে আলাপ হইল, তাহাতে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। লেভ্যান্দ্র্-লেভেকের দল ছাড়িয়া এই সকল সরল আড়ম্বরহীন বান্ধবের সঙ্গ প্রকৃতই ঈপ্সিত। ধর্ম্মপরায়ণা জেনেদ, স্নেহার্দ্র-হৃদয় মাঁর্জ্যা—ইহাদের সঙ্গে মিশিলে ফিরিলে একটা স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সংস্পর্শে মাতার অন্তরের মলিনতাও ঘুচিতে পারে, ইহা ভাবিয়া জাক আনন্দ বোধ করিল। কিন্তু দুই-চারি দিন পরেই সে বুঝিল, এই ভ্রমণশীলা ধর্ম্মপরায়ণা জেনেদের সংসর্গ ইদার তেমন মনঃপূত নহে—পুত্রের কথায় ভঙ্গীতে যেমন একটা অসভ্য সমাজের গন্ধ পাওয়া যায়—জেনেদ প্রভৃতির সংসর্গেও ঠিক তেমনই দুর্গন্ধ ভাসিয়া উঠে। কেমন একটা অভদ্র ভাব!

জাকের গৃহেও সেই গন্ধ—চতুর্দ্দিকেই কেমন একটা কদর্য্যতা! এই সকল নীচ কারিকরদের দলে কোথাও এতটুকু শ্রী বা পারিপাট্য নাই! দারিদ্র্য তাহার নিরানন্দ মূর্ত্তি লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! তাহার জীর্ণ কঙ্কালগুলা চতুর্দ্দিকে খট্‌খট্ করিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে! পথে ঘাটে কোথাও পলাইয়া দুইদণ্ড হাঁফ ছাড়িবার উপায় নাই। সর্ব্বত্রই কুশ্রী বীভৎসতা,—আবর্জ্জনার স্তূপ। তথা হইতে অহর্নিশি একটা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে! দারিদ্র্যের এ দুর্গন্ধে ইদা আর তিষ্ঠাইতে পারে না! তাহার বুক যেন কে সবলে চাপিয়া ধরিতেছে। আর সহ্য হয় না! ইদার প্রাণ মুক্তির জন্য আজ কাতর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তি চাই! এ নিরানন্দময়তার মধ্য হইতে মুক্তি চাই। ইহার মধ্যে বাস করার চেয়ে আত্মহত্যাও লক্ষগুণে ভাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাহাকে?

একদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া জাক লক্ষ্য করিল, ইদার চিত্ত অত্যন্ত অধীর চঞ্চল, মুখে-চোখেও কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনকার সে ম্লান বিমর্ষ ভাব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! জাককে দেখিয়া ইদা ক্ষিপ্র স্বরে কহিল, "আর্জাস্তঁ আমায় চিঠি লিখেছে, জাক!" পরে সজোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া ইদা আবার কহিল, "সত্যই শেষে চিঠি লিখেছে! চারমাস কোন খবর-বার্ত্তা না পেয়ে আর চুপ করে সে থাকতে পারলে না—দেখলে, কৈ, আমি ত আকারে-ইঙ্গিতেও একটা সাড়া দিলুম না! সে পারবে কেন, থাকতে? আমি ত তাকে চিনি। আমার কাছে লুকোবে কি? কি লিখেছে, জান, জাক? লিখেছে, সে খুব খানিক বেড়িয়ে-চেড়িয়ে পারিতে ফিরেছে, আমার ইচ্ছা হলে আমি এখন তার ওখানে যেতে পারি!"

শঙ্কিত চিত্তে জাক প্রশ্ন করিল, "তুমি কি ঠিক করলে? যাবে?"

"যাব! আমি! তুমি যে কি বল, জাক! আমার এখানে কিসের দুঃখ? কিসের অভাব? কষ্ট বরং তারই! ভারী অবুঝ, সে,—আপন-ভোলা লোক! একটি কাজও নিজের করবার ক্ষমতা নেই—একলা

থাকতে পারবে কেন, সে? ভারী এলোমেলো লোক যে! কিন্তু একজন উঁচু দরের আর্টিষ্ট বটে!"

"তুমি তার চিঠির কি জবাব দেবে?"

"জবাব দেব! যে অসভ্য আমার গায় হাত তুলেছিল, তার চিঠির আবার জবাব দেব? তুমি তাহলে আমাকে আজও চেন নি! আমার একটা মান আছে, ইজ্জত আছে, তা খোয়াব? কখনও না! আমি তার চিঠির সবটা পড়িও নি—ঐ অবধি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছি—একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এমন মেয়ে আমি নই! তবে একবার বড় দেখতে সাধ হয়, কি রকম কাজ-কর্ম্ম চলছে তার, কেমন করে সে ঘর-গেরস্থালী করছে! বেশ বুঝছি, সব একেবারে জঘন্য একাকার করে তুলেছে! তবে—না, তাই বা কি করে হবে? আমি আর এ জীবনে সে জায়গা মাড়াচ্ছি না। এই ত সে এত ঘুরেছে, কি দেশটায় ভালো—" বলিতে বলিতে ইদা অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে আর্জাস্তঁর পত্র বাহির করিল! সেই পত্র, যে পত্র এইমাত্র সে বলিল, টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! চিঠি দেখিয়া ইদা কহিল, "এই যে, রয়াতে গেছল! দেখ একবার বুদ্ধিখানা! সেখানকার জল-হাওয়া সইবে কেন? যাই হোক, না—তার যা ইচ্ছা, তাই সে করুক—আমার অত মাথা-ব্যথায় কাজ কি!"

মাতাকে নির্লজ্জভাবে এই অকারণ মিথ্যা বলিতে দেখিয়া জাক লজ্জায় মরিয়া গেল। এ অসরলতা, এ ভাণ আচরণের কি প্রয়োজন ছিল?

এই কথাটাই সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া জাকের মনকে বিপন্ন পীড়িত করিয়া তুলিল। ইদা আজ আবার পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল হইয়াছে, গৃহের ছোটখাট কাজকর্ম্মগুলায় হাতও দিয়াছে। তাহার গতি, ভঙ্গীও আজ বেশ সহজ লঘু হইয়া উঠিয়াছে! জাক যখন বহির পৃষ্ঠা খুলিয়া মার কথা ভাবিতেছিল, পাঠে বিন্দুমাত্রও মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না, সহসা তখন ইদা আসিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "বেশ জাক—ধন্য তোমার সাহস, আর মন কিন্তু! পড়াশোনায় কি চাও।"

কিন্তু ইদানীং জাকের সে অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, একাগ্রতায় নিষ্ঠুর বাধা লাগিয়াছিল! এই সহজ প্রফুল্লতার মধ্য দিয়া ইদার সমগ্র অন্তরখানি আজ পরিষ্কার ধরা পড়িয়া গিয়াছে—জাকের চোখ আছে, সে তাহা লক্ষ্যও করিয়াছে!

জাক ভাবিল, এ চুম্বন কাহাকে? কেন? ইহার অর্থ কি! যে অতীত আপনার সমস্ত ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, সেই সমস্ত অতীত আজ আবার নিমেষে প্রবলভাবে সাড়া দিয়া উঠিল। পূর্ব্বপ্রেম আবার পরিপূর্ণ আবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—নারীর দুর্ব্বল হৃদয় আবার সে কুহকে ধরা দিয়াছে। গুণ গুণ করিয়া ইদা আর্জাস্তঁর রচিত একটা গানের ছত্র সুর করিয়া গাহিতেছিল,—

"নাচ রে নাচ, বনের লতা,
নাচ রে নাচ গাছের পাতা—"

জাক স্তম্ভিত হইল। এ কি নির্লজ্জতা! সে এখানে বসিয়া রহিয়াছে, ইদার তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই? এতটুকু সঙ্কোচও নাই? আশ্চর্য্য! জাকের চোখের কোণে জল আসিল। যে ভগ্ন তরীখানিকে অসীম বলে, অপূর্ব্ব কৌশলে সে তীরের দিকে টানিয়া আনিতেছিল, সহসা তাহা একটা দমকা বাতাসের ঘায় এমনই ভাবে, কূলের কাছে আসিয়াও ডুবিতে চলিয়াছে—আর রক্ষা নাই, উদ্ধার নাই! বিলাসের তুচ্ছ একটা উপকরণের মত, আজন্ম বিলাসীর মুহূর্ত্তের খেয়াল-নিবৃত্তির জন্যই ইদা জীবন-ভার বহিয়া বেড়াইবে? যতক্ষণ খেয়াল, ততক্ষণই আদর,—সে খেয়াল নিবৃত্ত হইলেই দূরে যাও! তবুও ইদা মন যোগাইয়া সেই বিলাসীরই পিছনে ফিরিবে? কোনদিনই কি তাহার জ্ঞান হইবে না? রঙিন ফানুসের মত সাজিয়া বেড়ানোতেই কি নারী-জন্মের চরম সার্থকতা?

আবার পরক্ষণেই জাকের মনে হইল, মূর্খ অবোধ হইলেও এই নারী, তাহার মা। মাকে শ্রদ্ধা করিয়া সম্মান করিয়া সে তাহারও অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মান জাগাইয়া তুলিবে। মায়ের দুর্ব্বলতার সমালোচনা করিবার অধিকার তাহার নাই! মাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে সে—করিতেই হইবে! ভাগ্য-গগনের এক কোণে কৃষ্ণ মেঘের একটি বিন্দু আবার দেখা দিয়াছে। সে মেঘকে জমিতে দিলে ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিবে! সহানুভূতি ও স্নেহের স্নিগ্ধ মৃদু পবনে সে মেঘটুকু সরাইয়া দিতে হইবে, শ্রদ্ধার কিরণে সে কালিমা ঘুচাইতে হইবে. নহিলে ঝড় উঠিলে সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে!

জাক স্থির করিল, সতর্কভাবে সে মাতার ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিবে! দুর্ব্বল-হৃদয়া নারীর দল আপনাদিগের অলস কর্ম্মহীন জীবনগুলাকে প্রায়ই একটা মিথ্যা আদর্শের পিছনে ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইদাও অলস, কাজ-কর্ম্মে তিলমাত্র তাহার রুচি নাই, নির্জ্জনে বসিয়া কি অদ্ভ মায়ার রাজ্য যে সে গড়িতে থাকে, তাহা সে-ই জানে। আর্জাস্তঁর কবি-প্রতিভার প্রতি এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা যে ইদার হৃদয়কে এখনও সবলে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, জাকের তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইত, কখন তাহার প্রতি মমতার এ ক্ষীণ আভাটুকু চকিতে মিলাইয়া যায়!

মনের এ আশঙ্কা খুলিয়াও কাহারও কাছে বলা যায় না—ইদা তাহার মা ! মার দুর্ব্বলতার কথা সে কাহাকে বলিবে ? ইহাই ছিল জাকের আরও দুঃখ। কাহারও কাছে এ দুঃখের কথা বলিতে পারিলে বুঝি, তাহার বুকের ভার অনেকটা লাঘব হইবারও সম্ভাবনা ছিল ! কিন্তু এ কথা বলা চলে না ! তাই জাক এ বিপুল দুঃখের ভার আপনার বুকে পুরিয়া মনে মনেই গুমরিতে থাকে !

আর্জ্জান্তর পত্র পাইয়া ইদাকে সহসা আজ কাজ-কর্ম্মে অতিরিক্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া জাক ঈষৎ আশান্বিত হইল। সে ভাবিল, ইদা নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের এ বিপুল উত্তেজনা, চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাসটুকু বুঝিয়া ফেলিয়াছে, এবং বুঝিয়া তাহা রোধ করিতেছে ! এটুকু যে দুর্ব্বলতা, তাহা সে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য ইদার আজ এতখানি আয়াস ! কত গল্পে জাক বহু হতভাগ্য স্বামীর করুণ কাহিনী পড়িয়াছে,—যাহারা চপলা পত্নীর হৃদয়-সংশোধনে অহরহ সতর্ক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে ! নিপুণ উপন্যাস-কারগণের ইঙ্গিতে জাক তাহা দিব্য বুঝিত ! এই যে ইদা আর্জ্জান্তর প্রসঙ্গ ভুলিয়াও তাহার সম্মুখে উত্থাপন করে না, এই যে কাজ-কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিবার জন্য সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিতেছে—এ কেন ? জাক ভাবিত, ইহার অর্থ, শুধু তাহাকে ভুলাইবার প্রয়াস। পাছে পুত্রের মনে এতটুকু সন্দেহ জন্মে ! আর্জ্জান্তকে ইদা যে এখনও ভুলিতে পারে নাই, জাক তাহা বুঝিল। সে স্থির করিল, এ বিষয় লইয়া মনের মধ্যে আর সে কোনরূপ দ্বন্দ্ব-বিরোধ জাগাইবে না, অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটুক—ভবিতব্য রোধ করিবার চেষ্টায় আর সে ভাবিয়া মরিবে না।

একদিন কারখানা হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে জাক দেখিল, ডাক্তার হার্স্ঙ্ ও লাবাস্যান্দ্র্ তাহাদের গলির মোড় বাঁকিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল ! এদিকে কোথায় তাহারা আসিয়াছিল ? কি কাজে ?

গৃহে ফিরিয়াই জাক মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ আসিয়াছিল কি না ! উত্তরে যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে —পাছে তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এ জন্য গৃহেও একটা সতর্ক আয়োজন আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে ! চারিধারেই গোপনতা ! ইহাও সে আজও নূতন করিয়া লক্ষ্য করিল।

রবিবার এতিয়োল হইতে গৃহে ফিরিয়া জাক দেখিল, ইদা নিবিষ্ট চিত্তে কি একটা পাঠ করিতেছে ! সে যে আসিয়া ইদার পাশে দাঁড়াইয়াছে, ইদা তাহা জানিতেও পারে নাই। অসার উপন্যাস-পাঠে মাতার অসাধারণ অনুরাগের কথা জাকের অবিদিত ছিল না—তাই সেদিকে জাকের কৌতূহল মোটেই উদ্রিক্ত হইল না ! কিন্তু সহসা যখন ইদা জাককে দেখিয়া বহিখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ওঃ, জাক, তুমি ! আমি এমন ভয় পেয়ে-ছিলুম ! ভেবেছিলুম, কে এল !"

জাক কহিল, "ওটা কি পড়ছিলে তুমি ?"

"ও কিছু না, একখানা বাজে বই। ভাল কথা—ওদের সব খপর কি, বল ত ! ডাক্তার রিভাল কেমন আছেন ? আর সেসিল ? তুমি সেসিলকে আমার ভালবাসা জানিয়েছিলে ত ?"

কথাটা বলিবার সময় ইদার গা-টা যে ছম ছম করিয়া উঠিল, তাহা জাকের দৃষ্টি এড়াইল না। ইদা বুঝিল, জাকের চোখে এখন ধূলা দিবার চেষ্টা করায় লাভ নাই জাকের মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, নিশ্চয় ! তাহার চেয়ে ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া বলাই সঙ্গত বুঝিয়া ইদা কহিল, "ও, এ বইখানা কি, তুমি জিজ্ঞাসা করছ ! দেখ না—"

ইদা বইখানি জাকের সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। চক্‌চকে মলাট দেখিয়া জাক নিমেষেই বহিখানি চিনিল ! এ সেই মাসিক-পত্র, যাহার প্রথম খণ্ডের সহিত সিদ্‌নুয় জাহাজে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। এখন মাসিকখানির কলেবর অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—পত্রের সংখ্যাও প্রথম খণ্ডের অর্দ্ধেক ! ভিতরের কাগজও অত্যন্ত পাৎলা, মলিন। যে সকল মাসিক-পত্রের গ্রাহক জুটে না, অথচ প্রচারিত হইতে যাহাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা দ্বিধা নাই, এখানি অবিকল তাহাদেরই দোসর ! প্রবন্ধগুলিও উদ্ভট বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ—শুধু একটা অবজ্ঞার হাস্য উদ্রেক করে ! গুরু-গম্ভীর নামের আবরণে দাম্ভিক লেখকগণের অক্ষম লেখনী-নিঃসৃত উচ্ছ্বাস-গদ্‌গদ, যুক্তি-হীন, অসার সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে, এবং ছন্দ ও ভাবহীন কবিতায় পত্রিকার শীর্ণ কলেবর ভরিয়া রহিয়াছে। হাস্যরসের এই অপূর্ব্ব ভাণ্ডে হস্তার্পণ করিবার জন্য জাকের এতটুকুও আগ্রহ হইল না, কিন্তু সহসা তাহার দৃষ্টি সূচী-সন্নিবিষ্ট একটা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিষয়টি একটি কবিতা, নাম "প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ"—তাহার লেখক, কবিবর আর্জ্জান্ত স্বয়ং। কবিতাটি এই,-

"কি ! বলিল না হায়, একটি বাণীও
বিদায়-ক্ষণে—
পিছনে বারেক চাহিলও না সে
নয়ন-কোণে !
হারায়ে হৃদয়—"
ইত্যাদি।

এমনই ভাবে দুই শত ছত্র ব্যাপিয়া প্রাণহীন ছন্দের মালা দীর্ঘ অজগরের মতই গা মেলিয়া পড়িয়া

আছে! পাছে শার্লং কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, এ জন্য প্রতি চার্বি ছত্রের শেষে শার্লতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে! জাক রোষে জ্বলিয়া কাগজ-খানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি স্পর্দ্ধা! তোমাকে এ কাগজ পাঠাতে তার সঙ্কোচ হল না!"

ইদার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা ঢোক গিলিয়া সে কহিল, "না, সে ত পাঠায় নি! নীচেকার ঘরে আজ দু-তিন দিন ধরে কাগজখানা পড়েছিল। কে ফেলে গেছে, জানি-ও না।"

মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষ নিস্তব্ধ হইল। কাগজখানা কুড়াইয়া লইবার জন্য ইদা কাতর হইয়া উঠিল, কিন্তু লইতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে সে অন্যমনস্কভাবে কাগজখানার নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইল। জাক তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ও কাগজখানা আবার তুমি পড়ছ! ফেলে দাও, ফেলে দাও; রেখো না। ও পদ্যটা ভারী কদর্য্য, বীভৎস।"

ইদা কহিল, "কৈ, আমার ত তা মনে হল না।"

"বল কি! এর কোথাও না আছে ভাব, না আছে মানে। একে তুমি কবিতা বল? এ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।"

"জাক—" ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। ইদা কহিল, "মিছে তর্ক করো না, জাক। আর্জান্ত কেমন লোক, তার দোষ-গুণ কি, তা আমি যেমন জানি, এমন আর কেউ নয়। আমায় সে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, মানি। আর মানুষটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, তবে মানুষ এক, তার কবি-প্রতিভা আর—সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। আর্জান্ত মানুষ হিসাবে যেমন লোকই হোক না, তার কবিত্ব যে অসাধারণ, তাতে সন্দেহ নেই! তার কবিতায় এমন একটা আবেগ আছে, তেজ আছে, যা ফ্রান্সে আর-কারও কবিতায় নেই! যথার্থই যাকে বলে আবেগ-কম্পন! এই আবেগ-কম্পন, মুসের লেখায় ছিল, কিন্তু মুসের কবিতায় এমন মাধুর্য্য ছিল না! আর্জান্তর "প্রেম-বিজ্ঞানে"র মত কবিতার বই ফরাসী ভাষায় আর নেই, যদিও তেমন আর-একখানি বই আমি দেখিনি! কেন, এই 'প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ' কবিতাটাই কি ফেল্না! চমৎকার! আহা, নারী চলে গেল! তার প্রিয়তমের সমস্ত প্রেম উপেক্ষা করে, তার পানে না চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে সে চলে গেল! সুন্দর ভাব!"

জাক তীব্র স্বরে কহিল, "কিন্তু এই নারী যে তুমি! তা বুঝছ না! তুমি যে-ভাবে চলে এসেছ, তা তুমি ভুলে গেলে?"

ইদা কহিল, "জাক, এ কথা বলে আমায় অপমান করো না তুমি। কবিতা কারও নিজের কথা নয়—এ আর্টের ব্যাপার। এ বিষয়ে তোমার চেয়ে চর্চ্চাও আমি করেছি বিস্তর! আর্জান্ত আমার উপর যত অত্যাচারই করুক, সে যে একজন খুব উঁচু দরের কবি, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনদিন এতটুকুও সন্দেহ উঠবে না। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আর্জান্তও একজন! আজ দেশের লোক তাকে বুঝছে না—কিন্তু একদিন এমন সময় আসবে, যখন তার পরিচিত বন্ধুর দল গর্ব্ব করে বলতে পারবে যে, আমি কবি আর্জান্তকে জানতুম, তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছি।"

কথাটা বলিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল। মাদাম লেভ্যান্দ্রের কাছে যাইয়া দুইটা গল্প করিয়া প্রাণের ভার লঘু করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জাক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া টেবিলের ধারে আসিয়া বহি খুলিয়া বসিল। পাঠে মন লাগিতেছিল না—নানা চিন্তা, নানা কথা তাহার মাথার ভিতর রণোন্মত্ত সৈন্য-দলের মতই চলা-ফেরা করিতেছিল। সহসা একটা পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জাক অধীর আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে একটা ছায়া পড়িল। জাক উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিল। এ কি—স্বপ্ন! না—এ যে শত্রু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! আর্জান্ত! জাকের আপাদ-মস্তক শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিত স্বরে কহিল, "কে?"

"আশ্চর্য্য হয়ো না, জাক। চম্‌কে উঠো না। আমি আর্জান্ত, কবি আর্জান্ত।"

নির্ম্মম আঘাত! ক্রূর পরিহাস! অদৃষ্টের কি এ বক্র ইঙ্গিত! জাক ভাবিয়াছিল, ইদা বুঝি ফিরিয়া আসিল! কিন্তু তাহা না হইয়া এ কি—কে আসিল?

শীকারকে আয়ত্তের মধ্যে অতর্কিতভাবে দেখিলে প্রথম মুহূর্ত্তেই বাঘ যেমন একটা উত্তেজনায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠে, জাক ঠিক তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ তাহার চিরশত্রু তাহারই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আজ জাক উচ্চে, আর্জান্ত নিম্নে! আর্জান্ত জাকের আয়ত্তের মধ্যে! দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জাক স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কেন তুমি? কি চাও?"

কবি আর্জান্তর মুখখানা সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের কথা বাহির হইতে গিয়া বাধিয়া গেল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া সে বলিল, "আমি ভেবেছিলুম, তোমার মা এখানে আছে!"

"হাঁ আছেন, এখানেই আছেন! আমি এখন তাঁর অভিভাবক—তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা! আমি তা ঘটতে দেব না!"

বলিবার ভঙ্গীতে কথাটায় এমন ঘৃণা ও অবজ্ঞা বাজিয়া

উঠিল যে, আর্জাস্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কহিল, "জাক, আমাদের দুজনের মধ্যে মস্ত একটা ভুল চলেছে! বরাবরই চলে আসছে। এখন তুমি মানুষ হয়েছ, জীবনের গভীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ, সুতরাং এখন আর এ ভুলটুকু চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এস, আমি তোমার হাতে হাত রেখে বলছি, আজ থেকে আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না, আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু হব, সরল আন্তরিক অকপট বন্ধু—"

আর্জাস্তকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া জাক কঠিন পরুষ স্বরে কহিল, "এ প্রহসন অভিনয়ের কোন প্রয়োজন দেখছি না, আমি। তুমি আমায় ঘৃণা কর। আমিও তোমায় ততোধিক ঘৃণা করি।"

"—কিন্তু কতদিন ধরে আমাদের মধ্যে এ ভাব চলে আসছে, জাক ?"

"কত দিন! বোধ হয়, প্রথম যে দিন তোমায় দেখি, সেই দিন থেকেই। যাই হোক, সে সব কথার আলোচনায় কোন লাভ নেই। আমার এ ঘৃণা কখনই দূর হবে না! তুমি আমার শত্রু,চিরদিন শত্রুই থাকবে। তোমায়-আমায় বন্ধুত্ব অসম্ভব! আমার সারা জীবনের অভিশাপ, আমার সব সুখের কণ্টক তুমি—আজ এসেছ কি না বন্ধুত্ব স্থাপন করতে! আমার লজ্জা, আমার ঘৃণা, আমার সকল দুর্দ্দশা, সকল দুর্ভাগ্যের মূল তুমি—"

"কিন্তু শোন, জাক—এতদিন যথার্থই আমরা পরস্পরের প্রতি একটা মিথ্যা আচরণ করে এসেছি। এখন বন্ধুত্বের একটা সুযোগ দাও। জানই ত, কবি বলে গেছেন, এ জীবন নহেক স্বপন। আমরা একটা ভাব নিয়ে ত বাস করতে পারি না—"

জাক আবার বাধা দিয়া কহিল, "ঠিক বলেছ তুমি, এ জীবন নহেক স্বপন। সত্যই তাই। জীবন একটা সত্য, ভীষণ কঠোর সত্য! আমার সময়ের দাম আছে। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক, বাজে গল্প করে তা নষ্ট করতে পারব না। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করি, শোন। দশ বছর ধরে আমার মা তোমার বাঁদীগিরি করে এসেছে—বাঁদী কি—বাঁদীরও নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আমার মার তাও ছিল না—তিনি ছিলেন, যেন তোমার তৈজসের মত। এ দশ বছর আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি, তা আমিই জানি, কিন্তু থাক্ সে কথা! তোমার কাছে এখন কাঁদুনি গাইতে চাই না। গাইতে ঘৃণা হয়। এখন আমার মাকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি—তাঁর উপর এখন আমার সম্পূর্ণ অধিকার। যেমন করে পারি, এ অধিকার এখন বজায় রাখব। তাঁকে আর তোমার কাছে আমি যেতে দেব না—কিছুতেই না। কেন দেব? তোমারই বা তাঁকে আর কিসের প্রয়োজন? তাঁর মাথার চুল আজ শাদা হয়ে গেছে—চোখের জল মুখে কালির ছাপ টেনে দিয়েছে, যৌবনের সে লাবণ্য সব ঝরে গিয়েছে—তোমার বিলাসের খোরাক তিনি আর জোগাতে পারবেন না! এখন তাঁকে তোমার মনেও ধরবে না, আর। আজ তাঁর আর কেউ নেই—শুধু আমি আছি। তিনি আমার মা—শুধু মা, আর কারও কেউ নয়। আমার সেই মাকে আমি কাছে কাছে রাখব—ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।"

আর্জাস্ত জাকের ভাবটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বলিল, "বেশ, তা তিনি তোমার কাছেই থাকুন। আমি শুধু একজন পুরোনো বন্ধুর মত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়—"

"কিছু না—কিছু না—কোন দরকার নেই। আমার একলার পরিশ্রমই চূড়োন্ত। সব অভাব তাতে মিটে যায়—কিছু বাকী থাকে না।"

আর্জাস্ত কহিল, "তোমার কিছু অহঙ্কার হয়েছে, দেখছি, জাক। আগে ত কৈ তুমি এমন কড়া কথা বল্‌তে পারতে না!"

"ঠিক বলেছ, কবি আর্জাস্ত। যদি বুঝে থাক, তবে এটুকু আরও জেনে রাখ যে, আমার বাড়ীতে অনেকক্ষণ তোমায় বরদাস্ত করেছি, আর করব না। এখন শোন তুমি, সহজভাবে যদি বিদায় না নাও, তাহলে মানে মানে তা পারে বলে আমার ভরসা হয় না। কারণ, এখানে তোমার হাজির থাকাটা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে; বুঝলে?"

জাকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অমানুষিক তীব্রতা, দৃষ্টিতে এমন তেজ বিকীর্ণ হইতেছিল যে, তাহার কথার উত্তর দিতেও আর্জাস্তর আর সাহস হইল না। সে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া ধীর পদে নীচে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহার জুতার শব্দ শুনা গেল, জাক উৎকর্ণভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে শব্দ মিলাইয়া গেল। জাক আপনার কক্ষে আসিয়া বসিল; আসিয়া দেখিল, ইদা একটা চেয়ারে বসিয়া আছে; তাহার কেশরাশি বিস্রস্ত, চক্ষু অস্বাভাবিক রাঙা। ইদা কাঁদিতেছিল।

জাককে দেখিয়া চোখ মুছিয়া ইদা কহিল, "আমি এখানে বসে সব কথা শুনেছি, জাক, সব কথা, যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, যে, আমি—" জাক মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল। পরে মাতার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "এখনও সে বেশী দূর যায়নি—ডাকব তাকে, বল?"

হাত ছিনাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জাকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ইদা কহিল, "না, না, জাক—তুমি ঠিক

বলেছ। আমি তোমার মা, শুধু মা, আর কারও কেউ নই আমি, কিছু হতেও চাইনে আর।”

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক রাত্রে ডাক্তার বিভালকে জাক এক দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল,

“আমার বন্ধু, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মা চলিয়া গিয়াছে, তাহারই কাছে গিয়াছে! সে যেন একটা ভীষণ চক্রান্ত! কিন্তু না, সে জন্য মার কোন দোষ দিই না—কুৎসার আশ্রয় লইতে সেইজন্যই আমি এত নারাজ।

“কাহারই বা দোষ দিব? ছেলেবেলায় এক কাফ্রীর ছেলে স্কুলে আমার সঙ্গী ছিল। সে বলিত, ‘গরীব হতভাগার দল যদি একটা দীর্ঘনিশ্বাসও না ফেলতে পেত ত দম বন্ধ হয়েই তারা মরে যেতে।’ কথাটার অর্থ আজ যেমন বুঝিতেছি, পূর্ব্বে কোনদিন এমনটি বুঝি নাই। আজ যদি আপনার কাছে এ তপ্ত শ্বাস ফেলিতে না পাইতাম, সব কথা খুলিয়া বলিতে না পারিতাম, তাহা হইলে বুকের এ অসহ্য ভারে আমি বোধ হয় মরিয়া যাইতাম! দুর্ব্বহ এ ভার! রবিবার পর্য্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না—সে এখনও অনেক দেরী। কিন্তু সেসিলের সহিত কোন্ মুখেই বা এখন আমি দেখা করি?

“আপনাকে বলিয়াছিলাম আর্জান্তঁর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল—তাহার সহিত স্পষ্ট সব বুঝা-পড়া করিয়াছিলাম। সে দিন হইতে মার মুখে আর হাসি দেখি নাই, বুঝিয়াছিলাম, তাহার মনে এতটুকু সুখ নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। মন অহর্নিশি সেইখানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! দুর্ব্বল নারী কি করিয়া মন বাঁধিবে—তথাপি মনকে বাঁধিবার জন্য মা যে রীতিমত একটা চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই জন্যই আমি এ বাসা বদলাইবার চেষ্টায় ছিলাম, যদি স্থান-পরিবর্ত্তনে মন কিছু শান্ত হয়! মার উপর দৃষ্টিও বেশ সতর্ক রাখিয়াছিলাম, বাসাও ঠিক হইয়াছিল। এ বাসা মার পছন্দ ছিল না। চারিধারে ছোটলোক ও কারিকরের বাস—নূতন বাসার কথা মাকে জানাই নাই! গোপনে সব ঠিক করিয়াছিলাম। বাসা নূতনভাবে সৌখীন রকমেই সাজাইতেছিলাম। সব ঠিক হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, একেবারে মাকে সেখানে বেড়াইবার ছলে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিব। আকস্মিকতার জন্য মার মনটা খুবই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে—তাহারও ফল মন্দ দাঁড়াইবে না। কাদিকদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

“আমি নূতন বাসাতে গিয়া বেলিসেয়ারকে পাঠাইয়াছিলাম, মাকে লইয়া আসিতে। সন্ধ্যার পরও মা আসিল না, বেলিসেয়ারও ফিরিল না। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। শেষে অধীরভাবে নিজেই সন্ধান লইতে যাইব স্থির করিতেছি, এমন সময় বেলিসেয়ার ফিরিয়া আসিল—একা, সঙ্গে মা নাই। বেলিসেয়ার আমার হাতে মার চিঠি দিল। ছোট একখানি চিঠি—শুধু লেখা আছে, আর্জান্তঁর অত্যন্ত অসুখ, এ সময় তাহাকে না দেখিলে ধর্ম্ম থাকিবে না, এইজন্যই হঠাৎ তিনি পারি যাইতেছেন; আর্জান্তঁ সারিলেই আবার ফিরিয়া আসিবেন। অসুখের কথাটা আমার খেয়ালে আসে নাই, নহিলে আমিও নিজে অসুখের ভান করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। তখন দুইজনকে লইয়া মার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলিত।

“সে পাপিষ্ঠ খুব ফন্দী বাহির করিয়াছে। সত্যই কি তাহার অসুখ? না, কখনই নয়—এ শুধু সে একটা ফাঁদ পাতিয়াছে। যদি অসুখ সত্যই হয় ত পূর্ব্বেকার মত, আপনি যেমন এতিয়োলে দেখিতেন, তেমনই! তবু মা এ কথা বিশ্বাস করিল! আমার অসুখ হইলে কি মা এতটা করিত? আমার সন্দেহ হয়। আর্জান্তঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলিয়াছিল—আজ সে জয়ী হইয়াছে, আমার সব কৌশল সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আজ আমার সুগভীর পরাজয়—নিষ্ঠুর পরাজয়!

“আর সেই নারী—আমার মা। কি নিষ্ঠুর তার হৃদয়, কি পাষাণে তার হৃদয়টা গড়া! আমার কথা একবারও সে ভাবিল না! আমার এ নীরব নির্জ্জন সাধনার মর্ম্ম তাহার মনে একবারও ঠাঁই পাইল না? আশ্চর্য্য! অথচ এই নারী, আমার মা—এই নারীর গর্ভে আমি জন্মিয়াছি!

“আমি এখানে আর একদণ্ডও থাকিতে পারিতেছি না। চারিধারে বাতাস অবধি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্বাস লওয়া যায় না। আমি আপনার কাছে যাইতে চাই—আমায় সান্ত্বনা দিন, আশ্বাস দিন, নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব! আমার এত সাধ, এত কল্পনা, এত আশা, সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল—ধূলায় লুটাইল!

“এখন আমার শুধু একটি অনুরোধ আছে, এ চিঠি আপনি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন—সেসিলকে দেখাইবেন না। সে দেখিলে আমার আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। এ কথা শুনিলে আমার ভালবাসাতেও সে সন্দেহ করিতে পারে। হয়ত সে আর আমায় ভাল না বাসিতেও পারে। যদি এমন দুর্দ্দিন আসে, আমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে! সেসিল ছাড়া এখন আমার আর কেহ নাই। তার প্রেমে, স্নেহে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আজ এ শূন্য ঘরে বসিয়া শুধু ভাবিতেছি, ‘সেসিল! আমার সেসিল! এই সেসিল যদি আমায় ত্যাগ করে?’ সে কথা ভাবিতেও পারি না! জগতে আসিয়া

কেবলই প্রতারিত হইতেছি—সকলের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, একমাত্র শুধু সেসিলের উপরই বিশ্বাস আছে। সেই সেসিল,—সেও যদি আমায় ত্যাগ করে? না। তাহা কখনও হইতে পারে না। সে নিজে আমায় আশ্বাস দিয়াছে—সে আশ্বাস কখনও সে ভাঙ্গিবে না! সেসিল দেবী—জগতের জীব নয়। সেসিল আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, ইহা আমি ধ্রুব জানি। আমার এ বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকিবে, সন্দেহ নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন

মা ফিরিয়া আসিবে, এ আশাটুকু জাক সহজে ত্যাগ করিতে পারিল না। কতদিন সকালে সন্ধ্যায় এবং নিস্তব্ধ নিশীথে বইয়ের পাতায় মনটাকে অতিরিক্তভাবে ঢালিয়া দিয়াও সহসা সে চমকিয়া উঠিত, ঐ বুঝি মা আসিল! ঐ যে তাহার পায়ের মৃদু ধ্বনি! পোষাকের সতর্ক খস্‌খস্ শব্দটা না ঐ শুনা যাইতেছে! অধীর আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করিত, কখন্ আসিয়া মা ডাকিবে, "জাক!" কিন্তু হায়, কোথায় মা?

রুদিকদের গৃহ হইতে ফিরিবার সময় সে ভাবিত, আজ নিশ্চয় ঘরে ফিরিয়া দেখিবে, মা আসিয়াছে। রবিবার রাত্রে এতিয়োল হইতে ফিরিবার পথে মন তাহার দুরন্ত ঘোড়ার মতই অস্থির হইয়া উঠিত, গাড়ী বড় ধীরে চলিতেছে! কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া সে মার মুখের কথা শুনিতে পাইবে! কিন্তু এ আশা নিত্যই তাহার ব্যর্থ হইত। মা আসিল না, আসিবার লক্ষণও কিছু দেখা গেল না।

মাকে সে চিঠি লিখিয়াছিল, "তোমার এখানে থাকিতে কষ্ট হয় বলিয়া আমি নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। বাড়ীখানি একেবারে সহরের প্রান্তে—পল্লীটিও বেশ শান্ত, নীরব। ঘরগুলি তোমার মনের মত সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, তুমি ফিরিয়া আসিয়ো। কিন্তু সে চিঠির কোন উত্তর আসিল না। ইদা জাককে একখানিও চিঠি লিখে নাই। জাক ভাবিত, এ বিচ্ছেদ তবে চিরদিনের জন্যই। কি দারুণ, নির্ম্মম, এ বিচ্ছেদ!

জাকের বেদনার সীমা ছিল না। মানুষ হস্ত যে বেদনা দান করে, বিধাতার নিষ্ঠুর অবিচারের মতই তাহা আসিয়া বুকে বাজে—নিতান্তই তাহা অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেসিলের যেন দৈবশক্তি ছিল। এ দারুণ বেদনা-উপশমের মন্ত্র সে জানিত, তাহার হাসির কিরণে সকল কষ্ট জাক নিমেষে ভুলিয়া যাইত। সেসিলের মিষ্ট কথায় কি আশ্বাস, দৃষ্টি হইতে কি সুধা যে ক্ষরিত হইত, ভাগ্যদেবীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত অনল-বর্ষী শরগুলা তাহার কাছে নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া ফিরিত। ইহার উপর জাকের ছিল, অজস্র অবিরাম কাজ,—যাহার কঠিন গায়ে ঠেকিয়া বিশ্বের সমস্ত কঠোর দুঃখ, গভীর বেদনাও ঠিকরিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। এই কাজই দুর্ভাগ্য জাককে দারুণ দুর্দ্দিনে আপনার বিরাট দেহাবরণে ঢাকিয়া তাহার দুঃখ ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

যতদিন মা কাছে ছিল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও সতর্কতা-সত্ত্বেও কত দিন সে জাকের পড়াশুনায় অকারণ ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার অপূর্ব্ব খেয়াল, বিচিত্র সখ জাকের গ্রন্থ-নিবিষ্ট চিত্তকে কতবার আসিয়া নাড়া দিয়া গিয়াছে! বিঘ্ন নিবারণ করিতে গিয়াও কতদিন ইদা কত বিঘ্ন ঘটাইয়া তুলিয়াছে! এখন সেই মা কাছে নাই—জাক তাই বইয়ের পাতায় আবার অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিয়া অতীত দিনের সমস্ত অবহেলা-ক্রটি সারিয়া লইতে উদ্যোগী হইল। প্রতি রবিবার যখন সে এতিয়োলে আসিত, ডাক্তার রিভাল তাহার পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। পরীক্ষা লইয়া সহজেই তিনি বুঝিতেন, জাকের জ্ঞান বেশ পরিপক্কতা লাভ করিতেছে। আর একটি বৎসর মাত্র—তাহার পরই একটা পরীক্ষা দিয়া জাক উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে, চিকিৎসার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিবে—তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

উপাধি-লাভের সম্ভাবনা। জাকের প্রাণের ভিতর হইতে একটা অসহ্য উল্লাস সাড়া দিয়া উঠিল! উপাধি! লোহার হাতুড়ি পিটিয়া নীচ জঘন্য কারিকরগুলার সাহচর্য্যেই যাহার জীবনের দিন কাটিয়া যাইতেছে, সেই জাক ডাক্তার হইবে! সম্ভ্রান্ত সমাজে আবার তাহার জন্য আসন মিলিবে। ইহা কি সম্ভব, ভগবান!

বাসায় ফিরিয়া বেলিসেয়ারের নিকট জাক যখন ডাক্তার রিভালের আশার কথা খুলিয়া বলিল, বলিল যে, আর এক বৎসর পরেই সে ডাক্তার হইবে, তখন সেই নিরীহ টুপিওয়ালার বুকখানা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। জাক ডাক্তার এবং বেলিসেয়ার তাহার বন্ধু!

গাড়ী চড়িয়া জাক পাড়ায় পাড়ায় রোগী দেখিয়া বেড়াইবে—অসংখ্য আতুর নর-নারী তাহাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণের জন্য জাকের করুণার ভিখারী হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে—কি সুন্দর স্বর্গীয় সে দৃশ্য! বেলিসেয়ার মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা-নেত্রে ভবিষ্যতের সে সুমধুর চিত্রখানা একবার দেখিয়া লইল! জাকের প্রতি শ্রদ্ধাও তাহার সেদিন হইতে অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

ডাক্তার রিভাল ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া

আনন্দিত হইলেও তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কয় মাসের অতিরিক্ত পরিশ্রমে জাকের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সেই পুরাতন কাশিটুকু আবার দেখা দিয়াছে, চোখের সে দীপ্তি কোথায় গিয়াছে! চোখ কোঠরে ঢুকিয়াছে, কণ্ঠের নীচে হাড় দুখানা ঠেলিয়া উঠিয়াছে! মধ্যে মুখে যে একটু লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাও আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সারা দেহ কেমন কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে!

ডাক্তারের ললাটে একটা চিন্তার রেখা পড়িল। জাকের তপ্ত হাতখানা আপনার হাতে ধরিয়া তিনি কহিলেন, "এ তুমি ভাল কচ্ছ না, জাক। শরীরটার দিকে মোটেই মন দিচ্ছ না। খাটুনি খুব পড়েছে, তার উপর তোমার মনের অবস্থাও এখন ভাল নয়। পড়ার ঝোঁকটা কিছু কমাও না হয়, আর এক বছর বেশী সময় লাগবে, তাতে কি! শরীরটাকে আগে রাখা চাই ত! সেসিলও কিছু কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।"

না। সেসিল যে পলাইবে না, এ কথা সত্য! জাক তাহা ভাল করিয়াই জানে। বরং তাহার প্রতি সেসিলের অনুরাগ-যত্ন ইদানীং বাড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সেসিল কখনও জাকের সম্মুখে স্নেহ, প্রেম, করুণা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়-পাত্রটি এমন করিয়া কানায় কানায় ভরিয়া ধরে নাই! সে পাত্রের স্নিগ্ধ মধুর রস জাক এখন প্রচুরভাবে পান করিতে পায়! তাহার মত উপেক্ষিত দুর্ভাগার জন্য পৃথিবীতে এত সুখ সঞ্চিত থাকিতে পারে, ইহা সে কখনও পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই! সেসিলের এই অযাচিত করুণার অজস্র ধারায় স্নান করিয়া সে এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। কোন পরিশ্রমই তাহার কাছে আজ অতিরিক্ত বা অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না। অনর্গল খাটিয়াও এতটুকু ক্লান্তি কোনদিন সে অনুভব করে নাই। আরাম, নিদ্রা, এ সব কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সারা দিন-রাত্রির মধ্যে সতেরো ঘণ্টা কাজ ও পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত —তাহার জন্য এতটুকু আস্বাচ্ছন্দ্য নাই! ইসেনডেকের তপ্ত কারখানায় সারাদিন যে লোহার মুগুর তাহাকে পিটিতে হইত, তাহাও তাহার কাছে লেখনীর মত হাল্কা বোধ হইত।

মানুষের দেহে এত শক্তি থাকিতে পারে—জাক তাহা বুঝিত না। বুদ্ধের মত সে যেন কঠোর সাধনায় রত ছিল। ইষ্টলাভের জন্য তেমনই অক্লান্ত তপ! দেহের কষ্ট? সে কথা ভাবিবার অবসরও তাহার ছিল না। দীর্ণ গৃহের জীর্ণ দ্বার-জানালা—তাহার মধ্য দিয়া অজস্র হিম আসিতেছে—সে হিমে আগুন জ্বালাইয়া লইবারও অবসর নাই—শুধু পড়া, পড়া, পড়া! তাহার পর দিনের আলো দীপ্ত কিরণে ফুটিয়া উঠিলে কোনমতে মুখে কিছু আহার গুঁজিয়া কারখানায় ছুটিতে হয়। সেখানে শুধুই কাজ, কাজ, কাজ—তাহার পর ছুটি হইলে দ্রুত গৃহে ফিরিয়া আবার সেই বই লইয়া বসা। এতটুকু বিলাস নাই, আরাম নাই, আমোদ নাই! দুইটা খোস-গল্প? না, তাহারও সময় নাই! কবে এই এক বৎসর পূর্ণ হইবে—উপাধি মিলিবে—তপস্যার বিরাট ফল করায়ত্ত হইবে! তখন আরাম, তখন বিলাস, তখন গল্প—সবই হইবে। এখন নয়। বাহিরে কখন্ শীতের শেষে বসন্ত আসিল, আবার বসন্তকে ঠেলিয়া গ্রীষ্ম আসিয়া দেখা দিল, এ সকলের সন্ধান রাখিবারও জাকের মুহূর্ত্ত অবকাশ ছিল না। এ যেন সেই প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষির একনিষ্ঠ সাধনা! অমিত-তেজা বিশ্বামিত্রের বিরাট উগ্র তপস্যা!

এমনইভাবে জাকের যখন দিন কাটিতেছিল—রিভালের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও এ সনাতন নিয়মে এতটুকু সে ত্রুটি ঘটিতে দেয় নাই, তখন সহসা একদিন কারখানা হইতে বাসায় ফিরিয়া সে রিভালের এক পত্র পাইল। তাহার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। দারুণ উদ্বেগে সে পত্র খুলিল। মাথাটাও দপ্ দপ্ করিতেছিল। পত্রে শুধু একটিমাত্র ছত্র। লেখা আছে,—

"কাল এখানে আসিয়ো না, জাক! এক সপ্তাহ আমরা এখানে থাকিব না।

রিভাল।"

সেদিন শনিবার। এতিয়োলে যাইবে বলিয়া জাকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামাটি ইস্ত্রি করিয়া মাদাম বেলিসেয়ার সবে-মাত্র তখন জাকের কক্ষে প্রসন্ন মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসিয়া জাকের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার সে প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হইল। হাতের জামা হাতে রাখিয়া চমকিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

জাকের বুকের মধ্যে দারুণ ঝড় উঠিল—কেন এ পত্র? ডাক্তার কোথায় যাইতেছেন? সেসিল সব কথা খুলিয়া লিখিল না, কেন? সে কেমন আছে, তাই বা কে জানে? হঠাৎ এ সঙ্কল্প কেন? শুধু একটি মাত্র ছত্র! আর কিছু খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই? কেন? কেন? সহস্র আকুল প্রশ্ন তাহার অন্তরের মধ্যে হু-হু করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

জাক ভাবিল, কাল বোধ হয় সেসিলের পত্র আসিবে, তাহা হইতে সকল রহস্যই তখন জানা যাইবে। কিন্তু পরদিন কোন পত্র আসিল না। সেসিল বা ডাক্তার, কাহারও নহে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া জাক চিঠির আশায় অধীরভাবে পথ চাহিয়া রহিল, তবু কোন চিঠি আসিল না। ভয়ে ও ভাবনায় তাহার চেতনালোপের উপক্রম হইল। কেন চিঠি আসে না? কি হইয়াছে? কি?

কি? মনকে বারবার প্রশ্ন করিয়াও জাক এ সমস্যার এতটুকু সমাধান করিতে পারিল না। বেচারা, বেচারা জাক! সহসা তাহার জীবন-আকাশে আবার এ কি মেঘের উদয় হইল! এ মেঘের আড়ালে পড়িয়া বেচারার এত সাধের, এত আশার সদ্যোত্থিত আলোক-রেখাটুকু একেবারেই যে ঢাকিয়া যায়। একটা দারুণ শঙ্কায় তাহার অন্তরের মধ্যে করুণ হাহাকার গুমরিয়া উঠিল।

ডাক্তার বিভাল বা সেসিল সেদিন গৃহেই ছিলেন। সহসা সেদিন সেসিলের মুখ হইতে বাজের মত যে নিষ্ঠুর কথাটা বাহির হইয়াছে, তাহার আকস্মিক আঘাতে জাক পাছে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, এই ভয়েই ডাক্তার তাহাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এমন আশাও একটু ছিল, ইতিমধ্যে সেসিলের এ মত হয়ত আবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত! ডাক্তার নিজেও ইহার জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না! ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে সেসিল জাককে পরিত্যাগ করিবে—তাহাকে বিবাহ করিবে না? বিশেষ তাহাকে এত দিন ধরিয়া এতখানি আশা দিবার পরও?

সেসিলের মুখখানা সেদিন অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া ডাক্তার কারণ-অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলে সেসিল কহিল, "জাক এ রবিবার এখানে আসবে?"

ডাক্তার কহিলেন, "তা ত আসবে—কিন্তু সে কথা হঠাৎ যে!"

সেসিল কহিল, "কারণ আছে। আমার ইচ্ছা নয়, সে আর আসে!"

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন। এ কি আবার নূতন কথা! নূতন খেয়াল! তাঁহার মুখে সহসা কোন কথা যোগাইল না। সেসিল আবার কথা কহিল—তাহার স্বর কাঁপিতেছিল! সে কহিল, "এখানে যেন আর কখনও সে না আসে!"

ডাক্তার স্তম্ভিতভাবে কহিলেন, "কেন? কি হয়েছে, সেসিল?"

"না, আমার তা ইচ্ছা নয়!"

"তোমার ইচ্ছা নয়! কেন, হঠাৎ হল কি? ঝগড়া না অভিমান?"

"না দাদামশায়, ঝগড়া কি অভিমানের মত ছোট কথা নয় এ!"

"কি তবে কারণ, শুনি।"

"গুরুতর কারণ আছে, খুব গুরুতর কারণ! আমি ভেবে দেখলুম, আমাদের এ বিয়ে হতেই পারে না—"

"কোন্ বিয়ে?"

"এই আমার সঙ্গে জাকের বিয়ে।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ! এ বিয়ে হতেই পারে না, দাদামশায়। না, এ বিয়ে একেবারে অসম্ভব!"

"কেন?"

"আমার ভুল হয়েছিল। এ বিয়ে—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আগে। আমি জাককে ভালবাসি না।"

"ভালবাস না? সে কি কথা, সেসিল? বুঝেছি, দুজনে ঝগড়া হয়েছে,—নিশ্চয়! আমায় খুলে বল্ দেখি, ভাই—বুড়ো হলেও তোদের এ ঝগড়াটুকু মিটিয়ে দেবার সামর্থ্য অবধি যে আমি হারিয়ে ফেলেছি, তা ভাবিসনে দিদি। লক্ষ্মীটি, কি হয়েছে, বল্! আমি সব মিট-মাট করে দিচ্ছি! দেখ্।"

"না দাদামশায়, এ তা নয়। সত্যি বলছি, আমি তামাসা করছি না! ছেলে-মানুষি ঝগড়াঝাঁটির কথা নয়, এ। জাককে আমি বোনের মত ভালবাসি—অন্য-ভাবে নয়। এখন তা বুঝতে পেরেছি। অবশ্য অন্য রকম বাসবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু পারলুম না।—জাক আমার ভাই, আমি তার বোন। তাকে অন্য রকম ভাবা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, দাদামশায়।"

সহসা পথে সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, ডাক্তার সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। কন্যা মাদ্-লীনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—সেসিলের মার কথা! তিনি সেসিলকে কহিলেন, "এ সবের মানে কি? তবে তুমি আর কাকেও ভালবেসেছ বুঝি?"

লজ্জায় সেসিলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল! ঘাড় না তুলিয়া কম্পিত অথচ দৃঢ় স্বরে সে কহিল, "না, না, তা নয়। আর কাকেও আমি ভালবাসি না—বাসবও না, কখনও! আমি বিয়ে করব না, দাদামশায়, এই শুধু আমার কথা!"

ডাক্তার সেসিলকে বহু প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু তাহার শুধু সেই এক উত্তর, "আমি বিয়ে করব না, দাদামশায়, বিয়ে করবই না।" স্বর তাহার যেমন দৃঢ়, তেমনই স্থির, অচঞ্চল!

তখন সেসিলের সম্মানের প্রতি ডাক্তার ইঙ্গিত করিলেন। পাড়ার লোকে কি বলিবে? এই নিরীহ শান্ত যুবকের সহিত তাহার বিবাহের কথা যে পাকা হইয়া গিয়াছে। এ কথা পাড়ায় যে কাহারও অজানা নাই! এখন সেসিলের এ আকস্মিক নূতন সঙ্কল্পে নিন্দুকের রসনায় লক্ষ কুৎসা নিমেষে উচ্ছ্-সিত হইয়া উঠিবে! বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারও গ্লানির সীমা থাকিবে না! আর বেচারা জাক! এ সংবাদ ছুরির ফলার মত তাহার বুকে বাজিবে যে! আগুনের মত প্রাণটাকে তাহার পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে! তাহার শেষ সম্বল, শেষ আশাটুকু সেসিল এমন নিষ্ঠুরভাবে

চূর্ণ করিয়া দিবে! কেন? কেন? কি তাহার দোষ?

সেসিলের অন্তরেও কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরির আঁচড় টানিতেছিল। মনের ভাব সে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার দুই চোখে অশ্রু ফুটিল। ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া সেসিলের হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "দিদি—"

"দাদামশায়—" সেসিল বৃদ্ধের বুকে মুখ ঢাকিল। সস্নেহে সেসিলের মুখ তুলিয়া বিভাল কহিলেন, "সেসিল, দিদি, শোন—চট করে এমন একটা সঙ্কল্প করে ফেলো না। আরও কিছু দিন না হয় ভেবে দেখ—জাককেও না হয় আমি সে কথা বলি। তার পর—"

"না দাদামশায়, তা অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব! আমি ভেবেছি, ঢের ভেবেছি। এ কথা জাককে এখনই জানান উচিত, একটুও দেরী করা নয়! আমি জানি, এ কথা শুনলে বুক তার ভেঙ্গে যাবে—তার—" সেসিলের স্বর বাধিয়া যাইতেছিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সেসিল আবার বলিল, "সে বড় কষ্ট পাবে—সত্যিই তার শেষ আশা নির্ম্মূল হয়ে যাবে, দাদামশায়, হয় ত সে সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যাবে, মরে যাবে—" সেসিল ফোঁপাইতে লাগিল।

ডাক্তার আপনার বুকের মধ্যে আবার তাহার মুখখানি চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহারও চোখে জল আসিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, "সেসিল—"

মুখ তুলিয়া সেসিল কহিল, "কিন্তু যতদিন এই আশা নিয়ে সে বসে থাকবে, ততই তার কষ্ট বাড়বে বই আর কিছু হবে না। আমারও ইচ্ছা নয়, মিথ্যে আশা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমি মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখতে চাইনে, দাদামশায়, তাহলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে—ভারী নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা।"

ডাক্তার বিভালের রাগ হইল! রুষ্ট স্বরেই তিনি কহিলেন, "তবে কি এখনই তাকে সাফ জবাব দিয়ে দেব —সাফ জবাব—যে, জাক, তুমি অন্যত্র যাও—সেসিল তোমায় চায় না—কোনদিন সে চায়ও নি—তুমি ভুল বুঝেছিলে? চুপ করে রইলে কেন? বেশ—তাই হোক! কিন্তু উঃ, ভগবান, এরা কি! কি দিয়ে তুমি এদের গড়েছ—এই সব দুর্ব্বল স্বার্থপর স্ত্রীলোকের মন—"

সেসিল ডাক্তারের পানে চাহিল—কি করুণ বিষণ্ণ ম্লান, সে দৃষ্টি! তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে, বিভাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। অমনই তাঁহার সমস্ত রাগ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তিনি কহিলেন, "না দিদি, রাগ করিনে আমি! একবার শুধু অভিমান হয়েছিল, তোমার কোন দোষ নেই, দোষ আমারই! তুমি ছেলেমানুষ, কিছু জান না। কিন্তু আমার বোঝা উচিত ছিল—! ওঃ, নির্ব্বোধ, মূর্খ আমি—জীবনে কতবার এ রকম ভুল করব!"

কিন্তু জাককে এ সংবাদ দিতেই হইবে! উপায় নাই! দুই-তিনবার কাগজ ছিঁড়িয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে চতুর্থবারে ডাক্তার সংক্ষেপে শুধু লিখিলেন, "জাক, যাদু আমার, সেসিল তার মত বদলাইয়াছে।" আর একটি কথাও কলমের মুখে বাহির হইল না। সেসিল তার মত বদলাইয়াছে? লিখিয়া তিনি ভাবিলেন, না, মুখেই তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলা ভাল! লিখিয়া কাজ নাই! কাগজখানা আবার তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে আর একটু সময় লইবার আশায় এবং জাককে এ নিদারুণ সংবাদ-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক সপ্তাহ জাকের এখানে আসা স্থগিত রাখাই তিনি সঙ্গত স্থির করিলেন। এই সাত দিনে সেসিল যদি ভাবিয়া আবার নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে! তাই তিনি জাককে শুধু একটা রবিবার এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন।

এই সাতটা দিন ডাক্তার ও সেসিল কেহই এ সম্বন্ধে একটা কথাও তুলিলেন না। আবার শনিবার আসিল। ডাক্তার তখন সেসিলকে ডাকিয়া কহিলেন, "সেসিল, কাল ত রবিবার। জাক এখানে আসবে। তোমার মত সম্বন্ধে তুমি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখেছ কি? মত বদলেছ?"

সেসিল দৃঢ় স্বরে কহিল, "না।"

"তোমার সঙ্কল্প তবে অটল, স্থির?"

"হাঁ।"

সেদিনও এ বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। পরদিন রবিবার। জাক তাহার চিরপ্রথামত প্রভাতেই বিভাল-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন সে দারুণ উদ্বেগ বক্ষে লইয়া সারা পথ অতিক্রম করিয়াছে। বিভাল-গৃহের দ্বারে পৌঁছিতেই তাহার বুকের স্পন্দন কেমন অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিল, নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, পা কাঁপিতে লাগিল।

দ্বার-সম্মুখে দাসীর সহিত জাকের সাক্ষাৎ হইল। দাসী সংবাদ দিল, ডাক্তার জাকের জন্য বাড়ীর পশ্চাতে বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। বাগানে? সে কি! জাক থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। বাগানে কেন? বুঝি, কি বিপদ ঘটিয়াছে! চারিধারের সে প্রফুল্ল ভাবই বা কোথায় গেল? সে চিন্তিত হইল—কোনমতে আপনার কম্পিত দেহটাকে টানিয়া ডাক্তারের সম্মুখে সে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার বিভাল বিচলিত হইলেন। চল্লিশ বৎসর রোগীর শয্যার পাশে বসিয়াও যে হৃদয় এতটুকু কাঁপে নাই—সে হৃদয় আজ এই তরুণ শান্ত যুবককে দেখিয়া

কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক কহিল, "দাদামশায়, সেসিল কি এখানে নেই ?"

"না ভাই—তাকে সেখানেই রেখে এসেছি, যেখানে গেছলুম। কিছুদিন সেখানে থাকুক, সে। কোথাও ত যায় না, কখনও।"

"অনেক দিন কি সে সেখানে থাকবে ?"

"হাঁ—আপাতত কিছুদিন এখন থাকবে, এমনই ত স্থির হয়েছে।"

"আমার কাছে আর আসবে না সে, দাদামশায়—কখনও আর আসবে না ?"

ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্বর ফুটিল না। জ্যাক শরীরটাকে আর খাড়া রাখিতে পারিল না। মাথা তাহার ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল, দেহে এতটুকু বল নাই। নিকটে একটা বেঞ্চ ছিল। থপ্ করিয়া সে তাহাতে বসিয়া পড়িল।

শীতের কুয়াশার মধ্য দিয়া দিনের সূচনা অপূর্ব্ব রাগে তখন দেখা দিয়াছে। অদূরে সম্মুখস্থ জমিতে কলাইয়ের ক্ষেত হরিদ্রাবর্ণের অজস্র ছোট ফুলে আলো হইয়া রহিয়াছে। বড় গাছের পাতার ফাঁকে কুয়াশার আড়ালে অগ্নিচক্রের মত লাল সূর্য্য উঁকি দিতেছে। জ্যাক সকলই দেখিল। এক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা তাহার মনে পড়িল। সে ও সেসিল যখন পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে বেড়াইতে গিয়াছিল, প্রকৃতি তখন কি অপূর্ব্ব শোভায় ঝলমল করিতেছিল। সেই অজস্র শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চিত্ত সেসিলের প্রতি কি অসহ্যভাবে আকৃষ্ট হইল! তার পর সেসিলের সুমধুর আশ্বাসে সে আকর্ষণ আজ একান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে! দিনে দিনে সে আকর্ষণের বেগ কি গভীর বাড়িয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সহসা এ কি—! কোন্ বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সে আকর্ষণ সহসা চকিতে আজ এমন স্তম্ভিত রুদ্ধ হইয়া গেল!

ডাক্তার জ্যাকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "জ্যাক, হতাশ হয়ো না। এখনও তার মত বদলাতে পারে। ছেলেমানুষ—কি রকম এ একটা খেয়াল শুধু, না হয় তামাসা!"

"না দাদামশায়, আপনি তাহলে সেসিলকে জানেন না! খেয়াল বা তামাসা কাকে বলে, সেসিল তা জানেও না! শুধু খেয়ালের ঝোঁকে একটা বুক সে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে—? না, না, তা হতেই পারে না। এ সঙ্কল্প জানাবার আগে এ বিষয়ে রীতিমত সে ভেবেছে, জানবেন। সে জানত, জানেও, যে, তার ভালবাসা, —আমার কাছে কি তার মূল্য! আমার জীবনের উপর কি তার শক্তি! সেই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে, আমার জীবনটা একেবারেই উবে যাবে! তবু যদি তাই সে ঠিক করে থাকে, তাহলে সে তা কর্ত্তব্য ভেবেই করেছে। আমারও আগে এটা বোঝা উচিত ছিল। এত সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটবে—এ কি সম্ভব, দাদামশায়? আপনি জানেন না, আমার নিজেরই সব সময় এটা ঠিক বিশ্বাস হত না! এত সুখ আমার বরাতে সইবে কেন? চিরকাল যার দুঃখে কষ্টে, দারুণ দুর্দ্দশায় কেটে এসেছে, এমন স্বর্গ-সুখ তার কপালে? পথের ভিখারী রাজ-সিংহাসনে বসবে! তা কি হতে পারে, দাদামশায়?"

জ্যাকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। সবলে তাহা সে রোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার রিভাল তাহার দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, "জ্যাক, আমায় ক্ষমা কর, তুমি। এ আঘাতের জন্য আমিই দায়ী! আমি ভেবেছিলুম, দুজনেই তোমরা এতে সুখী হবে। কিন্তু ভুল, ভুল ভেবেছিলুম, আমি। মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন, এ কথাটা তখন আমি ভাবিনি।"

"না দাদামশায়, আপনি তার জন্য দুঃখ করবেন না। অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে। সেসিল—সে স্বর্গের দেবী—আমার ভালবাসা অত উঁচুতে তার কাছে পৌঁছুবে কেন? আমার উপর তার অসাধারণ করুণা ছিল, তাই আমি ভুল করেছিলুম ভুল বুঝেছিলুম। এখন আমি তার কাছ থেকে দূরে আছি—সেসিলও ভাল করে সমস্তটা বুঝে দেখবার অবকাশ পেয়েছিল—বুঝে সে দেখেছে, এ বিয়ে হতে পারে না। তার জন্য আপনি দুঃখ করবেন না, দাদামশায়। তবে হাঁ, একটা কথা—সেসিলকে বলবেন, এ আঘাত আমার বুকে যতই বাজুক, তার উপর আমার এতটুকু রাগ বা দ্বেষ নেই। চিরদিন আমি তার মঙ্গলই প্রার্থনা করব! সে আমার কাছে যেমন দেবী ছিল, আজীবন তেমনই দেবী সে থাকবে!"

পরে মাথার উপর আকাশ, পাশে ক্ষেত, বন প্রভৃতির দিকে চাহিয়া জ্যাক আবার কহিল, "আর বছর ঠিক এমনই সময়ে সেসিলকে আমি প্রথম এক নতুন চোখে দেখতে সুরু করেছিলুম—আমার মনে হয়েছিল, সেসিলও বুঝি আমায় তেমনই ভালবাসে। তার পর থেকে আমার এই বাকী দিনগুলো যে কি সুখে কেটেছে, তা আমিই জানি! তেমন সুখ পৃথিবীতে মিলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না! সেদিন আমি যেন নতুন করে জন্ম নিলুম,—আর আজ? আজ আমার মৃত্যু হল! এই এক বৎসর যে অতুল সুখ আমি ভোগ করেছি, তা শুধু আপনার আর সেসিলের দয়ায়! জীবনে আমি তা কখনও ভুলব না!"

তাহার পর ধীরে ধীরে জ্যাক রিভালের কম্পিত হস্তের বন্ধন খুলিয়া লইলে ডাক্তার কহিলেন, "তুমি চলে যাচ্ছ, জ্যাক? এখানে আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে না?"

"পারব না, দাদামশায়! আমায় ক্ষমা করবেন,—আমার মনের অবস্থা ভারী খারাপ। আহারে রুচিও নেই! আমায় ক্ষমা করুন।"

জ্যাক চলিয়া গেল। কোন দিকে একবারও সে ফিরিয়া চাহিল না, নত দৃষ্টিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়া ঘরের জানালার পানে একবার যদি সে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, সেই খোলা জানালার পাশেই সেসিল দাঁড়াইয়াছিল। কি বিবর্ণ পাণ্ডু তাহার মুখ! চোখ অশ্রু-পরিপ্লুত! কম্পিত শীর্ণ দেহ! সেসিল জ্যাককে দেখিল—দেখিল, সে ধীর পদে নত দৃষ্টিতে চলিয়া যাইতেছে! যেন একটা প্রাণহীন দেহকে কোন্ অনৈসর্গিক শক্তি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

পরের কয়টা দিন রিভাল-গৃহ যেন এক নিরবচ্ছিন্ন শোকের রাগিণীতে ভরিয়া রহিল। এমনই নিরানন্দভাবে দিন কাটিতে লাগিল। গত কয়মাস ধরিয়া যে আনন্দ-ধারা সারা গৃহে বসন্ত বায়ুর মতই ছুটিয়া গিয়াছে, সহসা আজ যেন তাহা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ধারার শেষ স্রোতটির সহিত গৃহের প্রাণটুকুও যেন বিদায় লইয়া গিয়াছে!

রিভাল বিষণ্ণ চিত্তে সেসিলের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেন। এখন আর তাঁহার কাছে সে বড় একটা আসে না, নির্জ্জনে থাকে, কখনও বা বাগানের প্রান্তে নিজের মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার মার ঘর, এত দিন যে ঘর একরূপ বন্ধই ছিল, তাহা সে আবার খুলিয়াছে। সেই ঘরে অতীত দুঃখের যে সহস্র স্মৃতি নীরবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেসিল আবার তাহাদের সাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে জানালা খুলিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া মাদ্‌লীন বসিয়া থাকিত—এবং তাহার অশ্রুরুদ্ধ নয়নের সম্মুখে চারিধার অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া যাইত, ঠিক সেই জানালাটির পাশেই সেসিল তেমনই ভাবে বসিয়া থাকে। রোগী দেখিয়া রিভাল গৃহে ফিরিলে দৈবাৎ যদি কোন দিন সাড়া পাইয়া সেসিল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে ত দাদামশায়ের সহিত অত্যন্ত মৃদু কম্পিত স্বরে দুই চারিটা মাত্র কথা কহিয়াই সে ভোজের টেবিলে গিয়া বসে। যেদিন সাড়া না পায়, সেদিন তাহার হুঁসও থাকে না।

সেসিলকে খুঁজিয়া না পাইয়া ডাক্তার নীরব চরণে মাদ্‌লীনের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিতেন, "সেসিল—"

সেসিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িত, নতমুখে দাদামহাশয়ের সম্মুখে আসিত। তাড়াতাড়িতে চোখের জল মুছিবারও তাহার অবকাশ মিলিত না। তাহার সিক্ত পক্ষ্মই ডাক্তারের কাছে স্পষ্ট ধরাইয়া দিত। বৃদ্ধ রিভাল বলিবার মত একটি কথাও খুঁজিয়া পাইতেন না। কি বলিবেন তিনি? কিসের সান্ত্বনা দিবেন? কি জানি, নাড়া পাইলে সেসিলের সারা চিত্ত যদি সহসা আবার দারুণ শোকে ঝরিয়া পড়ে!

ডাক্তার অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ব্যাপার কি? এ যে মাদ্‌লীনের অবস্থার সহিত হুবহু সব মিলিয়া যাইতেছে। তেমনই বিশৃঙ্খলা! অশ্রুর নির্ঝর তেমনই উথলিয়া উঠিয়াছে! তবে কি সেসিলও বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া পলাইবে? কেন? তাহার এ দুঃখ, কিসের জন্য? জ্যাককে যদি সে আর ভাল নাই বাসিবে, তবে কিসের এ বেদনা? নির্জ্জনে থাকিবার জন্য অহরহ কেন এ প্রয়াস? আর যদি ভালই বাসে, তবে কেন তাহাকে এ-ভাবে সে বিদায় দিল? ডাক্তার ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে! কিন্তু কি সে রহস্য—? কি সে? তাহা কি এমনই গোপনীয় যে দাদামহাশয়ের নিকটও অসঙ্কোচে খুলিয়া বলা চলে না? কিন্তু সেসিলকে এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করিতেও তাঁহার সাহস হইত না।

সেসিলের দুঃখে জ্যাকের কথা রিভাল একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। রোগীর বাড়ী নাড়ী দেখিতে গিয়াও মাঝে মাঝে তাঁহার কেমন গোল বাধিত, দুই-একটা ভুল হইয়া যাইত! তাঁহার সেই হাস্যময় প্রসন্ন ললাটে ঘন কালো রেখা পড়িয়াছিল। তবু এ রহস্য মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছিল না।

সহসা এক গভীর রাত্রে ডাক্তারের ঘণ্টায় সঘন রব উঠিল। কোন্ রোগীর গৃহে ডাক পড়িয়াছে! ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধা সেল-গৃহিণী ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ডাক্তারকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া পড়িল, তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে বুঝি আর বাঁচানো যায় না। মৃত্যুর সহিত কয়দিন ধরিয়া কঠিন সংগ্রাম চলিয়াছে—কিন্তু এবার বুঝি মৃত্যুরই জয় হয়! বৃদ্ধার অদৃষ্ট মন্দ, তাই সে গরিবের মা-বাপ দয়াল রিভালের কাছে না আসিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়াছিল। এখন একবার তাঁহাকে যাইতেই হইবে, নহিলে বৃদ্ধা এখানে রিভালের পায় পড়িয়া প্রাণ দিবে।

বৃদ্ধের প্রাণ গলিয়া গেল। তখনই তিনি সেল-গৃহিণীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। দারুণ শীতের রাত্রি—ঠাণ্ডা বাতাসের অত্যাচারের অভাব ছিল না—হাড় অবধি ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে, তবু আর্ত্তের আহ্বানে বৃদ্ধ অবিচলিত চিত্তে ছুটিয়া চলিলেন।

আরাম-কুঞ্জের পার্শ্বেই সেলের কুটীর। সেখানে পৌঁছিয়া ডাক্তার দেখিলেন, শীতল ভূমির উপর ছিন্ন মলিন শয্যায় একখানা শীর্ণ কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল—ঘরটাকে দারুণ শীতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় এককোণে কয়েকখানা কাঠে আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তথাপি সে ক্ষুদ্র গৃহে মৃত্যুর হিম বায়ু হু-হু করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। সহসা একটা উৎকট দুর্গন্ধ ডাক্তারের নাসাবন্ধ টাকে যেন জ্বালাইয়া দিল! তিনি কহিলেন, "কিসের গন্ধ এ, মাদাম সেল ?"

একটা ঢোক গিলিয়া সেল-গৃহিণী কহিল, "ঐ ডাক্তার দিয়েছিল —কতকগুলো পাতা ঘরে জ্বালাবার জন্য—"

"ডাক্তার —? কোন্ ডাক্তার ?"

"ঐ যে, ও বাড়ীতে ছিল—হারুজ্ না কি নাম !"

বিভাল তাহাই অনুমান করিয়াছিল। হারুজকে সম্প্রতি পথে একদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, বটে! সে-ই তবে এই নিরীহ বৃদ্ধ কৃষককে মৃত্যুর পথে এমন করিয়া ঠেলিয়া আনিয়াছে! পারির আদালতে দুইবার জরিমানা দিয়াও তাহার এ দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইল না। করবেইয়ের কয়েকজন মূর্খ কৃষককে মৃত্যুর গ্রাসে ফেলিয়া একবার সে জেলও ঘুরিয়া আসিয়াছে, তবুও নিবৃত্তি নাই! চৈতন্য ফিরিল না !

বৃদ্ধ সেলের নিকট গিয়া ডাক্তার ডাকিলেন, "সেল !"

"এই যে—এই যে, আপনি এসেছেন। আমি আর বাঁচব না। বেশী দেরীও নেই—বেশ বুঝছি, আমি। বুকের ভিতর জ্বলে-জ্বলে উঠছে। জিভ খসে যাচ্ছে—"

বিভাল সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ভয় কি ? কি কষ্ট হচ্ছে, বল, আমি ব্যবস্থা কচ্ছি !"

"আর ব্যবস্থা ? কিছু না—কিছু না ! ঠিক শাস্তি হয়েছে আমার ! যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি !"

"কি হয়েছে, তোমার ? এ-রকম বকছ কেন ?"

"কেন ? কেন বকছি ? শুনুন, শুনুন, তবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এমন দেবতার আমি সর্ব্বনাশ করেছি। কেন ? কেন ? শুধু দুটো টাকার লোভে !" পরে পত্নীর দিকে চাহিয়া সেল কহিল, "বল্ বল্, সব কথা খুলে বল্, নিজের মুখে সব পাপ স্বীকার কর্—না হলে মরেও আমি নিশ্চিন্ত হব না। বল্, বল্, খুলে বল্। কিছু লুকোস্ নে !"

তখন সেল-গৃহিণী চক্ষু মুদিয়া ক্রন্দন-জড়িত স্বরে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—বৃদ্ধ সেল বহুদিন হইতে রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় সংসার অচল দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় দৈবাৎ একদিন ডাক্তার হারুজ্ এক প্রস্তাব লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিল। একটা সংবাদ যদি তাহারা ডাক্তার বিভালের নাতিনী সেসিলের কর্ণগোচর করিতে পারে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সেলকে ত সে আরোগ্য করিয়া দিবেই, তাহার উপর কুড়ি ফ্রাঙ্ক বখশিশও মিলিবে! এ প্রস্তাবে প্রথমে তাহারা রাজী হয় নাই। কিন্তু উদরে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, —রোগে, অনাহারে মতিরও স্থিরতা ছিল না—তাহার উপর এই অসহায় অবস্থা! দারিদ্র্যে পড়িলে লোকের বুদ্ধি একেবারেই লোপ পায়! কাজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। তাই তাহারা সেসিল ঠাকুরাণীকে সে নিষ্ঠুর সংবাদ দিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সেই অবধি মনে তাহাদের শান্তি নাই —রোগও রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছে! বৃদ্ধ সদাশয় বিভালের উপর অত্যাচার ভগবান সহিবেন কেন ? সে পাপের চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ হইতেছে—তবু ডাক্তারকে ডাকিয়া এ পাপের কথা না শুনাইলে মরণেও জ্বালা জুড়াইবে না, তাই তাঁহাকে এ রাত্রে তাহারা কষ্ট দিয়াছে —সেলের চিকিৎসার জন্য নহে।

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি ? কি সে খপর ?"

সেল-গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সেই সর্ব্বনেশে কথা, সেসিল ঠাক্‌রুণের মা-বাপের কথা !"

"পাষণ্ড সব—" দপ্ করিয়া বিভালের অন্তর দারুণ রোষে জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধার শুষ্ক হাত দুইটা ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া বিভাল কহিলেন, "এ কথা বলেছ তুমি ? তাকে বলেছ ? বল।" সে স্বরে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

"টাকার লোভে এ পাপ করেছি শুধু,—তুচ্ছ টাকার লোভে ইহকাল পরকাল সব হারিয়ে বসেছি। এ সব কথা আমরা কিছু জানতুমও না বাবা, সেই হতভাগা ডাক্তারই সব বলেছিল।"

"বুঝেছি সব।" ডাক্তার সেল-গৃহিণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন; পরে অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "এমন করে সে শোধ নিলে! কিন্তু এ-সব কথা কার কাছ থেকে শুনলে সে। জানলে কোথা থেকে ?" বিভাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সারা রাত্রি ধরিয়া বৃদ্ধ সেলের জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়াও বিভাল সেলকে বাঁচাইতে পারিলেন না। উষার প্রাক্কালে বৃদ্ধ সেল অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা হইতে যখন মুক্তিলাভ করিল এবং বৃদ্ধা সেল শবের পার্শ্বে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, ডাক্তার বিভাল তখন ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বিদায় লইলেন।

একটি রাত্রি তাঁহার দেহে ও মনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। তাঁহার শুধু মনে হইতেছিল, এমন চক্রান্ত, এমন নিষ্ঠুর হীন ষড়যন্ত্রও মানুষের মাথায় উদয় হইতে পারে!

ডাক্তার গৃহে ফিরিলেন; পথে আরাম-কুঞ্জের দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে ভুলিলেন না। তখনও তাঁহার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল! ডাক্তার হারুজের সৌভাগ্য যে সে পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল—নহিলে আজ বৃদ্ধের হস্তে পরিত্রাণ-লাভের তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

গৃহে ফিরিয়া প্রথমেই তিনি সেসিলের ঘরে প্রবেশ

করিলেন। সেখানে কেহ নাই! রাত্রে কেহ শয্যায় শয়ন করিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। তিনি ডাকিলেন "সেসিল"—কেহ সাড়া দিল না। তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি ডাক্তারখানায় গেলেন। কৈ, সেখানেও ত সেসিল নাই। তবে কোথায় সে? কোথায়? ডাক্তার মাদ্লীনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অতীত শোকের স্মৃতি যেখানে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিরাট সমাধি-মধ্যে,—ঐ যে সেসিল। কৌচের উপর মাথা রাখিয়া সেসিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখের কোণে জলের দাগ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহারই কালো ছাপ মুখে-চোখে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার ধীরে ধীরে সেসিলের মাথায় হাত রাখিলেন। সেসিল চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, "দাদামশায়—"

"বুঝেছি সেসিল—এই সব লক্ষ্মীছাড়া হতভাগার দল, এরাই তোমায় সব কথা বলে গেছে, যে কথা এত যত্ন করে এতদিন ধরে তোমার কাছ থেকে আমরা গোপন করে রেখেছিলুম। ভগবান---এত চেষ্টা, সব মিছে হল। এ বাজ সে সলের বুকে পড়লই! সে বাজ আবার এই সব নারকার হাত থেকে!

বৃদ্ধ মাতামহের বুকে সেসিল মুখ লুকাইল; বলিল, "না দাদামশায়, বলো না, আমায় কিছু বলো না। আমার নিজের মনে কি লজ্জা, কি দারুণ ধিক্কার জমে রয়েছে!"

"তবু আমায় বলতেই হবে, সেসিল। আমি যদি একটু আগেও বুঝতে পারতুম—কেন, তুমি জাককে বিদায় দিলে! এই জন্যই শুধু—না?"

"হাঁ।"

"কেন, শুনি। আমায় বল, দিদি!"

"মার এ কলঙ্কের কথা আমার মুখ থেকে বেরুবে না, কখনও না! তবু, যে আমায় বিয়ে করবে, আমি যার স্ত্রী হব, এ ঘটনার কিছুই সে জানবে না? তাকে এত বড় কথা প্রকাশ করে না বলা আমার অন্যায়—শুধু অন্যায় নয়, পাপও! অথচ নিজের মার এই কলঙ্কের কথা—! তা-ও বলা যায় না। কাজেই আমার এক পথ ছিল—আমি সেই পথ নিয়েছি।"

"তবে এখনও তুমি তাকে ভালবাস? বল, বল সেসিল।"

"বাসি, বাসি, দাদামশায়—সারা প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে ভালবাসি! জাকও আমায় তেমনই ভালবাসে—এ বিয়ে যদি না হয়, তবুও সে আমায় ভুলবে না, কখনও না, দাদামশায়। আমিও তাকে ভুলতে পারব না! কখনও না! তবু এ ত্যাগ আমায় স্বীকার করতেই হবে। নাম-হীনা এক কলঙ্কিনীর মেয়েকে সাধ করে কে করে ঘরের গৃহিণী করে, দাদামশায়?"

"তুমি ভুল করেছ, সেসিল, মস্ত ভুল করেছ। তোমায় বিয়ে করতে জাকের কতখানি সাধ! এ বিয়েতে শুধু যে সে সুখী হত, তা নয়, গর্ব্বও বোধ করত—তবু সে এ-সব কথা জানত। আমি নিজেই তাকে সব কথা খুলে বলেছিলুম।"

"দাদামশায়—"

"সেসিল, আমায় যদি তুমি সব কথা তখন খুলে বলতে, তা হলে আজ তিনজনকে এ কষ্ট ভোগ করতে হত না!"

"জাক জানে দাদামশায় যে, আমি কে,—আমার পরিচয়?"

"জানে, সব জানে। আমিই তাকে বলেছিলুম—সে আজ এক বছরের কথা। যেদিন প্রথম সে এসে আমায় বলে, তোমায় সে ভালবাসে, সেইদিনই তার কাছে তোমার পরিচয় আমি খুলে বলি।"

"তবুও সে আমায় বিয়ে করতে রাজী হল?"

"সে যে তোমায় বড় ভালবাসে, সেসিল। তা-ছাড়া তারও অদৃষ্ট তোমারই মত। তারও বাপ নেই, পরিচয় নেই। ইদা কুলত্যাগিনী—ইদার কুলত্যাগের পর জাকের জন্ম হয়। তবে তফাৎ এই, তোমার মা ছিলেন দেবী, আর তার মা—"

ডাক্তার রিভাল তখন সেসিলের নিকট জাকের ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। এই শান্ত নিরীহ বালকের জীবনের উপর দিয়া কি মহাঝড় বহিয়া গিয়াছে, কি গভীর দুঃখে-কষ্টে আপনাকে সে গড়িয়া তুলিয়াছে! শৈশবে দারুণ উপেক্ষা, যৌবনে নিষ্ঠুর নির্ব্বাসনের মধ্য দিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে—সে সমস্ত কথা রিভাল সেসিলের নিকট খুলিয়া বলিলেন। বলিতে বলিতে অতীত-বর্ত্তমানে মিলিয়া কাহিনীটি করুণ বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সব কথা ডাক্তারের নূতন করিয়া যেন মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এখন বুঝেছি, সেসিল, এ কথা কোথা থেকে প্রকাশ হল। এ তার কাজ, জাকের মার—তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সেই—সেই প্রগল্‌ভা নারীর রসনাই তোমাদের মধ্যে এ বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে। যে কথা কখনও তোমায় খুলে বলব না স্থির করেছিলুম, সে কথা তারই মুখ থেকে বেরিয়েছে! আহা বেচারা, বেচারা জাক! তার মা তাকে জীবনে কোন দিনই সুখী হতে দিলে না,—চিরদিন তার সুখে ব্যাঘাত দিয়ে আসছে।"

সেসিলের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। দারুণ নৈরাশ্যে সমস্ত ভবিষ্যৎ সঘন অন্ধকারে সে আচ্ছন্ন দেখিল। কি করিলে এখন এ আঁধার কাটে? সব যেমন ছিল, আবার তেমন হয়? জাক! বেচারা জাক আমার! একবার তুমি ফিরিয়া এস। সেসিল তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে! তুমি ছাড়া সেসিলের আর কে

আছে, জাক! কেউ নাই—আর কাহাকেও সে চাহে না! কোন দিনই চাহে নাই! তুমি এস, এস জাক—সেসিল তোমার দাসী, তাহাকে তোমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় দাও। সেসিল কাঁদিয়া ফেলিল।

রিভাল কহিলেন, "জাক বেচারা তোমার কথায় বড় কষ্ট পেয়ে গেছে—"

"সে আর কোন চিঠি লেখে নি, দাদামশায়?"

"না। কিন্তু তোমার সঙ্গেও কি সে মোটে দেখা করে নি, সেসিল?"

"না। আর কখনও সে এখানে আসবে না, দাদামশায়।"

"তবে চল, সেসিল, আমরাই তার কাছে যাই। সে বেশ হবে। আজ রবিবার, তার ছুটি আছে—বাসাতেই তাকে পাব'খন—নিশ্চয়। দুজনে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি, চল। যাবে দিদি?"

"যাব—এখনই চল, দাদামশায়।"

তখন সেসিলকে লইয়া রিভাল অবিলম্বে পারি যাত্রা করিলেন।

ইহার ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটি লোক আসিয়া রিভাল-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—পৃষ্ঠে টুপির প্রকাণ্ড বোঝা। টুপির বোঝা নামাইয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া পিতলের পাতে ক্ষোদা লেখাটুকু অতি কষ্টে বানান করিয়া সে পড়িল, "—ডা—ক্তা—রে—র—ঘ—ণ্টা।"

"এই যে—" বলিয়া সে দাঁড়াইয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল। পরে ঘণ্টায় ঘা দিল। একজন দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই?"

"ডাক্তারকে—"

"তিনি বাড়ী নেই।"

"তাঁর একটি নাতনীও এখানে থাকেন, না?"

"তিনিও নেই।"

"কখন্ ফিরবেন?"

"জানি না।"

ভিতর হইতে দ্বার আবার সশব্দে বন্ধ হইল। লোকটি ফটকের সম্মুখে কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল এখন তবে উপায় কি? তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। চোখের জল মুছিয়া কপালে দুই হাত চাপড়াইয়া অস্ফুট স্বরে সে কহিল, "হা ভগবান! এমন করে বিনে চিকিচ্ছেতেই কি বেচারা তাহলে মারা যাবে!"

একটা কাতর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

হাসপাতালে

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই "ভবিষ্য জাতির আলোচনার" সম্পাদক-গৃহে সাহিত্যের আসর জমিয়া উঠিয়াছিল। উপেক্ষিত অনাদৃত সাহিত্য-বন্ধুগুলি সকলেই তথায় উপস্থিত ছিল। শুষ্ক মুখ, ঈর্ষাক্ষরিত দৃষ্টি—প্রতিভার হতভাগা পুত্রের দল ছিন্ন মলিন বেশে সাধ্যমত পারিপাট্য সাধন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আর্জান্ত-গৃহে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, আর্জান্ত নিমন্ত্রণ-পত্র ঝাঁটার মত এই সমস্ত জঞ্জালকে ঝাঁটাইয়া এক জায়গায় জড় করিয়া দিয়াছে।

ইদা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। কবি-প্রিয়া কবির বাহু-বন্ধনে আবার আসিয়া ধরা দিয়াছে, সেই জন্যই আজ এ "পুনর্ম্মিলনোৎসবের" আয়োজন। উৎসবে আর্জান্ত-রচিত বিরাট বিরহ-কাব্য "প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ" পঠিত হইবে।

ইদা ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন এ বিরহ-গানের সার্থকতা কি! তাহারই সম্মুখে তাহার অদর্শন-জনিত বেদনার ভার এমনভাবে ছড়াইয়া দিলে, কাহার মর্ম্মই বা তাহাতে উদ্বেলিত হইবে? সার্থকতা নাই থাকুক মর্ম্ম উদ্বেলিত নাই হোক,—ঘটনা-চক্রের সকৌতুক আবর্ত্তনে এমন একটা বিরাট কাব্য তাই বলিয়া ত মাটি হইয়া যাইতে পারে না! বিষয়টা লইয়া বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আর্জান্তের বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল! কেহ বলিল, "ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। প্রিয়ার পাশে বসে প্রিয়ার অদর্শনে হা-হুতাশ—এমন পাজ কৈ আর কেউ করে নি ত!"

আর্জান্ত কহিল, "নাই করুক। প্রতিভা কখনও গতানুগতিক পথে চলতে পারে না।" তাহার মুখের কথা লুফিয়া একজন ভক্ত—সে বেচারা তিন দিন অনশনে কাটাইয়া আর্জান্তের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিল—সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "বয়ে গেল! স্ত্রী ফিরে এসেছে, তাতে কি। তার জন্য আর্টকে ত মেরে ফেলা যায় না!" আর্জান্ত কহিল, "ঠিক ত—এই ত সমঝদারের কথা। বিরহ চুলোয় যাক—আর্ট আর্ট।"

এই আর্টের খাতিরেই আর্জান্তের গৃহ আজ সুখাদ্যের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে,সাহিত্যিক মহারথিবৃন্দের কল-কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে! সন্ধ্যার বাতি জ্বালিলে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড একটা টেবিলের এক পার্শ্বে আর্জান্ত ও ইদা—তাহাদিগকে ঘিরিয়া লাবাস্যাঁন্দ্র-মোরোনভার দল বসিয়া গিয়াছে। লাবাস্যাঁন্দ্র্ পিয়ানোতে ঘা দিয়া খানিকটা চীৎকার করিল। সে থামিলে আর্জান্ত বিচিত্র ভঙ্গীতে কাব্য-পাঠে কণ্ঠ খুলিয়া দিল।

সে এক অপূর্ব্ব কৌতুককর ব্যাপার। কবি তাহার প্রিয়ার অদর্শনে ব্যথিত চিত্তের বিলাপ উচ্ছ্বাসে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই প্রিয়া কি "নিষ্ঠুরা," "হৃদয়হীনা, "পাষাণী," "দুষ্টা"! অভিধান হইতে অভিযোগের সব সম্বোধন-গুলিকে টানিয়া আনিয়া এ কাব্যে আসন দেওয়া হইয়াছে! গোলাপী ফিতায় কোণ-ফোঁড়া প্রকাণ্ড খাতার মধ্য হইতে আহা-উহুর ধারা অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। শুনিয়া ইদার কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল—ভক্তের দল যে কাব্য-সুধাপানে বিভোর হইয়া উঠিল। কাব্যের শেষে আবার একটু 'উপসংহার' ছিল—নূতন কয়েক ছত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবি পড়িল, "—সেই শয়তানী নারী ফিরিয়া আসিয়াছে—সেই দাসী আজ আসিয়া আবার এই পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে—এই সেই দুষ্টা দাসী, আমার চরণ-তলে!" ভক্তের দল করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "জয় জয় কবি, তোমারই জয়!"

করতালির দারুণ ঘটাতেও কবির চিত্ত তৃপ্তি মানিল না। পত্রিকাখানি আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এখন প্রতি মাসের পরিবর্ত্তে বৎসরে দুই-চারিবারমাত্র দৈবাৎ তাহা প্রকাশিত হয়। পাংলা জীর্ণ কাগজ—কালির রেখায় ভাঙ্গা অক্ষরে পৃষ্ঠাগুলি পরিপূর্ণ, শুধু বাহিরের মলাটটি জমকালো। তাহারে লাল কালিতে ছাপা—মধ্যে কৈফিয়ৎ আঁটা—ছাপাখানার গোলযোগে প্রকাশে বিলম্ব হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিহার্য্য ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, ছাপাখানার গোলযোগ কোন-মতে কাটিয়া গিয়াছে; এবার হইতে ঠিক নিরূপিত সময়েই পত্রিকা বাহির হইবে।

কিন্তু এ আশ্বাসেও এতটুকু লাভ ছিল না। পত্রিকা তাহার শেষ নিশ্বাসটুকু ছাড়িবার জন্য শুধু একটা অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন দিনে শার্লৎ ফিরিয়া আসিয়া কবির হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া কহিল, "এসেছি, ওগো কবি, আমি এসেছি—আজ থেকে আমি তোমার, তোমারই শুধু!"

আর্জ্জান্ত নির্ব্বোধ বা শয়তান যাহাই হৌক্—এই দুর্ব্বলা নারীর উপর তাহার প্রভাব অসাধারণ ছিল। আপনার গর্ব্ব-আস্ফালনের যন্ত্র-স্বরূপ এই নারীকে না পাইলে তাহার চলেও না—ইদাকে তাহার চাই-ই। এই অনাদৃত কবিদেবতাটি সহস্র নির্য্যাতনে তাহাকে পীড়িত ব্যথিত করিলেও ইদার তাহাতে দুঃখ ছিল না। এত বড় কবির সঙ্গ-সুখ-লাভে এতদিন বঞ্চিতা থাকিয়া কবির প্রতি তাহার অনুরাগ এবার যেন দ্বিগুণভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আহা, অনাদৃত উপেক্ষিত কবি,—বাহিরের সহিত প্রবল সংঘর্ষে কাতর হইয়া পড়িতেছে, তবুও তাহার সাধনার বিরাম নাই! বাহিরের লোকগুলা কোন্ মায়াবলে কবির অন্তরের ভাবরাশি কোনমতে জানিয়া লইয়া ছন্দে নাটিকায় উপাখ্যানে জন-সমাজে তাহা প্রচার করিয়া দেশের লোকের বাহবা লইতেছে! আর তাহার প্রিয় কবিটি এই নিভৃত নীড়ের মধ্যে বসিয়া দারুণ ঈর্ষার বিষে শুধু জর্জ্জরিত হইয়া মরিতেছে! দুর্ভাগা কবির প্রতি এই ভক্ত নারীর এতখানি সমবেদনার ইহাই এক প্রধান কারণ ছিল। ইদাই শুধু এ দুঃসময়ে কবির চিত্তে প্রতিভার দীপটিকে নিবিতে দেয় নাই—দুই হাতে নিরাপদ অন্তরাল রচনা করিয়া ঈর্ষার প্রলয়-ঝঞ্ঝা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। একবার শুধু একটু অবসর পাইলে হয়! আর্জ্জান্তের প্রতিভার দীপ অমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে,—নিশ্চয় জ্বলিবে। সে আলোর উজ্জ্বল রেখায় বিশ্বের লোক মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিবে—কি দেখিবে? শুধু কি তাহাদের কবিটিকে দেখিয়াই তাহারা চরিতার্থ হইবে? না। তাহার পার্শ্বে কবির প্রতিভা-দীপে তৈল-দান-রতা এই নারীকেও কি তাহারা এতটুকু কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবে না? এ একটি মাত্র আশা শুধু ইদাকে শত নির্য্যাতনেও কাতর করে নাই!

এই যে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত সংগ্রাম চলিয়াছে—প্রতিভাকে চাড়া দিয়া দাঁড় করাইবার জন্য এই অকাতর পরিশ্রম—যে সংগ্রামে কবির অপর সঙ্গীর দল,—কেহ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে, কেহ-বা ক্ষেত্র-প্রান্তে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে—ইহার মধ্যে—এই বিরাট বিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র কবিই শুধু বিজয়-গর্ব্বে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! অগাধ জলরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ-খণ্ডের মত জাগিয়া রহিয়াছে—প্রলয়-পয়োধি কিছুতেই তাহাকে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই!

কাব্য-পাঠ তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভক্তের দল কাব্য-সৌন্দর্য্যের মোহটুকু তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই; ইদার চোখের কোণে অশ্রুর রাশি আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, বহু চেষ্টায় ইদা তাহা ঝরিতে দেয় নাই, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একটা লোক মাদাম আর্জ্জান্তের সহিত দেখা করিতে চাহে! তাহার কি জরুরি প্রয়োজন আছে!

কে যেন মধু-চক্রে ঘা দিল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল—"কে?" "কি চায়?" "কেন এসেছে?" হু-হু করিয়া প্রশ্নের ঝড় বহিয়া গেল।

দাসী কহিল, "একটা লোক।"

"কে লোক?"

"লোকটা যেন পাগল! মাদামের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। আমি বললুম, এখন দেখা হবে না—মাদাম ব্যস্ত আছেন—তবু সে শুনবে না—বলছে, দেখা না করে কিছুতেই সে এখান থেকে নড়বে না। সে বলছে, তার

ভারী দরকার। এই বলে সে চৌকাঠের উপর বসে পড়েছে—কিছুতে উঠছে না!"

শারদেন্দুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "যাই, আমি দেখে আসি!"

আর্জাস্ত তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝটকা দিল, কহিল, "না, না, তোমার যাওয়া হতেই পারে না! লাবাস্যীন্দ্র, তুমি দেখে এস ত হে, ব্যাপারখানা কি!" লাবাস্যীন্দ্র একটা রাগিণীর কথা ভাবিতেছিল, শিস্ দিতে দিতে উঠিয়া গেল।

কবি তখন আপন কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বাধা পড়িল। লাবাস্যীন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কবিকে একান্তে ডাকিল কবি স্তম্ভিতভাবে প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার আবার কি! সেই ছোঁড়াটা একে পাঠিয়েছে—তার অসুখ করেছে।"

"ছোঁড়া! কে ছোঁড়া? জ্যাক—!"

"তা না ত আর কে! লোকটা বলছে, জ্যাকের বড় অসুখ।"

হুঁ! মস্ত চাল চেলেছে, ছোকরা! চল আমি একবার যাচ্ছি।" আর্জাস্ত বাহিরে আসিল। আর্জাস্তকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বেলিসেয়ার।

আর্জাস্ত কহিল, "তোমাকে যে পাঠিয়ে দিয়েছে, বুঝি?

'না মশায়, কেউ আমায় পাঠায় নি। আমি নিজেই এসেছি। তার কি কথা বলবার শক্তি আছে যে পাঠাবে? আজ তিন হপ্তা সে শয্যাগত। ভয়ানক জ্বর—একেবারে বেহুঁস হয়ে আছে।'

"রোগটা কি?"

"বুকের অসুখ। বুকে ভারী ব্যথা, বুক কন কন করছে। ডাক্তারেরা ভয় পেয়েছে, বলছে, আর এক হপ্তাও টেঁকে কি না সন্দেহ তাই আমরা ভাবলুম—আমরা মানে, আমি আর আমার স্ত্রী—ভাবলুম, তার মাকে একবার খপরটা দেওয়া উচিত ত! তাই আমি এসেছি।"

"তুমি কে?"

"আমি? আমি বেলিসেয়ার। জ্যাক আমায় আদর করে 'বেল' বলে ডাকে; তার মাও আমায় চেনেন। 'বেল' বললেই তিনি বুঝতে পারবেন তিনি আমাদের খুব জানেন।"

"শোন, বেল মশায়," কবির স্বরে একটা বিদ্রূপের সুর জাগিয়া উঠিল। কবি কহিল, "বুঝলে বেল মশায়, যারা তোমায় পাঠিয়েছে, গিয়ে তুমি তাদের বলো, এ চাল তারা যা চেলেছে, চমৎকার! কিন্তু এ সব চাল নেহাৎ পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন চাল চালতে বলো, তাতে যদি কার্য্যোদ্ধার হবার সম্ভাবনা থাকে!"

"চাল কি মশায়?" বেলিসেয়ার কবির বিদ্রূপ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "চাল, কি বলছেন? আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, আপনি?"

বেলিসেয়ারের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আর্জাস্ত সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বেলিসেয়ার হতবুদ্ধিভাবে পথের ধারে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—পরে সে-ও ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

আর্জাস্ত ফিরিয়া আসিয়া ইদাকে কহিল, "ও একটা বাজে লোক ভুল করে এ বাড়ীতে এসেছিল!" তখন আবার কাব্যালোচনা চলিল।

কুয়াশা-মণ্ডিত, ক্ষীণ-আলোক-বিচ্ছুরিত পথ ধরিয়া বেলিসেয়ার বাসায় চলিল। পথে সে শুধু ভাবিতেছিল, তাহার বন্ধুর কথা,—জ্যাকের কথা! না জানি, বিছানায় পড়িয়া কি অস্থির ভাবেই সে ছটফট করিতেছে! এতিয়োল হইতে ফিরিয়াই সে জ্বরে পড়িয়াছিল। গা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মতই টকটকে লাল। কপালের শির ফুলিয়া দপ দপ করিতেছিল। তবুও জ্যাক কাহাকেও সে কথা খুলিয়া বলে নাই।

সেই জ্বর-গায়েই পরদিন সে কারখানায় গেল। শেষে দুই দিনের পর যখন একদিন একান্ত কাতরভাবে বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল, তখন বেলিসেয়ারের স্ত্রীই তাহার এ অস্থিরতা প্রথম লক্ষ্য করে। জ্যাকের গায়ে হাত দিয়া সে দেখে, গা পুড়িয়া যাইতেছে। তখনই ডাক্তার আনা হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ললাট কুঞ্চিত করিয়া সংবাদ দিল, অসুখ বড় শক্ত। না সারিবারই সম্ভাবনা,—যদি সারে, তাহা হইলে জ্যাকের পুনর্জন্ম হইবে!

সেই অবধি জ্বরের আর বিরাম নাই। বেগটা কমিলেও জ্বর একেবারে ছাড়ে না, রাত্রে আবার বাড়ে। সেই প্রবল জ্বরে লোক কত-কি বকে! কখনও তৃষিত হৃদয়ে সে মাকে ডাকে, কখনও বা সেসিলের নাম করিয়া শুধু অশ্রু বর্ষণ করে।

মাদাম বেলিসেয়ার আসিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি বেলিসেয়ারকে কহিল, "ওগো, আমি ত গতিক বড় ভাল বুঝছি না—জ্যাকের মাকে একবার খপর দাও। যেমন করে পার, তাকে একবার তুমি নিয়ে এস! মাকে দেখলে ওর প্রাণটা তবু হয়ত বা একটু স্থির হতে পারে! জ্ঞান হলে ও ত ওর মার নাম করে না, রোগের ঘোরেই শুধু করে, এই থেকেই আমি বেশ বুঝছি, দিবারাত্রি ও শুধু ওর মার কথাই ভাবছে।"

তাই বেলিসেয়ার নানা সন্ধান করিয়া সেদিন ইদার বাটীতে গিয়াছিল। কিন্তু ইদা আসিল না—কোন সংবাদও সে পাইল না। নিতান্ত নিরাশ চিত্তে বেলিসেয়ার গৃহে

ফিরিয়া আসিল। বেদনায় প্রাণ তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল!

বেলিসেয়ার যখন ফিরিয়া জাকের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিল, জাকের বিছানার পার্শ্বে মাদাম বেলিসেয়ার ও লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী চুপি চুপি কথা কহিতেছে—আর থাকিয়া থাকিয়া জাকের দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সমস্ত ঘরে যেন একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে। তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া মাদাম বেলিসেয়ার উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "একলা যে?"

তখন বেলিসেয়ার, যাহা ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সব খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মাদাম বেলিসেয়ার শিহরিয়া উঠিল, "মাগো, কি সব রাক্ষস, শয়তান! ছেলেটা মরে, তবু একবার উঁকিটি মারবে না! আর তুমিই বা কেমন লোক—সে বাধা মেনে দিব্যি চলে এলে! শরীরে কিছু মায়া নেই! তুমি চীৎকার করে বললে না কেন, যে মাদাম, তোমার ছেলে জাক বুঝি মরে!"

বেলিসেয়ার বসিয়া পড়িল! গৃহে যে তিরস্কার মিলিবে, এ কথা সে বিলক্ষণ জানিত! কিন্তু উপায় কি? সেই অত লোকের ভিড়ে কি করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ-লাভ করিত? অজস্র গলাধাক্কা দিয়া সেখান হইতে ঠেলিয়া সকলে যে তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিত।

মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "এর চেয়ে যদি আমি যেতুম, তা হলে বোধ হয় কাজ হত!"

বেলিসেয়ার মাথা তুলিয়া নম্র স্বরে কহিল, "কিন্তু ভিতরে তারা যে ঢুকতেই দিলে না আমাকে।"

"ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে হয়—একবার কোন মতে খপরটা দেওয়া, তার পর যা তাদের মন যেত, তাই না হয় করত!"

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী কহিল, "কিন্তু তুমি ত জান না দিদি, এই সব মেয়েমানুষের প্রাণ কি রকম শক্ত, পাথরে গড়া!"

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর রাগ হইয়াছিল। ইদার প্রতি এখন আর তাহার এতটুকুও মমতা ছিল না। অত করিয়া তাহার মন যোগাইয়া খোসামোদ করিয়া সে বেচারী আশা করিয়াছিল, ইদা তাহাকে অর্থ-সাহায্য-দানে তাহার ব্যবসায়ের শ্রী-বর্দ্ধনে সাহায্য করিবে—তা কোথায় সে সাহায্য! বসন-ভূষণে অর্থ ব্যয় করিতে এতটুকু যাহার কৃপণতা নাই, গরীবকে কিছু দিতে গেলেই কি তাহার সেই অর্থে আগুন লাগিয়া যায়। কাজেই ইদার প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ যথেষ্টই ছিল। আজ সেই রোষের খানিকটা প্রকাশ করিতে পাওয়ায় তাহার হাড়েও যেন একটু বাতাস লাগিল!

মাদাম বেলিসেয়ার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "থাক্ গে, ও সব কথা! এখন করি কি? এ অবস্থায় ত ওকে আর ফেলে রাখতে পারিনে! বিনা চিকিৎসায় কি শেষ মারা যাবে? অথচ চিকিৎসা করাতে পয়সাও বড় অল্প লাগবে না—অত পয়সাই বা আমরা পাই কোথা?"

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী কহিল, "তুমি আর কি করবে বল, দিদি? যা না করবার, তোমরা তাই করচ! পরের জন্য এমন কে কবে করে থাকে? তবে আমার পরামর্শ যদি শোন ত বলি—"

"কি?"

"ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেখানে তদারকের অভাব হবে না।"

"চুপ, চুপ—কি বল, তুমি? জাক কি আমার পর—ওকে আমি আমার পেটের ছেলের মত দেখি যে! আহা, বাছাকে কি রোগে যে পেলে—"বেলিসেয়ার-গৃহিণীর চোখে জল আসিল। তাহা মুছিয়া সে বিছানার পানে চাহিল—বিছানাটা খট্ করিয়া একবার নড়িয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জাক পাশ ফিরিল।

মাদাম বেলিসেয়ার চুপি চুপি কহিল, "দেখ দেখি, ও বোধ হয় শুনেছে। ও রকম পড়ে আছে বলে তুমি কি মনে কর ওর জ্ঞান নেই? জ্ঞান বেশ আছে!"

"তাতে আর হয়েছে, কি? আমি কি মন্দ কথা বলেছি? বলি, তুমি যাই ভাব না কেন গো, ও ত আর সত্যিই কিছু তোমার পেটের ছেলে নয়, মার পেটের ভাইও নয়! তোমারও তেমন কিছু অর্থ-বল নেই। হাসপাতালে দিলে তবু ওর চিকিৎসা হবে, তাই আমার বলা।"

বেলিসেয়ার কহিল, "কিন্তু ও যে আমার মিতে।" এতক্ষণ সে কোন কথাই কহে নাই। লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর কথায় সেও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী ব্যাপার বুঝিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

জাক সমস্তই শুনিয়াছিল। পাশে কে কি কথা বলে, সে সমস্তই তাহার কানে যায়। সে শুধু নিরুপায়ে চক্ষু মুদিয়া থাকে। বুকের মধ্যে যে অসহ্য যাতনা আগ্নেয়-গিরির বিরাট দাহের মত অহর্নিশি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার জ্বালায় কথা কহিবার প্রবৃত্তিই তাহার মোটে থাকে না। চক্ষু মুদিয়া সে শুধু আপনার জীবন-নাট্যের প্রতি অঙ্ক প্রতি দৃশ্য পর্য্যালোচনা করে। কি বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে বুকের বেদনা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সে নীরবে শুধু পড়িয়া থাকে। পড়িয়া থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি! প্রকাশ হইয়া পড়িলে এখনই বেলিসেয়ার ও তাহার গৃহিণী অস্থির হইয়া উঠিবে! এই সরল গ্রাম্য নর-নারীর সুগভীর স্নেহ ও অবিরাম সেবায় তাহার প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। কি করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া

য়—ভাবিয়া সে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিত না। আজ লেভ্যাল্‌-গৃহিণীর কথায় সে যেন অকূল পাথারে কূলের সন্ধান পাইল! হাসপাতাল? ঠিক বলিয়াছে। সেখানেই সে যাইবে! তাহাতে আরোগ্য না মিলুক, এই নিরীহ লোক দুইটিকে মুক্তি দিয়া স্বস্তি ত তাহার মিলিবে। কিন্তু কি করিয়া সেখানে যাওয়া যায়? সে যে বহুদূরে! অথচ তাহার এক পা চলিবারও সামর্থ্য নাই!

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া শুধু সে এই কথাই ভাবিতেছিল। এই দেওয়ালের দিকে চাহিয়াই সে শুইয়া থাকিত, চক্ষু মুদিত না। মূক দেওয়াল যদি সে চোখের ভাষা বুঝিয়া কথা কহিতে পারিত ত সে নিশ্চয় বলিত, সে চোখে শুধু পরিপূর্ণ ধ্বংস ও সীমাহীন নৈরাশ্যের কাহিনী গভীর অক্ষরে কে রচিয়া রাখিয়াছে!

একাই সে আপনার বেদনার বোঝা বহন করিত, কাহাকেও তাহার অংশ দিত না। মাদাম বেলিসেয়ারের কথায় অধরে হাস্যরেখা স্ফুচিত করিয়া তুলিবার সে চেষ্টা করিত, কিন্তু জলের রেখার মতই সে হাসি নিমেষে মুছিয়া যাইত, এবং মুখের সেই দারুণ শুষ্কতা ভেদ করিয়া রোগের শীর্ণ ছায়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়িত।

এমনই ভাবে তাহার রোগতপ্ত দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে শ্রমজীবি-দলের কর্ম্ম-কোলাহল ধ্বনিয়া উঠিত, জাকের চিত্ত সে শব্দে কাতর হইত। কেন, তাহাকে দুর্ব্বল রোগাতুর করিয়া রাখিয়াছ, ভগবান। কেন সে আর সকলেরই মত কার্য্যক্ষম, সুস্থ, সবল নহে? জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচনে, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কেন আজ তাহার হাতদুটিকে নিযুক্ত রাখ নাই?

কাজ! কিন্তু কাহার জন্য জাক আজ কাজ করিবে? কিসের আশায়? মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, শেষে সেসিলও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে! এখন তবে কাহার মুখ চাহিয়া, কাহার সুখের জন্য সে কাজ করিবে, মানুষ হইবে? তাহার আজ আর কে আছে, কি আছে, যাহার আশায় অলস ক্ষুব্ধ চিত্তটাকে উত্তেজনায় আশার রাগিণীতে সে মাতাইয়া তুলিবে? আজ তাহার কেহ নাই, কিছু নাই! তবে আর এ জীবনে সংগ্রাম করিয়া লাভ কি? জয়ের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—গা এলাইয়া দিয়া বিপুল পরাজয়ের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। ক্ষতি কি।

পরদিন প্রত্যূষে মাদাম বেলিসেয়ার জাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, দেওয়ালে হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জাক বেলিসেয়ারের সহিত কি তর্ক করিতেছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি জাক, তুমি উঠেছ যে! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়—এখনও তুমি ভারী দুর্ব্বল। দাঁড়াবার মেহনৎ সহ্য হবে কেন?"

বেলিসেয়ার কহিল, "দেখ ত! কিছুতে ও কথা শুনবে না, দাঁড়াবেই। ও বলছে, ও হাসপাতালে যাবে, এখানে থাকবে না।"

মাদাম বেলিসেয়ারের বুকের ভিতরটা অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। চোখের কোণে অশ্রুর বেগ ঠেলিয়া আসিল। কোন মতে তাহা রোধ করিয়া সে কহিল, "কেন জাক? এখানে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে, বল। বল জাক, তোমার কি চাই?"

"না, না, মাদাম বেলিসেয়ার—কষ্ট কিছুই নয়। তোমরা আমার জন্য যা কচ্ছ, মা-বাপও বুঝি এমন করে না। এমন স্নেহ আর কখনও আমি পাই নি! বাপ কেমন, তা ত জানিই নে। তোমাদের এ স্নেহের ঋণ স্বর্গ দিলেও শোধ হয় না। কিন্তু আর আমায় ধরে রেখো না—ছেড়ে দাও। না, রাখবার চেষ্টাও করো না, আর। আমি মিনতি কচ্ছি, আমায় যেতে দাও। আমি যাবই।"

"কিন্তু কি করে যাবে তুমি? হেঁটে ত যেতে পারবে না—বড় কাহিল যে। তার চেয়ে একটু বল পেলে বরং যেয়ো। তখন আমরা বারণ করব না।"

"না, না, আমি এত কাহিল হই নি এখনও; বেশ যেতে পারব। আস্তে আস্তে যাব। বেলিসেয়ার সাহায্য করবে—ওর হাত ধরে যাব। কেমন বেলিসেয়ার, আমাকে নিয়ে যাবে না? সেই একদিন নান্তেয় আমি চলতে পাচ্ছিলুম না—পা টলছিল—তোমার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছিলুম—মনে পড়ে, বেলিসেয়ার? সেই রকম করে যাব। তা ছাড়া আকাশ, পথ, এ সব দেখবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। আর এ বদ্ধ ঘরে অন্ধকারের মধ্যে থাকা যায় না।"

এমন সুদৃঢ় যাহার সঙ্কল্প, তাহাকে বাধা দেওয়া কঠিন। নদীর জল যখন স্রোতের বেগে ছুটিতে থাকে, তখন সহস্র বাধাও সে স্রোত আঁটিয়া রাখিতে পারে না। জাককেও কোন মতে ধরিয়া রাখা গেল না। মাদাম বেলিসেয়ারের ললাটে চুম্বন করিয়া বেলিসেয়ারের স্কন্ধে ভর দিয়া জাক ঘরের বাহির হইল, ধীরে ধীরে দীর্ঘ সোপান অতিক্রম করিল এবং অবশেষে মুক্ত পথে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া বাড়ীটার পানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল। যে গৃহে তাহার এতদিন কাটিয়াছে, আশার আশ্বাসে যে গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, যে জায়গার প্রতি ইষ্টকখণ্ডে তাহার জীবনের সহস্র উজ্জ্বল স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে এবং যে গৃহে তাহার সমস্ত আশার সমাধিও হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় তাহার নয়ন-পল্লব এখন সজল হইয়া উঠিল। বিদায়, বিদায়, চির-বিদায়, হে আশা-নিরাশা-মণ্ডিত গৃহ, বিদায়। তাড়াতাড়ি সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বেলিসেয়ারের স্কন্ধে ভর দিয়া সে অগ্রসর হইল।

অত্যন্ত ধীর মৃদু পদে জ্যাক পথে চলিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম—এমনই ভাবে চলিতে হইল। মাথার চুল দীর্ঘ হইয়া মুখে-চোখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,ঘামে চুল ভিজিয়া গিয়াছে,—কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে চোখে চারিধার কেমন ঝাপসা ঠেকিতেছে, আবার পরক্ষণে সব দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আলো ও ছায়ার সে এক চকিত লীলাভিনয়! জনতার মধ্য দিয়া এই দুই জন লোক চলিয়াছে; জ্যাক ও বেলিসেয়ার। বাহিরের কোলাহল, বাহিরের বৈচিত্র্যের প্রতি তাহাদের লক্ষ্যও ছিল না। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন পারির পশুবলের সহিত সংগ্রাম করিয়া একটি প্রাণী বিধ্বস্ত হইয়াছে; অপরটি তাহাকে জীবন-সংগ্রামের সেই নিষ্ঠুর ক্ষেত্র হইতে অত্যন্ত সাবধানে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে—ক্ষেত্রের বাহিরে কোথাও যদি তাহার জন্য একটু শান্তি, একটু আশ্রয় মিলাইতে পারা যায়!

জ্যাককে লইয়া বেলিসেয়ার যখন হাসপাতালে পৌঁছিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। হাসপাতালের সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় সারি সারি বেঞ্চে অসংখ্য লোক বসিয়া। সকালে বিকালে এ জনতার বিরাম নাই! কেহ গুমরিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ-বা সান্ত্বনা দিতেছে। চারিধারে যন্ত্রণার মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি। সকলের মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন। জ্যাক আসিয়া সেই দলে যোগ দিল।

জনতা স্তব্ধ ছিল না। সকলেই সুখ-দুঃখের আলোচনা করিতেছিল—বেদনার রাগিণী যেন সুরের মূর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জ্যাক নির্বিকার চিত্তে বসিয়া সেই সকল আলোচনা শুনিতেছিল।

সম্মুখে দ্বার খুলিয়া গেল। ডাক্তার আসিল। অমনই চারিধারে একটা স্তব্ধতার আবরণ পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই ঈষৎ চাঞ্চল্য। ডাক্তার আসিয়া রোগীদের রোগ পরীক্ষা করিতে লাগিল। রোগীর হাত টানিলেই বুকটা তাহার ধ্বক্ করিয়া উঠে! না জানি, কি শুনিতে হইবে। হয় আরোগ্যের সম্ভাবনা, নয়, পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সঙ্কেত! রোগীর নিশ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতে থাকে, স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে! রোগের যাতনার উপর একটা বিভীষিকার কম্পন খেলিয়া যায়।

এক নারী একটি বালককে ক্রোড়ে লইয়া ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। বালকের বয়স বারো বৎসর হইবে। ডাক্তার নারীর হাত ধরিয়া কহিল, "কি—? কি হয়েছে ?"

"আজ্ঞে, আমার কিছু নয়, বাবা—অসুখ এই ছেলেটির।"

"হুঁ। ছেলের ? কি—কি হয়েছে ? দেখি—চট্‌পট্, দেরী না—দেরী না।"

"এই যে—ও কাণে একটু খাটো আছে, বাবা,—আমি বলছি—"

"কাণে খাটো ? কোন্ কাণ ?"

"দু কাণেই, বাবা।"

"দু কাণেই ? আচ্ছা, দেখি—"

"এই যে—দাঁড়াও ত এদুয়ার, দাঁড়াও—কোন্ কাণে শুনতে পাও না, বল।"

"আচ্ছা, ওষুধ পাবে!"

"তোমার কি ?"

জ্যাককে লইয়া বেলিসেয়ার ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। জ্যাক কহিল, "অসহ্য বেদনা।"

"কোথায় ?"

"বুকে। বুক যেন সর্ব্বদা জ্বলছে।"

বেলিসেয়ার কহিল, "আর জ্বর!"

ডাক্তার হুঙ্কার দিল, "তুমি থাম।" জ্যাককে কহিল, "হুঁ—তুমি মদ খাও ?"

"আজ্ঞে না, আগে এক সময় মাঝে-মাঝে খেয়েছি!"

"হুঁ—তাই বল! আর কখনও খেয়ো না—বুঝলে!"

"আজ্ঞে না, আর কখনও খাব না।"

"দেখি, জিভ্, দেখি—জিভ—"জ্যাক জিভ্ বাহির করিল।

ডাক্তার কহিল, "এবার বুকটা দেখি। জামার বোতাম খোল।" জ্যাক বোতাম খুলিল। ডাক্তার যন্ত্র বসাইল। পাঁচ মিনিট ধরিয়া যন্ত্র নাড়িয়া, বুকে-পিঠে টোকা দিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া ডাক্তার কহিল, "তাই ত—"

বেলিসেয়ার কহিল, "কেমন দেখলেন ?"

"ভাল না! খারাপ। খুবই খারাপ। একে কি সারা পথ হাঁটিয়ে এনেছ ?"

"হাঁ, গাড়ীভাড়ার পয়সা পাব কোথায়, বলুন—"

"অন্যায় করেছ, ভারী অন্যায় করেছ! এই শরীরে হাঁটাটা ভাল হয় নি!" তখনই ডাক্তার আদেশ দিল, "ডুলি আন!"

বেলিসেয়ার কহিল, "রোগটা কি ?"

ডাক্তার মৃদু স্বরে কহিল, "রোগ আর কি! কঠিন ব্যামো! সারা দুষ্কর! দেখা যাক চেষ্টা করে।"

ডুলি আসিল! জ্যাককে ডুলির সাহায্যে হাসপাতালের সাঁত-দি দিউ বিভাগে পাঠানো হইল। এ বিভাগটি যক্ষ্মা রোগীদিগের জন্য নূতন খোলা হইয়াছিল। জ্যাককে আনিয়া একটি বিছানায় শোয়ানো হইলে নার্শ আসিয়া কহিল,"এঃ, এ যে খালি কতকগুলো হাড়-পাঁজরা একটা চামড়ার খোলে পূরে নিয়ে এসেছ! কতদিন অসুখ হয়েছে ?"

বেলিসেয়ার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা আজ্ঞে, খুব বেশী দিন নয়।"

জ্যাক কোন কথা কহিল না। পথের পরিশ্রমে চোখ তাহার ঘুমে ভরিয়া আসিয়াছিল। মুক্ত জানালা দিয়া স্নিগ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সেই বাতাস যেন মার মতই জ্যাকের শ্রান্ত ললাটে ধীরে ধীরে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া দিল। জ্যাক ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল।

—এক সুদীর্ঘ পথ—কোথায় গিয়া সে পথ শেষ হইয়াছে, কিছুই বুঝা যায় না—সীমাহীন, অফুরান পথ! সেই পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে! সেও চলিয়াছে! কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে জানে না! পথের আরম্ভটা যেন কতক সেই এতিয়োলের পথের মতই! তবে এতিয়োলের পথ এতখানি দীর্ঘ নহে! ঐ দূরে তাহার অগ্রে ও কাহারা চলিয়াছে? এ কি—তাহার মা—আর ও—? সেসিল। হাঁ, ও সেসিল অগ্রে চলিয়াছে—এই পথেই! জ্যাক ডাকিল, "মা,"—"সেসিল"। কেহ সাড়া দিল না, ফিরিয়াও কেহ চাহিল না। চলিয়াছে ত চলিয়াছেই। জ্যাকও চলিতে লাগিল। সহসা কতকগুলা গাছপালার আড়াল পড়িল। মা ও সেসিলকে আর দেখা গেল না। জ্যাক তখন আপনার গতির বেগ বাড়াইয়া দিল। ঐ যে আবার যায়। ঐ যে মা আর সেসিল! সহসা আবার মধ্যে প্রকাণ্ড অন্তরাল রচিত হইয়া উঠিল। কল ও বিশাল যন্ত্রাদির বিরাট ব্যবধান! জাহাজ, রেল ও এঞ্জিন তাহাদের বিপুল দেহ লইয়া এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যাক সেই প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা করিল। ঘর্ঘর রব করিয়া কলের চাকা ঘুরিতেছে। জ্যাকের পা তাহাতে বাধিয়া গেল! তাহার দেহ চূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। মাংসগুলা দেহ হইতে টুকরা টুকরা খসিয়া পড়িল। শীর্ণ কঙ্কালটা চাকার মধ্য হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। তাহার পর নিমেষে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল।

—চারিধারে অগ্নিকুণ্ড! দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে—বুঝি এখনই তাহাকে গ্রাস করিবে! সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধ—উঃ, অসহ্য! জ্যাক পলাইয়া বাঁচিল।

—আবার নূতন দৃশ্য। জ্যাক যেন দশ বৎসরের ছোট ছেলেটি। মাদাম সেলের গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনে সে পাখীর সন্ধানে চলিয়াছে। গলি বাঁকিতেই সম্মুখে সে দেখে, এক ডাইনী বুড়ী। কাঠের বোঝা রাখিয়া বুড়ী তাহার উপর বসিয়াছিল—যেন সে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া জ্যাক যেমন পলাইবে, অমনই বুড়ীটা তাহাকে ধরিবার জন্য উঠিল। জ্যাক ছুট দিল; বুড়ীও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। অবিরাম গতিতে জ্যাক ছুটিতে লাগিল; বুড়ীরও ছুটের বিরাম নাই। শেষে অবসন্ন হইয়া জ্যাক বসিয়া পড়িল। বুড়ী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে যুদ্ধ চলিল, ভীষণ যুদ্ধ। জ্যাকের পরাজয় হইল। বুড়ী জ্যাককে তাহার কাঠের বোঝার সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। জ্যাকের বুকে খচ্ খচ্ করিয়া কতকগুলা কাঠের খোঁচা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা গো!"

চমকিয়া জ্যাকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে, তাহার বিছানার পাশেই নার্স। নার্স কহিতেছে, "নাও, এই অষুধটা খেয়ে ফেল ত!"

জ্যাক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নার্সের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ ত স্বপ্ন নয়! তবুও বুকের উপর এ কিসের বোঝা চাপিয়া বসিয়াছে—অসহ্য এ ভার! তাহার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

দশম পরিচ্ছেদ

উপেক্ষিত

জ্যাক বালিসে ভর দিয়া বসিয়া ঔষধ পান করিল। নার্স কহিল, "তোমার নাম কি?"

"জ্যাক।"

"কি কাজ কর, তুমি?"

"আমি কারিকর।"

"তোমার কেউ নেই—যাদের দেখতে চাও?"

"না" বলিয়া জ্যাক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নার্স আর কোন কথা কহিল না। জ্যাকের দীর্ঘনিশ্বাসে সে বুঝিল, তাহার চিত্তের তারে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে, তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "এবার তোমায় কিছু খেতে হবে। কাল সারারাত্রি ঘুমিয়েছ। এটা ভাল লক্ষণ অবশ্য।"

জ্যাক সবেমাত্র কিছু আহার করিয়াছে—এমন সময় ডাক্তার ও তাঁহার পশ্চাতে এক দল ছাত্র আসিয়া জ্যাকের সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তার জ্যাকের বুকে যন্ত্র রাখিয়া কাণ পাতিয়া তাহার মধ্য দিয়া বুকের বিচিত্র ধ্বনি শুনিল—পরে ছাত্রদিগের হাতে যন্ত্র দিয়া কহিল, "কি কি পাচ্ছ, বল সব" ছাত্রের দল একে একে আওড়াইয়া গেল—"সোঁ সোঁ, কুড়িক্ কুড়িক্, ঘড়্-ঘড়্! ফুস্ফুসের মধ্যে হাওয়া ঢুকছে—যক্ষ্মা!"

ডাক্তার জ্যাককে কহিল, "আজ রবিবার। কেউ তোমাকে দেখতে আসবে কি?"

জ্যাক কহিল, "না।" ডাক্তার ও ছাত্রের দল চলিয়া গেল। অদূরে বেলিসেয়ার ও মাদাম বেলিসেয়ার দাঁড়াইয়াছিল; তাহারা তখন নিকটে আসিল। মোড়ক খুলিয়া, কয়েকটি আঙুর লইয়া জ্যাকের হাতে দিয়া,

বেদানা ভাঙ্গিয়া দানা বাহির করিতে করিতে মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "এখন কেমন আছ, জাক? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

বেলিসেয়ার স্ত্রীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছে, রোগ ভীষণ, এ রোগে জাকের পরিত্রাণ নাই। তবে যে কয়টা দিন সে বাঁচিয়া থাকে, তাহাই পরম লাভ। দারুণ যক্ষ্মার হাতে কোন দিনই কোন লোক পরিত্রাণ পায় নাই—জাকেরও সেই দারুণ যক্ষ্মা হইয়াছে। কোনমতে অন্তরের বেদনা অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মাদাম বেলিসেয়ার সহজভাবেই জাকের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। কিন্তু জাক কোন উত্তর দিল না; শুধু ম্লান নয়নে সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বেদানার কয়টি দানা জাকের মুখে দিয়া তাহার দীর্ঘ কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "জাক, তোমার মাকে খপর দিয়ে আনাব কি?"

জাকের ম্লান চক্ষু সহসা দীপ্ত হইল, পাণ্ডু অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। আহা, ইহাই ত সে চায়! মাকে শুধু একবার দেখিবার সাধ হয়! সমস্ত প্রাণ আজ মাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু মা কি আসিবে? যদি মা জানিতে পারে যে, জাক মরিতে বসিয়াছে, আর বাঁচিবে না—তাহা হইলে—? তাহা হইলে কি একবার না আসিয়া মা থাকিতে পারিবে? না, না, মা ত নিষ্ঠুর নয়। মা যদি আসে, তবে জাকের এ বুকের বেদনাও বুঝি কিছু শান্ত হয়।

মাদাম বেলিসেয়ার বলিল, "আমি তাঁকে নিয়ে এখনই আসব, জাক।" মাদাম বেলিসেয়ার চলিয়া গেল। বেলিসেয়ার চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার বন্ধু, তাহার মিতে, তাহার সঙ্গী জাক—! সেই জাক চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়াছে! বেলিসেয়ারের হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা ঝড়ের মতই ঠেলিয়া ফুলিয়া গার্জ্জিয়া উঠিতেছিল।

মাদাম বেলিসেয়ার আর্জাস্তঁর গৃহে গিয়া কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইল না। ভৃত্য কহিল, সকলে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে—কখন্ ফিরিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। কথাটা মাদামের বিশ্বাস হইল না। এই শীতের দিনে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে? না! এই ভোরে, অজস্র তুষার-বর্ষণের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে? কখনও না! অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায়? মাদাম বেলিসেয়ার নিতান্তই নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জাক যখন কহিল, "কি? মা এল না! আমি জানতুম, মাদাম বেলিসেয়ার, মা আসবে না।" তখন কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, মাদাম বেলিসেয়ার এমন একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

জাক তখন চক্ষু মুদিয়া আর-এক কথা ভাবিতে লাগিল। সে কথা বড় ভাল লাগে। সেসিলের কথা! সেসিল, কোথায় তুমি? তোমার জাকের যে আজ প্রাণ বাহির হইয়া যায়! একবার আসিয়া দেখিবে না, সেসিল? জাকের চোখের কোণ বহিয়া একটি দুইটি করিয়া অশ্রুর বিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "কেঁদো না জাক, আমি আবার যাচ্ছি। যেমন করে পারি, তাকে আমি নিয়ে আসবই! দেখি, সে কত বড় পাষাণী মা।"

"না, না, কাজ নেই—সে আসবে না, মা আসবে না, মাদাম বেলিসেয়ার!"

কিন্তু মাদাম বেলিসেয়ার সে কথা কাণেই তুলিল না —ইদার সন্ধানে আবার সে বাহির হইয়া গেল।

শার্লৎ ও আর্জাস্তঁ সবে মাত্র তখন বাড়ীর দ্বারে গাড়ী হইতে নামিয়াছে, এমন সময় উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া মাদাম বেলিসেয়ার তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোষে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সে ইদাকে কহিল, "মাদাম, তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।"

ইদা চমকিয়া উঠিল। "এ কি—মাদাম বেলিসেয়ার!"

"হাঁ, আমি। তোমার ছেলে জাক,—তার ভারী অসুখ। বুঝি সে আর বাঁচে না—একবার তোমায় দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে!"

আর্জাস্তঁ কহিল, "বেরো মাগী, ঢং পেয়েছিস্ বটে! রোজ রোজ চালাকী! অসুখ করে থাকে—বেশ, আমরা ডাক্তার পাঠাচ্ছি—তা বলে এঁকে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই।"

মাদাম বেলিসেয়ার কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া কহিল, "ওগো, ডাক্তারের কোন ভাবনা নেই গো—অনেক ডাক্তার তাকে দেখছে। সে এখন হাসপাতালে।"

"হাসপাতালে?" ইদার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

"হাঁ, হাসপাতালে। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকচে না। যদি তুমি দেখতে চাও ত মিছে কথা-কাটাকাটি না করে এখনই চলে এস।"

আর্জাস্তঁ ইদার ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এস, এস, শার্লৎ,—ওর কথা শোন কেন? হঠাৎ এমন গুরুতর অসুখ হল যে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "ওগো, বাজে কথার সময় নেই, এখন! তা ছাড়া আমি তোমার জন্য আসিনি এখানে, শুধু বেচারা জাকের বড় সাধ, তোমায় দেখে—তার সেই শেষ সাধ যদি মিটুতে পারি, তাই আমি এসেছি। ওঃ ভগবান, ভগবান, এমন রাক্ষসী মার পেটেও তুমি ছেলে দিয়েছিলে!"

ইদার আর সহ্য হইল না! সে বলিল, "চল, চল, আমি এখনই যাব।"

আর্জান্ত হাঁকিল, "ইদা—" তাহার স্বর রূঢ়, তীব্র!

ইদা কহিল, "না, না, আমায় ক্ষমা কর। আমার জ্যাককে শুধু একটি বার আমি দেখে আসি। একটি বার, একটি বার আমায় ছুটি দাও—"

মাদাম বোলসেয়ারের হাত ধরিয়া ইদা তখনই গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছুটিল।

মাদাম বোলসেয়ার যখন হাসপাতাল হইতে আর্জান্তর গৃহের দিকে যাত্রা করিল, ঠিক তাহার পর মুহূর্ত্তে এক কিশোরীর হাত ধরিয়া এক বৃদ্ধ হাসপাতালে জ্যাকের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবনায় উভয়েরই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কে জ্যাক? কেমন আছে সে?

নিমেষে জ্যাকের শয্যা-প্রান্তে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। কিশোরী জ্যাকের তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "জ্যাক, জ্যাক,—দেখ, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, আমি—সেসিল!"

সেসিল। সত্যই সেসিল! সত্যই সে আসিয়াছে। জ্যাক চোখ মেলিল। এই যে, সেই সুন্দর মুখখানি,—শুধু অশ্রুর কুয়াশায় ঈষৎ ম্লান! মৃদু হাসিয়া জ্যাক আপনার দুই হাত বাড়াইয়া দিল। দুই হাত দিয়া সে সেসিলের কণ্ঠ বেষ্টন করিল! আঃ, সেই কোমল স্পর্শ,—কি মধুর, কি আরামের!

ধীরে ধীরে সেসিলের মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "সেসিল—"

"কেন জ্যাক?"

স্থির দৃষ্টিতে জ্যাক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সেসিলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পরে আবার ধীরে ধীরে ডাকিল, "সেসিল—"

"কি বলছ, জ্যাক? বল—"

"এখনও তুমি আমায় ভালবাস?"

"বাসি জ্যাক, বড় ভালবাসি। তোমায় ছাড়া আর কাকেও কখনও ভালবাসিনি আমি—কাকেও না।"

মৃত্যুর কর-স্পর্শে মমতা-হীন কঠিন এই রোগ-কাতর গৃহে এমন মধুর স্বর পূর্ব্বে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই! ভালবাসি! জীবনের শেষ সীমা-রেখায় আসিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার কাণে এই শব্দটুকু কি বিচিত্র মাধুরী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে!

"তুমি এসেছ সেসিল,—আমায় দেখতে এসেছ? আমায় তুমি এত ভালবাস? আর তবে আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব না! এখন আমি হাসি-মুখে মরতে পারব।"

ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "মরবে কেন? ছি, ও কি কথা বলছ, জ্যাক? ভয় কি? তুমি সেরে উঠবে। আমাদের সেবায় তুমি সেরে উঠবে। তোমার জ্বর এখন নেই; আজ ত তুমি ভালই আছ, জ্যাক, মুখখানিও বেশ দেখাচ্ছে!"

সত্যই আজ জ্যাকের মুখে স্বাস্থ্যের একটা উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অনেকখানি পাণ্ডুতা ঘুচিয়া গিয়াছিল! কিন্তু হায়, নিবিবার পূর্ব্বে মাটির দীপ এমনই উজ্জ্বলভাবে মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠে! অস্ত যাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সূর্য্য উদয়-কালের মতই রক্ত কিরণে রাঙিয়া উঠে—প্রভাতের তারা আকাশের গায় মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে এমনই শুভ্রতায় ভরিয়া উঠে।

জ্যাক আপনার মুখের উপর সেসিলের হাত চাপিয়া রাখিল—সেসিলের মুখের দিকে আবার কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জ্যাক কহিল, "আমার জীবনে যা-কিছু অভাব ছিল, তুমিই তা পূর্ণ করেছ। তুমি আমার কে, তা জান, সেসিল? তুমি আমার বন্ধু, আমার ভগ্নী, আমার স্ত্রী, আমার বাপ, আমার মা—এক কথায় আমার সর্ব্বস্ব।"

কিন্তু এ আনন্দ-জ্যোতি সহসা ম্লান হইয়া গেল। সেসিলের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই জ্যাকের চক্ষু মুদিয়া আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া গাঢ়ভাবে নামিয়া আসিতেছিল; সেসিল তাহা লক্ষ্য করিল। ডাক্তার রিভালের দিকে চাহিয়া সে ডাকিল, "দাদা মশায়—"

"চুপ।"

সেসিল নিষেধ মানিল না, আবার ডাকিল, "জ্যাক—"

ধীরে অতি ধীরে জ্যাকের ঠোঁট নড়িল, মুদিত নয়ন-পল্লব একবার শুধু কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক কথা কহিবার চেষ্টা করিল—কথা বাহির হইল না; মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, শুধু একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া পড়িল।

* * *

এমন সময় বাহিরে একটা কলরব উঠিল। "দাও, দাও, যেতে দাও—" নারী-কণ্ঠে মিনতির সে এক করুণ সুর। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত বেগে দুইজন স্ত্রীলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ইদা ও মাদাম বোলসেয়ার। সঘন নিশ্বাসে ইদা কহিল, "কৈ—কৈ—আমার জ্যাক কৈ সে?"

মাদাম বোলসেয়ার কহিল, "এস—দেখবে বৈ কি! এমন মার পেটেও এমন ছেলে জন্মায় গা!"

ইদা আসিয়া জ্যাকের শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ ঘর। জ্যাকের বুকের উপর মুখ ঢাকিয়া সেসিল শুধু নীরবে রোদন করিতেছিল। ডাক্তার রিভাল নিশ্চল জড়পুত্তলের মত জ্যাকের মুখের পানে চাহিয়া পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া ছিলেন ইদা ডাকিল, "জাক,—বাবা আমার—"

ডাক্তার বিভাল চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, কহিলেন, "চুপ—"

এই জাক! ইদার অত সাধের, অত আদরের জাক! এমন বিবর্ণ মলিন মুখ, নিস্পন্দ দেহ! হাত এলাইয়া পড়িয়াছে—জীবনের চিহ্নও যে দেখা যায় না!

কৈ! নিশ্বাসও পড়ে না ত! তবে—তবে কি জাক নাই? ইদার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, "জাক, যাদু আমার, দেখ, চেয়ে দেখ, মা এসেছে—তোমার মা"—

ইদা কম্পিত স্বরে কহিল, "একবার চেয়ে দেখ, জাক—আমি এসেছি, তোমার মা, পাষাণী মা—"

কিন্তু কে সাড়া দিবে?

ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ শ্বাসে ইদা কহিল, "তবে কি ওগো, বাছা আমার নেই—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে?"

"না।" ডাক্তারের স্বর দৃঢ়, তীব্র! ডাক্তার কহিলেন, সর্ব্বনাশ নয়, কড়ায়-গণ্ডায় তোমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সে আজ ছুটি নিয়েছে, তার সব যাতনার শেষ হয়ে গেছে।"

সমাপ্ত

সোনার কাঠি

উপন্যাস

(দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সোনার কাঠির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ছয়মাসে অর্থাৎ তিন মাস পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। এ তিনমাস বহু তাগিদ পাইয়াছি, দ্বিতীয় সংস্করণ সত্বর প্রকাশের জন্য। কিন্তু অবসরের অভাবে ছাপাইতে পারি নাই, এজন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

এ সংস্করণে কয়েক জায়গায় রচনার একটু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি।

ছয়মাসে এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছে, ইহাতে আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশা করি, এ সংস্করণের প্রতিও পাঠক-পাঠিকা সেই অনুরাগ দেখাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

১৭, মোহনবাগান রো
কলিকাতা, ১২ই ফাল্গুন, ১৩২৯।

পরম প্রীতিভাজন বন্ধু

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

উদার চরিতেষু

ভাই গজেনদা

জানিনা কি সোনার কাঠির পরশ আমার প্রাণে বুলিয়ে দিয়েছ। তোমার স্নেহ, তোমার প্রীতি—জীবনে আমার মস্ত লাভ। তোমার স্নেহের গভীরতা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতি পলে আমি অনুভব করি। আমার এ তুচ্ছ বইখানি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যত তুচ্ছই হোক, তোমার হাতে এ-উপহারের অনাদর হবে না, এ আমি বেশ জানি।

প্রীতিমুগ্ধ
সৌরীন্দ্র

১৭, মোহনবাগান রো
কলিকাতা, ৩রা আষাঢ়, ১৩২৯

"It is the mass of actions, their weight their sum
that constitutes the value of a human being."
Anatole France.

সোনার কাঠি

পৌষ মাসের রাত্রি। তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া টু-সীটার মোটর-কার হাঁকাইয়া প্রণব কলিকাতায় ফিরিতেছিল। বরাহনগরে পালপাড়ার কাছে আসিয়া হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হইয়া গেল। প্রণব চিন্তিতভাবে গাড়ী হইতে নামিয়া এধার-ওধার দেখিয়া পরখ করিয়া বুঝিল, গাড়ীর কার্বরেটরে ধুলা ঢুকিয়াছে। পাইপ খুলিয়া ময়লা সাফ করিয়া আবার গাড়ীতে বসিয়া যেমন ষ্টার্ট দিবে, অমনি রাস্তার বাঁ দিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া তাহার গাড়ীর কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, বলিল,—আমায় রক্ষা করুন।

প্রণব অবাক হইয়া গেল। এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে? বড় বড় ঘন দেবদারু গাছের পাতার অন্তরাল ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার মৃদু আলো পথে লুটাইয়া পড়িয়াছিল—আকাশ নির্মল, কোথাও এতটুকু ধোঁয়ার চিহ্ন নাই। সে আলোয় স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া প্রণব স্পষ্ট বুঝিল, তাহার বয়স অল্প। সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও তাহার যেটুকু দেখা যাইতেছে, সেটুকু হইতে ইহাও বুঝিল, স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফরশা এবং ফরশা হাতে পাঁচ গাছি করিয়া সোনার চুড়ি আছে।

প্রণব প্রথমটা এমন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আর্ত্ত স্বরে বলিল,—দয়া করে আমাকে বাঁচান।... ঐ গাড়ীতে করে আমায় সঙ্গে নিয়ে চলুন।

কথাটা শেষ করিয়াই রমণী গাড়ীতে চড়িবার অনুমতিটুকু পাইবার জন্য এমন কাতর দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে চাহিল যে, প্রণব কথা বলিবার আর অবসর পাইল না। সে একেবারে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। রমণীও অমনি ত্বরিত পদে উঠিয়া প্রণবের পাশে বসিয়া পড়িল। প্রণব মন্ত্র-চালিতের মত গাড়ী চালাইয়া দিল।

রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া গাড়ী আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল; কলিকাতায় পৌঁছিয়াও প্রণব কোথায় যাইবে, রমণীকে কোথায় নামাইতে হইবে, এ সব কথা ভাবিতে একেবারেই ভুলিয়া গেল। সে কেমন স্বপ্ন-বিহ্বলভাবে গাড়ী ছুটাইয়া সোজা চলিল; গাড়ী ছুটাইয়া ক্রমে সার্কুলার রোড ধরিয়া খিদিরপুরের পাশ দিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। দুই এক চক্র ঘুরিবার পর প্রণবের হঠাৎ মনে হইল, তাই তো, এ সে কি করিতেছে! রমণীকে লইয়া পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছে কেন। সে তখন গঙ্গার ধারে একটা জায়গায় গাড়ী থামাইল।

রমণী এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। গাড়ী থামাইয়া প্রণব রমণীর মুখের পানে চাহিল,—সে মুখখানি বড় সুন্দর, সে চোখে সহায়-প্রার্থিনীর কি যে আকুল অধীর ভাব।

প্রণব বলিল,—আপনাকে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে, বলুন দিকি?

রমণী অনেক কষ্টে জবাব দিল; বলিল,—আমায় নামিয়ে দেবেন?

প্রণব কহিল,—হাঁ, আপনি কোথায় যেতে চান্, বলুন? আমি আপনাকে রেখে আসবো।

কিছুক্ষণ ধরিয়া রমণীর মুখে কোন কথা ফুটিল না। শুধু ম্লান নয়নে কাতর দৃষ্টি লইয়া সে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল।

সে ভাব দেখিয়া প্রণব ভাবিল, রমণী উন্মাদিনী? না, কি...? প্রণব বিপদে পড়িল, তাইতো—।

সহসা রমণী কথা কহিল। সে বলিল,—আমার তো কোথাও আশ্রয় নেই।

রমণীর কণ্ঠস্বরে এমন দারুণ হতাশা ঝরিয়া পড়িল যে প্রণবের মনে সে স্বর গিয়া কাঁটার মত বিঁধিল।

প্রণব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল। এ কি বোঝা তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল! রমণীর অসহায়তায় মনে করুণা জাগিলেও এই একান্ত নিরুপায়তার মধ্যে পড়িয়া বিরক্তিও যে প্রণবের একেবারে ধরে নাই, এমন নয়। কে এ রমণী? কাহার কন্যা? কাহারই বা স্ত্রী? এ দায় ঘাড়ে করিয়া শেষে তাহাকে আদালতে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে নাকি! আদালত তো পরের কথা, এখন এই রাত্রে সে ইহাকে লইয়া কি করিবে! গৃহে সহসা ইহাকে লইয়া যাইতে সাহস হয় না। অথচ পথেও এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব! ষ্টীয়ারিং হুইলে মাথা রাখিয়া প্রণব ভাবিতে বসিল।

ভাবিয়াই কি ছাই কূল পাওয়া যায়! কি দারুণ রহস্য এই রমণীর চতুর্দ্দিকে কি জাল বিস্তার করিয়া আছে, কে জানে! তাইতো! এ নারী চরিত্রহীনা নয় তো? হয়তো কুল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তার পর যাহাদের চক্রান্তে কুল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইহাকে পথে ফেলিয়া পলাইয়াছে...?

কিন্তু ঐ জনহীন পথে সে আসিল কি করিয়া! এই রাত্রে!—তার উপর এই বেশ,—ঐ মুখ—প্রণব মহা-সমস্যায় পড়িল। না, কুলত্যাগিনীর সে কুটিল ভাব ইহার কথার স্বরে বা দৃষ্টির ভঙ্গীতে কৈ প্রকাশ পায় না তো!

রমণী বলিল,—আপনি কি ভাবছেন?

আশ্চর্য্য! প্রণব চমকিয়া নারীর পানে চাহিল। নারী এ বলে কি? কি ভাবিতেছি? কি ভাবিতেছি—রমণী তাহা সত্যই বুঝিতেছে না?

প্রণব অত্যন্ত চিন্তাকুলভাবে কহিল,—আপনি যে আমাকে বিপদে ফেললেন দেখচি। আপনি বলচেন, আপনার কোন আশ্রয় নেই, অথচ—আচ্ছা, আপনি কাল যেখানে ছিলেন, সেখানে ফিরে যেতে পারেন না?

—না—না। রমণী সবল কণ্ঠে বলিল—কিছুতেই না!

প্রণব বলিল,—তাইতো,—তা হলে কি করি?

রমণী কহিল,—আপনার বাড়ীতে দাসীদের কাছে না হয় আজ রাতটার মত আশ্রয় দেবেন। তারপর কাল সকালে কোথাও চলে যাবো।

দাসীর কাছে! না, তাহাও হইতে পারে না। প্রণব বলিল,—সে হয় না। তবে, কালই বা কোথায় যাবেন, শুনি?

রমণী সে কথার জবাব না দিয়া করুণ স্বরে কহিল,—আপনাকে অনর্থক তাহলে আর বিপন্ন করি কেন! আমার জন্যেই আপনি বাড়ী যেতে পারচেন না,—আমি বুঝেচি। বেশ, আপনি বাড়ী যান্। আমি এইখানেই নেমে যাচ্ছি,—তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে, হবে'খন। কথাটা বলিয়াই রমণী গাড়ী হইতে নামিবার জন্য উদ্যত হইল।

প্রণব বাধা দিয়া বলিল,—সে হতেই পারে না। এই রাত্রে পথে আপনাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেবো, এত বড় নরাধম আমি নই।

—তাহলে এমনি গাড়ীতে বসেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবেন?

—তা ছাড়া উপায়?

—তারপর রাত কেটে যাবে, সকাল হবে,—তখন কি করবেন?

সত্য, সেও এক কঠিন সমস্যা! না, প্রণব আর ভাবিতে পারে না। সে বলিল,—তবে এক কাজ করা যাক, গাড়ী করে খানিক ঘোরা যাক্—দেখি, ঘুরতে ঘুরতে যদি কোন উপায় ঠিক্ করতে পারি। কিন্তু, আপনি যে শীতে কাঁপচেন! দাঁড়ান, তার ব্যবস্থা আগে করি,—বলিয়া প্রণব উঠিয়া আপনার ওভার-কোটটা খুলিয়া রমণীকে বলিল,—আপনি এইটে পরে বসুন দেখি। যদিও গায়ে বড় হবে, তবু শীতটা কতক কাটবে!

রমণী মৃদু হাসিয়া বলিল,—আর আপনার শীত করবে না?

প্রণব বলিল,—কিছু না। আমার গায়ে গরম কোট রয়েছে। আর আপনার গায়ে কিছুই নেই। পরণে ঐ সাদা কাপড়টুকু আর একটা সাদা সেমিজ।

রমণী বলিল,—না, না, আমার গায়ে একটা গরম গেঞ্জি আছে, আর সেমিজটাও সাদা নয়, গরম ফ্লানেলের।

প্রণব বলিল,—তা হোক্, তবু আপনাকে এ ওভার-কোট গায়ে দিতেই হবে। আমার এ কথাটুকু আপনি রাখতে পারেন না?

রমণী বলিল,—সে কি কথা! আপনি আমাকে কত বড় বিপদ থেকে যে আজ উদ্ধার করেছেন! আমার যে আপনার পায়ে আজন্ম বিকিয়ে থাকা উচিত, আর এ সামান্য কথাটুকু আমি রক্ষা করবো না! আমাকে এত বড় বেইমান্ ভাববেন না।

রমণী ওভার-কোট গায়ে দিয়া বসিলে প্রণব আবার গাড়ী ছুটাইয়া দিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে এমন হেঁয়ালির মত মনে হইতেছিল,—এই অপরিচিতা নারী—এ কে? কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া পর্দ্দানশীন্ ঘরের নিতান্ত অবগুণ্ঠিতা সরমকুণ্ঠিতা মেয়ে বলিয়াও মনে হয় না—বরং একটু প্রগল্ভা। অথচ মুখ-চোখ দেখিয়া ভদ্রঘরের গণ্ডীর বাহির হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া প্রণব ভাবিল, আর তো ঘোরা যায় না। গৃহেই ইহাকে লইয়া যাওয়া যাক্। না হয়—চট্ করিয়া অমনি একটা কথা মনে জাগিল।

ভবানীপুরে প্রণবের বন্ধু অচলের বাড়ী। বাড়ীতে সে ও তাহার স্ত্রী—দুটী মাত্র প্রাণী। তাহারই বাড়ীতে আজিকার রাত্রিটুকুর মত ইহাকে রাখিয়া আসিবে। তারপর কাল যা হয় পরে না হয় ভাবিয়া স্থির করা যাইবে। অচলকে বলিবে, রমণী তাহার আত্মীয়া… আসল কথাটা এখন নাই বা ভাঙ্গিল!

তখন সে নারীকে বলিল,—তার চেয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে আপনাকে রেখে আসি, চলুন। কোন বিশেষ কারণে আমার বাড়ীতে আজ নিয়ে যেতে পারলুম না। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করে একটা উপায় যা-হোক্ করবো—তবে সেখানে কি পরিচয় দেবো, বলুন তো?

—বলবেন, পথ থেকে এক দুর্ভাগিনীকে কুড়িয়ে এনেচেন।

প্রণব একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—না, না, সে হয় না। আপনি বোঝেন না, লোকের মন পাঁচটা বাজে গল্পের সৃষ্টি করে একটা কুৎসা রটাতে পারে—তাতে ক্ষতি কিছু না হোক্, আপনার অপমান হতে পারে।

—আমার আবার অপমান! নারীর কণ্ঠস্বরে আবার তেমনি হতাশা, তেমনি বিষাদ।

প্রণব বলিল,—বলবো'খন, আমার সম্পর্কে ভগ্নী হন্ আপনি—বিপদে পড়েচেন,—আজ এইখানে থাকবেন, কাল আমাদের ওখানে সকালে নিয়ে যাবো। কেমন?

—কিন্তু···

প্রণব বলিল,—আপনি সেখানে আজ রাত্রিটা নির্ভয়ে থাকতে পারবেন। তারা দুটি মাত্র প্রাণী—স্বামী আর স্ত্রী।

রমণী বলিল,—আপনার বাড়ীতে একটু ঠাঁই দিতে পারলেই ভালো হতো। আপনার স্ত্রীর ভয়ে বুঝি নিয়ে যাচ্ছেন না?

হাসিয়া প্রণব বলিল,—স্ত্রী থাকলে তবে তো ভয়!

রমণী একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল,—কেন, আপনার স্ত্রী···?

হাসিয়া প্রণব বলিল,—এখানো এসে জুটতে পারেন না!

—আপনার বিবাহ হয় নি, তা হলে?

—না।

গাড়ী এতক্ষণে ভবানীপুরে পৌঁছিয়া ছিল। স্তব্ধ পথের পাশে বন্ধুর গৃহের দ্বারে আঘাত করিয়া বন্ধুকে জাগাইয়া তুলিতে ভিতর হইতে সাড়া আসিল,—যাই।

প্রণব তখন বলিল,—ভালো কথা, আপনার নামটা জানা দরকার তো—না হলে যে মুস্কিলে পড়বে।

গা হইতে ওভার-কোট খুলিয়া প্রণবের হাতে দিয়া রমণী কহিল,—আমার নাম? বলিয়া একটু থামিল, পরে বলিল,—আপনার কাছে গোপন করবো না, আমার নাম প্রীতিলতা।

—বেশ, জানা রইলো। কাল এসে আমি আপনাকে নিয়ে যাবো তাহলে, কেমন?

বন্ধু আসিয়া বলিল,—কি হে, এই রাত্রে ব্যাপার কি?

প্রণব বলিল,—ইনি আমায় এক আত্মীয়া, সম্পর্কে বোন্ হন। বড় বিপদে পড়েচেন। এইখানেই এঁদের বাড়ী। এঁকে আজ রাত্রের মত আশ্রয় দাও। কাল আমি আমাদের ওখানে এঁকে নিয়ে যাবো। তার পর রমণীর দিকে চাহিয়া প্রণব বলিল,—আজ রাতটা তুমি এখানেই তাহলে থাকো, প্রীতি। তারপর কাল আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

রমণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া উপরে পাঠাইয়া অচল বলিল,—তুমি চললে যে প্রণব,—একটু বসবে না?

—না ভাই, ভারী ব্যস্ত। মা কত ভাবচেন, তাঁকে গয়ে খবর দিতে হবে আবার। তারপর কাল সকালেই আসচি তো। বলিয়া প্রণব ব্যস্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গাড়ী ছুটাইল,—বাড়ীর পথে।

অচল দ্বার বন্ধ করিয়া ভাবিল, ব্যাপার কি! প্রণব অমন বিদ্যুতের মত আসিয়া বিদ্যুতের মতই অন্তর্হিত হইয়া গেল। অথচ বিপদটা কি, তাহাও জানা গেল না! সঙ্গে এই কিশোরী! প্রণব বলিল, বিপন্না আত্মীয়া!

প্রণব বেশ বড় ঘরের ছেলে। কলিকাতায় শ্যামাপুকুরে মস্ত বাড়ী, অগাধ পয়সা। তাহারা দুই ভাই, প্রণব বড়, ছোটর নাম শশাঙ্ক। প্রণবের বাপ নাই। বিধবা মা প্রণব আর শশাঙ্ককে লইয়া সে-বাড়ীতে বাস করেন। তা-ছাড়া জ্ঞাতিকুটুম্ব-দলে বাড়ীখান ভরিয়া আছে।

প্রণব এখনও বিবাহ করে নাই। তাহার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর। খেয়ালী মানুষ। এম-এ পাশ করিবার পর ছবি আঁকিবার নেশা তাহাকে পাইয়া বসিল। আর্ট স্কুলে দুই বৎসর কাটাইয়া সে এক ষ্টুডিও খুলিয়া ফেলিল। প্রথম প্রথম ল্যাণ্ডস্কেপ্ আঁকিয়া হাত মক্স করিয়া পরে সে নব নারীর চিত্ত-বৃত্তির বিচিত্র বিকাশ ছবির পটে রঙাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার হাতে আঁকা বাঙালী-ঘরের বিস্তর ছবি মাসিক-পত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া লোকের ঘরে ঘরে প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি অর্জ্জন করিতে লাগিল। দুই-চারিটা একজিবিশনে তাহার আঁকা "ভিখারী বালক," "বঙ্গবধু", "ফুলশয্যা" প্রভৃতি ছবিগুলি বেশ চড়া দরে বিক্রয় হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরও সোনার পদক এবং যশঃশ্রী-লাভে বঞ্চিত রহিল না।

এখন সে সুখচরের ওদিকে গঙ্গার ধারে মস্ত এক বাগান-বাড়ী কিনিয়া তাহাতে ষ্টুডিও খুলিয়াছে। পথ হইতে যত দীন-দুঃখীর ছেলে-মেয়েদের পয়সা দিয়া সেখানে লইয়া যায় এবং তাহাদের মডেল করিয়া ছবি আঁকে। বাস্তবের উপর কল্পনার তুলি বুলাইয়া যে-সব মূর্ত্তি সে এখন ছবির পটে আঁকিয়া বাহির করে, তাহা জীবন্তের চেয়েও প্রাণস্পর্শী হয়। এই ছবি আঁকার ব্যাপারে সে এখন এমনি মা'তিয়া উঠিয়াছে যে, সকালে মোটরে করিয়া ষ্টুডিওতে ছুটিয়া আসে। মার নিতান্ত সাধ, মার সামনে বসিয়া আহার করিতে হইবে, তাই দুপুর বেলায় বাড়ী আসিয়া স্নান-আহার সারিতেই হয়; তারপর স্নানাহার সারিয়া আবার সে গাড়ীতে চড়িয়া ষ্টুডিওতে ছোটে। মা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করেন,—শরীর থাকবে কেন রে! তা প্রণব সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।

তাছাড়া মার দুঃখের আরো কারণ ছিল। মা প্রায়

বলিতেন,—বিয়ে কর্ বাবা, তোদের দু'টির বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। আর এ শূন্য পুরীতে থাকতে পারি না! প্রণব হাসিয়া বলে,—বিয়ে করবার সময় কোথায় মা? বিয়ে করলে বৌ নিয়েই মেতে থাকতে হবে যে! আর আমার ছবিগুলি মলিন চোখে আমার পানে চেয়ে চেয়ে নিরাশায় শুকিয়ে মরে যাবে।

মা বলিলেন,—শোনো কথা! ছবি আবার মরে যায় কখনো? বিয়ে করলে নাকি আবার ছবি আঁকা যায় না! শোন্, আমার কথা শোন্, বিয়ে করে তুই বৌ এনে দে দিকি, আমি বল্‌ছি, বৌ আমার কাছে থাকবে, আর তুই তোর ছবি নিয়ে থাকিস্। আমি কোন কথা বলবো না।

প্রণব আবার হাসিয়া বলিল,—সে তার দাবী ছাড়বে কেন মা? বৌ তর্জ্জন করে বলবে, বিয়ে করে আনলে, আর আমায় ছেড়ে ছবি নিয়ে থাকবে? সে হবে না। মাঝে থেকে তোমারো অপবাদ হবে বৌ-কাটকী শাশুড়ী বলে। তুমি কিছুতেই ছেলে ছেড়ে বৌয়ের পক্ষ নিতে পারবে না! তখন তোমার ছেলের যে দুরবস্থা হবে, তা ভেবে তোমার ও-সাধ নিবৃত্ত করো।

মা বলিলেন,—তুই বিয়ে না করলে শশাঙ্কর বিয়েও দিতে পারি না!

প্রণব বলিল,—কেন, সে বিয়ে করুক না। আমি তাকে খুব সবল মনে বড়ার ভবিষ্যতে অনুমতি দিচ্ছি, তা হলেই তোমাদের শাস্ত্রে কোথাও বাধবে না।

মা বলিলেন,—সে কি কখনো হয়! লোকে বলবে কি?

প্রণব বলিল,—লোকের কথায় কি এসে যায়, মা?

মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—তা হয় না বাবা!

প্রণব বলিল,—আমায় মাপ করো মা, আমি বিয়ে করবো না, করতে পারবো না।

মার চোখে জল আসিল! আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মা বলিলেন,—আমার অদৃষ্ট! আমার অদৃষ্টে সুখ নেই, না হলে তোমার এমন সাধ হবে কেন?

শশাঙ্ক কিন্তু প্রণবের পথ অবলম্বন করিতে পারে নাই। বড় লোকের ছেলে মার আদরে প্রায় যেমন হয়, সেও তেমনি হইয়াছে। বি, এ ফেল করিয়া সে পারিষদবর্গ লইয়া প্রথমে গান-বাজনায় উন্মত্ত হইয়া কিছুদিন কাটাইল। তারপর পারিষদবর্গের পরামর্শে প্রকাণ্ড এক মোটরের কারবার খুলিয়া বসিল। সেখানে নানা চরিত্রের নানা মানুষের সংসর্গে আসিয়া রেশ, বাগান-বাড়ী প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ লইয়া মাতামাতি সুরু করিয়া দিল। দশটা-পাঁচটায় কারবারে হাজিরার সময়ে ক্রমে টান ধরিল, মাহিনা-ভোগী কর্ম্মচারীর দল দিব্য দৃষ্টিতে কারবারের ভবিষ্যৎ দেখিয়া নিজেদের ভাগ্য ফিরাইতে মন দিল। কারবারে লোকের আসা-যাওয়া বাড়া ভিন্ন কমিল না, তবে বিল আদায় হয় না, ফেরত আসে, অথচ পাওনাদারের তাড়া বাড়িয়া ওঠে। দুই-চারিটা নালিশও রুজু হইল। উকিল-কৌঁসুলির খরচ ছিল না, সে খরচও দেখা দিল। শেষে কারবারের ফটকে আদালতের পেয়াদা আসিয়া একদিন কুলুপ আঁটিয়া দিল। তখন শশাঙ্কর টনক নড়িল। ব্যাঙ্কে চেক কাটিয়া সে কারবারের দ্বারের তালা খুলিল। দুই তিন মাস আবার সমারোহ করিয়া কারবার চলিল। কারবারের বদ্ধ চাকা পুনরায় যখন বেশ ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন পুরাতন পারিষদবর্গ আসিয়া নূতন আমোদের সংবাদ দিল। নূতন কর্ম্মচারীর হাতে কারবারের ভার অর্পণ করিয়া শশাঙ্ক অমনি পারিষদবর্গ লইয়া রেশে ও বিবিধ আমোদের বিপণির দিকে মোটর হাঁকাইয়া সবেগে ছুট দিল।

গান-বাজনার যে সখ বাড়ীতে অর্গিন-যন্ত্রে প্রথম সাড়া দিয়াছিল, সে সখ ক্রমশঃ নারীর চরণ-নূপুরের মিষ্ট ঝঙ্কারে ও ললিত মদির কণ্ঠস্বরে বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিল! সহরের সৌখীন সমাজে তখন মিস্ রোজ ও প্রেমনলিনীর বেজায় প্রতিপত্তি। শশাঙ্ক মিস্ রোজের নৃত্যের ও প্রেমনলিনীর সঙ্গীতের রীতিমত সমজদার-রূপে সৌখীন-সমাজের ললাটে জয়-টীকার মত জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। চেকের খাতা কলমের আঁচড়ে শশাঙ্কর সহিত বহিয়া ব্যাঙ্কে আসিয়া জমিতে লাগিল। ব্যাঙ্কও হুড়-হুড় করিয়া টাকা ঢালিয়া সে-সব চেকের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

বাড়ীতে এত-বড় সংবাদ কিন্তু একেবারে প্রচ্ছন্ন রহিল। শশাঙ্ক মাকে বলিল, কারবার ফলাও করিয়া তুলিতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন, তাই এত চেকের খাতা এমন করিয়া চট্‌পট্ ফুরাইয়া যাইতেছে। শশাঙ্ক যেখানে যাক্, রাত্রি এগারোটার মধ্যে গৃহে ফিরিত, সুরার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রাখে নাই! প্রণবের কাণে মাঝে মাঝে পারিষদবর্গের সম্বন্ধে দুই-চারিটা মন্তব্য প্রবেশ করিলেও সে ভাবিত, কারবার করিতে গেলে সকল রকমের লোককে হাতে রাখা দরকার। মানুষ যে এমন করিয়া বিগড়াইতে পারে, বিশেষ তার নিজের ভাই শশাঙ্ক,—এ সম্বন্ধে তাহার নিজের মনে তিলার্দ্ধ সংশয় ছিল না। তাই সে কুৎসা-রটনার বারো আনা বাদ দিয়া চার আনা মাত্র কাণে শুনিত। এই জন্যই শশাঙ্ক এমন ভাবে বহিয়া যাইতে পারিয়াছিল। বহিয়া গেলেও মাকে ও দাদাকে শশাঙ্ক সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত, সেই জন্য সুরা স্পর্শ করিতে বা বাহিরে কোথাও রাত্রি কাটাইতে তাহার সাহস হইত না। এমনি ভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনই একদিন রাত্রে পথ-হারা প্রীতিলতা আসিয়া প্রণবের চলন্ত গাড়ীর সম্মুখে সহায়-প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইল।

অত রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া উপরে উঠিয়া প্রণব দেখে, দালানে তাহার খাবার ঢাকা, আর মা সেই ঢাকা খাবারের কাছে একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছেন। একটা দাসী শুধু পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছে।

মা বলিলেন,—তোর আজ বড্ড রাত্তির হয়ে গেছে যে পিনু। এমন করলে শরীর থাকবে কেন?

প্রণব বলিল,—হ্যাঁ, আজ মা একটু রাত হয়ে গেল। বাগান থেকে বেরিয়েছিলুম ঠিক সময়ে; কিন্তু একটু বেড়াবার সখ হল কি না, তাই গঙ্গার ধারে খানিক ঘুরে এলুম।

মা বলিলেন,—এই শীতের রাত্রে? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে।

কলার-কোটটা হুক্-আল্‌নায় খাটাইয়া রাখিয়া কোট খুলিতে খুলিতে প্রণব বলিল,—এই সব জামা গায়ে থাকতেও যদি ঠাণ্ডা লাগে মা, তাহলে তোমার এই দুগ্ধপোষ্য ছেলেটিকে আও্‌রের বাক্সর মধ্যে এবার থেকে ঢেকে রেখো।

মা উঠিয়া খাবারের ঢাকা খুলিয়া দাসীকে এক গ্লাস জল দিতে বলিলেন। দাসী জল আনিতে গেলে মা বলিলেন,—শশী আজ বাড়ী আসবে না, সন্ধ্যার পর মোটর ফিরিয়ে দেছে। ড্রাইভার বলে গেল, ছোট বাবুর নেমন্তন্ন আছে কোথায় বরানগরের ওদিকে, এক বন্ধুর বাড়ী। কাল সকালে ফিরবে। ছ্যাখো দিকি কাণ্ড! যেখানেই তোরা যাস্ পিনু, রাত্রে বাড়ী না ফিরলে আমার এমন অস্বস্তি লাগে!

প্রণব বলিল,—আমি তো কখনো তোমায় ভাবাই না মা।

মা বলিলেন,—আজ কিন্তু তোর জন্যেও ভারী ভাবনা হচ্ছিল। শশী ফিরবে না বলে পাঠিয়েছে, এক রকম খপর পেলুম। তার উপর তোর এত দেরী হচ্ছে, আমার কিছু ভালো লাগছিল না।

প্রণব বলিল,—তোমার এখনো খাওয়া হয়নি?

মা বলিলেন,-- আমি তো কিছু খাবো না। আজ যে একাদশী।

—ও! বলিয়া তাহার জন্য রক্ষিত গরম জল ও সাবান লইয়া হাত-মুখ ধুইয়া তোয়ালেয় মুছিয়া প্রণব আসিয়া একেবারে মার কোলের কাছে বসিয়া ছোট শিশুর মতই ডাকিল,—মা, আমার মা—

মা সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,—তোরা যত বড়ই হ'না কেন বাবা, আমার কাছে এখনো তোরা সেই ছোটটিই আছিস্। আমার কাছে কি আর বড় হবি রে কখনো? তোরা পথে বেরুস্, এখানে-সেখানে যাস্, আমি এখানে সমস্তক্ষণ শিউরে বসে থাকি, ঠাকুরকে কেবল ডাকি আর বলি, বাছাদের আমার নিরাপদে ফিরিয়ে আনো ঠাকুর! তোরা যে বাবা, আমার কাছে এখানো সেই ছেলে বেলার মতই অসহায়, নেহাৎ ছোটটি আছিস্। নয়?

মার কোলে মাথা রাখিয়া প্রণব চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

মার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ও মুখে কি গভীর স্নেহ, কি অসীম মমতা! এই মার মনের সাধ অপূর্ণ রাখিয়া তাঁর প্রাণে কতখানি সে ব্যথা দিতেছে! বিবাহ করা! সে তো খুব সামান্য কাজই! অথচ মার প্রাণ কি গভীর পরিতৃপ্তিতে না ভরিয়া ওঠে.....!

কিন্তু বিবাহ যে করিবার নয়! তাহার আজন্মের সাধ, এই ছবির বর্ণে ছবির ভাষায় নারী-চিত্তের নানা ভাবের বিচিত্র লীলা অপরূপ মধুর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিবে। জীবনে তাহার আর কোন সাধ নাই! কোথা হইতে কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিবে, তাহার সহিত মনের মিল হইবে কি না, কে জানে! এই যে মা আর ছেলের মনে গভীর মিল, নিবিড় বন্ধন,—বৌ আসিয়া যদি এ মিল, এ বন্ধন কাটিয়া দেয়? গৃহের এই বিপুল শান্তিটুকু তাহার ক্ষুদ্র হীন অনুযোগের সুরে যদি ভাঙিয়া ফেলে? প্রণব ভাবিল, ভাঙিবেই বা কেন? এ শান্তি আরো নিবিড়, আরো সুন্দর করিয়াও তুলিতে পারে। থাকুক, ভাঙার ভয়ও যখন আছে, তখন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিবার চেষ্টাই বা কেন!

ছেলের গালে-মুখে হাত বুলাইয়া মা কহিলেন,—নে, ওঠ্ দিকি, খেয়ে নে, অনেক রাত হয়ে গেছে। বেশী রাত্রে খেলে অসুখ করবে।

প্রণব উঠিয়া খাইতে বসিল। নিঃশব্দে সে খাইতেছিল, আর ভাবিতেছিল, আজিকার রাত্রে এইমাত্র যে মস্ত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কথা। দুর্ভাগিনী প্রীতি! কোথাকার এই অপরিচিত জীব, এ কোথায় আসিয়া পড়িল! কোথায়ই বা কাল যাইবে! প্রণবের জীবনের পথে এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়া কোথায় আবার চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে। শুধু একটু স্মৃতির ক্ষীণ আভাস হয় তো জাগিয়া থাকিবে! কি তাহার পরিচয়? কোন্ গৃহ-কাননে ছোট্ট ফুলের কুঁড়ির মত এক নব-নির্ম্মল প্রভাতে দেখা দিয়াছে, তারপর ফুলটি যেই ফুটিয়া উঠিল, অমনি কার নির্ম্মল অঙ্গুলি-পীড়নে একেবারে পথের মধ্যে ছিট্‌কাইয়া পড়িল! এ কি দায়িত্ব কোথা হইতে তাহার ঘাড়ে আসিয়া জুটিল! রাত্রির এই কয়দণ্ড মাত্র প্রণব যা-একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু কাল? দিনের আলোর সঙ্গে চারিধার যখন লোকের কোলাহলে ভরিয়া উঠিবে, তখন দুর্জ্জেয় হেঁয়ালির মত এই তরুণী নারীকে

লইয়া সে কি করিবে? মার কোলেই আনিয়া ফেলিবে? প্রণব ভাবিতে লাগিল।

মা বলিলেন,—কি ভাবচিস্ রে পিন্টু? অমন চুপ করে খাচ্ছিস্ যে! কি আঁকাল আজ, কিছু বল্‌চিস্ না?

প্রণব এক ঢোক জল খাইয়া বলিল,—এঁ্যা, না, বিশেষ কিছু এমন আজ আঁকিনি মা। একটা ছবির জমি তৈরী করেচি শুধু। ভাবচি, খুব একটি সুন্দর মেয়ের ছবি আঁকবো—তার নাম দেবো, কৈশর।

মা বলিলেন,—কি করে আঁকাব?

প্রণব বলিল,—একটি খুব সুন্দর মেয়ের মুখ চাই মা, তাই ভাবচি।

মা বলিলেন,—যদি বিয়ে করতিস্, তাহলে আমি কেমন একখানি সুন্দর মুখ দিতে পারতুম!

প্রণব হাসিয়া বলিল,—ক্ষেপেচো মা! যে মুখ কল্পনাতেও আমি আনতে পারি না, সেই মুখ তুমি ঘরের কোণ থেকে জোগাড় করে দেবে!

মা ও ছেলের মধ্যে কথাবার্তায় কোন আইন বাঁধা ছিল না। ছেলের মনে যে কথা, যে চিন্তা যেমন উদয় হইত, সরলভাবে অসঙ্কোচেই সে তাহা মার কাছে খুলিয়া বলিত; মাও সানন্দে সগর্ব্বে সে কথা শুনিতেন।

প্রণব বলিল,—এটা যদি ঠিক আঁকতে পারি মা, তাহলে আমি আর একখানা মস্ত ছবি আঁকবো। দেখো, সে ছবি এঁকে জগতে অমর কীর্ত্তি রেখে যাব।

মা সাগ্রহে বলিলেন,—কি ছবি?

প্রণব বলিল,—মার ছবি আঁকবো। একেবারে জগদ্ধাত্রীর রূপ!

মা বলিলেন,—তুই তো ভারী ঠাকুর-দেবতা মানিস্, তুই আঁকবি জগদ্ধাত্রীর রূপ!

প্রণব বলিল,—সে জগদ্ধাত্রীর কল্পনা তোমার শাস্ত্র ধারণাও করতে পারে নি, কোনদিন। ও সিঙ্গী-মিঙ্গী লটবহরের ধার ধারে না, আমার সে জগদ্ধাত্রী।

মা বলিলেন,—কি করে আঁকবি তুই?

প্রণব বলিল,—কেন, এই তোমার মূর্ত্তি! তোমার এই মুখখানি—মুখে চোখে গভীর স্নেহ, অসীম মমতা উছলে পড়চে। এই নিশ্চিন্ত বরাভয়প্রদ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এই রূপ, আর এই দুখানি পা, লক্ষ পদ্ম তোমার এই দুই পায়ে ফুটে আছে, মা!

মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আর জ্বালাস্‌নে বাপু, তুই থাম। দেবতার কথায় মস্করা!

প্রণব বলিল,—মস্করা নয় মা। আর কোন দেবতা মানিনে আমি। আমার এই দেবতা প্রসন্ন থাকলে আমি তোমার খোদ্ সেই খোদারও কোন তোয়াক্কা রাখি না।

মা বলিলেন,—জানি, জানি বাপু, তুই থাম্। তোর সব বাড়াবাড়ি। নে, তোকে আর বক্‌তে হবে না, তুই চুপ করে খা এখন! ক্ষ্যাপা ছেলে ক্ষেপে উঠলো!

প্রণব আবার নিঃশব্দে আপনার ভাবনার বোঝা খুলিয়া বসিল। মাকে প্রীতির কথা খুলিয়া বলিবে?

আবার সে ভাবিল, থাক! কাল তাহার পরিচয় লইয়া যদি যথা-স্থানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সব গোলই চুকিয়া গেল! তখন না হয় মাকে বলিবে,—কি করিয়া এক নারীকে তাহার কি বিপদে সে রক্ষা করিয়া ছিল।

আর যদি এমনই হয়, সত্যই তাহার কোন আশ্রয় না থাকে? কোথাকার কে,—জানা নাই, শোনা নাই, একেবারে গৃহে আনিয়া ফেলিবে! এ বাড়ীতে পাঁচ রকমের আরো পাঁচজন মানুষ আছে, তাহারা বেচারীকে কি চক্ষে দেখিবে, কে জানে? যদি কেহ একটা রূঢ় বা অপমানের কথা বলিয়া বসে? না, না,—বেচারী! আহা! মনের দুঃখে একেবারেই সে তাহা হইলে মরিয়া যাইবে।

তবে সে তাহাকে অপর কাহারো জিম্মা করিয়া দিবে কি? সেই ঠিক। কিন্তু কত দিনের জন্য? হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এমনি পরের জিম্মায় তাহাকে থাকিতে হইবে! এ ভার লইবেই বা কে? লইলেও প্রীতি তাহাতে রাজী হইবে কেন? তার চেয়ে সব কথা খুলিয়া বলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বেকার যথাস্থানে পাঠানোই সব-চেয়ে ভালো। এতকাল নিরাপদে যেখানে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ এমন কি হইল যে সেখানে সে আর ফিরিতে চায় না? এ মুহূর্ত্তের উত্তেজনা! শুধু আতঙ্ক! আজ রাত্রে সে উত্তেজনা কমিয়া যাইবে, সে আতঙ্কও মুছিতে পারে! তবে আর কি!

প্রণবের মন অমনি হু-হু করিয়া উঠিল। নিজের হাতে যাহাকে সে রক্ষা করিয়াছে, কালই সে হস্তচ্যুত হইয়া কোথায় ভবিষ্যতের কোন্ অদৃশ্য গহনে চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে,—এ কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র মন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনের অতল-তল অবধি গভীরভাবে তলাইয়া দেখিল।

প্রীতিলতা সেই ক্ষণিক আলাপে মনের মধ্যে বেশ একটু সুদৃঢ় রেখা পাত করিয়াছে! সে একেবারে চোখের বাহিরে চলিয়া যাইবে, হাজার মনে করিলেও তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না—এ কথাটা কাঁটার মত প্রণবের মনে বিঁধিল। মন টাটাইয়া উঠিল। জোর করিয়া প্রণব মনকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এ কি হীনতা তাহার মনে আজ সাড়া দিয়া উঠিতেছে প্রীতি—সে

তাহার কে? কেন তাহার জন্য আজ এ মিথ্যা অনুরাগ? জীবনের পথে এমন কত লোক যে নিত্য আসিয়া দুই-চারিটা আলাপ করিয়া কোথায় আবার চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের কাহাকেও তো কোনদিন নিবিড় বাঁধনে বাঁধিবার আগ্রহ হয় না—তবে এ মেয়েটির জন্যই বা আজ কেন এ আগ্রহ। সে-ও যাক্—ঐ সমস্ত পথিকদের মত এই স্মৃতিটুকুকে ক্ষণিক আঁচড়াইয়া দিয়াই সেই পথে সরিয়া যাক্!

কিন্তু সেই মুখখানি, দুই অধীর চোখে সেই ম্লান ছল-ছল দৃষ্টি! সে যে ভুলিবার নয়! প্রণব ভাবিল, ভুলিতেই হইবে। কোথাকার মেয়ে, কাহার মেয়ে, কাহার স্ত্রী সে! তাহার কথা এ-ভাবে চিন্তা করাও অন্যায়। খুব অন্যায়। প্রণব স্থির করিল, যেমন করিয়া হৌক, প্রীতিলতাকে বিদায় দিয়া জীবনের পথ হইতে একেবারে সে হঠাইয়া দিবে। তাহার মন উহার কল্পনা লইয়া তন্ময় থাকুক। সে আর কিছু চাহে না। আর কিছুতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ঘরে তাহার এই জগদ্ধাত্রী মা, স্নেহের ভাই শশাঙ্ক, আর তাহার চির-সাধের ছবির কল্পনা—ইহারাই তাহার সর্ব্বস্ব! লক্ষ প্রীতিলতা আসিয়া যদি পথে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, তবু সে অনায়াসে তাহাদের পাশ কাটাইয়া নিজের লক্ষ্যপথে চলিয়া যাইবে। দুর্ব্বল মন তাহার উপর আধিপত্য করিবে? কখনো না। প্রীতিলতা—সে একটা স্বপ্নমাত্র! স্বপ্ন ছাড়া তাহার আর কোন অস্তিত্ব নাই!

—৩—

সকালে যখন প্রণবের ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন আটটা বাজিয়াছে। প্রণব দড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই—যেটুকু হইয়াছে, স্বপ্নময়। প্রীতির সেই সুন্দর মুখ, আর সেই মুখের কাকুতি ভরা আকুল স্বর কেবলি তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বাতাসটাকে আক্রান্ত ভারী করিয়া তুলিয়াছে। সারা রাত্রি অনিদ্রার পর ভোরের দিকে ঘুমটা গাঢ় হইয়া দুই চোখ ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

প্রণব উঠিয়া বাহিরে আসিতে মা বলিলেন,—তোর চা দিয়ে যাক্ এইবার?

প্রণব বলিল,—এত বেলা অবধি ঘুমিয়েচি মা, ডাকোনি আমাকে?

মা বলিলেন,—তোর ঘরে এসে দেখলুম, তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস্, তাই ডাকিনি,—অত রাত্রে খেয়ে শুয়েচিস্।

প্রণব বলিল,—তাইতো মা, বড্ড যে দরকারী কাজ ছিল আজ।

মা হাসিয়া বলিলেন,—সেই সুন্দর মুখ আঁকা তো? ভারী দরকারী কাজ তোর,—থাম্! তার চেয়ে বল্, আমি একটি সুন্দর মুখ খুঁজে বের করি, তোর জন্যে। সেটা বেশী দরকারী কাজ।

প্রণব সে কথা কানে না তুলিয়া বলিল,—শশী ফিরেচে?

মা বলিলেন,—হ্যাঁ। এই আধ ঘণ্টা আগে ফিরে সে চান্ করতে গেল। কাল সারা রাত ঘুমোতে পায় নি, বল্লে। মুখের যা শ্রী হয়েচে!

প্রণব মুখ-হাত ধুইয়া দালানে একটা ইজি-চেয়ারে গিয়া বসিল। মা বলিলেন,—তার জন্যে আমার ভাবনা হয়েছে আজ। সত্যি, কি যে করে বেড়াচ্ছে, তাও বুঝছি না! কম টাকা তো বার করেনি ব্যাঙ্ক থেকে!

একটু অন্যমনস্কভাবে প্রণব শুধু বলিল,—হুঁ।

মা বলিলেন,—যে বয়সের যা। পুরুষ মানুষের যে বয়সে বিয়ে করা উচিত, তোদের এখন সেই বয়স। এখনো হেল্লো-ফেল্লো করে বেড়াবি দুজনে? টাকার অভাব নেই, মানি—কিন্তু তার একটা সীমা আছে তো। কাজ-কর্ম্ম নাই করলি—বিয়ে থা কর্, না হলে সংসারে মন বস্‌বে কেন? আমি গেলে সংসার চালাবে কে? চাকর-বামুনের উপর নির্ভর করে মানুষের চলে না, সত্যি। তা যদি চল্‌তো, তাহলে লোকে আর সংসার করতো না, মেশেই পড়ে থাকতো।

চায়ের পেয়ালা আসিয়াছিল। প্রণব হাতে করিয়া বলিল,—তা যদি থাকতো মা, তাহলে সুখেই থাকতো সকলে। এই যে দেশব্যাপী দারিদ্র্য হাহাকার, এরও কিছু কম্‌তি হতো। ভাবো দেখি মা, বাঙালীর ছেলেমাত্রেরই এই যে বিয়ে করা একটা মস্ত ব্যাধি আছে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে দমাদম্ সব বিয়ে করে বসচে, এর ফলে হয় কি? এক-একটা প্রকাণ্ড পরিবার গড়ে তুলচে, যার ভিতে জোর নেই, নেহাৎ পল্‌কা! রাশ-রাশ ছেলে-পিলে হচ্ছে, তারা না খেয়ে রোগে ভুগে জিরজিরে হাড়ের বোঝা বয়ে সংসারটাকে বিশ্রী কুৎসিত শ্মশান করে তুলচে, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-শান্তি নষ্ট করচে,—এ কি ভালো, মা?

মা বলিলেন,—বাঙালীর ছেলেগুলো যদি বিয়ে না করে, তাহলে বাঙালী মেয়েগুলোর গতি কি হবে, শুনি? তারা তো আর মেশে থেকে চাকরি করতে যাবে না!

প্রণব এক চুমুক পান করিয়া চায়ের পেয়ালা নামাইয়া বলিল,—তোমারো মুখে ঐ কথা শুনবো, মা? সন্তান প্রসব করা আর তাদের খাওয়ানো ছাড়া মেয়েদের আর কোন কাজ নেই? লেখাপড়া শিখুক, গান-বাজনা শিখুক, ছবি আঁকতে শিখুক, লোকের সেবা-শুশ্রূষা করতে শিখুক! পৃথিবীতে কাজের আবার অভাব? দেশের দারিদ্র্য দূর করবে, শিক্ষা দেবে, মনটাকে দরাজ করবে…

মা হাসিয়া বলিলেন,—শিক্ষা কাকে দেবে রে? সবাই যদি আলাদা-আলাদা ঐ সব নিয়ে থাকে, তাহলে দশ বছর বাদে বাঙালীর সংসারই যে লোপ পাবে। মানুষ আসবে কোথা থেকে?

প্রণব বলিল,—আমি কি তাই বলচি যে কেউ বিয়ে করবে না? বিয়ে করবে—কিন্তু কখন্? যখন পুরুষ নিজের পায়ের জোরে দাঁড়াতে পারবে, সংসারের দায়িত্ব বয়বার যোগ্য হবে। উপার্জ্জন করে বুঝবে, চার-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে জন্মালে তাদের মুখে অন্ন, পরণে কাপড় আর রোগে ওষুধ দিতে পারবে, তখন বিয়ে করবে। আর যারা এ-কাজের যোগ্য হবে, তারাই বিয়ে করবে শুধু। স্ত্রীলোককে তার রীতিমত মর্য্যাদা দিতে যে পুরুষ সক্ষম, সেই শুধু তাকে বিয়ে করবার যোগ্য—অক্ষম পুরুষের পা-থ্যাৎলানি খাবার জন্য নারীর জন্ম হয় নি। পুরুষের বোঝা উচিত, তার দাম নারীর চেয়ে এক পাই বেশী নয়—সে-ও যে, নারীও সে। নারীকে বিয়ে করে তাকে সে কৃতার্থ করে না, নিজেই বরং কৃতার্থ হয়।

মা হাসিয়া বলিলেন,—নে বাপু, তোর বক্তৃতা রাখ্। তুই ছবি এঁকে বেড়াস—সংসারের কি জানিস্? মেয়েদের পুরুষ বৈ গতি নেই। পুরুষ নিগুর্ণ হোক, নির্ধন হোক, মেয়েরা তাদের পানেই চেয়ে থাকবে নিজেদের আশ্রয়ের জন্যে। মেয়েদের বুদ্ধি কম, বলেরও তাদের তেমনি অভাব। বাইরের সঙ্গে লড়বার সে শক্তি কি মেয়েদের আছে রে?

প্রণব সবল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ভুল মা, এইটি মহা-ভুল। নিজেকে নিয়ে তুমি দ্যাখো না মা। বাবা যখন মারা যান্, তখন আমরা কত ছোট। তারপর এই তুমিই তো মা, আমাদের দু ভাইকে মানুষ করেচো, লেখা-পড়া শিখিয়েচো। কৈ, যেটাকে ভুল পথ বলে, সে পথে চলবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের হয় নি—অথচ তার সুযোগ ছিল কত! তুমি স্ত্রীলোক হয়েও যে স্নেহ-শাসনের দণ্ড ধরে সিংহাসনে বসে আছ, অনেক পুরুষকেও তেমন দেখি না। তার সাক্ষী দেখ মা, ঐ মিত্তিরদের বাড়ীর শচীনকে। বাপ কড়া শাসন নিয়ে আর মা গভীর স্নেহে ঘিরে শচীনকে মানুষ করে তুলতে পারলেন না। আর তুমি বলো কি না, নারী পুরুষের চেয়ে হীন!

মা বলিলেন,—তুই থাম্ পিনু। তোরা যে খারাপ হোস্ নি, সে কি আমার গুণে বাবা? সে তোরা ভালো বলেই শুধু। নাহলে সত্যি যদি খারাপ পথে যেতে, আমি কি ঠেকিয়ে রাখতে পারতুম? আমার গণ্ডী তো এই বাড়ীর সদর অবধি—বাড়ীর বাইরে আমার জোর চলে না, নজর চলে না—আমি মেয়ে মানুষ। কিন্তু পুরুষের গণ্ডী ঘর ছেড়ে বাইরে অবধি চলে। তা, ও কথা যাক্—তুই যা বলচিস্, তোর কথাতেই বলি, তোদের দু' ভাইয়ের জন্য তিনি যা রেখে গেছেন, তাতে তোদের পয়সার অভাব হবে না, তবে তোরা বিয়ে করবি না কেন?

প্রণব বলিল,—আবার সেই কথা আনলে মা! আমি বলচি তো, আমার বিয়ে করা চলবে না। আমি খেয়ালী মানুষ, বিয়ে করে পরের মেয়ে এনে তাকে শেষে অযত্ন-অনাদর করবো কি! সে বেচারীর নিশ্বাসে তোমাকেও হয়তো শেষে পুত্র-শোক পেতে হবে।

মা বলিলেন,—ষাট্, ষাট্! থাম্ বাপু, তোকে আর বিয়ে করতে বলবো না কখনো। আমার অপরাধ হয়েচে। মার স্বর শেষ দিকটায় অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল।

প্রণব বলিল,—শশী বিয়ে করুক না মা, সে বেশ হবে'খন। ওর ছেলে-মেয়ে হবে, আমায় জ্যাঠাবাবু বলে ডাকবে, তাদের কোলে-পিঠে করে আমার ষ্টুডিওতে নিয়ে যাবো, তাদের ছবি আঁকবো—সে ছবির নাম দেবো, 'আনন্দ'। সে বেশ হবে,...না মা?

মা বলিলেন,—তোর যেমন শশীকে দিয়ে সাধ মেটাতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি তেমনি তোদের দুজনকে দিয়েই সাধ মেটাতে চাই যে পিনু!

প্রণব বলিল,—ঐ তো মা, তোমার দুষ্ট বুদ্ধি!

এমন সময় শশাঙ্ক স্নান সারিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া সে বলিল,—মা, আজ আমাকে একটু সকাল-সকাল খেতে দাও দিকি।

মা বলিলেন,—কেন? আবার কোথায় যাবি? এই বললি, কাল সারা রাত ঘুমোতে পাসনি। খেয়ে-দেয়ে এখন একটু ঘুমো দেখি, ঘরে শুয়ে।

শশাঙ্ক বলিল,—হবে না মা। আজ অফিসে একবার যেতেই হবে। কতকগুলো বড় বড় কাজের ডেলিভারী দিতে হবে—অফিসার সাহেবদের কাজ।

প্রণব বলিল,—কারবার কেমন চলছে রে? নজর রাখচিস্ ঠিক?

শশাঙ্ক বলিল,—রাখচি বৈ কি।

প্রণব বলিল,—তবে যে মা বলছিল, অনেক টাকার চেক্ কাটচিস্! কেন, এত টাকার কিসের দরকার হচ্ছে? বিল আদায় হচ্ছে না, না কি?

শশাঙ্ক একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—বিল কি সব সময় ঠিক আদায় হয়? তা ছাড়া কতকগুলো যন্তর আনাতে হলো কি না!

প্রণব বলিল,—যাই করো শশী, কারবারটা নষ্ট করে ফেলো না। লোকের সঙ্গে dealings যেন সর্ব্বদা straight থাকে। আর যত-বড় বিশ্বাসী লোকের উপরই কাজের ভার দাও, নিজের নজর কখনো আলগা করো না। তাহলে বিশ্বাসী লোককেও অবিশ্বাসী হবার সুযোগ দেবে, এটুকু মনে রেখো!

লেক্‌চার-বিরোধী শশাঙ্কর এ লেক্‌চার তেমন ভালো লাগিল না। মুখে সে শুধু বলিল,—সে তো নিশ্চয়। তারপর মাকে বলিল,—আমাকে খেয়ে নিয়ে শীগ্‌গির বেরুতে হবে, মা। না বেরুলে নয়। এইটুকু বলিয়া শশাঙ্ক সে স্থান ত্যাগ করিল।

মা বলিলেন,—আমি কিছুই বুঝতে পারচি না, পিন্নু। ওর এত কি কাজ বেড়ে গেল, বল্ দেখি? আমি আজ ক'দিন ধরে দেখচি, ও আর আগেকার মত আমার সঙ্গে দু-চার দণ্ড যে স্থির হয়ে বসে কথা কবে, তারও ফুরসৎ পায় না। আর জীবন বলছিল, ক্রমাগত নাকি চেক্ কাটচে। একবার তুই গিয়ে দেখে আসিস্ যদি তো ভালো হয়। যে সব নন্দী-ভৃঙ্গী সঙ্গী জুটেচে, তাদের মাথার চুল ছাঁটার ধরণ দেখে আমার গা কেমন শিউরে ওঠে! যেমন চুলছাঁটা, তেমনি সব পাঞ্জাবি গায়ে! জামার ঝুল নেমেচে সেই হাঁটুর নীচে অবধি। মাগো, কি কদাকার!

প্রণব বলিল,—আমি তাহলে এখন উঠি মা। দু' একদিনের মধ্যে ওর অফিসে যাবো'খন। এত টাকার কি যন্তর এলো, একবার দেখেও আসবো। তবে অন্য ভয় নেই মা, ভেবো না—তোমারি পেটে ও জন্মেচে।

মা একটু উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন,—তাই হোক্, বাছা! কারবার ঘুচিয়ে দিয়ে ও না হয় ঘরে বসেই গান-বাজনা করুক! প্রাণ থাকৃতে তাদের কোন কলঙ্কের কথা যেন কানে না শুনতে হয়, দোখস্।

প্রণব উঠিল। মা বলিলেন,—কখন্ ফিরবি?

প্রণব বলিল,—যেমন সময়ে ফিরি।

—৪—

বাহিরে আসিয়া প্রণব ছোট মোটরের পরিবর্ত্তে বড় মোটর লইল; সোফারকে বলিল, সে নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া যাইবে, তাহাকে প্রয়োজন নাই।

প্রণব স্থির করিয়াছিল, বড় মোটর লইয়া যাওয়াই ঠিক। এই দিনের আলোয় একজন অপরিচিতা তরুণীকে সহরের বুকের উপর দিয়া টু-সীটার কারে পাশে বসাইয়া লইয়া আসা ভালো দেখাইবে না। নিজের জন্য সে ভাবে না, তবে সেই স্ত্রীলোকটির সম্ভ্রম রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য তো। প্রীতিলতাকে মার কাছেই আনিয়া দিবে, স্থির করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী যখন ভবানীপুরে অচলের বাসায় পৌছিল, বেলা তখন দশটা।

অচল তখন বাহিরের ঘরে চিন্তাকুলভাবে বসিয়া ছিল; প্রণব আসিতে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইল।

অচল বলিল,—মেয়েটি কে প্রণব?

প্রণব প্রথমটা কেমন ভড়কাইয়া গেল, চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না; পরমুহূর্ত্তে সে অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—দূর-সম্পর্কে বোন্ হয়। বিপদে পড়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল!

অচল বলিল,—হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কাছেও শুনলুম। আমার স্ত্রীর কাছে উনি সব বলেচেন। ওঁর স্বামীর সঙ্গে শত্রুতা করে কে তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বার করিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেছে না কি! পাড়ার লোকের সঙ্গে স্বামীর তেমন সদ্ভাব নেই, ওঁরা একটু ব্রহ্ম ধরণের বলে,—কাজেই তোমাদের ওখানে খবর পাঠিয়ে তোমায় আনিয়েচেন.—তুমি ওঁকে এখানে নামিয়ে থানায় ওঁর স্বামীর জামিনের চেষ্টায় ছুটে গেছ্‌লে!...তা, জামিন পেলে?

প্রণব বলিল,—না।

অচল বলিল,—এই ভবানীপুরের থানাতেই?

প্রণব আর একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—না। কোথায় নিয়ে গেছে, এরা তা জানে না।

—উপায়?

—দেখি। বলিয়া প্রণব একটু থামিল; পরে বলিল, —আগে এঁকে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দি, তারপর একজন উকিল ধরে সন্ধান নিই। হাঁ, তাহলে আর দেরী করবো না, তুমি ভাই ওকে ডেকে দাও।

অচল বলিল,—দি ডেকে।

অচল উঠিয়া গেলে প্রণব ঘরের মধ্যে অধীরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে ভাবিল, প্রীতি তাহা হইলে বেশ একটা গল্প বানাইয়া বলিয়াছে তো! ভাগ্যে সে ও বিষয়ে কোন কথা বলে নাই, তাহা হইলেই গল্পটার ফাঁক চট্ করিয়া অচলের চোখে ধরা পড়িত, আর অচল কি একটা বিশ্রী ব্যাপার কল্পনা করিয়া লইত!

প্রণব তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল, ভাবিল, তবে কি গল্পটার মধ্যে সত্যের ইঙ্গিতও আছে? সত্যই কি তাহা ঘটিয়াছে? বেচারার স্বামী ওয়ারেণ্টে ধরা পড়িয়া পুলিশের হেফাজতে আছে...

পরক্ষণেই সে ভাবিল, গল্পটা যদি আগাগোড়া বানানো হয়? তাহা হইলেও ভদ্র ঘরের মেয়ে প্রীতি,—সে এই সব ওয়ারেণ্ট পুলিশ...এ সব কথাগুলা মাথায় আনিল কেমন করিয়া? ভাবিতে ভাবিতে ব্যাপারটা তাহার মনে অস্পষ্ট ঘোলাটে হইয়া উঠিতে লাগিল। কে এ নারী? কে...?

তারপর সে ভাবিল, সত্যই যদি প্রীতি ভদ্রঘরের মেয়ে না হয়? তাহা হইলে পরিচয় না লইয়া নিজের গৃহে মার পায়ের কাছে একেবারে উহাকে দাঁড় করাইবে কি বলিয়া? না,—পরিচয় লইবার পূর্ব্বে দাঁড় করানো হইবে না! সে স্থির করিল, প্রীতিকে লইয়া

সে আপাততঃ ষ্টুডিওতেই যাইবে। সেখানে যাহাতে তাহার কোন অসুবিধা না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। ইহাতে একটু ভাবিবার সময় পাওয়া যাইবে! চট্ করিয়া এমন কাজ করিয়া বসিবে না, যাহাতে ভদ্র-ঘরের মেয়ে হইলে প্রীতির এতটুকু সম্ভ্রম-হানি ঘটিতে পারে! আর যদি এমন হয়, সে অভিমান করিয়া বা ভয় পাইয়া ক্রুদ্ধ স্বামীর ঘর ছাড়িয়া সেই গভীর রাত্রে পথে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আবার তাহাকে স্বামীর ঘরেই পৌঁছাইয়া দিবে। বেচারীকে তাহা হইলে আর জন্মের মত সারা জীবনটাকে খোয়াইতে হইবে না।

অচল আসিয়া বলিল,—উনি স্নান করতে গেছলেন, স্নান হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী একটু জল না খাইয়ে ছাড়বেন না, বলেলেন। এখনি আসচেন।...তা তুমিও কিছু খাও, প্রণব।

—না ভাই, আমার এখন খাবার ফুরসৎ নেই। বুঝচো তো, এখনি আমায় কি ছুটোছুটি করতে হবে। বাড়ীতে এঁকে পৌঁছে দিয়ে মুখে দুটি ভাত গুঁজে আবার বেরুবো।

অচল বলিল,—আর্টিষ্টের মন্দ গ্রহ নয়! তাহলে আর বলবো না। ঐ যে উনি এসেচেন, তুমি তাহলে ওঠো। I wish you good luck.

প্রীতি সদরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পিছনে অচলের স্ত্রী অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছিল; প্রণব আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—নমস্কার বৌদি, কাল আপনি এঁর সম্ভ্রম রক্ষা করে বড় দায়ে বাঁচিয়েছেন। তার জন্য ধন্যবাদ! তারপর প্রীতির পানে চাহিয়া বলিল,—আপনি আসুন, আর দেরী করবেন না। বলিয়াই সে জিভ্ কাটিল। তাই তো, প্রীতি বয়সে তার চেয়ে ছোট! তাহাকে এই আপনি বলিয়া সম্ভাষণ এ যে ভালো শুনাইল না। কিন্তু তখন আর সামলাইবার উপায় নাই, সে সময়ও নাই! সে আসিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া হুইল ধরিয়া বসিল। প্রীতিলতা উঠিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিলে গাড়ী চলিল।

—৫—

গাড়ী আসিয়া ষ্টুডিওতে পৌঁছিলে উভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে গেল।

বাংলো ধরণের বাড়ীখানি বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ছবির মত! প্রীতি কম্পিত বুকে ঘরের মধ্যে আসলে প্রণব বলিল,—এই চেয়ারটায় বসুন। প্রীতি বসিল।

সেখানি মাঝের ঘর; সোফা-কৌচে সাজানো। দেওয়ালের গায়ে বড়-বড় ছবি; প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নর-নারীর নানা ভাবের নানা মুখের চিত্র। অনেকগুলি ছবি প্রণবের নিজের হাতে আঁকা। প্রীতি বসিলে প্রণব ঘরটার মধ্যে কয়বার পায়চারি করিয়া বেড়াইয়া একটা কৌচে বসিয়া পড়িল; বসিয়া প্রীতির পানে চাহিয়া বলিল,—আজ এবেলায় এখানে থাকতে হলে আপনার কষ্ট হবে। তাই বলছিলুম, কোথায় আপনাকে রেখে এলে আপনি নিরাপদে থাকতে পারেন, বলুন দিকি!

প্রীতির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এই পরিপাটী সাজানো নির্জ্জন গৃহের মধ্যে একটু হাঁফ ছাড়িবার অবসর সে যেমন পাইয়াছে, অমনি এই প্রশ্ন! কোনমতে সঙ্কোচটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত মিনতির স্বরে সে বলিল,—কাল রাত্রের আতঙ্কটুকু আমি এখনো মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারি নি। দয়া করে একটু সময় দিন আমাকে। চারিধারটা একবার ভেবে নি। তারপর ...চলেই যাবো আমি। আমার জন্য আপনাকে বিপন্ন বা দায়গ্রস্ত করে রাখবো না। এইটুকু বলিয়াই দুই চোখের উদাস দৃষ্টি লইয়া প্রীতি ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো একখানা বড় ছবির দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রণবও ভাবনায় পড়িয়াছিল। এই অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীর কথা কাল রাত্রে কতবারই যে না ভাবিয়াছে! ইহাকে মডেল করিয়া 'কৈশোর' ছবিখানি আঁকিতে পারিলে কেমন হয়? বেশ হয়। কিন্তু ভদ্রঘরের মহিলাকে নিজের একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আটকাইয়া রাখিতে পারে না তো। তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সম্ভাবনাও আছে প্রচুর, অথচ ছাড়িয়া দিবার কথা মনে উদয় হইবামাত্র প্রাণটা কেমন হাহাকার করিয়া ওঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ধরিয়া রাখাও তো চলে না!

প্রণব বলিল,—বেশ, স্বচ্ছন্দে দু'দিন আপনি এখানে থেকে ভেবে-চিন্তে নিতে পারেন। আপনার নির্জ্জনতাটুকুও এখানে ক্ষুণ্ণ হবে না, এ আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি।

প্রীতি একটু বিস্ময়ের সহিত কহিল,—আপনার বাড়ীর লোকজন কাকেও দেখি না যে!

প্রণব একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—না। এখানে তাঁরা কেউ থাকেন না। তারপর প্রণব আপনার পরিচয় খুলিয়া বলিল। বাড়ীতে মা ও ছোট ভাই। দুই ভাইয়ের কেহই এখনো বিবাহ করে নাই; মা সেজন্য কত অনুযোগ করেন। ছবি আঁকিবার সুবিধার জন্য এই বাগান-বাড়ীটা ছয়মাস হইল, সে কিনিয়াছে। প্রথমে ভাড়া লইয়াছিল, তারপর পছন্দ হইয়া গেল। জায়গাটুকু নির্জ্জন, কোন গোল নাই। এ-বাড়ীর অধিকাংশ ছবিই তাহার হাতে আঁকা। এখানে থাকে শুধু দরোয়ান, একটা ভৃত্য ও দু'জন মালী। সকালে সে বাগানে আসিয়া ছবি আঁকে, বেলা এগারোটায় বাড়ী যায়,

তারপর আহারাদি সারিয়া দুটা-তিনটার সময় আবার আসিয়া রাত্রে বাড়ী ফেরে।

পরিচয় দিয়া প্রণব শেষে বলিল,—দু'দিনের জন্যে যদি এখানে আপনাকে থাকতে হয়, তাহলে আজই আমি দরোয়ানকে বলে দি, একটা বামুনী আর একটা ঝী এনে দিক্।

প্রীতি কি ভাবিতেছিল, চিন্তিত স্বরেই বলিল,—বামনী? বামনী কি হবে?

প্রণব বলিল—আপনাকে খেতে-দেতে হবে তো।

প্রীতি বলিল,—নিজের বান্না নিজেই আমি রেঁধে নিতে পারবো'খন। অনর্থক আপনি ও-সব ঝঞ্ঝাট করবেন না।

প্রণব বলিল,—সে হয় না।

প্রীতি গোঁ ধরিয়া বলিল, হইতেই হইবে। এই সামান্য ব্যাপারে অনর্থক দুই দিনের জন্য একটা বামনী আনার কোন প্রয়োজন নাই। তবে ঝী? নেহাৎ একলা না থাকিতে হয়! আগলাইবার জন্য তত না হোক, কথা কহিবার জন্য মন্দ হইবে না বটে।

প্রণব বলিল,—বেশ, তাই হবে। তারপর একটু স্তব্ধ থাকিয়া প্রণব আবার বলিল,—দেখুন, আমার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাইনি বলে' হয়তো আপনি অপরাধ নিতে পারেন। সেজন্য কারণটা খুলে বলা আমার পক্ষে দরকার... প্রথমতঃ আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা, দৈবাৎ বিপদে পড়ে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এ অবস্থায় আমাদের বাড়ী গেলে পাঁচজনের কৌতূহলী চোখের সামনে আপনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়বেন, সেটা আপনার বরদাস্ত না হওয়াই সম্ভব। বাড়ীতে যদি শুধু আমরা দুটি ভাই আর আমার মা থাকতুম, তাহলে কোন দ্বিধা না করে কাল রাত্রেই আপনাকে একেবারে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতুম।

প্রীতি বলিল,—এ আপনি খুব ভালো ব্যবস্থাই করেচেন। আমার মনের যে-রকম অবস্থা হয়ে রয়েছে, তাতে আপনাকেও সমস্ত ব্যাপার খুলে-বলবার মত মনের বল এখনো পাই নি। সমস্ত কাণ্ডটা এমনি হঠাৎ ঘটে গেছে, আর তা শুনতে এমনি কাল্পনিক গল্পের মত যে আমিও গুছিয়ে সবটুকু ঠিক বলতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। এমন অবস্থায় লোকালয়ের মাঝখানে দাঁড়াতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যাবে। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছে, আমার অবস্থা বুঝে ভগবান ঠিক যোগ্য আশ্রয়েই আমাকে এনে ফেলেচেন!

এই অবধি বলিয়া প্রীতি চুপ করিল; চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

প্রণব বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম।

চমকিয়া প্রণবের পানে ফিরিয়া চাহিয়া প্রীতি বলিল,—কি? বলুন।

প্রণব সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—ভবানীপুরে ওদের মুখে শুনেছিলুম, আপনি নাকি তাদের বলেচেন, আপনার স্বামীকে কে মিথ্যা ওয়ারেণ্টে পুলিশে ধরিয়ে দেছে।

প্রীতির বুকের মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া দুলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য দুই গাল পাংশু হইয়া গেল। জোর করিয়া প্রণবের কথায় বাধা দিয়া প্রীতি বলিয়া উঠিল,—না, না! আপনি শুনেচেন সে কথা? মিথ্যা কথা বলে'চ আমি। তাঁরা যে পরিচয় চেয়ে বস্‌লেন!...স্বামী! আমার স্বামী নেই,—ছিলও না কোন দিন!

প্রণবের দুই চোখ এই সুন্দরী কিশোরীটিকে মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া ঘিরিয়া ছিল। সে চোখ এখন লক্ষ্য স্থির করিতেই স্পষ্ট দেখিল, কিশোরীর তুষার-শুভ্র ললাটের মাঝখানে সীঁথির সীমায় সিঁদুরের রক্ত-চিহ্ন নাই! বিধবা? না, সে যে বলিতেছে, স্বামী তাহার ছিলও না কোন দিন। তবে?

প্রণবের সমস্ত মন এই অপরিচিতা তরুণীর দুর্জ্ঞেয় রহস্য জানিবার জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিল। ঐ নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ, ঐ মর্ম্মর-শুভ্র গাত্র,ঐ রক্ত গোলাপের বর্ণ,ঐ শুচি-স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর বেশভূষা, আর ঐ নির্ম্মল অনবদ্য যৌবনশ্রী তাহার জীবনে হঠাৎ বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মত উদয় হইয়া কি অপরূপ নেশায় তাহার সমস্ত চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ পুষ্পের জীবনে অতীত নাই, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট ছায়ায় ঢাকা। প্রণবের মনে হইল, একখানা বিচিত্র রোমান্সের সব-চেয়ে নবীন পৃষ্ঠাখানা কি এক পরম মুহূর্তে বিশ্ব-গ্রন্থের নিপুণ গ্রন্থকার তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন! পৃষ্ঠাখানি যেমন রসালো, তেমনি অপরূপ কৌতূহলে ভরা!

প্রণব বলিল,—আপনি...

বাধা দিয়া প্রীতি বলিল,—দুদিন সবুর করুন। দুদিন বাদে আপনাকে সব কথা খুলে বলবো, এতটুকু গোপন করবো না, এতটুকু মিছে বলবো না। শুনে আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তখন আপনি করতে চাইবেন, আমি তা মাথা পেতে নেবো।

প্রণবের উপর তরুণীর এতখানি নির্ভরতা! প্রণব একটু কেমন কুণ্ঠিত হইল। আহা, বেচারী! নিতান্তই বেচারী! যাহার কাছে নিজেকে একটু নিরাপদ ভাবিতে পারে, এমন আপন-জন এ দুনিয়ায় হয়তো ইহার কেহ নাই! যদি তাই হয়? প্রণব ভাবিল, সেও যে এক সমস্যার কথা! হোক সমস্যা,—মানুষ জীবনে কে আর কি করিতেছে! শুধু অন্ন-বস্ত্র, বিলাস-খেয়াল, ইহার পিছনে ছোটার নামই মানুষের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ!

ইহার উপর কেহ যদি স্কলারশিপের ফণ্ড খুলিয়া দুই তিন লাখ টাকা দান করিয়া বসে তো সে একেবারে মানুষের সমাজে দিগ্‌গজ বনিয়া যায়। প্রণব না হয় এ-সবের পিছনে না ছুটিয়া এই আশ্রয়হীনার আশ্রয়ের জন্য এক-খানি নিরাপদ নীড় বাঁধিয়া দিবে! ইহার জন্য এত মাথা-ব্যথাই বা কেন!

প্রণব বলিল,—বেশ, আপনি এখানে থাকুন। আমি বাজারের একটা ব্যবস্থা করিয়ে দি, আর ঝি আনাই। আপনি রান্না-বান্না করে খাওয়া-দাওয়া করুন। আমি আপাততঃ বাড়ী যাচ্ছি, একবার না গেলে নয়,—জানেন তো?

প্রীতি বলিল,—আপনি আবার আজ আসবেন তো একবার?

প্রণব একটু হাসিয়া বলিল,—বলেন যদি, তাহলে আসবো বৈ কি!

তাহাকে আসিতে বলায় প্রীতির এই আগ্রহ দেখিয়া প্রণবের মন প্রসন্ন হইল। তাহার তরুণ চিত্তে ইহাতে একটু গর্ব্বেরও উদয় হইল। সে বলিল,—দরোয়ান আপনার জন্যে এখন ঝি আনিয়ে দেবে'খন।

প্রীতি বলিল,—আপনার যদি অসুবিধা হয়, তাহলে অবশ্য আসতে বলা ··

বাধা দিয়া খুব উৎসাহের সহিত প্রণব বলিল,—না, না, এতে আর অসুবিধা কি। আমার তো আর অন্য কোন কাজকর্ম্ম নেই—তা-ছাড়া আমি ঐ খাওয়া-দাওয়া করতেই যা বাড়ীতে দুপুর-বেলায় একবার যাই। না হলে এইখানেই তো আমার দিনের বেশী সময় কাটে। আর তা না হলেও ভদ্র বলে যখন নিজের পরিচয় দি, তখন আপনার একটা খোঁজ-খপর নেওয়াও আমার উচিত তো!

প্রণব বাহিরে গিয়া প্রীতির জন্য দাসী ও রন্ধনাদির আয়োজন-বন্দোবস্ত করিয়া আবার যখন ভিতরে আসিল, তখন প্রীতি এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়া চারিধার দেখিয়া বেড়াইতেছে। প্রণবকে দেখিয়া প্রীতি বলিল,—আপনি দিব্যি রেখেচেন বাড়ীখানিকে। নিজেও ছবি আঁকেন কি না—তাই বাড়ীটিও সাজিয়েচেন, যেন ছবি!

প্রশংসার কথায় প্রণবের মন তত টলিত না, কিন্তু আজ এই মুখের স্বরে এ প্রশংসায় তাহার সমস্ত শরীর বহিয়া পুলকের একটা হিল্লোল ছুটিয়া গেল। সে মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিল।

তারপর ঘরের একধারে একটা অর্গিন দেখিয়া প্রীতি বলিল,—বাজনাও যে রয়েচে। আপনি গাইতে পারেন তাহলে?

প্রণব বলিল,—সামান্য একটু-আধটু চেঁচাই। ছবি আঁকতে-আঁকতে একটু বৈচিত্র্যের দরকার হয় কি না, তাই এই নির্জ্জন অরণ্যে চেঁচাই—কারো শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা নেই তো!

তারপর প্রণব উৎসাহের ঝোঁকে কখন এক সময় ফস্ করিয়া অর্গিনের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া মূক যন্ত্রে স্বরের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল, আর প্রীতি ছবিতে আঁকা মূর্ত্তির মত নীরবে সে সুরের ধারায় আপনার শ্রান্ত ভয়ার্ত্ত মনকে ডুবাইয়া দিল, সেদিকে কাহারো হুঁশ ছিল না। ঢং করিয়া ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, প্রীতির তখন হুঁশ হইল। সে বলিল,—যান্, যান্, আপনি বাড়ী যান্। একটা বাজলো যে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—এই যে যাই। আপনার ব্যবস্থা ঠিক হলো কি না আগে দেখি।

প্রণব আবার বাহিরে গেল, প্রীতিও সঙ্গে চলিল। বাহিরে তখন দরোয়ান ঝিকে রান্নার জায়গা দেখাইয়া উনুনে আগুন দিতে বলিতেছে। প্রীতি বলিল,—বা, সব যে ঠিকঠাক, দেখচি। আপনি তাহলে আসুন এইবার।

প্রণব বলিল,—হাঁ, এবার আমি আসবোই। আবার এখনি ফিরেও আসচি।

—৬—

নূতন শাড়ী-কাপড় প্রভৃতি মোট-ঘাট সঙ্গে লইয়া প্রণব যখন আবার বাগানে ফিরিল, বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য্য তখন বিদায়ের মলিন হাসি ঠোঁটে মাখিয়া পশ্চিম আকাশে অনেকখানি গড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগানের সীমানায় প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের ঘন শাখা পত্রের উপর সূর্য্যের আবীর-মাখা রঙ পড়িয়া সে দিকটাকে একেবারে লাল রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরে ঢুকিয়া প্রণব প্রীতিকে কোথাও দেখিতে পাইল না। এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া পিছনের বারান্দায় গিয়া দেখে, ওধারে বাগানের এক কোণে লোহার বেঞ্চের উপর প্রীতি নিবিষ্ট মনে বসিয়া আছে। প্রণব খানিকক্ষণ প্রীতির পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি ভাবিতেছে প্রীতি? হায়রে, কি না ভাবিবে? গৃহ-হারা সর্ব্ব-হারা নিরাশ্রয়া অনাথিনী তরুণী, জগতে দাঁড়াইবার যার স্থান নাই! কিন্তু কে এ রহস্যময়ী?

এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য প্রণব চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিশীথের অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া বিশ্ব ছাইয়া ফেলিবে, তখন এই ব্যাকুলা বালিকা দারুণ মর্ম্মজ্বালায় একা এই বাড়ীর মধ্যে কি করিয়া রাত্রি কাটাইবে? প্রণবের সর্ব্বশরীর দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে ছমছম্ করিয়া উঠিল। কেন ও নিজের পরিচয় বলিতে এতখানি কুণ্ঠা বোধ করিতেছে? কেন এ সঙ্কোচ?

প্রণব ধীরে ধীরে আসিয়া প্রীতির সম্মুখে দাঁড়াইল, ডাকিল,—প্রীতি···

প্রীতি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—আপনি এসেচেন ?

প্রণব কহিল,—হাঁ, একটু দেরী হয়ে গেছে, না ? আপনার দাসী কোথায় গেল ?

প্রীতি বলিল,—সে তার কাপড়-চোপড় আনতে গেছে।

প্রণব বলিল,—ঐ স্প্রীংয়ের খাটের বিছানায় শুতে আপনার বোধ হয় কোন অসুবিধা হবে না ?

প্রীতি গাঢ়স্বরে বলিল,—অসুবিধা ! এ যে রাজার প্রাসাদে এনে আমায় স্থান দেছেন আপনি !

প্রণব হাসিয়া কহিল, হাঁ, একেবারে সিংহাসনের উপর,—না ? কথাটা বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। এ কথাটা বলা ঠিক হইল না, হয়তো ! পরক্ষণেই সে আনি প্রীতির পানে চাহিল—প্রীতির মুখ সদ্য-ফোটা গোলাপের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে অপ্রতিভ ভাবটাকে কাটাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে প্রণব বলিল,—আপনি বাইরে রয়েছেন যে। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?

মৃদু হাসিয়া প্রীতি কহিল,—শত দুঃখ-কষ্টেও মানুষ এই পেটের দায় ছাড়তে পারে কখনো ? আপনি অতবড় পণ্ডিত লোক হয়েও এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করচেন ?

এ কথায় প্রণব একটু ব্যথিত হইয়া বলিল,—এমন কি দুঃখ-কষ্ট যে আপনি কিছুতেই তা ভুলতে পারচেন না !

—কি দুঃখ-কষ্ট ? মুখে মলিন হাসি ফুটাইয়া প্রীতি প্রণবের পানে চাহিল, পরে একটু থামিয়া আবার বলিল, —এত বড় দুঃখ-কষ্টের কথা কোনো কেতাবেও বুঝি লেখে নি কেউ ! কল্পনাতেও মানুষ আনতে পারে কি না, জানি না।

প্রণব বলিল,—লোককে বললে দুঃখ-কষ্টের কতক লাঘব হয়, প্রীতি।

প্রীতি বলিল,—হাঁ, বলবো আমি। যাবার আগে আপনাকে সব কথা বলে যাবো। না বলে বিদায় নিলে বেইমানি হবে, প্রণববাবু।

কথার স্রোত দুঃখের কঠিন পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে দেখিয়া প্রণব সে স্রোত ফিরাইল। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া সে বলিল,—চলুন, আমার ছবি দেখাইগে।

অন্যমনস্ক ভাবেই প্রীতি বলিল,—চলুন।

প্রণব সে ভাব লক্ষ্য করিল। সে বলিল,—তার চেয়ে মোটরে করে একটু বেড়িয়ে আসবেন ?

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে প্রীতি বলিল,—নড়তে চড়তে কেমন ভালো লাগচে না।

—বেশ, তাহলে আপনি এখানেই বসুন। আমি বরং ছবি আঁকিগে।

প্রণব চলিয়া যাইতে প্রীতি হঠাৎ তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—আমার একটা কথা আছে।

—বলুন।

—আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আশ্রয় যখন দেছেন, তখন ছোট বোনের মতই আমাকে মনে করবেন। আপনি বলে আর অপরাধী করবেন না।

—বেশ, তাই হবে।

কথাটা বলিয়া প্রণব ঘরের দিকে চলিয়া গেল। প্রীতি নির্নিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ছিল। প্রণব চোখের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলে সে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর ধীরে ধীরে আকাশের পানে চোখ তুলিয়া চাহিল। সূর্য্য তখন কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া লঘু পদক্ষেপে পৃথিবীর দিকে অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে।

ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রণব একেবারে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে বসিয়া গেল। দুই-তিনখানা গৎ বাজাইবার পর বাজনা ভালো লাগিল না; চেয়ার ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই তাহার চোখ পড়িল প্রীতির উপর। প্রীতি তখন দ্বারের সম্মুখে উদাসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ঘরে উজ্জ্বল আলো ছিল, তাহারই স্নিগ্ধ রশ্মি প্রীতির নিরুদ্বেগ মুখের উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। প্রণব তাহার পানে চাহিয়া মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সুন্দর মুখখানি। ছবিতে আঁকিবার যোগ্য বটে।

প্রীতির উদাস ভাব দেখিয়া প্রণব বলিল,—আমার বড় ক্ষিদে পেয়েচে, প্রীতি,—কি করি বলো দেখি ?

—ক্ষিদে পেয়েছে ! প্রীতি একান্ত সপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল,—লুচি ভেজে দেবো,—খাবেন ?

—লুচি ভাজবে ! বেশ কথা ! ঠিক বলেচো ! তাহলে···

—দি আমি ভেজে। আর একটু ছেঁচকি করে দেবো কি ? শুধু ভাজা, সে ভালো হবে না, খেতে পারবেন না।

প্রণব মৃদু হাসিয়া বলিল,—এই শুধু ? লুচি আর একটু মাত্র ছেঁচকি ? ব্যস্ ? আজ এখান থেকে যাবার পর খেয়ে দেয়ে কম ঘুরেচি। ক্ষিদের বহর সামান্য নয় প্রীতি, খাওয়াতে বসে তোমার ভয় লাগতে পারে !

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আগে তৈরী করি, তার পরে দেখা যাবে, কত ভয় লাগাতে পারেন ! তবে আপনাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কথাটা বলিয়া প্রীতি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

প্রণব তখন ছবির ঘরে গিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া ছবির ক্যানভাসের দিকে চাহিয়া দেখিল। জমি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে !

তুলি লইয়া এখানে ওখানে গোটাকয়েক লাইন টানিয়া সে গাছের খানিকটা ছায়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিল ; তারপর প্রচণ্ড লোভ হইল, এইমাত্র দ্বারের সম্মুখে প্রীতির যে উদাস মূর্ত্তি চোখে পড়িয়াছে, মুখের উপর রূপের আলো অপরূপ দীপ্তিতে ফুটিয়া আছে, সেই রংটুকু তুলির রেখায় ফুটাইয়া তুলিতে। প্রীতিকে গিয়া বলা যায় না, এইখানে আসিয়া তুমি বসো, আমি তোমাকে দেখিয়া ছবি আঁকি! সে কি ভাবিবে? নিজেকে অপমানিত মনে করিতে পারে! তাহাকে একটু আশ্রয় দিয়া এমনি মাথা কিনিয়া ফেলিয়াছি যে নিতান্ত নির্লজ্জের মত আমার বিস্ফারিত দুই চোখের দৃষ্টির সম্মুখে এক অপরিচিতা তরুণী মহিলাকে বলিতেছি, তোমার রূপটাকে পণ্যের মত ধরিয়া বসো! আর সেও অমনি বসিয়া বলিবে, নাও গো, আমায় দেখিয়া ছবি আঁকিয়া লও! ছি, তা কি কখনো হয়।

খানিক তুলির আঁচড় টানিবার পর তাহাও আর ভালো লাগিল না। প্রণব তখন ধীরে ধীরে রান্নাবাড়ীর দিকে চলিল। রান্নাঘরে উনুন জ্বলিতেছে। দাসী ময়দা মাখিয়া লেচি কাটিতেছে, আর প্রীতি কড়ায় তরকারী চাপাইয়া অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে তাহারি তদ্বির করিতেছে। উনুনের তপ্ত আগুনের হল্‌কায় তাহার চাঁপার মত বর্ণে যেন সিন্দূরের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রণব রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল,—হলো প্রীতি?

প্রীতি মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল,—এখানে এসেচেন বুঝি! তর্ সইচে না? তরকারীটা এই হয়ে এলো, এখনি নামাবো। তারপর ঝীয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—অন্নদা, তোমার হলো ভাই? ঐ যে লেচি কাটচে, তরকারীটা নামলেই ভেজে দেবো। কপিভাজা আলুভাজা হয়ে গেছে। তবে আমি ভাবছিলুম, একটু চাটনি করে দেবো, তা'···

হাসিয়া প্রণব বলিল,—চাট্‌নির জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে এদিকে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যাবে! সে পারবো না, প্রীতি। আমার যে কি রকম ক্ষিদে পেয়েচে, তা তুমি বুঝতে পারচো না!

প্রণবের এই সরস সহজ কথার ভঙ্গীতে প্রীতি ভারী খুশী হইল। হাসিয়া সে বলিল,—এত অধীর হলে কখনো হয়! বাঃ, আমায় সময় দিন একটু তৈরী করবার! তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, নেহাৎ অখাদ্য পাতে ধরে দেবো না। জানলেন?

প্রণব বলিল,—সময় দিতে হবে এর জন্যে? এ'তো ভাবিনি আমি। এই বুঝি তোমার আতিথ্য,—এ্যাঁ! আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে আসচি, এখানে এলেই প্রীতি যত্ন করে তখনি কিছু খেতে দেবে!

এ কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রীতি বলিল,—নতুন ব্যবস্থা, নতুন জায়গা।

প্রণব বুঝিল, তার কথায় প্রীতি অপ্রতিভ হইয়াছে। তাই সে কথার গতি ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল,—তা যাক্, তুমি মোদ্দা এইটুকু সময়ে সমস্তই তো প্রায় তৈরী করেচো। আমি ভাবছিলুম, লুচি ভাজতে দশটা বেজে যাবে। তা এ যে দেখচি, মেল ট্রেণ চালিয়ে দেছ একেবারে!

প্রীতি বলিল,—এই দেখুন, আমার তরকারীও হয়ে গেল,—এইবার নামিয়ে ফেলি। অন্নদাকে বলিল,—তুমি লুচি ঠিক বেল্‌তে পারবে তো?

সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

প্রণব বলিল,—বারে, আমি বসবো কোথায়? ঘরের মধ্যে জুতো পায়ে ঢুকবো কি?

প্রীতি বলিল,—স্বচ্ছন্দে। এ'তো ঠাকুর-ঘর নয়।

প্রণব বলিল,—না, সেটা ঠিক নয়। গোঁড়ামির জন্যে বলচি না। জুতো পায়ে দিয়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই, ধুলো-ময়লা, আরো কত কি রোগের ব্যাসিলি তলায় থাকে, খাবার ঘরে কিম্বা শোবার ঘরে রাস্তা-বেড়ানো জুতোশুদ্ধ তাই যাওয়া উচিত নয়। কথাগুলা বলিতে বলিতে প্রণব রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিল, ঢুকিয়া বলিল,—এই তোমার রান্নাঘর! বসবার জায়গা একটুও নেই! বসি কোথায়?

প্রীতি হাসিয়া বলিল,—রান্নাঘরে আবার বসবার জায়গা থাকবে কি? এ'তো আপনার ড্রয়িং রুম নয় যে সোফা চেয়ার মনে সাজিয়ে রাখতে হবে। এখানকার আসন হলো এই কুর্সি পিঁড়ে। এতে তো বসতে পারবেন না আপনি, একখানা চেয়ার আনিয়ে না হয় বসুন।

প্রণব বলিল,—বটে! চেয়ারে বসবো না আমি—কখ্‌খনো বসবো না। তুমি ঠাট্টা করলে যখন, তখন ঐ কুর্সি পিঁড়েতেই আমি বসবো। সত্যিই তো, এ হলো বাঙালীর রান্নাঘর, এখানে আবার সোফা-চেয়ার কেন! তা কুর্সি পিঁড়ে কৈ?

প্রীতি ছোট একখানি পিঁড়ি পাতিয়া দিলে প্রণব তাহাতে বসিল। প্রীতি দাসীকে বলিল,—নাও ভাই, তুমি একটু হাত চালিয়ে নাও। বাবুর কি রকম ক্ষিদে পেয়েচে, শুনলে তো?

তারপর লুচি ভাজিবার পূর্ব্বে রান্নাঘরেই পিঁড়ির সম্মুখে ঠাঁই করিয়া প্রীতি ভাজি ও তরকারী প্রায় সবটাই থালায় সাজাইয়া দিল! ব্যবস্থা দেখিয়া প্রণব বলিল,—দেখি, ও কি! সমস্ত তরকারীটুকু সে আমার পাতে ঢেলে দিলে। বাঃ, তোমার নিজের জন্যে রাখলে না কিছু? তার উপর ঝী আছে।

প্রীতি বলিল,—ঝীর এবেলার জন্যে তরকারী আছে! আর আমি? এবেলায় আমার তেমন ক্ষিদে নেই।

প্রণব বলিল,—লজ্জা হলো বুঝি? না, আমার প্রচণ্ড ক্ষিদে দেখে তোমার ক্ষিদে লজ্জায় মরে গেল? সে হবে না প্রীতি। এই যা তরকারী আমার পাতে দেছ, এর অর্দ্ধেক তুলে আগে তোমার জন্যে রাখো, তবে আমি বাকী অর্দ্ধেক খাবো। আর ঐ যে লুচি হচ্ছে, ও থেকে তোমার জন্যে দস্তুরমত অংশ রাখলে তবে বাকী-টুকু আমি গলাধঃকরণ করবো।

প্রীতি একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল,—দেখুন দিকি, খেতে বসে রাঁধুনীর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করচেন। তবেই আপনি খেয়েছেন খুব।

প্রণব বলিল,—আমি ভারী ঝগড়াটে। মার সঙ্গে বাড়ীতে আমার ত্রবেলা ঝগড়া চলে প্রীতি। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ কি। তুমি আগে তোমার খাবার বন্দোবস্ত করো, তবেই আমি বীরদর্পে ভোজন-কার্য্যে অগ্রসর হবো—নাহলে তুমি যে সারা রাত উপোস করে থেকে আমায় শাপ দেবে, সে আমি সহ্য করবো না।

প্রীতি এই আমোদ-পাগল আশ্রয়-দাতার বচনে-ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে দ্বিধা যে সঙ্কোচের ভারে সে কাতর কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল, সে-ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রীতির মনে হইল, কেনই বা এ সঙ্কোচ! এ যে কত-কালের জানা আপনার জনের মত,—কি প্রাণ-খোলা সদানন্দময় এই লোকটি!

তারপর ঝী লুচি বেলিতে স্থরু করিল এবং প্রীতি ভাজিয়া ভাজিয়া গরম লুচি প্রণবের পাতে দিতে লাগিল, প্রণবও হাসি-গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া খাইতে লাগিল। তরকারী শেষ করিয়া প্রণব বলিল,—একটু চাট্‌নি করোনি? এই তো প্রীতি, তাহলেই আমায় খাইয়েচো তুমি!

প্রীতি ঈষৎ ক্ষুন্ন স্বরে বলিল,—আপনি কি রকম তাড়া দিলেন, বলুন তো। এত শীগ্‌গির মানুষ সব তৈরি করে উঠতে পারে?

প্রণব বলিল,—তবে আর রাঁধুনী কি। বারো ঘণ্টা সময় পেলে আমিও যে সতেরোখানা ব্যঞ্জন বেঁধে তাক্‌ লাগাতে পারি।

প্রীতি ক্ষুন্নস্বরে বলিল,—একটি উনুন—আচ্ছা, কাল আর একটা উনুন আমি তৈরী করাবো'খন—তারপর দেখবো, আপনি কত বড় খাইয়ে!

—তাই দেখো। এখন তাহলে উঠলুম। বলিয়া প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রীতি উনানের উপর হইতে কড়া নামাইয়া রাখিল। দেখিয়া প্রণব বলিল,—ও কি, কড়া নামিয়ে রাখলে যে। তুমি খাবে না?

প্রীতি বলিল,—সে হবে'খন!

প্রণব বলিল,—হবে অখন কেন? এখনই হোক না! তুমি খেয়ে নাও, খেয়ে ঝীকে উনুন ছেড়ে দাও—ওর খাবার ও তৈরী করে নিক।

প্রীতি বলিল,—আপনার যে দেখছি শুধু ছবি আঁকা, ঘর সাজানো বিদ্যেই শেষ নয়, গিন্নীপনাতেও বেশ দখল আছে। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল,—ঝী ওর রুটি নিজেই সেখে সেঁকে নেবে। আমি একটু পরে খাবো'খন।

প্রণব বলিল,—না, আমি ঘরে গিয়ে বসচি, তুমি লুচি ভেজে খেয়ে নিয়ে এসো দিকিন্। একটু গল্প-সল্প করা যাবে'খন। না হলে ভারী রাগ করবো আমি। আমি ভারী রাগী মানুষ—আমার রাগ তো কখনো ছাখোনি!

প্রীতির চোখে ধোঁয়া লাগিয়াছিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে হাসিয়া সে বলিল,—বটে। তাহলে রাগটা একবার দেখাই যাক। কি বলেন?

প্রণব বলিল,—না, না, রাগ আর দেখতে হবে না। তুমি খেয়ে নাও প্রীতি, তারপর অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

প্রীতি বলিল,—আচ্ছা, আমি খেয়ে নিচ্ছি। আপনি এখন যান, হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে বস্থন। অন্নদা, বাবুর আঁচাবার জন্যে গরম জল করে রেখেচি, তুমি ঐ বালতির ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে দাও তো ভাই।

প্রণব বলিল,—থাক, ঐ কেট্‌লিতে গরম জল আছে তো? আমি নিজেই নিচ্ছি। ঝী ততক্ষণ তোমায় লুচি বেলে দিক্!

প্রণব বাহির হইয়া গেল। প্রীতি তখন উনানে আবার কড়া চাপাইয়া দিল, দিয়া আত্মগতভাবে বলিল,—ভেবেছিলুম, আজ রাত্রে আর কিছু খাবো না।

সে কথায় বাধা দিয়া দাসী অন্নদা বলিল,—তা কি হয়, বৌদিমণি? বাবু রাগ করবেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, গয়লা কখন্ দুধ দিয়ে গেছে গো! দুধ এখনো জ্বাল দেওয়া হয় নি তো! তা এক কাজ করো তুমি, তোমার লুচি ক'খানা ভেজে দুধের কড়াটা চাপিয়ে দাও। আমি জ্বাল দিয়ে জুড়িয়ে ঢেলে রাখবো'খন।

প্রীতি কোন কথা বলিল না, লুচি ভাজিতে ভাজিতে কেবলই ভাবিতেছিল, বৌদিমণি! ঝী ডাকিল, বৌদি-মণি। তাইতো,—এ যে একটা মস্ত গিঁট্ পড়িতেছে ও দিকে—এ গিঁট্ কেমন করিয়া, কি বলিয়াই বা এখন খোলা যায়! না খুলিলেও নয়! এ গিঁট আরো জটিল হইলে সে যে বড় বিশ্রী হইবে। বাবুর কানে যদি এ ডাক পৌঁছায়! ছি! তিনি কি ভাবিবেন?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া প্রীতি যখন ঘরে আসিল, প্রণব তখন তাহার ছবির সম্মুখে তন্ময় হইয়া বসিয়া আছে। প্রীতি ছোট একটি পিরীচে কয়েকটি সাজা পাণ লইয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিল,—আপনার পাণ!

প্রণব হাসিয়া বলিল—বাঃ, পাণও সেজে ফেলেচো যে। বেশ। এখন ঐ বাণ্ডিলটা খোলো দিকি—ওর মধ্যে তোমার কাপড়, সেমিজ, তোয়ালে, গামছা, এই-সব পাবে, তাছাড়া মাথায় মাখবার তেল-টেল সে সব ঐ পাশের বাণ্ডিলে আছে। এ-সবের কোন বন্দোবস্ত ছিল না তো এখানে।

প্রীতি বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে বলিল,—দু'দিনের জন্যে কেন আপনি এত খরচ-পত্তর করলেন বলুন দিকি? মিছে এ-সব আনানো।

প্রণব বলিল,—দুদিনের জন্যেই যদি হয়, তাই নয় ধরলুম—সে দুদিনই বা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে যাবে কেন?

প্রীতি বাণ্ডিল খুলিয়া সেমিজ প্রভৃতি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—আপনি আন্দাজে মাপও তো ঠিক ধরেছেন!

হাসিয়া প্রণব বলিল,—আঁকিয়ে মানুষ কি না। একবার দেখে ছবিতে মুখ-চোখের ছাঁচ ঠিক তুলতে পারি যখন···

প্রীতি বলিল,—কিন্তু কেন আপনি এত সব জিনিষ-পত্তর কিনলেন বলুন দিকি? অনর্থক এত পয়সা খরচ করে?

প্রণব বলিল,—দরকারী জিনিষ! না কিনলে চলবে কেন?

প্রীতি বলিল,—দু'দিনের জন্যে মিথ্যে এই খরচ-পত্তর করা!

প্রণব বলিল,—বুঝেচি। না হয় যাবার সময় স্মৃতি-চিহ্নের মত এগুলো নিয়েই গেলে প্রীতি!

প্রীতি বলিল,—এইগুলোই কি মস্ত স্মৃতিচিহ্ন? নিয়ে যাবার মত কি আর-কিছু দেন নি?

প্রণব একটু বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিল,—কি দিয়েচি, প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—কিছু নয়। বলিয়া সে অতি-সন্তর্পণে ছোট একটা নিশ্বাস চাপিল। প্রণব তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

প্রণব বলিল,—ভালো কথা, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েচে?

প্রীতি বলিল,—হ্যাঁ।

প্রণব বলিল,—ঝীর খাওয়ার কি হলো? সে নিজে তৈরী করে নিচ্ছে তো?

প্রীতি বলিল,—আমি যাচ্ছিলুম তৈরী করে দিতে, তা ও দিলে না। বললে, কেন তুমি কষ্ট করবে। আমি নিজে তৈরী করে নেবো'খন।

প্রণব বলিল,—ছোটলোক হলেও বুদ্ধি-বিবেচনা আছে।

প্রীতি বলিল,—হ্যাঁ, মানুষটি ভালো।

প্রণব বলিল,—সত্যি, আমিও তাই দেখি। ভদ্রতা, বিবেচনা, এই সব জিনিষগুলো—যাঁদের ভদ্র বলে খ্যাতি আছে, তাঁদের চেয়ে এই যাদের আমরা ছোটলোক বলে ঘৃণা করি, তাদের বাস্তবিকই প্রচুর আছে। তাই ভদ্র সমাজ ত্যাগ করে আমার মেলা-মেশা, কাজ-কর্ম্ম, যা-কিছু সমস্তই এই সব ইতর ঘৃণ্য ছোট লোকদের সঙ্গে! দেখেচো প্রীতি, আমার ছবির মধ্যে ভদ্রঘরের রূপসী বধূ কি নায়িকার দেখা তুমি খুব কম পাবে,—ঐ সব অভদ্র ইতর ঘরের ছেলে-মেয়ে নিয়েই আমার কারবার! সত্যি, এরাই দেশের লোক, বাঙলার মাটীতে তৈরী, বাঙলার জল-বাতাসে এদের পুষ্টি! আর ঐ যে ইংরাজি পোষাক-পরা কি শিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে বাবুর দল ছাখো, ওরা তো পাঁচমিশেলি জাতের বিস্বাদ খিচুড়ী মাত্র। পোষাকে ব্যবহারে আচারে ভঙ্গীতে স্বভাবে তাদের এ বাঙ্‌লা দেশের লোক বলে মনেও হয় না। বাঙালীর বাঙালীত্ব যদি তারা ঢাকা দিতে চায় তো তাদের বাঙালী বলি কিসে?

প্রণবের প্রাণে ভাবের যখন আবেগ আসে, তখন এমনি নির্ঝরের মত তার স্রোত বিপুল বেগে বহিয়া চলে, কাহারো বাধায় সে আবেগ বন্ধ হয় না।

প্রণবের মুখে বাঙলা দেশের ইতর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এই ভাবাবেগ শুনিয়া শ্রদ্ধায় প্রীতির প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এই তরুণ বয়সে এমন খাঁটি প্রাণ—কেতাবেই এমন প্রাণের পরিচয় পাইয়াছে। সত্যকার জগতে কি হীন, কুৎসিত বর্ব্বর সব···

কথাটা ভাবিতে তাহার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এই অল্প বয়সে সত্যকার জগতে যে কয়টি প্রাণীর সে পরিচয় পাইয়াছে, সে পরিচয় তাহার হাড়ে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছে! প্রণবের উচ্ছ্বাসে বাধা না দিয়া স্থির হইয়া সে একবার নিজের জীবনের উপর দিয়া যে ঘটনাগুলা বহিয়া গিয়াছে, বায়োস্কোপের ছবির মত সেগুলার উপর মনশ্চক্ষু বুলাইয়া লইল। প্রীতিকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রণব ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। এই সদ্য-পরিচিতা মেয়েটির কাছে ভাবের উচ্ছ্বাস একটু অতি মাত্রাতেই বাহির করিয়া ফেলিয়াছে না? ও কি ভাবিবে? প্রণব বলিল,—আমার কথাগুলো নেহাৎ বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে,—না প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—না।

প্রণব বলিল,—বক্তৃতার কথা নয় এ। কাজেও আমি এই রকম করবার চেষ্টা পাই।

প্রীতি বলিল,—সে তো তার প্রমাণও পেয়েচি আমি। এই যে, জানা নেই, শোনা নেই, কাদের ঘরের মেয়ে তারও ঠিক নেই, আমাকে আপনি এমন আশ্রয়, এতখানি সম্ভ্রম দিয়েচেন··

প্রণব বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে বলিল,—ও-সব তুমি কি বলচো। ধরো, নয় তোমায় আশ্রয় দিয়ে ভালো কাজই আমি করেচি—যদিও এটাকে বিশেষ মস্ত বলে আমি মনে করচি না, তবু তোমার কথাতেই বলচি, মস্ত কাজ, ভাল কাজ করেচি আমি। কিন্তু এতে তুমি এমন কেন আশ্চর্য্য হচ্ছ ? এ ত মানুষ মাত্রেই করে থাকে। ধরো, যদি আমার সাম্‌নে না পড়ে কাল রাত্রে অন্য লোকের সামনে গিয়েই তুমি অমনি আশ্রয় চেয়ে দাঁড়াতে, তাহলে কি সে এ আশ্রয় দিত না ?

ঈষৎ হাসিয়া প্রীতি বলিল,—আমার জবাব চাইছেন ? সত্য জবাব ?

প্রণব কৌতূহল-ভরা স্বরে বলিল,—বেশ, জবাব চাইছি। সত্য জবাব।

প্রীতি বলিল,—সকলের কাছে এ আশ্রয় পেতুম না আমি। তারা শিউরে উঠতো, ভাবতো, তাইতো, এত রাত্রে পথের মধ্যে একটা মেয়ে-মানুষ আশ্রয় চায়। নানা সন্দেহ তুলে তারা সরে পড়তো। সরে না পড়লেও এমন সব সন্দিগ্ধ প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে আমায় অস্থির করে ফেলতো যে আশ্রয়-ভিক্ষা ভুলে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ত। মানুষকে আপনি যত বড় ভাবেন, আমি তত বড় ভাবতে পারি না, এ আমার দুর্ভাগ্য, আমি স্বীকার করচি।

শেষের দিকটায় প্রীতির স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

প্রণব বুঝিল, না জানিয়া প্রীতির মর্মে ঠিক বেদনার জায়গায়টাতেই হয়তো সে আঘাত দিয়া বসিয়াছে! সে যে আজই স্পষ্ট বলিয়াছে, আতঙ্কে মন তাহার এখনো ভরিয়া আছে। তাই সে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলিতে দুই দিন আরো সময় চাহিয়াছে।

প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য প্রণব হঠাৎ বলিল—তুমি গান গাইতে জানো প্রীতি ?

প্রীতি বলিল—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করচেন যে! গানটা কি এতই সহজ ঠাওরান্ যে পথে-ঘাটে যে-সে লোকের ও-জিনিষে দখল থাকবে!

প্রণব বলিল—তা নয়। যে-সে হলে কথাটা তুলতুম না। তোমার মধ্যে আমি কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখেচি—এই সহজ সরল অকুণ্ঠিত ভাব একখানি মার্জ্জিত হৃদয়ের পরিচয় দিচ্ছে। তা ছাড়া আমি যখন হার্ম্মোনিয়ম বাজাচ্ছিলুম, তুমি তখন এমন তন্ময় হয়ে তা শুন্‌ছিলে,—তবু কোন গানও আমি গাইনি! এ শাস্ত্রে অধিকার না থাকলে শুধু বাজনা কেউ অমন তন্ময় হয়ে শোনে না প্রীতি।

প্রীতি নতশিরে ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিল—গানের কিছুই জানি না আমি। তবে গান-বাজনা শুনতে খুব ভালবাসি। আপনি বাজাবেন ?

প্রণব বলিল,—শুনতে চাও যদি তো বাজাই!

প্রীতি বলিল—বাজান।

তরুণীর এই কুণ্ঠাহীন সহজ বচন-ভঙ্গীতে প্রণব সত্যই মুগ্ধ হইতেছিল। এমন চির-পরিচিতের মত মেলা-মেশা করিতেছে, অথচ কথায়-বার্ত্তায় আচারে-ব্যবহারে কেমন সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আলাপ-আপ্যায়নের যে একটি ভদ্র রীতি আছে, তাহা এই তরুণীর ব্যবহারে আগাগোড়া শোভন ও সংরক্ষিত। তরুণী লজ্জাশীলা, অথচ তাহার লজ্জায় প্রাণহীন আড়ষ্ট ভাব মোটেই নাই। সে লজ্জায় তরুণীর শ্রী তাহার মস্তক অবয়বটিকে ঘিরিয়া শুচিস্নিগ্ধ শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রণব হার্ম্মোনিয়ম খুলিয়া বাজাইতে সুরু করিল। বাজাইতে বাজাইতে মুগ্ধ শ্রোতার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া কণ্ঠ যে কখন্ খুলিয়া গিয়াছে, প্রণবের সেদিকে খেয়ালও নাই। গানের পর গান মুক্ত নির্ঝরের মত অবাধে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে! হঠাৎ এক সময় যখন চমক ভাঙ্গিল, ঘড়িতে তখন দশটা বাজিয়াছে। প্রীতি বলিল,—আর থাক্। বড্ড রাত হয়ে গেল আপনার। দশটা বাজচে। বাড়ীতে মা আবার ভাবেন যদি ?

প্রণব বাজনা ছাড়িয়া বলিল,—তা ঠিক। মাকে তো এখনো তোমার কথা বলিনি। তোমার অনুমতি না পেলে বল্‌তেও পারি না। আসল কথা, বাড়ীতে তোমায় নিয়ে যাইনি কেন, তা তো বলেচি, মস্ত বড় সংসার, পাঁচরকমের পাঁচজন লোক আছে, নানা প্রশ্নে আপনাকে পাছে তারা বিদ্ধ করে ফেলে···

প্রীতি বলিল,—বেশ করেচেন। আমার এখন মনের অবস্থা যা, তাতে কারো ছোট একটা প্রশ্নও সহ্য করতে পারবো না। মন সত্যি এখনও এমন ভারী হয়ে রয়েছে! নাহলে আপনাকেও বলি না ?

প্রণব বলিল,—বেশ, এখন তা হলে আমি আসি। কাল আমার ছবি আঁকা চলবে। দেখো। প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রীতি বলিল,—এইখানে খাবেন কি কাল সকালে ?

প্রণব বলিল,—না প্রীতি আমার মার মনে তাহলে ভাবী অস্বাচ্ছন্দ্য জাগবে। সামনে এসে আমাদের দু'

ভাইকে খাইয়ে তিনি যে কি তৃপ্তি পান্! এই বাড়ী যাচ্ছি তো, সেখানে মা আমার খাবার আগলে বসে আছেন—খেয়ে-দেয়ে শুলে তবে মা নিশ্চিন্ত হবেন। এত বড় হয়েচি দু'ভাই, তবু মার কাছে আমরা যেন সেই কোন্ ছেলেবেলার মতই ছোট বয়ে গেছি! লোকে হয়তো হাসবে এ-কথা শুনলে। কিন্তু…

প্রীতি বলিল,—আপনার কাছে মাব কতটুকুই বা শুনেচি, তবু শুনে অবধি তাঁর উপর আমার মন এমন শ্রদ্ধায় ভবে রয়েচে। যাবার আগে তাঁর পায়ে প্রণামটুকু করে যাবার অনুমতি আর সুযোগ আমায় দেবেন কিন্তু —নাহলে আমিও নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবো না।

প্রণব বলিল,—বেশ তো, আর বেশী কথা কি।

প্রণব চলিয়া গেল।

প্রণব চলিয়া গেলে প্রীতি বহুক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানে তেমনি বসিয়া রহিল। প্রণব আর তাহার সংসারের চারিধারে প্রীতির মন কিসের আকর্ষণে এমন ব্যাকুল আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে সে ক্রমে হাঁফাইয়া উঠিল। কি সুখের সংসারটি,—আহা! এই তপ্ত মরুর বুকে ছায়ায়-ঘেরা স্নিগ্ধ নীড় যদি কোথাও থাকে তো সে ঐ প্রণবের গৃহ! সে যদি ঐ নীড়ের এককোণে চিরদিনের মত একটু স্থান পায়—তাহা হইলে এ-জন্মটা আবার বাঁচিতে সাধ হয় বটে! এ পৃথিবীর যেটুকু সে এই বয়সে দেখিয়াছে, তাহা কি ভীষণ! দৈত্যের মত লেলিহান রসনা মেলিয়া সে-জগৎ মন-প্রাণ-দেহ সমস্তই গ্রাস করিতে চায়!

দাসী অন্নদা আসিয়া বলিল,—এখনো জেগে আছো বৌদিমণি? বাবু চলে গেলেন যে! রাত্রে থাকবেন না এখানে?

কথাটা কাঁটার মত প্রীতির মর্ম্মে বিঁধিল। গম্ভীর মুখেই সে জবাব দিল,—না।

দাসী বলিল,—তুমি বসে কেন, বৌদি? যাও, শোওগে—অনেক রাত হয়েচে। আমি কি তোমার ঘরের মেঝেতেই শোবো তা হলে? তুমি একলাটি শুতে পারবে?

প্রীতি বলিল,—আচ্ছা, তুমি ঐ মেঝেতেই শুয়ো। আমি একটু পরে শুতে যাচ্ছি। তুমি আর কেন মিছে জেগে থাকবে, ভাই? শুয়ে পড়'গে।

দাসী চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার একটা কথা আগুনের গোলার মত প্রীতির মনে ছ্যাঁকা দিতে লাগিল! বৌদিমণি! ঝী বুঝিয়াছে, বাবু তাহার…! ছি!

লজ্জায় প্রীতির সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া সে পড়িয়া রহিল। মুদ্রিত চোখের সম্মুখে ছোট একটি সুখের কুঞ্জ অপরূপ মাধুর্য্যে ফুটিয়া ঠিল। ফুলে-ফুলে সে কুঞ্জ ছাইয়া গিয়াছে,— শুধু ফুল, শুধু স্নিগ্ধ-মধুর হাওয়া আর পাখীর গান,—প্রচুর, অজস্র! আর সেই কুঞ্জে ঝরা-পাতার শয্যায় ম্লান বেশে প্রীতি বসিয়া আছে! দূরে সে কার আশা-পথটুকু চাহিয়াই যেন বসিয়া আছে। ক্রমে এক পথিক আসিয়া দেখা দিল, মাথায় তার ফুলের মুকুট, গলায় ফুলের মালা। পথিক আসিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরশে প্রীতির মুখের-মনের কালিমা মুছিয়া তাহাকে ডাকিল। সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া প্রীতি চাহিয়া দেখে, পথিক আর কেহ নয়, —প্রণব!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ চাহিয়া প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া ভাবিল, মনের আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা বটে! মনটাকে দুই পায়ে সে মাড়াইয়া চাপিয়া ধরিল; তারপর ধীরে ধীরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া কত কথা, কত চিন্তা লইয়া সে এই একটু আগেকার মনে-জাগা কুঞ্জের কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই সব চিন্তার সূত্র পদে পদে খুলিয়া গিয়া মন সেই কুঞ্জকেই সামনে তুলিয়া ধরিতে লাগিল। সে কুঞ্জে রাজার আসন পাতিয়া প্রণব বসিয়া আছে, আর তাহারই আসনের নীচে ভূ-লুণ্ঠিতা প্রীতি! সমস্ত শরীর বহিয়া অস্বস্তির একটা তীব্র তপ্ত ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কি অবাধ্য মন! শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া ধীর পদে প্রীতি আসিয়া পাশের ঘরে খড়খড়ি খুলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত বাহিরের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে কুয়াশার পর্দ্দা ঠেলিয়া জ্যোৎস্না তখন চপল চরণে রূপালি নাচের ঝরণা ঝরাইয়া দিয়াছে!

—৯—

পরদিন অনেক বেলায় প্রীতির ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিতে সে দেখে, ঘরে অনেকখানি রৌদ্রের হিল্লোল আসিয়া পড়িয়াছে। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল—প্রণব হয়তো আসিয়াছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া সে বাহিরের বারান্দায় আসিল। প্রণবের গাড়ীর চিহ্নও নাই! দরোয়ান ফটকের সামনে কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। ফটকের কাছে তাহার ঘরের সমানের রোয়াকে বাট্‌না বাটা শীলটা পড়িয়া আছে। মালী বাগানে ফুল তুলিতেছে। প্রীতিকে দেখিয়া মালী প্রণাম করিল। প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু এসেচেন মালী?

মালী কহিল,—না। তারপর সে ফুলের তোড়া তৈয়ার করিতে চলিয়া গেল। প্রীতির মন প্রণবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত অধীর হইয়াছিল। প্রণব আসে নাই শুনিয়া মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পথের দিকে উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার সে ভিতরে আসিল। অন্নদা তখন মশারি

তুলিয়া বিছানা ঝাড়িতেছে। প্রীতিকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া অন্নদা কহিল,—দাদাবাবু কাল চলে গেলেন যে? রাগ-টাগ করেছেন বুঝি, বৌদিমণি?

আবার সেই কথা। পোড়ারমুখী এ বলে কি!

প্রীতির মনে শপাশপ্ কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। এ কি ধারণা দাসীটা মনের মধ্যে পুরিয়া বসিয়াছে! কি বিষম ভুল।···অথচ কি বলিয়াই বা তাহার এ ধারণা সে খণ্ডন করিয়া দেয়। যদি প্রীতি বলে, না রে, সে বৌদিমণি নয়, কোনো কালে বৌদিমণি হইতেও পারে না, তাহা হইলে এই অশিক্ষিতা মূর্খ দাসী আরও কি সব কদর্য্য ধারণা করিয়া বসিবে! হোক্ ভুল, কানে বড় মিষ্ট লাগিতেছে। বৌদিমণি! তাই বলিয়াই দাসী যদি খুশী থাকে, বলুক! আর একটা দিন বৈ তো নয়! তারপর কোথায় সে চলিয়া যাইবে, প্রণবকে ছাড়িয়া কত, কত দূরে—প্রণবের সম্বন্ধে এতটুকু ছোট কথাও সেখানে অত দূরে আর তাহার কানে পৌছিবে না! এই বাগান, এই ঘর, এই হাসি-আনন্দের মিষ্ট লহর—এ শুধু স্মৃতির একটি কোণে ঐ অজস্র ফোটা ফুলের গন্ধের মত, বর্ণের মত জমিয়া থাকিবে!

প্রীতিকে নিরুত্তর দেখিয়া অন্নদা বলিল,—ও রাগ কিছু নয়, বৌদিমণি। আজই দেখো, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা, তুমি নাইবে তো? গরম জল চড়িয়ে দিইগে। তারপর তোমার চুল খুলে তেল মাখিয়ে দেবো'খন। নাইবে তো?

কোনমতে এই-সব কথাবার্ত্তার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় প্রীতি বলিল,—নাইবো।

—তাহলে গরম জল চড়িয়ে দি, আর মালীকে বলি, নাইবার ঘরের টবে ঠাণ্ডা জল তুলে দিক্। বলিয়া অন্নদা চলিয়া গেল।

প্রীতি অন্যমনস্কভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এখনো প্রণব আসিল না কেন? কাল রাত্রে সেই হাসি-গল্প, গানে বাজনায় কি পুলকের স্রোতই না বহিয়াছিল! আর আজ? উৎসব-রজনীর অবসানে উৎসব-মণ্ডপ শূন্য পড়িয়া আছে, ফুলের মালা ম্লান হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, পরিত্যক্ত মণ্ডপ নিতান্ত নির্জ্জীব, নীরব! সে হাসির এক বিন্দুও আর ঝরে না! প্রচণ্ড নিরানন্দময়তা গুমট বাধিয়া প্রীতির মনের উপর যেন একখানা ভারী পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে! হাসিয়া প্রীতি ভাবিল, এ কি দুরাশার পিছনে মত্ত মন এমন ছুটিয়া চলিয়াছে। আর একটা দিন শুধু এখানে তাহার থাকিবার অধিকার আছে। তবে কেন এ আকুলতা! কেন এ অধীর আবেগ!

অন্নদা আসিয়া বলিল,—এখনো চুপ করে বসে আছ বৌদিমণি? এসো, চুলগুলো খুলে দি। তেলের শিশি কোথায়?

প্রীতি বলিল,—ও ঘরের শেল্‌ফে আছে।

অন্নদা তেলের শিশি আনিয়া প্রীতির কুঞ্চিত কৃষ্ণ নরম কেশের রাশি বেণী-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। নাচিয়া নাচিয়া কালো কেশের রাশি অধীর তরঙ্গের মত তাহার পিঠ ছাপাইয়া ঝাঁপাইয়া ঝরিয়া পড়িল। অন্নদা সেই কালো কেশের রাশি কুলাইতে কুলাইতে বলিল,—কি রেশমের মত নরম চুলগুলি তোমার বৌদিমণি! ভারী সুন্দর!

প্রীতি এ কথার জবাব দিল না। অধীর মন প্রতিক্ষণে একটা গাড়ীর প্রতীক্ষা করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিল।

তেল মাখিয়া তারপর সে স্নান করিতে গেল; স্নান করিয়া প্রণবের দেওয়া শাড়ী পরিয়া আবার বারান্দায় আসিল। কোথায় প্রণব? তাহার গাড়ীর শব্দ নাই, প্রণবের চিহ্নও নাই। প্রীতির মন অবসন্নের মত হইয়া পড়িল।

তারপর কতক্ষণ এমনি ভাবে কাটিলে অন্নদা আসিয়া তাড়া দিল,—রান্নাবান্না হবে না বৌদিমণি? উনুন যে জ্বলে গেল।

রান্না-বান্না করিতে প্রীতির ভালো লাগিতেছিল না। সে বলিল,—থাক্‌গে, ক্ষিদে নেই মোটে।

অন্নদা হাসিয়া বলিল,—তোমার যেন ক্ষিদে নেই, বৌদি! আমাকে খেতে দিতে হবে তো।

প্রীতি বলিল,—চল, তোমার জন্য ভাতে-ভাত চড়িয়ে দি।

অন্নদা আবার হাসিয়া বলিল,—শুধু ভাতে-ভাত নয়, বৌদি। কাল তোমার তরকারীটুকু ভারী চমৎকার হয়েছিল। একটু ডালও-বেঁধো।

প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, সত্যই তো, আমার জন্য ও বেচারী না খাইয়া মরিবে কেন! সে বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে। চলো।

অন্নদা বলিল,—তোমার জন্যেও দুটি চাল নিয়ো, বৌদি। না খেয়ে মানুষের থাকতে নেই। কাল রাত্রে এমন কিছু খাওনি যে আজ ক্ষিদে থাকবে না! তার পর একটু থামিয়া হাসিয়া সে আবার বলিল,—কেন ক্ষিদে নেই, তা কি আর আমি বুঝি না গা! ঘর করতে গেলে অমন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েই থাকে, তার জন্যে একেবারে উপোস দেবে! দাদাবাবুরই বা কি রকম কাণ্ড—এত বেলা হলো, দেখা নেই!

প্রীতি শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কশাঘাত করিল। ঝী এ বলে কি! বৌদিদি! বৌদিদি! বৌদিদি! এ কি বিশ্রী ধারণা মনের মধ্যে সে পুষিয়া

বাধিয়াছে! লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল! মুখ তুলিয়া অন্নদার পানে তাকাইতেও পারিল না। সে বলিল,—আমি রান্নাঘরে যাই। এবং কথাটা বলিয়াই অন্নদার সম্মুখ হইতে সে সরিয়া গেল।

রান্নাঘরে গিয়া রান্না চাপাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনের মধ্যে ঝীর কথাগুলা প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়া ভীষণ তোলাপাড়া বাধাইয়া দিল। এমন তাহার অদৃষ্ট হইবে! বাসের জন্য একখানি ক্ষুদ্র গৃহকোণ কোন দিন সে অধিকার করিতে পাইবে। সেই গৃহের কোণে স্বামীর জন্য বাঁধিয়া-বাড়িয়া সে তাঁহার আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে! অধীর প্রতীক্ষায় প্রতি-মুহূর্ত্ত কি উদ্বেগেই কাটিবে! হোক্ উদ্বেগ, তবু কি মধুর সম্ভাবনা তাহার পিছনে গো। সে ঐশ্বর্য্যের কাঙাল নয়, বিলাসের কাঙাল নয়। ঐশ্বর্য্যের তাহার অভাব কি? পায়ের কাছে রত্নালঙ্কারের স্তূপ ছড়ানো,—রাজার ঐশ্বর্য্য। শুধু হাতে করিয়া তুলিয়া লওয়ার অপেক্ষা। সে ঐশ্বর্য্য যদি সে হাতে লয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য বর্ত্তাইয়া যায়! কিন্তু সে এ-সব কিছু চায় না—দরিদ্র স্বামীর ঘরে সহস্র কাজে সে আপনার এই সদ্যবিকশিত যৌবনকে ঢালিয়া দিতে কতখানি উন্মুখ, তাহা শুধু তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন! কিন্তু ঝী এ কি দুরাশার স্বপ্ন কাণের কাছে এমন সুরে শুনাইতে চায়। হাবে নির্ব্বোধ,—সে জানে না, দাসী হইলে কি হয়, তাহার পাশে প্রীতি কত দীন, এ সবের আশা হইতেও সে একেবারে বঞ্চিতা!

অন্নদা আসিয়া বলিল,—এই তোমার বাটনা আর এই কুট্নো। এগুলো ঝোলে দিয়ো। আর এই বাঁধা কপিটুকু ভাতে দিয়ো না বৌদি, বেশ ঝাঁজালো তেল এনেচি, একেবারে টাটকা ঘানির—খেতে যা হবে, একটু নুন দিয়ে!

এ সব আহারের আলোচনা প্রীতির মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। সে এখন চায় নির্জ্জনে একটু একলা থাকিতে—মনের রাশকে উদ্দাম গতিতে একবার ছাড়িয়া দিতে! কি নব নব পথে নব নব অপরূপ দৃশ্যাবলীর পাশ দিয়া কোন্ অজানা অসীমের তীরে গিয়া মনের সে যাত্রা শেষ হয়, তাহা দেখিতে!

তাই ঝীকে বিদায় দিবার উদ্দেশ্যে প্রীতি বলিল,—হ্যাঁ ভাই অন্নদা, একটু ঘুরে দ্যাখো না ভাই,—মিঠে পাণ আর দালচিনি-এলাচ, এ সব কোথাও পাও কি না!

অন্নদা বলিল,—পয়সা দাও, যাচ্ছি। আর তো আমার এখানে এখন কোনো কাজ নেই, তোমার সব গুছিয়ে রেখেছি।

খরচের জন্য প্রণব কয়টা টাকা দিয়া গিয়াছিল; প্রীতি উঠিয়া আসিয়া আর্শির টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া তাহা হইতে একটা টাকা দিয়া অন্নদাকে বিদায় করিয়া ফিরিয়া আবার রান্নাঘরে আসিয়া বসিল; বসিয়া মনের রাশ ছাড়িয়া দিল। মন কি বিচিত্র কল্পনা-কুঞ্জের ধার দিয়া নব-নব ফুলের সৌরভে মত্ত হইয়া কোন্ অসীম লক্ষ্য করিয়া দুরন্ত ঘোড়ার মত ছুট দিল! অজানা নূতন পথে চঞ্চল গতি-ভঙ্গীতে পদে-পদে ঠোক্কর খাইলেও প্রীতি সে অপরূপ দৃশ্যের মধ্যে একেবারে তন্ময় মোহিত হইয়া পড়িল। মন গিয়া শেষে পৌঁছিল এক সজ্জিত গৃহের দ্বারে,—প্রণব সে গৃহে বসিয়া ছবির পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

আর···? বুকে অসহ্য বেদনার ঘা খাইয়া প্রীতি সেই ঘরের দ্বার-প্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার মোহ ভাঙ্গিল। তাই তো, সে এ কি দুরাশার পিছনে মনকে ছুটাইয়া দিয়াছে! যে তোর এমন উপকার করিয়াছে, সর্ব্বনাশী, তুই তার ছবির ধ্যান এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে চাস্!

মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সে মনের রাশ চাপিয়া ধরিয়া আবার রান্নার দিকে ফিরাইল।

—১০—

অন্নদার তাগিদে আহারাদি করিতে হইল! আহারের পর প্রীতি বাগানে খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল। শেষে তাহা আর ভালো লাগিল না। তখন সে আসিয়া ছবির ঘরে ঢুকিল। দেওয়ালের গায়ে হাতে আঁকা কত ছবি! এই-সব ছবি প্রণব নিজের হাতে আঁকিয়াছে! ছবির রঙে, ছবির লতায়-পাতায়, ছবির অবয়বে প্রণবের সরল খোলা প্রাণের মধুর ছাপ হাসির মতই বিছানো রহিয়াছে! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে ছবি দেখিল; তারপর অন্যমনস্কভাবে আসিয়া হার্ম্মোনিয়মের সামনে বসিয়া তাহার রীড-গুলায় আঙুলের পরশ বুলাইল। মৌন মূক রীডগুলা অমনি সে পরশে এক করুণ সুর জাগাইয়া তুলিল। সুরের পর সুরের তরঙ্গ ছুটিল। তারপর বাজনার সুরে কখন্ যে কণ্ঠ আসিয়া যোগ দিল, প্রীতি তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। হার্ম্মোনিয়মের সুরে প্রীতি গাহিতে লাগিল,—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী!
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী!

একবার, দুইবার, তিনবার সে এই গান গাহিয়া চলিল,—যখন ক্লান্ত কণ্ঠে গান থামিল, তখন প্রীতির

চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সজল চোখে প্রীতি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—আশে-পাশে কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তাহার চারিধার হইতে বাহিরের জগৎ অদৃশ্য হইয়া গানের ভাষায় গানের সুরে মিশিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এমন সময় একটা স্বর কাণে গেল,—চমৎকার গাইতে পারো তুমি প্রীতি।

চমকিয়া প্রীতি চাহিয়া দেখে, অদূরে প্রণব সোফায় বসিয়া আছে। সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রণব বলিল,—উঠো না, প্রীতি। আর একটি গান গাও। আজ আমার এ হার্মোনিয়ম কেনা সার্থক হলো। যেমন তোমার হাত, গলাও তেমনি! আমার লজ্জা হচ্ছে, কাল আমি তোমার সামনে বাজনার কেরামতি দেখাতে গিয়ে শুধু বাজনার অপমান করিনি, তোমারও দস্তুরমত অপমান করেচি।

প্রীতি ঈষৎ লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল,—আপনি কখন্ এলেন, আমি কিছুই জানতে পারিনি।

প্রণব বলিল,—কি করে জানবে? গানের শব্দ শুনে গাড়ী ঐ ফটকের সামনে রেখে পা টিপে-টিপে আমি ঘরে এসেচি—কি জানি, যদি তুমি টের পাও, তাহলে এমন সুরের নির্ঝর, এ যে শুকিয়ে যাবে!

প্রীতি বলিল,—লুকিয়ে-লুকিয়ে কেন আপনি গান শুনলেন?

প্রণব বলিল,—প্রকাশ্যে শোনবার কোন আশা ছিল না বলে।

প্রীতি বলিল,—ভারি অন্যায় কিন্তু।

প্রণব বলিল,—এ অন্যায়ের সাজা হবে আর একখানি গান শোনালে।

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—আমায় খালি অপ্রতিভ করচেন!

প্রণব বলিল,—না, সত্যি বলচি, প্রীতি—মেয়েমানুষের উপর নানা বিষয়ে আমার খুব শ্রদ্ধা আছে, স্বীকার করি। কিন্তু গেয়ে গানকে এমন জীবন্ত করতে পারে, এ ধারণা আমার কোনকালে ছিল না। আমার সেটা মস্ত অপরাধ হয়েচে,—তাও স্বীকার করচি। নাও, এখন রবি-বাবুর আর একখানি গান গাও দিকি, গাও প্রীতি।

কণ্ঠের স্বরে একটু সঙ্কোচ মিশাইয়া প্রীতি বলিল,—গাইবো? কিন্তু নিন্দে করবেন না, ঠিক সুরে গাইতে না পারলে! ঠিক সুর আমি জানি না।

প্রণব বলিল,—ভূমিকা রেখে তুমি এখন গাও।

প্রীতি আবার হার্মোনিয়মের সামনে বসিয়া প্রথমে একটা রীড্ টিপিয়া সুর ধরিল, তারপর কণ্ঠ খুলিয়া গাহিল,—

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আসে
কোন্ সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

প্রণব অবাক হইয়া গেল। গলার সুরে ও মাধুর্য্যে, গায়িকার আন্তরিকতায় সমস্ত গানখানি যেন সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিল,—গানটি অপরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, গলা ও সুরের কসরৎ নয় শুধু, রীতিমত কাল্‌চার ও হৃদয় না থাকিলে, এ-সব গান এমন করিয়া গাওয়া যার-তার কাজ নয়! প্রীতি এমন শিক্ষা পাইয়াছে যখন, তখন সে যে-সে ঘরের মেয়ে হইতেই পারে না। কাহাদের মেয়ে আজ এমন নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রণবের গৃহে দৈবাৎ আসিয়া পড়িয়াছে? মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রণব প্রীতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রীতির মুখে-চোখে এমন শ্রী ফুটিয়াছে—ও কি তাহার চোখদুটি ছল ছল করিতেছে যে। প্রীতি চোখ তুলিতেই প্রণবের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল—অমনি সে চোখ নামাইল।

প্রণব ডাকিল,—প্রীতি···

প্রীতি প্রণবের পানে চাহিয়া বলিল,—কি বলচেন?

প্রণব বলিল,—থাক! আর গাইতে হবে না।

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—সখ্ মিটে গেল। এমন গাইলুম যে গান বন্ধ করতে বলচেন?

প্রণব বলিল,—তা তো বটেই! না প্রীতি, গান এখন থাক, তোমার কষ্ট হবে।

প্রীতি বলিল,—কষ্ট। কোন কষ্ট নেই। আপনি যদি শুনতে চান্...

প্রণব বুঝিল, এই যে গাহিতে চাওয়া,—এ শুধু তাহাকে খুশী করিবার জন্য। প্রীতির কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার ভাবটাই যেন করুণ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া ওঠে! এমন মিনতি, এমন নিবেদনের সুর সে স্বরে দেখা দেয় যে প্রণবের সমস্ত মন তাহাতে হাহাকার করিয়া ওঠে! প্রণব বলিল,—না, আমি শুনতে চাচ্ছি না। আজ একটু ঝঞ্ঝাট পোহানো হয়েচে কি না, তাই একটু গল্প-স্বল্প করে জিরুতে চাই। আজ সকালে আসতে পারিনি, কৈ, জিজ্ঞাসা করলে না তো, কেন এলুম না?

প্রীতি কোন জবাব দিল না, শুধু দুই চোখে মিনতি ভরিয়া প্রণবের পানে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম না···?

বটে! হায় রে, এতক্ষণ কি অস্থিরতা বুকে করিয়া যে কাটাইয়াছি, তা যদি বুঝিতেন!

প্রণব বলিল,—দরকার বোধ করোনি, না?

প্রীতি বললে,—কেন আসেন নি?

প্রণব বলিল,—আজ সকালে মার সঙ্গে বালিগঞ্জে নেমন্তন্ন গেছলুম, এক আত্মীয়ের বাড়ী। সে একটা রীতিমত ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।

প্রীতি বলিল,—ষড়যন্ত্র কি রকম?

প্রণব বলিল,—ষড়যন্ত্র বৈ কি। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে মার কাছে শুনলুম, কে-এক পিস্‌তুতো বোন্ আছেন বালিগঞ্জে—তাঁর বাড়ী আজ সকালে নেমন্তন্ন। ছোট ভাই জবাব দিয়েছেন, তাঁর যাবার অবসর হবে না, কাজেই মাকে নিয়ে আমাকে যেতে হবে। তথাস্তু। গিয়ে হাজির হলুম—দিব্য চর্ব্ব্য-চূষ্য-ভোজনে উদর-তৃপ্তি করা গেল—তারপর আস্‌বো—মা বললে, মাকে নিয়ে তবে ফিরতে পাবো। বেশ। তারপর বিশ্রামের জন্য এক সজ্জিত কক্ষে বসলুম। পাণ নিয়ে এক কিশোরীর কম্পিত বক্ষে সে কক্ষে প্রবেশ হলো। রাজ্যের লজ্জা তাঁর গায়ে জড়ানো! পাণ নিলুম, কিন্তু তিনি নড়েন না। একটু সন্দেহ হচ্ছিল। হঠাৎ মা এসে সন্দেহ-ভঞ্জন করে দিলে, বল্‌লে,—এই মেয়েটিকে পছন্দ হয় রে পিনু? আমি তো অবাক! মুখে স্পষ্ট করে বলতে পাচ্ছি না—না মা, না! বেচারীর প্রতি বড় অন্যায় করা হয় তাহলে। আম্‌তা আম্‌তা করে কোনমতে পাশ কাটালুম। মাকে বললুম,—বুক ধড়ফড় করছে আমার! বললুম, গাড়ী পাঠাবো সন্ধ্যার সময়, তুমি বাড়ী যেয়ো,—ব্যস, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়ে একেবারে হেথায় আগমন!

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—কেন মেয়েটিকে পছন্দ হলো না?

প্রণব বলিল,—ক্ষেপেছ প্রীতি! আমি তো নেহাৎ খোকা নই যে নারী-মূর্ত্তি দেখলেই মুগ্ধ হয়ে যাবো!

প্রীতি বলিল,—কেন, আপনার পছন্দ কি এমনি গবেষণার বস্তু?

প্রীতির এই সরল ব্যঙ্গে প্রণব একটু প্রীত হইয়াই বলিল,—না, আমার মনে হয়, এখন পছন্দ করতে গেলে চট্ করে তা করে উঠতে পারবো না। গায়ের কটা চামড়া কিম্বা কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম দেখেই ভুলে যাবো না—তার মনের পরিচয়ও দস্তুরমত পেতে চাইবো।

প্রীতি বলিল,—এ মেয়েটিকে তার অবসর দিলেন না যখন, তখন আপনার অপছন্দ করবার অধিকারও নেই তো।

প্রণব বলিল,—তা নেই। তবে চেহারা থেকে তার পরিচয় কতক মিলবে বৈ কি! এ যে-ভাবে জড়পুত্তলিবৎ পাণ নিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো! বাবাঃ! এসে ভদ্রলোককে কোথায় বলবে, পাণ নিন্—তা মুখে একটা কথা নেই!

ঈষৎ অনুযোগের স্বরে প্রীতি বলিল,—কি করে বলবে? সে বাড়ীর মধ্যে শুনেচে, আপনি কেন এসেচেন, আর সেই বা পাণ নিয়ে আপনার কাছে আসচে কেন। এতে তার লজ্জা হবে না?

প্রণব মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া প্রীতির পানে চাহিল, তারপর বলিল,—ঠিক! তুমি ঠিক বলেচো প্রীতি। তা হলে ও-রকম এক কথায় ডিস্‌মিস্ করা আমার উচিত হয়নি। তারপর একটু হাসিয়া আবার বলিল,—তবু কি জানো প্রীতি, একে ঐ একটিবার দেখেই মনে হল, বুদ্ধি এর তেমন তীক্ষ্ণ নয়। পছন্দ হবে যে-মেয়ে, সে এমন হবে যে তার মুখ-চোখ একটি নিমেষেই আমার প্রাণে রেখাপাত করবে! এই কি পছন্দ করবার আসল মাপ-কাঠি নয়? আমি জানি, এই একমাত্র পথ—এবং এই পথে চলে যাবে অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়ন, থুড়ি, এ প্রণব রায়।

প্রীতি অবাক হইয়া বলিল,—ও কি হলো আবার?

প্রণব বলিল,—রবি বাবুর 'বিসর্জ্জন' কোট্ করে দিলুম।

প্রীতি বলিল,—আপনার সঙ্গে কথা কয়ে ভারী সুখ হয় কিন্তু! এক মিনিটে এমন জমিয়ে দেন···

প্রণব বলিল,—যেন কুলপী বরফ! না?

প্রীতি বলিল,—যান্, সব কথায় ঠাট্টা!

এমন সময় অন্নদা আসিয়া ঘরের দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল,—বৌদিমণি—

হঠাৎ ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, প্রীতি ঠিক সেই রকম চমকিয়া উঠিল। চমকিয়া মুহূর্ত্তের জন্য প্রণবের পানে চাহিল, প্রণবের দৃষ্টি তখন একেবারে বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছে। যে-মানুষ অমন হাসি-ভরা কথার বান ডাকাইয়াছিল, এ যেন সে মানুষই নয়! এমন গম্ভীর! রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া প্রীতি উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। আসিয়া অন্নদাকে কহিল,—কি বলচো?

অন্নদা বলিল,—আর একটা উনুন তৈরী করে দিতে বলেছিলে না? তা একবার এসো গো বৌদিদি,—কত বড় উনুন হবে, আর কোথায় হবে, আমায় দেখিয়ে দিয়ে যাও।

প্রীতি মন্ত্রচালিতের মত বলিল,—চলো। কথাটা বলিয়া সে একবার ঘরের মধ্যে প্রণবের পানে চাহিল,··· সেই একই ভাবে সে বসিয়া আছে! অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবেই প্রীতি অন্নদার সঙ্গে চলিয়া গেল।

—১১—

প্রণবের কানেও ঝীয়ের সম্বোধনটুকু স্পষ্ট আঘাত করিয়াছে, ইহাতে সেও একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল। প্রীতি চলিয়া গেলে সেও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল! তাইতো, ঝী এ কি সম্পর্ক ধরিয়া লইয়াছে! প্রীতি কি ভাবিল? ঝীয়েরই বা অপরাধ কি? সে যে-ভাবে কাল প্রীতির সঙ্গে হাস-গল্প করিয়াছে, তাহাতে ঝীয়ের ও ধারণা করার কোন অপরাধ হয় নাই! তাহার মনে লজ্জা হইল, প্রীতির সঙ্গে তবে ঠিক-ভাবে ব্যবহার করে নাই সে! তা যদি করিত, তবে ঝী ওরূপ ভাবিত না!

প্রণব আরো ভাবিল, ঝীয়ের এ-রকম ভাবা বিচিত্র নয়। এই নগরের প্রান্তে এই সজ্জিত বাড়ীতে তরুণী নারী একা রহিয়াছে, বাড়ীতে অপর লোক-জনও কেহ নাই—সে আসিয়া এমন চির-পরিচিতের মত সহজ ভঙ্গীতে তরুণীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে, ইহাতে ঝী অন্যরকম ভাবিবেই বা কোথা হইতে! তবু তো সে বৌদিমণি ভাবিয়াছে, ঝীর মন ভালো, তাই! নাহলে পরিচয়ে অত্যন্ত কুশ্রী একটা ইঙ্গিতও সে দিতে পারিত! ছি, ছি! না, প্রণবের এ রকম মেলা-মেশা করা উচিত হয় নাই। প্রীতির সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া ইহাতে সে তাহার সম্ভ্রমের হানি করিয়া বসিয়াছে।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া প্রণব গিয়া ছবির সম্মুখে বসিল। দুশ্চিন্তা উড়াইয়া দিবার জন্য মনকে সে ছবির কল্পনায় ডুবাইয়া দিল। হাতে তুলি লইয়া সে 'কৈশোরে' রঙ্ ফলাইতে বসিল। দু-চারিটা ফুটন্ত লতা-পাতায় back-ground আঁকিয়া সে এক তরুণীর নব কিশলয়ের মত কোমল সুন্দর মুখ আঁকিতে সুরু করিল। ছবির কাপড়ে তুলির আঁচড় টানিয়া পরক্ষণে তাহা মুছিয়া, আবার নূতন রঙের পোঁচ টানিয়া কোনমতে একখানি মুখের আভাস যখন ফুটাইয়া তুলিল, তখন দিনের আলো নিবনিব হইয়া আসিয়াছে। মুগ্ধ নয়নে ছবির পানে চাহিয়া সে দেখে, এ কি! এ কি করিয়াছে! এ যে প্রীতির মুখখানিকে ভাবের ঝোঁকে আঁকিয়া বসিয়াছে! সেই মুখ, সেই নাক, সেই কুঞ্চিত কেশের অলকদাম, চূর্ণ-কুন্তল বক্রিম কপোল বহিয়া রেশমী সূতার মত দুই-চারিগাছা ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেই টানা-টানা চোখ-দুটি, সে দুই চোখে ম্লান ছল-ছল দৃষ্টিটুকু অবধি! প্রণবের সর্ব্বশরীর ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। এ দেখিয়া প্রীতি কি ভাবিবে? আতিথ্যের বিনিময়ে প্রীতিকে সে একেবারে সহস্র দর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে এমন ভাবে টানিয়া বাহির করিয়াছে!

একটা পেয়ালা লইয়া হঠাৎ প্রীতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—আপনার চা।

প্রণব ছবিখানা পর্দ্দা টানিয়া ঢাকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল; কহিল,—চা এনেচো? দাও।

প্রীতি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—লুচি ভেজে দেবো?

ঝীর কথাটা তাহার সর্ব্বাঙ্গে সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া তখনো জড়াইয়া ছিল, তাই এ কুণ্ঠা!

প্রণব বলিল,—লুচি? বলিয়া সে চায়ের পেয়ালা মুখে ধরিল, জবাব দিল না।

প্রীতি বলিল,—আজ আর অসুবিধা হবে না। লুচি ভাজবো—খাবেন না?

প্রণব বলিল,—না। থাক। অবেলায় নেমন্তন্ন খেয়ে পেট ভার আছে, লুচি আর আজ খাব না। এই চাই যথেষ্ট হবে। বরং গোটা-দুই পান সেজে দিয়ো।

—দি। বলিয়া প্রীতি বিদ্যুতের মতই খানিক আলোর ঝিলিক ছিটাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে প্রণব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর চা-টুক নিঃশেষে পান করিয়া পেয়ালাটা টি-পয়ের উপর রাখিয়া ঘর-ময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রীতি আসিয়া পান দিল। পান দিয়া সে তখনি চলিয়া যাইতেছিল; প্রণব বলিল,—কোথায় যাচ্ছ?

—রাঁধতে।

—এখন থাক না।—তারপর তাহার পানে চাহিয়া রহিল। প্রীতি মুখ নত করিল। প্রণব বলিল,—মনে আছে, প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—কি?

প্রণব বলিল,—কাল ·

প্রীতি বলিল,—ও। মনে আছে বৈ কি! কাল আমার বিদায়ের দিন, না? তাই বলচেন তো?

প্রণব মনে আঘাত পাইল। আঘাত পাইয়া কহিল,—ছি, ও কথা কেন প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—অন্যায় কথা বলিনি আমি। চিরকাল আপনার ঘর দখল করে বসে আপনার অন্ন ধ্বংস করতে পারি না তো!

প্রণব বলিল,—যদি আমি যেতে না দিই?

প্রীতির সমস্ত প্রাণটার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া গেল। দুই চোখের বিস্মিত দৃষ্টি প্রণবের মুখে স্থাপন করিয়া সে কহিল,—যেতে দেবেন না? তারপর মুখ নামাইয়া হাতের একটা নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ধীর স্বরে বলিল,—কেন যেতে দেবেন না, জানতে পারি?

—১২—

প্রণব বেশ সহজভাবেই বলিল,—ছোট বোনের উপর বড় ভাইয়ের কি একটু অধিকারও নেই?

দাসীর কথায় মনের কোণে যে মেঘ আসিয়া জমিয়া

ছিল, যে মেঘের ঘটায় চারিদিক একেবারে ঝাপসা কালো হইয়া আসিতেছিল, প্রণবের এই কথার হাওয়ায় সে মেঘ ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া সরিয়া মনটাকে স্বচ্ছ পরিষ্কার করিয়া দিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রীতি বলিল,—কাল আমার পরিচয় দি, আগে শুনুন। তারপর তা শুনেও আমায় এখানে রাখার যোগ্য মনে করেন যদি, তা হলে এইখানে এই তীর্থেই পড়ে থাকবো। আর যদি তাড়িয়ে দেন…

প্রণব বলিল,—তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার।

প্রীতি বলিল,—আমার বাচালতা মাপ করবেন। আপনি বড় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এ-প্রশ্রয়ে আমার মত লোকের মাথা ঠিক থাকে না।

প্রণব প্রীতির কাছে সরিয়া আসিল, আসিয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিল,—বড় ভাইকে ও-রকম কথা বলতে নেই, প্রীতি। আর কখনো বলো না। কাল মার কাছে তোমার কথা বলবো মনে করেছিলুম—বলিনি। ভাবলুম, মা যদি জিজ্ঞাসা করেন,—কাদের মেয়ে, কি পরিচয়, তখন বেকুব বনবো কি? তাই বলিনি। কাল তোমার পরিচয় নিয়ে মার কাছে সব কথা খুলে বলবো। কোন ভয় নেই প্রীতি। যে পরিচয়ই হোক তোমার, তুমি ইচ্ছে করে আমার সঙ্গ ত্যাগ না করলে আমি কখনো এ-কথা তোমায় বলবো না যে, তুমি চলে যাও।

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রীতির চোখে জল আসিল। সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না; একেবারে প্রণবের পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল,—আপনার দয়া জীবনে ভুলবো না। আমার দ্বারা—

কথা আর শেষ হইল না। আবেগে-আবেশে দুই চোখে জল এমন ঠেলিয়া আসিল যে, পাছে প্রণব তাহা দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে প্রীতি বিদ্যুতের মত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রীতি চলিয়া গেলে প্রণব অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, কাল প্রীতির পরিচয় দিবার দিন! পরিচয় দিতে এ আশঙ্কা তাহার কেন হইতেছে যে, পরিচয় শুনিয়া প্রীতিকে আশ্রয় দিবার সম্বন্ধে প্রণব দ্বিধা করিবে! পরিচয়ের মধ্যে এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিতে পারিলে প্রীতির এই কোমল শান্ত প্রকৃতি, এই উদার শিক্ষার আলোয় আলোকিত মন—এ-সব একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে? এমন কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রীতির পরিচয়ে থাকিতে পারে না! সে কি কাহারও কিছু চুরি করিয়াছে, না, সে মানুষ খুন করিয়াছে…

কথাটা মনে হইতেই প্রণব কেমন শিহরিয়া উঠিল। প্রীতি চোর? প্রীতি খুনী? অসম্ভব! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! তবে কি সে কুলত্যাগিনী? কখনো নয়! তাহার বিবাহ হয় নাই! সে নিজেই বলিয়াছে, তার স্বামী নাই, ছিলও না কোনদিন।

আর যদি এমন হয়,—প্রীতি সত্যই কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? তবে বুঝিতে হইবে, প্রীতির তাহাতে কোন অপরাধ নাই! সে যদি কুলত্যাগ করিয়া থাকে, তবে দায়ে পড়িয়াই করিয়াছে এবং সে কুলত্যাগ করাই উচিত ছিল। না, না, এ-সব নয়। হয়তো বেচারী এমন বিপদে পড়িয়াছিল যে, তাহার আতঙ্ক এখনো মন হইতে মুছিয়া যায় নাই—মানুষের উপর তাহার বিকট ভয় জন্মিয়া গিয়াছে এবং এত শীঘ্র এমন অকস্মাৎ সে ভয় কাটে নাই। তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল—রূপে-গুণে এমন মেয়েটি—তাই তো—কি তার পরিচয়? কে এ? অথচ একটা রাত্রির জন্য এ কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে যাওয়াও ঠিক হইবে না। তাহা হইলে প্রীতির মনের সেই ক্ষতটুকুকে আরো সে খোঁচাইয়া তুলিবে। প্রীতি ভাবিবে, একটা রাত্রির সবুর সহিতেছে না? কাল তো সে নিজেই সব কথা খুলিয়া বলিবে।

প্রণব হাসিল; মনে মনে ভাবিল, যে পরিচয়ই হউক, প্রীতি ইচ্ছা করিয়া চলিয়া না গেলে প্রণব তাহাকে কখনো বলিবে না, তুমি চলিয়া যাও। আবার এ কথাও অমনি চকিতে মনে উদয় হইল, রাখিতে হইলেও এ-ভাবে এখানে রাখা যায় না। পাঁচটা লোকের মনে নানা সংশয় জন্মিতে পারে। সে সংশয়ে অবশ্য তাহার কিছু আসিয়া যায় না, তবে প্রীতি তাহাতে বেদনা পাইতে পারে! এই যে ঝীটা তাহাকে বৌদি বলিয়া ডাকিল…

প্রণব আবার হাসিল। মানুষের মন এমনি বটে। দেখিয়াছে নির্জ্জন বাগান-বাড়ী—ব্যস্, সেখানে আর কে থাকিতে পারে? ঝীয়ের অপরাধ কি! ইতরের মত আমাদের এই সমাজও যে সময় সময় এমনি ধারণা করিয়া বসে! কেন, নাই বা থাকিল কোনো আত্মীয়তা—স্ত্রীলোক ও পুরুষকে একত্র মিশিতে দেখিলে ঐ একটা সম্পর্কই বুঝি কল্পনা করিয়া লইতে হয়! নারী ও পুরুষে বিশুদ্ধ বিমল সখ্য—সে কি এমনি অসম্ভব ব্যাপার?

প্রণব ভাবিল, ঝীর ঐ সম্বোধন না জানি প্রীতিকে কতখানি আঘাত করিয়াছে। বেচারী আশ্রিতা। নেহাৎ নিরুপায় ভাবিয়াই হয়তো এ কথার কোন প্রতিবাদ সে করে নাই। কি জানি, তাহা হইলে আরো কি কঠিন সম্বোধন শুনিতে হয়।

তারপর প্রণব ভাবিল, ঐ সম্বোধনটুকু শুনিতে কিন্তু মন্দ লাগে নাই! প্রীতি যে-রকম যত্ন-আদর করিয়া তাহার খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করিতেছে, কথায় বার্ত্তায়

যে রকম সহজ সলীল ভঙ্গী তার—জানি না, স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক এই রকমই মধুর কি না—তবে সেটুকু বড় ভালো লাগিয়াছে। মা তো বিবাহের জন্য এত তাগিদও দিতেছেন। প্রীতিকে যদি—

প্রণবের মন অমনি হুঙ্কার দিয়া উঠিল, খবর্দার! আতিথ্যের মধ্যে এতখানি স্বার্থের বিষ পুরিয়া রাখিয়াছিস! না, না, না—প্রীতি তাহার বোন, ছোট বোন!

ঘরের মধ্যে মুহূর্তে অমনি এমন গরম বোধ হইতে লাগিল যে, প্রণব সেখানে আর টিঁকিতে পারিল না, কয়বার ঘরে পায়চারি করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল। সেখানে সে অন্তরাল হইতে উঁকি দিয়া দেখিল,—না, প্রীতি রান্নাঘরে নাই! ঝী একলা বসিয়া ময়দা মাখিতেছে। একবার তাহার মনে হইল, ঝীকে জিজ্ঞাসা করে, প্রীতি কোথায় গেল। পর-মুহূর্তে ভাবিল, কিন্তু কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ভালো দেখাইবে না, অথচ এ-কথাও জিজ্ঞাসা করিলে ভালো দেখায় না, যে তোর বৌদিদি কোথায় রে? নিঃশব্দে সেখান হইতে সে চলিয়া আসিল।

আসিয়া ঘরগুলার মধ্যে এমন ভাবে ঘুরিয়া চলিয়া সে বেড়াইতে লাগিল যেন, প্রীতিকে সে খুঁজিতেছে না,—বিনা-উদ্দেশ্যে বেড়াইতেছে শুধু! ঘুরিতে ঘুরিতে কোন ঘরেই সে প্রীতিকে দেখিতে পাইল না। উত্তর দিকের বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ার পড়িয়াছিল, প্রণব বারান্দায় আসিয়া চাঁদের আলোয় দেখে, ইজি চেয়ারের উপর কে যেন শুইয়া আছে! প্রণব বুঝিল, সে প্রীতি। প্রণব ডাকিল—প্রীতি…

প্রীতি ধড়মড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কাঁদিতেছিল, প্রণবের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

প্রণব বলিল,—এখানে একলাটি পড়ে আছো কেন প্রীতি, অসুখ করেছে কি?

প্রীতি গাঢ় স্বরে কহিল,—না।

প্রণব বলিল,—তবে?

প্রীতি বলিল,—মাথাটা একটু ধরেছিল।

প্রণব অগ্রসর হইয়া তাহার ললাটে হাত দিয়া দেখিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—তা এখানে কেন? ঘরের মধ্যে কোচে গিয়ে শোও না। এখানে ঠাণ্ডা লাগবে। আজ আর আগুন-তাতে যেয়ো না। শুধু দুধ খেয়ো, আর বেয়ারাটাকে বরং বলে দাও, আমার পাঁওরুটী আছে, তাই ক'খানা টোষ্ট করে দিক্।

একটা নিশ্বাস চাপিয়া প্রীতি বলিল,—না, না, ও-সব হাঙ্গামের দরকার নেই। এ মাথা-ধরা এখনি ছেড়ে যাবে। এখনো ময়দা মাখা হয়নি, তাই এখানে এসে বসেছিলুম।

প্রণব বুঝিল, প্রীতির স্বর বেশ স্বাভাবিক নয়, একটু যেন গাঢ়! সে বলিল,—ময়দা মাখা হলে ঝী নিজের খাবার তৈরি করে নিক্। তুমি আর নাই খেলে…

প্রীতি কহিল—আপনি?

প্রণব বলিল,—আমি আজ খাবো না। ক্ষিদে নেই।

প্রীতি ভাবিল, তাহার অসুখ করিতেছে, কষ্ট হইবে, এই জন্যই প্রণব ও কথা বলিল,—সে খাইবে না। তাই সে চেষ্টা করিয়া একটু হাসিয়াই বলিল,—আপনার ক্ষিদে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আর আপনি আমায় খেতে দেবেন না, পাঁওরুটী টোষ্ট আর দুধ খেয়ে থাকতে বলচেন? শীতকালের এই এত বড় রাত! তারপর আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি আর কি।

প্রণব বলিল,—না প্রীতি, ও-সব কথা বললে চলছে না। তুমি যে ময়দা মাখচো, বুঝেচি সে আমার জন্যে। তা বেশ, এত যদি খাওয়াবার সাধ হয়ে থাকে তো কাল রাত্রে খাইয়ো। কাল এখানেই খাবো, খেয়ে বাড়ী যাব। মাকে বরং বলে আসবো, নেমন্তন্ন আছে। দেখবো, কত খাওয়াতে পারো।

প্রীতি বলিল—কাল খাবেন?

—হ্যাঁ, কাল। তুমি ভাবচো, কাল আমি বেঁচে থাকব না, মরে যাব? তোমার খাওয়ানো একদম বরবাদ যাবে?

এ-কথায় প্রীতি মুখ নত করিল, তার পর হাসিয়া বলিল,—তা নয়। তবে কাল এ-সময় আমি নিজে কোথায় থাকি, তার ঠিক নেই তো!

প্রণব এ কথার মর্ম্ম বুঝিল; তবু যেন বোঝে নাই, এমনি ভাণ করিয়া বলিল,—কেন? কাল তুমি কোথায় যাবে? কাশীবাসের জন্য বেরুবে না কি?

প্রীতি বলিল,—সে ভাগ্য আমার হবে কি না!

প্রণব ব্যথিত চিত্তে বলিল,—এ-সব কথা কেন বলচো প্রীতি? সত্যি, আমি তামাসা করে বলেচি শুধু। আমায় মাপ করো।

—ছি ছি, ও কি কথা বলেন আপনি! আপনি মাপ চাইছেন আমার কাছে? ছি! ওতে যে আমার পাপ হয়!

—কেন তুমি ও কথা বললে? ও কথায় আমার ভারী পুণ্যি হয়! না?

—তা নয়। তবে কাল আমার সব কথা খুলে বলবো কি না!

—আর তোমার কথা যেই ফুরোবে, অমনি আমি

তোমার কেশাকর্ষণ করে পৃষ্ঠে পদাঘাত দিয়ে বলবো, তুমি দূর হও? এই সত্ত আছে তোমার সঙ্গে?

—তা নয়। তবে সে কথা শুনে আপনি এমন মনে করতে পারেন কি না যে, আমার স্পর্শে আপনার ঘর কলঙ্কিত হচ্ছে।

—এত-বড় নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী আমি নই যে তোমার কথা শুনে আমি মনে করবো, আমার এ রাজপ্রাসাদ কলঙ্কিত হচ্ছে! আমি বেচারা চিত্রকর মাত্র, প্রীতি, আমি কলকাতার থিয়েটারের নাট্যকলাকুশল জনপ্রিয় অভিনেতা নই! ও-সব কলঙ্কিত, কলুষিত কথার মানেও জানি না যে গোল চক্ষু রক্তবর্ণ করে ঐ সব ভাষার হুঙ্কার ছাড়বো! ছি প্রীতি, আমার সম্বন্ধে এত হীন, এমন নীচ ধারণা তোমার!

প্রীতি একটু থামিয়া ধীর-ভাবে কহিল,—না সত্যি, আপনাকে আমি যে কি শ্রদ্ধা করি, তা আমার অন্তর্য্যামীই জানেন! আপনার সম্বন্ধে হীন-নীচ ধারণা করবো আমি! আমার মাথায় তা হলে সেই দণ্ডে বজ্রাঘাত হবে না!

প্রণব দেখিল, প্রীতি এই অসুস্থ শরীরে মনটাকে ঐ একই আগুনে পোড়াইতে চায়! ঐ পরিচয় দিবার ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া আপনাকে অত্যন্ত অপরাধিনী ভাবিয়া একেবারে কঠিন কঠোরভাবে নিজেকে আঘাত করিতেছে! এ প্রসঙ্গ হালকা করিয়া উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাই সে গম্ভীরভাবে কহিল,—তোমার পরিচয় পেয়েছি, প্রীতি। নতুন করে ছন্দে গেঁথে তা আর তোমার বলবার দরকার নেই; এবং কথাটা বলিয়া সে গম্ভীরভাবেই চুপ করিয়া রহিল।

প্রীতি কিন্তু এ কথায় একেবারে কাঁটা হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। তাহার ভাগ্যগুণে একটুকরা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিয়াছিল, তাই চাঁদের আলো তেমন উজ্জ্বল ছিল না, না হইলে সে আলোয় প্রণব দেখিত, প্রীতির মুখ কিরূপ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! তাহার বুকের পাঁজরাগুলার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া গেল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, মুখে কথা ফুটিল না।

প্রণব আবার বলিল,—পরিচয় পরিচয় করে ব্যস্ত করচো—কিন্তু তা পেতে কি আমার বাকী আছে?

প্রীতি এবার জোর করিয়া কথা কহিল, বলিল,—কি বলুন? বলুন আপনি। প্রীতির মুখ বিবর্ণ! সে কম্পিত চিত্তে অধীর আগ্রহ লইয়া প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রণব বলিল,—তুমি মাসিক পত্রে গল্প-টল্প কিছু লেখো, এ আর আমি বুঝি না! না হলে এমন কথার বাঁধুনি!

প্রীতির বুকের মধ্যে যেন মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, প্রণবের কথার হাওয়ায় তাহা উড়িয়া গিয়া বুক হালকা হইয়া গেল। তবু ভালো, তামাসা! কিন্তু মুখে কোন কথাই সে বলিতে পারিল না।

প্রণব বুঝিল, কাল পরিচয় দিতে হইবে এবং সেই কথা মনে উঠিতে প্রীতির পুরাতন আতঙ্ক আবার নূতন হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই সে বলিল,—শোনো প্রীতি, তুমি অমন করে আমার মনে আর ব্যথা দিয়ো না। তুমি কি ভাবো, আমি তোমার ঐ পরিচয় নেবার জন্য একেবারে অধীর উদ্যত হয়ে আছি! এই দুদিন তোমার সঙ্গে মেলামেশা করে, আলাপ করে, তোমার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমারো শ্রদ্ধা হয়েচে তোমার উপর খুব,—এইটুকু শুধু জেনে রাখো। এর বেশী যদি কোন পরিচয় থাকে, তবে সে তোমার মনেই থাকুক—আমি তা জানতে চাই না! আর কি এই আশ্রয় আশ্রয় কথা তুমি মুখে বলো, বলো ত? তোমার যতদিন অনুগ্রহ হবে, তুমি এখানে থাকবে, তারপর যে দিন তোমার চলে যাবার ইচ্ছে হবে, তোমার খুশী, সেই দিন তুমি চলে যেয়ো। আমি তোমায় থাকতে বাধ্য করবো, জোর করে—এ তুমি কখনো ভেবো না। তোমায় এখানে থাকা না থাকা সে তোমার ইচ্ছা, মর্জ্জি! কেন তুমি পরিচয়-পরিচয় করে মিছে আমায় ব্যস্ত করো। যেদিন পথে গাড়ীতে তোমায় তুলে নিয়েছিলুম, সেদিন তোমার পরিচয় জানিনি বলে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার এতটুকু দ্বিধা দেখেছিলে? তবে?

প্রীতির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে অশ্রুর তরঙ্গ একেবারে বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মত ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিল। এই কান্না ছাড়া তার আর কি বা সম্বল আছে?

সে বলিল,—আমাকে মাপ করবেন! কিন্তু আমার কথা কাল আপনাকে শুনতেই হবে, আমার পরিচয়। আমি সত্য করেছি! এটুকু দয়া করবেন আমার উপর! না হলে আপনার এ সুমধুর আতিথ্যের অমর্য্যাদা হবে, আর তা আমার দ্বারাই হবে, এ ভেবেও যে আপনার এখানে আমি নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারব না।

প্রণব বলিল,—আবার ঐ কথা, প্রীতি! তা হলে আমায় চলে যেতে হবে এখনি।

প্রীতি বলিল,—আর ও-কথা বলব না আমি। আপনি রাগ করবেন না।

প্রণব বলিল,—আমি রাগ করিনি। তবে তোমার মুখে ও-রকম কুণ্ঠিত কাতর কথা শুনলে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তাই বলছিলুম।

এ কথার আর শেষ নাই! এ যে বাড়িয়াই চলে! তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য প্রীতি বলিল,—সত্যি

আপনি খাবেন না ? না, আমার মাথা ধরেচে বলে আমার পাছে কষ্ট হয়, এই জন্ম ও কথা বলচেন ?

প্রণব বলিল,—না প্রীতি, আজ আর সত্যই খাবো না। আজ এখনি আমাকে যেতে হবে। ওবেলায় মার সঙ্গে একটা গোলমাল করে এসেছি কি না, তাই একটু শীঘ্র ফিরতে হবে। যাক, তোমার মাথা ধরা থাকে যদি তো ভিতরে এসো, এখানে ঠাণ্ডায় থেকো না। মেন্থল আছে এখানে, আমি দিচ্ছি; দুই রগে দাও দেখি, সেরে যাবে'খন। আর তাতেও যদি না সারে তো একটা ফেনাসৃপ্রিণ-ট্যাবলেট্ খেয়ে ফেলো। আমি আনুতে দিই।

প্রীতি হাসিয়া বলিল, —আপনি শুধু ছবি আঁকেন না, ডাক্তারীও করেন, দেখছি।

প্রণব বলিল,—এগুলো সাধারণ ব্যাপার, সকলেরই জেনে রাখা উচিত। এ আর ডাক্তারী কি।

প্রীতি বলিল,—ওষুধের দরকার নেই, তবে ভিতরে যাচ্ছি। মেন্থলই দেবেন চলুন।

—বেশ, তাই এসো।

উভয়ে ভিতরে ঘরে আসিলে প্রীতি দুই রগে মেন্থল ঘষিয়া দিল। এমন সময় অন্নদা আসিয়া ডাকিল,—ময়দা মাখা হয়েচে বৌদি। এসো এবার।

আবার ঐ কথা! দুজনেই একটু অপ্রতিভ হইল। প্রণব যেন সে কথা শোনে নাই, এমনি ভাবে বলিল,—সে রকম মাথা ধরা না থাকে তো ঝীকে বলো, তোমার জন্মে ক'খানা ও ভেজে দিক,—খেয়ে ন'ও আর দুধ খাও—ব্যস, খেয়ে শুয়ে পড়ো।

—তাই বলচি। বলিয়া প্রীতি বাহিরে গিয়া কি করিতে হইবে, অন্নদাকে বুঝাইয়া দিয়া আসিল।

প্রণব বলিল,—আমি তা হলে এখন আসি। তুমি খেয়ো সোদা, উপোস করে থেকো না। খাবে তো বলো।

প্রীতি বলিল,—যদি না খাই ?

প্রণব বলিল,—আমার আতিথ্যে তাহলে পাপ স্পর্শ করবে,—ধর্ম্ম যাবে।

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—যান্ আপনি!

—তাই যাচ্ছি, প্রীতি।

—না, আপনার সঙ্গে কথায় পারা ভার। বলিয়া প্রীতি চলিয়া যাইতেছিল; প্রণব বলিল,—খাবে তো? বলো। উপোস দেবে না ?

—না, না।

—কি না ? খাবে না ? না, উপোস দেবে ?

—খাবো,—খাবো।

—আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি তাহলে, কথা দিয়েচো! বলিয়া প্রণব ওভার-কোট গায়ে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। প্রীতি বলিতে যাইতেছিল, কাল একটু সকাল-সকাল আসিবেন তো? কিন্তু লজ্জায় সে কথা আর বলা হইল না।

বাহিরে সশব্দে প্রণবের গাড়ী যখন ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িল, তখন প্রীতি একেবারে কৌচের উপর দেহভার লুটাইয়া দিল। লুটাইয়া দিয়া ভাবিল, না, এমন লোক, এমন দরদী, এমন দরাজ বুক—পরিচয় বলিতেই হইবে। না হইলে নিজের মনের কাছে সে মস্ত অপরাধী হইয়া বসিয়া থাকিবে! তারপরও ইনি ছাড়িয়া না দেন, তবু তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, নহিলে—

নহিলে লোকে উঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কোনদিন যদি এক বিন্দু কালির ছিটা দেয়? না, না, চলিয়া যাইতে বুক তাহার ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া গেলেও সে কালির বিন্দু প্রীতি সহ্য করিতে পারিবে না!

তবু চলিয়া যাইবার কথা মনে হইতে সমস্ত প্রাণে যেন ঝড় বহিতে থাকে! সে ঝড়ে প্রাণের মধ্যে মনের মধ্যে যা কিছু আছে ভাবনা-চিন্তা, সাধ-আশা, কল্পনা সব ছিঁড়িয়া পড়িয়া প্রাণ ও মন যেন একেবারে সাফ হইয়া যায়, খাঁ-খাঁ করিতে থাকে।

—১৩—

প্রণব চলিয়া গেলে প্রীতি তাড়াতাড়ি কিছু আহার করিয়া ঘরের মধ্যে সেই কৌচটাতে আসিয়া বসিয়া পড়িল। এই ঘর, এই নির্জ্জন কোণ, এই সঙ্গ,—সব ছাড়িয়া কাল কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে লক্ষ্য-হারা গতি লইয়া তাহাকে বাহির হইতে হইবে! প্রণব মুখে যত আশ্বাস দিক, নিজের সমস্ত পরিচয় খুলিয়া বলিবার পর সে নিজেই বা কোন্ মুখে এখানে থাকিবে দয়ার পাত্রী হইয়া? তা-ছাড়া প্রণব তাহাকে না ছাড়িলেও প্রীতি যদি এইখানেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে লোকের মুখে-মুখে এমন গ্লানির কুৎসা সহসা এক দিন হয়তো রটিয়া উঠিবে যে, প্রণব অন্তরে জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইবে! এত করুণার, এমন স্নেহের বিনিময়ে প্রণবের বুকে সাধ করিয়া সে অশান্তির খোঁচা মারিবে? তাও কি হয় কখনো!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তেমনি বসিয়া প্রীতি নানা কথাই ভাবিতে লাগিল। শেষে মনে হইল, যেমন আছি, এমনি থাকি! অনন্ত কাল ধরিয়া এমনি সুখে, এমনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে, জগতের বাহিরে, এই নির্জ্জন কোণটুকুতে! এ কোণটুকুতে বসন্তের হাওয়া, সূর্য্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না, পাখীর কূজন—কোন্ সুখই বা নাই! প্রণব যখন এমন আশ্বাসও দিয়াছে—পরিচয় সে জানিতে চায় না!

প্রীতি চুপ করিয়া চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দের মত কৌচে পড়িয়া রহিল। তারপর হঠাৎ এক সময় গা ঝাড়িয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, না, তা হয় না! এমন কাপুরুষ সে! এত দুর্ব্বল মন! ছি! সাহস করিয়া সত্যের সামনে সকল আবরণ ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের সত্য পরিচয় লইয়া সে দাঁড়াইবে, এ রহস্যের কুহেলি কাটাইয়া দাঁড়াইবে—তার পর যা হয়, সে তাহা মাথা পাতিয়া লইবে! পথেই যদি দাঁড়াইতে হয় তো দাঁড়াইবে। এই প্রণবের সঙ্গে সে-দুর্দ্দিনের রাত্রে অমন অকস্মাৎ পথে যদি দেখা না হইত? সে রাত্রে পাষণ্ডের দল যদি পিছনে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া আবার সেই নরকের আঁধার গহ্বরে টানিয়া লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিত! কথাটা মনে করিতে প্রীতি শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত হাতে-পায়ে যেন কিসের বাঁধন কাষয়া বসিল। কম্পিত-কলেবরে নিজের পানে খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, পরে হাসিয়া কৌচে পড়িয়া ভাবিল, এ কি মিথ্যা আতঙ্ক তাহার! কোথায় কে তাহাকে বন্দী করিবে? সে মুক্ত, স্বাধীন! সে আজ পথে দাঁড়াইয়া নাই—দুর্গের মত নিরাপদ আশ্রয়-ছায়ায় গা ঢালিয়া সে নানা রঙে রঙীন অলস স্বপ্ন দেখিতেছে! সমস্ত প্রাণটার মধ্য দিয়া স্বস্তির স্নিগ্ধ-নির্ম্মল বাতাস বহিয়া গেল! সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তারপর আবার ভাবনা হইল, কেমন করিয়া আসামীর মত প্রণবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের দুর্গতি দুর্ভাগ্যের অত-বড় কাহিনী অচপল মুক্ত কণ্ঠে আগাগোড়া সে খুলিয়া বলিবে! অথচ বলিতেই হইবে, এবং কালই! না বলিলে তাহার নিস্তার নাই না, বলিলে একদণ্ড চলিবে না! কাল সকালেই প্রণব আসিয়া যখন এখানে দাঁড়াইয়া ডাকিবেন—প্রীতি—তখন সে কি বলিয়া নিজের আশঙ্কা, দ্বিধা ভয়, সব দূরে ঠেলিবা অকম্পিত চিত্তে সব কথা বলিয়া যাইবে! সে কথার মধ্যে কতখানি সংশয়, কতখানি ভয়, কতখানি লজ্জা, কত ঘৃণা, কত গ্লানি যে জড়িত আছে! তাছাড়া মুখে আজ যাহাই বলিয়া যাক্, কাল সকালে প্রণব কি তাহার এই পরিচয়টুকু শুনিবার আগ্রহেই এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে না? প্রীতির সমস্ত মন এক তীক্ষ্ণ কাঁটার ঘায়ে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে বাতাস যেন স্তব্ধ হইয়া গেল—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

সত্যই যদি এ নিশ্বাস চিরকালের জন্য বন্ধ হইত, তাহা হইলে সে বেশ হইত! কত বড় অগ্নি-পরীক্ষার দায়ে সে খালাস হইতে পারিত! কিন্তু সে-ভাগ্য কি তাহার হইবে! সমস্ত দুনিয়ার উপর তাহার রাগ হইল। পরের পাপের ভার তাহাকে বহিতে হইতেছে কেন? তাহার কি অপরাধ? সে তো কোন দোষে দোষী নয়! পরের কলঙ্কের দাগ তাহাকে এ জীবনে এমনি মার্কা মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে যে, সে দাগ ঢাকিবার কাহারও সাধ্য নাই! সেই কালো দাগগুলা মুখে-বুকে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া এই কালি-মাখা মুখে তাহাকে বেড়াইতে দেখিলে লোকে হাসির বাণ মারিবে, ঘৃণার ঢেলা ছুড়িবে, লাঞ্ছনার অগ্নিবৃষ্টি করিবে—আর সে-সব তাহাকে সহিয়া থাকিতে হইবে! তাহার ভ্রূকুটিটুকু করিবার যো নাই—করিলে লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িবে বই কমিবে না! এই আঘাত ও লাঞ্ছনার জন্য কাহারো কাছে নালিশ করিতে পারিবে না—নালিশ করিলে তাহা বিদ্রূপের ফুৎকারে তখনই বাতিল নামঞ্জুর হইয়া যাইবে। অথচ সেও জন্ম লইয়াছে ঐ উহাদের মত শুভ্র অকলঙ্ক মন ও নিষ্পাপ শরীর লইয়া! হায় রে, এই রকমেই এ জীবনটা তাহাকে কাটাইয়া যাইতে হইবে! সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া অস্পৃশ্য হীন জানোয়ারগুলার মতই! সাধ করিয়া এ ভার বহিয়া বেড়ানো কেন? কিসের আশায়? প্রীতির মনে হইল, নিজেকে সে বেশ করিয়া একবার চাবকাইয়া দেয়! কেন এ মুখ লইয়া এখানে এই গৃহ-কোটরে আসিয়া সে আশ্রয় লইল? সে-রাত্রে কেন প্রণবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিল? অদূরে গঙ্গায় অতল জল ছিল—সেই জলের তলে আশ্রয়ও ছিল প্রচুর! তবে?

অনেক ভাবিয়া প্রীতি বুঝিল, মরা হইবে না! মরিতে সে পারিবে না। মরার কথা মনে হইলে গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে! এই সুন্দর পৃথিবী,—হাসি-গানের এই অনন্ত উৎস, জীবনের এই স্নিগ্ধ-শীতল শুভ্র ধারা,—এই নির্ম্মল শীতল ধারায় এ কালি কি মুছিয়া ফেলা যায় না! পরের দেওয়া এই কালি? এই শীতল ধারায় বুকের দাহ নিবানো কি এমনি অসম্ভব? সে আর ভাবিতে পারে না!—প্রণবের পায়ে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া সে তাহার পরামর্শ লইবে—ওগো, তুমি আমায় বলিয়া দাও, আমি এখন কি করিব? বাঁচিব, না মৃত্যুর কোলে সমস্ত বিসর্জ্জন দিব?

সে ভাবিল, না, মুখে এত কথা গুছাইয়া বলা যাইবে না। কাগজে লিখিয়া সব কথা জানাইবে! প্রণব যখন সে কাহিনী পড়িবে, তখন সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিবে, সে কাহিনী পড়িতে পড়িতে প্রণবের চোখে ঘৃণার কালি ঘনাইয়া ওঠে, না, সমবেদনার নির্ম্মল ধারা দুই চোখ ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়ে! ঠিক! সেই ঠিক হইবে। প্রীতি উঠিয়া ড্রয়ার হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিল—টেবিলের উপর প্যাডের পাশে প্রণবের ফাউন্টেন পেন ছিল—পেন লইয়া আলোটা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে নিজের কাহিনী লিখিতে বসিল।

লিখিতে গিয়া সে দেখিল, এ সহজ ব্যাপার নয়,—কোন্‌খান হইতে কি কথা দিয়া আরম্ভ করা যায়! বাজে কতকগুলা যা-তা লিখিয়া প্রণবকে বিরক্ত করা চলিবে না—অথচ এমন সংক্ষেপে আসল কথাটুকু লিখিতে হইবে, যাহা পড়িয়া প্রণব নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারে। কোনো রকম উচ্ছ্বাসের ধোঁকায় ফেলিয়া সে চায় না যে প্রণব কৃপার পাত্রী বলিয়া তাহাকে কৃপা করিয়া বসে। দয়া নয়—সে তা চায় না। সে চায় বিচার, নিরপেক্ষ বিচার।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একরকমে সে একটা কাহিনী রচনা করিয়া ফেলিল। তারপর আগাগোড়া সেটা পড়িয়া দেখিল,—ঠিক হইয়াছে। কোথাও সে রং ফলায় নাই—সকল কথা অকপটে খুলিয়া লিখিয়াছে। একটা জায়গায় মনের নিভৃত কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়াছে—সেগুলা কাটিয়া দিবে? হাত ঝন্‌-ঝন্ করিতেছে,—মাথা-কাণ গরম আগুন হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সমস্ত শরীর মাতালের মত টল্‌মল্ করিতেছিল। সে ভাবিল, থাক্, আর কাট-কুট করিয়া কাজ নাই। কলমের মুখে আপনা হইতে যেটুকু বাহির হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধির প্রলেপ লাগাইবার দরকার নাই!

থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। কাগজগুলা একটা বড় খামে পুরিয়া খামের উপর স্পষ্ট করিয়া বড় বড় পরিষ্কার অক্ষরে সে লিখিল—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রণবনাথ রায়,
শ্রীচরণেষু—

এইটুকু লিখিয়া উঠিয়া পাশের কৌচে সে অলস দেহ-ভার লুটাইয়া দিল। দুই চোখ উত্তেজনার ঝাঁজে ক্লান্তির আবেশে ঘুমের ঘোরে মুদিয়া আসিয়াছিল। কৌচে গা গড়াইয়া দিবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

—১৪—

সকালে প্রণব আসিয়া ডাকিলে তবে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল; উঠিয়া সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। প্রণব বলিল,—এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে যে?

প্রীতি কোন কথা না বলিয়া লেখার তাড়াটা হাতের মধ্যে লুকাইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। প্রণব অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই মুখ-হাত ধুইয়া আসামীর মত কম্পিত বক্ষে প্রীতি আসিয়া লেখার তাড়াটা প্রণবের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—এই আমার পরিচয়। কষ্ট করে ধৈর্য্য ধরে সবটুকু পড়বেন।

প্রণব হাসিয়া বলিল,—এ কোনো মাসিক পত্রে পাঠাতে হবে না কি, প্রীতি?

প্রীতি কোন কথা বলিল না—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রণব তাহার মুখের পানে চাহিল, প্রীতির মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। লজ্জিত হইয়া প্রণব বলিল,—এর কোন দরকার ছিল না, প্রীতি। ছোট বোনের এত-বড় লম্বা পরিচয় কোন্ বড় ভাই আর কবে চেয়ে থাকে?

প্রীতি অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বিনীতভাবে বলিল,—না, পড়ুন।

প্রণব আবার তাহার মুখের পানে চাহিল—সে মুখে বেদনার এমন কালো ছায়া যে দেখিয়া প্রণব শিহরিয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে পারিল না।

প্রীতি বলিল,—দয়া করে পড়ুন!

প্রণব কহিল,—আচ্ছা, পড়বো'খন। তার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

প্রীতি কহিল,—না, এখনি পড়ুন, নাহলে আমার স্বস্তি হবে না। প্রীতির সমস্ত হৃদয় সত্যই অতি অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁটার মত কি-একটা যেন বুকে ফুটিয়া অনবরত খচ-খচ করিতেছিল।

প্রণব বলিল—আচ্ছা, পড়চি। কিন্তু—

প্রীতি দৃঢ় স্বরে বলিল,—কিন্তু নয়। দয়া করে পড়ুন।

—পড়চি—বলিয়া প্রণব কাগজের তাড়া খুলিয়া পড়িতে বসিল।

প্রীতি তখন ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। প্রণবকে সেখানে হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রণব লেখা পড়িতে বসিল, আর প্রীতি দেখিতে লাগিল, প্রণবের মুখে-চোখে কি ও ভাবের স্রোত খেলিয়া বহিয়া চলিয়াছে! বুকটার মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল—যেন প্রতিক্ষণে কে বুকে মুগুরের ঘা মারিতেছে! কাঠগড়ার আসামীর মতই চিন্তা-ক্লিষ্ট ব্যাকুল মন! প্রণব পড়িতে লাগিল। প্রীতি লিখিয়াছে—

আমি পতিতার মেয়ে। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই আমার কথা শেষ হইবে না। আমি আজ সব কথা খুলিয়া বলিয়া বিচার চাহিতেছি। আমি পতিতার মেয়ে, কিন্তু সে কি আমার মস্ত অপরাধ? এত বড় অপরাধ যে মানুষের সভায় আমার স্থান নাই? মানুষ দেখিলে অত্যন্ত কুণ্ঠায় অস্পৃশ্য জানোয়ারের মত অন্তরালে সরিয়া যাইতে হইবে?

কথাটা সব খুলিয়া বলি। যে নারী আমায় এই পৃথিবীতে আনিয়াছিল, রাগে আজ তাহাকে অভিশাপ দিতে চাহিলেও মনে করুণা যে এতটুকু হয় না, এমন নয়! অভাগিনী!

সে নারী, অর্থাৎ আমার মা পেটের দায়ে কলিকাতা সহরে এক মস্ত-বড় সংসারে চাকরি করিতে আসে। এক

মুখ—অন্ন সংগ্রহের উপায় না থাকিলেও বিধাতা রূপ ও যৌবন-ধনে হতভাগিনীকে বঞ্চিত করেন নাই। বিধাতার এই করুণার কথাই বড় বড় বইয়ে বহু পাণ্ডিত্য খরচ করিয়া নানা মুনি নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা পণ্ডিত, ভগবানের করুণা তাঁহারাই ভাল বোঝেন। কিন্তু এই করুণার দায়ে ঠেকিয়া বেচারা আমি আজ জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইতেছি।

কলিকাতার সেই বাবুদের বাড়ীর এক তরুণ উত্তরাধিকারী অভাগিনী নারীর একদিন সর্ব্বনাশ করিল। সর্ব্বনাশই! অভাগিনী কিন্তু তখন এ সর্ব্বনাশের কথা একটুও বোঝে নাই! আদর সোহাগের মধুর বচন, মিনতির ললিত কোমল স্বর প্রাণে তাহার চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছিল, বসন্ত জাগাইয়াছিল। শত মিথ্যা ছলনায় ভরা হইলেও তাই সে গোপনে ঐ প্রণয়ের উচ্ছ্বাসগুলাকে অমর-লোকের অমৃত-ধারার মত পান করিয়া নিজের জন্মকে সার্থক মনে করিতেছিল। তারপর একদিন সমস্ত গোপনতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের মোহ কাটিয়া আমার আসার সম্ভাবনা জাগিল। অভাগিনী সেদিন বুঝিল, সুধা বলিয়া কি বিষ সে আকণ্ঠ পান করিয়াছে! পাপিষ্ঠ তরুণ যুবা এই সম্ভাবনার সূচনা-মাত্রেই পশ্চিমে হাওয়া খাইতে চলিয়া গেল, আর বড় লোকের বাড়ীর কঠিন নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন অভাগিনী নারীর শিরে বাজের মত আসিয়া পড়িল। চুলের মুঠি ধরিয়া বাড়ীর লোক পাপের গাছটাকে কাটিয়া বিদায় করিল, আর পাপের গাছ জানিয়া-শুনিয়া স্বহস্তে যে রোপণ করিয়াছিল, সে নিজের পুরুষত্বের দোহাই পাড়িয়া তরুণ বয়সের একটা অবিবেচনার কালি মুছিয়া আবার মানুষের সভা আলো করিয়া বসিল। অভাগিনী মা পথে দাঁড়াইয়া যখন বুঝিল, কোন্ পথে পা দিয়াছিল, তখন সব পথ এড়াইয়া এ জন্মের মত যাত্রাটাকে শেষ করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল! সেখানে ওপারের যাত্রী হইতে গিয়া আমার জন্য মায়া তার উথলিয়া উঠিল—তাই পারের নৌকা ফিরাইয়া মা সেই ঘাটেই পড়িয়া রহিল। তার দুইদিন পরে রোগার্ত্তা নারীর উপর সহানুভূতি দেখাইয়া পাঁচজনে তাহাকে ধরিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেই হাসপাতালের ঘরেই আমি জীবনের মুখ দেখিলাম। পৃথিবীর আলো-হাওয়া আমায় নিজের বুকে তুলিয়া লইল। আমার সর্ব্বাঙ্গে কালির ছাপ মারিয়া সংসারের বুকে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া অভাগিনী মা মরিয়া বাঁচিল।

একদল নারী আছে, নির্লজ্জের মত তাহারা শুধু নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়াই ফেরে না, রূপ-যৌবনের পশরা লইয়া মানুষের লালসার হাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়াই তাহাদের তৃপ্তি হয় না—তাহারা চায়, ফুলের মত অমনি শত শত শুভ্র হৃদয়গুলিকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া সেগুলাকে লইয়া ব্যবসা ফাঁদিতে। আমি অমনি-এক রাক্ষসীর হাতে পড়িলাম। সে আমাকে মার আদরে বুকে তুলিয়া লইল। ফুলের মত আমার হৃদয়টাই শুধু ছিল না,—শুনিয়াছি, আমি নাকি রূপের ছটায়, মাধুর্য্যে, সুষমায় ঐ ফুলের মতই ছিলাম।

তাহারি ঘরে বড় হইতে লাগিলাম। রোদে সে আমায় যাইতে দিত না, পাছে রোদের জ্বলুসে রূপ আমার শুকাইয়া যায়! ব্যবসা পরে ভালো চলিবে ভাবিয়া সে আমার জন্য মাষ্টার রাখিয়া দিল—তাহারি কাছে লেখা-পড়া শিখিতে লাগিলাম, গান শিখিলাম।

বয়স যখন আমার দশ বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন পুলিশ আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাকে সে রাক্ষসীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। রাক্ষসীর তখন সে কি বুক-ফাটা কান্না! সে পুলিশের পায়ে ধরিল, কত সুপারিশ আনিল। কত বড় লোক—আমার বড় হওয়ার আশায় যাহারা অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছিল,—তাহারা আসিয়া নানা ফন্দী বাহির করিল, কত টাকা খরচ করিয়া উকিল-কৌঁসুলী দাঁড় করাইল, পুলিশ কিন্তু কাহারো কথায় কর্ণপাত করিল না—আমাকে এক আশ্রমে পাঠাইয়া দিল।

আশ্রম বেশ লাগিল। এক মেম-সাহেব আমার ভার লইলেন। আমার মত আরো পাঁচ-সাতটি বালিকা সেখানে ছিল। তাহাদের সঙ্গে ক্রমে ভাব হইল। কিন্তু আশ্রমে তাহারা যেন খাঁচার পাখীর মত ছটফট্ করিতেছিল—কেবলি ফাঁক খুঁজিতেছিল, কোনো ফাঁক দিয়া উড়িয়া বাহিরে যদি একবার পলাইতে পারে! সে সুরে আমি কিন্তু সুর মিলাইতে পারিলাম না! বাহিরে কোথায় যাইব? বাহিরের বাতাস কেমন ধোঁয়ায় ভরা মনে হইত। চোখ জ্বালা করে—সমস্ত প্রাণ তাহাতে হাঁপাইয়া ওঠে!

মেম-সাহেবের কাছে প্রথম শুনিলাম, আমার জীবন, কি সে জীবন, কেমন জীবন! যে আমাকে মার আদরে মানুষ করিতেছিল, সে কেন এত আদর করিত—কি তাহার লক্ষ্য, তাহাও জানিলাম! তারপর নানা বই পড়িয়া, জগতের নানা তথ্যের পরিচয় পাইতে লাগি-লাম! বুঝিলাম,—আমি ঘৃণার বস্তু। গ্লানির পঙ্কে আমার জন্ম। এই এত-বড় বিশ্বে কোলাহল-ভরা লোকের সমাজে আমার এতটুকু ঠাঁই নাই!

বয়স বাড়িয়াছিল। পনেরো বছর বয়সে আলোয়-বাতাসে মেয়েমানুষের মন আপনি পাকিয়া ওঠে—তার উপর সেই সঙ্গিনীদের কথায়-বার্ত্তায়, মেয়েদের আলাপে-প্রসঙ্গে মনের পরিচয় পাইতে আমারো কোন অসুবিধা ঘটে নাই! মেম-সাহেব বলিল, খৃষ্টান হও, তাহা

হইলে জীবনটার কতক তবু স্বাদ পাইবে! বিবাহেই নারীর জীবনের সার্থকতা, স্বামীর প্রণয়েই নারীর সব পাওয়া। অর্থাৎ খৃষ্টান হইলেই শুধু এ সম্ভাবনা আমার আছে—নহিলে ঐ পাপের মধ্যে পাপীর শরীর-মনের খোরাক জোগাইয়া কোথায় শেষে গিয়া পড়িব, আমার মোটে তল্লাসই পাওয়া যাইবে না!

মাঝে মাঝে বায়োস্কোপে যাইতাম, মেমের সঙ্গে। পুরুষ ও নারীর প্রণয়-লীলার মধ্যে পনেরো বৎসর বয়সের কিশোরীর মন যে কি ভাব অনুভব করিত, সে আমার মনই জানে—সে কথা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই! তবে খৃষ্টান হইয়া একটা সোনালি পাতে নিজেকে মুড়িয়া পণ্যের মত খৃষ্টানের পাতে বিকাইতে দাঁড়াইব, এ কথা মনে করিতে ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত। কেবল ভাবিতাম, জন্মের মধ্যে একটা বিশ্রী ইতিহাস আছে বলিয়াই লোক-সমাজে আমার ঠাঁই নাই? হৃদয়-বলে মনের মাধুর্য্যে আমি যদি নিষ্কলঙ্ক মানুষ হই, তাহা হইলেও আমি চিরদিন এমনি হেয় হইয়া থাকিব কেন? আমার এ-মনের কি কোন দাম নাই? এই যে মনকে চারিধারের কালির ছোপ হইতে বাঁচাইয়া অমলিন রাখিয়াছি? এ মনটার পানে সমাজ চাহিয়া দেখিবে না? শুধু কবেকার একটা ইতিহাসের জীর্ণ মলিন পাতা কয়খানা খুলিয়া অবজ্ঞায় সে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে? তা যদি থাকে, তবে সে সমাজের দ্বারে আমি দাঁড়াইতে চাহি না!

বায়োস্কোপে দেখিয়াছি,—এমন পাঁকে জন্ম লইয়া কত নারী যে পদ্মের মত সমাজের বুকে অমল শোভায় অপরূপ মাধুরীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুখ-শান্তিরও তাহাদের অভাব নাই! বায়োস্কোপ হইতে ফিরিয়া কত রাত্রে ভাবিয়াছি, কি চমৎকার ঐ সাহেবদের সমাজ! মানুষকে যাহারা মানুষের চোখে দেখে! সমস্ত সংস্কার, সমস্ত ইতিহাসের খোশা ছাড়াইয়া খাঁটি মনটুকুর তাহারা দরদ করে, দরদ করিয়া তাহার ন্যায্য মূল্য তাহাকে দেয়! মানুষকে তাহারা এতখানি ঘৃণা করে না! আর এখানে আমাদের সমাজে? কাটা খালের মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ধরিয়া সকলকে চলিতে হইবে! মানুষের নিজের দাম এখানে কিছু নাই! দাম যা-কিছু, তা তার বংশের, তার আভিজাত্যের! নহিলে যে-অভাগিনীর জঠর হইতে আমি আসিয়াছি, তাহাকে যে দিন সমাজ চুলের মুঠি ধরিয়া পথে খেদাইয়া দিয়া চোখ রাঙাইয়া হুঙ্কার ছাড়িল, সেই সমাজেই সে দিন সেই নরাধম উত্তরাধিকারীটার একটি কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিল না! সমাজে উঁচু গদিতে তাকিয়া হেলান দিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর মতই সে দিব্য বসিয়া রহিল!

এমনিভাবে একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন লইয়া আরো কয় মাস কাটিয়া গেল। শেষে একদিন তলব আসিল সেই পুলিশের অফিসে—যেখান হইতে আশ্রমে চালান হইয়া আসিয়াছিলাম। মেমের সঙ্গে পুলিশের অফিসে আসিলাম। সেই রাক্ষসীটাও আসিয়াছিল—যে আমার মা সাজিয়া আমাকে মানুষ করিতেছিল! আমায় দেখিয়া দুই চোখে সে বান ডাকাইয়া দিল! শরীর তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সে বলিল,—আমার বিবাহের সে ঠিক করিয়াছে! আমার দেহ ভাড়ায় খাটাইয়া পয়সা রোজগারের এতটুকু অভিপ্রায় তাহার নাই। আরো এমনি কত কথা সে বলিয়া গেল। বিবাহ না দিয়া অমন গর্হিত চেষ্টা যদি করে, তবে সে এক হাজার টাকা খেসারৎ দিবে—এমনি সর্ত্তে মুচলেকা দিতেও প্রস্তুত আছে।

পুলিশ আমায় বলিল,—ইহার সঙ্গে যাইবে?

আমি বলিলাম,—যাইব।

আসল কথা, মেমেদের আশ্রমে মনটা যেন হাঁফ ফেলিতে পারিতেছিল না—দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে শুধু নীরস উপদেশ আর খৃষ্টানের মাহাত্ম্য-কথা শুনিতে শুনিতে আমি কেমন শিহরিয়া উঠিতেছিলাম। এখানে জীবন কোথায়···জীবনের সে মলয়-হিল্লোল? প্রাণ আমার তাহারই পরশ খুঁজিয়া মরিতেছিল! তারপর যখন-তখন ওখানকারই একজন কর্ম্মচারী আমার পানে কি-এক দৃষ্টিতে চাহিয়া কয়দিন এমনি হাসিয়া আলাপ করিতে আসিতেছিল,—ভাবিলাম, দূর হোক্, যাই ইহার সঙ্গে! মানুষ করিয়াছিল! একটু মায়া কি নাই? তার উপর যখন বলিতেছে—

রাক্ষসীর সঙ্গে তাহার বাড়ীতেই আসিলাম। সে এই সে দিনের কথা।

আমায় পাইয়া রাক্ষসী যেন হারামণি ফিরিয়া পাইল। কি সে আদর-যত্ন। তার বাড়ীতে আরো কতকগুলা দুর্ভাগিনী নারী ছিল। আমি থাকিতাম তেতলার ঘরে —সেখানে রাত্রে তাহাদের গানের আওয়াজ আসিয়া কাণে এমন বেতালা বাজিত যে, আমার সর্ব্বাঙ্গ ছম্ ছম্ করিয়া উঠিত।

একদিন রাক্ষসীর ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছি— দুপুরবেলা—হঠাৎ জুতায় দুপ দুপ্ শব্দ তুলিয়া এক যুবা আসিয়া উপস্থিত। আমায় দেখিয়া সে হাসিয়া ঘরে ঢুকিল। আমি তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যুবা আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিল। আমি বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। সে ডাকিল, আমার নাম ধরিয়া—কত পরিচিতের ভঙ্গীতে!

বিশ্রী লাগিল। কোনো জবাব না দিয়া চলিয়া

যাইতেছিলাম; রাক্ষসী আসিয়া হাসিয়া বলিল,—কোথায় যাচ্ছ মা?

কোন কথা না বলিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে নামিতে পারিলাম না। নীচে তখন অত্যন্ত কদর্য্য ভাষায় দুটা নারী গালি-গালাজ করিতেছিল। সমস্ত বাতাস নিমেষে এমন দুর্গন্ধে ভরিয়া উঠিল যে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। আমি বারান্দায় রেলিং ধরিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটু পরে হঠাৎ সে যুবা বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল,—রাগ করো না। মাপ করো।

করুণ নিবেদনে ভরা স্বর, তবু বিরক্তি ঘুচিল না। নীচে নামিয়া একবার উপর-পানে তাকাইল। আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছিলাম—কোনো সঙ্কল্প বা উদ্দেশ্য লইয়া নয়! এমনি, অলস ভাবে। আমার চোখে চোখ পড়িতে সে একটু হাসিল। সে হাসি এমন কদর্য্য যে আমার দুই চোখে যেন কে আগুন ছুড়িয়া মারিল!

ঘরে আসিলাম। রাক্ষসী বলিল,—যে-ভাগ্য নিয়ে জন্মেচো মা, কি করবে বলো? এই দেহ আর রূপ দিয়ে যা কিছু কামিয়ে নিতে পারো! না হলে উপায় কি! পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে পারবে না তো!

ঘৃণার বিষে মন ভরিয়া গেল। আমি সব বুঝিয়া বলিলাম,—পুলিশের কাছে কি বলে এসেচো, মনে নেই? ভয় নেই? আমার চোখে জল আসিল।

রাক্ষসী বলিল,—কেঁদে ফল কি মা। এ কান্নায় কিছু উপায় হবে না। যখন এমন ঘরে জন্মেচো, তখন এই নিয়েই থাকতে হবে। অদৃষ্ট তো বদলাতে পারবে না।

নিরুপায় মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া পড়িলাম। রাক্ষসী চলিয়া গেল। তারপর আবার সব চুপচাপ! ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্থির থাকে, তেমনি! কিন্তু ঝড় শীঘ্রই উঠিল। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে তার লক্ষণটুকুও জানিতে পারি নাই!

যে রাত্রে পথে আপনার গাড়ীর সামনে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলাম, সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে হঠাৎ রাক্ষসী আসিয়া বলিল,—তোমারই কথা থাকবে মা। এ বাড়ীতে তোমায় রাখা চলবে না, পাঁচজনে ভারী বিরক্ত করচে। কলকাতা ছেড়ে পালাই চলো। আজই রাত্রে উৎপাত করতে পারে।

অত্যন্ত ভীত কুণ্ঠিত চিত্তে রাক্ষসীকে জড়াইয়া ধরিলাম, পূর্ণ বিশ্বাসে, একান্ত নির্ভয়ে, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য!

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে একখানা গাড়ীতে করিয়া রাক্ষসীর সঙ্গে অনেক পথ ঘুরিয়া এক জীর্ণ বাগান-বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। বাহির হইতে জীর্ণ দেখাইলেও ভিতরটা বেশ সাজানো। আমি প্রথমে বিস্মিত হইলাম, পলাইয়া আসিলাম যদি তো এখানে কেন? চারিধারের আব-হাওয়া ভালো ঠেকিতেছিল না। কিন্তু মনের সন্দেহ প্রকাশ করিলাম না, শুধু একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র আশঙ্কা করিয়া সতর্ক রহিলাম।

যা ভয় করিয়াছিলাম, শেষে তাই ঘটিল। খানিকটা রাত্রি হইতেই উৎপাত সশরীরে দেখা দিল। কোথা হইতে একটা বেয়ারা আসিয়া ঝাড়ে আলো জ্বালিয়া দিল। একটা কৌচের উপর কেমন বিমূঢ়ভাবে পড়িয়াছিলাম, প্রতিক্ষণে ভীষণ ঝড়ের প্রতীক্ষা করিয়া। শেষে সে ঝড়ও আসিল। তিন-চারিজন তরুণ যুবা হঠাৎ আসিয়াই সে ঘরে ঢুকিল। আমায় দেখিয়া তাহাদের কি সে উল্লাস-চীৎকার। আমার দশা হইল, ঠিক ব্যাধের জালে হরিণের মতই। তাহাদের মধ্যে একজনকে চিনিলাম। সে সেদিন দুপুর বেলায় ঘরে গিয়া ফিরিবার সময় মাপ চাহিয়াছিল! সে হাসিয়া বলিল,—এখন কোথায় যাবে, সুন্দরি?

আর একজন গান ধরিল,—ও আমার বনের হরিণী!

সমস্ত পৃথিবী আমার পায়ের তলায় দুলিয়া উঠিল। একজন ধরিতে আসিল। আমি বাঘের মত তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। গায়ে বাঘের বলই আসিয়াছিল। মুহূর্ত্তে একটা ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত কাহাকেও ঠেলিয়া, কাহাকেও ফেলিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। রাক্ষসী পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সবেগে একটি ধাক্কায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া বাগানের ফটকে আসিলাম। তারপর একবার শুধু পিছনে চাহিয়া বাগান ছাড়িয়া আসিলাম পথে। ছুটিতে লাগিলাম। অন্ধকার পথ। পথের ধারে দূরে দূরে একটা করিয়া তেলের আলো টিম্ টিম্ জ্বলিতেছে! সেই আলোয় লক্ষ্যহারা ছুটিতে ছুটিতে আপনার গাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িলাম। তারপর আপনি আমায় এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন!

এখন বলিবার কথা আর কি আছে? আপনার করুণায় নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছি। এমন নিরাপদ আশ্রয় আর কোথাও নাই। তবু আজ আপনার আদেশ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছি। আমায় ধরিয়া রাখিবেন না। তাহাতে নানা বিঘ্ন, নানা উৎপাত! দয়া করিয়া আমায় ছুটি দিন। এ বিশ্বের কোনো নিভৃত কোণে এখন নিজেকে আমি লুকাইয়া রাখিব! আপনার করুণার কথা জীবনে ভুলিব না। আপনার ঋণ শুধিবার নয়। যতদিন বাঁচিব, ভগবানের কাছে শুধু ইহাই প্রার্থনা করিব, আপনাকে যেন তিনি চির-সুখে সুখী করেন!

—১৫—

এক নিশ্বাসে প্রণব প্রীতির লেখা-কাহিনীটুকু পড়িয়া শেষ করিল। পড়িতে পড়িতে কখনো হর্ষে তাহার চোখ উজ্জ্বল দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, কখনো বা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এ যেন সুরের সাগর মন্থন করিয়া আর-সব সুর ডুবাইয়া বিশ্বে শুধু এক ভৈরবীর করুণ তান ছুটিয়াছে। এমন বিষাদের গান সে কখনো শোনে নাই, অশ্রু-সজল এমন করুণ কাহিনী কোনো কেতাবেও বুঝি কোন দিন পড়ে নাই! পড়া শেষ হইলে প্রণব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, নিশ্চল পাষাণের মত মৌনতার পাহাড় সাজিয়া। মনের মধ্যে ভাবনা-চিন্তার কোন দ্বন্দ্ব নাই --মন হইতে সব কোলাহল সরিয়া গিয়াছে! দুই চোখ সমবেদনার অশ্রুতে শুধু ভরিয়া উঠিল।

প্রীতি অন্তরাল হইতে প্রণবকে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রণব পড়া শেষ করিয়া স্থির হইয়া বসিলে প্রীতি সেই পাশের ঘরেই এক কোণে ঝড়ের ঝাপটায় আহত পক্ষি-শিশুর মতই মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে প্রণব উঠিল। কাগজের তাড়াটা হাতে লইয়াই সে প্রীতির সন্ধানে বাহিরে আসিল। চারি-ধারে ঘুরিয়া প্রীতিকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বেগাকুল মনে আবার যখন ফিরিল, তখন দেখিল, ঐ যে, ঐ কোণে প্রীতি একটা কাপড়ের স্তূপের মত ভূমে পড়িয়া আছে! প্রণবের প্রাণ হা-হা করিয়া উঠিল। অভাগিনী বালিকার কাছে ধীরে ধীরে আসিয়া সে প্রীতির পাশে ভূমেই বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর প্রণব প্রীতির শির ধরিয়া আপনার ক্রোড়ের উপর সে শির রক্ষা করিল; তারপর অতি কষ্টে বড় একটা নিশ্বাস চাপিয়া ডাকিল,—প্রীতি—

প্রীতির বুকের মধ্যে ভীষণ ঝড় বহিতেছিল। চাপা কান্না প্রণবের ঐ একটি ডাকে একেবারে বৃষ্টির ধারার মত ঝরিয়া পড়িল। প্রণব আবার ডাকিল,—ছি, কেঁদো না। ওঠো প্রীতি।

এ কথায় প্রীতির কান্নার বেগ কমিল না, আরো বাড়িল। সে কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া আরো কাঁদিতে লাগিল। প্রণব বলিল,—কেঁদো না প্রীতি! কান্না কিসের জন্য? এ কাহিনী পড়ে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা কতখানি যে বেড়ে উঠেচে! এই এতটুকু মেয়ে তুমি—কিন্তু তোমার মধ্যে কি মহিমময়ী নারী জেগে বসে আছে, তা তুমি জানো না, কিন্তু আমি তাকেই দেখচি শুধু।

প্রীতি তবু মাথা তুলিতে পারিল না, কান্নার বেগ এতটুকু থামাইতে পারিল না। অশ্রু তখন মনের দুই কূল ছাপিয়া খরস্রোতে নদীর মতই তীব্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

প্রণব আবার বলিল,—পাপের মধ্যে বাস করেও পাপের উপর এত ঘৃণা, পাপের নামে এমন লজ্জা—এ যে আমার কল্পনার অতীত ছিল। ওঠো প্রীতি।

প্রণব জোর করিয়া প্রীতির মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

প্রীতি সবেগে নিজেকে প্রণবের পায়ের কাছে লুটাইয়া দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রণব আর কোন কথা বলিল না; সে একদৃষ্টে শুধু প্রীতিকে দেখিতে লাগিল। তাহার মন বলিল, কাঁদো, প্রাণ ভরিয়া কাঁদো। দুঃখিনী, অভাগিনী বোনটি আমার, চোখের জলে মনের সমস্ত মেঘ ধুইয়া সাফ করিয়া ফেলো! নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক মনে তোমার যদি কোন আবর্জ্জনা থিতাইয়া থাকে, বেশ করিয়া চোখের জলে সে সব ভাসাইয়া দূরে ঠেলিয়া দাও।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া অনেকক্ষণ পরে প্রীতি মুখ তুলিয়া গাঢ় স্বরে বলিল,—আমায় ছেড়ে দিন। আমি যাবো।

প্রণব বলিল,—কোথায় যাবে?

—যেখানে আমার দু'চোখ যায়! নদীর জল—

—ছি, পাগল হয়ো না, অধীর হয়ো না। মরবে কি দুঃখে? বিধাতার এত-বড় দান একটা নারীর প্রাণ, সেটাকে পরের দোষে নষ্ট করবে? না প্রীতি, এ জীবন তোমার সার্থক করো, ধন্য করো।

সার্থক করো! কথাটা প্রীতির কাণে বিদ্রূপের মত শুনাইল। পাপের পঙ্কে যে জীবনের উদয়, তাহার আবার সার্থক হইবার আশা কোথায়। সে শুধু কাতর দৃষ্টিতে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

প্রণব বলিল,—কথার কথা বলচি না। জন্মের উপর মানুষের কোন হাত নেই, কর্ম্মেই তার পরিচয়, প্রীতি। দেশের অনেক মহাত্মার জন্মই দরিদ্রের ঘরে, ছোটর ঘরে, হীনের ঘরে, তা বলে কেউ তাঁদের মহত্ত্বের কোনো অমর্য্যাদা করেচে কোনো দিন? জগতের শ্রেষ্ঠ পূজা-অর্ঘ্য তাঁদের মাথায় পড়ে ধন্য হয়ে উঠেচে। ওদিকে তেমনি কত মহাপুরুষের ঘরে জন্মে কত লোক যে চণ্ডালেরো অধম ঘৃণ্য হয়ে দিন কাটাচ্ছে! কেন তুমি হতাশ হচ্চ? তোমার এই ফুলের মত শুভ্র অকলঙ্ক জীবন, তাকে তুমি সার্থক করো। তুমিই সকলের নমস্যা হবে একদিন দেখো। জানো, একজন মহাপুরুষ কি বলে গেছেন,—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষং। এই পৌরুষের জোরে হৃদয়ের মহত্ত্বে তুমি জগতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করো।

প্রীতির কাণে প্রণবের এ কথাগুলা মন্ত্রের মত

শুনাইল। এ যে বড় আশার সুর! এ সুর তো সে কোথাও শোনে নাই। আশ্রমের মেয়েরা অবধি বলিয়াছিল, যে-ঘরে সে জন্মিয়াছে, তাহাতে এ-জন্মটা কোনো দিক্ দিয়াই সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে না। তবে যদি খৃষ্টান হইতে পারে, তাহা হইলে কাহারও সঙ্গে বিবাহ করিয়া সংসারে একটা বাসা তবু বাঁধিতে পারে, মাথা তুলিতে পারে!

সংসার! সংসারে বাসা বাঁধাতেই কি নারীর জন্মের চরম সার্থকতা! দয়া করিয়া কেহ যদি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করে, তবেই সে ধন্য হইয়া যাইবে? আর তা না হইলে ঐ নরকের আবর্তে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে!

এ কথাটাও সেই আশ্রমে বসিয়া কতদিন সে ভাবিয়া দেখিয়াছে। আশ্রমের আরো দুটি-তিনটি মেয়ে, ডালিম, সুরো, পারুল—তাহারা ভয় দেখাইয়াছিল, একদিন সেই স্বামী সগর্জ্জনে যদি ঘরের বাহির করিয়া দেয়, দিয়া বলে,—যে ঘরে জন্ম, সেই ঘরে তুই চলিয়া যা? তাহা হইলে জগতে আর কোন দ্বার সে খোলা পাইবে না। পুরুষের জন্য সহস্র পথ আছে—কিন্তু নারীর খোলা ঐ এক পথ। সে পথেও বিপদের ভয় প্রতি পদে। তবে? সে-অবধি সংসারের আশা প্রীতি ছাড়িয়া দিয়াছে।

তবু মরিতে ইচ্ছা হয় না। মরিবার কথা মনে হইলে সমস্ত প্রাণ শিহরিয়া ওঠে! মরিবার শক্তি যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই দিনই মরিত, যে-রাত্রে দিক্বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া সে প্রণবের গাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল! গাড়ীখানা দেখিতেই আশ্রয়ের জন্য তাহার সমস্ত প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মরিবার কথা মনে পড়ে নাই। এমন সুন্দর পৃথিবী—মরিবে কোন্ দুঃখে! পৃথিবীকে যে তাহা হইলে দেখাই হয় না!

প্রীতিকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রণব বলিল,—কথা কচ্ছ না যে? শোনো প্রীতি—মাথা ঠিক কর, চঞ্চল হয়ো না। বুঝেচি, তুমি হয়তো ভাবচো, তোমার এ জীবন কেমন করে সার্থক করবে? কিন্তু আছে, সহস্র উপায় আছে। তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমার উপর নির্ভর করো—আমি তোমায় সে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দেবো।

প্রীতি বলিল,—আপনার দয়া কখনো ভুলবো না। যদি বাঁচতে পারি, তবে সে আপনার দয়াতেই বাঁচবো, জানবেন।

তারপর প্রণব চট্ করিয়া আর কোনো কথা বলিতে পারিল না। প্রীতি বলিল,—আপনার কথা আমি শিরোধার্য্য করবো। আমি অন্ধ হয়ে পথ খুঁজে মরচি, আপনি আমায় পথ দেখিয়ে দিন। পরের পাপের পশরা মাথায় যখন বইতে হয়েচে—উপায়ও যখন নেই, তখন কি আর করব! তবে ঐ সংসর্গে আর আমায় পাঠাবেন না। তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

প্রণব বলিল,—কোন ভয় নেই প্রীতি। এখানে যতক্ষণ আছ, জেনো, তুমি নিরাপদ দুর্গের মধ্যে বসে আছ। দরকার হয়, বুক দিয়ে আমি তোমায় রক্ষা করবো।

তারপর একটু স্থির থাকিয়া প্রণব আবার বলিল,—আমার একটা কথা রাখবে প্রীতি?

প্রীতি মাথা না তুলিয়াই বলিল,—কি কথা?

প্রণব বলিল,—যদি রাখো, বলি।

প্রীতি বলিল,—আপনার কথা আবার রাখবো না,—এই কি আপনার বিশ্বাস?

প্রণব বলিল,—কথাটা এই, কাল যে-সব পাগলামির কথা বলেছিলে—যে, তুমি এখানে থাকবে না, এখান থেকে চলে যাবে, সে রকম কল্পনা কি এখনো তোমার মনে আছে?

এইটুকু বলিয়া প্রীতির উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে আবার বলিল,—আমার কথা হচ্ছে, সে কল্পনা যদি এখনও থাকে, তবে তা ত্যাগ করো। আমার অনুমতি ছাড়া আমার এ ঘর ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না—বলো, এ কথা রাখবে?

প্রীতি বলিল,—রাখবো। তারপর চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—এখান থেকে উঠে চলুন, কেউ যদি আসে…

প্রণব বুঝিল, ঠিক। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রীতিও উঠিয়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়া বলিল,—আপনি ওবেলায় এখানে খাবেন তাহলে?

মৃদু হাসিয়া প্রণব বলিল,—নেমন্তন্নর কথা ভোলোনি দেখচি।

প্রীতি মনে মনে বলিল, সে কথা কি ভুলিবার! সে কথা বলিয়া প্রীতিকে কতখানি ধন্য করিয়াছ—তা তুমি কি জানিবে! তুমি প্রীতিকে যে দায়ে রক্ষা করিয়াছ, তা প্রীতির অন্তর্য্যামী দেবতা শুধু জানেন! তাহার শোধ দিতে যদি—প্রীতির সর্ব্বাঙ্গ ছমছম্ করিয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, বলিল,—মাংস-টাংস কিছু করবো?

প্রণব বলিল,—না, না। স্রেফ নিরিমিষ। পারবে? রান্নার কেরামতি দেখাতে চাও নিরিমিষ বেঁধে খাওয়াও! মাংস খাওয়ানোটা আসুরিক পদ্ধতির আতিথ্য। নয় কি? বলিয়া প্রণব হাসিল।

প্রীতি বলিল,—নিরিমিষই হবে।

প্রণব বলিল,—পুরানো কথা মন থেকে এখন মুছে

ফ্যালো। চোখের জলে তোমার বাইরের সব ময়লা ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। সে সব কথা ভুলেও আর মনে এনো না। জেনো, আজ তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। তুমি আর সে প্রীতি নও। পৃথিবীতে যদি তোমার আর কেউ না থাকে, তবু জেনো, সম্পদে বিপদে চিরদিন তোমার পাশটিতে যে থাকবে, সে এই আমি, তোমার বড় ভাই! পুরানো কথা ভুলবে তো, বলো?

—ভুলবো। বলিয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রীতি প্রণবের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া ধীর পদে চলিয়া গেল। প্রণব একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর প্রীতি দৃষ্টির অন্তরালে গেলে প্রণব একটা রোয়াকে বসিয়া পড়িল; বসিয়া প্রীতির কথাই ভাবিতে লাগিল। প্রীতির ভবিষ্যৎটাকে সে গড়িয়া দিবার ভার লইয়াছে! কত বড় দায়িত্বের ভার! সে ভবিষ্যৎ কেমন হইবে, প্রণব তাহা ভাবিয়া পাইল না, তবে চকিতে সেই অজানা ভবিষ্যতের অত্যুজ্জ্বল আলোর একটা আভাস তাহার চিত্তে এমন আলো ফুটাইয়া তুলিল যে, সে মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই আলোর নেশায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিল।

—১৩—

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া প্রণব স্নান করিতে যাইবে, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে পিনু, তোরা এমনি করে বাইরে-বাইরেই যদি সময় কাটাস্ তো আমায় আর কেন যখের ধন আগলাতে এখানে বসিয়ে রাখিস্ বাবা? কি নিয়ে আমি একলাটি থাকি, বলো দেখি?

কথাটা শুনিয়া প্রণব ভাবিল, কাল সে মার সাধের সে-স্বপ্নটুকু যে ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়াছে, সেই জন্যই মা বুঝি অভিমান করিয়াছেন! প্রণব হাসিয়া বলিল,—আবার সেই সব পুরানো কথা তুলে ঝগড়া বাধাচ্ছ, মা—?

মা বলিলেন,—না বাবা, পুরানো কথা নয়। শশী আমাকে মারবে, দেখচি। কাল রাত থেকে সে আর বাড়ী ফেরেনি। আজ দশটা অবধি বসে বসে এমন অস্থির হয়ে উঠলুম যে বেণীকে একবার তার কারখানায় পাঠালুম। এখনো সে ফিরচে না—আমার প্রাণ কেমন শিউরে উঠচে।

প্রণব চিন্তিত হইল। কাল হইতে শশাঙ্ক বাড়ী ফিরে নাই? এত কি কাজ? সে বলিল,—কাল বেরুবার সময় কিছু বলে যায় নি?

মা বলিলেন,—সন্ধ্যার পর তো বেরুল,—ভাবলুম, যেমন রোজ বেরোয়, তেমনি বেরুচ্ছে। তারপর রাত্রে ফিরল না—ভাবলুম, দূর ছাই ভাববো না। ক্রমশঃ দেখি, বেলা দুপুর হতে চলেছে, তবু তার দেখা নেই!

প্রণব মার চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—এ তো ভাল কথা নয় মা! দেখি, আমি তেল মেখেচি, চান না করলে নয়—চান করে আমি নিজেই বেরুচ্ছি।

মা রাগ করিয়া বলিলেন,—কোথায় তুই সে লক্ষ্মীছাড়া ছেলের পিছনে ঘুরবি বল্ তো? না খেয়ে না দেয়ে, এই দুপুর রোদে?

প্রণব বলিল,—তা বলে খবর নেব না?

মা বলিলেন,—তা নিবি, নে না। তবে এত তাড়া কেন! বেণী ফিরুক্। তুই তার মধ্যে নেয়ে খেয়ে নে

প্রণব একটু বিস্মিত হইল। শশাঙ্ক এখনো ফেরে নাই! মা তার জন্য চিন্তিত, তবু তার না খাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না! সে কিছু না বলিয়া বাথ-রুমে যাইতেছিল, মা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনেই বলিলেন,—আমারি পাপের ফল। অন্ধ স্নেহে পিনুর কাছে লুকিয়ে রাখছিলুম।

শেষের কথাটা প্রণবের কাণে গেল। সে বলিল,—কি লুকিয়ে রাখছিলে মা?

মার চোখ ছল-ছল করিতেছিল; চট্ করিয়া তাঁহার কোন কথা জোগাইল না। প্রণব মার চোখের জল ও মুখের ছল-ছল ভাব লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া ডাকিল,—মা—

মা বলিলেন,—কি বলছিস্ পিনু?

প্রণব কহিল,—আমার কাছে কি কথা লুকিয়ে রেখেচো মা?

মা বলিলেন,—আজকাল মধ্যে মধ্যে সে এমনি করচে, বাবা। এক এক-দিন রাত্রে মোটেই ফেরে না।

প্রণব বসিয়া পড়িল, বলিল,—আমায় এ-কথা না বলে ভাল করোনি মা। যাই হোক্, আমায় ভাত দিতে বলো। আমি নেয়ে খেয়ে এখনই তার সন্ধানে বেরুই।

প্রণব উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নান করিতে গিয়া এক অজানা ভাবনায় তার মন প্রতি মুহূর্ত্তে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের স্বস্তি লইয়া সে এতখানি ব্যস্ত যে বাড়ীর খবর রাখিতে তাহার মনে থাকে না! এই যে আগে দুই ভাই একসঙ্গে আহার করিতে বসিত, কত গল্প করিয়া কত হাস্যকৌতুকে সেই সময়টুক্ কাটাইয়া দিত, মাও প্রাণ খুলিয়া একটু তৃপ্তি পাইতেন! এ কয়দিন সেই ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে আহার করা হয় নাই। চকিতে মুহূর্ত্তের জন্য যা দেখা হইয়া গিয়াছে মাত্র! সে দেখার ক্ষণটুকুতেও শশীর তেমন সন্দিগ্ধ ভাব কৈ, চোখে ঠেকে নাই তো! কি এক চিন্তায় সে যেন জর্জ্জরিত! কেন? সেদিককার কোন খবর প্রণব রাখে নাই!

স্নান সারিয়া তাড়াতাড়ি মুখে ভাত গুঁজিয়া প্রণব তাহার টু-সীটার কার লইয়া শশাঙ্কর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। প্রথমেই সে গেল মাটরের কারখানায়।

কারখানার গিয়া প্রণব দেখে, শশাঙ্ক সেখানে নাই। কোথায় সে? ম্যানেজার নিজের সাফাই গাহিবার উদ্দেশে স্পষ্টই বলিল, বাবু আজ প্রায় এক সপ্তাহ কারখানায় আসেন নাই। অনেক কাজ হাতে লইয়া টাকার অভাবে সারা হইতেছে না, এজন্য খরিদ্দারদের দলে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাছাড়া কয়টা মোটা বিলের টাকা শোধ হয় নাই বলিয়া কড়া তাগিদা আসিয়াছে, দুই-একটা নালিশও রুজু হইয়া গিয়াছে।

প্রণব একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল,—এ খপর এতদিন আমাকে দেওয়া হয় নি কেন?

ম্যানেজার কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—আজ্ঞে, ছোট বাবুর মানা ছিল।

প্রণব তীব্র দৃষ্টিতে ম্যানেজারের পানে চাহিল, কহিল,—মানা ছিল বলে কারবারটিকে সর্ব্বনাশের পথে দিন দিন ঠেলে দিচ্ছেন! চাকরি রক্ষা করছেন?

এমন রূঢ় কথা প্রণব জীবনে কোনদিন কাহাকেও বলে নাই। আজ বলিবার কারণ ছিল। কারখানায় ঢুকিতেই সে দেখিয়াছে, একটা ফিরিঙ্গী ছোকরা দুইটা মদের বোতল লইয়া অত্যন্ত বে-হেড অবস্থায় কারখানা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রথমটা সেদিকে সে তত নজর দেয় নাই। ভাবিয়াছিল, বুঝি কোন খরিদ্দার বা দালাল। তারপর কারখানায় ঢুকিয়া সে দেখে, চারিধারে কেমন বিশৃঙ্খল ভাব। লোকজন কাজকর্ম্ম লইয়া কেহ ব্যস্ত নাই। ওধারে পাঁচ-সাতজনে মিলিয়া জটলা করিতেছে,—সিগারেট ফুঁকিতেছে! অফিস-ঘরেও কেহ নাই, টেবিলের উপর একরাশ ধুলা জমিয়া রহিয়াছে। এ-সব ব্যাপার দেখিয়া লোকগুলার কর্ত্তব্য-জ্ঞান বুঝিয়া মনে মনে সে অত্যন্ত চটিয়াছিল। তার উপর এত টাকা দেনা, এত লোকের কাজ পড়িয়া আছে, অথচ ম্যানেজারের সেদিকে দৃষ্টি নাই, কাজের দিকে আগ্রহও নাই! প্রশ্ন করিতে অম্লান বদনে বহু দিনকার সঞ্চিত এই বদ্ধ হাওয়ার দুঃসংবাদ দিয়া বসিল! এই সব লোকের হাতে কারখানার ভার দিয়া শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত আছে! শশাঙ্ক না হয় নিশ্চিন্ত আছে, কিন্তু এ লোকগুলারও তো একটা কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছিল! হায়রে, বাঙালী ম্যানেজার দিয়াও নাকি আবার কাজ হয়! ফাঁকি দিবার জন্য যাহারা প্রতিক্ষণ উদ্যত—দায়িত্ব বলিয়া যে-একটা জিনিষ আছে, তাহার কোন সংবাদও রাখে না! বিলাতী অফিসের কর্ত্তা যে অনেক সময় বিলাতে বসিয়া থাকে, অথচ ইংরাজ ম্যানেজার কাজ ঠিক বজায় রাখিয়া যায়। চুরি-চামারি করিলেও অফিসের ইজ্জৎটা রক্ষা করে! আর ইহারা—? সদাই ইহাদের অসন্তোষ, মুখে সদাই বুলি, দাও, টাকা দাও! সদাই মনিবের গাফিলির ফাঁকে নিজের ফাঁকির জোগাড়ে ব্যস্ত! এইজন্যই বাঙালীর কারবারের এমন দুর্দ্দশা!

প্রণব বলিল,—কত টাকা বাইরে দেনা, তার একটা ফিরিস্তি আমার কাছে আজই পাঠিয়ে দেবেন। আর কি কাজ পড়ে আছে, কেনই বা আছে, সে কাজের জন্যে কি কি চাই, তারও একটা নোট আজই আমি চাই। আপনি নিজে দেখে করে দেবেন। মামলা-মকর্দ্দমা যা রুজু হয়েছে, তার তদ্বিরের কি বন্দোবস্ত করছেন, শুনি?

ম্যানেজার একটু থতমত খাইয়া বলিল,—আজ্ঞে, ছোটবাবুর দেখা পাইনি বলে—

তাহার কথায় বাধা দিয়া প্রণব বলিল,—মকর্দ্দমা ছোটবাবুর ফুরসুৎ প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে না! ছোটবাবু অফিসেই আসেন নি যখন, তখন বাড়ীতে গিয়ে আপনি এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কন নি, কেন?

ম্যানেজার এ কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রণব বলিল,—ভেবেছিলেন, আপনার কি গরজ! ডিক্রী হয়, ছোট বাবু যাবে,—আপনার মাস-মাইনে তো আর অনাদায় থাকবে না? এখানকার চাকরি যায়, আরো অন্য জায়গা আছে! ছি!

ম্যানেজার কহিল,—আজ্ঞে, এ-সব কথা বলছেন যখন, তখন কাজেই আমারও সব খুলে বলা দরকার।

প্রণব বলিল,—বলুন।

ম্যানেজার কহিল,—ছোটবাবু কড়া হুকুম দিয়েচেন, কারখানার কোন কথা বা কাজের জন্য কেউ বাড়ীতে যাবে না। তাই—

প্রণব বলিল,—আপনি এটা বুঝেছিলেন যে, এ হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মানলে ছোটবাবুর সর্ব্বনাশ! তাঁর মঙ্গলের জন্য আপনার কি বাড়ীতে আমার কাছে খপর দেওয়া উচিত ছিল না? কারখানায় যদি আগুন লাগতো, কিম্বা কারখানা যদি লুঠ হয়ে যেত, তাহলেও আপনি ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করে চুপ করে এইখানেই বসে কারখানায় সে সর্ব্বনাশ দাঁড়িয়ে চক্ষে দেখতেন?

ম্যানেজার এ কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। বয়সে ছোকরা, কাজেই কারখানার প্রতি টান যে তাহার একেবারে ছিল না, এমন নয়।

ম্যানেজার জড়িত কণ্ঠে বলিল,—আজ্ঞে, যদি অভয় পাই তো বলি।

প্রণব বলিল,—বলুন। ভয় করবার কোন কারণ নেই।

ম্যানেজার বলিল,—ইদানীং ছোট বাবু বড় বাড়াবাড়ি করচেন। পঞ্চাশজন বখা ইয়ার আশে-পাশে ঘুরচে, কারখানার কোন কথা বলতে গেলে তারা তাড়া দিয়ে আমাদের হঠিয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে রেশে যাও...,

তবে পাঁচটা ফিরিঙ্গী মাগী সঙ্গে নিয়ে বাগান-টাগান, এমনি…

প্রণবের মুখ রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর-ভাবে শুধু বলিল,—হুঁ! পরে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল,—কাল থেকে সে বাড়ী ফেরেনি। কোথায় আছে, জানেন?

ম্যানেজার বলিল,—কোথায় আছেন জানি না, তবে সন্ধান নিয়ে বল্তে পারি।

প্রণব বলিল,—তবে আসুন আমার সঙ্গে, আমার গাড়ীতে। আর ফিরে এসে, যা-যা বললুম, সে-গুলো করবেন। কারখানাটা গেলে আমাদের লোকসান খুবই, আপনাদেরও তাতে লাভ বা মঙ্গল নেই। বরং কারখানাটাকে বাঁচিয়ে গড়ে' তুলতে পারলে আপনাদের তাতে লাভ আছে! এইটে বুঝে কাজকর্ম্ম যদি চালিয়ে নেন…

ম্যানেজার বলিল,—আপনাকে আর বলতে হবে না। আমি নিজের অন্যায় বুঝেচি। আর কোন রকম গাফিলি আমার তরফ থেকে পাবেন না। বরং যাতে কারখানা এ বিপদ কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সেজন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—দেখুন, লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করে বাঙালীর কি হচ্ছে? কিছু না। এমনি কল-কারখানা খুলে তাতে যদি প্রাণ ঢেলে লাগি, তাহলে বাঙালীকে নেহাৎ ঐশ্বর্য্যের কাঙাল হয়ে থাকতে হয় না! আপনিও যখন আমার কাছে এই সত্য করলেন আজ, তখন আমিও কথা দিচ্ছি, আপনি কারখানাটাকে তুলে দাঁড় করান, মাহিনার উপর একটা ভালো কমিশন্ আপনাকে আমরা দেবো। বাঁধা মাহিনার উপর একটা আশার বস্তু না থাকলে কাজে উৎসাহ আসবে কেন? এখন আসুন আমার সঙ্গে। আর লোকজনদের একটা ওয়ার্ণিং দিয়ে যান, কাজকর্ম্মে কেউ যেন গাফিলি না করে!

প্রণব আসিয়া মোটরে উঠিল। মিনিট দুই পরে ম্যানেজার আসিয়া বলিল,—বীডন্ ষ্ট্রীটের দিকে চলুন। সেখানে রামতারক বাবুর বাড়ী খপর পাবো, নিশ্চয়। কাল তাঁর সঙ্গেই ছোটবাবু বেরিয়েছিলেন।

—১৭—

বীডন্ ষ্ট্রীটে আসিয়া শশাঙ্কর কোন খপর পাওয়া গেল না। রামতারক বাবু বলিলেন, শশী কাল চুনিদের বাগানে গিয়াছিল। চুনির বাড়ী নারিকেলডাঙ্গায়।

প্রণব নারিকেলডাঙ্গায় ছুটিল। চুনি তখনো বাড়ী আসে নাই। তাহার চাকরের কাছে খপর লইয়া গাড়ী ছুটাইয়া সে যশোর রোডে চলিল। চুনির বাগান যশোর রোডে।

পাতিপুকুর ষ্টেশন ছাড়াইয়া খানিকটা অগ্রসর হইতে দেখা গেল, পথে একখানা প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরে দুই-তিনজন তরুণী, হাবে-ভাবে সাজে-সজ্জায় একেবারে রূপের পশরা খুলিয়া যেন চলন্ত পথিককে লুব্ধ করিবার জন্যই তাহারা বসিয়া আছে!

ম্যানেজার বলিল,—আপনি একটু আগে গাড়ী রাখুন দিকি। আমি নেমে একবার ডাইনে ঐ গলির মধ্যে যাই।

প্রণব গাড়ী থামাইয়া ম্যানেজারকে নামাইয়া দিল। ম্যানেজার বড় মোটরখানার সামনে দিয়া ডাহিনে গলির মধ্যে ঢুকিল। প্রণবের সমস্ত শরীর-মন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই সংসর্গে মাতিয়া তাহার ভাই শশী বাড়ীর কথা, মার কথা ভুলিয়া বসিয়া আছে! কেমন একটা অস্বস্তি ধরিতেছিল। সে মোটর হইতে নামিয়া ইতস্তত বেড়াইতে লাগিল। পথে প্রকাণ্ড খালি বাজরা হাতে ঝুলাইয়া পিঠে বহিয়া সওদা চুকাইয়া ব্যাপারীর দল ঘরে চলিয়াছে ধুলা উড়াইয়া,—ধুলায় সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া সকলে চলিয়াছে। ওধারে একটা গাছ-তলায় বসিয়া একটা লোক পাণ ছিঁড়িয়া ছোট ছোট খিলি সাজাইয়া রাখিয়াছে। পাশে ছোট চুবড়িতে কয়েকটা কমলা লেবু ও সোডা-লিমনেডের বোতলও রহিয়াছে। রেলোয়ে সিগ্ন্যালের ধারে একটা বুড়ী কলা-পাতা বিছাইয়া তাহার উপর কয়েকটা শুকনো নারিকেল কুল ও টোপা কুল রাখিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া প্রণব ভাবিল, আহা, বেচারী! এইগুলি বিক্রয় করিয়াই তাহারা জীবিকার সংস্থান করে! ক'টা পয়সাই বা ইহাতে পাইবে। দেশের চারিদিকে কি দারিদ্র্য তার কঙ্কালসার মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! আর ঐ মোটর গাড়ীটায় বিলাসিনী নারীর দল চেহারার চটক দেখাইয়া শরীরে ও মনে মিথ্যার খোলস আঁটিয়া বিলাসীর টাকার তহবিল ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইতেছে : এই নিরন্নদের মুখ চাহিয়া একমুঠা চাল ফেলিয়া দিবার কথা কাহারো মনে জাগে না! তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কে চাবুক মারিতে লাগিল। সে নিজেও কি ইহাদের এই কঙ্কালসার মূর্ত্তির ভিতরটা কোনদিন নাড়িয়া দেখিয়াছে? জীর্ণ কুটীরের শত ছিদ্র চাল ফুঁড়িয়া শীতের হিম, গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার জল নির্ম্মম অত্যাচারের মত বেচারীদের জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাদের দুঃখ জানিয়া সে দুঃখ ঘুচাইবার জন্য সেই বা কি করিয়াছে! সে উহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়া ছবিতে রং ফলাইয়াছে! নিজের সখ মিটাইয়াছে, শুধু! সেও তো ঐ বিলাসীদের

মত! উহারা মত্ত আছে এই নারীদের রূপ-যৌবন, চটুল চাহনি আর মধুর বচন-বিন্যাস লইয়া—আর সে মাতিয়া আছে ছবি লইয়া। ঐ যে প্রীতি,—তার মত কত অভাগিনী বালিকা যে সবলের সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া নিজেদের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া নেহাৎ ঘৃণ্য কীটের মতই জীবন বহন করিতেছে। না—প্রণব ভাবিল, এই ধনের অত্যাচার, শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে একবার তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবে! করিয়া দেখিবে, এ অত্যাচার এতটুকুও সে বোধ করিতে পারে কি না!

ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজনার বশে প্রণব গতির বেগ কখন্ যে বাড়াইয়া দিয়াছিল, নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। কোনদিকে তাহার মন বা লক্ষ্য ছিল না—নিজের চিন্তার মধ্যে সে একেবারে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ হুঁশ হইল, যখন কাণের কাছে বড় মোটরখানা যাত্রার সূচনা জাগাইয়া বিরাট গর্জ্জন তুলিল। চমকিয়া প্রণব চাহিয়া দেখে, মোটরখানা যাইতে উদ্যত, আর মোটরের আরোহিণী তরুণীরা তাহার পানে বিস্ময়-কৌতুক-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, মুখে তাহাদের মৃদু হাসি, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুতের লহর!

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া প্রণব আসিয়া নিজের গাড়ীতে বসিল। বড় মোটরখানা চলিয়া গেলে সে একবার গলির দিকে চাহিল। দুই-চারিজন করিয়া লোক নেহাৎ কোনমতে দেহ-ভার টানিয়া গলির পথে চলিয়াছে। প্রণব বিরক্ত হইয়া মোটর হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিল; খানিকটা পথ গিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ম্যানেজার ফিরিয়া আসিতেছে। একা যে? প্রণব বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ম্যানেজার কাছে আসিলে প্রণব বলিল,—খবর পেলেন?

ম্যানেজার বলিল,—পেয়েছি। এইখানেই আছেন।

প্রণব বলিল—এলো না?

ম্যানেজার বলিল,—ভারী রেগে উঠলেন। আমি বললুম, বড় বাবু গাড়ী নিয়ে এসেচেন, আপনাকে যেতে হবে, তা শুনে আমায় ধমকে উঠলেন।

প্রণব বলিল,—আর কেউ আছে?

ম্যানেজার বলিল,—যাঁর বাগান, সেই চুনিবাবু আছেন। তা তিনি নেশায় একেবারে অজ্ঞান।

দারুণ শঙ্কায় গভীর উত্তেজনায় প্রণবের আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শশীও তবে বিষম মাতাল হইয়া পড়িয়া আছে? প্রশ্নটা করিতে তাহার বুক দুরদুর করিয়া উঠিল। যদি শোনে, হ্যাঁ? প্রণবের সমস্ত মন যে তাহা হইলে সেই দণ্ডে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িবে! তাহার সকল শক্তি অন্তর্হিত হইবে!

তবু এ প্রশ্ন করিতেই হইবে। তাই সকল দ্বিধা সবলে কাটাইয়া সে বলিল,—শশী?

ম্যানেজার বলিল,—কৈ, নেশা করেচেন বলে মনে হলো না!

আঃ, ভগবান রক্ষা করুন! প্রণবের মনে হইল, সে যেন বড় দায়ে বাঁচিয়া গিয়াছে! সব তো হইয়াছে, এই সঙ্গে মাতাল হইলে কি করিয়া তাহাকে লইয়া মার কাছে সে এখন দাঁড় করাইবে!

প্রণব বলিল,—তবে চলুন একবার। আমি তাকে না নিয়ে ফিরবো না।

ম্যানেজার অগত্যা প্রণবকে লইয়া বাগানে উপস্থিত হইল। শশাঙ্ক তখন গায়ে শাল জড়াইতে জড়াইতে ফটকের দিকে আসিতেছিল। প্রণবকে দেখিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল; আগাইয়া আসিয়া বলিল,—তুমি এসেচো?

রাগে প্রণবের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল! সে বলিল,—আসবো না? মা ওদিকে ভাবনায় সারা হচ্ছে, আর তুমি এখানে পিক্‌নিক্ করচো! বাড়ীর কথা মনে থাকে না?

শশাঙ্ক বলিল,—মিছে ভাবনা! আমি তো জলে পড়ি নি।

প্রণব শশাঙ্কর কথা শুনিয়া অবাক হইল। এ কথা কোন্ মুখে সে অনায়াসে বলিল? এই কি তার সেই ভাই শশী! কালও যে এমন কঠিন কথা শশীর মুখে শুনিবে বলিয়া সে কল্পনা করে নাই! হায়রে, দুর্জ্জনের সঙ্গ মানুষকে এমন অধঃপাতে টানিয়া আনে।

শশী বলিল,—এখনি যাচ্ছিলুম। শুধু গাড়ীখানা এলেই হয়! তা চলো, তোমার সঙ্গেই যাই।

গাড়ীখানার কথায় প্রণব বুঝিল, শশাঙ্ক কোন্ গাড়ী আসিবার কথা বলিতেছে! যাক্, ঐ গাড়ীখানা যে সে দেখিয়াছে, শশাঙ্ক তাহা জানে না। ভালই হইয়াছে। তবু একটু পর্দ্দার আড়াল থাকুক!

প্রণব বলিল,—এসো, আমার গাড়ী আছে। তাতেই যাবে।

শশাঙ্ক বলিল,—চলো।

প্রণব ও শশাঙ্ক আসিয়া মোটরে বসিল। ম্যানেজার উঠিয়া পিছনের সীটে বসিলে প্রণব মোটর হাঁকাইয়া দিল।

গাড়ীতে শশাঙ্ক চুপচাপ বসিয়া আসিল, প্রণবও কোন কথা বলিল না। বাড়ীতে আসিয়াও কোন হাঙ্গামা হইল না। মা শুধু বলিলেন,—এমনি করে কি বাড়ী ছেড়ে থাকতে হয় রে শশী? আমাদের ভাবনা হয় না? না হয় একটু খবর পাঠিয়ে দিতিস! কোলের কাছে ভাত বেড়ে নিয়ে এই যে বসে আছি…

একটু ঝাঁঝালো স্বরে শশাঙ্ক বলিল,—গেছি একটা নেমন্তন্নয়, তাতেও নিশ্চিন্ত নেই! লোক পাঠানো! আমি কচি খোকা নই।

কথাটা বলিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে শশাঙ্ক গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল।

প্রণব তখন বাহিরে ম্যানেজারের সঙ্গে কারবার সম্বন্ধে নানা কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল। কি করিতে হইবে, তাহারি পরামর্শ দিয়া ম্যানেজারকে অফিসে পাঠাইয়া প্রণব উপরে আসিতে মার সঙ্গে দেখা হইল।

মা উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন,—ব্যাপার কি পিনু?

প্রণব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আর নাই বা সব শুনলে! ও-ও জানে না, আমি সব জানি। তা জানলে আরো বে-পরোয়া হয়ে উঠবে। তবে আজ থেকে ওর উপর আর কারবারের উপর আমি কড়া চৌকিদারী করচি। যতদিন তুমি বেঁচে আছ, ততদিন অবশ্য আমারও জোর আমি খাটাবো। সে কটা দিন ভাল থাক্, তারপরে তুমি গেলে ও যা খুশী করুক, আমি তাতে বাধা দিতে যাবো না। সন্তানের কলঙ্ক যে-মাকে শুনতে হয়, তার মত দুর্ভাগিনী মা যে আর কেউ আছে, তা আমার মনে হয় না।

মা বলিলেন,—কি হয়েচে, বল্ দেখি বাবা?

প্রণব বলিল,—কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া বওয়াটের সঙ্গে মিশেছে আর কি!

মা বলিলেন,—উপায়?

প্রণব বলিল,—আমি।

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া প্রণব বলিল,—আমায় একটু চা খাওয়াও মা—মাথাটা ধরে টিপ টিপ করচে। গলায় ব্যথাও একটু হয়েচে। আর নাকটা সড়সড় করছে—বোধ হয়, সর্দ্দি হবে।

মা বলিলেন,—এই রোদে ঘুরে দুশ্চিন্তা নিয়ে। কেন গেলি বাবা? শেষে একটা অসুখ হবে, আমি ভেবে মরবো!

হাসিয়া প্রণব বলিল,—কোন ভয় নেই মা। তোমার হাতের চা খেলেই আমার সব অসুখ সেরে যাবে।

মা হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—পাগল ছেলে! তুই কি চিরকাল এমনি পাগল থাকবি রে!

মা চলিয়া গেল, প্রণব নিজের ঘরে আসিয়া ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িল। শীতের রৌদ্রে দারুণ উদ্বেগ লইয়া ছুটিয়াছে, তাহার উপর অতখানি গ্লানি, উত্তেজনা! প্রণবের মাথা অত্যন্ত দপদপ করিতেছিল। মাথা ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছে। প্রণব বুঝিল, জ্বরের লক্ষণ! সে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল।

অনেকক্ষণ পরে মা চা লইয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রণব ইজিচেয়ারে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। মা ডাকিলেন,—পিনু। কোন সাড়া নাই! মা তখন তাহার কপালে হাত দিলেন, এ কি! কপাল যে আগুন! পুড়িয়া যাইতেছে। এ-যে বেশ জ্বর! মা তাহার কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া ডাকিলেন,—পিনু, বাবা—

—মা—বলিয়া প্রণব চোখ খুলিল। বলিল,—চা এনেচো? দাও, খাই।

—এ যে বেশ জ্বর দেখচি তোর।

—হ্যাঁ, জ্বর আসবে বলেই মনে হচ্ছে। ও কিছু নয়। চা খেলেই সেরে যাবে।

—চা খাও, মোদ্দা আজ আর বেরিয়ো না তুমি।

চা পান করিয়া প্রণব ইজি চেয়ারে পড়িয়া রহিল। মা বলিলেন,—বিছানায় উঠে শো' না, বাবা।

—আচ্ছা। বলিয়া প্রণব গিয়া বিছানায় শুইল। মা মাথার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সারা রাত্রি মাথার যন্ত্রণায় প্রণবের ভালো ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়া মা শশাঙ্ককে ডাকিয়া বলিলেন,—দ্যাখ্ তো শশী, পিনুর টেম্পারেচারটা। গা বেশ গরম।

শশাঙ্ক উঠিয়া আসিয়া থার্ম্মোমিটারে টেম্পারেচার দেখিল, জ্বর ১০৩। খুব সর্দ্দি। সে বলিল,—ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েচে, দেখচি।

মা চিন্তিতভাবে বলিলেন,—নগেন ডাক্তারকে একবার খবর দে বাপু।

—যাই। বলিয়া শশাঙ্ক নিজেই ডাক্তারের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। কালিকার ঐ ঘটনার পর হইতে তাহার মন একেবারে ভমড়াইয়া ছিল। সে ভাবিল, না, ও সব বদ্ সঙ্গ ছাড়িয়া দিব। আমার জন্য ঘুরিয়াই দাদার এই অসুখ হইল! সেই রৌদ্রে অতখানি উদ্বেগ বুকে লইয়া—

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখচি। খুব সাবধান।

প্রণব একেবারে বেহুঁশ্ হইয়াছিল। মাথায় অসহ্য যাতনা। ডাক্তারের কথায় মাথায় আইস্ ব্যাগ দেওয়া হইল। মা নিজে শিয়রে বসিয়া আইস্ ব্যাগ ধরিয়া রহিলেন। শশাঙ্ক বলিল—আমায় দাও মা।

—না রে, তুই যা। বলিয়া শশাঙ্ককে তিনি উঠাইয়া দিলেন।

১৮

সেদিন মনের উৎসাহে বৈকাল হইতেই পরিপাটী করিয়া রন্ধন সারিয়া প্রীতি উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, কখন্ প্রণব আসিয়া তাহার এ সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দিবে! রাত্রি হইল। আটটা

বাজিল, ন'টা বাজিল, দশটাও বাজিয়া গেল, শেষে এগারোটা বাজিতে যায়, তবু প্রণবের দেখা নাই! সন্ধ্যার পর হইতেই দূরে পথে কাহারো গাড়ীতে হর্ণ বাজিয়া ওঠে, প্রীতি অমনি আকুল চোখে পথের পানে চায়। কোথায় প্রণব? কেহ নাই।

সে অধীর হইয়া উঠিল। এত রাত্রি হইয়া গেল, তাই তো! কেন আসিলেন না? আর আসিবার সময় কৈ? কি হইল? আমি যে কত আশা করিয়া পথ চাহিয়া আছি, ওগো আমার জীবন-মরণের দেবতা, ওগো নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়—কোথায় তুমি? তুমি কি তবে ঘৃণার ভরে আমার সেবা ভুলিয়া গেলে!

রান্নাঘরে সযত্নে প্রস্তুত বিচিত্র খাদ্য শুকাইয়া কাঠ হইতেছে। প্রীতি কখনো আসিয়া নিঝুমভাবে রান্নাঘরের দ্বারে বসিয়া থাকে—বাহিরে একটা কিছু সাড়া পাইলে ছুটিয়া অমনি বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়। দেখিয়া অন্নদা বলিল,—তুমি খেয়ে নাও বৌদি। আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বে? বাবু হয়তো কোন কাজে আট্‌কে পড়েচেন। রাত বারোটা বাজে।

প্রীতি বিরক্ত হইয়া বলিল,—তুই খেতে বোস্ দেখি বাপু। আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না!

—দাও বৌদি, আমি তাহলে খেয়েই নি। আমায় আবার আজ বাড়ী যেতে হবে। আমার ভাইঝী সত্ত কাল ভোরে শ্বশুরবাড়ী যাবে—কাল আস্‌তে আমার দেরী হবে ভাই। আমায় আজ রাতটা ছুটি দিয়ো।—তুমি আমায় বেড়ে দেবে তো?

—তুই আপনি বেড়ে নে, ভাই। বাবুর খাবার আলাদা করা আছে—ছুঁস্ নে যেন।

—আচ্ছা বৌদিমণি, তাই নিচ্ছি। বাবুর খাবার আমি ছুঁতে যাবো কেন! কিন্তু আর কি রাত দুটোয় তিনি আসবেন?

অন্নদা খাইতে বসিল। প্রীতির দুই চোখে ধারা বহিল। তার এমন যত্ন—সব বৃথা হইল। কি হইয়াছে…তাঁর কি হইয়াছে? কেন তিনি আসিলেন না? তিনি যে নিজে যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইয়াছিলেন! তবে…তবে?

প্রীতি যেন পাগল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাগল হইয়াই বা কি করিবে! চিন্তার ভারে আকুল হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, রাত্রি তখন তিনটা। হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়মড়িয়া উঠিল আলু-থালু বেশেই সে গিয়া বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইল। শীতের রাত্রি। চারিধার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। শুধু দূরে কে একজন অত রাত্রে গান গাহিতেছিল,…

আমার গাঁথা মালা ঝরে গেল, শ্যাম এলো না;
সখি, শ্যাম এলো না!

প্রীতির বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! ওরে, তাহার মত দুর্ভাগ্য তবে আর কাহারো ঘটিয়াছিল! শ্যামের জন্য তার গাঁথা মালা ঝরিয়া গিয়াছিল, শ্যাম আসে নাই! আর তার দশা? প্রীতির সমস্ত বুকটাকে দুলাইয়া প্রলয়ের ঝড় উঠিল। সে ঝড়ের বেগ সহিতে না পারিয়া সে আবার গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বাকি রাত্রিটা কখনো একটু ঘুম আসে, আবার তখনই সে স্বপ্ন দেখে, ঐ যে, প্রণবের গাড়ী আসিয়া থামিল! প্রণব হাসিমুখে বলিল,—বাঃ, বেঁধে বেড়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছ যে প্রীতি! অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। এমনি ঢেউয়ের আঘাতে রাত্রিটা কোনমতে কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা আটটায় ঘুম ভাঙ্গিল। অন্নদা আসিয়া বলিল,—খাবার-দাবার সব অমনি রয়েছে বৌদিমণি, বাবুর দেখা নেই! এ তো ভালো কথা নয় ভাই, তুমি খপর নাও।

ঠিক্! এ কথাটা প্রীতির মনেও জাগিতেছিল। কিন্তু এখনই খবর লওয়া! যদি তিনি রাগ করেন? বাড়ীতে তার পরিচয় দেন নাই, তার কথা কাহাকেও বলেন নাই। দরোয়ান গিয়া শেষে কি বলিয়া বসিবে!

খপর লওয়া চলিল না। সে দিনটা দারুণ উদ্বেগে কাটিল।…প্রণব আসিল না। রাত্রে উদ্বেগ আরো বাড়িল। বুক যেন ফাটিয়া যায়!…মাগো বলিয়া প্রীতি বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। দুই চোখের জলের ধারাও আর ফুরাইতে জানে না! এত জলও এ চোখে ছিল!

পরদিন সকালে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুইটা টাকা দরোয়ানের হাতে গুঁজিয়া সে বলিল,—তুমি এখনি যাও, রামসিং…বাবু কেমন আছেন, সেই খপরটা শুধু আনো।

দুইটা টাকা পাইয়া চটপট স্নান সারিয়া টিকিতে ফুল না বাঁধিয়াই সে ছুট দিল! মা-জী বলিয়াছে, শীঘ্র ভালো খপর আনিয়া দিলে আরো দুই টাকা বখ্‌শিস্ মিলিবে।

প্রীতি বাসি মুখে জল না দিয়া তেমনি বসিয়া রহিল, কেমন যেন স্বপ্ন-বিহ্বলের মত। পাখীর ডানা ঝাড়ার শব্দে গাছের পাতা যেমন দুলিয়া ওঠে, বাহিরে যেমন একটু শব্দ হয়, অমনি চমকিয়া প্রীতি চোখ মেলিয়া চারিধারে চায়, ঐ বুঝি দরোয়ান ফিরিল! বাহিরে পথে ছোট ছেলেরা লোহার চাকায় খাখারি ঠুকিয়া ছুটিয়া যায়—প্রীতি ভাবে, ঐ বুঝি প্রণবের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল! প্রতীক্ষার ক্ষণটুকু তাহার যে কি করিয়া কাটিল, তাহা সে জানেও না। এক একটি মুহূর্ত যেন যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল! ভাবিয়া কোন কূল না পাইয়া সে শেষে

এক-মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—ঠাকুর, হে ঠাকুর, ভালো খপর আনিয়া দাও। শুধু তিনি ভালো আছেন! আর আমি কিছু চাই না—কিছু না!

ঠাকুর সে মিনতি রাখিলেন না। দরোয়ান ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পরশু সন্ধ্যা হইতে বাবুর ভারী বেমার! বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় লাগিয়াছে। দরোয়ান এ সংবাদে নিজেই বিচলিত হইয়াছিল, কাজেই বখ্‌শিসের জন্য হাত পাতিতে তাহার সঙ্কোচ হইল। সে চলিয়া গেল।

প্রীতি তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিল। তাঁহার অসুখ? এমন অসুখ? সে দেবতার কাছে মানত করিতে লাগিল—তাঁকে ভালো করে দাও ঠাকুর, আমি বুক চিরে রক্ত দেবো। ঠাকুর, হে ঠাকুর—

কিন্তু কি করিবে? প্রীতি এখন কি করিবে? খাঁচার মধ্যে বন্ধ পাখীর মত ডানা ঝটপট্ করিয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিবে? না, না। সেখানে গিয়া নিজের হাতে সে তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করিবে। অতি তুচ্ছ দাসীর কাজ! তাঁর মুখে জলের গ্লাস তুলিয়া ধরিতে না পারুক, তাঁর পরণের কাপড় কাচিয়া, তাঁর ভুক্ত পাত্র মাজিয়া ধুইয়া, যেমন করিয়া, যত তুচ্ছ হোক—নিজের হাতে কিছু সেবা তাহাকে করিতেই হইবে। নহিলে অকৃতজ্ঞতার মহাপাপে সে জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইবে।

কিন্তু কি করিয়া, কি বলিয়া সে সেখানে যায়? প্রীতি ভাবিতে বসিল। অনেক ভাবিয়া একটা উপায় মাথায় আসিল। প্রতারণা—তা হয়, হোক। সে তো প্রতারণা করিয়া ধন-বস্ত্র লুঠিতে যাইতেছে না। সে চায় ক্ষুদ্র শক্তিতে একটু সেবা করিতে। এ প্রতারণার পাপ ভগবান ক্ষমা করিবেন না? না করেন, সে তাহার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত আছে। তাহার মনে হইতেছে, সে যদি গিয়া প্রণবের সেবার ভার লইতে পারে, তবে তার প্রাণ-ঢালা আকুল আবেগে প্রণব নিশ্চয় শীঘ্র সারিয়া উঠিবে।

সে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া দরোয়ানকে ডাকিল, তার হাতে দুইটা টাকা দিয়া বলিল,—একখানা গাড়ী শীগ্‌গির ডেকে আনো তো। আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে।

দরোয়ান টাকা পাইয়া গাড়ী আনিতে ছুটিল। প্রণবের দ্বারে গাড়ী থামিলে দরোয়ানের হাতে আরো দুইটা টাকা দিয়া প্রীতি বলিল,—তুমি যাও, বাড়ী চৌকি দাও গে—আমি এখন এইখানেই থাক্‌বো। বাবু সারলে তবে যাবো।

দারোয়ান টাকা পাইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

প্রীতি ভিতরে আসিয়া পরিচয় দিল, সে নার্শ; বাবুর অসুখ শুনিয়া আসিয়াছে, সেবা করিতে।

কি দিতে হইবে? এ-কথার উত্তরে সরকারকে জানাইল, বাবু যদি সারিয়া ওঠেন, তবে তাঁহারা খুশী হইয়া যাহা দিবেন, তাহাই সে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবে। টাকার তাহার বড় অভাব। এখন শুধু দুই বেলা দুই মুঠা খাইয়া সে কাজ করিবে। বড়লোকের বাড়ী,—টাকার আবার ফিরিস্তি সে কি দিবে!

সরকার প্রীতিকে লইয়া ভিতরে গেল; কর্ত্রীর কাছে বলিল,—নার্শ আসিয়াছে।

ভালোই হইয়াছে। কাল ডাক্তারও বলিয়া গিয়াছেন, একজন পাকা নার্শ পাইলে ভালো হয়। শুধু পাকা নয়, তার দরদী হওয়াও দরকার।

মা প্রীতিকে দেখিয়া যেন আশার মুখ দেখিলেন। তিনি বলিলেন,—তোমার নাম কি বাছা?

একটা ঢোক গিলিয়া প্রীতি বলিল,—আমার নাম? আমি জগৎতারিণী।

মা শুনিলেন, জগদ্ধাত্রী। চাহিয়া দেখিলেন, জগদ্ধাত্রীর মতই আলো-করা রূপ, জগদ্ধাত্রীর মতই বরাভয়প্রদ মূর্ত্তি বটে!

মা বলিলেন,—আমাদের রান্না খাবে তুমি?

মৃদু হাসিয়া প্রীতি বলিল,—খাবো।

আশ্রমে এই নার্শের কাজটাই সে ভালো করিয়া শিখিয়াছিল। ভবিষ্যৎ যখন নিতান্ত অন্ধকার ছিল, হাতড়াইয়া এ জীবন-নদীর কোন কূল সে পাইত না, তখন সে পীড়িত মনকে পীড়িতের সেবাতেই চালিয়া দিয়াছিল! নার্শিংয়ে মেমেদের কাছ হইতে তারিফও পাইয়াছিল।

মা প্রীতিকে লইয়া প্রণবের ঘরে আসিলেন। প্রীতি চমকিয়া উঠিল। প্রণবের ঘর! তাহার দেবতার মন্দির। আর শয্যার উপর—ঐ যে শীর্ণ দেহ লইয়া তাহারি জীবন-মরণের দেবতা, ঐ রোগের যাতনা ভোগ করিতেছেন।

সতর্ক নিপুণ হস্তে সে প্রণবের সেবার ভার গ্রহণ করিল। তাহার সযত্ন ভঙ্গী, তাহার পরিচ্ছন্নতা, তাহার দরদ দেখিয়া মার প্রাণ আনন্দে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া প্রীতির সেবা দেখিয়া বলিলেন,—এইটুকুরই যা একটু অভাব ছিল। এখন আমার বেশ আশা হচ্ছে, সারাতে দেরী হবে না।

ডাক্তার প্রীতিকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়ানো, সেঁক দেওয়া, ফোমেণ্ট করা, পথ্য খাওয়ানো, বিছানা-পত্র ঝাড়িয়া বদ্‌লাইয়া দেওয়া—এ-সব কাজ ঘড়ির কাঁটার মতই নিয়মিত চলিতে লাগিল। কোথাও একটুকু খুঁৎ নাই, কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই!

দুপুর বেলা মা আসিয়া বলিলেন,—তুমি এসে অবধি একটু জল পর্য্যন্ত মুখে দাও নি বাছা। যাও মা, খাও গে—খেয়ে আবার এসো।

অডিকলোন্ ফুরাইয়া গিয়াছিল। মা বলিলেন,—ঐ কুঁজোয় ভালো জল আছে—এই পেয়ালায় ঢেলে অডিকলোন্ দাও মা।

প্রীতি একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—জলের কুঁজো আমি ছোঁব না মা। আমি ক্রীশ্চান।

মা বলিলেন,—তোমার এত যত্ন, এই সেবা, তুমি লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ মা। ক্রীশ্চান হও আর যেই হও, যে-হাতে আমার ছেলের সেবা করচো, তোমার সে হাতে আমিও নির্ব্বিঘ্নে জল খেতে পারি। কোন দোষ হবে না, তুমি দাও।...তুমি ক্রীশ্চান? তুমি ছুঁলে আমার সামান্য জলের কুঁজো নষ্ট হবে? না মা, তুমি দাও।

এই সমবেদনা ও সহানুভূতির কথা শুনিয়া প্রীতির প্রাণ জুড়াইয়া গেল। মানুষকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করা! মা এমন না হইলে কি আর ছেলের প্রাণ অতখানি উঁচু হয়! কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখে জল আসিল। জল আনিয়া প্রীতি খাইতে গেল।

অন্দরে জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীর বিষম ভিড়। প্রীতিকে একটা অপূর্ব্ব চীজ মনে করিয়া তাহার সামনে দস্তরমত ভিড় জমিয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল। একজন প্রাচীনা আসিয়া বলিলেন,—কেমন দেখলে বাছা? পিনু আমাদের শীগ্‌গির সেরে উঠবে ত?

প্রীতি বলিল,—সারবেন বৈ কি মা,—এমন পুণ্যের সংসার, এখানে মঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গল ঢুকতে পারে কখনো!

সকলে আশ্বস্ত হইল। এত লোক থাকিলে কি হয়, বাড়ীতে সকলের মনে আশ্চর্য্য মিল, প্রীতি তাহা দু'দণ্ডেই বুঝিল। কেন হইবে না? গৃহিণীর প্রাণ দরাজ হইলে কাহারো মনে কোন ক্ষুদ্রতা আসিতে পারে না যে!

১৯

প্রণব অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিল। প্রীতির ঐকান্তিক সেবার জয়-জয় পড়িয়া গেল। এখন প্রণব বড় দুর্ব্বল, —বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না।

কাল সে পথ্য করিবে। বাইশ দিন বিছানায় পড়িয়া রোগে ভুগিয়া সে যেন শুকাইয়া কাঠি হইয়া গিয়াছে!

প্রীতিকে ডাকিয়া মা বলিলেন,—তুমি এখনি যেতে পাবে না মা। ও আমার সেরে উঠে মানুষের মত বেড়াক চেড়াক, তখন তোমার ছুটি হবে। কি বলবো, তোমায় ধরে রাখবার উপায় নেই—না হলে তোমায় কি ছাড়তুম! আমার পিনুকে যে ফিরে পেলুম, সে শুধু তোমারই প্রাণ-ঢালা সেবায়। আমি মা, আমিও অমন করতে পারতুম না। জানি না, আর-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে!

প্রীতি সসঙ্কোচে বলিল,—আমি আপনাদের দাসী, আমায় ও কথা বলবেন না।

প্রীতির চিবুক স্পর্শ করিয়া মা বলিলেন,—দাসী বলো না, তুমি আমার মা ছিলে, মা। মায়ের মতই তোমার দরদ। নিজেকে দাসী বলে ছোট করো না। কি দিয়ে তোমার এ ঋণ শোধ হয়, আমি ঠাউরে উঠতে পারচি না।

প্রীতি বলিল,—আমরা গরিব, পেটের দায়ে এ দরদ করতেই হয় মা, না হলে লোকে ডাকবে কেন? পয়সা দেবে কেন?

মা বলিলেন,—ছি, ও কথা বলো না। পয়সা দিয়ে তোমার ঋণ শোধ হয় কখনো? না। এ সংসারে ঢের ত দেখলুম মা।—আমার প্রাণটা ছিঁড়ে যদি তোমার হাতে দিতে পারতুম, তাহলে এ ঋণের কতক তবু শোধ হতো। তাও সব নয়।

প্রণব ডাকিল,—মা—

মা বলিলেন,—কেন বাবা?

প্রণব বলিল,—ও মেয়েটি কে, মা?

মা বলিলেন,—এটি নার্শ। এঁর সেবাতেই তোকে ফিরে পেয়েচি, পিনু।

প্রণব বলিল,—উনিই আমার মাথার শিয়রে বসে সেবা করেচেন, ওষুধ খাইয়েছেন? আমি স্বপ্নে দেখতুম, যেন কোন্ দেবী এসে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

মা বলিলেন,—দেবীই বটে, পিনু। এমন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি, এমন প্রাণ-ঢালা সেবা—তাইতো বলছিলুম বাবা, আমিও এমন করতে পারতুম না।

প্রীতির দুই চোখে জল একেবারে ঠেলিয়া আসিল। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া রুদ্ধ ভাবের তরঙ্গ দুই চোখে সে একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিল।

প্রণব বলিল,—উনি কি নেবেন?

মা বলিলেন,—সেই কথাই হচ্ছিল। লক্ষ টাকা দিলেও ওঁর ঋণ শোধ হয় না। যে প্রাণ নিজের হাতে বাঁচিয়ে তুলেচেন, সেই প্রাণটিকেও ওঁর হাতে দিতে পারতুম যদি...

প্রণব হাসিল, হাসিয়া বলিল,—তুমি কেবল ঐ চেষ্টাতেই ফিরচ মা।

বড় আদরের ছেলে, সে রোগ হইতে বাঁচিয়া আবার হাসিয়া কথা কহিয়াছে, এ দৃশ্যে মার আনন্দ-উচ্ছ্বসিত প্রাণ চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। মার

চোখে জল আসিল মা বলিলেন,—তুই যদি সে সেবা চোখে দেখতিস্, বাবা…।

প্রণব বলিল, আমি সে সেবা অচেতন হয়েও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেচি, মা।

মা বলিলেন,—যাই, আমি চান করি গে। তেল মেখে রয়েচি, তোর কাছে বসতে পারবো না! ওঁকে ডেকে দিয়ে যাই, তোর ওষুধ খাবার সময় হয়েচে, বোধ হয়।

মা চলিয়া গেলেন; যাইবার সময় প্রীতিকে ডাকিয়া দিয়া গেলেন। প্রীতি আসিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া প্রণবের কাছে আসিতেই প্রণব চমকিয়া ডাকিল,—প্রীতি।

এ-ডাকে প্রীতির রুদ্ধ অশ্রু আবার দুই চোখের কোলে পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ের গোছে কে যেন লাঠির ঘা মারিয়াছে!

প্রণব বলিল,—ওষুধ দাও প্রীতি!

প্রীতি উঠিয়া ঔষধ দিল। প্রণব তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—মাকে সব বলেচো?

গাঢ় স্বরে প্রীতি বলিল, —না।

প্রণব বলিল,—রোগের ঘোরে স্বপ্নে তোমাকেই আমি দেখতুম। কে সেবা করচে, বুঝতে পারতুম না। তবু মনে হতো, তুমিই! তাই চোখ খুলতে সাহস হতো না।…মাকে কি বলেচো?

সংক্ষেপে প্রীতি শুধু বলিল,—ক্রীশ্চান নার্শ।

প্রীতি আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে হাত ছাড়াইয়া ঘরের মেঝেয় একধারে গিয়া বসিয়া পড়িল। চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। প্রণব একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে দেখিতেছিল, এই দুর্ভাগিনী বালিকার অন্তরখানি। কি মায়া, কি মমতায় তাহা ভরিয়া রহিয়াছে। কি মহিমায় দীপ্ত অন্তর।

মা ফিরিয়া আসিলে প্রণবের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—হ্যাঁ মা, এ মেয়েটিকে পেলে কোথায়? কথাটা বলিয়া মুখে একটু দুষ্টামির হাসি মাখাইয়া সে প্রীতির পানে চাহিল। প্রীতি তখনো পুতুলের মত নিস্পন্দ কাঠ হইয়া মেঝেয় বসিয়া।

মা বলিলেন,—ভগবান পাঠিয়ে দেছেন, বাবা। তখন কি আর খোঁজ খপর নেবার কথা মনে ছিল! আজ ধরে পরিচয় নেবো। ভাগ্যে মা আমার এসেছিলেন। নাহলে তোমায় ফিরে পেতুম কি না, কে জানে!

মার মন অতীত ভয়ের আভাসে শিহরিয়া উঠিল।

প্রণব বলিল,—এঁকে খুশী করা হয় যেন!

মা বলিলেন,—সে আর বলতে! ওঁকে কি দিলে আমি নিজে খুশী হই, তা বুঝতে পারচি না। এমন ধন আমার কি আছে, যা দিলে মার ঋণ শোধ হয়!

প্রীতি আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া আসিয়া জড়োসড়ো ভাবে মার পায়ের কাছে বসিল, বসিয়া বলিল,—আপনারা মাপ করুন। ও সব ঋণের কথা তুলে আমায় ব্যথা দেবেন না।

প্রণব দুষ্টামি করিয়া বলিল,—বেশ, আপনি নিজে বলুন, কি পেলে আপনি সন্তুষ্ট হন্?

তাহার কথা শেষ হইল না। প্রীতি এমন-এক দৃষ্টিতে প্রণবের পানে চাহিল যে প্রণবের বুকের উপর সে দৃষ্টি লাগিয়া অশ্রুর সহস্র ধারায় ফাটিয়া পড়িল। কতখানি হতাশা, কতখানি বেদনা যে সে দৃষ্টিতে মাখানো!

মা বলিলেন,—না পিনু, ওঁকে ও-সব বলে ওঁর সেবার অপমান করো না, বাবা। সত্যি, উনি যা করেচেন, এ জগতে তার শোধ হয় শুধু একটি জিনিষে!

প্রণব সস্নেহে বলিল,—সে কি জিনিষ মা?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া মা বলিলেন, —সে হবার নয় বাবা। মিছে বলে মুখ নষ্ট করি কেন!

মার এ কথার ইঙ্গিত প্রণব বুঝিল, বুঝিয়া প্রীতির পানে চাহিল। প্রীতি নত শিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে প্রণবের চোখের সে-ভাষা বুঝিল না।

প্রণব হঠাৎ কথার স্রোত ফিরাইবার জন্য বলিল,—শশী কোথায় মা?

মা বলিলেন,—ক'দিন বাড়ীতেই আছে। আমি একবার আধবার ঠেলে-ঠুলে তবু কারখানায় পাঠাতুম, তা গিয়ে থাকতে পারতো না; একটু পরেই পালিয়ে আসতো। ভয়ে সে নিজের ঘরটির মধ্যেই পড়ে থাকতো, নড়তো না। এ ঘরেও বড় একটা ঢুকতো না, কেউ এদিকে গেলেই যেন চমকে উঠতো, খালি বলতো, দাদা কেমন আছে এখন? যে দুশ্চিন্তায় সে দিন কাটিয়েছে!

প্রণব কহিল,—তাকে একবার ডাকো মা। কারখানায় অনেক গোল উঠেছিল, কি হলো, জানতে চাই।

মা বলিলেন,—সে আগে ভালো করে সেরে ওঠো বাবা,—তার পর দেখো।

প্রণব বলিল,—না মা, তুমি ডাকো তাকে, একবার!

মা বলিলেন,—সে নেই, বেরিয়েচে। কোন্ বন্ধুর বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন করে গেছলো,—তা কিছুতে যাবে না। আমি ঠেলে-ঠুলে এখন পাঠিয়ে দিলুম, বললুম, ও তো সেরেচে। মিছে কেন তাদের মনঃক্ষুণ্ণ করিস্!

প্রণব বলিল,—বেরিয়েচে? কার বাড়ী নেমন্তন্ন?

মা বলিলেন,—কে রাম বাবু আছে, এই বীডন্ ষ্ট্রীটে বাড়ী। তারা কিছুতে ছাড়বে না! তাই আমি বললুম—

রামবাবু! ও, সেই বীডন্ ষ্ট্রীটের রামতারক! তাই তো! প্রণব একটু চিন্তিত হইল; মুখে কিছু বলিল না।

—২০—

সাত আটদিন পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রণব বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। প্রীতিকে ডাকিয়া মা বলিলেন,—যাও তো মা,পিন্টুর ঘরের নতুন বালিশের ওয়াড়গুলো কেচে এসেছে—সেগুলো নাথু পরিয়ে দিচ্ছে। তুমি মা ওয়াড়গুলোয় তার নাম লিখে দাওগে ত। তোমার মেয়ের মতই দেখ, তাই বলচি। জানি, তুমি এতে দুঃখ্য ভাববে না!

প্রীতি বলিল,—সে কি কথা, আমি এতে সত্যি ভারী খুশী হই। এই যত্ন—এ যে আমার একেবারে অজানা মা! শেষের দিকে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে আসিয়া প্রণবের ঘরে ঢুকিল ও ছুঁচ-সূতা লইয়া ওয়াড়ে নাম তুলিতে লাগিল। এ কয়দিন সেবার কাজ চুকিলেও প্রণবের প্রত্যেক কাজটি নিজের হাতে সে করিতে যাইতেছিল। কি করিয়া সে এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, প্রণবকে তাহা বলিয়াছে, কিছুই লুকায় নাই! যে-ভাবনা তার হইয়াছিল।—ওঃ! এইবার বিদায় লইবার পালা আসিয়াছে। ইঁহারা না ছাড়িলেও সে কি বলিয়া এখানে থাকিবে? ভালো দেখায় না! কিন্তু যাইবেই বা কোথায়! বাহিরে নিরাশ্রয় মরু ধূ-ধূ করিতেছে। কোথায় আশ্রয়? কোথাও নাই! এ বাড়ীতে যত্নের কি কমতি আছে। মা জগৎ বলিতে অজ্ঞান! আদর করিয়া জগদ্ধাত্রী-মা বলিয়া ডাকেন! আর বাড়ীর লোকগুলি—ক্রীশ্চান্ জানিয়া ছুঁৎ বাঁচাইয়া চলিলেও সকলেই তাহাকে সুনজরে দেখে। ছোটবাবুটি কেমন, সেইটুকু তাহার দেখা হয় নাই। ছোটবাবু নিজের ঘর আর নিজেকে লইয়া ব্যস্ত! বাড়ীতে আর কে প্রাণী আছে, তাহা জানিবার আগ্রহ একটুও নাই! এটুকু ছাড়া সে আরো লক্ষ্য করিয়াছে, ছোটবাবুর চাল-চলন সব কেমন অদ্ভুত রকমের! কখন্ বাড়ীতে থাকেন, কিছু বুঝা যায় না। তবে প্রত্যহ গভীর রাত্রে কণ্ঠস্বর শুনা যায়, তাহাতে সে বোঝে, ছোটবাবু বাহিরে গিয়াছিলেন, এখন বেড়াইয়া ফিরিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরখানা ছাইয়া ফেলিয়াছিল। উঠিয়া ইলেকট্রিক আলোটা জ্বালিয়া দিবে, সেদিকে খেয়াল ছিল না। অন্ধকারে চিন্তাস্রোতে মনটাকে ভাসাইয়া দিতে ভালো লাগিতেছিল। সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার ঝাপসা আঁধারে মনও চিন্তার স্রোতে কোন্ অকূলে অনির্দ্দেশ যাত্রা সুরু করিয়াছিল। তীরে গাছপালা নাই, ছায়া নাই, উঁচু পাড়ের মধ্য দিয়া তাহার মন একা কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছিল, সে দিকে তাহার কোন খেয়াল ছিল না!

হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। কে একজন আসিয়া ড্রয়ার হইতে চাবি টানিয়া কোণের দেরাজ খুলিতেছে—তারপর তাহার মধ্য হইতে কি একটা বাহির করিয়া সে আলোর সুইচ্ টানিয়া দিল। আলো জ্বলিল। প্রীতি উঠিয়া তাহার পানে চাহিল। কে? সে শিহরিয়া উঠিল। এ যে···সে-ই! সেই দুর্দ্দিনের রাত্রে এই তো তাহাকে বাগানে ধরিতে গিয়াছিল! সে এখানে আসিল কি করিয়া··? এ তবে··?···এ তবে? ঠিক!

আগন্তুক প্রীতিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, কহিল,—তুমি?

আগন্তুক শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক আবার সেই বন্ধুদের দলে পড়িয়া তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-টিট্‌কারীতে সেই পুরাতন অভ্যস্ত পথেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে এবার ভারী সতর্ক হইয়া চলিতেছে। আজ কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে—হাতে টাকা নাই, ব্যাঙ্কে এ সময় চেক পাঠানো যায় না, ধারও কোথাও মিলিল না। তাই দাদার কাছ হইতে ধার করিবে, ভাবিয়াছিল। দাদা বাড়ীতে নাই শুনিয়া দাদার দেরাজ হইতে টাকাটা লইয়া যাইবে ভাবিয়া সে আসিয়াছিল।

আসিয়া প্রীতিকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মেয়েটা কি ভাবিল? ভাবিল না কি, সে চোর? চোরের মত আসিয়াছে টাকা চুরি করিতে!

শশাঙ্ক প্রীতির দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিল,—বনের হরিণী, তুমি এখানে এলে কি করে? এ্যাঁ!

প্রীতি বলিল,—চুপ।

শশাঙ্ক বলিল,—কি রকম। আমার বাড়ীতে আমি থাকবো চুপ করে, আর তুমি সম্রাজ্ঞীর মত হুকুম করবে! তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল,—ও, তুমিই নার্শ! চাল চেলেছো বেশ!

প্রীতি কোন কথা বলিল না। সে বুঝিল, ইনিই বাবুর ছোট ভাই শশী! সেখানে নাম লইয়াছিল মোহন বাবু! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!

প্রীতি বলিল,—টাকা রেখে দিন।

বিদ্রূপের স্বরে শশাঙ্ক বলিল,—বটে! সে আসিয়া প্রীতির হাত চাপিয়া ধরিল।

প্রীতি একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—হাত ছাড়ুন।

শশাঙ্ক বলিল,—কেন ছাড়বো, বলো তো? তোমার জন্যে অনেক টাকা খরচ করেচি। ওস্তাদের মাইনে, বাড়ী ভাড়া, পুলিশের টাকা, সে সব তোমার মা বসন্ত বাড়ীউলি তালুক বেচে জোগায় নি! এই শর্ম্মাই গাঁট থেকে খরচ করেছিল, মস্ত প্রত্যাশায়!

সমস্ত ব্যাপার অমনি এক নিমেষে প্রীতির চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইনিই তবে··· ?

শশাঙ্ক বলিল,—ত্যাখো, এ নার্শের কাজে ক'টাকাই বা রোজগার হবে! ছেড়ে দাও। এ কি তোমার সাজে ? তার চেয়ে বলো, কি চাই ? হীরের মটুক, হীরের হার, সোনার সিংহাসন, যা সাধ থাকে, বলো। শশাঙ্ক প্রীতির হাত ধরিল।

প্রীতি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—হাত ছাড়ুন। তারপর সে সবলে হাত ছাড়াইয়া লইল। হাত ছাড়াইয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। শশাঙ্ক গিয়া তখন দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রীতি বলিল,—আমায় যেতে দিন, বলচি, না হলে ভালো হবে না।

শশাঙ্ক বলিল,—বটে! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকেই চোখ রাঙাবে! বেশ, রাঙাও! কিন্তু যদি চেঁচামেচি করো, তা হলে আমি সকলকে ডেকে এখনি তোমার পরিচয় দেবো, এই নার্শটি কে!

প্রীতি ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভয় তখনই কাটিয়া গেল। হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে প্রণব আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যেন ইন্দ্রজালের মত! প্রণব বলিল,—কি বলবে শশী ?

শশাঙ্ক প্রথমটা একটু থতমত খাইল, তারপর বলিল,— এ নার্শ নয় দাদা,—এ কে, জানো ?

হাসিয়া প্রণব বলিল,—একে নার্শ বলেই জানি। এর জন্যেই আমি প্রাণ পেয়েচি। অন্য পরিচয় আছে না কি ?

হাসিয়া শশাঙ্ক বলিল,—ওর নাম ফুলি, ও বেশ্যা। বসন্ত বাড়ীউলির মেয়ে।

প্রণব গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—সাবধানে কথা বলো শশী! একজন স্ত্রীলোককে হাতে পেয়ে অপমান করো না। তুমি ওঁকে চেনো না, কিন্তু আমি চিনি।

শশাঙ্ক বিস্মিতভাবে বলিল,—তুমি চেনো ? ও... ?

প্রণব বলিল,—হ্যাঁ, তোমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী হবে। শুনলে ?

সেই মুহূর্ত্তে দারুণ অন্ধকারে সমস্ত বিশ্বটা যদি একেবারে ঢাকিয়া জমিয়া যাইত, তাহা হইলেও প্রীতি ও শশাঙ্ক কেহই অত বিস্মিত হইত না! প্রীতি অবাক হইয়া গেল! এ কি কথা! শশাঙ্ক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—কিসের গোলমাল রে তোদের ?

প্রণব অচপল কণ্ঠে বলিল,—আমি শশীকে বলছিলুম, এঁকে চেনে না, তাই চিনিয়ে দিচ্ছিলুম। বলছিলুম যে, এই নার্শ—এ আমার স্ত্রী। আমি একে বিবাহ করবো।

মার বুকে কিসের একটা ঢেউ উথলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—তাই কর্ বাবা। আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করচি, এতে তোর মঙ্গল হবে, দেখে নিস্! বিয়ের মানে যদি এই হয়, দুজনে মনে মনে গভীর মিল, দু'জনে দুজনের উপর প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে এক হওয়া, তা হলে এর চেয়ে যোগ্য মেয়ে তুই আর কোথাও পাবিনে। ক'দিন আমি কেবলি ভাবচি, কি দিলে এর ঋণ শোধ হয়! আর এও ভাবছিলুম, যদি এই প্রাণটি—যেটিকে ও প্রাণ-ঢালা সেবায় বাঁচিয়ে তুলেছে—সেই প্রাণটুকু ওরই হাতে জন্মের মত তুলে দিতে পারি, ওরি জিম্মায়, তা হলে যেন আমার প্রাণ খুশী হয়। নাহলে ওর সেবার দাম তুচ্ছ টাকায় শোধ হয় না।

শশাঙ্ক বলিল,—কিন্তু মা, তুমি ওর পরিচয় নিয়েচো ?

হাসিয়া মা বলিলেন,—কোন দরকার নেই, শশী। মানুষের পরিচয় কি শুধু তার গোত্রেই ? তা নয়। মানুষের পরিচয় মানুষের মনে। ওর মন এ ক'দিনে আমি যা দেখে বুঝেচি, তাতে বলতে পারি, মস্ত বড় মহামহোপাধ্যায়ের ঘরের মেয়েকেও এর কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে হয়। এত বড়, এত পবিত্র ওর মন!

প্রণব উচ্ছ্বসিত আনন্দে মার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল,—মা, তোমাকে এর সব কথা বলবো। এর নিজের হাতে লেখা সত্য পরিচয়। তা পড়লে শুধু স্নেহ কি মা, শ্রদ্ধায় তোমার মন ভরে উঠবে!

মা বলিলেন,—এসো মা জগৎ, পিনুর দুধ আনবে।

প্রণব বলিল,—জগৎ কাকে বলচো মা ? এর নাম প্রীতি।

মা বলিলেন,—প্রীতি!

প্রণব বলিল,—হ্যাঁ মা, ওর কথা তোমায় আমি বলবো'খন।

শশাঙ্ক যেন অবাক হইয়া গেল! এই এক মুহূর্ত্তে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, এ কি সত্য, না স্বপ্ন ? এ কি সে উপন্যাস পড়িতেছে, না, বায়োস্কোপে ছবি দেখিতেছে! সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল। ফুলি—সে কাহাদের মেয়ে স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলা সত্ত্বেও তাহাকে একেবারে—!

সে চলিয়া যাইতেছিল। প্রণব বলিল,—শশী, কোথাও যেয়ো না—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বাইরে তোমার এক বন্ধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, তোমার কাছে কি টাকার জন্যে এসেচেন। আমি তাঁকে বলেচি, পাওনা টাকা হয় যদি তো কাল হিসাব নিয়ে আসবেন। তা' চলে গেলেন।

শশাঙ্ক এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার আর কোথাও যাইতে ভালো লাগিতেছিল না। হাতে টাকা, দেরাজ খোলা—এগুলার রহস্য এখনি কি বিশ্রী হইয়া সকলের চোখে ধরা পড়িবে! সে বলিল,—দাদা,

তোমার সঙ্গে আমারো কথা আছে, একবার বাইরে এসো।

প্রণব বাহিরে গেল। শশাঙ্ক প্রায় কাঁদিয়া তাহাকে বলিল,—দাদা, আমি চোরের মত তোমার দেরাজ থেকে এই টাকা বার করে নিয়েচি। চুরির মতলব আমার ছিল না। কিন্তু—

প্রণব বাধা দিয়া বলিল,—আমার টাকা তুমি নিলে চুরি করা হয় না, শশী। তুমি আমার ভাই, আমরা দুজনে এক নই কি? টাকার দরকার হয়েচে, নিয়েচো —তাতে কি।

শশাঙ্ক বলিল,—না দাদা, আমায় মাপ করো। এই টাকা নাও, নিয়ে তুলে রাখো। ইয়ারদের ফুর্ত্তি দেবার জন্য টাকার দরকার হয়েছিল, সেই টাকা নিয়ে যাবো বলে এসেছিলুম। নিজের হাতে কিছু নেই—ভেবেছিলুম তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো। তুমি বাড়ী ছিলে না, আমারো তর্ সইছিল না—

—কত টাকা?

—দুশো।

—কি হবে?

—একটা বাজি রেখেছিলুম। হেরেচি, তাই দিতে যাচ্ছিলুম।

—বেশ, দিয়ে এসো। কথার খেলাপ করো না। তবে ও-সঙ্গ ছাড়ো শশী। ওতে কোন আমোদ নেই। জীবনটাকে সার্থক করবার হাজার উপায় আছে—তার একটা অন্ততঃ বেছে নাও। টাকাটা দিয়ে এসো—তবে সে আমোদে থেকো না।

—না দাদা, যাবো না।

—যাও। তবে তারা যদি না ছাড়ে? তাদের বলো, বাড়ীতে কাজ আছে।

শশাঙ্ক বলিল,—বেশ, তাই হবে।

শশাঙ্ক চলিয়া গেলে প্রণব নিজের ঘরে আসিল। ঘরে কেহ ছিল না। প্রণব ইজি চেয়ারে বসিয়া প'ড়ল। ভাবিল, তাইতো, এক নিমেষে কি এ এক নাটকের অভিনয় করিয়া ফেলিল! কিন্তু না, এ অভিনয় নয়! এই কথাটাই আজ কয় দিন ধরিয়া সে ভাবিতেছিল! এই একটিমাত্র উপায় ছিল—প্রীতিকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে শুধু এই একটিমাত্র উপায়! সে তো মাকে জানে! মার কাছে বংশ-গোত্র এ-সবগুলার চেয়ে মনের দাম ঢের বেশী!

প্রীতি আসিয়া বলিল,—দুধটুকু খেয়ে ফেলুন। মা দিলেন।

প্রণব নিঃশব্দে দুগ্ধ পান করিল। পান করিয়া বাটিটা মেঝেয় রাখিল। প্রীতি তখন দুম্ করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, বসিয়া বলিল,—আমার একটি ভিক্ষে আছে।

প্রণব সস্নেহে বলিল,—ভিক্ষে! কি ভিক্ষে, বলো?

প্রীতি বলিল,—বলুন, সে ভিক্ষে দেবেন?

প্রণব বলিল,—দেবো, বলো। আমার জীবনদাত্রীকে আমার অদেয় কিছুই নেই।

প্রীতি বলিল,—ও কথা বলে আপনার তৃপ্তি হয় যদি তো বলুন। আমার ভিক্ষা এই যে, ও হবে না—আপনি ও সঙ্কল্প ছেড়ে দিন।

প্রণব বলিল,—কি সঙ্কল্প?

প্রীতি বলিল,—এইমাত্র ঐ যা বললেন।

প্রণব বলিল,—ও! বুঝেচি। এ কথা কেন বলচো প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—তা হতে পারে না।

প্রণব বলিল,—কেন হতে পারে না, শুনি?

প্রীতি বলিল,—আপনি সব জানেন তো! আমার জন্য আপনি সমাজে হেয় হয়ে থাকবেন, এ কথা মনে হলে আমার সেই দণ্ডে মরবার সাধ হয়!

প্রণব বলিল,—এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে প্রীতি। মার কথা শুনলে তো?

প্রীতি বলিল,—শুনেচি। তিনি যদি স্নেহে অন্ধ হন, আপনি পুরুষমানুষ, আপনিও হবেন?

প্রণব বলিল,—কিন্তু এ অন্ধের কথা নয়, প্রীতি, যার চোখ আছে, চোখ ফুটেচে, এ তার কথা।

প্রীতি বলিল,—না, না, এ হতে পারে না।

প্রণব বলিল,—খুব হতে পারে।

প্রীতি বলিল,—আপনি যে আমার দেবতা।

প্রণব হাসিয়া বলিল,—স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা।

প্রীতি বলিল,—না, না, সে-দেবতার কথা আমি বলচি না। আপনি,—আপনি আমার ভাই, বন্ধু, মা, বাপ, স্বামী, সব⋯সব। আপনি যে ও-স্বামীদেবতারও উপরে।

প্রণব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে বলিল,—আমার মার মনের অতখানি সাধে তুমি বাদ সাধবে?

প্রীতি কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া বলিল—কি করবো? আমি যে কতখানি নিরুপায়⋯! নাহলে স্বর্গ পেয়ে এমন করে কেউ তা হারাতে চায় কখনো?

প্রণব বলিল,—প্রীতি, তুমি জানো না, তুমি এ কি বলচো! এই কথায়, তোমার এ সঙ্কল্প রাখতে আমার কতখানি কেড়ে নিচ্ছ! এ জগতে কখনো স্ত্রী বলে কাকেও গ্রহণ করতে পারবো, তা আমি স্বপ্নে ভাবিনি কোনদিন। আজ স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে চেয়েছি একমাত্র তোমাকে। করতে চেয়েচি কেন—মনে মনে পেয়েওচি। তুমি যদি এ সাধে বাদ সাধো, তাহলে এ-জন্মে আর কখনো আমি বিয়ে করবো না। মানুষ এমন করে ভালোবাসতে পারে একজনকে শুধু—আমি তোমায় সেই

ভালোবাসাই বেসেছি। সমাজের ঘৃণার কথা বল্‌চো? এ ভালোবাসা সে ঘৃণাকে অনায়াসে পরাস্ত কর্‌তে পারবে।

প্রীতি কোন কথা বলিল না।

প্রণব আবার বলিল,—আমার মার মুখের পানে চেয়ে দেখেচো কি? আমার এ কথায় মার মুখে হাসির কি জ্যোৎস্না ফুটেচে! এ জগতে মাই আমার সব। মার অনুমতি, মার অমন আগ্রহ-ভরা সম্মতি পেয়েচি যখন, তখন জগতে কোন সমাজকে ডরাইনে আমি। তুমি যদি এ-সব ভেঙ্গে-চুরে চলে যেতে চাও—আমার মন থেকে দূরে, খুব দূরে, তাহলে আমি কি শোধ নেবো, জানো?

প্রীতি আকুল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রণবের মুখের পানে চাহিল,—কোন কথা বলিতে পারিল না।

প্রণব বলিল,—তাহলে আমার নাম আর কখনো তুমি কাণে শুন্‌তে পাবে না।

প্রীতি নিরুপায়ের কান্না কাঁদিতে লাগিল। তাহার বুক ফাটিয়া অশ্রুর সাগর যেন উথলিয়া উঠিল।

এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—দুধ খেয়েচিস্ রে?

—হ্যাঁ মা।

তারপর প্রীতিকে দেখিয়া মা বলিলেন,—বৌমা কাঁদচে কেন রে?

প্রণব ডাকিল,—মা—

সে কথা কাণে না তুলিয়া প্রীতির হাত ধরিয়া মা বলিলেন,—ওঠো তো মা। ছেলেবেলায় মা হারিয়েচি। যেদিন পিনু কোলে এলো, সেদিন থেকে এই দিনটির পানেই শুধু চেয়ে আছি—কবে একটি ছোট্ট দরদী মা পেয়ে মন খুলে তাকে মা বলে ডেকে তৃপ্তি পাবো! আজ সেই সুদিন এসেচে। আমার এ সাধ পূর্ণ করো মা। একবার ওঠো—উঠে পিনুর পাশে বসো। দেখে আমি চক্ষু সার্থক করি!

আনন্দের উত্তেজনায় মার চোখে জল আসিল। মা দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—এই কথাটি মনে রাখিস্ দুজনে, এ জগতে বংশের পরিচয়ে গোত্রের পরিচয়ে মানুষ মানুষ হয় না, মানুষ মানুষ হয় তার নিজের মনের গুণে, নিজের মনুষ্যত্বে

তারপর মা বলিলেন,—ভালো কথা, আমার মালা-ছড়া নিয়ে আসি। পিনুর মুখে তোমার কথা শুন্‌বো সব। পালিয়ো না মা।

মা চলিয়া গেলেন। প্রণব তখন প্রীতির মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—মার কাছে তোমার আবেদন জানালে না কেন যে, ওগো মা, আমায় এ দায় থেকে মুক্ত করো?

প্রীতির চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। দুই চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ভরিয়া সে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, তাহার চোখের সামনে হইতে মলিন জীর্ণ কি একখানা পর্দ্দা খশিয়া পড়িয়াছে—চারি-ধার সোনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!

সে বলিল,—কি সোনার কাঠির পরশ বুলিয়ে দিয়েচেন আমার প্রাণে—

—যে, প্রাণে প্রেমের শতদল ফুটে উঠলো এতক্ষণে —না? বলিয়া প্রণব প্রীতির অধরে গাঢ় চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

* * * *

গভীর রাত্রি। অন্ধকার আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রীতি জানালার ধারে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আজিকার এই সমস্ত ব্যাপারগুলা। এমন সময় পাশে কে ডাকিল,—বৌদি—

চমকিয়া চাহিয়া প্রীতি দেখে, শশাঙ্ক। সে একটু সঙ্কুচিত হইল।

শশাঙ্ক তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—আমায় ক্ষমা করো, বৌদি। অতীত ভুলে যাও। আমাকে আর সে-পশু তুমি কখনো দেখবে না। আজ থেকে আমায় ছোট ভাইয়ের মতই দেখো। দেখবে?

প্রীতি যেন পাগলের মত হইয়া পড়িল। এত আলো। এ বিশ্বে এত আনন্দ সঞ্চিত ছিল! তাহার অদৃষ্টে এত সুখ!

সে শশাঙ্কর হাত ধরিয়া বলিল—ছি, ও-কথা বলবেন না। আমি দুর্ভাগিনী, নিরাশ্রয়া। আমাকে আশ্রয় নয়, এ যে একেবারে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েচেন আপনারা। এ ঋণ কি ভোল্‌বার!

শেষ

পুনশ্চ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অজাতশত্রু

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত

বন্ধুবরেষু—

পৌষ, ১৩৪১

সৌরীন্দ্র

দাদু

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বহুকালের পুরানো দোতলা বাড়ী। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা—তৃণশষ্পে আচ্ছন্ন। সেইখানে একখানা বেঞ্চে বসিয়া বৃদ্ধ শ্যামাচরণ আকাশের পানে চাহিয়া আছেন; সন্ধ্য বেড়াইয়া ফিরিয়াছেন! এমন সময় মৃদু পদসঞ্চারে নাতি মণ্টু আসিয়া কহিল,—আমার লবঞ্চুস এনেচো দাদু?

সঙ্গে সঙ্গে নাতনী শচীর কণ্ঠস্বর,—আর আমার পুতুল?

নাতি-নাতনী আসিয়া দাদুকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিল। দাদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—ঐ যাঃ! সত্যি ভুলে গেছি ভাই···

দুজনে সানুনাসিক সুরে কহিল,—বা রে, রোজ রোজ ভুল!

মণ্টু বলিল,—আজ কাগজে লিখে তোমার জামার পকেটে সে কাগজ রাখলুম···

শচী কহিল,—আমি তোমার কোঁচায় গিঁট বেঁধে দিলুম যে আর কথাগুলো ভুলে যাবে না!

সনিশ্বাসে দাদু কহিলেন,—তবু ভুলে গেছি, বোন।

অনুযোগের স্বরে মণ্টু কহিল,—দাদুর কিচ্ছু মনে থাকে না···

শচী প্রতিধ্বনি তুলিল,—না!

দাদু কোনো জবাব দিলেন না। দিবার মত জবাব ছিল না।

মণ্টু কহিল,—কি তোমার মনে থাকে?

শচী বলিল,—হ্যাঁ···

দুজনকে কোলের কাছে টানিয়া দাদু সনিশ্বাসে কহিলেন,—থাকে রে, থাকে অনেক কিছু মনে থাকে।··· মন থেকে চেষ্টা করেও সে-সব তাড়াতে পারি না!

মণ্টু কহিল,—কি মনে থাকে—শুনি···

শচী ঝাঁকানি দিল, বলিল,—বলো···

দাদু দুজনের পানে চাহিয়া রহিলেন। গোধূলির স্তিমিত আলো-আঁধারে তাদের চোখ দুটি জ্বলিতেছিল যেন সাঁঝের বাতি!

দাদু কহিলেন,—শুনবি···কি মনে আছে?

মণ্টু কহিল,—শুনবো···

শচী কহিল,—নিশ্চয়।

দাদু ক্ষণেক নীরব রহিলেন।

মণ্টু কহিল,—বলো···

শচী বলিল,—হ্যাঁ···ছাড়চি না না-বললে। শুনবোই।

দাদু কহিলেন,—শোনো তবে···

দাদু একবার আকাশের পানে চাহিলেন। আকাশ যেন নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে—তার নক্ষত্র-নয়নে যেন প্রচণ্ড কৌতূহল। সারা জীবনের যত ঘটনা···তাদের মধ্যে কোন্‌টা দাদুর মনে আজো কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে, শুনিবার জন্য আকাশের কৌতূহলও যেন দারুণ হইয়া উঠিয়াছে! আকাশের বুকে তার কোনোটাই অগোপন নাই! দাদুর জীবনকে নিজের আশ্রয়-তলে আগাগোড়া রাখিয়া আসিয়াছে···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাদু কহিলেন,—রান্নাঘরের পাশে ভাঙ্গা পাঁচিল দেখচো···

মণ্টু কহিল,—হ্যাঁ···

দাদু কহিলেন,—ঐ পাঁচিল একদিন আস্ত ছিল—টানা, লম্বা! ঐ যে পথের ধারে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল··· ওখানে জঙ্গল ছিল না; পাঁচিল ছিল সেই রাস্তার ধার পর্য্যন্ত। আর যে জায়গায় জঙ্গল দ্যাখো, ওখানে ছিল মস্ত ঠাকুর-দালান। একদিন সে দালানে খুব ধূমধামে পূজা হতো···দুর্গা-পূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, অন্নপূর্ণা-পূজা···

শচী কহিল,—সব পূজাই?

দাদু কহিলেন,—তাই!···আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। কি ধূমই হতো। যাত্রা হতো—গান, বাজনা, আমোদ-আহ্লাদের অন্ত ছিল না।

শচী প্রশ্ন তুলিল,—তুমি অত ছোট ছিলে? দাদার চেয়েও ছোট? বা রে।

মৃদু হাস্যে দাদু কহিলেন,—ছিলুম দিদি! বরাবর কি এমনি বুড়ো আমি?··· মাথায় টাক? দাঁত নেই? তা নয়···একদিন আমিও ছিলুম তোমার এই লক্ষ্মী দাদাটির মত। আমার মা ছিল, বাবা ছিল···কত আদর করতো, কত ভালোবাসতো। সকালে উঠে ঠাকুর-দালানে পণ্ডিত মশায় এসে বসতেন—তাঁর কাছে বসে বানান করে ঐক্য-বাক্য পড়তে হতো! পড়া বলতে না পারলে কাণমলা খেতুম, মার খেতুম।

শচী কহিল,—তোমাকে মারতো? সে পণ্ডিত-মশায় তোমার চেয়েও বড় ছিলেন বুঝি?

দাদু কহিলেন,—ছিলেন।

শচী বলিল,—তিনি এখন কোথায় আছেন, দাদু? তাঁকে ভারী দেখতে ইচ্ছা করচে!

দাদু কহিলেন,—তাঁকে আর দেখা যাবে না ভাই! তিনি এখন স্বর্গে।

—তোমার মা? তোমার বাবা?

—তাঁরাও স্বর্গে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের স্মৃতির ভারে দিকে দিকে স্তব্ধতা জাগিল। মণ্টু শচী চুপ—যেন তারা মনের মধ্যে সেই অতীত দিনের স্মৃতিকে ভালো করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে!

দাদু কহিলেন,—তখন অনেক টাকা ছিল আমার বাবার। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন··· ফেরবার সময় কত কি কিনে আনতেন। টিনের রেল গাড়ী···দম দিলে চলে—সবে তখন উঠেচে। লবঞ্চুস, মার্ব্বেল আনতেন; এনে আমাকে দিতেন। আমার খেলনা দেখে পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে আসতো খেলবার জন্য···

একদিনের কথা তবে বলি···

মুড়ি খাবার আমার ভারী সখ ছিল। বাড়ীতে খেতে দিত না। সেদিন মার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়েছিলুম। চাকরদের চোখে ফাঁকি দিয়ে চুপ চুপি বিকেলের দিকে বাড়ী থেকে দূরে ছিল সিধুর দোকান··· সেই দোকানে গিয়ে পয়সা দিয়ে এক পয়সার মুড়ি চাইলুম। তারা কোঁচায় মুড়ি ঢেলে দিলে একরাশ। সেই মুড়ি পথে দাঁড়িয়ে চিবুচ্ছি···এমন সময় গাড়ীর শব্দে চেয়ে দেখি, গাড়ীই বটে—আমাদের বাড়ীর দিকে আসচে। নিশ্চয় বাবা ফিরচেন কলকাতা থেকে! ভয়ে সেই কোঁচড়-ভরা মুড়ি ছড়াতে ছড়াতে বাড়ী ছুটলুম। বাড়ীতে ঢুকে একেবারে তেতলার চিলকোঠার পাশটিতে ···নিশ্চিন্ত মনে মুড়ি চিবোচ্ছি··হঠাৎ সামনে দেখি, বাবা! পথ থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত—সিঁড়ি বয়ে ছাদ পর্য্যন্ত ছড়ানো মুড়ি দেখে বাবার মনে সন্দেহ জেগেছিল, নিশ্চয় সে আমার কীর্ত্তি! সব মুড়ি তিনি ফেলে দিলেন···দিয়ে চাকরদের ধমকালেন—ছেলে চৌকি দিস্ না···ছেলে দোকানে গিয়ে মুড়ি কিনে খায়! আমিও বকুনি খেলুম। কিন্তু সেজন্য তত দুঃখ হয়নি, যত দুঃখ হলো মুড়িগুলো মনের সাধে খেতে পেলুম না বলে! মার কাছে রাত্রে মনের দুঃখ জানিয়ে বলেছিলুম—বেশ, যেমন আমাকে মুড়ি খেতে দাও না, দাঁড়াও, বড় হই, ঐ মুড়ি ধামা ভরে খাবো!

শচী কহিল,—বড় হয়ে ধামা ভরে মুড়ি খেয়েছিলে?

দাদু কহিলেন,—না দিদি। তখন মুড়ির সখ জন্মের মত ঘুচে গেছে। তখন বড় বড় জিনিষ নজরে পড়লো··· তুচ্ছ মুড়ির কথা মনে রইল না।

মণ্টু স্তব্ধ বসিয়া কাহিনী শুনিতেছিল, দাদু কহিলেন,—কি ভাবচো দাদা?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মণ্টু কহিল—তোমার মাকে বাবাকে ভারী দেখতে ইচ্ছা করে দাদু। কেন তাঁরা স্বর্গে গেলেন? থাকলে আমরা কেমন দেখতে পেতুম! তোমার মত ভালোবাসতেন। আচ্ছা দাদু, তাঁদের তাহলে কি বলে ডাকতুম?

গাঢ় স্বরে দাদু কহিলেন,—যদি তাঁরা কখনো আসেন, তখন শিখিয়ে দেবো দাদু, কি বলে তাঁদের ডাকবে।

শচী কহিল—তাঁরা আমাদের দেখেন নি?

দাদু কহিলেন,—না।

শচী কহিল—আমাদের দেখলে কি করে চিনতে পারবেন?

মণ্টু কহিল—তাঁরা এলে ভালো হয়···আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের দেখতে তাঁদের ইচ্ছা হয় না দাদু?

দাদু কোনো জবাব দিলেন না···

শচী কহিল—আসুন না একবার! আমরা এমন ভাব করবো আর লেপ্‌টে থাকবো যে আমাদের ছেড়ে আর চলে যেতে পারবেন না···

দাদু ভাবিতেছিলেন—তাঁরা তো তোমাদের দেখেন নাই, দাদু! যারা দেখিয়াছিল, বুকে রাখিয়াছিল, শত সাধ সত্ত্বেও তারা কোথায় চলিয়া গেল তোমাদের ফেলিয়া···! এ কি মানুষের সাধ্য, যে এমন বুকের মণি ফেলিয়া যায়! অক্ষম কিন্তু মানুষ...

কিছুক্ষণ পরে মণ্টু কহিল—চুপ করে থেকো না দাদু। আরো বলো···ভালো লাগচে।

শচী কহিল—আমার কান্না পাচ্ছে। কেন সবাই একসঙ্গে থাকে না দাদু? স্বর্গে কেন যায়? স্বর্গে কি আছে দাদু...?

দাদু কহিলেন—জানি না দিদি। যদি কখনো সেখানে যাই, ফিরে এসে বলবো···

শচী সবলে দাদুর দুই হাত চাপিয়া ধরিল, বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে কহিল,—না দাদু, স্বর্গে কি আছে, জানতে চাই না। তুমি স্বর্গে যেয়ো না। শুনেচি, যারা স্বর্গে যায়, তারা আর ফিরে আসতে চায় না।

দাদু কহিলেন—আসে বৈ কি দিদি···

মণ্টু কহিল—আসে?

দাদু কহিলেন—আসে। আমি দেখো, ফিরে আসবো। সত্যি আসবো···তোমার পেটে এসে জন্মাবো দিদি···ছোট্ট ছেলে হয়ে···

শচী কহিল,—না দাদু, ছেলে হয়ে পেটে এসে জন্মাতে হবে না। তোমাকে তাহলে চিনতে পারবো না...

মণ্টু কহিল—তুমি বলো দাদু, যা বলছিলে···

দাদু কহিলেন—আর একদিনের কথা তবে বলি, ভাই···

সেদিন বিজয়া-দশমী। নদীর ঘাটে সারা দিন ধরে খুব ধুমধামে দুখানা নৌকা তক্তা দিয়ে জুড়ে ফুলে পাতায় নিশানে আশে-পাশে সাজানো হচ্ছিল—সেই নৌকোয় প্রতিমা তুলে খুব খানিকটা দূরে ভাসান্ দেওয়া হবে—বাড়ীতে জ্ঞাতি-কুটুম্বের মস্ত ভিড়। আমরা ছেলের দল মহানন্দে মেতে নেচে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যার পর বাজনা-বাদ্য করে প্রতিমা তোলা হলো ঠাকুর দালান থেকে। আমার মা প্রতিমা বরণ করলেন। লাল-টকটকে বেনারসী শাড়ী-পরা মায়ের সে মূর্ত্তি···আজো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করচে! সে মূর্ত্তির পানে তাকিয়ে প্রতিমার পানে তাকাবার কথা আমার মনে আসেনি। আনন্দে বুক ভরে গেছলো। মনে মনে কেবলি মন্ত্রের মত আওড়াচ্ছিলুম—মা, আমার মা···

এমনি তন্ময়তার মধ্যে কখন্ যে সকলে প্রতিমা তুলে বাইরের পানে নিয়ে গেল, খেয়াল ছিল না। মা দাঁড়িয়েছিলেন, ঠাকুর-দালানের খিলানের নীচে সব-উপরের সিঁড়িতে মার চোখ জলে ভরে আছে। কদিন মায়ের মুখে আনন্দের যে জ্যোতি দেখেছিলুম, তা এই প্রতিমা-বিদায়ের ব্যথায় মলিন ম্লান। আমার বুক-খানার মধ্যে ব্যথা টনটনিয়ে উঠছিল। হঠাৎ বাড়ীর চাকর গোপাল এসে আমাকে কাঁধে তুলে নিলে। আমি চমকে উঠলুম! মা বললেন—যাও, ভাসান দেখে এসো··

আমি বললুম—তুমি যাবে না?

মা বললেন—আমি বাড়ীতে থাকবো। যাবো না তো।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বাড়ীশুদ্ধ সব লোক ঝেঁটিয়ে বেরিয়ে গেছে—বৌ, ঝী, ছেলেমেয়ে, দাস-দাসী সকলে! আর মা···

বুকটা নিশ্বাসে জমে ভারী হয়ে এলো···মায়ের পানে চাইলুম—দুই চোখের পিছনে জল ঠেলে এলো।

গোপাল আমাকে কাঁধে তুলে এলো নদীর ঘাটে। বাজনা-বাদ্য মশালের সমারোহে তখন প্রতিমা নৌকোয় তোলা হয়েচে। লোকের ভিড় একেবারে গিশ্‌গিশ্ করচে··আরো পাঁচ-সাতখানা ভাউলে ছিল। ছেলে-মেয়েরা তাতে চড়ে বসেছে। লোকের চীৎকারে কানে তালা ধরে যায়—এমন কলরব!

বাবা বললেন—গোপাল, তুই তোর দাদাবাবুকে নিয়ে আমার পান্সীতে ওঠ···

গোপাল চললো আমাকে নিয়ে। আমার চোখে মশালের অত আলো যেন নিব-নিব হয়ে এলো। দুই চোখ জলে ঝাপ্‌সা! আমি ডাকলুম,—গোপাল—

গোপাল বললে,—কি বলচো?

আমি শুধু বললুম,—মা···

গোপাল বললে—মা বাড়ীতে আছেন।

আমি বললুম,—ভাসান আমি দেখবো না, গোপাল।

গোপাল বললে—বাবু যে বললেন! মা বলে দেছেন।

আমি বললুম—না। আমার মা একলা আছে··· মায়ের কাছে কেউ নেই। আমি মার কাছে যাবো···

কথার সঙ্গে দুই চোখে ঝর-ঝর জল-ধারা বইলো।

গোপাল সেদিকে লক্ষ্য করলো না—আমি তার কাঁধে আছাড়ি-পিছাড়ি! তবু গোপাল ছাড়ে না। আমি তার চুলের ঝুঁটি ধরে টানাটানি লাগালুম। তার নাকে মুখে চড় বসাতে লাগলুম। অত হট্টগোলে গোপাল কেমন দিশেহারা হলো···সে আমাকে সিঁড়ির উপর নামিয়ে দিলে। যেমন নামানো, আমি কোনো দিকে না চেয়ে সোজা ছুট দিলুম বাড়ীর দিকে।

রাত্রি-কাল। নদীর পথে দুদিকে ঘন বন। ভূতের ভয়ে এদিকে সন্ধ্যার পর কখনো আসি না। তখন কোথায় গেল সে ভূতের ভয়! ছুটে বাড়ী চলে এলুম ··ডাকলুম· মা...

মায়ের সাড়া নেই! এ ঘর ও-ঘর, এ দালান, ও দালান ছুটোছুটি করে শেষে এলুম ছাদে···

দেখি, ছাদে আলিশার ধারে দাঁড়িয়ে মা···

নদীর ও-দিককার আকাশ মশালের আলোয় লালে লাল! মা সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন··

আমি গিয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরলুম। মা চমকে ফিরে দেখলেন, বললেন—কে?

আমাকে দেখে মা অবাক! বললেন—ভাসান দেখতে গেলিনে?

আমি বললুম—না মা। আমি ভাসান দেখবো না। আমার ভালো লাগে না···

মা বললেন—সে কি! বাড়ীশুদ্ধ সকলে গেল...

আমি বললুম—যাক! আমার বড্ড মন কেমন করচে মা··তুমি একলা আছো···

আর কোনো কথা বলতে পারলুম না। মুখে কথা ফুটলো না। মা আমাকে বুকে চেপে ধরলেন, আমার মুখে চুমু দিয়ে হেসে বললেন—পাগলা ছেলে, তোর মাকে একলা পেয়ে চোরে চুরি করে নিয়ে যেতো যে তুই এলি মাকে চৌকি দিতে?

আমার দুই চোখে জল-ধারা···মুখে কথা নাই!

মায়ের সে হাসি, মায়ের সে কথা—আজো আমার প্রাণে বাজচে, দাদু—যেন কাল আমার মার সঙ্গে এ-কথা হয়েচে!

দাদু চুপ করিলেন। মণ্টু, শচী কাহারো মুখে কথা নাই।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাদু কহিলেন,—তারপর অমন করে মাকে জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে রেখেছিলুম—কোথা থেকে এমন চোর এলো, দাদু—ছিনিয়ে নিয়ে গেল মাকে আমার বুকের বাঁধন ছিঁড়ে। খোলা চোখে জেগে দিনের অত আলোতেও মাকে পাশে ধরে রাখতে পারলুম না···

মনে আছে দাদু, সে কথা আজো আমার মনে আছে—সে কথা এতটুকু ভুলিনি।

দাদু চুপ করিলেন।

শচী বলিল—হ্যাঁ দাদু, আকাশের তারাগুলো কি সত্যি যারা স্বর্গে যায়, তাদের চোখ?

সনিশ্বাসে দাদু কহিলেন—হবে। ওখানকার কোনো খপর তো কোনোদিন রাখলুম না দিদি···ওদিক পানে চেয়েও দেখলুম না! ভুলতেই চেয়েছি—এই পৃথিবীর মাটী আঁকড়ে, এই পৃথিবীকে বুকে চেপে ধরে। তবু ভোলা যায় না!···কাঁচা বয়সে কি বেগ মনে চেপে বসে ···যা যায়, মাটীর নীচে সব যেন ঢাকা পড়ে যায়; কিন্তু হারায় না! আবার এই চুল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের মাটী ঠেলে তারা জেগে ওঠে, ফুটে ওঠে নিত্য—সদ্য-জাগা ফুলের মত সেই গন্ধ, সেই বর্ণ নিয়ে! তখন দেখি, এতদিনেও তাদের অতি ছোট পরাগ কাঁটা অটুট—অটুট আছে সব। কোথাও ঝরেনি, খশেনি, টোটেনি। ভেবেছিলুম, গেছে। কিন্তু যায়নি, যায়নি। যায় না ভাই। সব যেন বীজ থেকে অঙ্কুরে ফুটে লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে বুকের মধ্যটা ছেয়ে আছে!

দাদুর শেষের কথাগুলা মণ্টু ভালো বুঝিল না—শচীও না; তাই তারা মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—হতভম্বের মত!

দাদুর চোখের সামনে নক্ষত্র-দীপ্তির উপর কে যেন কুয়াশার একখানি পুরু পর্দা টানিয়া দিল!

শচী কহিল—তারপর আর মনে নেই, দাদু?

দাদু কহিলেন—মনে নেই? সব মনে আছে। ভেবেছিলুম, মন থেকে গেছে; যায়নি! আছে, সব মনে আছে। সেই একদিন খেলার মাঠে ধুমধাম—বাজি জিতে সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরেচি···দারুণ পিপাসা! কলসী থেকে জল গড়িয়ে ঢক্‌ঢক্ করে খাচ্ছি···সদরে হৈ-হৈ রব উঠলো।···চমকে সেদিকে ছুটে এলুম। দেখি, বাবাকে গাড়ী থেকে অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় পাঁচ-সাত-জন লোক ধরে বয়ে দোতলায় উঠলো। আমার রক্ত যেন হিম হয়ে গেল! দোতলায় ছুটলুম। ঘরে কেউ ঢুকতে দিলে না···প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘরের বাহিরে দ্বারের সামনে আকুল মন নিয়ে আমি ছটফট করে বেড়ালুম···লোকজনের যাতায়াতের বিরাম নেই। ক্রমে আমি পাথর বনে গেলুম! রাত তখন দশটা···মনে আছে, ঘরে ঢুকলুম। মার কোলে বাবার মাথা—বাবা শুয়ে আছেন—দুই চোখে ঝর-ঝর জল-ধারা···মার চোখেও তাই! আমি গিয়ে পালঙের পাশে দাঁড়ালুম। ভারী গলায় মা বললেন,—খেয়ে নাও গে বাবা···অনেক রাত হয়েচে···

আমি বললুম,—বাবার অসুখ করেচে মা?

মা বলিলেন,—করেছিল। এখন ভালো আছেন। তুমি যাও···

আমি চলে এলুম···খেতে গেলুম না। আহারে রুচি ছিল না। পাশের ঘরে মেঝেয় শুয়ে পড়লুম···

ক্রমে অল্পে অল্পে জানলুম, বাবার কলকাতায় যে কারবার ছিল, সে কারবার আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা দেখা-শুনা করতেন। তিনি ছিলেন ম্যানেজার। নানাভাবে বাবার বিশ্বাসের তলায় তলায় তাঁকে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় রেখে বহু টাকা আত্মসাৎ করে কারবারে তিনি প্রচুর দেনা দেখিয়েচেন। কারবার বিক্রী হয়ে গেছে। এত-বড় বিপদের কথা বাবা কাকেও জানান নি। নীরবে সে বেদনা চেপে রেখে রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করছিলেন। সকলের সঙ্গে হাসি-গল্প, সামাজিকতা, শিষ্টাচার কোথাও ব্যাঘাত ঘটাননি এক কণা। সংসারে সবার দাবী সমানে রক্ষা করে এসেচেন। তবু পারলেন না, এত-বড় বিপদ কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে! কারবার বেচে নিঃসহায় ফিরে এসেচেন। ব্যথার ভারে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারেন নি!

সহ্য করতে পারলেন না। এক হপ্তার মধ্যেই এত বড় আঘাতে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গে···যেখানকার পথ আমরা চিনি ন—যেখানে গেলে মানুষ এই মাটির পৃথিবীর পানে ফিরে তাকাতে ভুলে যায়!

এক দিনে আমরা পথে বসলুম। তারপর আবো মনে আছে দাদু, মামার বাড়ী মায়ের সঙ্গে ভিখারীর মত বাস। যেদিন অবস্থা ভালো ছিল, সেদিন যে মামার বাড়ীতে হাঁটতে ফিরতে সবাই বুক পেতে দাঁড়াতো, সে মামার বাড়ীতে এ দুর্দ্দিনে সবার বুক দেখি পাথরে ঢাকা! সে হাসি, সে স্নেহ-সৌন্দর্য্যের চিহ্ন যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে!

তারপর কোনোমতে দিনগুলো গড়িয়ে চললো। কত নূতন লোক নব নব স্মৃতি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো, সামনে থেকে সরে গেল। মনে কোনো রেখা পড়লো না। মন তখন পাথর বনে গেছে!

তারপর এলেন তোমাদের এই দিদিমা। তাঁর হাতে আমার চার্জ্জ বুঝিয়ে মা নিলেন ছুটি। মাকেও হারালুম। আমার দুঃখিনী মায়ের দুঃখের অবসান হলো। তিনি স্বর্গে গেলেন! কাঁদছিলুম। মা বললেন,—কেঁদো না! তিনি অনেক দিন চলে গেছেন··তোমাকে মানুষ করে তুলেছি বাবা! এবার তাঁর কাছে যাই···

আমার সেই করুণাময়ী স্নেহময়ী মা—সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হয়ে কি দুঃখে দিন কাটাচ্ছেলেন! মায়ের বিদায়-ক্ষণের এই হাসি দেখে তা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলুম যে দাদু! মায়ের মুখে ইদানীং হাসি দেখিনি। মামার বাড়ী আশ্রিতা—বাক্য-যাতনা সইতে হতো··নির্ব্বাক অবিরল সে যাতনা সয়েছেন—তাও দেখেছি ভাই···এই চোখে···! ভুলিনি—আছে, আমার আজো তা মনে আছে।

তখন যৌবনের আবেগ। মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুললুম। যা গেছে, তার পানে তাকিয়ে বসে নিশ্বাস ফেললে চলবে না। সংসার তো চলার পথ··· চলতে হবে! না চললে কেউ হাত ধরে ঠেলবে না, বলবে না—ওঠো, চলো। সকলে চলে যাবে তোমাকে ডিঙ্গিয়ে মাড়িয়ে নিজের নিজের ঠিকানায়··

আমিও চলতে লাগলুম। তোমাদের দিদিমা ধরলেন আমার হাত···

দাদুর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সামনে ঐ আঁধার-ভরা ঝোপের পানে তাকাইয়া রহিলেন···

মণ্টু কহিল—কোথায় চলতে লাগলে দাদু? কোন্ দিকে?

দাদু কহিলেন,—দিকের কোনো নিশানা ছিল না, ভাই। ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ের চাপে তাদের দলে মিশে চলতে লাগলুম···আমি আর তোমার দিদিমা। তারপর এলো তোমার মা। পথে কি আরাম সে বয়ে নিয়ে এলো! আঃ, আজো মনে আছে তার সেই হাসি কথা···

তাকে পেয়ে দুঃখ-যাতনা সব ভুলে গেলুম। মনে হলো, এতদিনকার হারানো যত-কিছু সুখ আবার ফিরিয়ে পেয়েছি···!

দাদু নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—কিন্তু সেও রইলো না! কিছু রইলো না···সব চলে গেল।

বাবার কারবারে জ্ঞাতি কাকা পাহাড়-প্রমাণ যে দেনা চাপিয়েছিলেন, সে পাহাড় সরাতে সারা জীবন লড়াই করে চলেছি রে···সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাবার খেয়ালও হয় নি! তোদের মা···তাকে দেখেই শুধু আশা আর শক্তি মিলেচে! না হলে এমন দিন এসেচে—যে, তোমাদের দিদিমার কোলে মাথা রেখে বলেচি, আর পারি না—এসো, দুজনে নদীর জলে ডুব দিই গিয়ে··

তোমাদের দিদিমা বলেচেন,—না, বাণু···

সেই বাণুর পানে তাকিয়ে আবার পরক্ষণে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেচি—সব যাতনা সব শ্রান্তি ভুলে।

সে দেনার পাহাড় সরাতে আর কোনো দিকে তাকাতে পারিনি। সে ঔদাস্য-অবহেলায় এত বড় বাড়ীটা যেন মস্ত অভিমানে-বেদনায় তার দেওয়াল, ঘর নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঝরিয়ে খশিয়ে নিজেকে দীন ভিখারীর করুণ বেশে সাজিয়ে তুলতে লাগলো। ঠাকুর-দালান গেল পড়ে; ওদিককার অমন যে চক-মিলানো বৈঠকী-মহল, তাও গেল ধ্বংশে। অমন উঠান—যেখানে যাত্রা হয়েচে, নাচ হয়েচে, গাঁয়ের লোক মনের আনন্দে পাত পেড়ে বসে খেয়েচে—সে এখন মুছে গেছে—সেখানে উঠেচে আজ আগাছার জঙ্গল! নিঃশব্দে তাও দেখেছি দিদি···কিছু করতে পারিনি। বাবার ঋণ···সেই ঋণ শোধ করাই ছিল সারা জীবনের লক্ষ্য। তার মধ্যে সংসারের ছোটখাট দাবী—যা না মেটালে নয়, মিটিয়েচি!

তারপর খুঁজে পেতে কোন্ বন গিরি থেকে নিয়ে এলুম চাঁপার বরণ রাজপুত্র··আমাদের রাণুর বর, তোমাদের বাবাকে! আশার আলোয় প্রাণ রঙীন হয়ে উঠলো··· তারপর এলে তোমরা দুটি অপ্সর-অপ্সরী! তোমাদের দিদিমা বললেন,—সংসারে আমাদের দুঃখ কোন্খানে গা?

আমি নিশ্বাস ফেললুম। কোনো জবাব দিতে পারলুম না···তোমার দিদিমা দেখেননি, জানেননি, এ সংসারে আমার শৈশব কি আরামে কেটেছিল···

সে সংসারে আমার প্রাণের কামনার ধন রাণু-মা আমার - সেই রাণুমার ছেলেমেয়ে···তারা কি পেলে···! তাও যদি সব বেঁচে বর্ত্তে থাকতো! রইলো না···

তোমার বাবা···তার কি অভিমান হলো, আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তোমাদের দিয়েও পারলুম না দাদু তাকে ধরে রাখতে। রাণু-মাও গেল চলে। আমাদের এত স্নেহ—তাতে তার রুচি ছিল না! একের বিহনে তার সংসার অরণ্য হয়ে গিয়েছিল।

পারবে কেন? সে তো আমাদের মত পলে পলে নানা যাতনার আগুনে মনকে পুড়িয়ে লোহার মত শক্ত করে তুলতে পারেনি!···

এখন তোমরা দুটি ভাই-বোন···

এত দুঃখ, এত যাতনা সাধে ভুলে থাকি ভাই? সে সব দিনের কথা মনে এলে দু'হাতে সরিয়ে দিই! না, এখনি পাগল হয়ে যাবো···মরে যাবো। ভগবানকে কোনো দিন কোনো কামনা জানাইনি—এত দুঃখেও নয়। এখন জানাই। শুধু বলি, ঠাকুর, আমাদের দুই

বুড়ো-বুড়ীকে বাঁচিয়ে রাখো—ফেলে রাখো এই মাটির বুকে, পৃথিবীতে! তোমার সোনার ও স্বর্গে আমাদের রুচি নাই! সেখানে যেতে চাই না—আমরা চাই না…

দাদুর দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল—যাতনায় ভরা দুই চোখ—বুকের অনেকখানি দুঃখ-দাহে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। সে ছাইয়ের মধ্যে কি করিয়া জল আসে, মনে মনে দাদু তাও ভাবেন। ভাবিয়া কোনো কূল-কিনারা পান্ না।

চোখের চশমা খুলিয়া কোঁচার খুঁটে তিনি জল মুছিতেছিলেন।

মণ্টু কহিল—স্বর্গে তুমি যেতে চাও না, দাদু?

দাদু কহিলেন,—না ভাই, চাই না।

—সেখানে তোমার মা আছেন,—আমার মা, বাবা…

কথাগুলা ছোট…কিন্তু এই ছোট কথার আঘাত বুকে বাজিল শক্তিশেলের মত! দাদু কহিলেন, তারা সেখানে ভালো আছে, তারা সেখানে থাকুক…! আমরা এখানে বেশ আছি ভাই…তোমাদের দুটি ভাই-বোন্‌কে পেলে সে-স্বর্গ আমরা চাই না!…

শচী কহিল—এত কথা তোমার মনে থাকে দাদু, আর আমাদের পুতুল?

শচীকে বুকের কাছে টানিয়া দাদু কহিলেন—এই সব কথার ভিড়ে তোমার পুতুলের কথা কোথায় যায় চাপা পড়ে দিদি…! আমি তো ভাবিনা এ-সব কথা…কিন্তু তবু এরা উৎপাত করতে ছাড়ে না!

মণ্টু ডাকিল—দাদু…

দাদু কহিলেন,—কেন দাদা?

মণ্টু কহিল,—মা-বাবাকে চাই না দাদু। আমরা স্বর্গে যাবো না। কিন্তু মা-বাবা যদি আমাদের ডাকে?

দুই বাহুর ঘেরে দুজনকে ঘিরিয়া চাপিয়া দাদু কহিলেন—যেতে দেবো না আমি। খুব বকবো। কখনো বকিনি। তোমাদের ডাকলে কিন্তু ভারী বকবো। তাদের কাছে যেয়ো না ধন, যেয়ো না মাণিক। তারা এমন নিষ্ঠুর…নিজেদের যাতনা এত বড় করে দেখলো যে তোমাদের দুঃখের কথা ভাবলো না! এমন নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল…

শচী কহিল,—তোমাকে আর দিদিমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না দাদু…

আবেগ-ভরা স্বরে দাদু কহিলেন,—না, যেয়ো না সোনা! যেতে আমরা দেবো না। দুটো বুড়ো-বুড়ীতে কি নিয়ে থাকবো?

মণ্টু কহিল—মা বাবা তো তোমাদের চেয়ে ভালো-বাসে না আমাদের…

দাদু কহিলেন—না, বাসে না তো! আমি জানি…

শচী কহিল—মাকে বাবাকে আমরা চিনি না তো…

দাদু কহিলেন—আর কাকেও চেনবার তোমাদের দরকার নেই দিদি…শুধু এই বুড়ো-বুড়ীকে চিনে রাখো! তারাও আজ পৃথিবীর আর কাকেও চেনে না—চিনতে চায় না! চেনার পালা সাঙ্গ করে তোমাদের দুটিকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে। বারে বারে দাগা পেয়েও তাদের মনের আশা আজো ফুরোয় নি…এই মাটীর বুকে আজো এমন দুটি মণি তাদের বুকে…

এত দুঃখ-যাতনা ব্যথা-বেদনার মধ্যে তোমরা আছো বুক জুড়ে…পুরানো দিনের সঙ্গে স্মৃতির তারে হারানো তোমাদের গেঁথে আমরা দুটিতে সে সব আবার প্রাণের উপরে পাই…। হারায়নি, কিছুই হারায়নি…এ বুকের সংসারে তোমরা একসঙ্গে সবাই আছো দাদু · সবাই! আমার মা, আমার বাবা…রাণুমা, তোমরা। চাইবা মাত্র সকলকে বুকের উপরে পাই। তাই বেঁচে আছি। নুয়ে ভেঙ্গে পড়ে মরিনি…মরিনি আজো।

বিধাতার ইঙ্গিত

দু'বার ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করিয়া নিকুঞ্জর মনে কেমন ধারণা জন্মিল, এ বিধাতার ইঙ্গিত!

অর্থাৎ আর পাঁচজনের মত জীবনের সিধা বাঁধা পথ ধরিয়া ওকালতি ডাক্তারী বা চাকরি করিয়া চলবে, সেজন্য বাঙলার মাটীতে তার জন্ম হয় নাই। তার জীবন ধন্য হইবে অন্য পথে।

এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল; দিয়া স্নানাহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত বাকী সময়টায় এখানে ওখানে খেয়াল-মত ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ তার উদ্দেশ্যহীন পর্য্যটন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিলে নিকুঞ্জ কখনো মৃদু হাসিয়া, কখনো বা গম্ভীর স্বরে বলিত—মনুষ্য-চরিত্র অধ্যয়ন করচি।

কিন্তু এমনভাবে ঘুরিতে—যত অসাধারণ হোক,—মানুষের কতদিন ভালো লাগে? নিকুঞ্জরও ভালো লাগিল না। সে তখন হ্যারিশন রোডের মোড়ে এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হকারদের দোকানে জড়ো-করা কেতাবপত্র ঘাঁটিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। দু'ঘণ্টা ধরিয়া বই ঘাঁটিয়া বাছিয়া কখনো চার আনা দামে পাঁচ-সাতখানা পুরানো ছেঁড়া পেনি-সংস্করণ পত্রিকা কিনিত; কখনো কিছু না কিনিয়া দোকান ছাড়িয়া সোজা পথে চলিয়া যাইত।

বন্ধুর দল বলিত,—পাগল! আত্মীয়েরা বলিত,... খেয়ালী! নিকুঞ্জ এ কথায় কাণ দিত না; কারণ, মনে মনে জানিত, এ সব বিধাতার ইঙ্গিত!

এবং এ-ই ইঙ্গিতের অর্থ একদিন সে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিল।

কথানা রহস্য-সিরিজ বিলাতী পত্রিকা পড়িয়া একদিন সে স্থির করিয়া বসিল, সখের গোয়েন্দা-গিরি করিয়া দিন কাটাইয়া দিবে। ব্যবসা-হিসাবে এ কাজ করিবে। এ ব্যবসা যখন বিলাতে চলে, তখন এদেশে কেন চলিবে না? দু'চারিজন বন্ধুর কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে তারা বিস্ময়ে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিকুঞ্জ কহিল,—কাল রাত্রে শুতে যাবার সময় যেন প্রেরণা পেয়েচি। বিধাতার ইঙ্গিত!

বন্ধুরা বলিল,—কিন্তু কাজের জন্য তো গোয়েন্দা-পুলিশ রয়েচে।

নিকুঞ্জ কহিল,—তা আছে। তবে অনেক সময় এমন ঘটে—পারিবারিক উপসর্গে গোয়েন্দা পুলিশ দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে গেলে আদালত পর্য্যন্ত দৌড়ুতে হয়।...

বন্ধুরা কহিল,—তার মানে?

নিকুঞ্জর মনে তখনো একটা সদ্য-পড়া বিলাতী কাহিনী জাগিয়া ছিল। সে বলিল—ধরো, তোমার স্ত্রীকে কেউ হরণ করে নিয়ে গেছে। এ-'কেশে' গোয়েন্দা পুলিশ ডাকলে স্ত্রীকে পাওয়া যাবে, মানি; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যাপার গড়াবে আদালত পর্য্যন্ত। হয়তো স্ত্রী নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক—তবু লোক জানাজানির ফলে তাঁকে নিয়ে সমাজে বাস করা অসম্ভব হবে। এমন ক্ষেত্রে সখের ডিটেক্টিভ দিয়ে স্ত্রীর সন্ধান করালে ব্যাপারটা গোপন থাকবে এবং নিষ্কলঙ্কা স্ত্রীর পক্ষে ঘরে ফেরা মোটে কঠিন হবে না। এমনি আরো অনেক ঘটনা সমাজে ঘটচে।

বন্ধুরা বলিল,—তাহলে আইন-কানুনগুলো পড়া দরকার।

নিকুঞ্জ কহিল,—পড়ে নেবো। বাঙলা একখানা ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি বই কিনেচি। এক হকারের দোকানে পেলুম—দাম পাঁচ আনা। চাই একখানা ফৌজদারী Procedure Code. বাঙলা খুঁজে দেখবো—পাই ভালো, নাহলে ইংরিজি কিনতে হবে। কোনো উকিল-মোক্তারের কাছে বুঝে নেবো, যেখানটা বুঝতে পারবো না।

বন্ধুরা কহিল,—যোদ্ধা হুঁশিয়ার! আইন-পুলিশ নিয়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছো! ভুল হলে মারা যাবে। হয়তো শ্রীঘর-বাস। শুনেছি একটা ধারা আছে Personating Police-officer—না, এমন কি!

হাসিয়া নিকুঞ্জ কহিল,—আইনের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্যবসা করবো বন্ধু! বুঝচো না, এ বিধাতার ইঙ্গিত!

কর্ণওয়া'লশ ষ্ট্রীটের উপর 'চিত্রার' পাশে একখানা মস্ত তিন-তলা বাড়ীর নীচেকার একটা ঘর ভাড়া করিয়া তার সামনে সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া নিকুঞ্জ ব্যবসা খুলিল। বোর্ডে লেখা রহিল,—

নিকুঞ্জ দত্ত

প্রাইভেট ডিটেক্টিভ

অফিসে আসিত সকালে সাতটায়; বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত বসিত। তারপর গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিত। সারিয়া আবার অফিসে আসিত বেলা দুটায়; আসিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকিত।

খরিদ্দার আসিত না; আসিত পুরানো বন্ধুর দল।

চা-পাণ-সিগারেট মিলিত; তাছাড়া এমন জায়গায় আসর। গল্প চলিত—সোনালি স্বপ্নে রচা কত সে গল্প।

নিকুঞ্জ রাশীকৃত খপরের কাগজ সংগ্রহ করিয়াছে; সে-গুলা পড়িত—সংবাদের কলম। কোথাও যদি তেমন কিছু ঘটিয়া থাকে! উইল জাল বা মানুষ গায়েব; দামী গহনা-পত্র সরানো বা তহবিল তছরুপ—স্ত্রী-চুরি—পুলিশ যে সবের কূল-কিনারা পাইতেছে না! তাহা হইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখে। বিলাতী গল্প পড়িয়া যে কৌশল মাথায় খেলিতেছে—ওঃ! শুধু একটু সুযোগ!

কিন্তু খপরের কাগজগুলা যেন কি। এমন একটা ভয়ঙ্কর খপর আজ পর্যান্ত ছাপিল না, যাহার আগাগোড়া রহস্যাচ্ছন্ন। তাদের কি দোষ? বুদ্ধিমান ফন্দিবাজের দল কি আর আছে! যারা ছিল, তাদের কতক ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া প্রাণ দিয়াছে; বাকী গিয়াছে দ্বীপান্তরে! এখনকার খুনীর দল পথে ঘাটে খুন করিয়া বেড়ায়। খুন করিবামাত্র অস্ত্র-সমেত ধরা পড়ে। লোকে আত্মহত্যা করে,—তাও চিঠি লিখিয়া তার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া যায়। নারী-হরণ এমন প্রকাশ্যভাবে ঘটিতেছে যে হাতাহাতি বামাল সমেত ধরা পড়ে।

তবে কি আশার ছলে ভুলিয়া সে নিরাশা সার করিল।

একখানা বাঙলা কাগজ খুলিয়া সেদিন মফঃস্বলের পত্র-কলমে বর্জ্জয়েশ অক্ষরে ছাপা খবরে নিকুঞ্জর চোখ পড়িল।

বারোয়ারী পূজা হইয়া গিয়াছে, স্বনামধন্য নাট্যকার গোবর্দ্ধন সাঁতরার অভ্যর্থনা ইত্যাদি জবর খবর দিবার পর তেলেনা গ্রামের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছে, বারোয়ারী তলার পশ্চিমে যে-জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ধারে পুরানো বাইসিকল্ লক্ষ্য করিয়া গ্রামের লোক গিয়া দেখে, একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে—পগারে মুখ গুঁজিয়া; মুখের খানিকটা খোবলানো! পশুতে খাইয়াছে কিংবা হত্যাকারী অস্ত্র হানিয়াছে, বুঝা যায় নাই। পুলিশ এ সংবাদে অকুস্থলে আসে; এবং লাশ আনা হইলে বুঝা গেল, ব্যোমপাড়া গ্রামের গাঙ্গুলী-বাড়ীর ছেলে শিবচরণ—যাত্রা থিয়েটার করিয়া বেড়াইত; তাহার লাশ! কেহ খুন করিল, না, বাইসিকল হইতে পড়িয়া মারা গেল, তাহা নির্ণয় হয় নাই। বাইসিকলখানি ভাঙ্গা দেখিয়া পুলিশ অনুমান করিয়াছে, লোকটি পড়িয়া মারা গিয়াছে! তারপর পশুতে খুব্‌লাইয়া খাইয়াছে ইত্যাদি।

দু'বার তিনবার বহুবার নিকুঞ্জ এ সংবাদটি পাঠ করিল; পাঠান্তে নিশ্বাস ফেলিল; তারপর শ্যামবাজার পোষ্ট অফিসে গিয়া তেলেনা গ্রামের হদিশ লইল। তার পরে সে গেল রেলোয়ে বুকিং অফিসে এবং সেখান হইতে বহু সাধ্য-সাধনায় জানিল, তেলেনা গ্রামে যাইতে হইলে বারাশত লাইনের ট্রেণে চাপিয়া গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিতে হয়। তারপর সেখান হইতে...

কোথায় কোন্ পথে যাইবে,—রেলের কর্ম্মচারীরা সে সংবাদ জানেন না। অর্থাৎ নিকুঞ্জকে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া তেলেনার ভূগোল নির্ণয় করিতে হইবে।

অফিসে বসিয়া সে টাইম-টেবলের বহিগুলা বার-বার পড়িল; তারপর একখানা বাঙলা ভূগোলের পাতা উল্‌টাইল। কোথায় তেলেনা গ্রাম, সন্ধান মিলিল না। ভাবিল, এমনি করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের ভূগোল শিখাইতেছে! তেলেনা গ্রাম কোথায়, বাঙালীর ছেলে তাহা জানিবে না! অথচ জিজ্ঞাসা করো, লিসবন্ কোথায়? ছেলেরা বলিয়া দিবে—পোর্টুগালে!

সে যে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে নাই—ইহাতে সে আনন্দ বোধ করিল।

চিন্তা করিল। 'চিত্রার' অমর মল্লিকের খোসামোদ করিয়া খানিকটা আঠা ও ক্রেপের দাড়ি-গোঁফ সংগ্রহ করিল। এবং পরের দিন সকালে স্নানাহার সারিয়া শেয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া বারাশত লাইনের ট্রেণে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে লইল একটা সুটকেশ ও বিছানার ছোট লগেজ; হাতে রহিল একগাছি মোটা লাঠি।

বন্দুকের লাইসেন্স নাই—কাজেই অস্ত্র বলিতে ঐ সনাতন লাঠি।

গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে তেলেনা গ্রামের হদিশ মিলিল। এবং নিকুঞ্জ তেলেনায় আসিয়া পৌঁছিল।

কি করিয়া? সে কথা—আমি গল্প বলিতেছি, আমার বলিবার কথা নয়। যদি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতাম—লিখিয়া জানাইতাম। সে কাহিনী লিখিবার মত।

তেলেনার সাগর মুদি লোকটি ভালো। বৈষ্ণব; আতিথ্য-ধর্ম্ম আজো মানে। নিকুঞ্জ তার গৃহে স্থান সংগ্রহ করিল। পরিচয় দিল, সরকারী কাজে আসিয়াছে। কাজটা গোপনীয়; ঢাকঢোল পিটিয়া জানাইলে বিগ্‌ড়াইয়া যাইবে।

সাগরের কৌতূহল সীমাহীন হইয়া উঠিল।

সকালে নিকুঞ্জর ঘুম ভাঙ্গিল। সাগর গিয়াছে গঞ্জে। তার বৈষ্ণবী আসিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া তরুণ অতিথিকে প্রশ্ন করিল—বাবু চা খাবেন?

নিকুঞ্জ কহিল,—পেলে ভালো হয়।

বৈষ্ণবী চা তৈয়ার করিয়া আনিল। পাথর বাটীতে করিয়া আনিল না, আনিল পেয়ালায় ভরিয়া।

নিকুঞ্জ কহিল—বাঃ! তোমরা তাহলে চা খাও?

বৈষ্ণবী মুখের ঘোমটা একটু সরাইল, কহিল—আমি কলকাতার মেয়ে···

নিকুঞ্জ কহিল,—বটে ! বেশ ! তা ছাখো সাগর-বৌ···

সাগর-বৌ চাহিল, কহিল,—পাণ দেবো ?

নিকুঞ্জ দেখিল, সাগর-বৌ একটু গায়ে পড়া। জাতে বৈষ্ণবী বলিয়া হয়তো মায়া-মমতা এত বেশী! সে কহিল,—না।

সাগর-বৌ কহিল,—কলকাতা নাকি বদলে গেছে ? এখন আর চেনা যায় না ?

নিকুঞ্জ কহিল,—তাই। কদ্দিন তুমি কলকাতায় যাওনি ?

সাগর-বৌ কহিল—প্রায় দশ বছর। উনি গেছলেন কলকাতায় গস্ত করতে। বরাতে কেমন ছিল। এঁর সঙ্গে চলে এলুম! আর ফিরে যাইনি। উনিও সেই অবধি যান না। কি জানি, যদি আমার স্বোয়ামী নালিশ-মকর্দ্দমা করে থাকে!

নিকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিল। ইঃ! পরকীয়া প্রেম! এ কোথায় আসিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এদিকে মন দিলে চলিবে না। যে কাজে আসিয়াছে! নিকুঞ্জ বলিল,—আচ্ছা সাগর-বৌ, বলতে পারো—খপরের কাগজে পড়েছিলুম, বারোয়ারি-তলার ওদিকে কে একজন শিব গাঙ্গুলি খুন হয়েছিল···সে জায়গা কোথায় ?

সাগর-বৌ কহিল—ও! গাঁ ছাড়িয়ে হাটতলা। সেই হাট-তলার ওবাগে বারোয়ারিতলা। সেইখেনে।

—অনেক দূর ?

—না। খুব বেশী দূর নয়। পুলিশ বললে, খুন নয়। কিন্তু আমি জানি, খুনই।

নিকুঞ্জ বোঝে, এই-সব স্থান হইতেই এ-ব্যাপারের সন্ধান মেলে।

তাই সে প্রশ্ন করিল,—কিসে জানলে ?

সাগর-বৌ কহিল—বয়স বেশী নয়। ছোকরা। দেখ-তেও খাশা! যাত্রা করতো। রাধিকা সেজে ছিল। সে কি চমৎকার! এখানে এলে থাকতো ঐ বিন্দে মিস্ত্রীর বাড়ীতে। বিন্দে লরি চালায়। তার বৌটা দোজপক্ষের বৌ—ভারি ফাজিল। দুজনে ভাব ছিল। এ-খুন ঐ বিন্দের কাজ। সন্দ করেছিল কেমন—তাই!

নিকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিল। মেঘ না চাহিতে জল! বাঃ! বিধাতার ইঙ্গিত!

নিকুঞ্জ তখন সাগর-বৌয়ের শরণ লইল, ডাকিল,—সাগর-বৌ—

বৌ বলিল,—কেন বাবু ?

নিকুঞ্জ কহিল—আমায় সাহায্য করবে ?

—কিসের বাবু ? সাগর-বৌয়ের চোখ দু'টা আশার আলোয় ঝকমক্ করিয়া উঠিল।

নিকুঞ্জ লক্ষ্য করিল, বুঝিল, সাগর-বৌ শীকারী! সাগরের কূলে আসিয়া এখনো শীকারের লোভ ছাড়ে নাই! কিন্তু সে ইহাতে ভুলিবে না। যে-কাজে আসিয়াছে। ডিটেক্‌টিভের কাজে ওশমানের মত ফন্দী, লীলাকৌশল চাই। সে কহিল—আমি এসেচি সেই খুনের তদারক করতে। তুমি আমার সাহায্য করো—কাকেও এ কথা বলো না। সাগরকেও নয়।

মৃদু হাসিয়া সাগর-বৌ কহিল,—বেশ। তবে আপনি টেক্স বসাবার জন্যে আসো নি ?

নিকুঞ্জ কহিল,—না।···

আহারাদি সারিয়া সাগর-বৌয়ের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া নিকুঞ্জ যাত্রা করিল—বারোয়ারি-তলার দিকে।

হাটতলায় হাট বসে নাই। আজ হাটের দিন নয়; তথাপি বেশ একটু ভিড় জমিয়াছে। তাকে দেখিয়া ভিড় ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

নিকুঞ্জ হাটতলা পার হইয়া অগ্রসর হইল। হাটতলার পর গ্রামের পাঠশালা। ছেলেরা সুর করিয়া কোরাশে নামতা আওড়াইতেছে!

দুদিকে দুটা পথ গিয়াছে। নিকুঞ্জ প্রশ্ন করিল,—বারোয়ারি-তলায় যাবো কোন্ দিকে ?

গুরু ও শিষ্যদল নিমেষের জন্য স্তম্ভিত। গুরু কহিলেন—সিধে পথ। সামনে।

নিকুঞ্জ চলিল। পাঠশালায় নামতা-গান বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ সাতটি ছেলে পথে বাহির হইল; নিকুঞ্জর সামনে আসিয়া কহিল,—যেখানে যাত্রার রাধিকা মারা গিয়েছিল—সেখানে যাবে বুঝি ?

নিকুঞ্জ কোনো কথা কহিল না; অগ্রসর হইয়া চলিল। ছেলের দল সঙ্গ ছাড়িল না। নিকুঞ্জ বুঝিল, ইহারা সঙ্গে গেলে চলিবে না! সব ফাঁশ্ হইয়া যাইবে। খুনী সরিবে! সাগর-বৌ বলিয়াছে, বিন্দে মিস্ত্রী! অমন একটা রোমান্স রচিয়াছে—এ খুন বিন্দে করিয়াছে! সে অনেক গল্প পড়িয়াছে, বরাবর দেখিয়াছে—খুনের অন্তরালে আছে নারীর ভালোবাসা! জেলশি! শুম্ভ-নিশুম্ভ, রাবণ, হেলেন অফ্ ট্রয়, মিসেস ডিক্রুজ, সনাতন লাহিড়ী···সর্ব্বত্র!

জগতের নিয়ম!

ছেলেদের পানে চাহিয়া সে লাঠি তুলিল—হুঙ্কার ছাড়িল। ছেলেরা ছুটিয়া পলাইল।

বারোয়ারি-তলা মিলিল। একটা চাষা চলিয়াছিল বলদ তাড়াইয়া। তাকে প্রশ্ন করিতে জায়গা মিলিল—যেখানে সেই খুন। সেখানে আসিয়া দেখে, কি ঘন জঙ্গল! কাঁটাওয়ালা মনসার ঝোপ্···পগার, খানা। মশা ভনভন করিতেছে।

নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিল। দেখে, ছেলেগুলা আসিয়া জুটিয়াছে। একজন আগাইয়া আসিল, কহিল,—শিবু গাঙ্গুলী কোথায় মরেছিল, দেখবেন? ঐ...ঐখানে।

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল।

নিকুঞ্জ কহিল—সে গাড়ী কোথায়?

ছেলেটা জবাব দিল,—সেই দু-চাকার গাড়ী?

—হ্যাঁ।

—পুলিশ নিয়ে গেছে।

—হুঁ।

নিকুঞ্জকে ফিরিতে হইল। এ ভিড়ে গোয়েন্দার তদারক চলে না। সাগরের দোকানে সে ফিরিল—সন্ধ্যার একটু আগে।

সাগর কহিল—ফিরে বৌয়ের কাছে শুনলুম, বেরিয়েচেন। ভাবলুম, যদি পথ হারিয়ে ফেলেন!

হাসিয়া নিকুঞ্জ কহিল,—না।

দোকানে ভিড় জমিয়াছে। নিকুঞ্জকে দেখিয়া এক জন বলিল,—যে টেক্স-খাজনা দিচ্ছি, তার জ্বালায় প্রাণ বেরিয়ে গেল! আবার কি নতুন খাজনা হবে বাবু?

আর একজন বলিল—তা নয়—তা নয়। বন কাটানো, পুকুর বুজোনোর হাঙ্গামা হবে।...না বাবু?

নিকুঞ্জ অবাক! সে কহিল—কাকেও এখন কিছু বলতে পারবো না। তবে তোমাদের ভয় নেই। সরকারের যে-কাজে আমি এসেচি, তাতে তোমাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই!

দোকান ও অন্দরের মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজায় করাঘাত হইল। সাগর উঠিয়া অন্দরে গেল; ফিরিয়া আসিয়া নিকুঞ্জর পানে চাহিয়া বলিল—যান ঠাকুর, ভিতরে যান।

নিকুঞ্জ বাঁচিল। ভিতর-বাড়ীতে আসিতে সাগর-বৌয়ের সঙ্গে দেখা। মোড়া পাতিয়া বৌ হাসিল, বলিল,—বসো বাবু। জলখাবার আনি। মুখ-হাত ধুতে হয়, ধোও—দাওয়ায় জল রেখেচি।

মুখ হাত ধুইয়া নিকুঞ্জ মোড়ায় বসিল। বৌ রেকাবিতে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। সাগর-বৌ কহিল,—সন্ধান মিললো?

নিকুঞ্জ কহিল,—না। যে ভিড় জমে উঠলো!

বৌ বলিল—খুব ভোরে যেয়ো। তখন লোক থাকে না। তা ছাড়া ওর আর তত্ত্ব নেবে কি? ঐ বিন্দেকে ধরে চালান দাও। সব কথা সে স্বীকার করবে।

নিকুঞ্জ কহিল—বিন্দের বৌয়ের কথা গাঁয়ের লোক পুলিশকে বলেছিল?

বৌ কহিল,—কে বলবে! হুঃ! এত বড় বুকের পাটা গাঁয়ে আছে কার?

নিকুঞ্জ কহিল—তুমি কি করে জানলে?

বৌ চোখ ঘুরাইয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমার চোখে ধূলো দেওয়া সহজ নয় বাবু। আমি এখানে এসে অবধি 'বাষ্টম হয়েচি। ঐ যে যাত্রা হয়েছিল—সে ছোঁড়া সেজেছিল রাধিকা। বিন্দের বৌয়ের মুখে কি সুখ্যেৎ রাধিকার! তাকে ভাল খাওয়ানো—তার জন্যে ভালো করে পাণ সেজে পাঠানো। মেয়ে-মহলে কারো জানতে বাকী রইলো না। তার পর বিন্দে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেতো—আর ঐ রাধিকা এসে বৌয়ের সঙ্গে বসে তাস পিটতো। কত লোক দেখেচে। ফিশির ফিশির কত কথা!

নিকুঞ্জ চুপ করিয়া রহিল। এ ঘটনাগুলা...? এগুলার সঙ্গে একটু সূত্র দিয়া বিন্দেকে জুতিতে পারিলেই ব্যস্... এত বড় রহস্যময় খুনের কিনারা হইয়া যায়!

সাগর-বৌ পরের দিন ভোরে ডাকিয়া দিল; চা তৈয়ার করিয়া খাওয়াইল। নিকুঞ্জ চা খাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভোরের সোনালি আলো মাখিয়া গ্রাম যেন হাসিয়া সারা! দু-একটা পাখী গান ধরিয়াছে। জানা পথ। নিকুঞ্জ আসিয়া অকুস্থলে পৌঁছিল।

পগার। চারিদিকে চাহিয়া নিকুঞ্জ লাফাইয়া পগারে নামিল। কাঁটায়, খোঁচায় জখম হইয়া গেল। তাহা হইলে কি হয়? যে কাজে আসিয়াছে...

গাছপালা ঠ্যাঙাইয়া, ঝোপ-কাঁটা ঠেলিয়া নিকুঞ্জ পাইল একখানা ভাঙ্গা বঁটী, আর ফাটা একটা টায়ার। তাহা লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পরে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার গা ছড়িয়া গিয়াছে। জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—সে যা মূর্ত্তি!

উপরে দাঁড়াইয়া ছিল কালিকার সেই পাঠশালার ছেলেগুলা! যেন বিরাট অক্ষৌহিণী!

একটা ছেলে বলিল,—ওগুলো ওর মধ্যে পেলেন?

নিকুঞ্জ কহিল,—এ বঁটী কার জানো?

ছেলেটি বলিল—ও তো বিন্দে মিস্ত্রীর খড়-কাটা বঁটী।

ঠিক।

জয়-গর্ব্বে নিকুঞ্জ বলিল,—থানা কোন্‌দিকে?

—আসুন। ছেলেটি আগে আগে চলিল; পিছনে নিকুঞ্জ।...

তেলেনার থানা বেশ উঁচু আটচালা। সামনে বেড়া-দেওয়া বাগান। বাগানে রাশীকৃত দোপাটি ফুটিয়াছে...

নিকুঞ্জ আসিয়া কহিল,—ইনস্পেক্টর বাবু কোথায়?

খাকী কোট-প্যান্ট-পরা একটি বাবু বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,—আমি ইন্‌স্পেক্টর। বলুন, কি দরকার?

নিকুঞ্জ কহিল,—আমি এসেচি সরকারী কাজে। চৌকিদার চাই। খুনী আসামী গ্রেফতার করবার জন্য।

খুনী আসামী! ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। নিকুঞ্জ কহিল,—যাত্রায় রাধিকা সেজেছিল, শিবু গাঙ্গুল। সে খুন হয়েছিল। সে খুনের তদারকে এসেচি। আসামী পেয়েচি—তাকে গ্রেফতার করতে হবে।

ইন্‌স্‌পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোত্থেকে আসচেন আপনি?

—কলকাতা।

—লালবাজারের সি আই ডি থেকে?

—না। শ্যামবাজারে আমার বাড়ী। আমি প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্‌।

ইন্‌স্পেক্টর তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া তাঁর ডায়েরি-খাতার দিকে চাহিলেন।

নিকুঞ্জ কহিল,—শুনবেন না আমার কথা?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ইনস্পেক্টর কহিলেন,—প্রমাণ?

নিকুঞ্জ কহিল,—বঁটী দেখলুম, টায়ার দেখলুম। নিয়ে এসেচি।

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—কার বঁটী?

—বিন্দের।

ইনস্পেক্টর কহিলেন,—না। কাল ছেলেগুলো এ-বঁটী নিয়ে পগারে জঙ্গল কাটছিল। আমার চৌকিদার গিয়ে তাড়া দিতে বঁটী ফেলে পালায়। একজনকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করি—কি করছিল ওখানে? তাতে জবাব দেয়, কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেচে—ওখানে যেতে চায় কিসের খোঁজ করতে; তাই জঙ্গল কাটছিলুম। আর ঐ টায়ার? ও টায়ার আমরা বিন্দের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলুম। কাঁটায় নেমে লাশ তুলতে পারিনি বলে ঐ টায়ার দিয়ে কায়দা করে লাশ তুলি! মড়ার ছোঁওয়া বলে বিন্দে ওটা ফিরিয়ে নেয় নি।

ইনস্‌পেক্টর উচ্চ হাস্য করিলেন; কহিলেন—শিবু খুন হয় নি। বাইসিক্‌লে চেপে যাচ্ছিল। খানা ছিল। তাড়ি খেয়ে নেশাও করেছিল। নেশার ঝোঁকে পড়ে যায়। সে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে পোষ্ট-মর্টেমে…

নিকুঞ্জ নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া পথে আসিল। পথে আসিতে ছেলের দল হো-হো হাস্যে যে-রব তুলিল, নিকুঞ্জর মনে হইল, সে-রবে আকাশের বিধাতা বুঝি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন! তাঁর ইঙ্গিত আর মিলিবে না!

হাটতলা পার হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, একটা জুয়ান লোক আসিয়া চোখ রাঙাইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তার পানে চাহিতে নিকুঞ্জর বুকখানা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—আমার নামে খুনের অপবাদ দেছ আমার গাঁয়ে এসে!

নিকুঞ্জ ভীত কম্পিত স্বরে কহিল—ত-ত-তুমি?

সে কহিল,—আমার নাম বিনোদ। তুমি বলেচো, আমি খুন করেচি শিবুকে? আমার বৌ ছিল তার সঙ্গে নষ্ট? পাজী বদমায়েশ্‌ কোথাকার!

কথার সঙ্গে সঙ্গে কিল চড় ঘুষি! নিকুঞ্জ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। একে দু'ঘণ্টা ঐ পগারের কাঁটায় দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে! তার পর টায়ার ঘাড়ে করিয়া থানা পর্য্যন্ত হাঁটিয়াছে! সে সবের উপর এখন…

পৃথিবী যেন টল্‌মল্‌ করিতেছিল! বিনোদ হুঙ্কার দিল,—ভাগ্যে শিবু আমার পরিবারের ভাই হয়। না হলে আমার পরিবারের নামে এ-কলঙ্কে আমি গাঁয়ে থাকতে পারতুম! ভদ্দর সেজে বাঁদরামি করবার আর জায়গা পাওনি? মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। হতভাগা, পাজী! আমি করেচি আমার নিজের সম্বন্ধীকে খুন! ছুঁচো কোথাকারের…

নিকুঞ্জকে বিন্দে প্রায় আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়া দিল। নিজেকে সম্বৃত করিয়া নিকুঞ্জ চাহিয়া দেখে, চারি দিকে মস্ত ভিড় জমিয়াছে!

একজন বলিল—সোজা চলে যাও গোবরডাঙ্গা ইষ্টি-শান। জোর পায়ে গেলে দুঘণ্টায় পৌছুতে পারবে। গিয়ে রেলে চড়ো। ও-মুখ নিয়ে সাগরের ওখানে আর ফিরো না।

প্রজাপতির রঙ্গ

ভুজঙ্গ গিয়াছিল পূর্ণ থিয়েটারে—অল্ কোয়ায়েট্ ছবি দেখিতে।

শো শেষ হইলে পথে আসিয়া বাসে চড়িবে, পিছনে কে ডাকিল,—ভুজঙ্গ না কি!

ফিরিয়া ভুজঙ্গ দেখে, কার্ত্তিক।

ফিট ফাট বেশ; বাস্ হইতে কার্ত্তিক সভ্য নামিয়াছে!

ভুজঙ্গ কহিল,—কোথায় আছো? কি করচো?

কার্ত্তিক কহিল—সে মস্ত কাহিনী। এসো না সঙ্গে··· বেশী দূরে নয়। হরিশ পার্কে।

ভুজঙ্গ কহিল,—চলো···

বহুদিন পরে দেখা। দুজনে একসঙ্গে সেণ্ট জেভিয়াসে বি-এ পড়িত; ফেল হয়। চার বৎসরের কথা। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি।

হরিশ পার্কে আসিয়া একটা বেঞ্চে দুজনে বসিল। কার্ত্তিক কহিল,—কি করচো?

ভুজঙ্গ কহিল—আপাততঃ দুটো টুইশনি।

—কোথায় আছো?

ভুজঙ্গ কহিল—বৌবাজারে এক মেশে। তুমি?

কার্ত্তিক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—জানো তো, লেখার সখ্ আছে। গল্প লিখি।

ভুজঙ্গ কহিল,—তাতে এত পয়সা উপার্জ্জন করো! পোষাক বেশ ফিট্‌ফাট্ দেখছি···

কার্ত্তিক কহিল,—হ্যাঁ। এর মধ্যে মস্ত কাহিনী আছে।

ভুজঙ্গ কহিল,—কি?

একটু হিংসা হইতেছিল। ফেল করা ইস্তক চাকরির বাজার চুঁড়িয়া বেড়াইয়াছে! আজ ইনসিওরেন্স অফিস, কাল ছাপাখানা, পরশু কর্পোরেশনে ধাঙড় খাটানোর কাজ—কোনটা টেঁকসই নয়। পরের চাকরিতে ঠেকা দিয়া সময় কাটানো! বিরক্ত হইয়া দুটা টুইশনি লইয়া পড়িয়া আছে; চাকরির চেষ্টায় ঘোরা ছাড়িয়া দিয়াছে। সময়ে-সময়ে মন পাথরের মত ভারী হইয়া ওঠে!

ভবিষ্যতের কত আশা মনে গড়িত। ছোট সংসার—রূপসী স্ত্রী! গৃহের কোণ! হায়রে, সবই মরীচিকায় মিলাইতে চলিয়াছে!

কার্ত্তিক কহিল,—গল্প লেখার স্রোতে জীবন ভাসিয়ে চলে ছিলুম—আলাপ হলো মন্দাকিনী দেবীর সঙ্গে। মাসিকে কবিতা লেখেন এই মন্দাকিনী দেবী। বিধবা। হাতে বেশ পয়সা আছে; মাথায় বুদ্ধি আরো বেশী! নিজের কোথাও কেউ আত্মীয় নেই। বকুলবাগানের ওদিকে দোতলা একখানি বাড়ী—ব্যাঙ্ক প্যাটার্ণের। নিজে দোতলায় দুখানা ঘর নিয়ে আছেন, বাকীগুলোয় বোর্ডিং মেস্ খুলেচেন। সরকার আছে। আয়ের জন্য ভাবতে হয় না। আমি সে বাড়ীর একতলার কামরায় একখানি তক্তাপোষ দখল করে আছি। ভাড়া দিতুম; এখন ভাড়া মাপ হয়েচে। মানে, বোর্ডিংয়ের কাজকর্ম্ম কতক দেখি। মন্দাকিনী আমার গল্পগুলোর তারিফ করেন।

ভুজঙ্গ কহিল,—তাহলে বেশ আরামে আছো! গল্প লেখবার সুবিধাও খুব?

কার্ত্তিক কহিল—সম্প্রতি একটু অসুবিধা ঘটেচে!

—কি রকম?

কার্ত্তিক কহিল—মন্দাকিনী দেবী এ-যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন। কোনো দিকে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই। পুরুষকে ভয়ের চক্ষে বা সন্দেহের চক্ষে দেখেন না। তর্ক-বিবাদ পুরুষের সঙ্গে করেন সমানে গলার জোরে—অর্থাৎ নারী হয়েও আচরণে তিনি রীতিমত পুরুষ!

ভুজঙ্গ বিস্ময়-ভরা স্বরে কহিল,—এবং তিনি কবিতাও লেখেন?

কার্ত্তিক কহিল,—লিরিক কবিতা। মহাকাব্য নয়।

—আশ্চর্য্য!

কার্ত্তিক কহিল—তোমার তাড়া আছে?

—কেন?

কার্ত্তিক কহিল—তাহলে আমার ওখানে নিয়ে যেতুম।

ভুজঙ্গ বলিল—তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য?

কার্ত্তিক কহিল—না। তিনি এখন এখানে নেই; গেছেন শিউড়িতে। একটা এগজিবিশন হচ্ছে। তিনি এক বেনারশী শাড়ীর ফার্ম্মের প্রতিনিধি হয়ে গেছেন।

—ব্যবসা-বুদ্ধিতে বেশ দড়?

—নিশ্চয়।

—তোমার মুস্কিল তবে কোন্‌খানে!

কার্ত্তিক কহিল— আমার প্রতি দরদ একটু বেশী। মানে, তিনি বিবাহ করতে চান এবং আমাকে···

ভুজঙ্গর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে কহিল—রোমান্স! তোমার আপত্তি কিসের? বিধবা বলে?

কার্ত্তিক কহিল—তা নয়। অমন পুরুষালি চালের মেয়েকে বিবাহ! তা ছাড়া টাকা-পয়সার মালিক! স্ত্রীর কাছে সারা জীবন মাথা নীচু করে থাকতে হবে। আছি ভালো, সন্দেহ নেই! মনের খেয়ালে লিখি! খাওয়া-পরার জন্য ভাবতে হয় না—বাড়ীভাড়ার দুশ্চিন্তায় পাগল হতে হয় না! কিন্তু…

এমন আরামেও কিন্তু! ষ্টুপিড। সে কহিল—কিন্তুটা কিসের?

কার্ত্তিক কহিল,—আসবে বাসায়? খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রিটা না হয় কাটিয়ে গেলে!

ভুজঙ্গর কৌতূহল হইতেছিল। ব্যাপারটা রহস্যময়—'ষ্টাডি' করিবার মত!

সে কহিল,—চলো।

কার্ত্তিকের সঙ্গে ভুজঙ্গ আসিল, বকুল বাগানের বাসায়।

বাসা-বাড়ী। পিছনে অনেকখানি কম্পাউণ্ড। ঘরগুলা বড়; বিজলী বাতির আলোয় ভরপুর।

কার্ত্তিক কহিল,—স্পষ্ট আমাকে এমন কথা বলেন নি যে বিবাহ করতে হবে। তবে স্বামীর কথা প্রায় তোলেন। বলেন, মনে কত সাধ ছিল,কত আশা। আমার সঙ্গে এসব কথা কইতে সঙ্কোচ নেই। আমার উপর অসীম যত্ন,—ভোরে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে এসে নিজের হাতে চায়ের পেয়ালা ধরে দেন। একটু অসুখ হলে ডাক্তার ডাকান। সেদিন শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়েছিল গরম জলের বোতল ধরে সেঁক দিলেন। সর্দ্দি হলে চায়ে আদার রসটুকু নিজের হাতে মিশিয়ে দেন।

ভুজঙ্গ যত শুনিতেছিল, ততই তার তাক লাগিতেছিল! সে কহিল—এ যে গল্পের রাজকন্যা হে! তুমি নেহাৎ গর্দ্দভ।

কার্ত্তিক কহিল—বেপরোয়া নর-নারীর কল্পিত কাহিনী গল্পে যতই লিখি ভাই, ঘরের স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার মত আজো সেকেলে রয়ে গেছে—তা স্পষ্ট বলবো! ইনি বয়সে তরুণী—গল্প পড়ে আমার সঙ্গে পরিচয়। তার উপর যেভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন,—বিবাহিতা স্ত্রীর অতখানি স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা বরদাস্ত করা দায় হবে। গল্প লিখলেও মন এখনো সেই আদিম সংস্কারে জড়িত আছে। কে জানে, যে-নারী এ রকম গায়ে-পড়া, তার জীবনে হয়তো ইতিহাসও আছে। ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকা নিয়ে নাট্য রচনা চলে—ঐতিহাসিক স্ত্রী নিয়ে সংসার রচনা চলে না। এই যে খুশী হবামাত্র শিউড়ী গেলেন—একা! স্বামী হলে এ স্বাধীনতা আমি কি সহ্য করতে পারবো?

ভুজঙ্গ কহিল—বিয়ে তো হয়নি, শুধু শুধু এতখানি দুর্ভাবনাই বা কেন? নোটিশ দিয়ে বিদায় নিতে পারো!

কার্ত্তিক কহিল—ভদ্রতায় বাধবে! এত যত্ন, এমন সেবা! চক্ষুলজ্জা তো আছে!

ভুজঙ্গ কহিল—তা আমায় ধরে আনলে কেন? আমি কি করবো এ ব্যাপারে?

কার্ত্তিক কহিল,—তুমি যদি ওর স্বামি-পরিচয়ে এসে দেখা দাও!

ভুজঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; কহিল,—বলো কি! জাল প্রতাপচাঁদ। তারপর ঐ ভাওয়াল কেশ্ চলছে! না ভাই, জেলের ভয় আছে। না খেতে পেলেও জেল শিরোধার্য্য করবার মত সাহস আমার নেই। তাহলে কোন্‌দিন নন্‌কোতে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতে পারতুম!

কার্ত্তিক কহিল,—ওঁর স্বামীর পরিচয় আগে শোনো—আমাকে তো কোনো কথা বলতে বাকি রাখেন নি। মানে, ওঁর বিবাহ হয় দশ বৎসর বয়সে। স্বামী ছিলেন চাকরী নিয়ে কোন্ দূর-বিদেশে—অমনি স্বামীর বুড়ো মা জেদ ধরলেন, বিয়ে করে তবে যা! তাতেই মায়ের কথায় স্বামী বিয়ে করেন। বিয়ে করে আসামে যান—আর ফেরেন নি। সেখানে ভূমিকম্পে বাড়ী চাপা পড়ে মরে গেছেন। বুড়ো শাশুড়ী ছেলের শোক সইতে না পেরে ছেলের পথে পথিক হয়েছেন। দুঃখের কাহিনী!

কার্ত্তিক সবিস্তারে বহু কথা বলিল, বলিল, মন্দাকিনী দেবী খুব ফরোয়ার্ড। গল্পে উপন্যাসে বাঙালীর মেয়েকে ফরোয়ার্ড দেখিলে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে মন ভরিয়া ওঠে, কিন্তু ঘর-সংসারে ঠিক একেবারে নিজের পাশটিতে নারীকে সে রকম ফরোয়ার্ড দেখিলে তার আতঙ্ক হয়। সুতরাং ভুজঙ্গ যদি মন্দাকিনী দেবীর মৃত স্বামী গোকুল চাটুয্যের বেশে আসিয়া দেখা দেয়, ধরা পড়িবার কোনো ভয় নাই। স্বামীকে সেই বিবাহের সময় চকিতের জন্য মন্দাকিনী দেবী দেখিয়াছেন! তার পর এই সুদীর্ঘ বিরহ! সুতরাং…

এ কাজ করিলে ভুজঙ্গকে সে নগদ একশোখানি টাকা গণিয়া দিবে, তাহাও বলিল। সেও তাহা হইলে মুক্তি পায়। তারপর ভুজঙ্গর পলায়ন আদৌ অসম্ভব হইবে না। মন্দাকিনী দেবীর বুকখানা শূন্যতায় আকুল হইয়া আছে স্বামীর জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

কার্ত্তিক কহিল—দেখবে এসো, ওঁর ঘরে ওঁর স্বামীর ছবি।

ভুজঙ্গকে কার্ত্তিক দোতলায় মন্দাকিনী দেবীর ঘরে টানিয়া আনিল।

ঘরখানি সজ্জিত। বিধবা! বাঙালীর ঘরের তরুণী বিধবা! এতখানি বিলাসের মধ্যে···

ভুজঙ্গর আজন্মের সংস্কার লজ্জায় রী-রী করিয়া উঠিল। সে কহিল,—চাবি তোমার হাতে দিয়ে গেছেন? এমন বিশ্বাস···

কার্তিক কহিল,—সে আর বিচিত্র কি, বলো! জীবন-টাকেই আমার হাতে বিশ্বাস করে দিতে প্রস্তুত···

ভুজঙ্গ ক্ষণেক চুপ করিয়া কি ভাবিল। পরে কহিল, কিন্তু—তুমি বলচো, স্পষ্ট তোমায় সে কথা জানান নি! তোমার এ অনুমান।

কার্তিক বলিল, কখনও কোন নারীর প্রেমে পড়েচো? হুঁঃ! আমি ঐ নিয়ে কারবার করচি! এদিককার ব্যাপার আমি বুঝি!

ভুজঙ্গর কৌতূহল বাড়িতেছিল। সে কহিল,—বেশ, আমি যেন স্বামী গোকুল চাটুয্যে হয়ে এলুম। তারপর প্রমাণস্বরূপ কাহিনী তো চাই।

কার্তিক কহিল—কদিন বা দেখা! ফুলশয্যার পরের দিনই গোকুল চাটুয্যে আসাম যাত্রা করেন। ফুলশয্যার রাত্রের কথা আমি জানি—আমায় বলেচেন।

সাশ্চর্যে ভুজঙ্গ কহিল, বলো কি?

—তাই। সে কাহিনী তোমায় বলবো'খন!

—ক'বছর আগে বিবাহ হয়েছিল?

—দশ বৎসর আগে। শ্রাবণ মাসের দশ তারিখে। সেদিন ছিল শনিবার।

ভুজঙ্গ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

কার্তিক কহিল—একবার শুধু সেজে আসা। পরের দিন সরে পড়তে পারো। অছিলের জন্য ভাবতে হবে না। বলবে, জিনিষপত্র এক বন্ধুর বাড়ী ফেলে এসেচি—নিয়ে আসি। ব্যস। যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? একটু গুছিয়ে বানিয়ে গল্প বলো! গল্প আমি বানিয়ে দেবোখন।··একবার তুমি লেগে যাও ভাই। না হয় মজার জন্য। তারপর এই নিয়ে একখানা মস্ত উপন্যাস লিখে ফেলবো। তাতে যে টাকা পাবো—অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তোমার!

কার্তিক নাছোড়বান্দা! সে বলিল—আমি এমনি একটা মতলব আঁটছিলুম। বিশ্বাস করতে পারি, এমনি বন্ধু শুধু খুঁজে পাচ্ছিলুম না! লক্ষ্মী ভাই···

আতিথ্যে সে রাত্রিটা ভালোই কাটিল। ভুজঙ্গ ঘুমাইতে পারিল না। এ রহস্য তাকে অভিভূত করিয়া দিল!··· এমন কথাও মনে হইল, স্বামী সাজিয়া না ফিরিয়া বিবাহের পাত্র-বেশে আসিয়া যদি উদয় হয়? চাকরীর উমেদারী করিয়া শুধু নৈরাশ্য সার হইয়াছে! বিধবা-বিবাহ? প্রাণে বাঁচিতে পারিলে বিধবা-বিবাহে আসিয়া যায় না! এত পয়সা-কড়ি আছে···

তবে মাথা নীচু করিয়া থাকা!···আরে মনিবের কাছে চাকরি রাখিতে মাথা বুঝি উঁচু থাকে? এ হইবে স্ত্রী! তার কাছে মাথা নীচু করায় কি ক্ষতি? স্ত্রী··· অর্দ্ধাঙ্গিনী···কথায় বলে,—এক-প্রাণ, এক-মন!

সকালে কার্তিকের কাছে কথাটা পাড়িল। কার্তিক কহিল,—না, না, না! তরুণী নারী···প্রেমের দাম বোঝে! স্বামী পাওয়া লক্ষ্য হলে বিবাহ কি এতদিন পড়ে থাকে?

ভুজঙ্গ কহিল—তাহলে ভেবে দুদিন পরে বলবো, ভাই!

কার্তিক কহিল—বেশ! তোমার ঠিকানা?

কৌতুকের ব্যাপার! কৌতূহলও খুব!

ভুজঙ্গ ঠিকানা লিখিয়া দিল।

কার্তিক কহিল—আগাম এই পঞ্চাশ টাকা নাও।

ভুজঙ্গ টাকা লইল। অভাব বড় ভীষণ···

এ কাজ। ভিক্ষা নয়! দোষ কি?

কার্তিক কহিল,—কাল মন্দাকিনী দেবী আসবেন। তুমি কবে উদয় হচ্চো? পরশু?

ভুজঙ্গ কহিল,—বেশ!

সন্ধ্যার সময় মন্দাকিনী বসিয়া হিসাব বলিতেছিল, কার্তিক তাহা খাতায় লিখিতেছিল। বোর্ডিংয়ের ভৃত্য আসিয়া বলিল—একটি বাবু এসেচেন।

কার্তিক কহিল—কে?

গঙ্গা বলিল—নাম বললে না। সে বললে, মন্দাকিনী দেবীর বাড়ী এটা? আমি বললুম, হ্যাঁ। শুনে আমায় বললে, তাঁকে খবর দাও, বলো, তাঁর একজন আত্মীয় এসেচে। দেখা করতে চায়।

—আত্মীয়। মন্দাকিনী দেবীর চোখে বিস্ময়।

কার্তিক কহিল—দেখবো?

মন্দাকিনী কহিলেন—ছাখো।

কার্তিক নীচে নামিয়া গেল।

তারপর দোতলায় আসিল—মুখে-চোখে একরাশ বিস্ময় ভরিয়া।

মন্দাকিনী কহিল,—কে?

কার্তিক কহিল—নাম বললে, গোকুল চাটুয্যে।

মন্দাকিনীর দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কোন কথা কহিল না।

কার্তিক বলিল—বললে, আমি মন্দাকিনী দেবীর স্বামী।

মন্দাকিনী কহিল—এঁ্যা!

তার দুই চোখ এমন হইল, যেন ভূত দেখিয়াছে! তেমনি বিস্ময়-স্তম্ভিত দুই চোখের দৃষ্টি!···

তারপর মন্দাকিনী কার্তিককে বলিল গোকুল

চাটুয্যেকে তার কাছে আনিতে। কার্ত্তিক কি করিয়া তাকে আনিয়া দাঁড় করাইল এবং গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল কি ভাবে—সেগুলা কালির লেখার চেয়ে তুলির লেখাতেই ফোটে ভালো! ত্রিমূর্ত্তির সে ছবি আঁকিয়া দেখাইবার; লিখিয়া দেখাইবার কালি ফাউণ্টেন পেনে কুলায় না।··

গোকুল ডাকিল,—মন্দাকিনী...

—তুমি! বলিয়া মন্দাকিনীর মূর্চ্ছা!

সেই সঙ্গে এ-দৃশ্যের উপর পটক্ষেপ!

দশ বৎসর পরে স্বামি-স্ত্রীর অপ্রত্যাশিতভাবে মিলন! পৌরাণিক যুগে দু'একটা মাত্র এমন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। তারপর হইতে বিধাতা তাঁর আইনগুলাকে টাইট করিয়া আঁটিয়া দিয়াছেন! তাই ধরণীর বুকে এমন ঘটনা আর ঘটে নাই।

পাঁচদিন পরে অসহ্য কৌতূহল বুকে লইয়া কার্ত্তিক আসিয়া হাজির হইল—বৌবাজার ষ্ট্রীটে ভুজঙ্গর মেশে।

মেশের ম্যানেজার বলিল,—আজ ক'দিন তাঁর দেখা নেই। সতেরো টাকা সাত আনা বাকী পাওনা ছিল। আজ সকালে এসে পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে কাপড় বিছানা নিয়ে চলে গেছেন।

—কোথায় গেছেন—জানেন?

ম্যানেজার কহিল,—বললেন, বিয়ে করচেন। বকুল-বাগানে বাড়ী নেওয়া হয়েচে...

বিবাহ! বকুলবাগান।···

কার্ত্তিক দাঁড়াইল না; বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া প্রথম বাসখানায় চাপিয়া বসিল এবং সেখান হইতে সোজা আসিল ভবানীপুর, বকুলবাগান!

সেই গলি। সেই বাড়ী।

পা কাঁপিল। কি বলিয়া ও-বাড়ীতে আবার গিয়া মাথা গলাইবে?

মোড়ে সে দাঁড়াইয়া রহিল। মুদিকে বলিয়া চুপি চুপি ডাকাইয়া পাঠাইবে?···

ডাকাইতে হইল না। ভুজঙ্গ আসিতেছিল; ট্রাম হইতে এই দিকে। তার হাতে মস্ত একটা বাণ্ডিল।

সে মলিন বেশ নাই! সেইটাই সব প্রথম কার্ত্তিকের নজরে পড়িল।

ভুজঙ্গ কহিল—হ্যালো কার্ত্তিক···

কার্ত্তিক কহিল—খপর কি?

ভুজঙ্গ কহিল—As luck would have it...

কার্ত্তিক কহিল—বিবাহ করচো?

ভুজঙ্গ কহিল,—হ্যাঁ।

মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি! এমন স্পষ্ট যে, পথের গ্যাস-বাতিতেও নজরে বাধিল না।

কার্ত্তিক কহিল—তুমি নিরুদ্দেশ স্বামী! অথচ তোমায় বিবাহ করবে! তার মানে?

ভুজঙ্গ কহিল,—তুমি যা অনুমান করেছিলে···

বিস্ময়ে কার্ত্তিকের বাক্য বিলুপ্ত হইল।

ভুজঙ্গ কহিল,---বিধবা নন্, কুমারী। গোকুল চাটুয্যেকে জানেনও না। বাপের পয়সা ছিল। লেখাপড়া শিখেচেন। বাপের পয়সার সংবাদ পেয়ে কতক-গুলো হতভাগা পাত্র দোবে এসে ভিড় জমিয়ে-ছিল। সকলকে তাড়ালেন। তখন সাধ ছিল, খুব লেখাপড়া শিখবেন।···তারপর বাবা গেলেন মারা। এ বোর্ডিং হাউস নিজের আইডিয়া নয়। বাপের ছিল। সেটা ছাড়লেন না, চালিয়ে আসচেন। বোর্ডিং আগে ছিল শাঁখারিটোলায়? এই বাড়ীতে পরে আসে। এ বাড়ী কিনেছিলেন। এতে ভাড়াটে ছিল। ভাড়া আদায় হতো না তাই এই বাড়ীতে উঠে আসেন। কুমারী বলে পরিচয় দিলে ভদ্র বাসিন্দার অভাব হতো! কিম্বা কতকগুলো ফাজিল কবি, গল্প-লিখিয়ে এসে ভিড় করতো, তাই বিধবা-পরিচয়ে আত্মগোপন।

কার্ত্তিক যেন স্বপ্ন-কাহিনী শুনিতেছিল! কহিল,—সে ফটো?

হাসিয়া ভুজঙ্গ কহিল,—বাজে। নিলেমে কতকগুলো ফার্ণিচারের সঙ্গে এক লাটে কেনা। ঐটিকে বর্ম্ম-রূপে খাড়া করে'ছলেন।

কার্ত্তিক কহিল,—তোমার মিথ্যা পরিচয় তখনি ধরে ফেললেন?

ভুজঙ্গ কহিল—She has a heart. মূর্চ্ছাটা কৃত্রিম! তুমি তো সরে পড়লে! উনি উঠে বললেন, আমার স্বামী তুমি? আমি বললুম, হ্যাঁ। উনি বললেন,—কোনো জন্মে স্বামী নও। তুমি জাল। কস্মিনকালে আমার বিবাহ হয়নি। বিবাহ কে দেবে, এমন আত্মীয় আমার ছিল না।···তোমাকে পুলিসে দেবো! আমি ভয়ে তখন পদানত হই। নিজের দুর্দ্দশার কথা জানিয়ে ক্ষমা চাই। ওঁর মমতা জাগলো! আমায় বললেন, সংসারে কে আছে? আমি বললুম, এক বিধবা মা আর বোন। বললেন, তোমার নাম? আমি বললুম, ভুজঙ্গ ঘোষাল! বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ! বেশ! তারপর বিবাহের প্রস্তাব।

প্রচণ্ড নিশ্বাস চাপা দিয়া কার্ত্তিক কহিল,—Luckই বটে!

ভুজঙ্গ তাকে পাকড়াইয়া ধরিল, কহিল—ফাঁকে এসো। তোমার সেই টাকা কটা···

কার্ত্তিক কহিল,—মাপ করো। সে টাকা মন্দাকিনী দেবীর।

ভুজঙ্গ কহিল,—সে টাকা আমি নেবো না। তখন আমার অভাব ছিল। এখন নেই।

ভুজঙ্গ ছাড়িল না ; কার্ত্তিককে ধরিল।···

কার্ত্তিক কহিল,—আমার উপর চটেছেন ?

ভুজঙ্গ কহিল,—তোমার কথা শুধু একদিন উঠেছিল। তুমি নাকি ওঁকে একখানি প্রণয়-পত্র লিখেছিলে···

ওঁকে! প্রণয়-পত্র···!

কার্ত্তিক যেন আকাশ হইতে পড়িল।

ভুজঙ্গ কহিল,—হ্যাঁ। স্পষ্ট নয়। একটু অস্পষ্ট রকম। মানে, বিধবা ল্যাণ্ডলেডি! গল্প লেখার আর্ট জানা আছে। আমাকে তাই বলছিলেন, যেন গল্পের কাপির ছেঁড়া পাতার মত! তাতে লেখা ছিল,—আর কতদিন ধ্যান করবো দেবী? আমার সকল কামনার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আর কত দগ্ধ করবে? উনি তাই আভাসে জানিয়েছিলেন, স্বামীর কথা ওঁর আগাগোড়া বানানো গল্প। সেই গল্প শুনেই নাকি তুমি চিট্ হয়ে যাও! সেই জন্যই তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়িয়ে বোর্ড এ্যাণ্ড লজিং ফ্রী করে দেন। বলছিলেন, হয়তো বিবাহ করতেন। শুধু ঐ গল্প লেখো বলেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। লেখকদের উপর মতটা ভারী সেকেলে রকম। বলেন, বেচারী মাষ্টার-গুলো আর যাই হোক দুর্বৃত্ত হয় না—পোষ মানে। লেখকগুলোর মনের নাকি অন্ত পাওয়া যায় না!

বিবরণ শুনিয়া কার্ত্তিক কহিল—না ভাই, ছাড়ো।

ভুজঙ্গ কহিল,—তোমার টাকা আমি রাখবো না।

কার্ত্তিক কহিল—সে না হয় আর একদিন আসবো—দিয়ো।

কার্ত্তিক মিনতি করিল ; ভুজঙ্গ কহিল,—আচ্ছা···

ভুজঙ্গ উঠিয়া তেতলায় গেল। মন্দাকিনী তখন পুরোহিতের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

মন্দাকিনী কহিল—কি রকম বেনারশী জোড় আনলে, দেখি।

ভুজঙ্গ কহিল—জোড় তো বেনারশী নয়। গরদ। তবে শাড়ী এনেচি···বেনারশী।···তোমার জন্য।

—সে আবার কে আনতে বলেছিল ?

ভুজঙ্গ কহিল—বা রে, আমি হবো স্বামী! স্ত্রীর জন্য দরদ করবো না? বেনারশী পরবে তুমি। একটা রাত্রির জন্য আমার বেনারশী জোড়ে কি হবে? মিছে পয়সা খরচ···

—ইস! তবু যদি নিজের রোজগারের পয়সা হতো।

—তোমার পয়সা এখন আমারি পয়সা···

পুরোহিত কহিলেন—তা তো বটেই বাবুজী···

সন্ধ্যার পর মোটা খাতা বাঁধিয়া কার্ত্তিক ওদিকে উপন্যাস ফাঁদিয়া ছিল। উপন্যাসের নাম হইবে—স্ত্রী-চরিত্র! সে স্থির করিয়াছে, সমস্ত নারীজাতটাকে সে উপন্যাসে এমন কালো করিয়া আঁকিবে, যে সে-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে···

কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা! বর্ত্তমানে সে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

পল্লী-দর্শন

প্রমথ ঘোষাল কলিকাতায় থাকে। বি-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্রাম-কামনায় হাটুবায় আসিয়াছিল দিদির কাছে। হাটুবায় দিদির শ্বশুর-বাড়ী। ভগ্নীপতি পশ্চিমে চাকরী করে; আমের সময় ছেলেমেয়েগুলা গাছের আম খাইয়া বাঁচিবে, তা ছাড়া গ্রীষ্মের ছুটী হইয়াছে—এমনি নানা কারণে হাটুবায় আসিয়া দিদি এই ক'মাস এখানে কাটাইয়া যায়।

বি-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমথর তরুণ মন কাব্য-লোকের পথে বিচরণ করিত. একালের পাঠক-পাঠিকার কাছে বাহুল্য-বোধ হইলেও সে-কথাটুকু বলিয়া না রাখিলে প্রমথর পরিচয়টুকুর পূর্ণ-বিকাশ ঘটিবে না—সেজন্য বিশেষ করিয়া এ-কথাটুকু বলিয়া রাখিতেছি।

প্রথম দিনে বৈকালের দিকে গ্রাম ছাড়িয়া মেঠো পথ ধরিয়া প্রমথ বহুদূর ঘুরিয়া আসিল। পথের বৈচিত্র্য তাকে রীতিমত মুগ্ধ করিল। কাব্য-রসের রসিক বলিয়া মনে গর্ব্ব আছে—কাজেই মুগ্ধ হওয়ায় বিস্ময়ের কিছু নাই!

গৃহে ফিরিয়া সে ছাদে উঠিল। ছাদে মাদুর পাতা। শুইয়া আকাশের পানে সে চাহিয়া রহিল। আকাশের এককোণে ফালি চাঁদ। ছোট আলিশার ওধারে গাছের শ্রেণী, বাতাসের দোলা পাইয়া আমোদে মাতিয়াছে—প্রমথর ভারী ভালো লাগিতেছিল। মনে হইতেছিল, তার চিত্ত-আকাশেও ভাবের অজানা দোলায় যেন কোন্ কিশোরীর আঁচল উড়িতেছে—তার মুখখানা যেন ধরা পড়ে, পড়ে, পড়ে না!

দিদি ছাদে আসিল, আসিয়া বলিল—বেড়িয়ে এলি?

প্রমথ কহিল—হ্যাঁ।

—পাড়া-গাঁ ভালো লাগলো?

প্রমথ কহিল—চমৎকার!

দিদি কহিল—রাত্রে মশার উৎপাত, এই যা কষ্ট। না হলে আমিও দু'মাসের জন্য এখানে এসে যেন বর্ত্তে যাই···

প্রমথ এ-কথার জবাব দিল না। আকাশের বুকে কতকগুলা টুকরা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে! চাঁদকে কখনো ঢাকিয়া দেয়—আবার কোন্ ফাঁকে চাঁদ তাদের গ্রাস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে! কল্পলোকের কিশোরীর মুখচন্দ্রও তেমনি থাকিয়া থাকিয়া যেন চোখের সামনে আভাসে উদয় হয়, আবার পরক্ষণে আবছায়ার অস্পষ্টতায় ঢাকিয়া যায়!

প্রমথ ডাকিল,—দিদি···

দিদি কহিল—কেন?

প্রমথ একটা নিশ্বাস ফেলিল। যে কথা মনে জাগিতেছিল, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দিদির কাছে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়! সে কহিল,—রবিবাবু বোধ হয় এমনি গ্রামে বসেই সেই গান লিখেছিলেন—

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটীর পথ
আমার মন ভুলালো রে!

সত্যি দিদি, বহুদূর মাঠের শেষে সূর্য্যি অস্ত যাচ্ছিল; সারা আকাশ লালে লাল—পথের মাটী অবধি রাঙা হয়ে উঠেচে। সে যা দেখতে! আহা!

দিদি কহিল—অত জানিনে বাপু। তবে এখানে বেশ ফাঁকা ফর্দ্দা··· তোদের কলকাতা আমার সত্যি ভালো লাগে না! বাড়ীর গায়ে বাড়ী—ঠাশাঠাশি, ঘেঁষাঘেঁষি···যেন বুক চেপে ধরে। হাওয়া নেই, খালি ধুলো আর ধোঁওয়া···

প্রমথ কহিল—যা বলেচো!···

ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া প্রমথর আর কাজ ছিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে স্বপ্নগুলা বুকের উপর কত ছায়া-ছবি আঁকিয়া চলে! ছায়া-শ্যামল পথে তরুণী পল্লী-রমণীদের কলস কাঁখে জল আনিতে যাওয়া···মাটীর বুকে পায়ের রেখা···নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমথ ভাবে, যাঁহা যাঁহা কমল চরণ ফেলি যাওয়ত···

একটা কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিয়াছে—

আমার মনের লক্ষযুগের প্রিয়া
যায় এ পথে, কাঁখে কলস নিয়া।
জল সে বলে, ছল-ছল সুরে—
কোথায় বঁধু, কোথায় আছে দূরে?

তার উপর দিদির এখানে কবেকার একখানা পুরনো ছেঁড়া মাসিক পত্রে সে একটা গল্প পড়িতেছিল,—গল্পের নায়ক তার মত এগজামিন দিয়া পল্লীর বুকে বেড়াইতে গিয়াছিল। এক পুকুর-ঘাটে দুপুরে দেখা কিশোরী নায়িকার সঙ্গে। নায়িকা একরাশ বাসন মাজিয়া ঘাট ছাড়িয়া উপরে আসিতে পিছল-ধাপে পড়িয়া যায়—নায়ক গিয়া তাকে তোলে! তার পর নায়িকার সঙ্গে ঘাটের ধারে একটা বকুল গাছের তলায় নিত্য দেখা! প্রেম যখন প্রাণের বাঁধ মানিয়া আর আটক থাকিতে চায় না, তখন একদিন মুখ ফুটিয়া প্রাণের কামনা প্রকাশ করিতে

কিশোরী নায়িকা বলিল,—সে বিধবা! নায়ক কহিল—সামনে এই দীর্ঘ জীবন! একটা স্মৃতি বহিয়া সে-জীবন বহিয়া বেড়ানো··?

নায়িকা বলিল—স্বামীকে শুধু বিবাহের রাত্রে দেখিয়াছিল, শুভদৃষ্টির সময়···পরের দিনই স্বামী মারা যায়!

নায়ক বলিল – তবে? তবে?

নায়িকা বলে,—না।

নায়ক বলে,—দিকে দিকে এমন মাধুরী! ঐ পানা পুকুর, ঐ বাঁশবন, ঐ ঝিল্লীর সুর···তুমি শুধু নিশ্বাস ফেলিবে?

নায়িকা বলিল,—এই দু'দিনের মধু-স্মৃতি—সোনার রেখায় বুকের পটে আঁকিয়া রাখিব!

নায়িকার চোখে জল—নায়িকা কলস-কাখে চলিয়া গেল। নায়ক দাঁড়াইয়া রহিল—যতক্ষণ নায়িকাকে দেখা যায়! তার পর নায়িকার চরণ রেখায় বুক দিয়া পড়িয়া রহিল!

গল্প এইখানে শেষ। তবু বুঝিতে কাহারো বাকী থাকে না, দুটা বুকে কি মরুভূমি রচিয়া রহিল।

বুককে এমনি মরুভূমি করিয়া তুলিতে সেও কি পারে না? তার ভাগ্যেও তেমনি কোনো জীবন্ত কিশোরী যদি······

দিদি আসিয়া বলিল,—আজ আমার এক ভাশুরের বাড়ী রাত্রে নেমন্তন্ন···যাবি তো? তোকেও যেতে বলে গেছে অনেক করে। তুই তখন বেরিয়েছিলি···তাই দেখা হয়নি।

নিমন্ত্রণ! প্রমথ কহিল,—না দিদি, কাকেও চিনি না, জানি না, গিয়ে পুতুলের মত বসে থাকবো!

দিদি কহিল,—তাতে কি! গেলেই আলাপ হবে। মানুষের সঙ্গে মিশতে শেখ্‌বে। কুণো হয়ে থাকিস্ নে।

প্রমথ কহিল,—আচ্ছা,যাবো। কিন্তু কার সঙ্গে যাবো?

দিদি কহিল,—কেন, নিতাইয়ের সঙ্গে যাবি।

নিতাই দিদির বড় ছেলে, বয়স বারো বছর।

তখন এই অবধি···কিন্তু সেই যে কথা শুনা যায়, বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া মাঝে মাঝে হাসেন, তেমনি ব্যাপার নিশ্চয় ঘটিয়াছিল! নাহলে···

নিতাইয়ের সঙ্গে দিদির ভাশুরের গৃহে গেলে একটা ঘটনা ঘটিল। ঘটনা তুচ্ছ। কিন্তু তুচ্ছ হেতুর মধ্যে বিরাট পরিণতি বিরাজ করে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই আসরে প্রমথর সমবয়সী ক'জন কিশোর গান-বাজনা করিতেছিল। কলিকাতার সৌখীন বেশ-ভূষায় প্রমথকে আসিতে দেখিয়া তারা মুখ তুলিয়া তার পানে চাহিল; তার পর নিতাইকে একান্তে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল,—উনি কে নিতাই?

নিতাই কহিল,—আমার মামা।

মামার সবিস্তার পরিচয় দিতে বসিয়া নিতাই কহিল,—মামা কবি—কবিতা লেখে; মামা কখনো পল্লীগ্রাম দেখে নাই; বি-এ দিয়া বাঙলা দেশের গ্রাম দেখিতে আসিয়াছে ইত্যাদি। বাঙলা দেশের গ্রাম—এ-কথাগুলা মামার কথার কোটেশন!

দলের মধ্য হইতে প্রিয়নাথ আসিয়া প্রমথকে অভিবাদন জানাইল,—আপনি কবি।

কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে প্রমথ কহিল,—কবিতা লিখি।

—কোন্ কাগজে ছাপা হয়?

—'বসন্ত-দূত', 'কল্যাণশ্রী'—এই সব মাসিকে ছাপা হয়।

ক্ষণেক তার পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ কহিল,—আমাদের এ গ্রাম কেমন দেখচেন?

—চমৎকার।

প্রিয়নাথ কহিল,—আমাদের একটা লাইব্রেরী আছে···এক দিন আসবেন সেখানে?

প্রমথ কহিল,—আসবো।

প্রিয়নাথ কহিল,—নিতাইয়ের কাছে বলে দেবো—একটা তারিখ ঠিক করে। মানে, সেদিন আমাদের কমিটির সকলে হাজির থাকবে। আপনাকে at home দেবো।

প্রমথ খুশী হইল। বুড়া চাণক্যর বচন মিছা হইবার নয়—বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে! বিদ্বান্ আর কবি—স্বতন্ত্র জীব নয়! চাণক্যর আমোলে কবির কদর ছিল, শাস্ত্র-পড়ারা দলে ছিল ভারী। নহিলে চাণক্য 'বিদ্বান্' কথা না লিখিয়া 'কবি' লিখিতেন।

ভক্তদলের ভক্তি-নিবেদনের উচ্ছ্বাস বেশী দিন রহিল না! তাদের নিজেদের কাজ-কর্ম্ম আছে—কলিকাতার মত নিছক ভাব-বিলাসী এখানে নাই! খায় দায়, মাথায় লম্বা চুল রাখে, আর কবিতা লেখে—এমন জাত-ভাবুকের দারুণ অভাব! সাধে কলিকাতা অমন সুরসিক!

এক সপ্তাহ পরের কথা। সকালে উঠিয়া প্রমথ আবার তার দীর্ঘ পাড়ি সুরু করিয়া ফিরিতেছিল। মাঠের ধারে একঝাড় কলাগাছের পাশে জীর্ণ এক-তলা বাড়ী। বাড়ীর সামনে রোয়াক। রোয়াকে বসিয়া একটি কিশোরী···হয়তো সাজিয়া কলিকাতার পথে মোটরে চড়িয়া বাহির হইলে তার পানে পথিকের চোখ পড়িত না! কিন্তু এখানে ঐ তরু-পল্লবের ব্যাক্-গ্রাউণ্ড, আর এই জীর্ণ গৃহ—পথে আর পথিকও কেহ নাই! কাজেই···প্রমথর মনে হইল, পল্লীশ্রী যেন অপরূপ মূর্ত্তিতে রোয়াকে বসিয়া আছে!···

প্রমথ তার পানে চাহিল! এমন মুখ এখানে আসিয়া অবধি চোখে দেখে নাই! চোখ দুটিতে কি এক অজানা রহস্য! তার গাত্র মন্থর হইল। নানা ভাবে সে কিশোরীর পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল···সহসা কিশোরীর দৃষ্টির সহিত তার দৃষ্টি মিলিল। কিশোরী মৃদু হাসিল। সে হাসি···

রাজ্যের কবিতা, গল্প—সে হাসির ধারায় প্রমথর মনের পাথারে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। যেন রাশি রাশি ফুল সে পাথারে কে ভাসাইয়া দিয়াছে! তার বুক কাঁপিল; ভয় হইল···তখন চকিতে চোখ ফিরাইয়া সে পথের বাঁক ঘুরিল।

বাঁকের মুখে এক মুদির দোকান। বড় নয়। দোকানে দু'চারিজন লোক বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে!···দোকান পার হইয়া প্রমথ চলিল···আশে-পাশে মাঠ, বাগান, কুটীর···সব যেন ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে।

মনের মধ্যে দু' চারিটা কবিতার ছত্র বড়-বেশী কলরব তুলিয়া দিল। কবে কোন্ মাসিকে পড়িয়াছিল—নিজের লেখা নয়···

মৃদু হাসি হেসে তুমি গেলে চলি—
চমক ভাঙিল মম!
হা রে অভাগা ফুরালো নিমেষে
মহা-সুখ অনুপম!···

তাই কি? জীবনে এই একটিমাত্র সুযোগ···প্রাণের চির-সম্বল, মনের সকল কামনা···সত্যই জাগিয়া নিমেষে হারাইতে চলিল!···

না, না···

প্রমথ ফিরিল; ফিরিয়া দোকানে আসিল। দোকানী কহিল—কি চাই বাবু?

প্রমথ চারিদিকে চাহিল, চাহিয়া কহিল—ডাব আছে?

দোকানী কহিল—আজ্ঞে, না। চাল আছে, ডাল আছে, নুণ আছে, তেল আছে।

প্রমথ কহিল—ভারী তেষ্টা পেয়েচে···

দোকানী কহিল—বেশ, ডাব পাড়িয়ে দিচ্ছি। ওরে দীনো···ভাখ তো, ঘরে ডাব আছে কি না···

দোকানী প্রমথর পানে চাহিল। প্রমথর মনে তার চিরদিনের কল্পনা তখন জাল মেলিয়া বসিয়াছে যত ভাঙা ভালো আধুনিক গল্পের প্লট বাছিয়া খুঁজিয়া ধরিবার বাসনায়···

দোকানী কহিল,—এ দিকে কোথা এসেছিলেন?

প্রমথ চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—ঐ যে বাড়ীখানা···বাঁকের ওদিকে···

দোকানী কহিল,—ও। আমাদের নবীন ভশচাষ্যি মশায়ের বাড়ী?··· তা, ওখানে?

দোকানীর স্বর যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রমথ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দোকানীর পানে চাহিয়া···দোকানী কহিল,—ভশচাষ্যি মশায়ের পরিবার বুঝি নদীতে গেছেন চান করতে! আর ভশচায্যি মশাই? কোথায় যে নিরুদ্দেশ। অথচ কি কারণ···

প্রমথ কহিল,—তাঁর কাছেই এসেছিলুম। তা, কার সঙ্গেই বা দেখা করি!

দোকানী কহিল,—ও!···তা তেনার মেয়ে তো আছে! চমৎকার মেয়ে। খাশা বুদ্ধি।

ডাব আসিল। প্রমথ ডাবের জল নিঃশেষ করিয়া কহিল,—ক' পয়সা?

দোকানী কহিল,—ঘরের ডাব, বেচি না।

প্রমথ উঠিল, কহিল,—দেখি আর একবার···ভটচাষ্যি মশায়ের পরিবার ফিরলেন কি না।···

প্রমথ ফিরিল। রোয়াকের উপর কিশোরী তখনো তেমনি বসিয়া আছে! প্রমথ ভাবিল, কি ব্যাপার?

সে কাছে আসিল। কিশোরীর দৃষ্টি স্থির, তার উপর নিবদ্ধ!

প্রমথ কহিল,—এটা তো নবীন ভটচাষ্যি মশায়ের বাড়ী?

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, হাঁ। তার চোখে বিস্ময়!

প্রমথ কহিল,—তাঁর কাছে বিশেষ দরকারে এসেছিলুম···

কিশোরী কহিল,—কি দরকার?

প্রমথ কহিল,—মানে···কলকাতা থেকে আমি আসচি!···তিনি বাড়ী নেই?

কিশোরী কহিল,—না।

—কখন্ ফিরবেন?

কিশোরী কহিল,—তার ঠিক নেই।···

কথা ফুরাইল! ইহার পর?···কিশোরী কহিল,—কি দরকার, আমায় বলতে পারেন।

প্রমথ কহিল,—আপনি তাঁর মেয়ে?

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রমথ কহিল,—আপনার মা আছেন না?

—আছেন।

—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না?

কিশোরী কহিল,—মা নাইতে গেছে।

প্রমথ কহিল,—আমার দরকারী কাজ ছিল···বড্ড দরকারী।··· তাই তো!

কিশোরী কহিল—তা হলে ঘরে বসবেন, আসুন। মা এখনি চান করে ফিরবে··

প্রমথর বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল! চলিয়া যাইতে পা সরে না—অথচ বসিতে গেলে···

তার পর ?…

কিন্তু ঐ কিশোরী…!

বুক দুর-দুর করিয়া উঠিল।…প্রমথ অগত্যা কিশোরীর সঙ্গে আসিয়া ঘরে বসিল।

৪

ঘরখানি সাজানো। একধারে ছোট তক্তাপোষ। তক্তাপোষের পাশে ছোট একটি টেবিল—টেবিলের উপর একরাশ খাতা, বহি দোয়াত, কলম। দেওয়ালের গায়ে রঙীন ন্যাকড়ার আবরণে একটা এশরাজ ঝুলিতেছে।

মা অচিরে ফিরিলেন। কিশোরী তাঁকে কহিল—একটি ভদ্দর লোক এসেচেন কি দরকারে!

মা কহিলেন—কে ?

মেয়ে কহিল—দেখো'খন কাপড় ছেড়ে। ঐ ঘরে বসিয়েচি…

এ কথাগুলা হইল নেপথ্যে। নেপথ্যে হইলেও কথাগুলা প্রমথ শুনিল। তার বুক কাঁপিল। এবার সঙ্গীন মুহূর্ত্ত। মনে মনে সে ডাকিল—জয় মা বাগীশ্বরী… কণ্ঠে সার্থক বাক্ ফুটাও মা…

অচিরে এক প্রৌঢ়া মহিলা অর্থাৎ মা ঘরে আসিলেন, কহিলেন—কে গা ?…

প্রমথ কহিল,—নবীন ভটচায্যি মশায়ের কাছে আসচি। মানে, একটু কাজ আছে। তিনি বলেছিলেন, এখানে এসে দুদিন থাকলে সে কাজটুকু সারবার সুবিধা হবে।

মা কহিলেন—কবে বলেছিলেন ?

প্রমথর মনে সজাগ ছিল, দোকানীর কথা—নিরুদ্দেশ! সে কহিল—সে অনেক দিনের কথা! তখন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলুম, তাই… তা এখন…

মা কহিলেন—কি দরকার তোমার ?

প্রমথ কহিল—একটু বৈষয়িক কাজ। অর্থাৎ ঐ গাঙ্গুলিদের সঙ্গে…

গাঙ্গুলির অর্থ, প্রমথর ভগ্নীর শ্বশুর গোষ্ঠী।

মা কহিলেন—ও…তা, কতদিন লাগবে কাজ বুঝতে…!

প্রমথ কহিল—হপ্তাখানেক…

তার বুকের মধ্যে যেন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল! মনে হইতেছিল, সে যেন কল্পলোকে প্রবেশ করিয়াছে! বা কোনো এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পড়িতেছে—তার আগাগোড়া thrill। কিম্বা স্বপ্ন দেখিতেছে !…

মা কহিলেন—তিনি যদি বলে থাকেন, তাঁর জানা লোক—বেশ, থাকো…

মা প্রমথকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, করিয়া কহিলেন—তোমার জিনিষ-পত্তর ?

ঠিক! প্রমথ কহিল—ষ্টেশনে রেখে এসেচি!… মানে, একটা গুজব শুনেছিলুম, নবীন বাবু না কি দেশে নেই…তাই ভাবলুম, বাড়ীতে কেউ আছেন কি না…

মা কহিলেন—এ বেলায় এখানে খাবে তো ?

প্রমথ কহিল—না, এ বেলায় আর আপনাদের কষ্ট দেবো না। ষ্টেশনে যেমন করে হোক…ষ্টেশন-মাষ্টারটি ভারী ভদ্রলোক। তার সঙ্গে আলাপ হয়েচে…

মা সে-সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—তা বেশ, এখানেও আমাদের কোনো কষ্ট হতো না…

প্রমথ মার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ নত হইয়া প্রণাম করিল, করিয়া কহিল,—এখন তাহলে আসি.

সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। উঠানের কোণে কিশোরী বসিয়া তখন কাঠ চ্যালাইতেছে। তার দৃষ্টির সহিত প্রমথর দৃষ্টি আবার মিলিল…

পথে আসিতে ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িল। এ কি অমানুষিক দুঃসাহস! ভাগ্যে কোনো পুরুষ ছিল না। থাকিলে পুলিশের হাতে…

না, এ রোমান্স গল্পের পাতাতেই সাজে!…এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পাইলে…

দিদি! দিদির আত্মীয়-কুটুম্বের দল…

প্রমথ শিহরিয়া উঠিল…না, এ দেশ ছাড়িয়া আজই পলায়ন কর্ত্তব্য!…

খাইতে বসিয়া দিদির কাছে বিদায়ের পালা গাহিবার উপক্রম করিতে দিদি কহিল,—কলকাতায় ফিরে কি রাজ্য জয় করবি ? শুনি!

প্রমথ কহিল,—রাজ্য-জয় নয়, তবে সমিতির মিটিং-গুলো…

দিদি কহিল,—তোর মিটিংয়ের কথা আর বলিসনে! ও-সব শুনলে হাড় জ্বালা করে!… তোর গাঙ্গুলি-মশাই এক দিন কম জ্বালায়নি আমায় ঐ মিটিং করে। ওতে কি লাভ ?

লাভ যে নাই, প্রমথ তা জানে। তা ছাড়া এ্যাডভেঞ্চারের যে বীজটুকু আজ এই পল্লী-প্রান্তে বুনিয়া আসিয়াছে…কিশোরীর চোখে সেই কুতূহলী দৃষ্টি…

গল্প হইলে এ-প্লট কি চমৎকার ভাবেই না 'ডেভেলপ' করা চলিত!

সে অনেক ভাবিয়াছে! উপন্যাসে মস্ত একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয়-স্বজন, বা পাঁচজন প্রতিবেশীর চুলের টিকি কোথাও দেখা যায় না! অথচ বাস্তব জীবনে এদের ভিড়, এদের কলরব এমন বিশ্রী ভাবে রোমান্সের সুর কাটিয়া দেয়! উপন্যাস হইলে ঐ বাড়ীটির কোনো দিকে লোক-জনের বসতি থাকিত না! থাকিলেও তারা

এ দিকে চোখ তুলিয়া চাহিত না! পদে পদে লক্ষ কৈফিয়ৎ চাহিত না! উপন্যাসের দুনিয়া ধূ-ধূ মরুর মত… আর সেই মরুর এক প্রান্তে শ্যামল ওয়েসিসের মত বিরাজ করিত শুধু ঐ নবীন ভটচাযি্যি মহাশয়ের বাড়ীখানি :—

দিদির কাছে সে বসিয়া বসিল,—তোমাদের এ গাঁয়ে নবীন ভটচাযিার বাড়া কোথায়, জানো দিদি?

দিদি কহিল,—না। গাঁয়ের সঙ্গে আমার ভারী সম্পর্ক কি না।

প্রমথ কহিল,—তুই জানিস রে, নিতাই?

নিতাই তখন সুগভীর মনোযোগে কাঁচামিঠা আম খাইতেছিল, কহিল,—না।

দিদি কহিল,—এবার মস্ত মুরুব্বি পাকড়েছিস বটে… নিতাই। হুঁঃ!

প্রমথর যাওয়া হইল না! হয়তো যাইত। কিন্তু সেই কিশোরীর দৃষ্টির বাঁধন…।

অথচ ওদিকে যাইতে পা সরে না। এতক্ষণে হয়তো সব রহস্য ফাঁশিয়া গিয়াছে।…পাড়াগাঁ…তাকে লইয়া নানা কলরব উঠিয়াছে। দোকানীর কাছে যদি ডাব খাওয়ার কথা শুনিয়া থাকে?

সারা দিন প্রমথ বাড়ীর বাহির হইল না। বড় দূরের ব্যবধান। বড় বড় দুটা মাঠের পর নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহ—তবুও পাড়াগাঁ! সহর নয়…যে, পাশের বাড়ীর সন্ধান পাশের লোক রাখে না!…যদি জানাজানি হয়…?

সন্ধ্যার পর মনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। খেজুর ঝোপের পাশ দিয়া কালি চাঁদ উঁকি দিবামাত্র প্রমথ পথে বাহির হইল। দিদি কহিল—কোথায় চলেছিস্ রে?

প্রমথ কহিল—সারা দিন বেরুইনি…একটু ঘুরে আসি।

দিদি কহিল—দেখিস, পথ ভুল করিস্ নে।

—না—না…

প্রমথ আসিল সেই পথে…

নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঐ প্রদীপের আলো দেখা যায়! প্রমথ আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, ডাকিল,—মা…

ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—কে গা? সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটী আসিয়া দ্বার খুলিল।

প্রমথর মাথার রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে গলা সাফ করিয়া সে কহিল—মা আছেন?

কিশোরী কহিল—আছে।

প্রমথ কহিল—আমি এসেছিলুম। মানে, তাঁকে একটা কথা বলতে…

—আসুন…

প্রমথ গৃহ-মধ্যে আসিল। মা কহিলেন—কি বাবা?

প্রমথ কহিল—আজ আর আপনাদের কষ্ট দেবো না, তাই বলতে এলুম। ঐখানে ষ্টেশনেই আছি…যদি অসুবিধা হয়, আসবো। তখন যেন তাড়িয়ে দেবেন না…

বহু প্রয়াসে প্রমথ মৃদু হাসিল। মা হাসিলেন না, গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—আচ্ছা।

মা চলিয়া যাইতেছিলেন; প্রমথ কহিল,—এক গ্লাস জল দেবেন মা?

মা ডাকিলেন,—ওরে মেনি, এক গেলাস জল এনে দে তো…

মেনি কহিল,—যাই।

মেনি গ্লাস আনিল, প্রমথ জল পান করিল। ঘরে একটা কেরোসিনের চিমনি জ্বলিতেছিল। টেবিলের উপর একখানা বাঙলা বই পড়িয়া আছে। প্রমথ কহিল,—এ বাজনা…আপনি বাজান?

মেনি কহিল—না,—বাবা বাজায়।

প্রমথ কহিল—আপনি এস্রাজ শেখেন না কেন?

মৃদু হাসিয়া মেনি সলজ্জভাবে মাথা নামাইল। শোভা যা হইল…

দেখিয়া প্রমথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মেনি চলিয়া যাইতেছিল, প্রমথ কহিল—এ বই… আপনি পড়ছিলেন?

মেনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

বইখানা হাতে লইয়া প্রমথ দেখে, পরমানন্দ পাঁড়ের লেখা গল্পের বই—"তিন তালি"। সদ্য বাহির হইয়াছে। পাঁড়ে বই লিখিয়া খ্যাতি যা লাভ করিয়াছে, অসাধারণ! "সুচিত্রা," "গান্ধারী," "নবনী," "মারু চাবুক" প্রভৃতি হালের মাসিকগুলা আজো সে খ্যাতির প্রতিধ্বনিতে ভরপুর।

প্রমথ কহিল—বেশ বই না?

ঘাড় নাড়িয়া মেনি জানাইল, হাঁ।

প্রমথ কহিল,—এই পরমানন্দ পাঁড়ে আমার বন্ধু… মানে, আমরা একই দলের…অর্থাৎ আমাদের লেখা পরস্পরকে না দেখিয়ে ছাপতে দিই না।

মেনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রমথর পানে চাহিল। প্রমথ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—আমিও লিখি। গল্প নয়, কবিতা। গল্প লেখা এবার সুরু করবো, ভাবচি। মানে, কবিতার ছন্দ মনে ভালো করে না বসলে গল্প লেখা উচিত নয়। গল্প আর কবিতা—দুয়ের মূলে বড় তফাৎ নেই—একটাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ, অপরটাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলা চলে।…

মেনি বেশ মনোযোগ দিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল।…

প্রমথ কহিল,—আপনি কখনো লেখবার চেষ্টা করেছেন?…

মেনি কোনো জবাব দিল না।

প্রমথ কহিল—লেখা উচিত। মেয়েরা লিখতে সুরু করলে, সে-লেখার কাছে পুরুষদের লেখা হার মানবে! অন্তরের যথার্থ যে-কথা, তা লেখবার শক্তি আছে শুধু মেয়েদেরই!···এই দেখুন না, সম্প্রতি ঐ চারণী মিত্র, শোষিণী সেন, কানাড়া পট্টনবীশ, উন্মাদিনী সাহা—এঁরা যে লেখা লিখতে সুরু করেচেন, আঃ, লেখায় যেন আগুন ছুটচে! সে আগুনে মেয়েদের ঘোমটা, অন্দরের পাঁচিল, জানলার পর্দ্দা—সব একেবারে হু-হু করে পুড়ে যাচ্ছে···

প্রমথর মুখের কথায় এবারে বন্যা নামিয়াছিল। এ সব কথা তার element! পাড়া-গাঁয়ে দিদির কাছে আসিয়া এ সব কথা দিদিকে বলিতে পারে না! এ সব কথা শুনিবার লোক এখানে কোথায়? কাজেই এতদিন রুদ্ধ ছিল! কলিকাতার আসরে তাদের কথাবার্ত্তা যে চলে, তা এমনি রসালো। আজ এই কিশোরীর হৃদয়ের স্পর্শে সে সব কথা···চন্দ্রালোকে নদীর জল যেমন উচ্ছ্বসিত হয়, তরঙ্গিত হয়, তেমনি···

এই কথার তরঙ্গে বহু কথা সে বকিয়া চলিয়াছিল। মানুষে মানুষে ভেদ নাই—নর-নারী যাহা চাহিবে, তাহাই করিবে। কিসের নিষেধ? সে নিষেধ কে তুলিয়াছে? পরিণত রসিক মন সে নিষেধ মানিবে কিসের জন্য? না-জানা পথিক যদি দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তো কিশোরীর উচিত, তাকে প্রাণের ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া! নহিলে ঘরে-বাহিরে যোগ রচিবে কেন? এমনি বহু কথা···

আর মেনি···? অত্যন্ত কুণ্ঠা-ভরে চোরের মত দাঁড়াইয়া সে-কথা শুনিতেছিল!···

সহসা মা ডাকিলেন,—মেনি···

—যাই মা···

মেনি চলিয়া গেল। প্রমথ চুপ করিল, যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড ফশ্‌ করিয়া বন্ধ হইল।

একটু পরে মেনি ফিরিল; ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,—মা বললে, আপনি কি এইখানে থাকবেন?

একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমথ কহিল,—না, কেন আর আপনাদের কষ্ট দি?···তবে নবীন বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না···সেজন্য আমার ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ···

৫

পরের দিন। বেলা প্রায় আটটা। এক হাঁটু ধূলা মাখিয়া ডাক-পিয়ন আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। প্রমথ বাহির হয় নাই। দিনের আলোয় পথে বাহির হওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে! কোনো দিক দিয়া যদি মেনি বা তার মার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়।

টেলিগ্রাম পড়িয়া সে দিদিকে কহিল,—গাঙ্গুলি মশায় যাবার জন্য তার করেচেন গো! অসুখ-বিসুখ নয়। তবে হঠাৎ বদলি হচ্ছেন...চটপট যাওয়া দরকার!

দিদির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই গরমে বদলি! দিদি কহিল,---কোথায় বদলি, লিখেচে?

প্রমথ কহিল,---না···

দিদি কহিল,---একবার আক্কেলখানা ছাখো। সে কথাটা জানাতে হয়···যে, আমি বুঝতুম!···তুই যাবি রে প্রমথ আমার সঙ্গে?

অন্য সময় হইলে প্রমথ মহানন্দে সহযাত্রী হইত! কিন্তু এখন? কাল সন্ধ্যায় মেনিদের বাড়ী অমন আলাপ জমিবার পর? না, এখন যাওয়া চলে না। দিদি চলিয়া গেলে কোনোমতে যদি এ-গৃহে আরো দু'চারি সপ্তাহ থাকিতে পারে তো বর্ত্তাইয়া যায়!···যে প্লট ফাঁদিয়াছে, তার ডেভেলপ্‌মেণ্ট...

কিন্তু তা হয় না! কি বলিয়া থাকিবে?

সেদিন গোছগাছ করিতে সময় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাহির হইতে পারিল না।

পরের দিন বৈকালে দিদিদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া প্রমথ কহিল—যাঃ! আমার একজোড়া পাম্পশু তোমার ওখানে ফেলে এসেচি দিদি···

দিদি কহিল—উপায়?

প্রমথ কহিল—থাক গে··· তবে কি না নতুন—এখানে আসবার সময় কিনেছিলুম।

দিদি কহিল—এই নে চাবি। জুতোজোড়া বার করে চাবি সঙ্গে নিয়ে যাস। তার পর কলকাতা থেকে ডাকে রেজেষ্ট্রী করে আমায় পাঠাস। কোথায় যাই আগে জানাবো, তার পরে—বুঝলি?

ঘাড় নাড়িয়া প্রমথ জানাইল, বুঝিয়াছে।···

দিদির ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে ষ্টেশনে আরো কিছুক্ষণ থাকিয়া প্রমথ দিদির গৃহে ফিরিল। দ্বারের কাছে দিদির এক জ্ঞাতি-জাঠশ্বশুর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন; তিনি কহিলেন,—ফিরলে যে, বাবাজী?

প্রমথ কহিল—কি সব গুছোতে হবে—দিদি বলে গেল···

জাঠ-শ্বশুরটি চিরদিন পল্লীগ্রামে থাকেন—সহরের ধাঁচ জানেন না, বলিলেন,—আমাদের ওখানেই রাত্রে তাহলে খেয়ো···

প্রমথ কহিল—আজ্ঞে না। এখানে আমার একটা নিমন্ত্রণও আছে—রাত্রে···

—তাহলে মিছে বলা! তবে বাড়ীতেই ফিরচো তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করে?

মৃদু হাস্যে প্রমথ কহিল,—দেখি!

মনের মধ্যে যেন বসন্ত জাগিয়াছে। কত সুরে কত পাখীর কূজন চলিয়াছে!…

সন্ধ্যার পরে প্রমথ চলিল নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহের পথে!…

সেই দোকান! দোকানের সামনে মস্ত ভিড়। সর্ব্বনাশ! সে ভিড়ের মধ্যে তার পরিচিত সেই দুটি ভক্ত…নিতাইয়ের মারফৎ যাদের সঙ্গে পরিচয়…

ভক্ত কহিল,—এধারে?…

প্রমথর বুক কাঁপিল, পা টলিল।

প্রমথ কহিল,—একটু দরকারে…

দু-নম্বর ভক্ত কহিল,—ওঁরা যে সব চলে গেলেন—ছোটুদা কোথায় বদলি হয়েচে না?

ছোটু ভগ্নীপতির ডাক-নাম।

প্রমথ কহিল,—হ্যাঁ…

এক নম্বরেরটি কহিল,—আপনাকে বুঝি দু'চার দিন থেকে যেতে হলো?

প্রমথ কহিল,—হ্যাঁ…

তারা নড়িতে চাহে না, অথচ বাঁক ঘুরিলে সেই বাড়ী। ইহারা যদি সঙ্গে যায়?…

সে কহিল,—আপনারা বুঝি বাড়ী যাচ্ছেন?

ভক্ত কহিল,—না। আমাদের আজ এ্যামেচার থিয়েটার আছে…দু'জনের দেখা নেই, তাই এদিকে এসেচি বিধুকে ধরতে। বিধু নেই…তাকে না নিয়ে যেতে পারচি না।

প্রমথ কহিল,—হুঁ…

ভক্ত কহিল,—আপনার দরকার কার কাছে?

দ্বিতীয় ভক্ত কহিল,—কত দূরে যাবেন?

ঢোক গিলিয়া প্রমথ কহিল,—তা প্রায় ক্রোশখানেক…

—কার বাড়ী?

এত জেরা! বিপদও কম নয়! প্রমথ কহিল,—বাড়ী নয়। মাঠ। ধানের মাঠ আছে না? তাতেই…। মানে, পাটের চাষ, সর্ষে, তিশি, ছোলা…

এমনি কি-সব মাথামুণ্ড বকিতে বকিতে প্রমথ চলিয়া গেল—নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহ ছাড়িয়া বহু দূরে…নবীনের গৃহের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া গেল—বাড়ীর দ্বার খোলা…ভিতরে একটা অস্ফুট কলরব…

সাম্‌নে দাঁড়ানো চলিল না, ভক্ত দুটি অদূরে রহিয়াছে! অথচ মন ঐ বাড়ীটার কাছ ছাড়িয়া যাইতে চায় না! উপায় কি? পথ ধরিয়া সোজা সে চলিয়া গেল—দৃষ্টি সেই রোয়াকে।

এমন সন্ধ্যা…হায়, চাঁদের এই আলো…নবীনের গৃহে নবীনতর আলাপ! বাস্তব জীবনে রোমান্সে এত প্রমাণ বাধা! বাঙালী কি করিয়া মানুষ হইবে?

বুকে আগুন বহিয়া পাগলের মত পল্লীর পথে বহুক্ষণ ঘুরিয়া প্রমথ আবার যখন এ-পথে ফিরিতেছিল, তখন নবীনের গৃহ-দ্বার বন্ধ। চারিধার নিশুতি। মুদির দোকানে আলো জ্বালিয়া মুদি দিনের কেনা-বেচার হিসাব মিলাইতেছে। দূরে মিশ্র একটু বাদ্যধ্বনি! প্রমথ বুঝিল, বিধুকে তাহা হইলে পাওয়া গিয়াছে, ওদিকে তাই এ্যামেচার থিয়েটার অভিনয়ে মাতিয়াছে!…

সে…?

ভাগ্য!

৬

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে মাথায় নানা প্ল্যানের আদরা ছকিতে লাগিল। কাণাকাণি ও আইন বাঁচাইয়া কি করিয়া…

সকালে মুখ-হাত ধুইয়া স্নান সারিয়া আবার সে বাহির হইল। নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহ। আবার সেই ভক্ত…আঃ! ভক্তটি এক রাশ আশশ্যাওড়ার ডাল ভাঙ্গিয়া গৃহে ফিরিতেছে, হাসিয়া কহিল,—দাঁতন হবে।

আর কোনো কথা নয়। প্রমথর বুকে আবার সেই উদ্যত মুগুর! কিন্তু…খুব বাঁচিয়া গেছে! ভক্ত দাঁড়াইল না।

এখানে ভিড় থাকে না। আজও ছিল না। প্রমথ আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—মা…

মেনি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল,—আসুন…

হাসিয়া প্রমথ ঘরে আসিয়া বসিল।

মেনি কহিল,—বাবা এসেচে কাল সন্ধ্যার সময়…

বাবা! কাণে যেন বাজ হাঁকিল! প্রমথর মুখ চকিতে বিবর্ণ পাণ্ডুর! অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে কহিল,—কোথায়?

মেনি কহিল,—ষ্টেশনে গেছে আপনার খোঁজ করতে ..

—এ্যাঁ! মুখ এমন ফ্যাকাশে যে মেনির লক্ষ্য এড়াইল না! মেনির চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিল!

কোনোমতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া প্রমথ কহিল,—তা হলে আমি যাই। আমার জন্য ওদিকে তিনি ব্যস্ত হবেন আবার!…

প্রমথ উঠিয়া পড়িল। আর বসা নয়। এখনি যদি নবীন ভট্টাচার্য্য…

সে দাঁড়াইল না। মোড় বাঁকিবে, এক জন ভদ্রলোক কহিলেন,—আপনি আমায় খুঁজচেন?…

প্রমথর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল,—না…

—আমার বাড়ী থেকেই তো আসচেন? …নবীন…নবীন—আমি নবীন ভটচার্য্যি।…

এ প্রশ্নের জবাব নাই। জবাব চলে না। এ সেই

অবস্থা···যে অবস্থায় অতি-বড় নাস্তিকও কাঁপিয়া মনে মনে ডাকে,—ঠাকুর, ঠাকুর...

প্রমথ কহিল,—তাহলে নামের ভুল করেচি।

নবীন হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আসুন। ভুল হোক, তবু আমার বাড়ীতে এসেচেন যখন ··

নবীন ছাড়িল না। প্রমথকে আসিতে হইল।

নবীন ডাকিল,—মেনি···

মেনি আসিল, কহিল,—ইনি···

নবীন কহিল,—শুনলুম, আপনি কবি। 'বাঁশবেড়ে গেজেটে', না 'নবডঙ্কা' কাগজে আপনার লেখা ছাপা হয়!

প্রমথর বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···মনে মনে সে ভাবিতেছিল, সীতার মত ডাকিতে পারিলে, বুঝি, মা-বসুমতী আজো বুক ফাঁড়িয়া সে-বুকে মাটির মানুষকে আশ্রয় দিয়া তার দুর্গতি হরণ করিবেন!

নবীন ডাকিল—মেনি···

মেনি কহিল,—কেন?

নবীন কহিল,—মাছ ধরতে বলে দে, বড় দেখে। এত বড় লোক অতিথি· ·খাতির করা চাই···

মেনি চলিয়া গেল।

স্তব্ধ ঘর। বাহিরে আমড়া গাছের ডালে বসিয়া একটা কাক ক্রমাগত জড়িত আর্ত্ত রব তুলিতেছে, আর গাছের ডালে মাঝে মাঝে আক্রোশে, না, বেদনায় ঠোঁট ঠুকিতেছে!···

সহসা বাহিরে কার কণ্ঠস্বর,—সত্যি?···

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর,—হ্যাঁ···

পরক্ষণে ঘরে উদয় এক প্রৌঢ়া নারীর বিরাট বপু···কালো রঙ···! দেখিলে মনে হয়, মাসিক-পত্রের অফিসের সামনে বসাইয়া রাখি, কাকলী-কবির দল সম্পাদকের দ্বারে সনেট বা লিরিক লইয়া ঘেঁষিতে পারিবে না!···

প্রৌঢ়া আসিয়া প্রমথকে ভালো রকম দেখিয়া পরখ করিয়া কহিল,—ও মা, তাই তো! তা দাদা···

প্রমথর হাত ধরিয়া প্রৌঢ়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। প্রমথর চেতনা বিলুপ্ত হইতেছিল!

প্রৌঢ়া কহিল—আমার নাতনীকে বিয়ে করে পালিয়ে বেড়ানো, এ কি ভাল হচ্ছে, দাদা! হলোই বা কালো, হলোই বা পাগল-ছাগল! মানুষ তো! তোমরা আছো, ভাই, মীমাংসা করে দাও, লক্ষ্মিটি...

প্রমথ কাঁদ-কাঁদ···এ আবার কি কথা!

হাসিয়া নবীন কহিল,—না, না, তামাসা নয়, ঠানদি। ইনি কবি। তা মুস্কিল এ ক্ষেত্রে কি হয়েচে জানেন প্রমথ বাবু? আমার স্ত্রীর পরিচয় জানেন না? ওঁর নাম পদ্মাবতী দেবী,—যিনি উপন্যাস লেখেন··· লেখিকা পদ্মাবতী দেবী। এই উপন্যাস লিখে সংসার চালাচ্ছেন। আমি কারবারে ফতুর, দেনার দায়ে ইন্‌সলভেন্সি নিতে চলেছি। আপনার কথাবার্ত্তা শুনে আমার স্ত্রীর কেমন সন্দেহ হয়েছিল! তা ছাড়া আপনাকে এরা ছোটুর ওখানে দেখে এসেচে কি না। ছোটু আবার সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী···কাজেই আপনার কথায় প্রথম দিন থেকেই এঁদের বিশ্বাস হয়নি!···আমার স্ত্রী বলছিলেন, রোমান্স! ছোকরা বয়স। গ্রামের এক কোণে আমার ঘর! আর...

নবীন মেনির পানে চাহিল। মেনি কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল···মৃদু হাসির আভায় তার মুখ উজ্জ্বল!

নবীন কহিল,—আমি নিরুদ্দেশ হইনি সত্যি। একটা মামলার ডিক্রী ছুরি উঁচিয়ে ছিল···তাই সে টাল্ সামলাতে গেছলুম! বাঙালীর ঘরে রোমান্স আজ পর্য্যন্ত ঘটতে দেখলুম না, প্রমথবাবু। গল্পে-উপন্যাসে আমার স্ত্রীও এমনি কথা লেখেন···! খেয়াল···লিখুন!···আসলে এখানকার মাটীতে ও-ব্যাপার অসম্ভব! তা ছাড়া মেনির বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। ছোটুর এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। ছেলেটি ভালো···লাহোরে প্রফেশরি করে। তাদের কথায় মেয়েকে গান-বাজনা শেখাচ্ছি! ও-বিদ্যে আমার একটু আয়ত্ত আছে কি না···আর।

প্রমথ কোনোমতে নবীনের পানে চাহিল।

নবীন কহিল,—লেখার উপর মানুষের আর তেমন শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নেই। লেখক এখন কে নয়? কবিতায় গল্পে বাঙালীর মাথা এখন ঠাশা যে তাদের··· বুঝলেন···?

আর বোঝা? প্রমথর বুদ্ধি তখন কোথায় উবিয়া যাইতেছিল···

বেঙ্গল বেহার কাট্‌লারি

রাত্রি প্রায় দশটায় পশ্চিমের এক জংসন-ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিলাম। ফিরিব কলিকাতায়—মেল আসিবে রাত্রি প্রায় দুটায়। এতখানি সময় ষ্টেশনে বসিয়া কাটানো সহজ ব্যাপার নয়! একটু ঘুমাইব, উপায় নাই। বয়স হইয়াছে। ঘুমের আয়োজন করিতে খানিকটা সময় লাগে—ষ্টেশনের কোলাহল-কলরবে সে ঘুম পাকিতে তিন ঘণ্টা লাগিবে, ততক্ষণে মেল ধরিবার উদ্যোগ!

হুইলারের বুকষ্টল হইতে একখানা রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস কিনিয়া ওয়েটিং-রুমে আসিয়া ঢুকিলাম। ঘরটি জন-হীন নয়। চার-পাঁচজন বাঙালী ভদ্রলোক গোল-টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ সিগার টানিতেছেন, কাহারো হাতে খপরের কাগজ, কেহ বা ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু মুদিয়া তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন!

আমি আসিতে নিমেষের জন্য চাঞ্চল্য ঘটিল। দেওয়ালের দিকে ইজিচেয়ারখানা শূন্য পড়িয়াছিল। বিস্ময়ে-আনন্দে সেখানা দখল করিয়া তাহাতে আড় হইয়া শুইয়া নভেল খুলিলাম।

একটু পরেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম—ইজি-চেয়ারের গদি শূন্য থাকার হেতু। ছারপোকার বংশ বোধ হয়, এ মুল্লুকের সকল খাট-পালঙ ছাড়িয়া এইখানে আসিয়া সমৃদ্ধ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে! বুদ্ধিমান জীব! কত জাতের বিচিত্র শোণিত-পানের সুযোগ—তারা এখানে hall of all nations পাইয়া বর্ত্তাইয়াছে!

বাহিরে গিয়া দু'খানা খবরের কাগজ কিনিয়া আনিলাম। সেই খবরের কাগজে ইজিচেয়ারের বেত্রাংশ দু-তিন পুরু মুড়িয়া আবার নভেল খুলিলাম।

লেখা বটে! পাঁচখানা পাতা উল্‌টাইতে মনটাকে যেন শুষিয়া লইল! ঘটনার গতি চলিতেছে বেগে—রহস্যের পর রহস্যের মাইল-পোষ্ট অতিক্রম করিয়া। কোথাও সে গতির বেগ কমিতে জানে না—যেন non-stop run!

রুদ্ধ নিশ্বাসে লাইন ধরিয়া মন ছুটিয়া চলিল। বাহিরের বিশ্ব ক্রমে পর্দ্দায় ঢাকিয়া অনুভূতির অন্তরালে অদৃশ্য হইল। জগতে রহিল শুধু দুটো খুন—পাঁচটা হেঁয়ালী-জড়িত নর-নারী; আর তাদের পিছনে ছুটন্ত এক দুর্দ্ধর্ষ ডিটেকটিভ্‌! তার ভয় নাই, ডর নাই, দ্বিধা নাই! কলের দম-খাওয়া পুতুলের মত নিজের গোঁয়ে চলিয়াছে, চলিয়াছে!

দেড়শো পাতা অতিক্রম করিবার পর ঘাড়ে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিলাম। চমক ভাঙ্গিল। উঠিয়া অভিনিবেশ-সহকারে দেখি, ছারপোকার একদল দুরন্ত ফৌজ কোনোমতে কাগজের 'ওয়াল' ঘুরিয়া আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ে আমার স্কন্ধদেশ আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। অদ্ভুত organisation! উঠিয়া পীঠ-বস্ত্র খুলিয়া নখ-ঘর্ষণে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়িয়া অশান্তি নিবারণ করিলাম; পরে দিয়াশলাই জ্বালিয়া কতকগুলা ছারপোকার নিধনান্তে কাগজখানাকে সুবিন্যস্ত করিয়া দুর্গস্কন্ধটুকু নিরাপদ করিলাম। বসিতে যাইতেছি, একজন ভদ্রলোক কহিলেন, —ছারপোকা খুব বেশী?

আমি কহিলাম,—উঃ!

ঐ একটি কথায় তিনি বুঝিলেন, সংখ্যা কত। তাহা অনুভব করিলাম শ্রোতার মুখ-চোখের ভঙ্গী দেখিয়া!

ভদ্রলোকটি নবাগত। আসনের অভাবে ঘরের মেঝেয় বাক্স-প্যাঁটরা রাখিয়া তাহার উপর তিনি চড়িয়া বসিয়াছেন। ভদ্রলোক কহিলেন,—কি বই পড়চেন? ডিটেক্‌টিভের গল্প?

কহিলাম,—হ্যাঁ।

তিনি বলিলেন,—ভূতের গল্প-টল্প কিছু পাবো এখান-কার বুকষ্টলে?

কহিলাম,—জানি না।

গোল-টেবিলের প্রান্তস্থিত জনৈক ভদ্রলোক কহিলেন, —পাবেন। ভূত নিয়ে ওদেশে এখন খুব বেগে চর্চ্চা চলেছে। কথাটা বলিয়া তিনি হাসিলেন।

প্রথম বন্ধু কহিলেন,—তামাসার কথা নয়। ভূতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় যাদের ঘটেচে, তারা জানে, কি মর্ম্মান্তিক সত্য ঐ ভূতের ব্যাপার!

চট্ করিয়া ঘরের হাওয়া ফিরিয়া গেল। নিদ্রা-ঘোরের সে স্তব্ধ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। প্রথম বন্ধুটি কহিলেন,—আপনারা বোধ হয় জীবনে কেউ ভূত দেখেন নি এবং তার অস্তিত্বে বিশ্বাসও করেন না?

সকলের মুখে সজোর হাসি উথলিয়া উঠিল।

বন্ধু কহিলেন,—আমি সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা লাভ করে

আসচি, সে-কথা মনে হলে এখনো সারা-গায়ে রোমাঞ্চ হয়!...এই দেখুন...

ভদ্রলোক উঠিয়া দুই হাত আমাদের সামনে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। দেখিলাম, তাঁর হাতের লোমগুলা সত্যই খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। ক্যাক্সন্ ডিটেকটিভের রোমাঞ্চকর কাহিনী এইখানেই বই মুড়িয়া চাপা দিলাম। সে কাহিনী হাতে রহিল! এ কাহিনী ভৌতিক, এবং......

ঘরশুদ্ধ সকলে তখন বেশ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। একজন উহার মধ্যে চেয়ারখানা টানিয়া ভৌতিক-বন্ধুর কাছে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—জীবনে নিজের চোখে দেখিনি; তবে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মুখে যা শুনেচি, তাতে ভূত নেই বলে উড়িয়ে দিতে পারি না!...অলৌকিক!

কেহ বলিলেন,—Deep mystery!

আর একজন সুগভীর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ফেলিয়া বলিলেন,—There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy!

ঠিক যেন সেই মধুচক্রে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ! সকলেই মৃদু-গম্ভীর গুঞ্জন-রব তুলিলেন।

বন্ধু কহিলেন,—গিয়েছিলুম গুলগাঁওয়ে। ছুটো ষ্টেশন আগে—পীরখান্ ষ্টেশনে নেমে সাত-আট মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিতে হয়। এককালে ওদিকটা নাকি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ওখানে কামার-মিস্ত্রী আছে। তাদের হাতের কাজ চমৎকার। গুলগাঁওয়ে একটি নদী আছে, সারা বছর বালির গাদায় লুকিয়ে থাকে; বর্ষায় জল একেবারে অথৈ-অতল হয়ে ওঠে! এদাবকার নদীগুলোর দশা-ই তাই!...আমি গিয়েছিলুম গুলগাঁওয়ে—একজন মিস্ত্রীর কাছে। সেখানে দু'দিন ছিলুম। কোনো গোলযোগ ঘটে নি! কাল ফেরবার মুখে মস্ত বিভ্রাট...

আমরা উৎকর্ণ উদগ্রীব হইয়া বসিলাম।

বন্ধু কহিলেন,—বেলা তখন চারটে—মিস্ত্রীর ওখান থেকে বেরুলুম। আকাশে মেঘ জমছিল। মিস্ত্রী বললে,—ভারি ঝড় হবে বাবু-সাব! আজ যাবেন না! আমি বললুম, তা হয় না মিস্ত্রী, আজই রাত্রের ট্রেণ আমার ধরা চাই। মিস্ত্রী বার-বার মানা করলে। আমি শুনলুম না—বেরিয়ে পড়লুম। দু'মাইল আসবার পর হু-হু ঝড় উঠলো। মেঠো পথ—দু'ধারে বন আর মাঠ! মাঠ ফুটিফাটা—জনপ্রাণীর বসতি নেই। মিস্ত্রীর এক কারিগর আমার এই লগেজ মাথায় সঙ্গে আসছিল। সে বললে, একটা ঝোপের ধারে বসা যাক বাবু! আমি বললুম, বাপ রে! তেপান্তর মাঠ আর ঐ ঝড়!

আমার মাথায় কেমন নেশা জাগলো—এ্যাডভেঞ্চারের নেশা! সে ঝড় ঠেলে চলতে লাগলুম। আরো এক মাইল এলুম...পথের ধারে পুলিশের ফাঁড়ি। জরাজীর্ণ কুঁড়ে-ঘর। ঝড়ে তার মাথাটা যেন একবার বাঁধন ছেড়ে উঠে পড়চে, আবার সজোরে সেটাকে কে খুঁটির মাথায় আছড়ে ফেলচে! মিস্ত্রীর লোক সেইখানে আস্তানা নিল! লগেজগুলো ভিজবে? আমি বললুম, তুই বোস, বৃষ্টি আসচে! আমি এগুই। বর্ষাতি-কোটটা গায়ে চড়িয়ে আমি সেই ঝড়-জল রুখে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললুম!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্ধু চুপ করিলেন; তারপর একটা সিগার বাহির করিয়া ধরাইয়া মুখে দিলেন। আমাদের সামনে কেশটা ধরিলেন। আমরা সিগার লইয়া ধরাইয়া মুখে দিলাম। বন্ধু বলিতে লাগিলেন,—বৃষ্টি বেশ জোরেই এলো। বুকখানা কাঁপলো ক্ষণেকের জন্য! ভাবলুম, এ গোয়ার্ত্তুমি না করলেই হতো! বাতাস তার বেগ তখন ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে তুলেছে। জলের বড়-বড় ফোঁটা পাটকেলের মত এসে গায়ে বাজতে লাগলো। বাজের সঘন গর্জ্জন—বিদ্যুতের চমক! যেন প্রলয়ের লীলা! গা ছম-ছম করতে লাগলো। মাঠে এ সময় নিরাপদ নয়। বজ্রাঘাতের আশঙ্কা আছে! কিন্তু ফেরা গেল না। খোট্টাদের সামনে রোখ দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসেচি! কাজেই সে-দুর্য্যোগে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া যায় না। তিন-পা এগুতে পাঁচ-পা যেন কে ঠেলে পিছিয়ে দেয়!

আধঘণ্টা আমার সংগ্রাম চললো...প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার বিরুদ্ধে! সংগ্রামই! হাত-পা ক্রমে ঝিমিয়ে এলো...

সহসা অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের আলোর চমক! সে আলোয় পথের পাশে দেখি, একটা বাঙলো-ধরণের বাড়ী। মনে পড়লো, মিস্ত্রীর ওখানে যাবার সময় দেখে গিয়েছিলুম—ইনসপেক্‌শন-বাঙলো! নিরুপায় হয়ে সেই বাঙলোর ভাঙা ফটকে ঢুকে তার বন্ধ দ্বারে করাঘাত করলুম!...

বার-বার করাঘাত! ভিতর থেকে এক বুড়া চৌকিদার এসে দ্বার খুলে সামনে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলোয় তার যা মূর্ত্তি দেখলুম—শিউরে ওঠবার মত মূর্ত্তি! শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু,—মানুষের জীর্ণ কঙ্কাল! তাকে বললুম,—রাত্রে এখানে থাকবো।

শুনে সে এমন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো! তার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, তার বিস্ময়ের সীমা নেই!

আমার সঙ্কল্প অটল দেখে সে বললে,—অর্থাৎ, তার

কথার মর্ম্ম—এ বাঙলো ঝড়-বাদলের রাতে মোটে নিরাপদ নয়! অশরীরীদের আস্তানা হয়ে ওঠে। তাকে চাকরির দায়ে নিরুপায় চিত্তে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বাহিরের রোয়াকে পড়ে চাকরি রাখতে হয়। তখন তার চারিদিক ঘিরে কি কাণ্ডই চলে! এ বাঙলোয় লোকে কালে-ভদ্রে আসে।—সাহাব-লোক। তারা রাত্রে কখনো থাকে না! পাশের গাঁয়ে সাহাব-লোকের চিনির কল আছে। সেখানে যাতায়াত করতে কেউ যদি বাঙলোয় আসে তো খানিক বসে বিশ্রাম করে যায়।

সে আরো জানালে…

কিন্তু কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না। এই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, বিজ্ঞানের যুগে—যে-যুগে ছবির মানুষ কথা কয়—সে-যুগে ভূত! এর চেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে না। লোকটার ওস্তাদী। রাত্রে এইখানে আরামে মুড়ি দিয়ে ঘুমোবে—আমি আস্তানা নিলে ফাই-ফরমাশে ব্যতিব্যস্ত করবো—তাই আমাকে ভূতের নাম করে সরাবার ফন্দী!

আমি বললুম—ভূত-দানাদত্যি যে-ই আসুক বাপু, আমাকে এইখানেই থাকতে হবে। অন্ধকার পথ। এই জল-ঝড় মাথায় করে ষ্টেশনে যাওয়া সম্ভব হবে না!

সে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—মুখে কথা নেই। আমি আশ্বাস দিলুম,—ভয় নেই! খাওয়া দাওয়ার উৎপাত করবো না। রাত্রিটা শুধু পড়ে থাকবো। বিছানা আছে তো?

ঘাড় নেড়ে সে জানালে,—আছে।

আমি বললুম—বিছানাটা শুধু দেখিয়ে দাও! তুমি যা' খুশী করো, আমার আপত্তি নেই।…

লোকটা তবু নড়ে না—কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার সে-ভঙ্গী দেখে মনে হলো, হয়তো এর পিছনে আরো বিচিত্র কোনো রহস্য আছে! বাঙালীর মন—যেখানে মৌনতা, সেইখানেই সে বিচিত্র গাঢ় রহস্যের সন্ধান পায়।…আমি বললুম—বখশিস মিলবে।…

বৃষ্টির বেগ তখন বেশ প্রচণ্ড হয়ে উঠেচে—সঙ্গে সঙ্গে মত্ত বাতাসের তীব্র হুঙ্কার! বাজ হেঁকে যায়—সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা আগুনের হল্‌কা আকাশ চিরে ছুটে আসে—যেন প্রলয়-রাক্ষসীর লক্‌লকে জিভের মত!

লোকটা নিশ্বাস ফেলে বললো,—বখশিস চাই না, বাবু-সাব!…আসুন, শোবেন। কিন্তু আমাকে পাবেন না। রাত দশটার পর আমি ঐ ফাঁড়িতে যাবো।

আমি বললুম—কুছ পরোয়া নেই!

ঘরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেলুম। ঘরখানি নেহাৎ ছোট নয়। এককালে সযত্নে তৈরী হয়েছিল! বড় বড় কাঁচের সার্শি—খড়খড়; একখানা খাট—খাটে বিছানা আছে। দেওয়ালের গায়ে একটা আর্শির টেবিল; আলমারি। পাশে বাথ-রুম, বাথ-রুমে বাথ-টব, ছোট র‍্যাক।…

সে বললে,—জলের দরকার হবে?

আমি বললুম,—কিছু জল রাখতে পারো?

সে বললে,—পারি। ইঁদারা আছে।

লণ্ঠন রেখে সে বেরিয়ে গেল। আমি জুতা-মোজা-বর্ষাতি-কোট খুলে, আরাম করে খাটের বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিলুম।…

ভাবলুম, ঝরুক আকাশ সারা রাত—ঝড়ের গর্জ্জন দুনিয়াকে ভীত-শঙ্কিত করুক—আমি আরাম-নীড় পেয়েচি! আরাম, আরাম…!

চৌকিদার ফিরলো প্রায় আধ ঘণ্টা পরে; ফিরে বললে,—রাত্রে তাহলে নিশ্চয় থাকবেন?

আমি বললুম,—নাহলে এ-দুর্য্যোগে গাছতলায় দাঁড়াবো?

সসঙ্কোচে সে বললে,—পুলিশ-ফাঁড়ি ছিল…

আমি ভাবলুম, সেপাহীদের খাটমল-ভরা খাটিয়া… না বাপু! যদি মরতে হয় তো ভূতের হাতেই মরবো। ছারপোকার কামড়ে পলে-পলে মৃত্যু-যাতনা সহা—সে-কষ্ট আমার পোষাবে না।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পর বললে,—কুঁজোয় জল রেখেচি। বাথ-টবে জল আছে। ওদিক বন্ধ করে দিয়েচি। আপনি এ-দিককার দরজা বন্ধ করে শোবেন তো?

সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল। বললুম,—নিশ্চয়।

সে হতাশভাবে আর একটা নিশ্বাস ফেললো; বেশ বড় নিশ্বাস ফেলে বললে,—আমি ঐ দাওয়াতেই থাকবো। আপনি যখন নেহাৎ থাকবেন—নড়তে পারবো না। বিদেশী লোক—সাহাব-লোক!

চৌকিদার বেরিয়ে গেল…আমি বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলুম। অনেক কথা মনে আসছিল…

সব চেয়ে বড় কথা—হাতে লোকজন আছে না কি? পয়সা-কড়ি সঙ্গে আছে—বোঝে। হয়তো ফাঁড়ির চৌকিদারদের সঙ্গেও যোগ আছে। মেরে-ধরে যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়—তারপর ভূতের কথা বলে ব্যাপারটাকে চাপা দেয়।

ভূতের নামে প্রাণে চমক লাগেনি, এখন এ চিন্তায় শিউরে উঠলুম—সত্যি!…

কিন্তু নিরুপায়! অগত্যা উঠে বড় দরজায় খিল এঁটে লণ্ঠনটাকে আর্শির টেবিলে রেখে বিছানায় শুয়ে চক্ষু মুদলুম।

পরিশ্রম কম হয়নি, কাজেই বর্ষার উদ্দাম মত্ত

হুঙ্কার কাণে এসে বাজলেও কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলেন। তারপর সিগারে একটা দীর্ঘ টান দিয়া যেন দম লইলেন—দম লইয়া কাহিনীর পুনরাবৃত্তি সুরু করিলেন। বলিতে কি, গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেহে রোমাঞ্চ হইতেছিল···তবে ভয়ের কিছু নাই, বুঝিতেছিলাম। যেহেতু ভূতের হাতে পড়িলেও ভদ্রলোক অক্ষত-দেহ লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইয়াছেন!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন,—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। ঘুম কিসে ভাঙ্গলো, বলতে পারি না। তবে ঘুম ভাঙ্গতে বুঝলুম, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। গা কেমন ছম-ছম করছিল—চারিদিক গভীর স্তব্ধ! ঘড়িতে সময় দেখি, বারোটা বেজে সতেরো মিনিট। এত রাত্রে পথে বার হওয়া যায় না। উপস্থিত আশ্রয় ছেড়ে পথে বার হওয়া সঙ্গত হবে না! আছি বেশ!...

থাকলেও কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলুম···মনে হলো, যেন ঘরের মধ্যে কারা চলে বেড়াচ্ছে। ছায়া! দেখা যায় না—কিন্তু বেশ পায়ে চলার একটা শব্দ! লণ্ঠন জ্বলছিল। অন্ধকার ঘরে কেউ স্পষ্ট সন্তর্পিত গতিতে চলে বেড়ালে যেমন অনুভূতি পাওয়া যায়—আলো-জ্বালা ঘরে তেমনি অনুভূতি বোধ করছিলুম।··· এই দেখুন—সে কথা মনে হতে আমার গায়ে এখনো এই রোমাঞ্চ···

ভদ্রলোক আবার তাঁর হাতখানি প্রসারিত করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন।·· কথাটা সত্য।

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, তবু উঠে দাঁড়ালুম। মন তখন—ভয়াতুর না হোক—মনে কেমন একটা অস্বস্তি। ভাবলুম, খড়খড়ি খুলে দি'; শুধু সার্শিটাই বন্ধ থাকুক। তবু কাচের মধ্য দিয়ে মৃদু আলোয় বাহিরের সঙ্গে একটু সম্পর্ক থাকবে! উঠে সার্শির হুড়কো খুলে—খড়খড়ির কপাট দু'খানা···

খোলবামাত্র মনে হলো, যেন বাহিরের বারান্দার কাছে মস্ত মজলিশ বসেছিল—আমার অনধিকার-হস্তক্ষেপে তারা যেন চাপা-হাসি সম্বরণ করতে না-পেরে হেসে চট করে সরে গেছে!···

গা কেঁপে উঠলো। চকিতে দেখে নিলুম—আপাদ-মস্তক কাপড়ে-ঢাকা পুঁটলির মত কি একটা পদার্থ বারান্দায় পড়ে আছে। মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। ক্ষিপ্র হাতে সার্শি বন্ধ করে দিলুম।

তবু আর একবার চাইবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। বুকটার মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল—তবু চাইলুম। চাইবামাত্র নিজের এ-ছমছমানিতে নিজেই লজ্জিত হলুম। ভূত নয়—চৌকিদারটা আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

ফিরে খাটে এসে বসলুম। মনে হতে লাগলো, বাহিরে বাঙলোর চারিদিকে যেন কারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে! ···মনে মনে সান্ত্বনা সংগ্রহ করলুম—গ্রাম্য বিড়াল, শেয়াল, ভাম! নয়তো কোনো নিশাচর পাখী!

শুয়ে চক্ষু মুদলুম। কিন্তু না···

গায়ে আবার রোমাঞ্চ! ক্ষণে ক্ষণে গায়ে যেন হাজার ছুঁচ বিঁধতে লাগলো—তেমনি অস্বস্তি।

বাহিরে ছুটোপাটি দ্রুত···যেন ঝনাৎ করে বাথরুমের দরজা খুলে কে তার মধ্যে ঢুকে আবার সেটা বন্ধ করে দেছে! ভাবলুম···উঠি, নিশ্চয় চৌকিদারটা বাথরুমের দরজা খুলে রেখেছিল। হয়তো এর মধ্যে কোনো রোমান্স আছে! পল্লীর কোনো আহিরাণীর প্রণয়-রঙ্গ হয়তো!

আমার ঘরের দ্বার গেল খুলে। বাথরুমের দিকে যে-দ্বার···সেইটে। চেয়ে দেখি...

যা' দেখলুম, তাতে নিমেষে যেন পাথর বনে গেলুম। আমার চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেল।

একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক। গায়ে প্রকাণ্ড আচকান। বেশমী আচকান···মাথায় সাটীনের টুপি। বেশ সুপুরুষ। কাঠ হয়ে আমি বিছানায় বসে···দৃষ্টি পলক হারা···

রূপকথায় পড়েছিলুম, মায়া-ছড়ির স্পর্শে জীবন্ত মানুষ অচেতন নিস্পন্দ পাষাণ হয়ে যেতো·· আমার ঠিক সেই দশা!

কথা কইবার চেষ্টা করলুম! ঠোঁট নড়লো না—কথা মুখে ফুটলো না। হাত-পা সব যেন অবশ, নিথর, নিস্পন্দ।

পুতুলের চিত্র-করা চোখ। সেই চোখের অবিচল দৃষ্টিতে শুধু সেই মূর্ত্তির পানে চেয়ে রইলুম। ঘরটা তখন আতর-খোসবোর গন্ধে মশগুল হয়ে উঠেচে! কি গন্ধ··· তীক্ষ্ণ স্পষ্ট। আতঙ্কে বোধ হয় চক্ষু মুদে এসেছিল! কারণ, তীব্র একটা সুস্পষ্ট রবে যেন নূতন দৃশ্য চোখে জাগলো।

দেখি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক। তার পিছনে এক নারী। নারী সুন্দরী তরুণী···নীল সাটিনের ঘাগরা পরা। রূপে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়চে!

পুরুষ সবলে নারীর কণ্ঠ চেপে ধরেচে—নারী প্রাণপণে মুক্তির চেষ্টা করচে!···টেবিলের টানা খুলে পুরুষ ক্ষিপ্র হস্তে কি-একটা বার করলে! বার করে নারীর অধরের উপর সেটা রেখে সজোরে যেন লাইন টেনে দিলে! ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠলো একটা রূপার পাত।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্ত্তরব এবং চারিদিক নিমেষে আবীরের রঙে রাঙা হয়ে উঠলো।

ভয়ে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হলো, দেখি, সার্শির কাঁচ ভেদ করে ভোরের আলো এসে ঘরে পড়েছে।...মেঝেয় রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে...আর রক্ত মেখে পড়ে আছে একটি টিয়াপাখী...তার গলা কাটা—পাশে পড়ে আছে...একখানা ক্ষুর

এই সে ক্ষুর।

ভদ্রলোক পকেট হইতে কাগজ মোড়া ছোট একখানি ক্ষুর বাহির করিলেন; আমাদের সামনে ধরিয়া বলিলেন,—গুলগাঁওয়ের মিস্ত্রীর তৈরী ক্ষুর। আশ্চর্য্য ধার। না হলে এক-টানে নাবীর গলাটা কেটে ফেলা সহজ কাজ নয়!

শুধু ক্ষুর কেন! ছুরি, নরুণ, কাঁচি—সমস্ত গুলগাঁওয়ের মিস্ত্রীদের হাতের তৈরী। দাম খুব শস্তা! ক্ষুর—পাঁচ আনা; ছুরি—দু আনা; আর কাঁচি—ছ পয়সা। তা ছাড়া ছুঁচ, ডাক্তারী ল্যান্সেট! যা বলবেন,—আমরা গুলগাঁওয়ে তৈরী করাচ্ছি। বেঙ্গল-বেহার কাটলারি ওয়ার্কস—নাম শুনেছেন? আমি সে কোম্পানীর Sole অর্থাৎ একমাত্র এজেন্ট এণ্ড ক্যানভাসার।...

কি চাই বলুন? লিমিটেড কোম্পানী। কলিকাতায় ব্রাঞ্চ অফিস আছে—No 2 Pagla Modi Lane Ahiritola,...দয়া করে আপনাদের কিছু কিছু কিনতে হবে। সন্তুষ্ট হবেন কাজ দেখে...তা ছাড়া আমার এ জীবিকা!

চটিয়া উঠিলাম,—এমন করিয়া রসভঙ্গ! কহিলাম,—ইনসপেকশন-বাঙলোয় সে ভূত...?

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—বিজ্ঞাপন...গল্প না বললে আপনারা শুধু শুধু দয়া করবেন কেন? ঢের ক্যান্‌ভাসার ঢের জিনিষ নিয়ে পথে বেরিয়েছে তো!

প্রবল হাস্যরোল উঠিল। বেচারী—এতখানি সম্মোহিত করিয়াছে। চুপচাপ বসিয়াছিলাম। গল্প মন্দ জমায় নাই। আমাদের গায়েও কাঁটা দিয়াছে!

সকলেই দাম দিয়া দু'খানা করিয়া ছুরি-কাঁচি কিনিলাম। মোটা একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,—বই-টই লেখেন না কেন?

ক্যানভাসার কহিল,—লিখেছি। তাতে পয়সা হয় না। গল্প রচনার শক্তি নিয়ে ক্যানভাসিংয়ে নেমেছি। দু'পয়সা রোজগার হচ্ছে মশায়। রাত্রে ভূতের গল্প জমে বলেই এ গল্প...প্রয়োজন হলে বাদশাহী কেচ্ছা বলতে পারি। এ যুগের triangle-এর গল্পও মজুত আছে। সব রসের গল্প বলি...... রসিক বুঝে!

ওদিকে ঘণ্টা পড়িল—সিগ্‌নালের ঘণ্টা। মোট-ঘাট বাঁধিয়া প্লাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ভূতের বাড়ী

১

দিদির সঙ্গে সুশীলের জোর তর্ক চলিয়াছিল। নূতনত্ব নাই। এমন তর্ক নিত্য হয়। খুব খুঁটি-নাটি ব্যাপার লইয়া দিদি বিরক্ত হয়, রাগ করে, সুশীল তবু দমিতে চায় না; শেষে দিদির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখে জল আসে, সুশীল তখন উচ্চ হাস্যে আকাশ ফাটাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

দু'তিন ঘণ্টা পরে সুশীল ফিরিয়া আসে; দিদি গম্ভীর মুখে সংসারের কাজে মগ্ন! সুশীল কখনো খাঁচায় ভরিয়া ক্যানারি আনে, নয় তো গিনি-পিগ, কিম্বা সাদা ইঁদুর ···দিদির অভিমান পলায়, দিদি সোৎসাহে বলিয়া ওঠে,—বাঃ, বেশ তো রে! কত দাম পড়লো?

সুশীল জবাব দেয়,—দশ টাকা···

দিদি টাকা ফেলিয়া দেয়; টাকা হাতে লইয়া সুশীল বলে,—সাত টাকা লাভ হলো।

দিদি হাঁ করিয়া সুশীলের পানে তাকায়, সুশীল বলে,—সত্যি দিদি, তিন টাকায় কিনেচি, খাঁচা-শুদ্ধ···

দিদি প্রশ্ন করে,—তবে দশ টাকা বললি যে?

হাসিয়া সুশীল বলে,—না হলে আমার লাভ থাকে কৈ? খরচ কত, জানো? একটা র‍্যাকেট কিনতে হবে, টেনিশ-শু এক জোড়া, বল, চাঁদা···

দিদি বলে,—টাকা-কড়ি পাও না কি সহজ-ভাবে চাইলে?

সুশীল বলে,—কত চাইবো দিদি? চক্ষুলজ্জা হয় না?

দিদি বলে,—চুরি-বাটপাড়ি করে নিতে চক্ষুলজ্জা হয় না, না রে?

সুশীল বলে,—এতে একটা সান্ত্বনা থাকে এই যে, বুদ্ধি-বৃত্তিতে শাণ দেওয়া হয়। Worldly success-এর মূলে হলো এই শাণিত বুদ্ধি!

দিদি পলকের জন্য গুম্ হইয়া সুশীলের মুখের পানে তাকায়, পরে সদ্য-আনীত পশু-পক্ষীর সেবায় মনোনিবেশ করে; সুশীলও আসিয়া সে সেবায় যোগ দেয়।

দিদি আর ভাই লইয়া সংসার, মাথার উপর আর কেহ নাই। দিদি বিধবা, সুশীলের চেয়ে আট-দশ বছরের বড়; ছেলে-মেয়ে নাই। ছোট ভাইটিকে আজ বারো বৎসর বুকে রাখিয়া মানুষ করিতেছে। সুশীল এবার বি, এ পাশ করিয়াছে; ল পড়িতেছে; এম, এও সেই সঙ্গে। ওকালতি করিয়া খাইবার প্রয়োজন নাই। দিদির যা সম্পত্তি আছে, নির্ব্যূঢ় স্বত্বে দিদিই তার মালিক। এবং···

কিন্তু সে কথা থাক্। ওবেলায় যে তর্ক চলিয়াছিল, সেই তর্কের কথা বলি।

দিদির সাধ, ভাই মানুষ হইয়া উঠিল, এবার তার বিবাহ দিয়া···

কিন্তু সুশীলের কাছে সে কথা তুলিলে সে হাসিয়া উড়ায়। দিদি আজ পণ করিয়াছিল, সুশীলকে আর ছাড়া নয়! একটি মেয়ে দেখিয়া রাখিয়াছে, যেমন রূপ, তেমনি শিক্ষা, বাপের তেমনি পয়সা আছে, একালে যেমনটি হওয়া উচিত! সুশীলের কাছে সে কথা তুলিতে তর্ক বাধিল এবং তর্কের ফল নিত্য যেমন হয়, আজও তাই। হাসিয়া সুশীলের অন্তর্দ্ধান এবং দিদির সেই মুখ গম্ভীর করিয়া গুম্ হইয়া বসা!

রাত্রে সুশীল আহার করিতে বসিলে কথার পূর্ব্বে ভূমিকা ফাঁদিয়া দিদি বলিল,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি এমনি ধারাই হয়, তো বেশ, তুই এখানে থেকে যা খুশী কর্, আমি সামনের মাসে হরিদ্বার, নয় দ্বারকা চলে যাবো।

সুশীল বুঝিল, এ ভূমিকার পরে দিদি কোন্ কাহিনী সুরু করিবে। সে কহিল,—আমিও তাই ভাবি দিদি, আমার জন্য সত্যি চিরকাল কাঁহাতক বন্দী হয়ে থাকবে! তা, হরিদ্বার-দ্বারকা কেন? বলো তো, রামেশ্বর-সেতুবন্ধ অবধি যাতে যেতে পারো, ফর্দ্দ বানিয়ে খরচের খশড়া তৈরী করে দি। মায় ট্রেণের টাইম, কোন্ ষ্টেশনে কখন্ গাড়ী বদল করতে হবে, তা পর্য্যন্ত।

দিদি কহিল,—থাক্, ও কষ্ট তোমার না করলেও চলবে! আমি বেশ হুঁশিয়ার লোককেই সঙ্গে নিয়ে যাবো। ওবাড়ীর কালীপদ···চাকরি নেই, বসে আছে, সে যাবে, তার মা যাবে—আমাকে কোনো ঝক্কি পোহাতে হবে না।

সুশীল কহিল,—সব তা হলে ঠিক করে রেখেচো?

দিদি কহিল,—রেখেচি। তবে একটা কাজ শুধু বাকী···

—কি?

দিদি কহিল,—তোর বিয়ে। বিয়ে করিস, না করিস, তোর মর্জ্জি! ভাবনায় আমার ঘুম হচ্ছে না, এমন নয়

…তবে পাড়ায় পাঁচ জনে বলে…এর পর খারাপ হয়ে যাবি! কি যে হবে…

হাসিয়া সুশীল কহিল,—হুঁঃ! বিয়ে আমি করবো না। এই যে স্বচ্ছন্দ আরাম, এ আরাম খোয়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব!

দিদি কহিল,—বিয়ে করে লোকে বেয়ারামে ভোগে—না? সংসারে আরাম পাবে বলেই মানুষ বিয়ে করে…

সুশীল কহিল,—সকলের আরামের ধারণা এক রকম নয়, দিদি…

দিদি গম্ভীর হইয়া রহিল, সুশীল খাইতে লাগিল।

সহসা দিদি কহিল,—কেন বিয়ে করবি না, বলতে পারিস্? তোর ভয়টা কিসের?

সুশীল কহিল,—ভয়! প্রথমেই ধরো, এই স্বচ্ছন্দ জীবন-প্রণালীর মধ্যে এক অজানা লোক এলে তাকে জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক ব্যাপারে ওলট-পালট ঘটে যাবে। তার পর তাঁর অস্তিত্ব প্রতি পলে আমার স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটাবে। আমার মনের সঙ্গে স্ত্রীর মন মিশ খাবে কি না, সেটা ভাবনার কথা। তাতে risk অনেকখানি…

দিদির গা জ্বলিয়া উঠিল। দিদি কহিল,—মেয়ে আমি দেখেচি। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি শান্ত…রূপেও লক্ষ্মী!

সুশীল কহিল,—ঐটুকুই বুঝি স্ত্রীত্বের passport ঠাউরেচো? হয়তো সেকালে ঐটুকুই সব ছিল…কিন্তু কালের গতি…

দিদি কহিল,—ওরে, এ-মেয়ে গান-বাজনা জানে, সেলাই জানে; আর লেখা-পড়ায় ভালো। ম্যাট্রিক পাশ দেবে…বুঝলি?

সুশীল কহিল,—হুঁ…

সে আবার ভোজনে মনোনিবেশ করিল। দিদি নিজের মনে সংসারের বিচিত্র রঙীন বর্ণনায় তার শ্রুতি-বিবর পরিপূর্ণ করিয়া চলিল…

ভোজন শেষ হইলে দিদি কহিল,—তা হলে কি বলিস্? মেয়েটিকে একবার দেখবি?

সুশীল কহিল,—দেখবো!…তার কথায় সুগভীর অভিনিবেশের আভাস!

দিদি কহিল,—হ্যাঁ, ছাখ্। একালের ছেলে, ডাগর হয়েচিস, নিজের পছন্দ-অপছন্দও আছে। সত্যিই তো, কেন দেখবি না?…ছাখ্…দেখলে 'না' বলবি না…এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।

সুশীল কহিল,—বেশ, তুমি যখন বলচো·

দিদি কহিল,—তা হলে কালই…ও আর দেরী করে না। তারাও আশা করে বসে আছে। এখানে যদি না হয়, অন্যত্র চেষ্টা দেখবে তো! তাদের হলো মেয়ে·· বলে, সাগর ছেঁচতে হয় যদি পাত্র আনতে, তাও তাদের করতে হবে!

সুশীল কহিল,—কাল নয়, সময় হবে না। কাল আমাদের ক্লাবে টুর্ণামেণ্ট…নিশ্বাস ফেলতে সময় পাবো না।

দিদি কহিল,—বেশ, তবে পরশু··

সুশীল কহিল, কাল জবাব দেবো।

দিদি কহিল,—এর আবার জবাব কি! একবার শুধু গিয়ে দেখে আসা…আরো পাঁচ কাজে ঘোরো তো… এ অমনি পথ চলতে এক ফাঁকে দেখে নেওয়া…

সুশীল কহিল,—বেশ।…

২

পরের দিন সন্ধ্যায় টুর্ণামেণ্ট সারিয়া সুশীল ফিরিল। ভারী ব্যস্ত ভাব। তার হাতে একখানা বাঙলা খবরের কাগজ।

কাগজ হাতে ভিতরে আসিয়া সুশীল ডাকিল,—দিদি…

দিদি কহিল,—কি রে?

সুশীল কহিল,—এক মজার খপর আছে…

দিদি কহিল,—কি খপর?

সুশীল কহিল,—এই কাগজ পড়ে ছাখো…

দিদির সামনে সুশীল কাগজখানা মেলিয়া ধরিল, কহিল,—এই যে…

'মফঃস্বল' স্তম্ভে বর্জ্জয়েস অক্ষরে ছাপা এক দীর্ঘ প্যারা। দিদি পড়িল…

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে যে পথ পূর্ব্বদিকে পলাশীতে গিয়াছে, ঐ পথের উপর বহুকালের পুরাতন একটি দ্বিতল বাড়ী আছে। বাড়ীর সঙ্গে বাগান, পুকুর; কোনো বস্তুরই অভাব নাই। এককালে এক ধনীর বাস-ভবন ছিল। পরে নানা কারণে গৃহস্বামীর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। বাড়ীটি খালি পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি মিল খুলিবার জন্য ঐ বাড়ী কিনিবার অভিপ্রায়ে এক সাহেব সেখানে গিয়া থাকেন। সকালে সাহেবকে মৃত অবস্থায় পুকুর-ঘাটে দেখা যায়। এ ব্যাপারের মীমাংসার জন্য সাহেবের এক বন্ধু ঐ গৃহে যান; তাঁর মৃতদেহও পরদিন প্রাতে একটা আম-গাছের ডালে লটকানো দেখা যায়। তদন্তে জানা গিয়াছে, ঐ বাড়ী উপদেবতার উপদ্রব-হেতু বহু কাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রামের লোক রাত্রি দশটার পর ওবাড়ীর সামনে দিয়া পথ চলে না। আমাদের মধ্যে এমন কোনো সাহসী তরুণ নাই, যিনি আসিয়া এ রহস্যভেদে সমর্থ হন? ভূত নাই বলিয়াই জানি। ভূতের নামে অত্যাচারীর দল আস্তানা বাঁধিয়া ভয় দেখায়, আমাদের এমনই বিশ্বাস। অথচ লোকাল-পুলিশ বলিতেছে, ওখানে বদমায়েসের আড্ডা নাই। তারাও

রাত্রিকালে ওবাড়ীর সীমানায় পদার্পণ করিতে ভয় পায়। এই বিজ্ঞানের যুগে এমন কথা কাণে শুনিব, স্বপ্নে ভাবি নাই! সম্প্রতি আবার নাকি ও-অঞ্চলে গোলযোগ ঘটিয়াছে। আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। এদিকে গভর্ণমেন্টের ও আমাদের ভলান্টিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পড়িয়া দিদি কহিল,—পড়লুম। তা কি হবে?

সুশীল কহিল,—কাল আমরা সদলে যাবো কাঁচড়াপাড়ায় এই রহস্য ভেদ করতে···

দিদির দুই চোখের দৃষ্টি কঠিন হইল। দিদি কহিল,—ঐ দু-দুটো সাহেব মরেচে, তা জেনে···?

হাসিয়া সুশীল কহিল,—এ যুগে ঐ ভূতুড়ে কাণ্ড তুমি মানতে চাও, দিদি? ভূতও মানো তা হলে,··· বলো?

দিদি কহিল,—ভূত না হোক, কোনো বদমায়েস লোকের কাণ্ড, নিশ্চয়।···

সুশীল কহিল,—কিন্তু পুলিশের কথাও তো পড়লে! তা ছাড়া কাগজওয়ালা এমন করে তরুণদের ডাক দেছে যখন···

দিদি কহিল,—সম্পাদক তো বেশ টিপ্পনী কেটেচে—বিজ্ঞানের যুগ, বদমায়েসের আস্তানা, তরুণের সাহস—এ সব বেশ! নিজে যাক্ না তদন্ত করতে···

সুশীল কহিল,—কাগজ লিখতে হলে রাজ্যের জ্ঞান আর সাহস নিজের আছে বলে প্রচার করতে হয় কি না; তাই! না হলে সম্পাদক মহাশয়কে যেতে বললে, তাঁর হাড়ে নিশ্চয় কাঁপন লাগবে!···

দিদি কহিল,—সব ভুয়ো! এমন কাণ্ডও না কি ঘটে।

সুশীল কহিল,—দেখাই যাক না; একটা adventure!

দিদি কি ভাবিল; ভাবিয়া কহিল,—না। খুনখারাপির মধ্যে যাবি কি, বল্?

সুশীল কহিল,—আমরা দলে থাকবো আট জন; বন্দুক সঙ্গে থাকবে।

দিদি মুখ ফিরাইয়া কহিল,—যা ভালো বোঝো, করো, আমার কোন্ কথাটাই বা শুনচো···

সুশীল কহিল,—কোন্ কথাটা শুনি না?···ও·· বিয়ে? আচ্ছা, ফিরে আসি, তার পর মেয়ে দেখবো, এবং···

দিদি কহিল,—তোমার খুশী।

৩

পরের দিন বৈকালে কোনো মতে ছুটিয়া সুশীল গিয়া শেয়ালদায় ট্রেণ ধরিল, যে-কামরা সামনে পড়ে! দিদির শরীর ভালো ছিল না, এবং দিদি কাঁচড়াপাড়া যাওয়া লইয়া অনেকখানি বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল। অনুমতি মিলিল প্রতিশ্রুতি দিয়া! বিবাহ ব্যাপারে সুশীল সত্যই নামের গৌরব রাখিবে, শান্ত ছেলেটির মত বিবাহ করিবে। কাজেই বিলম্ব!

ট্রেণ বারাকপুরে থামিতে সুশীল ভাবিল, সঙ্গীদের সন্ধান করিবে। পরক্ষণে ভাবিল, থাক। তারা ভাবিতেছে, ভয়ে সুশীল সরিয়া পড়িয়াছে। বেশ হইবে, একদম কাঁচড়াপাড়ায় গিয়া তাদের তাক লাগাইয়া দিবে।

কাঁচড়াপাড়ায় ট্রেণ থামিলে সুশীল নামিল, সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কা কস্য পরিবেদনা! সঙ্গীরা? দেবকী? প্রফুল্ল? প্রমথ? অসীম? অনিল? হেম?··· কাহারো চিহ্ন নাই! সে অবাক্! তারা আসে নাই?···

যদি আগের ট্রেণে আসিয়া থাকে···

নিঃশব্দে সে আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল। দু'খানা বাস দাঁড়াইয়া আছে,থার্ড ক্লাশ গাড়ীও দু'চারখানা। তবে থার্ড ক্লাশ গাড়ীগুলার পানে চাহিলে প্রাণে মায়া জাগে! ও গাড়ী কবে সেই পাঠান-যুগে মিস্ত্রীখানা হইতে বাহির হইয়াছিল, ঘোড়াগুলা যেন সত্যযুগে অশ্বমেধের হাত ফস্কাইয়া কোন্ খোঁয়াড়ে অনাহারে পড়িয়াছিল! খোঁয়াড়ে থাকার জন্য আকারেও এমন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে···মনে হইল, সেকালের পক্ষিরাজ কি সত্য এমনি ছিল? কে জানে!

বাসে গিয়া সে উঠিল। বাসে বিবিধ শ্রেণীর লোক, বোচকা-বুচকির অন্ত নাই!···

বাস চলিতে এক বাঙালী ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করিল, —আপনি কোথায় যাবেন?

সুশীল কহিল,—পলাশী।

—পলাশী!···কার বাড়ী?

সুশীল সংক্ষেপে ঠিকানা বলিল। বাস-শুদ্ধ লোক চমকিয়া সমস্বরে কহিল,—সেই ভূতুড়ে বাড়ীতে? এই সন্ধ্যাবেলায়?

সুশীল কহিল,—তাই।

তারা মৃদু গুঞ্জনে বুঝাইয়া দিল, এ বয়সে প্রাণে বহুৎ দাগা না পাইলে, ও-গৃহে প্রবেশের সাধ কাহারও মনে জাগিতে পারে না। নিশ্চিত মরণ জানিয়া কে কবে সাপের মুখে হাত দেয়?···

সুশীল কহিল,—আপনারা কেউ কখনো দেখেচেন কিছু?

সকলেই জানাইয়া দিল, না দেখা হোক, যা শুনা গিয়াছে, তা দেখার সামিল!

সুশীল কহিল,—ঐ সাহেব দুটো যে মলো, পুলিশ এসে তদন্ত করলে না?

তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে তারা জানাইল, তদন্তের কিছু

বাকী ছিল না! টিকটিকি পুলিশ অবধি আস্তানা পাতিয়াছিল…

—তাদের তো প্রাণহানি ঘটে নি।

—তারা কি রাত্রে থাকতো? হুঁ টাঁ্যা-কোঁ যা-কিছু তাঁদের, তা ঐ দিনের বেলায়! কোনো সন্ধান পেলে না।

—ও পথে রাত্রে কেউ হাঁটে না?

—রাজ্য দিলেও নয়।…

বাস চলিতে লাগিল। রেলোয়ে লাইনের তলা দিয়া পথ। সেই পথে একটু আসিতে কাঁপা। দু'ধারে রেলোয়ে কোয়ার্টার্স—যেন ওদিকে পাশা-পাশি পায়রার খোপ সাজানো রহিয়াছে!

সুশীল কহিল—সে বাড়ী কি পথের উপর?

—না।

—আমায় কোথায় নামতে হবে, একটু হদিশ বাৎলে দেবেন দয়া করে……

দলে এক বৃদ্ধ ছিলেন; তিনি কহিলেন,—এ দুর্মতি ছাড়ো, বাপু! ও-বয়সে মানুষ একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ হয়, মানি,—কিন্তু মানুষের কাছেই গোঁয়ার্তুমি চলে। তা'বলে ভূতের সঙ্গে…

তাঁর কথার খেই ধরিয়া আর একজন বলিল,—বটেই তো! ঐ যে জাগুলের জোগু ওস্তাদ…শুনচেন মশাই? শুনুন তবে তাঁর গল্প…বলি…

সুশীল কহিল,—বলুন…

লোকটি কহিল—ভূতের ওস্তাদ—তিন ফুঁয়ে ভূত তাড়াতো। যেমন মন্তর, তেমনি ফুঁ—মাদুলি-টাদুলির বিদ্যাও জানা ছিল। একবার রায় বাবুদের কাছে গলাবাজী করে সে ঐ বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে। রাত তখন দশটা—রায় বাবুদের জোয়ান পালোয়ান পাঁচ-সাতটা পথের মোড়ে পাহারা মোতায়েন ছিল—একটু শব্দ পেলেই রৈ-রৈ শব্দে গিয়ে পড়বে!…ওঃ, কবেকার কথা! শোনা কথা! তবু এই দেখুন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

লোকটি স্তিমিত আলোকে হাত বাড়াইল।

সুশীল কহিল,—বলুন, বলুন…ওস্তাদজীর কথা…বেশ লাগচে।

লোকটি আবার গল্প ধরিল,—বারোটা মশাল ছিল সঙ্গে…এক ঘণ্টা চুপ-চাপ…বেশ কাটলো। তার পর বললে হয়তো প্রত্যয় হবে না,—বারোটা বাজা, অমনি কোথা থেকে ভারী ঝড় উঠলো, মশালের দপদপে আলো টুক্ করে নিভে গেল। যণ্ডা পালোয়ানগুলো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করচে, অমনি এক হুহুঙ্কার রব… বাড়ীর ছাদে বাজ পড়লো…হৈ-হৈ কাণ্ড! পরের দিন সকালে পালোয়ানগুলোকে সকলে দেখে, রায় বাবুদের পুকুরের রাণায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে, আর জোগু ওস্তাদ তাদের পায়ের নীচে! কি করে এমন ঘটলো, তা কেউ বলতে পারে না!

বাসের এক কোণে ছিল এক নারী, তরী-তরকারী বেচিতে নৈহাটী গিয়াছিল! সে কহিল,—থামো বাবুরা, আমায় আঁধারে যেতে হবে জঙ্গল পার হয়ে…বুড়ো বয়সে মুখ থুবড়ে মরবো কি শেষে!

বাসের মধ্যে চকিতে সুগভীর স্তব্ধতা! শুধু বাসের কর্কশ ঘর্ঘর চক্র-ধ্বর! কোয়ার্টার্সের গণ্ডী পার হইয়া বাস মুক্ত প্রান্তর-পথে পড়িয়াছে। দু'ধারে আঁধার—মাঝে মাঝে গাছ-পালা সে আঁধারকে আরো ঘন করিয়া তুলিয়াছে!

বাসের এক দিক্ হইতে ক্ষীণ রব উঠিল,—গা ছম্ ছম্ করচে…কি আঁধার!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—আলো-টালো সঙ্গে আছে?

সুশীল কহিল,—আমার এই ব্যাগের মধ্যে দুটো এ্যাসেটিলিন গ্যাস-ওয়ালা সাইক্ল্ ল্যাম্প আছে, টর্চ্চ আছে তিনটে, আর একটা পিস্তল।

—হুঁ…

আবার সেই স্তব্ধতা! বাহিরে ঝিল্লী-ঝঙ্কৃত বনবীথি, বন্য লতা-গুল্মের উগ্র কটু গন্ধ…

এক জন কহিল,—কাল আপিসে যাওয়া আর ঘটবে না…

সুশীল কহিল,—কেন?

সে কহিল,—আর কেন! জোয়ান ছোকরা… সকালে ঐ দেহ লণ্ড-ভণ্ড হয়ে কোথায় লুটোবে, গাঁয়ে গোলমাল পড়ে যাবে—যাকে রীতিমত হুজুগ বলে!

সুশীল কৌতুক বোধ করিল, কহিল,—হুঁ। আমি দেখতে পাবো না—এই ভেবে মনে আপশোষ জাগচে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এ আপশোষ নিজেই তো বন্ধ করতে পারো, বাপু…

—সেইটে পারচি নে বলেই আপশোষ আরো সীমা-হীন হয়ে উঠচে!

স্ত্রীলোকটি শুনিতেছিল,—নিজের মনে কহিল,—মা বাপ ছেড়ে দিলে কি করে, কে জানে!

কথাটা সুশীলের কাণে গেল। সুশীল কহিল,—মা-বাপ নেই গো বাছা…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া স্ত্রীলোকটি কহিল,—তা তোমার মতি-গতি দেখেই মনে হয়েছিল বাপু…

বাস সহসা থামিল। বন-মধ্য হইতে একটু আলোর রেখা…

সুশীল কহিল,—এইখানে বুঝি আমি নামবো?

—না, না—প্যাসেঞ্জার আসচে।

—এখানেও প্যাশেঞ্জার ?…

প্যাশেঞ্জার আসিল, এক জোয়ান কাব্‌লিওয়ালা।

সুশীল ভাবিল, সাবাস্ কাবুলী, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ, টাকা ধার দিয়া বাঙলার গরীব চাষাকে রক্ষা করিতে!

সুশীল কহিল,—এইখানেই থাকা হয় না কি মিয়া সাহেব ?

পাণের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কাবলী কহিল,—ইলিঁসঁহরে থ কি।

—তা এধারে চলেছো কোথায় ?

—জঁগুঁলে…

—ফিরবে কখন্ ?

—কঁল।…

একটু কথা…কিন্তু এই ছোট্ট কথাটুকুতে আশ-পাশের গ্রামের গরীব চাষাভূষার পরিচয় তার মনে জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল। সোনার বাঙালার মাটী চষিয়া দিন গুজরাণ করে যে চাষা, তার অভাব ঘুচাইতে আসে লাঠি-ঘাড়ে জোয়ান কাবুলী টাকা আর হ্যাণ্ডনোটের ছাপানো খাতা লইয়া…ইহার পরেও বাঙালী চাষ-বাসের কথা মুখে আনে!…

জঙ্গলের মধ্য দিয়া বাস চলিয়াছিল—সেই জঙ্গল ফুঁড়িয়া আঁকা-বাঁকা পথ—বাসের হেড্‌লাইটের পথ-রেখায় পথের আভাস পাওয়া যায়।

এক মাঠের প্রান্তে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এই পলাশী। এইবার নামো তা হলে। সে বাড়ী ঐ দিকে…

সুশীল দেখিল, বাড়ীর চিহ্ন দেখা যায় না, মাঠের প্রান্তে শুধু নিবিড় বন।

—ঐ বনে ?

—হাঁ।

বাস থামিল। সুশীল নামিল; নামিবার পূর্ব্বে ব্যাগ খুলিয়া দুটা টর্চ্চ জ্বালিয়া লইল।

বাস ছাড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে একরাশ কণ্ঠস্বর—

—গেরোর ভোগ…

—নিয়তি…

—গোঁয়ার্তুমির ফল ভোগ করবে! নাচার!…

বাস চলিয়া গেল। তার চক্র-রব শূন্যে মিলাইলে সুশীল টর্চ্চের আলোয় দিক্ নির্ণয় করিল, ঐ গাছের আড়ালে মস্ত কি যেন…বাড়ী ? তাই!

পায়ের নীচে কি একটা সর-সর করিয়া সরিয়া গেল। সাপ ? কে জানে! নিমেষের জন্য বুকটা কেমন দুলিয়া উঠিল। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সুশীল ব্যাগ হাতে তুলিয়া—দুটা টর্চ্চ জ্বালিয়া তাহারি আলোয় পথ-রেখা খুঁজিয়া বনের দিকে অগ্রসর হইল।

অন্ধকার বন। বনের আড়ালে জীর্ণ দোতলা বাড়ী। টর্চ্চের আলোয় দ্বারের সন্ধান মিলিল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, তবে কপাটের খানিকটা ছিল ভাঙ্গা, কাজেই ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধিল না।

সামনে উঠান। উঠানে এক রাশ জঙ্গল, আবর্জ্জনার সীমা নাই। চারি দিক্ স্তব্ধ। সুশীল আলো ফেলিতে ছুঁচা-ইঁদুর প্রভৃতি নিশাচর জীবগুলা একটু কলরব তুলিল; দু'চারিটা বাদুড় উড়িয়া পলাইল।

পথ খুঁজিয়া সুশীল দোতলায় উঠিল। সিঁড়ির পরেই মস্ত বারান্দা। রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাথার উপর ছাদের কড়ি দু'একখানা পড়ো-পড়ো; ছাদের খানিকটা ফুটা, টালি নাই। সেই রন্ধ্রপথে নিশীথিনীর জমাট কালো অন্ধকার হু-হু করিয়া ঢুকিতেছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার। সে অন্ধকারের পিছনে দু'একটা ঘোলাটে নক্ষত্র সুশীলের চোখে পড়িল। খান চারেক ধূলি-লিপ্ত বরগা জড়ো করিয়া কোঁচার খুঁটে ধূলা ঝাড়িয়া সুশীল তাহাতে চাপিয়া বসিল, বসিয়া ব্যাগ খুলিল। ব্যাগের মধ্যে ছিল এ্যাসেটিলিনের দুটা বাইক্ ল্যাম্প; সেই ল্যাম্প দু'টা জ্বালিয়া রেলের বাতির মত আলো ঘুরাইয়া বাড়ীর যতখানি অংশ বসিয়া দেখা যায়, সে দেখিয়া লইল।

বারান্দার ওধারে সার-সার ঘর। ঘরে বড় বড় জানলা। দু'একটা জানলার কপাট ভাঙ্গা; কাঠের চওড়া রেলিঙ দেখা যাইতেছে, রেলিঙ ঘেরিয়া মাকড়সার বিস্তীর্ণ জাল। কত কালের নিরুপদ্রবতায় ও জাল রচিয়া উঠিয়াছে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার! সুশীল ভাবিল, ভূত যদি থাকে তো মাকড়সাগুলার প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ নাই, নিশ্চয়।

ছাদের দিকে লণ্ঠন ঘুরাইয়া সে আলো ফেলিল, আলিসার রঙ যেন কালি ঝুল! ছাদে জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই! কোথাও এতটুকু সাড়া নাই! শব্দ নাই। না কোনো বাদুড় ডানা ঝাড়ে, না কোনো পাখী বিকট রব তোলে। একটা কালো বিড়ালের ডাক! চারি দিকে এমন স্তব্ধতা যে নিজের নিশ্বাসের শব্দটুকুও অনায়াসে শুনা যায়!…

তাচ্ছল্যের মৃদু হাসি সুশীলের অধরে উথলাইয়া গেল। আলো রাখিয়া সে ব্যাগ হইতে ষ্টেশনে সদ্য কেনা ইংরাজী ছ'পেনি দামের ডিটেক্‌টিভ নভেল খুলিয়া বসিল।…

দু পরিচ্ছেদের পর প্লট জমিয়া উঠিয়াছে। সুশীল উপন্যাসের মধ্যে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল।…

সহসা একটা শব্দ···যেন দ্রুত-পায়ে সিঁড়ি দিয়া কে উপরে উঠিয়া আসিতেছে···পায়ে জুতা নাই। সুশীলের শুনিবার কথা নয়, কিন্তু উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ শেষ হইয়াছে, বইয়ের পাতা কাটা নাই, বইয়ের পাতা হইতে মন খসিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই প্রথমে সে উৎকর্ণ এবং পরক্ষণে আলোটা সিঁড়ির মুখে ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির প্রান্তে লাল টকটকে শাড়ীর পাড় এবং এক তরুণীর মুখ··মাথায় কাপড় নাই, এক রাশ কালো চুল—খোঁপা নাই। আর দুটি চোখ···ভয়ে ভরা! শুধু ভয়? করুণ বেদনা যেন মূর্ত্তি ধরিয়াছে! কিন্তু চকিতে সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল।

সুশীলের দেহে রোমাঞ্চ! সুশীল আত্মগতভাবেই প্রশ্ন তুলিল,—কে?

চারিদিক্ স্তব্ধ! তার স্বর প্রতিধ্বনিতে ভাঙ্গিয়া বাতাসে মিশিল। কেহ সাড়া দিল না।

কিন্তু এ ভুল নয়! সুশীল স্পষ্ট দেখিয়াছে, তরুণীর মুখ··এবং সেই আর্ত্ত দৃষ্টি···

দুই হাতে দুটি বাইক ল্যাম্প ও পকেটে পিস্তল লইয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুত পায়ে সিঁড়িতে আসিল। কেহ নাই। সুশীল নীচে নামিল, দাঁড়াইয়া ডাকিল,—কে?

কোনো সাড়া নাই! সুশীলের বুকের মধ্যে একটা শব্দ—দুপ্, দুপ্,···দুপ্, দুপ্,···

ভয়? সুশীল দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে তাকাইল,—কেহ কোথাও নাই। সেই স্তব্ধতা!···

ধীরে ধীরে সে দোতলার বারান্দায় আসিয়া বসিল। বই? না, পড়া চলে না! হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে! খবরের কাগজে পড়া সেই সাহেবদের মৃত্যুর কথা মনে জাগিল। সত্যই যদি···

পরক্ষণে সে ভাবিল, তাও কি সম্ভব! ভূতে মানুষ মারিয়া গাছে লট্‌কাইয়া দিবে? ভূত কি সার্কাস দেখাইতে চায়? না, বীরত্ব? না, কি?···

তবু চুপ করিয়া থাকা চলে না! ভূত যদি হয় তো এমন সতর্ক মানুষের কাছে সে ঘেঁষিতে চাহিবে না! সুশীল আবার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাতা কাটিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিল।

বহুক্ষণ···সহসা কেমন একটা অস্বস্তি! আলো তুলিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরাইতে দেখে, ছাদের কোণে··· হাঁ, শাড়ী·· রমণী-মূর্ত্তি! মূর্ত্তি হাতছানি দিয়া তাকে ডাকিতেছে। চকিতের দেখা! তার পরই সে-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। সুশীল ভাবিল, ভূত? না, নারী? যাই হোক, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—এক হাতে দুটা লাইট, অপর হাতে পিস্তল। বারান্দা ঘুরিয়া, বহু ঘর পার হইয়া একেবারে ছাদের সিঁড়ি···সুশীল সেই সিঁড়ি ধরিয়া ছাদে গিয়া উঠিল।

আলো তুলিতে দেখে, কোণে লাল পাড় শাড়ী-পরা তরুণী। বিবর্ণ মুখ, চোখে সেই আতঙ্ক! সুশীলকে দেখিবামাত্র তরুণী আর্ত্ত রব তুলিয়া এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল পলকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। চোখের ভুল? না। ঐ তো তরুণীর মূর্ত্তি···দুই হাত বুকে রাখিয়া, চোখে আবেদন জাগাইয়া···ভয়ে যেন শিহরিয়া রহিয়াছে।

সুশীল কহিল,—তুমি মানুষ? বলো। না হলে আমার হাতে এই পিস্তল···দেখচো···?

সুশীল অগ্রসর হইল। তরুণীর ভয় বাড়িল। সে কহিল,—না—না। তুমি কে? কে···?

মানুষের স্বর!···সুশীল আরো অগ্রসর হইল। তরুণী দু হাতে মুখ ঢাকিল—একটা ক্রন্দনের রব···

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হইতে কার বজ্রমুষ্টি সুশীলকে এক পাক ঘুরাইয়া দিল—সুশীল স্তম্ভিত!

তার সে ভাব কাটিল বজ্র-স্বরে—আজ তোকে ধরেচি। পাজী! শয়তান! তোর এই কাজ!···

এও মানুষের স্বর! সুশীল কহিল,—ছাড়ো, আমি সব কথা বলচি···

—কোনো কথা নয়···

সুশীল তার কবলে! পিস্তল পড়িয়া গেল! লোকটা সুশীলকে টানিয়া লইয়া চলিল—সেই সিঁড়ি··· সিঁড়ির কাছে আসিয়া লোকটা কহিল,—আগে তোর ব্যবস্থা করি, তার পর ওর··

সুশীল যেন মন্ত্রমুগ্ধ! তার এমন শক্তি নাই যে লোকটার আক্রমণ রোধ করে!

সিঁড়ির পাশে ঘর। সুশীলকে সেই ঘরে ফেলিয়া লোকটা বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল, তার পর সিঁড়ির উপর দুপ্ দাপ্ শব্দ!···সুশীল কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে শুনিল, তীব্র হুঙ্কার,—চলে আয় বলচি···সর্ব্বনাশী···হুঙ্কারের সঙ্গে ও-পক্ষ হইতে আর্ত্ত ক্রন্দন! যেন বজ্রাঘাতের সহিত বর্ষার ধারা···

হুঙ্কার-রব একটু পরে মিলাইয়া গেল। আবার সেই প্রচণ্ড স্তব্ধতা!···

সুশীল ভাবিল, এ কি রহস্য! সে উঠিয়া দাঁড়াইল টর্চ্চের আলোয় দেখে, ঘরে আবর্জ্জনা। ঝুলে মাকড়শার জালে ঘর ভরা। নড়িতে চড়িতে মাথায় মুখে সে-ঝুল নাগপাশের বাঁধন কষিয়া দেয়!

৫

স্বপ্ন নয়! অথচ...

ঠিক যেন আষাঢ়ে গল্প! অনেক কথা সুশীলের মনে জাগিতেছিল···এ তো ভুত নয়! সহসা তবে খবরের কাগজে ভূতের বাড়ীর অসহ্য দৌরাত্ম্যের কাহিনী ছাপা হয় কি কারণে?...বসিয়া এ-সব কথার আলোচনায় লাভ নাই! সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দ্বার ধরিয়া নাড়িল; ওদিক্ হইতে শিকল বন্ধ। যদি ভূত হয়, তাকে আরাম করিতে দেওয়া নয় ভাবিয়া সবলে সে দ্বারে পদাঘাত সুরু করিল···কত কালের কপাট···লাথির ঘায়ে ভাঙ্গিবে না?···

ভাঙ্গা চাই। যদি ভূত না হয়, তাহা হইলেও রহস্য এবং এ রহস্যের অন্তরালে এক তরুণী নারী! আর্ত্ত অসহায়...তার চোখে সেই দৃষ্টি! পুরুষটা নিশ্চয় খুব পীড়ন চালাইয়াছে! নারী যেই হোক, প্রবলের পেষণে যাতনার তার সীমা নাই!

দ্বারে লাথির পর লাথি পড়িল। তবু অটুট। সারা বাড়ী ঝন্-ঝন্ করিয়া ওঠে, তা ছাড়া দ্বার ভাঙ্গিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না!···

নিরুপায়! সুশীল চুপ করিয়া বসিল, চক্ষু মুদিয়া সমস্ত মনটুকুকে শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রিত করিয়া···

চারিদিক্ স্তব্ধ!···এবং সেই স্তব্ধতায়···

ঘুম ভাঙ্গিতে সুশীলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহার মধ্যে ঘুম আসিল কখন্, কি করিয়াই বা আসিল, কখন্ যে আসিল, আশ্চর্য্য!

আবার সে উঠিল, উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিতে দ্বার খুলিয়া গেল। সুশীল দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। ছাদের দিক্ হইতে একটু আলো!···ও···হাঁ, ভোরের আলো!

সুশীল সোজা গিয়া ছাদে উঠিল। কেহ নাই! পিস্তলটা পড়িয়া আছে।···

ব্যাপার যে ভৌতিক নয়, তা সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই নর আর নারী···তারা কোথা হইতে কেন আসিয়াছিল? ছাদ হইতে চারিদিকে চাহিল, দূরে বনান্তরালে দু'একখানা কুটীর···তার পর আবার বন, গভীর ঘন বন।

সুশীল ছাদ হইতে নামিয়া ঘরগুলার মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া ফিরিল। মানুষের বসতির কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। বারান্দায় আসিয়া ব্যাগটা গুটাইয়া লইল, তার পর নিঃশব্দে সেই ভূতের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা। এক বৃদ্ধ। সুশীলকে দেখিয়া সে কহিল,—আপনি কাল ও-বাড়ীতে ছিলেন রাত্রে?

সুশীল কহিল,—হাঁ। একটা কথা আছে···

লোকটির সঙ্গে আলাপে এটুকু জানা গেল, বিশ বছরের মধ্যে এ-বাড়ীতে কেহ বাস করিতে আসে নাই। সরিকানী কলহে পাঁচ ভাই বাড়ী ছাড়িয়াছে ইত্যাদি।

মস্ত কাহিনী। তবে এ কাহিনীর মধ্যে একটু বিস্ময়ের ব্যাপার এই:—কোনো ভাইয়ের স্ত্রী বাঁচে নাই। কেহ দু'তিন বার বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবার প্রয়াস পাইয়াছে··কিন্তু পাঁচ-সাত বছর পরেই নবোঢ়া বধূদের ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। তারো একটু কারণের ইঙ্গিত দিতে বৃদ্ধ ভুলিল না। ঐ সরিকদের পূর্ব্বে বাড়ীটা ছিল রাজীব মণ্ডলের। সেই রাজীব মণ্ডলের নারী-রূপ-বিহ্বলতা ছিল বেশী মাত্রায়; আশ-পাশের গ্রামে রূপসী তরুণীর দেখা মিলিলে সে-নারীর রক্ষা ছিল না। রাজীবের প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। কাজেই···

রাজীব মারা গেলে তার ছেলে এ-বাড়ী বেচিয়া বিলাত চলিয়া যায়। কিন্তু বাড়ীতে একটা উপসর্গ ঘটে। রূপসী তরুণীর দল রাত্রে মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, নানা বিভীষিকা দেখিতেন! ওঝার দল আসিয়া ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্রাদি-সাধনের পর বুঝাইয়া দিল, রাজীবের রূপ-বিহ্বলতা এ-বাড়ীর ইটে-কাঠে জড়াইয়া আছে! রূপসী নারীর পক্ষে এ গৃহ নিরাপদ নয়।

সুশীল কহিল,—থাক। আপনি বোধ হয় রবি বাবুর ক্ষুধিত পাষাণ গল্প পড়েছেন···

লোকটি কহিল,—সে আবার কি?

সুশীল কহিল,—এ সব রূপ কথা আজ-কাল অচল···

লোকটি কহিল,—চাক্ষুষ কিছু দেখি নি কখনো, তবে এ কাহিনী শুনে আসচি আমাদের প্রথম যৌবন থেকে। আপনি জানতে চাইলেন, যদি কোনো বিচিত্র ইতিহাস···

সুশীল তাঁকে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইল বাসের প্রতীক্ষায়···

বাস আসিলে বাসে চড়িয়া কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন। ট্রেণ আসিতে দেরী আছে। প্লাটফর্ম্মে সে পায়চারি করিতেছিল, ও-লাইনের ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ লাইনের ট্রেণের সিগনাল পড়িয়াছে; ট্রেণ এখনও আসে নাই। ও লাইনের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। চলন্ত ট্রেণের দিকে চাহিয়া সুশীল দাঁড়াইল, কত দূর-পথের কত যাত্রী চলিয়াছে···সহসা একখানা থার্ড ক্লাশ কামরার জানালায় নজর পড়িল···এ কি...

এক তরুণী বসিয়া···পরণে লাল পাড় শাড়ী; এবং তরুণীর মুখ...? না, ভুল হইবার নয়! বিশেষ ঐ দুটি

চোখ, সেই আতঙ্কের ছায়া! দিনের আলোতেও তেমনি রহিয়াছে! সুশীলের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইল! সে লোকটা কামরায়? না, কৈ, দেখা যায় না!

ট্রেণ চলিয়া গেল। এদিক্কার ট্রেণ আসিতেছে··· দূর সীমান্তে ধোঁয়ার রেখা!

সুশীলের চিত্তে চাঞ্চল্যের সীমা নাই! সমস্ত ব্যাপারখানা···থিয়জফি? না, ফিলজফি? জন্মান্তর? না, মরীচিকা? কিছু বুঝা যায় না! রাজীব মণ্ডলের বিহ্বলা নায়িকাও তো নয়···

লাইন পার হইয়া দুইচারি জন লোক ডাউন প্লাটফর্মে আসিতেছিল···

সুশীল ভাবিতেছিল, কে ঐ নারী? সত্যই উহার অস্তিত্ব আছে? না, কাল রাত্রের বিভ্রম মাত্র? কিন্তু আজও ট্রেণে ঠিক তার চোখের সামনে!···তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। যড় করিয়াও আসে নাই! সুশীল কাঁচড়াপাড়ায় আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সে আসিল! আর সুশীল ষ্টেশনে, সে-নারীও অমনি ··

সহসা সামনে এক লোক। তাকে দেখিয়া সুশীল চমকিয়া উঠিল। সেই রাত্রের পুরুষটা না?···

সুশীল ডাকিল,—শুনচেন মশায়?

লোকটি দাঁড়াইল। সুশীল কহিল,—চিনতে পারেন?

ক্ষণেকের জন্য লোকটির কেমন অপ্রতিভ ভাব! সে কহিল,—কাল রাত্রে মোড়ল বাবুদের বাড়ী···?

সুশীলের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সত্য সব—ছায়া নয়, মায়া নয়!

সুশীল কহিল তাই। আমি এসেছিলুম কাগজ পড়ে ভৌতিক রহস্যের সন্ধানে। তার মধ্যে হঠাৎ···

লোকটি কহিল,—বলেন কেন দুঃখের কথা! আমার পুত্র-বধূ। বাপের বাড়ী গেছলেন প্রসব হতে··· একটি মেয়ে হয়েছিল, রইলো না। তার পর থেকে উন্মাদ! আমার কাছে প্রকাশ করে নি। বাপের বাড়ী থেকে এখানে রেখে গিয়েছিল। দু'মাস প্রাণ যাবার জো হয়েছিল! রাত্রে মাঝে মাঝে আচমকা কোথায় চলে যান! তাঁর ভাইকে আনিয়েছিলুম···পাঠিয়ে দিলুম আজ। ঐ যে ট্রেণ চলে গেল না?···বাড়ী শান্তিপুরে। বিপদ! পাগল বৌ নিয়ে কি করবো, বলুন তো! বিদায় করলুম!···হাড়ে আজ বাতাস লাগলো···আঃ, ঘুমিয়ে বাঁচবো।

ট্রেণখানা হুড় মুড় শব্দে আসিয়া পড়িল। সুশীল কহিল,—তা হলে ঐ ভূতের বাড়ী বলে কাগজে যা ছাপা হয়েচে···

সে কহিল,—ও! সে বাড়ী মোড়ল বাবুদের ও-বাড়ী থেকে আরও তিন কোশটাক্ পূবে, ভারী জঙ্গলের মধ্যে—মানুষের অগাম্য ঠাঁই।

—সাহেব মরার সে গল্প?

লোকটি হাসিয়া কহিল,—ও সব বাজে কথা!...কাণে শুনি ঢের কথা মশায়—কিন্তু চোখে তো কখনো কিছু দেখলুম না!···

ট্রেণ আসিয়া পড়িল, সুশীল একটা কামরায় উঠিয়া বসিল। সে কামরায় আর কেহ ছিল না। জানালার ধারে বসিয়া সে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। কি ভাবিতেছিল? ভূতের কথা? না, ঐ উন্মাদ-রোগ-গ্রস্তা অসহায়া তরুণী? শ্বশুর যাঁকে এই সকালে বিদায় দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছেন?

সুন্দর মুখ

অজনাথ 'ল' পড়িতেছে—এবারে ফাইনাল দিবে। আইনের কেতাব খুলিলে তার মাথায় কল্পনার এমন জলুশা জমিয়া ওঠে,—যে তাহার ছন্দে-তালে সেই বর্ব্বর যুগের শৃঙ্খলাহীন বর্ব্বরতা, পীড়ন, অত্যাচার, জোর যার মুলুক তার, এই নীতির দুরন্ত প্রসার হইতে সুরু করিয়া শান্তি-শৃঙ্খলার ওজুহাতে কি করিয়া মানুষে-মানুষে রফারফির অন্তরালে আইনের নানা বিধি গড়িয়া উঠিল,—তাহারি ধারাবাহিক ছবি যেন চোখের সামনে ভাসিতে থাকে! সেই সঙ্গে চোর, খুনে প্রভৃতির কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া, ফন্দী-বদমায়েসির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কাজে মন যেন রুখিয়া অলি-গলি, বস্তী পাহাড়-নদী-বনের আশে-পাশে অভিযান-মত্ত ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। অর্থাৎ তার কল্পনা ফুল, নির্ঝর ও নারীর দেহ-মনের লীলা-ছন্দে আকুল হয় নাই, তার কল্পনা বাস্তবের ধূলি-জঞ্জাল লইয়া বিচিত্র খেলায় মত্ত থাকিত; অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে তার কেমন স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল।

বাড়ীতে ছিল কি একটা উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্ব জড়ো হইয়াছে অনেকগুলি।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণের ছাদে বসিয়া গল্প চলিতেছিল। —কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যপ্রণালী হইতে সুরু করিয়া মেনিনজাইটিশ্-ব্যাধির প্রকোপ—কোনো আলো-চনা বাদ পড়ে নাই!

সহসা জলু আসিয়া সংবাদ দিল, মোড়ে ঐ যে তেতলা বাড়ী—ও বাড়ীর মালিক রায় যোগীন্দ্র দাস বাহাদুর সপরিবারে বাহিরে গিয়াছিলেন বিবাহের নিমন্ত্রণে—তিন দিনের জন্য। গৃহে ছিল একটি মাত্র খোট্টা ভৃত্য; দোতলা-তেতলায় চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। আজ এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তেতলার ঘরে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া চোরে অনেক টাকা দামের গহনা-গাঁটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। থানা ভাঙ্গিয়া পুলিশ-পাহারা আসিয়াছে তদারক করিতে।

অজনাথ বলিল—খোট্টা চাকরটা তো বাড়ীতে আছে?

জলু কহিল,—আছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেচে।

অজনাথ কহিল,—তারই কাজ!

জলু বলিল—সে বাড়ীতে ছিল।

মলিনা—অজনাথের মাসতুতো বোন; অজর চেয়ে একবছরের বড়। মলিনা বলিল,—সে চুরি করেচে যদি তো বাড়ীতে বসে থাকে কেন? পালাবে না?

হাসিয়া অজনাথ কহিল,—ঐ তো মজা! চোরের সাইকলজিই এই। ওস্তাদ নম্বর ওয়ান! তার লোকজন চুরি করেচে—সে দেছে সন্ধান! তারপর বাড়ীতে বসে আছে নিরীহ নির্দ্দোষের মত! পালালে বাবুরা দেশ থেকে পাকড়াও করে আনবে—তার বিরুদ্ধে প্রমাণ একেবারে অকাট্য হয়ে উঠবে!

জলু বলিল—কিন্তু চাকরটা আজ বিশ বৎসর রায় বাহাদুরের বাড়ীতে চাকরি করচে! খুব বিশ্বাসী। বাড়ীর লোকের এতটুকু সন্দেহ নেই তাকে। পুলিশ বলচে—না মশায়, আপনারা বোঝেন না। ওরই যোগ-সাজিতে চুরি হয়েচে! তাই তাকে গ্রেফ্‌তার করেচে!

সহজ আলোচনার মধ্যে এত বড় বাস্তব ব্যাপারের সংস্পর্শ ঘটায় ছাদের আসরে একটু গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা সহরের বিভিন্ন চোরের বিচিত্র ওস্তাদি—ক্রমে কলিকাতা ছাড়িয়া লণ্ডন, নিউ ইয়র্কের বড় বড় চুরির রোমাঞ্চকর কাহিনীর উপর দিয়া আসরের আলোচনা গড়াইয়া একালে সহরের এই চার-পাঁচতলা উঁচু বহু-বিস্তীর্ণ ফ্ল্যাট-ভাড়া-বাড়ীগুলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রমণী কহিল,—আমার সম্বন্ধী মণি থাকতো সহরের বুকে বড় রাস্তার উপর মস্ত এক পাঁচতলা ফ্ল্যাট-বাড়ীর তিন-তলায় সাতখানা ঘর ভাড়া করে! বাসের অসুবিধা ঘটেনি; কিন্তু একদিন ভোর হবার একটু আগে দমাদম পিস্তলের আওয়াজে সচকিত হয়ে তারা সপরিবারে জেগে দেখে, পিস্তল চলেছে তার পাশের কামরায়; অর্থাৎ তার ফ্ল্যাটেরই অপরাংশে হপ্তাখানেক আগে এক নতুন ভাড়াটিয়া আসে—আসার পর থেকেই গান-বাজনার আসর জমতে থাকে, সদরে বড় বড় মোটর এসে দাঁড়াতো এবং এত রকমের লোকও এসে জমতো! রাত্রি একটা-দু'টো পর্য্যন্ত সে-ফ্ল্যাটে মহাসমারোহে কিসের যে আসর জেঁকে থাকতো, বেচারী মণি তার কোনো সংবাদ রাখতো না। সপরিবারে শুধু বিস্ময়ে সচকিত থাকতো! সেদিন পিস্তলের শব্দে যে নাটক গড়ে উঠলো, যবনিকার অন্তরাল থেকে জানা গেল,—তারা একদল চোর, বিপ্লবী—বহুদূরে পাড়ি দিয়ে চুরি-চামারি করে বাসায় এসে জমিদার সেজে ধুমধামে বিশ্বজগৎকে ধাঁধা দিতে চায়; পুলিশ খপর পেয়ে নিঃশব্দে এসে বাড়ী ঘেরাও করেছিল—একজন জানতে পেরে পালাবার সঙ্কেত তোলে; পালাবার পূর্ব্বেই পুলিশ আসে—তখন মরিয়া হয়ে তারা পুলিশের উপর গুলি চালায়। পুলিশও তখন গুলি চালিয়ে দেয়। রীতিমত একটা skirmish; —দুটো আসামী আর একজন বাঙালী ইনসপেক্টর জখম

হয়! এই চুরির তদারকীতে জানা গেল, ফ্ল্যাটের চার-তলায় তিন দিন পূর্ব্বে যে চুরি হয়েছিল, সে-চুরির ব্যাপারে ছিল এই ছদ্ম জমিদারের কুশলী হাত। সে চোরাই মাল জমিদার-গৃহ থেকে উদ্ধার হয়। এ-দলে নারীও ছিলেন—সুন্দরী সুবেশা নারী!

রমণীর কথায় আসরে আতঙ্কের শিহরণ বহিয়া গেল।

পরেশ বলিল,—ফ্ল্যাট বাড়ীগুলোয় মস্ত অসুবিধা ঐখানে। পাশের বাড়ীতে যত দুরন্ত ব্যক্তি বাস করুক, তাতে ভয় কম! কিন্তু পাশের ঘরে চোরের আস্তানা পড়লে ব্যাপার খুব সঙ্গীন হয়ে ওঠে। লেকের ও দিকে আমার পিশেমশায় এমনি একটা ফ্ল্যাটে বাস করতেন—রাত্রে থিয়েটার দেখ্‌তে যান—বাড়ীর সকলে মিলে। ফিরে এসে দেখেন, ঘরের মাঝখানে যে-দেওয়াল—সে-দেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর; সেই গহ্বর-পথে পাশের ঘর থেকে চোর এসে একটা ক্যাশবাক্স আর সিল্কের কাপড়-চোপড় সরিয়ে চম্পট দেছে!

পাশের ঘরে সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাড়াটিয়া ছিল—দেখেছিলেন। তারা ফেরার হবার পর ঘর খালি!

কথা শুনিয়া মলিনা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ! সেও যে সেন্‌ট্রাল এভিনিউতে ফ্ল্যাটে বাস করে—দোতলায়। স্বামী উপেন্দ্র গিয়াছে বাহিরে আফিসের কাজে; সে আসিয়াছে এখানে! গহনাপত্র বাড়ীতে পড়িয়া আছে। ফ্ল্যাটের পাশের কামরায় থাকে এক নেপালী ভদ্রলোক। সে নাকি বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে; জুয়েলারির কারবার আছে! কে জানে, জুয়েলারির কারবারের নামে হয়তো চোরাই ব্যাপারের ব্যবস্থা!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—আমার যে ভারী ভয় হচ্ছে পরেশদা! বাড়ী ছেড়ে এসেচি…আমারও যে ঐ ফ্ল্যাট-বাড়ী! যত গহনাপত্র…

পরেশ কহিল,—সহরের বুকের উপর…

জলু বলিল,—এ ব্যাপারগুলো যা ঘটেচে, তা সহরের বুকের উপরেই…পায়ের তলায় নয়!

রমণী কহিল,—মণির কাহিনী তো শুনলে…

পরেশ কহিল,—আর পিশেমশায়ের ফ্ল্যাটে…! সে ঘটনার পর পিশেমশায় ফ্ল্যাট ছেড়ে দেন। স্যাঁৎসেঁতে গলির মধ্যে separate বাড়ীতে বাস করচেন, বলেন,—এ দুর্গন্ধ সয়েও বাস করা যায়, তা বলে অমন চোরের পাশে! বাপ রে!

মলিনা কহিল,—তাই তো। তাহলে কি করি? আমি বরং চলে যাই।

জলু বলিল,—চাকর-বাকর আছে তো বাড়ীতে?

মলিনা কহিল,—একটা চাকর আর একটা দাসী, তারা ছুটি নেছে আজকের মত! কাল সকালে আসবে!

জলু বলিল,—তারা ছুটি নেছে,—এ-খবর তো কেউ জানে না!

মলিনা কহিল,—তা আর জানবে না কেন?

তার স্বরে ভয়ের রেশ।

অজনাথ এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া বিচিত্র কাহিনী শুনিতেছিল। সে কহিল,—এর মধ্যে একটা psychology লক্ষ্য করেচো?

মলিনা কহিল,—তোর psychology রেখে দে, অজ… যাবি একবার আমাকে নিয়ে? গহনাপত্রগুলো নিয়ে আসি তাহলে।

অজ কহিল, তোমার যাবার কি দরকার!…তার চেয়ে বলো, আমি না হয় রাত্রে গিয়ে সেখানে থেকে বাড়ী চৌকি দি।

শিহরিয়া মলিনা কহিল,—একলা?

হাসিয়া অজ কহিল,—তাতে কি!…

মলিনা কহিল,—যদি চোর আসে?

অজ কহিল,—মানুষ থাকলে তারা আসতে দ্বিধা বোধ করে!

নানা যুক্তি-আলোচনায় স্থির হইল—খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অজ চাবি লইয়া যাত্রা করিবে মলিনাদি'র ফ্ল্যাটে—সেখানে রাত্রে থাকিবে—গহনাপত্র চৌকি দিবার জন্য।

মোড়ের বাড়ীতে পুলিশের ভিড় তখনো গমগম্ করিতেছে।

দেখিয়া অজ চকিতের জন্য বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল—পরে কল্পনার রথে চাপিয়া psychologyর ব্যূহমধ্যে মনকে ঠেলিয়া দিল!

সেন্‌ট্রাল এভেনিউয়ে মস্ত ফ্ল্যাট—বহুবাজারের চৌমাথা পার হইয়া চীনা থিয়েটারের একটু দূরে। ফ্ল্যাটে বহু জাতির বহু নর-নারীর বাস। নীচেকার একটা ঘরে এক চীনাও বাস করে। অজ ভাবিল, এই ফ্ল্যাট-খানা যেন সারা পৃথিবীর একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ!

ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া মস্ত ল্যাণ্ডিং। এখানে দাঁড়াইয়া সে শুনিল, বিচিত্র কলরব! পিয়ানোর টুং-টাং রাগিণীর সহিত হামানদিস্তায় মশলা-কোটা; তিন তলার এক ঘরে বাঙালী তরুণীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান যেমন আপনাকে বিচিত্র সুরে বিচ্ছুরিত করিয়া ধরিয়াছে, একতলায় তেমনি দরোয়ান গুল্‌ফলাল চৌবের বিরাট রাগিণীও অস্থি-গুলাকে কনকনায়িত করিতে কার্পণ্য করে নাই! মলি-নাদি' বলিয়া দিয়াছে, দোতলায় উঠিয়া বাঁ-দিকে 'নম্বর দুই'-ফলক-আঁটা দিকটা তার!

সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া বাঁ-দিকে ফলক নজরে পড়িল। কিন্তু দরজা খোলা!

অজুর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! যা কল্পনা করিয়া মলিনাদি' শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তাই? নিশ্চয় চোর। দেহের রক্ত নিমেষের জন্য স্তম্ভিত-রুদ্ধ হইয়া গেল; বুক-খানাও কাঁপিল! পরক্ষণে মনকে নাড়া দিয়া চাঙ্গা করিল। সে আইন পড়িতেছে!...

ঘরের মধ্যে অজু প্রবেশ করিল। প্রথমে ছোট একটি দালান; তারপর ড্রয়িং-রুম। ড্রয়িং-রুমের পাশে ছোট কামরা—চাকরদের আস্তানা! ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া অজু রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইল,—উৎকর্ণ হইয়া। না, কোন সাড়া-শব্দ নাই!

ঘর অন্ধকার। রহস্য!

সে ধীরে ধীরে হাতড়াইয়া আলোর সুইচ খুঁজিল—জানালা-খড়খড়ি বন্ধ; অন্ধকার ঘর। সুইচ খুঁজিতে একটা ফুলদানী ফেলিল! সেও যেন পা-ঠুকিয়া হুমড়ি খাইয়া প'ড়ল! অবশেষে খড়খড়ি খুলিল, সুইচ মিলিল—সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলো! আলোয় কাহারো দেখা মিলিল না!...

সন্তর্পণে পাশের কামরায় প্রবেশ করিল। ড্রয়িং-রুম হইতে আলোর রশ্মি সে ঘরের অন্ধকারটুকুকে তরল করিয়া রাখিয়াছিল; আলো জ্বালিতে কষ্ট হইল না! আলো জ্বালিয়া দেখে, সামনে খাট; খাটে বিছানা! বিছা-নায় চোখ পড়িতে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া বিছানায় শুইয়া এক নারী! পায়ের যেটুকু দেখা যায়, নারী রূপসী এবং তরুণী! নারী ঘুমাইতেছে!

গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। ভুল করিয়া আর কাহারো ফ্ল্যাটে ঢোকে নাই তো? কুণ্ঠিত ভীত-চিত্তে নিঃশব্দে দেওয়ালের পানে চাহিল। না—ফ্ল্যাট ভুল করে নাই! এই ঘর··ঐ যে দেওয়ালে মলিনাদির হাতে বোনা কার্পেটের ছবি!

এ ঘর যদি,···তবে? মলিনাদি বলিয়াছে, ঘর খালি—ফ্ল্যাটে কেহ নাই। দাসী-চাকর ছুটি লইয়াছে। আজ তারা তাদের বাড়ীতেও গিয়াছিল! মলিনাদি দু'দিন এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে; বাড়ীতে কেহ নাই—এমনি কথাই বলিয়াছে। আর থাকিবেই বা কে?

দ্বারের দিকে ধীরে ধীরে সে সরিয়া আসিল। খুট করিয়া শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় ওদিকে একটি ক্লান্ত নিশ্বাস-ধ্বনি এবং নারী পাশ ফিরিলেন। মুখখানি সুন্দর।

চোর? অসম্ভব!···

অজু কিন্তু হটিয়া সরিয়া যাইতেছিল। সহসা নারী চোখ মেলিল; চোখ মেলিয়া ক্ষিপ্র উঠিয়া বসিল এবং ভীত-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল—কে?

একটা ঢোক গিলিয়া অজু কহিল—আমি অজু··· মলিনাদির ভাই।

তরুণীর চোখে কৌতূহল। আঁচল টানিয়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া নারী কহিল,—ও! নরেনদার সম্বন্ধী?

নরেন মলিনার স্বামী। অজু কহিল,—হ্যাঁ।

তরুণী হাসিল, হাসিয়া কহিল—দেখুন তো বিপদ!

অজুর আতঙ্ক ঘুচিল। তরুণীর হাসি দেখিয়া সে ঘরে আসিল।

তরুণী বিছানা হইতে নামিয়া একটা চেয়ার টানিয়া কহিল,—বসুন···

অজু বসিল। তরুণীও বসিল। তরুণী কহিল,—সম্পর্কে নরেনদা আমার cousin; আমি থাকি পাটনায়, আমার স্বামী সেখানে ওকালতী করেন। দাসপুরের রাজার একটা বড় মকর্দ্দমা আছে। আমার স্বামী এখানে এলেন বড় কৌশুলী এন্‌গেজ করতে! আমি বায়না ধরলুম, আমাকেও নিয়ে চলো—দুদিন ঘুরে আসি। নির্ব্বাসনে আছি; আপনার লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে'খন! এলুম। এসে কোথায় নামবো? নরেনদার এখানে আমায় নামিয়ে স্বামী গেলেন রাজার ম্যানেজারের ওখানে। ম্যানেজারের ওখানেই তাঁর থাকবার কথা—কাগজপত্র দেখা—কৌশুলীর বাড়ী যাওয়া—এ-সব কাজ করতে হবে। আমি সেখানে কোথায় থাকবো?—আমি গাড়ী থেকে নামলুম—নেমে সোজা উপরে এলুম। চাকর ছিল, দোর খুলে বললে, মা-জী গেছেন নেওতা—বাবু গেছেন বাহার। আমি অকূল সমুদ্রে পড়লুম। চাকর বললে,—মা-জীকে খপর দেবো? আমি বললুম—কাল সকালে যেয়ো!···মানে, কাল সকালে চম্‌কে দেবো ভাবছিলুম।

অজু কহিল—আপনি একা?

তরুণী বলিল—একা নই। আমার সঙ্গে আমার এক খুড়তুতো দ্যাওর এসেচে। সে গেছে তার শ্বশুর-বাড়ী—খপর নিতে। তার শ্বশুর-বাড়ী ভবানীপুরে। দেখা-শুনা করে কখন্ সে ফিরে আসবে—জানি না তো। এখানে এরা কেউ নেই···

অজুর তরুণ মনে মমতার সীমা রহিল না। সে কহিল,—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয় নি?···এঁদের চাকর আর দাসী আজ ছুটী নিয়ে গেছে। আপনার···

তরুণীর অধরে সলজ্জ হাসি—মুখের যা শোভা হইল! অজুর চোখের পলক তাহাতে পড়িতে চায় না! তরুণী

কহিল,—একটা রাত্রি না খেলে মরে যাবো না! আমাদের ব্রত-ট্রতর উপোসও মাঝে মাঝে একটু আধটু করতে হয় তো···

অজ কহিল—না না···। আমি দেখচি···সে উঠিতেছিল।

তরুণী কহিল, কোন দরকার নেই। ব্যস্ত হবেন না ···এরা কবে ফিরবে, তা জানেন? মানে বৌদি আর খুকী?

অজ কহিল, আমাদের ওখানে গেছেন। কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়া···বোধ হয়, পরশু বিকেলে ফিরবেন। নরেনদাও ফিরবে পরশু। গেছেন হাজারিবাগে—আপিসের কাজে।

তরুণী শুধু কহিল, ও!

অজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তরুণী······

তারপর তরুণী কহিল, আপনি এসেচেন বুঝি কেউ নেই বলে রাত্রে বাড়ী চৌকি দিতে?

অজ কহিল, হ্যাঁ।

তরুণী কহিল, ভালোই হলো। জগৎ ঠাকুরপো এখনি আসবে—আমার সেই দ্যাওর। সে ওঁর সঙ্গে জুনিয়ারী করচে। আপনাদের বয়সী···! আপনারা দুজনে এই খাটে শোবেন'খন। আমি পাশের ঘরে··· ··

তরুণী পাকা গৃহিণী আর কথায় বার্তায় এমন সহজ সুর! অজর শ্রদ্ধা হইতেছিল, শুধু ইহার উপরে নয়, নারী জাতিটির উপর! সে অপরিচিত—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ তার সঙ্গে কি স্বচ্ছন্দ অবলীলায় আলাপ করিতেছেন! নিজের বাড়ীতে সে নিত্য দেখিতেছে, ঘোমটা-দেওয়া জড়ো-সড়ো তাদের মূর্ত্তি। অপরিচিত কাহারও সাড়া পাইলে ছুটিয়া কোথায় পলাইবে, ভাবিয়া পায় না। যেন দুনিয়াটা শুধু বাঘের আস্তানা! আর ইনি······

চমৎকার!······

অজনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার উচিত কত কি করা···অভ্যর্থনা, সেবা-পরিচর্য্যা···কিন্তু কি ভাবে সে পরিচর্য্যায় নামিবে, ভাবিয়া কোনো হদিশ পাইল না!

বাহিরে পথে চলন্ত মোটরের শব্দ, নীচে দরোয়ানের ভজন-গান, তিন তলায় পিয়ানোর ঝঙ্কার—সমস্তগুলা মিশিয়া এমন এক মিশ্র ঝঙ্কার তুলিয়াছিল যে, সে ঝঙ্কারে তার কল্পনা ঠোক্কর খাইয়া ফাঁসিয়া চূর্ণ হইতেছিল··· কোনো মতে একটা পরিপূর্ণ স্বপ্ন রচিয়া তুলিতে পারিতে-ছিল না!

সহসা তরুণী কহিল, আপনি কি করেন?

অজ কহিল,—ল' পড়চি।

তরুণী কহিল,—ওকালতি করবেন?

মুখ তুলিয়া মৃদু হাস্যে অজ কহিল,—ইচ্ছা তো আছে।

—হাইকোর্টে?

অজ কহিল—না। বোধ হয় পুলিশ-কোর্টে।

পুলিশ-কোর্ট! কথায় বিস্ময়ের চমক!

অজ কহিল,—হ্যাঁ। ওদিকে আমার একটু ঝোঁক আছে।

তরুণী কহিল—আপনার বিয়ে হয়েচে?

শিরায় শিরায় কাঁপন বহিল—রোমাঞ্চ! সলজ্জভাবে অজ কহিল,—না।···

তারপর স্তব্ধতা! তরুণী কহিল,—আপনারা কি?

কথাটা না বুঝিয়া অজ কুতূহলী দৃষ্টিতে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল।

মৃদু হাস্যে তরুণী কহিল—কি গোত্র?

ও! অজ কহিল,—চাটুয্যে।

—বাঃ!

তরুণীর সস্মিত-উচ্ছ্বাসে অজ তার পানে চাহিয়া দেখিল। তরুণী কহিল,—আমার একটি বোন আছে। পূর্ণিয়ায় থাকে। এবারে ম্যাট্রিক দেবে। দেখতে চমৎকার। রঙ···

এই অবধি বলিয়া সে নিজের হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল, ধরিয়া কহিল,—আমার চেয়েও রঙ ফর্শা···! নরেনদাকে বলবো, ঘটকালি করতে। বৌদিকেও ছাড়বো না!

একথায় অজ একেবারে কণ্টকিত···বাক্যহারা হইল। তরুণী কহিল,—একটু চা পেলে খেতুম। বৌদির সে ব্যবস্থা কি রকম···

অজ কহিল,—আমি দেখচি।···

উঠিয়া অজ ওদিককার ছোট ঘরে গেল। এ ঘরে চায়ের সরঞ্জাম আছে। অজ ষ্টোভ জ্বালিল; কেট্‌লিতে জল ঢালিল। ষ্টোভে কেটলি চাপাইবে—দ্বারপ্রান্তে মিষ্ট কণ্ঠের স্বর জাগিল—আপনাকে এ হাঙ্গামা করতে বলিনি তো···

অজ ফিরিয়া চাহিল। তরুণী কহিল,—কোথায় আছে, দেখতে বলেছিলুম···চা-টুকু আমি তৈরী করতে পারি। সরুন···

তরুণী আসিয়া অজর হাত হইতে কেট্‌লি কাড়িয়া লইয়া তাকে মৃদুভাবে সরাইয়া দিল; কেট্‌লি চাপাইয়া কহিল,—একটু উপকার করতে হবে!

—কি, বলুন।

তরুণী কহিল—এই গহনাগুলো যদি রাখবার ব্যবস্থা করেন··গায়ে দিয়ে সঙ, সেজে বসে আছি যেন···

তরুণী কণ্ঠ হইতে একছড়া হার খুলিয়া অজর হাতে দিল,—তারপর হাতের ব্রেশ্‌লেট···কাণের দুল···

অজ কহিল—কোথায় রাখবো?

তরুণী কহিল—তা জানি না। দেখুন না! কোনো টেবিলের টানায়—রাঙটার মত!...কিন্তু কাল সকালেই বৌদিকে একবার আনিয়ে দেবেন দয়া করে! পরে না হয় আবার যাবে'খন।...এলুম এ্যাদ্দুর—তারই বাড়ীতে এসে উঠলুম...দেখা না করে চলে যাবো?...এদের কাজ চুকলেই ঘাড় ধরে বলবেন, চলো...দাঁড়াতে দেবেন না এক মিনিট!...

অজ কহিল—মলিনাদি'র সঙ্গে আমাদের ওখানে গিয়েই দেখা করবেন। আমি গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

তরুণী কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিল, পরে কহিল,—মন্দ হয় না। নেমন্তন্ন খাওয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে বোনের সম্বন্ধও স্থির করা যায়...কি বলেন?

তরুণীর চোখে বিদ্যুৎ-শিখা! সে শিখার উজ্জ্বল দীপ্তির পানে অজ তাকাইয়া থাকিতে পারিল না; মুখ নামাইল।

গহনা হাতে লইয়া সে শয্যাকক্ষের আর্শির টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া তার মধ্যে সেগুলা রাখিল; রাখিয়া আবার যখন চায়ের ঘরে আসিল, তখন তরুণী চায়ের দুটো পেয়ালা জলে ধুইতেছে।

অজ কহিল,— আমি চা খাবো না।

তরুণী কহিল—তাও কি হয়! একা চা খেতে ভালো লাগে না! চায়ের পেয়ালায় সঙ্গী চাই। তা ছাড়া যা' ভাবচি, যদি লাগে, আমি হবো আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া—শ্যালী!

আনন্দে অজর বুকখানা দুলিয়া উঠিল। বিবাহে তার বড় রুচি নাই—বধূর কল্পনায় পরিণীতা-আত্মীয়াদের ঘোমটা ও সন্ত্রস্ত ভঙ্গীর যে আদরা-ছবি মনে জাগে, তাহাতে তার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া ওঠে! অমন জড়-পুত্তলি লইয়া জীবনে বাস করা চলে না! জীবনে রস বা বৈচিত্র্য জাগে না! যেন মরুভূমির মধ্য দিয়া কোনোমতে দেহটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল! বালুকারাশির চাপে মন শুকাইয়া মরিয়া যায়।

এই তরুণী-ইহার বোন...রঙ আরো ফর্শা! সারা দুনিয়া যেন রঙের টেকার মধ্যে ডুবিয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল!...

কিন্তু না...ইহার খাওয়া হয় নাই!

অজ কহিল—বেশ, চা খাবো। কিন্তু আপনাকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে।

তরুণী কহিল—কি কথা?

অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে সেই হাসির বিদ্যুৎ মিশিল!

অজ কহিল—আমি খাবার কিনে আনি...আপনি খাবেন।

তরুণী কহিল,—রাত যে বারোটা বাজে...

অজ কহিল—বাজুক। দোকান খোলা পাবো। ধর্ম্মতলায় ভালো খাবারের দোকান আছে।

বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে অজকে বিঁধিয়া তরুণী কহিল—না খেলে মনে দুঃখ হবে?

বিহ্বল-বিগলিত কণ্ঠে অজ কহিল,—খুব দুঃখ হবে।

তা হলে আসুন। কিন্তু দেরী করবেন না। একলাটি আছি। ভয় করবে মোদ্দা, জগৎ ঠাকুরপো করলে কি? এত দেরী! বৌ এখানে নেই...তবু শ্বশুরবাড়ীর উপর এত মায়া!

তরুণী হাসিল। অজও হাসিল। তারপর সে কহিল,—আপনি দরজা বন্ধ করে দিন—আমি খাবার এনে ডাকলে দরজা খুলে দেবেন।

—বেশ কথা!

তাহাই হইল। অজ গেল মহা-উৎসাহে ধর্ম্মতলার দিকে খাবার কিনিতে। তরুণী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আশ্রয়-নীড়টুকুকে নিঃশঙ্ক নিরাপদ করিবার বাসনায়!

চৈত্র মাসের উতল হাওয়া! সে হাওয়ায় ধর্ম্মতলায় নয়, অজ যেন কোন স্বপ্নলোকে উড়িয়া চলিয়াছিল।

তরুণীর চেয়েও ফর্শা রঙ...এই কথাটা বুক জুড়িয়া কি রাগিণীই ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল! মলিনাদি'কে আনা নয়, কাল সকালে নরেনদার বোনকেই তাদের ওখানে লইয়া যাইবে! যে কথা উনি বলিলেন...

যদি ঘটে! আঃ! জীবনের গতি বদলাইয়া যাইবে!

জগৎ-ঠাকুরপো! আসিলে ভাল হয়...না আসিলে ক্ষতি কি! শ্যালী! সত্য, তার চেয়ে বড় সম্পর্ক, মিষ্ট-মধুর সম্পর্ক আর নাই।

বিবাহ এখনো হয় নাই—তবু অজর উপর ইহারই মধ্যে এমন মায়া! তার মনটাও...

আলোর চমক! হাসির চমক! আনন্দের চমক!

বড় ঠোঙায় রাজ্যের খাবার ভরিয়া তাহা বহিয়া অজ আসিয়া ফ্ল্যাটের দোতলায় উঠিল! নিঃশব্দ ফ্ল্যাট! দূরে কোন্ চীনার মাতলামির একটা কর্কশ রব শুধু কানে বাজিতেছিল।

বিস্মিত মনে দ্বারে ঠেলা দিল...দ্বার ভেজানো ছিল—খুলিয়া গেল। অন্ধকার ঘর। ঘুমাইতেছেন?...

সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া খাবারের ঠোঙা হাতে ঘরে ঢুকিল...সব শূন্য!

চায়ের ঘর—পেয়ালার উপর পিরীচটা উপুড় করিয়া বসানো। তরুণী নাই।

বাথরুম? বোধ হয়, গা-হাত ধুইতে গিয়াছেন।...

খাবারের ঠোঙা টেবিলের উপর রাখিয়া সে আসিয়া শয়ন-ঘরের চেয়ারে বাসল...বুকখানার মধ্যে যে স্পন্দন জাগিয়াছিল...

সে স্বপ্ন দেখিতেছিল!...সজ্জিত ঘর...বিজলী বাতির আলোয় ভরপুর...একধারে একটা পিয়ানো...সেই পিয়ানোর ধারে বসিয়া...

পিয়ানো বাজিতেছিল সত্যই! সামনের দু'তলা বাড়ীর কামরায়! চমৎকার রাগিণী...

স্বপ্ন ভাঙ্গিল। ঘড়িতে দুটা বাজিল। সেই শব্দে। চম্‌কিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বাথরুমের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—দিদি—

নিজের স্বরে নিজেই চমকিল। লজ্জাও হইল! দিদি? ...ছি ছি...

কোনো সাড়া নাই। আবার ডাকিল—দিদি...

আবার...আবার...বার-বার...

কোন সাড়া নাই! বিস্ময়ে সে ফিরিয়া আসিল।

শয়ন-ঘর।...চারিদিকে চাহিল...

ও কি! আলমারির দরজাটা খোলা? তাই।

টানিতে দেখে,—চাবি ভাঙ্গা। চাড় দিয়া কে ভাঙ্গিয়াছে। ড্রয়ার টানিল...খালি ড্রয়ার। শুধু একখানা চিঠির মত ভাঁজ-করা কাগজ।

সেটা হাতে লইয়া ভাঁজ খুলিল—তাহাতে লেখা

—সাম্যের যুগে উপায় নাই! পুরুষের সঙ্গে নারী সকল ক্ষেত্রে যোগ না দিলে দেশের দুঃখ ঘুচিবে না। বুদ্ধিতে নারী ছোট নয়। এ-কাজে নারীর বিধি-দত্ত বহু সুবিধা আছে। এই রূপ, এই যৌবন—তার শক্তি সামান্য নয়।

ফ্ল্যাটের একটা ঘরে ভাড়াটিয়া ছিলাম। ছোটখাট চুরি এ ফ্ল্যাটে হইয়াছে—তার অন্তরালে আমার কৌশল।

আজ এ ফ্ল্যাট! সব সংবাদ রাখিতাম। ঘরে ঢুকিবামাত্র আপনার পায়ের শব্দ পাই। বিছানায় পড়িয়া উপায় ভাবিতেছিলাম।

একটা প্লট ঠিক হইল। জাগিয়া ফিরিয়া আপনাকে দেখিলাম।—নব্য তরুণ! পথ সহজ হইয়া গেল।

দেরাজে গহনা-পত্র যা ছিল, লইয়া চলিলাম। আপনার কাছে যে দুখানি গহনা জিম্মা দিয়াছিলাম—সে দু'খানি কাল সংগ্রহ হইয়াছে পাশের ফ্ল্যাট হইতে। সে বাড়ীতে ব্রাহ্মবী-বেশে গতিবিধি ছিল।

আজিকার এ ব্যাপারের পর এ-পাড়া ছাড়িলাম। আমার কোন বোন নাই—থাকিলে গোত্রে বাধিত। নহিলে আপনার মত গোবেচারা-পাত্র হাত-ছাড়া করিতাম না। ইতি

শ্রীমতী বিহ্বল-কারিণী
শ্যালিকা।

অজয় পা টলিতেছিল। মাথায় হাত রাখিয়া সে খাটের পাশে বসিয়া পড়িল।

আদর্শ স্বামী

ট্রেণে ডেলি প্যাশেঞ্জার। সকালে ৮-৫০এর ট্রেণ, সন্ধ্যায় ৬-৪৭। কামরাটি প্রায় পরিচিত-দলে রিজার্ভ। খুচরা প্যাশেঞ্জার যদি কামরায় উঠিয়া পড়েন তো তাঁর দশা হয় কতকটা সেই fish out of waterএর মত!

শশাঙ্ক টিটাগড়ের প্যাশেঞ্জার। সেদিন ট্রেণে চড়িল, শশাঙ্কর হাতে একটা বড় খাম। অবু কহিল—পুলিন্দা কিসের?

শশধরের দল আসে হালিসহর হইতে। তাদের আসর তাসে সরগরম। পঞ্চাশ কাবার করিয়া হঠাৎ এমন চীৎকার তুলিল যে, এক খুচরা প্যাশেঞ্জারের কোলে ঘুমন্ত শিশু সে-চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া ককাইয়া উঠিল।

দুই চোখে আনন্দের মশাল জ্বালাইয়া শশাঙ্ক কহিল,—আমার স্ত্রী আর্টিকল্ লিখেচে...ক্যালকাটা পিওর অয়েল কোম্পানি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা করচে কি না—ফার্ষ্ট প্রাইজ কুড়ি টাকা নগদ, আর তাদের ঘানির বৃশ্চিক-মার্কা আড়াই সের পিওর মাষ্টার্ড অয়েল!

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। সে হাসিতে ভড়কাইয়া শশাঙ্ক কহিল,—সত্যি। এই ত্যাখো···

খামখানা সে চোখের সামনে ধরিল। মেয়েলি হাতের লেখা ঠিকানা—"ম্যানেজার, ক্যালকাটা পিওর অয়েল কোম্পানি, গোয়াবাগান, কলিকাতা।"

খামের মাথায় লাল কালিতে লেখা "প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা।" লেখা আণ্ডার-লাইন করা।

খামের মুখ আঁটা ছিল না। তারাদাস খামের মধ্য হইতে ফশ্ করিয়া প্রবন্ধটা টানিয়া বাহির করিল। ফুলস্ক্যাপ সাইজে লেখা বারো পাতা প্রবন্ধ।

শশাঙ্ক কহিল,—তারা প্রবন্ধ চায়—"আদর্শ স্বামী"—আর শুধু মেয়েদের লেখাই এ competition-এ গ্রাহ্য হবে।

তারাদাস কহিল,—বটে! তা এ আদর্শ স্বামীটি কি পদার্থ? তোমার জীবন-বৃত্তান্ত? স্ত্রীর কথায় নড়েন-চড়েন-ওঠেন-বসেন—তাস খেলতে বেরোন না—রাত্রে ছেলে কাঁদলে নিজে উঠে ঘুম পাড়ান—স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গান না—ইত্যাদি···?

বিরক্ত-ভরে শশাঙ্ক কহিল—না, এ জীবন-চরিত নয়। প্রবন্ধ।

রোহিণী কহিল,—ও!

আমি কহিলাম,—গোলমাল করো কেন? আঃ! শোনো স্থির হয়ে···

কোরাশে রব উঠিল,—আচ্ছা, আচ্ছা···

ট্রেণ থামিল খড়দায়। কামরায় প্রবেশ করিল বৈদ্যনাথ আর রাইচাঁদ।

আমরা কহিলাম—চুপচাপ বসে যাও। শশাঙ্কর স্ত্রীর লেখা পড়া হবে। অয়েলিং প্রতিযোগিতার জন্য লেখা—প্রবন্ধের নাম—"আদর্শ স্বামী।"

বৈদ্যনাথ কহিল,—O. K.

অফিসে সে সাহেবের খাশ্-কেরাণী—চিঠি-পত্র লেখে। কাজেই একটু সাহেব-ঘেঁষা—তার উপর হাতে তার চব্বিশ ঘণ্টা রুশ ড্রামা, স্প্যানিশ গল্প! আর জাপানী কবিতার বই! মস্তব্যাদি যা করে, তা ঐ জটিল ইংরেজী ভাষায়! আমরা ইণ্টারামিডিয়েট ফেল করিয়াছি। সে-সব কথা কোনো কেতাবে পড়ি নাই!

আমরা কহিলাম—পড়ো হে শশাঙ্ক।

রোহিণী বলিল—শাশঙ্ক লিখে দিয়েচিস?

শশাঙ্ক কহিল,—না ভাই, সত্যি না।

রোহিণী কহিল—তোর বৌয়ের এ রোগ ছিল না তো ··

মৃদু হাস্যে শশাঙ্ক কহিল—মাঝে মাঝে লেখে—তবে ছাপানো হয় না। আর লিখবে না কেন, বলো? ওর এক খুড়ী যে উপন্যাস লেখেন! মানে, আমার এক খুড়শাশুড়ী—নাম শোনোনি শ্রীমতী কুঞ্জকামিনী দেবী?

সকলে কহিল—না।

আমি কহিলাম—গোলমাল রাখো। পড়ো, কি লিখেচে।

শশাঙ্ক প্রবন্ধ-পাঠ সুরু করিল,—

"আমাদের এই ভারতবর্ষে স্বামীর আদর্শ খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা! স্বামী এখানে দেবতার তুল্য। স্বামী যেমনই হন, সুচরিত্র বা দুশ্চরিত্র বা রোগগ্রস্ত বা তস্কর বা বাটপাড় হন,—ভারত-রমণীর তিনি ধ্যানের দেবতা, ইহকাল-পরকাল, সাক্ষাৎ নারায়ণ—"

রোহিণী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আহা! চমৎকার লিখেচেন তো বৌমা! আমাদের স্ত্রীরা যদি এ কথার দামটুকু বুঝতো ··

তারাদাস কহিল,—সংসার স্বর্গ হতো!

অবু কহিল,—শশাঙ্ক is a happy husband.

বৈদ্যনাথ কহিল,—Happy-hubby!—husband

কথাটা একেবারে সেকালের, অচল! Hubby হলো fond form—বুঝলে!

আমরা কথা কহিলাম না।

শশাঙ্ক পড়িতে লাগিল,—

"স্বামীর আদর্শ-প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে তাঁর দেহ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে চাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বামী সুশ্রী হৌন, বিশ্রী হৌন, বেঁটে হৌন, ঢ্যাঙা হৌন, কালো হৌন, ফর্শা হৌন, মোটা হৌন, রোগা হৌন, গরীব হৌন, ধনী হৌন, নারীর তিনি উপাস্য দেবতা! তবু কুমারী বয়সে নারী স্বামীর একটি বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করিয়া মন-মন্দিরে সেই রূপ-বিশিষ্ট মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করেন। সেই ধ্যানের রূপ প্রত্যক্ষ স্বামীর রূপের সহিত না মিলিতে পারে—সে তো ভাগ্যের কথা! আমরা প্রত্যক্ষ স্বামীর কথা ছাড়িয়া কাল্পনিক স্বামীর মূর্ত্তির একটা আভাস দিবার প্রয়াস পাইব—"

বাধা দিয়া রোহিণী কহিল—সত্যি স্ত্রীর লেখা?

শশাঙ্ক সক্রোধ দৃষ্টিতে রোহিণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

রোহিণী কহিল,—রূপবিশিষ্ট, প্রত্যক্ষ, আভাস, প্রয়াস—এ সব কথার বানানও আমি জানি না যে রে, মানে তো দূরের কথা। প্রয়াস মানে কি রে?

শশাঙ্ক কহিল—আমার স্ত্রী ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিল!

আমি কহিলাম,—প্রয়াস মানে চেষ্টা।

রোহিণী কহিল,—ও!

শশাঙ্ক আবার পড়িতে লাগিল,—

"স্বামীর দেহ হইবে দৈর্ঘ্যে ছ'ফুট। কবি কালিদাস পৌরুষের চিত্র আঁকিয়াছেন—শালপ্রাংশু মহাভুজ। সুতরাং এ দৈহিক আদর্শ আমরা বিদেশ হইতে আমদানি করিতেছি না! দৈর্ঘ্য ছ'ফুট না হইলে পুরুষ মানুষকে মানায় না! তার পর সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, পুরুষের দৈর্ঘ্য সংসার-পথে বিশেষ সুবিধা ঘটায়! যেমন, স্বামী সপরিবারে পূজার ছুটীতে পশ্চিমে চলিয়াছেন; ষ্টেশনে খুব ভিড়! স্ত্রী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া মাথা নত করিয়া ট্রেণে উঠিতে চলিয়াছে—ভিড়ে স্ত্রী যদি পিছাইয়া পড়ে তো সামনে চাহিলেই দেখিবে, বিপুল জনতার মধ্যে হিমালয়ের শিখরের মত দীর্ঘ-দেহ স্বামীর "জাগিছে উচ্চ শির"! মহাভুজ বা আজানুলম্বিত বাহুর প্রয়োজন কেন?

কারণ বলি—আজকাল ফুটবল খেলা দেখা ছেলেদের একটা নিত্যকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া পুরুষ মাঠে গেলে ছেলেমেয়েরা জনতা ভেদ করিয়া খেলা দেখিতে যদি না পায়, মহাভুজ পুরুষ তাহাদের হাতে তুলিয়া ধরিবেন, এবং ছেলেদের খেলা দেখায় তাহাতে প্রচুর সুবিধা ঘটিবে! তাছাড়া গাছ হইতে ফল-ফুল পাড়া, শেল্‌ফে কাসুন্দি-আচার তুলিয়া রাখা, মশারি টাঙানো, খাট-তক্তাপোষের তলায় ঝাঁটা বুলাইয়া দেওয়া, এমনি বিবিধ কার্য্যে আদর্শ পুরুষ যে কত সাহায্য করিতে পারেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না! আর দেহের দৈর্ঘ্য হেতু—স্বামীর মাথায় যদি টাক পড়ে তো সে টাক পথের পথিকদের দৃষ্টিগোচর হইবে না।

"তাঁহার প্রকৃতি হইবে শান্ত, নিরীহ। সংসারে কুরুক্ষেত্র মহাসাগর বাধিয়া গেলেও তিনি নির্ব্বিকার ব্রহ্মের মত ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন; স্ত্রীকে তাহা হইলে সংসার-পরিচালনায় বেগ পাইতে হইবে না। স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, গৃহের কর্ত্রী। আমরা ভালো করিয়া জানি, এক-জনের কর্ত্তৃত্বেই শৃঙ্খলা থাকে—দুজনের কর্ত্তৃত্ব শান্তি-শৃঙ্খলার বিশেষ পরিপন্থী। সংসারে যতই ব্যয় হউক, স্বামী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না—এজন্য তাঁর প্রকৃতিতে চাই মহত্ত্ব, উদারতা, দানশীলতা।"

ট্রেণ দমদমায় থামিল—যথাসময়ে। এক ঝাঁক লোক কামরায় উঠিয়া কামরা একেবারে ঠাশিয়া ব্লাক-হোলে পরিণত করিয়া তুলিতে চায়—এমন কাণ্ড! প্রবন্ধ-পাঠে কাজেই ব্যাঘাত ঘটিল।

আমি কহিলাম—এই প্রবন্ধ তুমি পাঠিয়ে দেবে আজ?

শশাঙ্ক কহিল—নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো—রসিদ আনবো। শেষে বাছাধনরা না বলতে পারেন, প্রবন্ধ পাইনি মশায়—হুঁ।

আমার শ্রদ্ধা জাগিতেছিল—স্ত্রীলোক এমন চমৎকার ভাষা জানে, এমনভাবে গুছাইয়া-সাজাইয়া লিখিতে পারে! বাঃ!

নারী-প্রগতির উজ্জ্বল দৃশ্য মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল। নারীর দল কাগজ কেতাব লইয়া ভারী কলরব তুলিয়াছে, আর পুরুষের দল সভয়ে ছিটকাইয়া মূঢ়ের মত সরিয়া গিয়াছে!

তারাদাস কহিল—কিন্তু মা-লক্ষ্মীর স্বামীটি—মানে, শশাঙ্ক এ-আদর্শের একেবারে উল্টো! চেহারা বেঁটে, মোটা,—মেজাজ খিট্‌খিটে!

শশাঙ্ক কহিল—আমার কথা তো হচ্ছে না! এ হলো আদর্শ স্বামীর কথা অর্থাৎ ঐ কল্পনার রূপ-বিশিষ্ট স্বামী—শুনলে তো!

শিবু বসিয়াছিল এক কোণে—সে কথা কয় কম—আর ট্রেণে চড়িয়া বাঙলা নভেলের পৃষ্ঠায় তন্ময় থাকে। আজও তাই। সে কথা কহিল। বলিল,—লেখা শুনলুম। লেখা থেকে বুঝচি, শশাঙ্ককে শশাঙ্কর স্ত্রী মোটে পছন্দ করে না—লেখার লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে বরাবর একটা

বেদনার নিশ্বাস ঝরে বয়ে চলেছে—লক্ষ্য করেচো? এই এখনকার নভেলে পড়ি—এই ক্ষোভ আর দুপুর বেলায় নির্জ্জন পল্লীভবন···ওর স্ত্রী মনে মনে অমনি কাকে ভালো বেসেচেন—ভালো বাসেন—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি!

আমরা সকৌতূহলে শিবুর পানে চাহিলাম।

শিবু কহিল—এই অতৃপ্তি থেকে আদর্শের সন্ধান···

তার মুখের কথা লুফিয়া বৈদ্যনাথ কহিল—and seeking for love at suitable quarters···

বৈদ্যনাথের ইংরাজী ভাষা আমরা ঠিক বুঝি না—এ কথার সম্বন্ধেও তাই ঘটিল। কিন্তু সে কথা স্বীকার করা চলে না, কাজেই হা-হা, হি-হি হাসি সকলের অধরে—যেন বিদ্যুৎ বহিয়া গেল! শশাঙ্কর যে-ভাব হইল, বলিবার নয়! যেন সেই "পাণ্ডুর শশধর ম্লান অস্তাচল!"

তার পরই শেয়ালদা ষ্টেশন! ভীষণ চীৎকার···কর্ম্ম-চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি! সে ধ্বনি, সে চীৎকারের মধ্যে আদর্শ স্বামী কোথায় যে ডুব মারিল!—

দু'মাস পরে সেই টিটাগড় ষ্টেশন···হাসি-মুখে শশাঙ্ক কহিল,—কাল এনেচি নগদ কুড়ি টাকা আর 'বৃশ্চিক-মার্কা পিওর মাষ্টার্ড অয়েল।

আমরা তার পানে চাহিলাম।

শশাঙ্ক কহিল—মনে পড়চে না? আমার স্ত্রীর লেখা সেই প্রবন্ধ—ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েচে—

শিবু কহিল,—স্ত্রী খুঁজে পেয়েচেন যে—তাঁর ও আদর্শ?

আমাদের দৃষ্টি শশাঙ্কর মুখ হইতে সরিতে চায় না! শশাঙ্ক কহিল—লেখাটা আমার। তবে টাকাটি গৃহিণী কেড়ে নিয়েচেন। তেলটা সত্যি খাশা—গৃহিণী বলছিলেন, কি ঝাঁজ! কড়ায় চড়িয়ে সামনে দাঁড়ায়, কার সাধ্য! হাঁচতে হাঁচতে—ওঃ!

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

রবিবার। আশ্বিন মাসের ৩রা কি ৪ঠা তারিখ। বাতাসে শারদীয়ার আভাস জাগিয়াছে। সতীনাথ দোতলার ঘরে বসিয়া একখানা পুরানো টাইম-টেবলের পাতা উল্টাইতেছিল; পত্নী প্রমদা পাশের ঘরে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া শিঙাড়া ভাজিতেছে।

দু'একখানা ভাজা হইলে একটা প্লেটে তুলিয়া প্রমদা আসিয়া সতীনাথের কাছে দাঁড়াইল, কহিল,—ছাখো তো খেয়ে, ঠিক হলো কি না!

সতীনাথ মুখ তুলিয়া প্লেটের পানে চাহিয়া কহিল,—এই সকালে শিঙাড়া! অম্বলে বুক জ্বলে মরি আর কি! সারা দিনটা বরবাদ যাবে!

প্রমদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল,—তা তো বটেই! ঘরে তোলা গাওয়া ঘী, তাতে ভাজচি…অম্বল হলেই হলো!

সতীনাথ করুণ দৃষ্টিতে প্রমদার পানে চাহিল; প্রমদা কহিল,—কত রঙ্গই জানো! বাজারের খাবার নয় কি না! যখন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশে বেলা বারোটায় দোকান থেকে হিঙের কচুরি আনিয়ে খাওয়া হয়, তখন তো অম্বলের ভয় করে না!…প্রমদা থামিল।

একটা নিশ্বাস পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সে কহিল,—এ যে আমি তৈরী করেচি—মুখে রুচবে কেন?…

প্রমদার মুখ-চোখ সজল হইয়া উঠিল। সতীনাথ কহিল,—অমনি অভিমান! দাও বাপু তোমার শিঙাড়া, খাই।

প্রমদা কহিল,—থাক্! মলিনার জন্য তৈরী করছিলুম। সে ভালো বাসে, একদিন বলেছিল, আমার হাতের শিঙাড়া ভালো লাগে, তাই। ভাবলুম, মুণ-টুন সব ঠিক হলো কি না, তোমায় খাইয়ে বুঝি। তা…

আবার একটা নিশ্বাস!

প্লেট হাতে তুলিয়া সতীনাথ কহিল,—খাচ্ছি গো, খাচ্ছি!

প্রমদা কোন কথা কহিল না। সতীনাথ শিঙাড়া খাইতে লাগিল।

প্রমদা কহিল,—মুণ কম-বেশী হয় নি?

দুখানা শিঙাড়া নিঃশেষ করিয়া হাসিয়া সতীনাথ কহিল,—তা তো বুঝলুম না…

প্রমদা কহিল,—আচ্ছা লোককে চাকাতে এসেচি!

প্রমদা গমনোদ্যত হইল। সতীনাথ কহিল,—নিজে তৈরী করতে করতে দু'চার কামড় দিয়ে পরখ করলেই পারো! কথায় বলে, আপ্ রুচি খানা।

হাসিয়া প্রমদা কহিল,—তোমার মত রাঁধুনি হলে তাই করতুম!

প্রমদা বাহিরে গেল। সতীনাথ কোঁচার খুটে হাত মুছিয়া আবার টাইম-টেবলের পাতা খুলিল…ভাড়ার 'নির্ঘণ্ট' দেখিয়া কাগজ-পেন্সিল টানিয়া কি হিসাব ফাঁদিল।

প্রমদা দ্রুতপদে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল, তার হাতে সেই প্লেট!

প্রমদা কহিল,—খাও, গরম গরম একখানা মুখে দাও দিকিনি। হাঁ করো, আমি খাইয়ে দি…

সতীনাথ নিঃশব্দে হাঁ করিল, প্রমদা শিঙাড়া ভাঙ্গিয়া সতীনাথের মুখে ফেলিল। সতীনাথ মুখ বুজিয়াই উঃ করিয়া আর্ত্ত রব তুলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিঙাড়ার ড্যালা মুখ হইতে বাহির করিয়া দিল।

প্রমদা কহিল,—ও কি হলো?

সতীনাথ কহিল,—পুড়ে মরেছিলুম আর কি! জিভটা বোধ হয় গেছে! চট্ করে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্টা আনো দিকিনি…

স্থির দৃষ্টিতে প্রমদা স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—কচি খোকা! দেখো…!

কথাটা বলিয়া সুদৃঢ় পদক্ষেপে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

সতীনাথ মৃদু হাসিল, হাসিয়া হিসাবের কাগজে মন দিল।…

বাহিরে কণ্ঠস্বর,—সতী আছো…

সতীনাথ সাগ্রহে কহিল,—ললিত! চলে এসো…

ললিত বন্ধু। দুজনে অন্তরঙ্গতার সীমা নাই। বহু বৎসর ধরিয়া সেই কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশ হইতেই এ অন্তরঙ্গতা সমান রহিয়াছে! সুখে-দুঃখে পরস্পরে পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে চিরদিন। এবং এ অন্তরঙ্গতার ফলে ললিতের স্ত্রী মলিনা আর সতীনাথের স্ত্রী প্রমদা দুজনের সখীত্ব বেশ নিবিড়। অর্থাৎ দুটি তরুণ পরিবারে হৃদ্যতার সীমা নাই।

ললিত কহিল,—বাড়ী ঠিক হলো হে। ঐ ডিহিরী-অন-শোণেই যাওয়া যাক। বাঙলা যা জোগাড় হয়েচে, ফার্ষ্টক্লাশ! একেবারে শোণের ঠিক উপরে!

সতীনাথ কহিল,—শোণে বন্যা নামে। শেষে···

হাসিয়া ললিত কহিল,—রামচন্দ্র! সেবারে অত বড় বন্যায় বেহারের বহু দেশ ভেসেছিল, কিন্তু ডিহিরীর কোনো ক্ষতি হয়নি। Co-relative যে···ডিহিরীর নামই হলো ডিহিরী-অন্-শোণ—শুধু ডিহিরী নয়!···

ললিত প্রফেশরি করে—ফিলজফিতে এম, এ।

সতীনাথ কহিল,—হুঁ। আমি তা হলে মিছে হিসাব কষে মরি কেন?

ললিত কহিল,—কিসের হিসেব, শুনি···

সতীনাথ কহিল,—আমি ভাবছিলুম, বৈদ্যনাথ-ধামে যাওয়া যাবে।

—বাড়ী?

সতীনাথ কহিল,—মিষ্টার সরকারের বাড়ী আছে। পাওয়া যাবে—বলেচেন।

ললিত কহিল,—বৈদ্যনাথে ভারী ভিড়। সকলে যায়! ডিহিরী নির্জ্জন জায়গা···বাঙলো যে ক'খানি আছে, তার সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায়।·· এঁরা দুই সখীতে বলছিলেন, ভিড়ের মধ্যে এঁরা যাবেন না! নির্জ্জন জায়গা এঁদের পছন্দ।

—বেশ!

সতীনাথ হাঁকিল—ওগো···

পাশের ঘর হইতে 'ওগো' বলিল,—যাই।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী প্রমদার প্রবেশ। তার হাতে প্লেট; প্লেটে শিঙাড়া।

প্রমদা ললিতের সামনে প্লেটটা আগাইয়া ধরিয়া কহিল,—নিন্, খান্ দিকিন। গরম আছে!

ললিতের দুই চোখ সুগোল হইয়া উঠিল। সেই সুগোল চোখের দৃষ্টি প্রমদার মুখে নিবদ্ধ করিয়া ললিত কহিল—এখন?

প্রমদা কহিল,—আপনাদের কি যে ভয়। ··রবিবার। না হয় একটু বেলা করে ভাত খাবেন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল,—সতীনাথ...?

সতীনাথ কহিল,—আমার ভোজন শেষ হয়েচে। প্রথমেই চেখেছি—চেখে চাখ্‌লাদার হয়ে বসে আছি। এবার তোমার পালা। বিশেষ যখন এ-ভোজ্য শ্রীমতী মলিনা দেবীর জন্ত তৈরী হচ্ছে, তুমিই right person তাঁর মুখের মত শিঙাড়া হয়েচে কি না, সে সম্বন্ধে opinion দিতে···

ললিত কহিল,—কি রকম?

সতীনাথ হাসিয়া কহিল,—তাঁর অধরের taste সম্বন্ধে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং তা প্রচুর!

প্রমদা সলজ্জভাবে কহিল,—এ রসিকতার কথা বলবো'খন মলিনাকে।

সতীনাথ কহিল,—বেশ! আমি মিথ্যা কথা বলিনি, অপমানের কথাও বলিনি! এই তুমি···তোমার অধরের টেষ্ট সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, সে অভিজ্ঞতা কি ললিতের আছে? না, আর কোনো···

কথা শেষ হইল না। প্রমদা সতীনাথের দুই ঠোঁট হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—ষ্টোভ জ্বলচে। এক খুরি ময়দার কাই করে এনে দুটি ঠোঁট জুড়ে দিচ্ছি—রসিকতার দম বন্ধ হয় কি না, দেখি। ইতর কোথাকারের! ওকালতি করো কি না—যত নির্লজ্জ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক দিবা-রাত্রি···

প্রমদার কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া করজোড়ে সতীনাথ কহিল,—ক্ষমা করো, দেবি! তোমার শাসনের ইঙ্গিতই পর্য্যাপ্ত! আর কাইয়ের প্রয়োজন হবে না। কবি বলেচেন···

> অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
> চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া!

তুমি সে পরম-কাম্য পন্থা ত্যাগ করে যে বর্ব্বর প্রথায় অধরের দ্বার রুদ্ধ করার ইঙ্গিত দিলে, তাতে বিভীষিকা প্রচুর! অতএব···

প্রমদা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিতের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—নুণ ঠিক হয়েচে?

ঘাড় নাড়িয়া ললিত কহিল,—খাশা হয়েচে। এ প্লেটটা নিঃশেষ করি। অসুবিধা ঘটবে না?

প্রমদা খুশী-মনে কহিল,—না। গাওয়া ঘী ঘরে তৈরী করেছিলুম; তাতে ভাজচি। কোনো অসুখ করবে না।

ললিত কহিল,—তুচ্ছ অম্বলের ভয়ে যদি এ প্লেট নিঃশেষ না করি, তাহলে অনুতাপের সীমা থাকবে না।

সতীনাথ কহিল,—ও কথা থাক। ললিত বাড়ী ঠিক করেচে গো—ডিহিরী-অন্-শোণে। পছন্দ হবে তো?

প্রমদা কহিল,—তোমরা যেখানে নিয়ে যাবে, সেই-খানেই যাবো। আমাদের আবার পছন্দ-অপছন্দ কি!

সতীনাথ কহিল,—সে কি। তোমাদের মতকে শিরোধার্য্য করেই যে আমরা দু'জনে কর্ম্মপথে যাত্রা করতে চাই। আমাদের তাই ব্রত!

প্রমদা কহিল,—অত তত্ত্ব-কথা জানি না! আমরা বলেচি, এই ভিড়ের মধ্যে যাবো না। শিমুলতলা, বদ্যিনাথ, মধুপুর, পুরী—এ-সব জায়গা ছেড়ে আর-যেখানে হোক! ···মানে, এখানে এই ভিড়ের কচকচি, আবার বাইরে জিরুতে গিয়েও যদি সেই ভিড় মেলে···

ললিত কহিল,—না, না—ডিহিরীতে মোটে ভিড় নেই।

প্রমদা কহিল,—বেশ! মলিনা জানে?

ললিত কহিল,—ঠিক হয়েচে, তা জানে না। ডিহিরীতে বাড়ী ঠিক করতে চলেছি, এ কথা তাঁকে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি।

ব্যাপার আর একটু খুলিয়া বলি। ক'জনে বাহির হইয়া পূজার ছুটিটা এবার পশ্চিমের কোনো জায়গায় একসঙ্গে কাটাইয়া আসিবে, স্থির হইয়াছে। এক বাড়ীতে বাস, অবিরাম সঙ্গ-সাহচর্য্য···আনন্দের সীমা থাকিবে না। সতীনাথ তাই টাইম্-টেব্‌ল্ লইয়া হিসাব করিতেছিল, কোথায় যাইতে কত খরচ পড়ে—এবং আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কাহার কোথায় বাড়ী আছে; থাকিলে বিনা ভাড়ায় কাহার বাড়ী মেলে, তাহারই সন্ধানে ললিত ঘোরাফেরা করিতেছিল।

ডিহিরীতে বাড়ী পাওয়া গিয়াছে, ভাড়া লাগিবে না—সেই সংবাদ লইয়া সে এখন আসিয়াছে।

২

বাঙলোখানি চমৎকার। পিছনে শোণের বুকে বালি ধু-ধু করিতেছে; মাঝে মাঝে জল। রেলের ঐ প্রকাণ্ড পুল। পথে লোকের ভিড় নাই! গাড়ীর মধ্যে সেই সনাতন একা! কোনো রকমে ক'খানা ভাঙ্গা তক্তা জুড়িয়া তলায় দুটা চাকা লাগাইয়া দিয়াছে; এবং ঘৃতপক একটা ঘোড়ার গলার সঙ্গে একগাছা দড়ি দিয়া তক্তাটাকে বাঁধিয়াছে—ঘোড়া দৌড়িলে সেই সঙ্গে চাকা-বাঁধা তক্তাগুলাকেও দৌড়িতে হয়! এই গাড়ী! দু'চারখানা মোটর ক্বচিৎ দেখা যায়!

বাড়ীতে ফটকের পর বাগান,—বৃত্তাকারে বাগানটুকুকে বেড়িয়া তৃণাচ্ছন্ন পথ গিয়া বাঙলোর সিঁড়ির পাশে ঠেকিয়াছে। ফ্লোরের উপর বাঙলো। সামনে লম্বা টানা বারান্দা··বারান্দার দুদিকে দুখানা ঘর; সামনে একখানা হল ঘর। পাশের দুই ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন দুটি বাথ-রুম; ওদিকে রান্নাঘর। ভৃত্যদের ঘর স্বতন্ত্র হাতায়। একটা আস্তাবল আছে। আস্তাবলের মধ্যে একখানি জীর্ণ-মলিন টঙ্গা চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। চাকার কাঠে ও কম্পাশে উই ধরিয়াছে!

দিন আনন্দে কাটিতেছিল। বেড়ানো, গল্প, গান ···মাঝে মাঝে ট্রেণে করিয়া সাসারাম, কিম্বা গয়ায় যাওয়া হয়। সেখান হইতে তরী-তরকারী কিনিয়া আনা—সুমধুর বৈচিত্র্য!

এক সপ্তাহ কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল! তার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রে যা ঘটিল, বলি।

ললিত সকালে কাশী গিয়াছে। তার পিশেমশায় আর পিশিমা সেখানে থাকেন···তাই। দু'দিন পরে ফিরিবে। বাঙালীদের ক্লাবে সন্ধ্যায় সতীনাথের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে, এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ।

ক্লাব সারিয়া সে বাঙলোয় ফিরিল, রাত তখন ন'টা। ফিরিয়া দেখে, সামনের বড় ঘরে আম-কাঠের যে বড় টেবিল, সেই টেবিলের দুই প্রান্তে দুখান চেয়ার। চেয়ারে বসিয়া মলিনা ও প্রমদা। মুখ গম্ভীর···কথা বা হাসির রেখাও নাই!

এই টেবিলে ভোজনের ব্যবস্থা। টেবিল হইলেও ভোজ্য সনাতন বঙ্গীয় প্রথায়,—ভাত, ডাল, ঝোল, অম্বল, লুচী, তরকারী।

সতীনাথ আসিয়া সস্মিত মুখে কহিল—কি! দুজনে এমন চুপচাপ বসে যে! খাওয়া-দাওয়া চুকেচে?

প্রমদা গম্ভীর স্বরে কহিল—না!···

সতীনাথ কহিল—খাবার দিতে বলো তাহলে। আমি এখ্‌নি মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হচ্ছি।

সতীনাথ চলিয়া গেল। মুখ-হাত ধুইয়া যখন ফিরিল, টেবিলে তখন এনামেলের থালা পড়িয়াছে। থালায় লুচি, ভাজি···ঠাকুর কাপে করিয়া ডাল-ঝোল আনিয়া দিল।

সতীনাথ কহিল,—ব্যাপার কি?

কেহ উত্তর দিল না।

দুজনের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল—বাঃ! দুজনেই গম্ভীর! পরে মলিনার পানে চাহিয়া পরিহাস-ছলে সতীনাথ কহিল—বন্ধুর বিরহ···এবং সে বিরহ এমন ঘনীভূত যে, দুই সখীর মুখ আঁধারে আচ্ছন্ন! Lucky ললিত!

এ-পরিহাস নিরর্থক হইল—কাহারো মুখে হাসির বা এতটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ফুটিল না! সতীনাথ কহিল,—কি হয়েচে?

বলিয়া দুজনের পানে চাহিল। দু'দিক হইতে শুধু মৃদু দুটি নিশ্বাস···তার পর অবস্থা পূর্ব্ববৎ। সতীনাথ বুঝিল, দুদিকেই মেঘ···এবং সে মেঘ কথার হাওয়ায় উড়িবার নয়! কিন্তু কি এমন ঘটিল চক্ষের নিমেষে যে···

মলিনার পানে সতীনাথ চাহিল। আহা, স্বামী কাছে নাই···তাই মিলনানন্দের মাঝখানে সুর কাটিয়া গিয়াছে! বেদনায় তার বুক ভরিয়া উঠিল। সতীনাথ কহিল—মনটুর সর্দ্দিটা বাড়লো না কি? তাকে ব্রায়োনিয়া দেওয়া হয়েছিল?

মনটু মলিনার তিন বছরের পুত্র। মলিনা কহিল,—ভালো আছে।

—টেবি?

সতীনাথের মেয়ে টেবি। বয়স দু'বছর প্রমদা কহিল—তার আবার কি হবে? সুস্থ মেয়ে···

প্রমদার স্বরে কেমন একটু রুক্ষতা। সতীনাথের চক্ষু স্থির! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভোজনে মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু এ কি ভালো দেখায়? ললিত নাই···মলিনার স্বাচ্ছন্দ্যের ভার তার উপর। একটা দায়িত্ব তো! সতীনাথ আবার মলিনার পানে চাহিল, ডাকিল,—মলিন···

মলিনার সঙ্গে সতীনাথের পরিচয় তার বিবাহের পূর্ব্ব হইতে। মলিনার দাদা নীলাব্জ স্কুলে তার সহপাঠী ছিল। নীলাব্জর গৃহে সে তখন নিত্য যাইত। তার পর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নীলাব্জ পুনায় চলিয়া যায়। ললিতের সঙ্গে মলিনার বিবাহে ঘটক সতীনাথ স্বয়ং। তাই সে মলিনাকে ডাকে নানা নামে···মলু, মলিন, মলি, মিল, মিলা···যখন যে-নাম মনে আসে।···

সতীনাথের আহ্বানে মলিনা তার পানে চাহিল।

সতীনাথ কহিল—কি হয়েচে মলি?

মলিনা প্রমদার পানে চাহিল। তার ঠোঁট কাঁপিল! মৃদু স্বরে মলিনা কহিল—কিছু না!

কথাটা বলিয়া সে মাছের কাঁটা বাছিতে মগ্ন হইল।

সতীনাথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্ত্রীর পানে চাহিল, ডাকিল—প্রমোদ···

প্রমদা তার পানে চাহিল···ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টি! সতীনাথ কহিল,—কি হলো তোমাদের?

—কি আবার হবে!···প্রমদা ডাকিল,—ঠাকুর···

ঠাকুর নিকটে ছিল, আসিল। প্রমদা কহিল,—আমায় আর একটু মাছের চচ্চড়ি দিয়ে যাও তো!

ঠাকুর চলিয়া গেল। প্রমদা লুচির উপর ডাল ঢালিল। ব্যাপার দেখিয়া সতীনাথ কহিল,—বাঃ।

নিঃশব্দে ভোজন-পর্ব্ব চুকিল। মুখ-হাত ধুইয়া মলিনা গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। বাঁয়ে প্রমদার ঘর। প্রমদা নিজের ঘরে গেল, ডাকিল—বিষণী···

বিষণী সতীনাথের ভৃত্য; আসিল। প্রমদা কহিল,—টেবির দুধ গরম করে আন্।

বিষণী চলিয়া গেল। সতীনাথ ব্যাপার দেখিয়া একখানা বাঙলা মাসিকপত্র লইয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া ইজিচেয়ারে বসিল।···এ-পাতায়, ও-পাতায় চোখ বুলাইল; গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, হিন্দু-শাস্ত্রের আলোচনা, বর্জ্জয়েসে ছাপা জাতিভেদের তর্ক—কিছু বাদ রাখিল না; শেষে একটা পাতা উল্টাইয়া 'নিকারাগুয়া-ভ্রমণ' পড়িতে সুরু করিল।···

দুধারে বন। জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই। সেই বনের পথে লেখক চলিয়াছে একা; এক হাতে রিভলভার, গুলি-ভরা—অপর হাতে বর্শা! গা ছম্-ছম করিতেছে। স্তব্ধ বন। এমন স্তব্ধতা জীবনে সে কখনো উপলব্ধি করে নাই!···হঠাৎ একটা খড়খড় শব্দ। চমকিয়া লেখক চারিদিকে চাহিল। সামনে এক খেজুর গাছ—আর সেই গাছ জড়াইয়া এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ। সাপটা হাঁ করিয়া ঘাড় দুলাইতেছে; লক্-লকে জিভ! লেখক ডান হাতে রিভলভার ধরিয়া তাগ্ করিল, বর্শা বাঁ হাতে···

সঙ্গীন মুহূর্ত্ত!···সতীনাথের গায়ে কাঁটা দিল...গা-ছম্ ছম্ করিতেছিল, কি হয়···কি হয়? তবে লেখক বাঁচিয়া যাইবে নিশ্চয়; নহিলে এ লেখা মাসিকে ছাপা হইত না।

এমন সময় হাত হইতে কে বই টানিয়া লইল। সেই সাপ···?

চমকিয়া সতীনাথ সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখে, প্রমদা!···প্রমদা আসিয়া বইখানা কাড়িয়া লইয়াছে! প্রমদা কহিল,—চলো, শোবে চলো। টেবির দুধ খাওয়া হয়ে গেছে। একলাটি ভয় করে, বাপু···

সতীনাথ কহিল,—বইখানা দাও গো। অজগরের মুখে লোকটা পড়েচে, তার কি হলো···

প্রমদা কহিল,—ও গাঁজাখুরি গল্প পড়তে হবে না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখচেন! মন খুশী হয়, এমন বৃত্তান্ত লেখো, তা নয়···

সতীনাথ কহিল—বাঃ! ভ্রমণে বেরিয়ে নিছক সুখ, নিছক আরামই যে মিলবে, তার কি মানে আছে! ঐ যে উত্তর-মেরু-ভ্রমণের ব্যাপার—কি সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছিল, ভাবো তো! যদি বিপদ ঘটে, সে কথা বুঝি ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখবে না?

—না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সুখের হবে। অজগর সাপের কথা লিখবে যদি তো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলে ছাপানো কেন? লিখুক 'সাপের মুখে' বা 'অজগর-চক্র'···যে, নামেই বুঝবো, এ্যাডভেঞ্চারের কথা বলচে।

সতীনাথ কহিল—ভ্রমণ আর এ্যাডভেঞ্চার co-relative terms.

—যা বলেচো! তবে ও তর্ক এখন থাক্। শোবে, এসো।

—বইখানা দেবে না? ওটুকু শেষ করে···

—না। কাল সকালে শেষ করো!

—রাত্রে ঘুম হবে না। হয়তো স্বপ্ন দেখবো, ঐ অজগর আমার গলা চেপে ধরেচে! সত্যি, বুঝচো না···

—না। বুঝচি না, বুঝবো না। এসো। বই পাবে না।···

প্রমদা বই লইয়া গমনোদ্যত হইল।

সতীনাথ কহিল,—অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

প্রমদার পিছনে তাকে আসিতে হইল।…ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রমদা কহিল,—কথায় বলে পরভোক্তী হওয়া বরং ভালো, কিন্তু পরঘরী হওয়া ঠিক নয়!

সতীনাথ কহিল,—হঠাৎ এত বড় তত্ত্ব-কথা?

প্রমদা সনিশ্বাসে কহিল—

কিন্তু থাক,—সে কাহিনী সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুবিন্দু, যুক্তি, বিচার প্রভৃতির সংমিশ্রণে সে কাহিনীটুকুর আমূল বর্ণনায় প্রমদার সময় লাগিয়াছিল একটি ঘণ্টা; এবং একঘণ্টা ধরিয়া এ-কাহিনী শুনিয়াও সতীনাথের ধারণা যে খুব সুস্পষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। অস্পষ্ট আব্‌ছায়ায় এটুকু সে বুঝিল, জল গরম করা লইয়া ললিতের ভৃত্য শিউধনীকে মলিনা বকে—অথচ শিউধনীর কোনো অপরাধ ছিল না। তাই সে কথা প্রমদা বলিয়াছিল—এবং ঐ কথার প্রসঙ্গেই মলিনার সঙ্গে প্রমদার কি-না কি তর্ক ঘটে! তাহাতে প্রচণ্ড অভিমানে ছেলের পিঠে মলিনা দুটা চড় কষাইয়া দেয়। প্রমদা গিয়া ছেলেকে তার কাছ হইতে কাড়িয়া আনে। মলিনা তাহাতে রাগিয়া নানা কথা বলে। সে কথা প্রমদার মনে নাই, তবে তার শেষটুকু কাঁটার মত মনে বিঁধিয়া আছে।

সতীনাথ কহিল—সে কথাটুকু কি শুনি?

প্রমদা কহিল—আমায় বললে,—আর টশ্‌ দেখিয়ে কাজ নেই, ভাই…চাকরের দোষ, তাকে বকচি, তাতে কারো মধ্যস্থতা আমি কখনো বরদাস্ত করি নি!

প্রমদার দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। প্রমদা কহিল—মলিনা এমন কথা আমায় বলবে, স্বপ্নেও ভাবিনি!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ কহিল—হুঁ!

৩

পরের দিন সকালে সেই টেবিলের ধারে আবার তিনটি প্রাণীতে দেখা। চা আসিল। সতীনাথ কহিল—চা খেয়ে নাও মলিন! আজ শোণের বুকের উপর দিয়ে ওপারে যাবো।

মলিনা কোনো জবাব দিল না।

সতীনাথ তখন অবান্তর কথা পাড়িল,—কাল ষ্টেশনে এক মজার ব্যাপার দেখলুম।…সন্ধ্যার ট্রেণে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এসে নামলো। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবে, পুলিশ তাকে পাকড়াও করলে।…ব্যাপার কি? না, জামা খুলে দেখা গেল, জামার যে অস্তর থাকে, সেই অস্তরের নীচে আফিং…একেবারে পাৎলা আমসত্ত্বের মত সাঁটা! Excise case। তা, আফিং প্রায় তিন হাজার টাকার। তারপর টান্ দিতে দাড়ি-গোঁফ খশে পড়লো! যাত্রী টেণ থেকে নামলো খোট্টা ভগবানদাস, টানা-হ্যাঁচ্‌ড়ায় গোঁফ দাড়ি খশিয়ে ভগবানদাস অবশেষে করিমুদ্দিন চাচা হয়ে গ্রেফ্‌তার!

কাহিনীটুকু বলিয়া সে নিজে হাসিয়া সারা হইয়া গেল, কিন্তু হাসির এতটুকু রেখা…না প্রমদার মুখে, না মলিনার মুখে!

সতীনাথ প্রমাদ গণিল।

চা-পান শেষ হইলে সতীনাথ কহিল—চলো মলিন, বেড়াতে যাই।

মলিনা কহিল—থাক। শরীরটা ভালো ঠেকচে না।

সতীনাথ কহিল—বলো কি! একরাত্রেই বিরহ এমন ভয়ঙ্কর হলো! এখনো যে দুদিন কাটাতে হবে! ললিতকে টেলিগ্রাম করে দি না হয় যে, সখীর দারুণ বিরহ, জল্‌দি আও..

সতীনাথ হাসিল। মলিনা গম্ভীর মুখে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সতীনাথ প্রমদার পানে চাহিল, কহিল—তুমি কি বেরুবে না? তোমারো গোঁসা-ঘর?

প্রমদা কোনো জবাব দিল না; রান্নাঘরের দিকে চলিল। বিষণী কহিল—টেবুকে বেড়াতে নিয়ে যাবো, মা?

প্রমদা কহিল—না।

ও-ঘরে শিউধনী বলিতেছিল,—খোঁকাবাবু যাঁবে না?

মলিনা কহিল—না।

চমৎকার! সতীনাথ মাসিক-পত্র খুলিয়া বারান্দায় বসিল…সেই 'নিকারাগুয়া ভ্রমণ'! এ গোলযোগে সে ভ্রমণ-কাহিনীর কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তরকারী-ওয়ালী আসিল। সতীনাথ ডাকিল—ওগো…

ওগো সাড়া দিল না। সতীনাথ উঠিয়া মলিনার ঘরের দ্বারে আসিল, ডাকিল—মলিন…

—কেন?

সতীনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মলিনার হাতে একখানা নভেল। সে তক্তাপোষে শুইয়া নভেল পড়িতেছিল; সতীনাথকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বিষাদিনী মূর্ত্তি! ম্লান, মলিন মুখ!

সতীনাথ কহিল,—তরকারীউলি এসেচে। তরকারী নেবে না?

মলিনা কহিল—জানি না।

সতীনাথ কহিল—কি হলো তোমাদের—বলো তা আমায়।

মলিনার দুই ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিল। মলিনা খোলা জানালার মধ্য দিয়া আকাশের পানে চাহিল।

সতীনাথ নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। বারান্দায় প্রমদা তরকারীউলিকে কি বলিতেছিল।

সতীনাথ কহিল—এই যে তুমি! তরকারী এনেচে।

—হুঁ। বলিয়া গম্ভীর মুখে প্রমদা প্রস্থান করিল। তরকারী-ওয়ালী হতভম্বের মত সতীনাথের পানে চাহিল; সতীনাথ প্রমদার পিছনে চলিল, কহিল—তরকারী নেবে না?

প্রমদা কহিল—উনি কি বললেন? গিয়েছিলে তো জিজ্ঞাসা করতে।

সতীনাথ কহিল—মলি! তা সে তো দেখেনা এ সব। তুমিই···

প্রমদা কহিল—আমি কিছু জানি না। মান ভাঙ্গাতে পারলে না? গিয়েছিলে তো! টশ্! ওঃ···

প্রমদার স্বর রুক্ষ। বিস্ময়ে সতীনাথের মন ভরিয়া উঠিল। সে ডাকিল,—প্রমোদ···

সতীনাথ প্রমদার অঞ্চলাগ্র ধরিল।

প্রমদা কহিল,—আঁচল ছাড়ো। আমি নাইতে যাচ্ছি।...আমি কিছু জানি না।

প্রমদা চলিয়া গেল। সতীনাথ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল ···

দু'ঘণ্টা পরের কথা।

বারান্দায় সেই ইজিচেয়ারে সতীনাথ পড়িয়াছিল। সাম্‌নে পথ। পথে দু'একজন করিয়া লোক চলিয়াছে। ফটকের মাথায় লতানে গাছটা বেশ ঝাঁকড়াইয়া উঠিয়াছে—কতকগুলা বেগুনি ফুল তাহাতে ফুটিয়াছে। ···ধূসর আকাশ, কোথাও এতটুকু মেঘ নাই, রৌদ্র-কিরণে চারিদিক্ ধপ-ধপ করিতেছে!···

প্রমদা আসিয়া ইজি-চেয়ারের হাতায় বসিল।···

সতীনাথ কহিল—মলিনার কাছে চলো। তুমি বড়...ওর হাত ধরে মিটিয়ে ফ্যালো এ গোলযোগ···

প্রমদা কহিল,—কি করেচি আমি যে মেটাবো?

সতীনাথ কহিল,—নাই করো! ওর মনে যদি আঘাত লেগে থাকে···

প্রমদা কহিল—কোথাও কিছু নেই—শুধু শুধু আঘাত···! তুমি তো শুনেচো···বেশ, বিচার করো। আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, আমি ভূঁয়ে নাক-খৎ দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইবো!

সতীনাথ কহিল,—তুমি তিলকে তাল করচো, প্রমোদ!···বেচারী! একে শরীর নেই···মন খারাপ হয়ে আছে···তার উপর হয়তো কি অভিমান!

প্রমদা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—অভিমান আমার নেই? বলচি তো, কোনো অপরাধ করে থাকি, আমায় ধরে দুশো জুতো মারো, সইবো। তা ব'লে বিনা-দোষে গল-বস্ত্র হবো···আমায় তো চেনো!

প্রমদা চলিয়া গেল।···সতীনাথ তেমনি বসিয়া; একেবারে থ!···অকস্মাৎ ঘরে ও'দিকে টেবির ক্রন্দন। সতীনাথ উঠিয়া ঘরে গেল। দেখে, বিছানায় কালির দোয়াত উপুড় করা···চাদরে কালি···আর টেবি হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে; টেবির মা প্রমদার রণ-বেশ! ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার—বুঝিতে বাধে না!

সতীনাথ কহিল,—কালি-কলম একটু উঁচুতে রাখতে হয়। ছোট ছেলেপিলে· ·

প্রমদা কোনো কথা কহিল না; টেবিকে ধরিয়া সেই কালির উপর তার মুখ গুঁজিয়া ধরিল। টেবির রোল পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল।···

তার পর আবার সেই টেবিল···টেবিলের উপর ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, দই। নিঃশব্দ ভোজন-পর্ব্ব! যেন সম্পূর্ণ অজানা তিনটি প্রাণী কোথাকার হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে!

স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সতীনাথ কথা কহিল, বলিল—আমি বিকেলের ট্রেণে সাসারাম যাচ্ছি। আমার এক বন্ধু সেখানে মুন্সেফ! ছুটীতে বাড়ী যায়নি। আমায় যেতে লিখেচে।

প্রমদা বা মলিনা কোনো কথা কহিল না।

সতীনাথ কহিল,—রাত্রে বোধ হয় ফিরতে পারবো না। তেমন ট্রেণ নেই। তোমরা দু'জনে থাকতে পারবে?

কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে! প্রমদা ও মলিনা জবাব দিল না; পূর্ব্ববৎ গম্ভীর রহিল!

সতীনাথ কহিল,—শরীর তোফা আছে। শুধু আমার বরাতে···

কথা শেষ হইল না!···কাহার জন্যই বা শেষ করা!···

দুপুর বেলায় সময় আর কাটে না। আগে তাসের আসর বসিত। রামি, স্ন্যাপ, গ্রাবু, ব্রে—কত খেলা!··· আর আজ? মাসিক-পত্রের বিজ্ঞাপনগুলা অবধি সতী-নাথের দু'বার পড়া হইয়া গিয়াছে!···

ও'দিকে বিষণী ঘুরিয়া আসিয়া শিউধনীকে বলিতেছিল, ভারী বান এসেছে রে দরিয়ায়। এ-পার থেকে ও-পার ইস্তক্ সব বালি ডুবে গেছে। আর কি টান···

শিউধনী ছুটিল—বিষণীও সেই সঙ্গে।···

কথাটা সতীনাথ শুনিল; ডাকিল,—ওগো···

ওগো বাহিরে আসিল। সতীনাথ কহিল,—টেবি ঘুমিয়েচে?

—হ্যাঁ। প্রমদা বারান্দার রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইল। তার পর ভিতরে গেল, গিয়া তখনি আবার ফিরিল; ফিরিয়া আপন-মনে কহিল,—শোণে জল এসেচে।

সতীনাথ কহিল,—যাবে দেখতে?

—যাবো!…

কাছেই চটি জুতা পড়িয়াছিল; প্রমদা চটি জোড়ায় পা ঢুকাইল।

সতীনাথ কহিল,—মলিকে ডাকি…

সে গিয়া মলিকে কহিল,—শোণে কূলে কূলে ভরা জল। দেখতে যাবে?

জানালা দিয়া শোণের বুক দেখা যায়। মলিনা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল; পরে সতীনাথের পানে; তার দৃষ্টিতে আগ্রহ।

সতীনাথ ভাবিল, বেশ হইয়াছে। এবার দুই সখীর এ মনান্তর তাহা হইলে…

সতীনাথ কহিল,—এসো। প্রমদাও যাচ্ছে…

মলিনা উঠিতেছিল, ওঠা হইল না। সে কহিল,—না, আপনারা যান। আমার ভারী মাথা ধরেচে।

সতীনাথের বুকখানা ছাঁৎ করিল। তবু হাল ছাড়িবে না! তাই পরিহাস করিয়া বলিল,—শুয়ে শুয়ে দিন-রাত বিরহ-চিন্তায় মগ্ন থাকলে মাথা ধরবেই তো! আমি ললিতকে চিঠি লিখে দিয়েচি, পত্র-পাঠ রওনা হও। ভাবনা নেই। এসো মলিন…

—না, সত্যি, পারচি না। আমায় মাপ করুন… আপনারা যান।

সতীনাথের উৎসাহ নিবিয়া গেল। সে আবার কহিল,—আসবে না মলি? আমার কথায়…

—মাপ…আমায় মাপ করুন।

মলিনা শুইয়া চক্ষু মুদিল। একটা নিশ্বাসও বুঝি রোধ করিতে পারিল না।

সতীনাথ বাহিরে আসিল। তীব্র দৃষ্টিতে প্রমদা ঘরের পানে চাহিয়া ছিল। সতীনাথকে দেখিয়া কহিল,—যাবে না?

সতীনাথ কহিল,—মলিনার মাথা ধরেচে…থাক্।

প্রমদা গর্জ্জিয়া উঠিল,—যাও, সেবা করো গে।… আমি জানতুম। বেশ, তুমি বাড়ী থাকো, সেবা করো। আমি যখন যাবো ঠিক করেচি, তখন যাবোই…

প্রমদা বাহির হইয়া গেল। সতীনাথ আবার সেই ইজি-চেয়ারে বসিল।…

৪

আরও এক দিন এমনি ভাবে কাটিল। এমন বিপদে সতীনাথ কখনো পড়ে নাই। কাহারো পক্ষ লইবার উপায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, সেকালের পণ্ডিতরাই নারী-চরিত্র ঠিক বুঝিয়াছিলেন! একালের মত ছাপাখানা, মাসিক-পত্র বা গল্প, কাব্য, উপন্যাসের এমন ছাড়াছড়ি ছিল না,—জীবন্ত নারীর চরিত্র লইয়া তাঁরা কারবার করিতেন। তাই! আর এ-যুগে? তারা কাব্য আর উপন্যাসের নারীর-চরিত্র ঘাঁটিয়াই পরমানন্দে ভাবে, ওদিক্‌টায় চূড়ান্ত রিশার্চ্চ হইয়াছে! সংসারে পদে পদে তাই এমন মান-অভিমান, উৎপাত, বিগ্রহ, বিপ্লবের উদয় হয়! কে জানে, অধীর নর-নারীর দল সেই জন্যই বুঝি-বা হিন্দুর ডিভোর্শ-আইনের স্বপক্ষে ভোট দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে!…

অবশেষে রাত্রে কাশীর ফেরত ললিত আসিয়া ডিহিরী ষ্টেশনে নামিল। সঙ্গে আনিল একটা টুকরি ও একটা টিন। টুকরিতে আপেল, নাশপাতি, পানিফল, আঙুর প্রভৃতি—ফলের বাগান! টিনের মধ্যে পরিপুষ্ট এবং উপাদেয় বেনারসী মাগুর মৎস্য।

সতীনাথ ষ্টেশনে আসিয়াছিল, আর কেহ আসে নাই।…

সতীনাথ কহিল,—মাগুর মাছ এনে হাজির! এ যে রোগীর পথ্য হে!

ললিত কহিল,—এ সে মাগুর নয়। নামে মাগুর হলেও আকারে মুগুর! দেখো। এমন মশগুল করেছিল হে যে, এই মাগুরের লোভে সাধ হচ্ছিল, ছুটির বাকী দিন-গুলো সেই কাশীতেই কাটিয়ে আসি!

—বলো কি?

ললিত কহিল,—তাই।…

দু'জনে গৃহে ফিরিল। মলিনা বা প্রমদা যেন এ-বাড়ীর কেহ নয়, কিম্বা সদ্য-আসীনা নব বধূ…তাদের দিক্ হইতে এতটুকু চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই!

কাজেই সতীনাথকে গৃহিণীপনার ভার লইতে হইল; ললিত অবাক্! হাসির উচ্ছ্বাসে ভরা গৃহ দেখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখে, সেখানে এমন গাম্ভীর্য্য! যেন ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল আসিয়া ইন্‌স্‌পেক্‌শন্ সারিয়া গিয়াছে, কি রিপোর্ট দিবে, সেই চিন্তায় চারিদিকে ছম্‌ছমে ভাব!

আহারাদির পর বিশ্রাম। সতীনাথ ভাবিল, এবার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কিন্তু সকালে ললিতের আর-এক মূর্ত্তি!

সতীনাথ কহিল,—ফলের টুক্‌রিটা খোলা হোক!

ললিত কহিল,—খোলো…

উৎসাহ ও আগ্রহ যেন ডিহরী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে!…নিশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ কহিল,—দুপুরবেলায় দেখা যাবে'খন, কি এনেচো…কেমন?

ফলের টুক্‌রি তেমনি রহিয়া গেল। শিউধনী গিয়া মলিনাকে কহিল,—ও টুকরিঠো···

মলিনা কহিল,—আমি জানি না।

বিষণী গিয়া প্রমদাকে ঐ এক প্রশ্ন করিল!

প্রমদা কহিল,—আমি কি জানি।···

সতীনাথ ললিতের পানে চাহিল। ললিত আকাশের দিকে চাহিয়াছিল—তার দৃষ্টি উদাস। বধূদের কথা দুই বন্ধুর কাণেই প্রবেশ করিয়াছিল!···বেড়ানো ঘটিল না। সতীনাথ বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ খুলিল—কাল ডাকে আসিয়াছে।

ললিত একখানা মোটা বই খুলিয়া বসিল, বারান্দার আর এক প্রান্তে।

সতীনাথ বইখানা দেখিল,—কার গ্রন্থাবলী। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত···

তার অস্বস্তির সীমা নাই। এ কি করিলে ভগবান! এ 'বরফ' কি করিয়া ভাঙ্গা যায়! ললিত হয়তো ভাবিতেছে, তার অনুপস্থিতিতে এবং তার প্রিয়তমা পত্নীর খুব যত্ন করিয়াছে, বটে!···

আহারাদির পর এ-ভাব একান্ত অসহ্য হইল। সতীনাথ ডাকিল,—ওহে ললিত···

ঘরের মধ্য হইতে ললিত কহিল—কেন?

সতীনাথ কহিল,—একবার বাজারের দিকে যাই, চলো...

—চলো।···ললিতের স্বর উদাস!

ললিত বাহিরে আসিল। সে সদা-প্রসন্ন মুখ আর নাই! সতীনাথ নিশ্বাস ফেলিল।···

ফটকের বাহিরে আসিয়া সতীনাথ কহি—একটা ইয়ে হয়েচে হে···এখানে ইতিমধ্যে অর্থাৎ···

ললিত কহিল—আমি সে কথা বলবো, ভাবছিলুম!

সতীনাথ কহিল—তুচ্ছ একটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার! বিশেষ কিছু নয়···

তার মুখের কথা লুফিয়া ললিত কহিল—তুচ্ছ!··· বলিয়াই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সতীনাথ কহিল—না হয় একটু বোঝবার ভুল···

ললিত কহিল—তা কি করে বলি?···যা শুনলুম···

সতীনাথ কহিল—আসল ব্যাপার তুমি তা হলে শোনো নি···মলি চিরদিন একটু অভিমানী···

ললিত কহিল—এ অভিমানের কথা নয়!···অভিমানী সে হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়।

সতীনাথ শিহরিয়া উঠিল; কহিল,—মেয়েদের সব খুঁটিনাটি কথা শুনো না। সেন্টিমেন্টের সঙ্গে সত্য এমন মিশে যায়···

ললিত কহিল—ও কথা থাক্! আমি তাই ভাবছিলুম···

—কি?

ললিত কহিল—তাঁবু তুলে গৃহে ফেরা যাক্!

—সে কি! এর মধ্যে? ছুটীটা মাটী হবে যে!

—মাটী যা হয়েচে, ঢের। এখানে থেকে মাটী ছাড়া আর কিছু হবার আশা দেখিনে।···অর্থাৎ তুমি ভাই প্রণয়ানুরাগে শ্রীমতীর অপরাধ সম্বন্ধে একটু পক্ষপাতিত্ব করচো। আমি অবশ্য যা শুনলুম···

সতীনাথ কহিল—আমার প্রণয়ানুরাগ যতই থাকুক··তোমার আমার মধ্যে reasonএর ব্যাঘাত তাতে ঘটতে পারবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো!···

—থাক্, ও তর্কে প্রয়োজন নেই।

—বেশ!

—উত্তম।

তে-মাথা মোড়। সতীনাথ ডাহিনের পথে বাঁকিল। ললিত কহিল,—তুমি ওধারে যাচ্ছো? আমি একবার ঐ আনিকাটের দিকে যাবো, ভাবছিলুম।

সতীনাথ কহিল—মানে, আমি ট্রাঙ্ক রোডে যাবো। হিমাংশু বাবু বলে একটি ভদ্রলোক আছেন। তাঁর কাছ থেকে কখানা বিলিতি ম্যাগাজিন্‌ আনবো। দেবার কথা আছে।

দুই বন্ধু দুই পথে চলিল।···দুজনের বুকে অসহ্য যাতনা!·· এমন ঘটিতে পারে···কে জানিত? প্রমদা আর মলিনা···দুজনে অমন ভাব···এতখানি অন্তরঙ্গতা! ···ছোট স্বার্থে একটু আঘাত। গৃহিণীপনায় বাধা! হয়তো তাই! কিন্তু নারী এমন অসার···

দুজনের মনে চিন্তার ধারাও বুঝি এক!···

সন্ধ্যার দিকে সতীনাথ ঘরে বসিয়াছিল···পুরানো ষ্ট্রাণ্ডের পাতায় ছবি দেখিতেছিল।

প্রমদা আসিয়া কহিল—ওঁরা বেড়াতে বেরুচ্ছেন। তুমি যাবে না?

সতীনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—তাই না কি!

প্রমদা কহিল—তোমার বন্ধুটি স্ত্রীর কথায় ওঠেন-বসেন!...বোধ হয়, আমার নামে গিন্নী লাগিয়েচেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না!

প্রমদার স্বর গাঢ়।

সতীনাথ কহিল,—হুঁ···

প্রমদা আয়না পাড়িয়া চুল বাঁধিতে বসিল। সতীনাথ বাহিরে বারান্দায় আসিল।

সেই ফলের টুকরি তেমনি পড়িয়া আছে। একটা দুর্গন্ধ! সতীনাথ নাসা কুঞ্চিত করিল।

ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইল ললিত আর মলিনা। মনুটুকে লইয়া শিউধনী আগে গিয়াছে!···

সতীনাথ কহিল—বেড়াতে চলেছো ?

—হ্যাঁ। একটু ঘুরে আসি।

ললিত ও মলিনা চলিয়া গেল। সতীনাথ আল্‌না হইতে জামা টানিয়া গায়ে দিল।

প্রমদা কহিল—বেড়াতে যাচ্ছো ? ওদের সঙ্গে ? ও···

কথা সংক্ষিপ্ত—কিন্তু স্বরে এমন বৈচিত্র্য খেলিয়া গেল! সতীনাথ কহিল,—না, তোমায় নিয়ে বেরুবো।···ওরা বেড়াতে যেতে পাবে, আমরা পারি না ?

প্রমদা খুশী হইল, কহিল—আমার হলো বলে। শুধ্ মুখে একটু সাবান দেবো।

—বেশ।···

পনেরো মিনিট পরে প্রমদা তৈয়ার হইয়া আসিল, এবং দুজনে বাহির হইল। কিন্তু যাইবে কোথায় ?

—শোণেই চলো।···

নদীর বুকে জল নাই—ধু-ধু বালি। মাঝামাঝি ঐ যে ললিত, মলিনা।

প্রমদার পায়ে হুঁচট লাগিল। প্রমদা কহিল—না বাবু—ভস্‌ভসে বালি। পায়ে লাগে, হাঁটতে পারি না। চলো, ষ্টেশনের দিকে যাই!

সতীনাথ কহিল,—বেশ!

দুদিন, তিন দিন, চার দিন আরো কাটিল। দিন কাটে, রাত কাটে, মেঘ তবু কাটিতে চায় না।···বামুন-চাকরে কাজ করিয়া যায়···কলের মত! সংসার চলিতেছে···কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই।...তবু···কেমন যেন নির্জ্জীব এঞ্জিন।

সতীনাথ ললিতকে পায় না, ললিতেরও সেই দুঃখ!··· কড়া নিষেধ,—না, ওধারে নয়। দু'দিকেই।···নিঃশব্দে দিন তবু কাটানো চাই।

ডাকে পরের দিন ললিত একখানা চিঠি পাইল। সতীনাথ লিখিয়াছে,—সকালে ষ্টেশনে আসিয়ো···কথা আছে।···

ললিত তার জবাব দিল—আচ্ছা!

জবাবটুকু সে কোনো রকমে ষ্ট্রাণ্ডের পাতার মধ্যে পিণে গুঁজিয়া দিল।···

পরের দিন সকালে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে দুজনে দেখা।

সতীনাথ কহিল— এ কি হচ্ছে ললিত ?

ললিত কহিল—মারা যেতে বসেচি।···দুই সখীর মান-অভিমান আমাদের মধ্যে খাঁড়ার মত এসে পড়েচে!

সতীনাথ কহিল,—আমায় স্পষ্ট বলেচে, ঢের হাওয়া খাওয়া হয়েচে। বাড়ী চলো। তাতে আমি বলেচি, বাড়ী এগ্রিমেণ্টে ভাড়া—ছাড়লে লোকশান হবে।

ললিত কহিল—আমারো ঐ দশা!···আমি বলি, শ্রীমতী প্রমদা তোমার চেয়ে বয়সে বড়, সম্পর্কেও তাই। তুমি আগে কথা কও। তাতে বলেচে, কি করেচি আমি যে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেচে ?···

সতীনাথ কহিল—উপায় ?

ললিত কহিল—ঠাওবাও।···তুমি উকিল। মিথ্যা defence তো মাঝে মাঝে আদালতে খাড়া করতে হয়।

সতীনাথ কহিল,—হাকিমকে ভুলোনো আর স্ত্রীকে ভুলোনো—দু'য়ে বিস্তর প্রভেদ!

ললিত নিশ্বাস ফেলিল। সতীনাথ কহিল,—চলো, বেড়াতে বেড়াতে শোণ-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক অবধি। একটা মতলব ঠাউরে তবে বাড়ী ফিরবো।

ললিত কহিল,—বেশ বলেচো!···

বেলা দশটা। দু'জনে দু'পথে গৃহে ফিরিল। সতীনাথ ডাকিল,—ওগো···

ললিত ডাকিল,—মলি···

কাহারো সাড়া নাই। সতীনাথ ডাকিল,—বিষণী···

বিষণী আসিল। সতীনাথ কহিল,—লগেজ বাঁধ্। বার্থ রিজার্ভ ক'রে এসেচি। আজই রাত্রের ট্রেণে গয়া যাবো!···

ললিত শিউধনীকে কহিল,—বিচানা পত্তর বাঁধ, আজ বিকেলে কাশী যাচ্ছি। ধোপার কাছে যা···কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে আয়। ট্রেণের বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে।··বুঝলি ?

গম্ভীর মুখে দুই বন্ধুতে পাকশালার দিকে চলিল। ওদিকে হাসি-গল্পের কি কলোচ্ছ্বাস!···তাহা হইলে ··

সতীনাথ হাঁকিল,—চট্‌পট সেরে নাও গো, আজ গয়া যাবো।

ললিত হাঁকিল,—কাশীর জন্য বার্থ রিজার্ভ করে এলুম, মলি।

প্রমদা রান্নাঘরে; উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া ডাকিল,—ওলো মলি···তোর হলো ? আয় শীগগির···সুপুরি নিয়ে। যে মাংস, বাবাঃ! সেদ্ধ করা দায়।···বাবুরা এলো বুঝি রে।

মলি কহিল,—দাঁড়াও দিদি···সুপুরি কি আছে! সব উই ধরেচে! মা গো, কি দেশ—সুপুরিতে উই ধরে!

—তুই আয় ভাই। হাঁড়িটা আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। উনুনও তেমনি··· জ্বাল নেই!

বেড়ি দিয়া উনুনের গলা ধরিয়া হাঁড়ি বহিয়া ওদিক হইতে প্রমদার প্রবেশ—এদিক হইতে একটা এনামেলের ডিশে উই-ধরা সুপারি লইয়া মলি···মধ্যপথে ললিত ও সতীনাথ!···

ললিত কহিল,—ও সব রাখো গো, গুছিয়ে নাও—শীগ্‌গির। আজই কাশী যাচ্ছি।

সতীনাথ কহিল,—ফ্যালো হাঁড়ি। বিছানা-পত্র বাঁধো। গয়া যাচ্ছি আজ।

—সে কি!

দুই সখী একসঙ্গে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

প্রমদা কহিল,—এমন ডেরা পেতে বসে'চি! একসঙ্গে আনন্দে আছি! না, ইনি বল্লেন, গয়া চলো,—উনি বল্লেন, কাশী!

মলিনা কহিল,—যেতে হয়, দুই বন্ধুতে যাও। আমরা যাবো না। বেড়াতে এসেচি বলে কেবলি টো-টো করতে হবে! থিতু হবো না—না?

সতীনাথ ও ললিত অবাক্!…

সতীনাথ কহিল,—হাসি নেই, কথা নেই—দুজনের গোমড়া মুখ!

মলিনা কহিল,—তার বোঝাপড়া আমরা করবো। আপনারা পুরুষ মানুষ—মেয়েদের কথায় থাকেন কেন?

সতীনাথ কহিল,—বটে! আমাদের যে প্রাণান্ত!

ললিত কহিল,—কত বিধি-নিষেধের সৃষ্টি। না, শুনবো না। আবার কাল তেমনি…

মলিনা কহিল,—আমার ভুল, আমি মান্‌চি। তার কারণ ছিল…তুমি চলে গেলে কেন? তোমার দোষ। ক'-দিনের জন্য আমোদ করতে আসা…ভারী রাগ হয়েছিল। তাই। দিদি বারণ করলে না কেন? সতীবাবু যদি কোথাও যেতেন, আমি যেতে দিতুম না। তাই আমার রাগ হয়েছিল! আমার মনটার পানে কেউ দেখলে না। সেই রাগে…

প্রমদা কহিল,—আমার কিন্তু অভিমান হয়েছিল, সত্যি…

সতীনাথ কহিল,—তার পর?

প্রমদা কহিল,—আজ মাংস বেচতে এসেছিল—চাকররা বললে, কিনবো মা? সত্যি, তোমাদের খাবার কষ্ট হচ্ছে! নিত্য ঐ ট্যাড়শ আর চিচিঙ্গে! তাই গেলুম মাংস নিতে। এ-দিক্ থেকে আমি গেছি, ও-দিক্ থেকে ও…তার পর দু'জনে চোখো-চোখি হতে হেসে বাঁচি না!

সতীনাথ কহিল,—বাঃ! কিন্তু আমি যে বার্থ রিজার্ভ করে এলুম…

ললিত কহিল,—চমৎকার! পিশিমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েচি, আজই কাশী যাচ্ছি বলে—এখন উপায়?

প্রমদা কহিল,—না।…কেমন একসঙ্গে আছি, নির্ঝঞ্ঝাটে! যাবো না!

মলিনা কহিল,—এ ক'টা দিন গিছে কি দুর্ভোগে কাটলো! বেড়াতে আসার আনন্দ পেলুম কবে?

সতীনাথ কহিল,—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং…

প্রমদা কহিল,—শাস্ত্র রেখে সুপুরি আনিয়ে দাও এখনি। না হলে এই এক-হাঁড়ি মাংস সেদ্ধ হবে না, চোখে জল ঝরবে! খাবে কি?

—অল্ রাইট্!…

বিধাতা কিন্তু সত্যই বিরূপ। ডিহীরীতে থাকা গেল না। সেই দিনই সন্ধ্যায় মণ্টুর প্রবল জ্বর দেখা দিল; এবং শেষ রাত্রে টেবির রক্ত আমাশয়!—উপায়? ডিহীরীতে ডাক্তার নাই! শেষে…

কাজেই কোনো মতে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া পরের দিন আবার সেই পুনর্মূষিক…অর্থাৎ কলিকাতার সেই ধূমাচ্ছন্ন আকাশ, আকাশের নীচে সেই বদ্ধ গলি, এবং সে গলিতে সেই কারা-গৃহ!…

সতীনাথ তাই আজও বলিতেছিল,—বাঙালীর ভাগ্যে রোমান্স সইবে কেন! কথায় বলে, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে!…

ললিত বলে,—কপাল নয় হে, বলো স্ত্রী! এই জন্যই শাস্ত্রকাররা ব'লে গেছেন, পথে নারী বিবর্জ্জিতা!

প্রমদা হাসিয়া বলিল,—থামো। তোমরা দুই বন্ধুতে কি বলে গম্ভীর হয়ে থাকতে মশায়? মুখ্যু মেয়েমানুষ নও…এক জন উকীল, আর এক জন ফিলজফির প্রফেশর!

মলিনা বলিল,—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে অনেকে ছাপায়, দেখি। আমাদের মনে হয়, আমাদের ডিহীরীর সেই বৃত্তান্ত যদি ছাপানো যায়…

সতীনাথ কহিল,—লোকের তাক লাগে তা হলে; ভাবে, নারী জাতটা এমন অপদার্থ।

প্রমদা কহিল,—পুরুষ তার চেয়ে অপদার্থ—সে প্রমাণ পেতেও কোনো বাধা ঘটে না।…আমরা যেন মান-অভিমান করেছিলুম, কথা বন্ধ করেছিলুম…তোমরা পেরেছিলে সে অভিমান সারাতে?

ললিত হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নারীর কাছে পুরুষের পরাজয় যুগে যুগে ঘটেচে! তা ছাড়া স্ত্রীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রয়োজন হলে chivalric পুরুষ-স্বামী সব ত্যাগ করে! বন্ধুর সঙ্গে আলাপ, সে তো অতি তুচ্ছ বস্তু!

ভগবান আছেন!

বি-এ এগ্‌জামিন দিব। বড়দিনের ছুটি ফুরাইলে পড়ার বইগুলা বাহির করিয়া দুশ্চর তপস্যায় মত্ত হইলাম। দু'টা বৎসর শুধু মিটিং করিয়া, কবিতা লিখিয়া মাসিক পত্রের অফিসে অফিসে ঘুরিয়া কাটাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, তাহাতেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিব!

কিন্তু বন্ধুরা হুঁশ করাইয়া দিলেন—ডিগ্রীটাকে তুচ্ছ করিলে পরে পস্তাইতে হইবে! প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিলেন,—যোগেশ, অভিলাষ, শর্ব্বরী—গোলদীঘীর বিশ্ববিদ্যায় দাঁড়ি টানিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের গায়ে খিমচি কাটিতে গিয়া মারা যাইতে বসিয়াছে! দুঃখের আজ তাদের সীমা নাই! আর ওদিকে ওই প্রশান্ত, সুশীল, চণ্ডী, হারাণ পাশ করিয়া নিজেদের আসনগুলাকে কায়েমি করিয়া যেটুকু সাহিত্য-চর্চ্চা চালাইয়াছে, তাহাতে —খাশা…

অর্থাৎ এদিকটায় আরাম আছে। ওদিকে করুণা-প্রার্থীর সেই দীন ভাব!

বন্ধুদের ইঙ্গিত গ্রহণ করিলাম।

সকালের দিকে বাহিরের ঘরে ভিড় জমে। এ সময়টায় আমি পড়াশুনা করিতাম দোতলায়—আমার শয়ন-কক্ষে। দুপরে বাহিরের ঘরে নামিতাম। তখন সে ঘরে ঝামেলা থাকে না—নির্জ্জনে বিশ্ব-বিদ্যা-মন্দিরের বাণী দেবীর সাধনা হয় ভালো।

'প্রগ্রেশ' ভালো হইতেছিল, বলিতে পারি না। মন এ কষ্ট সহিতে পারিত না; ছুটিতে চাহিত সেই দায়িত্ব-হীন মুক্ত কল্পলোকে! জোর করিয়া তাকে পড়ার কেতাবে চাপিয়া ধরিতাম। সেক্‌সপীয়র, কীট্‌স্, শেলি —বিশ্ব-বিদ্যার ভ্রূকুটি-পাতে রীতিমত নীরস কঠিন বোধ হইত। বাধ্যতায় এমনি দুর্ভাগ্য!

সেদিন কবিতার একটি লাইনে বাধা পড়িল প্রচুর—পাঁচটা সমালোচক বাক্‌জালে সে লাইনটার এমন বিভিন্ন অর্থ বাৎলাইয়া গিয়াছে যে, সে তর্কের ফাঁশে মন বুঝি দম আটকাইয়া মরে! আমার হাঁফ ধরিয়াছিল।

খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দীর্ঘ পথ দেখা যায়। সে-পথ সরল রেখায় দূরে গিয়া বাঁকিয়াছে। অর্থাৎ…

বাহিরের ঘরের পোজিশনটা একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন।

আমাদের বাড়ীখানি একেবারে মোড়ের উপর! বাহিরের ঘরের খড়খড়ি খোলা থাকিলে সামনের গলির সবটুকু সুস্পষ্ট দেখা যায়।

পথের পানে চাহিয়াছিলাম। সহসা কাণে বাজিল, —চুড়িয়ালা—অ চুড়িয়ালা……

ঝাঁকা মাথায় চুড়ি হাঁকিয়া পথে চলিয়াছিল এক চুড়িওয়ালা। এ আহ্বানে ফিরিল—ফিরিয়া একটা বাড়ীর দোতলার পানে তাকাইয়া দ্বারে আসিয়া কহিল,—কোথায় গো?

দোতলা হইতে স্বর শুনিলাম—ঐ দোরের গোড়ায় নামাও। যাচ্ছি…

টেক্‌শ্‌ট্-বুকে জর্জ্জরিত মন যেন একটা অবলম্বন পাইল। এতক্ষণ পথের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, গলির মধ্যে বাস করা মূঢ়তা। কোনো রকম diversion নাই! বিশ্রী একঘেয়েমি!

চুড়িওয়ালা ঝাঁকা নামাইল…ওদিকে বাড়ীর দ্বারে মানুষী-সমাগম হইয়াছে, বুঝিলাম। চুড়িওয়ালা চুড়ি দেখাইতে লাগিল…দুখানি সুগোল বাহু আমার চোখে পড়িতেছিল…দুইগাছি করিয়া কাচের চুড়ি…তাহাতেই বাহুর যা শ্রী দেখিলাম,—কবিতার ছন্দে ফ্রেমে গাঁথিয়া রাখিবার মত!

পড়ার কথা মন হইতে উবিয়া মুছিয়া গেল। মনে হইতেছিল…

ভগবান আছেন। এবং তিনি অন্তর্য্যামী—এ-কথাও এক একবার বিশ্বাস হয়। নহিলে চুড়ি দেখিতে দেখিতে সেই বাহুর অধিকারিণী দ্বার ছাড়িয়া গলির পথে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন? আসিয়া ঝাঁকা ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিল—রকমারি জিনিষ!—দেখিয়া দ্বার-মধ্যবর্ত্তিনী অপর কাহাকে দেখাইতেছিল।

নিশ্চয় ও-বাড়ীর কুমারী কন্যা! শীতের হাওয়া থামিবামাত্র চকিতে দক্ষিণ বায়ুর প্রথম পরশ যেদিন গায়ে লাগে, সেদিন যেমন আরাম বোধ হয়, কিশোরীকে দেখিয়া মনে তেমনি আরাম বোধ করিলাম। যৌবনের প্রথম ঢেউটুকু আসিয়া অবয়বে লাগিয়াছে…

এখনো তার তরঙ্গ-ভঙ্গে সারা অঙ্গ দুলিয়া ওঠে নাই। দুলিবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণ! দেখিলে মনে হয়—আর কাহারো হয় কি না জানি না, তবে কবিতার ফুল-বনে দু'বৎসর ঘুরিয়া আমার মত যদি কেহ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকেন তো আমার মত তিনিও বুঝিবেন, যেন বসন্ত জাগ্রত দ্বারে!

চমৎকার! কবিতা যদি লিখিতে হয় তো ঐ কিশোরীকে দেখিয়া। অপরূপ সুন্দরী? তা নয়। ত

কেমন যেন অপরূপ মূর্ত্তি! মন ও-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে চায়, কামনা করিতে চায়।

ভাবে-ছন্দে আমার বুক দুলিয়া উঠিল। বুঝি, এই জন্যই কবি বলিয়াছেন—Star to Star vibrates light ..

দ্বিতীয় ছত্রটাও বুক কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, May not soul to soul…

কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম,—

লক্ষ যুগের জটিল তর্করাশি
লোহার কঠিন নিগড়ে তা বন্ধ—
তোমায় দেখি মিলায় সুদূর প্রান্তে!
চিত্তে জাগে তোমার রূপের ছন্দ!

হু-হু করিয়া ছত্রের পর ছত্র—ছন্দে তালে নাচিয়া একশারসাইজ বুকের একখানা পাতা ভরাইয়া দিল!

কবিতা লিখিয়া চোখ তুলিয়া দেখি, পথ পড়িয়া আছে! রৌদ্র-মাখা ধূ-ধূ পথ। পথে কিশোরী নাই; চুড়িওয়ালা চলিয়া গিয়াছে।

পড়ায় মন বসিল না। ও-বাড়ীর দ্বারের সামনে পথের ঐ অংশটুকু—সেই অরুণ চরণের আভায় এখনো যেন রাঙা হইয়া আছে।

ও-ধূলি! থিয়েটারে গান শুনিয়া ছিলাম—

যদি সে ঘরে না পশিতে পারিস্—
ওরে সে দ্বারের ধূলা এনে দিস্—
সেই সে ধূলার কাজল দেখিস্
নয়নে মাখিব হেসে।

বুঝিলাম, পথের ধূলি তুচ্ছ বস্তু নয়!

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। চমকিয়া উঠিলাম। আজিকার দিনটা…তাইতো! তাড়াতাড়ি মনের টুঁটি চাপিয়া Moral Philosophyর পৃষ্ঠায় তাকে গুঁজিয়া ধরিলাম। মন তাহাতে বসিতে চাহিল না..

পরের দিন। পড়িতে বসিয়াছি! মন পথে ছুটিতে চায়…চুড়িওয়ালাটা আজ এখানে আসিবে না? কাল সওদা বেচিয়া লাভ করিয়াছে।…

রাজ্যের লোক পথে চলিয়াছে—শুধু সেই চুড়িওয়ালার দেখা নাই!…

কিশোরী, চুড়িওয়ালা—তাদের চিন্তা ছাড়িয়া মন বহির্মুখী হইয়া উঠিল। দেশের বাণিজ্য-বিস্তারে দেশবাসীর ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে দুঃখের সীমা নাই। এখানে সওদা বেচিল; আবার আসা উচিত। তা নয়, আজ সে গেল অন্য পাড়ায়! হায়রে, আরো নব-নব শিল্প-সম্ভার আনিয়া…

চুড়িওয়ালা আসিল না। বেকুব! এই জন্য দেশের দুঃখ ঘোচে না! বাণিজ্যের কোনো নীতি জানে না!…

চুড়িওয়ালার উপর রাগ হইল, দরদও হইল। অবশেষে…

কবিতার ছন্দে একটা কথা বড় হইয়া দেখা দিল,—কেমনে তাহার দেখা পাই?

ভগবান আছেন—এ সত্য আবার উপলব্ধি হইল!

দুপুরবেলায় ও বাড়ীতে তীব্র একটা আর্ত্তনাদ… সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্য আসিয়া আমায় জানাইল—একবার আমাদের বাড়ী আসবেন?

আমার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ! এ কি সত্য?…

সত্যই। তখনি গেলাম। সেই কিশোরী বালিকা—তার পাশে প্রৌঢ়া মহিলা—মুখে দারুণ উদ্বেগ। মহিলা কহিলেন—এঁর আফিসে একটা টেলিফোন করে দেবে বাবা? আমার ঐ ছেলের অসুখ যাচ্ছে। ভারী টাল…ডাক্তার নিয়ে উনি যেন এখনি বাড়ী আসেন। বলে গেছলেন, তোমাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে; দরকার হলে যেন খপর দিই। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ আছে তো…

আমি কহিলাম—কোথায় টেলিফোন করতে হবে?

মহিলা চাহিলেন কিশোরীর পানে; চাহিয়া বলিলেন, —বল্ না…

কিশোরী এক মার্চ্চেণ্ট অফিসের নাম করিল। আমি কহিলাম—আমি এখনি খবর দিচ্ছি…

তখন গৃহে ফিরিলাম এবং টেলিফোনে রিং করিলাম —হ্যালো…হ্যালো…

রামহরি বাবুকে পাইলাম। তাঁকে সংবাদ জানাইলাম। তিনি বলিলেন—আমি এখনি যাইতেছি। এখন কেমন আছে?

তা তো! তা তো জানি না! সে সংবাদ লই নাই। কহিলাম,—একটু অপেক্ষা করুন। আমি জেনে আসি।

রামহরি বাবু কহিলেন—থাক। আমি এখনি আসিতেছি ডাক্তার-সমেত……

টেলিফোন-পর্ব্ব চুকিল। কিন্তু এইখানেই আমার পর্ব্ব সুরু!

আবার গেলাম রামহরি বাবুর গৃহে! ও গৃহের দ্বার আজ অবারিত! গিয়া সংবাদ দিলাম, তিনি এখনি আসিতেছেন। ছেলেটি এখন কেমন আছে?

গৃহিণী কহিলেন—এসো না বাবা। অসুখ নেই। ভারী কাহিল…রোগ সেরেচে। ডাক্তার বলচে, খুব সাবধান।

তাঁর চোখে জল। তিনি কিশোরীর পানে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন—আয় না বৈকি। লজ্জা কি!

কিশোরীর নাম বেঁকি। মা-বাপের মূঢ়তা। আমি ভাবিয়াছিলাম, নাম বুঝি নলিনী, কিম্বা ছায়া, কিম্বা দীপ্তি।

কবিতায় আমি নাম দিয়াছি নলিনী! হৃদয়-সূর্য্য এই নলিনীকে দেখিবার জন্যই আকাশে নিত্য আসিয়া উদয় হয়।

বিশু বেঁকির ভাই। বেঁকি কহিল—মার সব-তাতে ভয়। উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলো। এখন তো ঐ চেয়ে আছে। মা কি কাণ্ডই করলে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম,—উনি যে মা! মায়ের মনে দুশ্চিন্তাই আগে জাগে।

বেঁকি কহিল,—আপনাকে শুদ্ধ জ্বালাতন করলে।

আমি কহিলাম,—না, না। এটুকু যদি না করলুম, তাহলে এক পাড়ায় থাকার উদ্দেশ্য?

কথাগুলা আমার কাণে ভারি মুরুব্বির মত শুনাইতেছিল। কিন্তু উপায় কি? দরদের কথা এমন শুনায়। সহসা কবিত্বের কথা তোলা চলে না; বিশেষ এমন আপৎ-কালে।

বিশু আমার পানে চাহিয়াছিল, কহিলাম, ভালো আছো?

বিশু ঘাড় নাড়িল, হ্যাঁ।

বেঁকির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, আমি বাড়ী আছি, সে খপর···

কথা এইখানে থামিল। 'আপনি' বলিব, না 'তুমি' বলিব, স্থির করিতে পারিলাম না।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বেঁকির পানে চাহিলাম। বেঁকি অন্যদিকে চাহিয়াছিল। মুখে···কবিতায় গল্পে পড়িয়াছি, ···সরম-রাগ—বেঁকির কপোলে সেই সরম-রাগের দীপ্ত আভাস! অধরে যেন হাসির রেখা তন্দ্রাতুর পড়িয়া আছে ···জীবনের একটু পরশ পাইলে যেন জাগিয়া সাড়া দিবে।

বেঁকি আমার পানে না চাহিয়া জবাব দিল,—ভর্ত্তু বললে,—ও-বাড়ীর দাদাবাবু বাইরের ঘরে বসে পড়াশুনা করেন।

বুঝিলাম, চাকরের নাম ভর্ত্তু। কহিলাম—হ্যাঁ। বি-এ এগ্‌জামিন দেবো কি না! আর ক'টা দিন পরেই এগ্‌জামিন।

কথা অজস্র—বিপুল হইয়া বুকে ফুঁশিতেছিল। বাধিতেছিল শুধু ছোট একটু ব্যাপারে—'আপনি' বলিব? না 'তুমি'? 'তুমি' বলিলে এক মুহূর্ত্তে প্রাণের কাছে গিয়া দাঁড়ানো যায়! 'আপনি' কথাটায় মস্ত ব্যবধান। উপন্যাস গল্পে 'তুমি' চলিয়া গিয়াছে। তাছাড়া বয়সে ছোট···

হোক ছোট! 'তুমি' বলিলে যদি ভাবে,—আমার বয়স বহুদূর পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—নাগালের বাহিরে!

সমস্যা! বাঙ্গলা ভাষার উপর রাগ ধরিয়া গেল। বিশেষ এই গদ্য ভাষা! কবিতায় 'তুমি' চলিয়া যায় অবাধে; কবিতায় 'আপনি' নাই! কিন্তু কবিতায় তো কথা কওয়া চলে না! কহিলে একেবারে নাটক!···তাও হয় না!

বেঁকি বলিল—আপনি এখানে বসবেন?

আমি কহিলাম—বসি। যতক্ষণ না ইনি আসেন।

ইনি অর্থে—রামহরি বাবু।

বেঁকি চলিয়া যাইতেছিল। আমি মরিয়া হইয়া উঠিলাম। ভাষা-সমস্যা ভুলিয়া সাফ বলিয়া ফেলিলাম,—তোমরা শুধু দু'টি ভাই-বোন? বাড়ীতে আর কেউ নেই?

বেঁকি বলিল—আমার দাদা পড়ে শিবপুরে। সেইখানে থাকে।

—ও।

বেঁকি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবিলাম, তাইতো। আবার কহিলাম—তুমি স্কুলে যাও না?

বেঁকি বলিল—যাই।

—আজ যাও নি?

বেঁকি বলিল—বিশুর অসুখ বলে যাই নি। মা একলা···

—ও!

বেঁকি আর দাঁড়াইল না। আমি বসিয়া রহিলাম।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কার্পেটের ছবি—নাম লেখা আছে শ্রীমনোরমা দেবী। বেঁকির নাম মনোরমা? মনে হইল, এনাম এ যুগে অচল! আগের যুগে এই নামই ছিল অপরূপ! এখন কাটিয়া ছোট করার পালা! নাম হইবে দু'অক্ষরে—বিশেষ কিশোরীদের। চার অক্ষরে নাম শুনিলে মনে হয়, অতীত-যুগের নারী—কিশোরী নয়। এ-যুগের নাম হাসি, শিখা, দীপ্তি, স্মৃতি, মীরা, গীতা!

তা হোক্—মনোরমা-নাম কবিতায় কেন চলিবে না? 'মনোরমা'র চমৎকার মিল—'প্রিয়তমা,' 'প্রাণসমা'।

আবার মনে হইল, মনোরমা যদি বেঁকির মায়ের নাম হয়! বেঁকি কার্পেটের ছবি তুলিয়াছে? এ যুগে রেওয়াজ নাই। এ যুগের শিল্প কবিতার ছন্দে, গানের সুরে, ছোট গল্পের প্লটে, জাম্পার কোটে, পুল-ওভারে! কার্পেটের ছবির যুগ চলিয়া গিয়াছে! এখন ছবি আঁকা চলে—তুলি টানিয়া।

রামহরি বাবু আসিলেন; সঙ্গে ডাক্তার। দেখিয়া

শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—ভয় নেই।··লাফালাফি করেছিল বুঝি?

বেঁকি বলিল,—ছাদে উঠেছিল। তারপর মা বকতে ছুটে নীচে আসে···এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে!

রামহরি বাবু কহিলেন—ত্থাখো তো অন্যায়!

ডাক্তার বিশুকে ভয় দেখাইলেন, কহিলেন—চুপ করে যদি শুয়ে না থাকো, তাহলে আমি হাসপাতালে তোমাকে নিয়ে যাবো!

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। রামহরি বাবু কহিলেন—আপিসে যাই! অনর্থক দৌড় করালে!···

আমার পানে চাহিয়া কহিলেন,—তুমি তো গুণময় বাবুর ছেলে?

কহিলাম—আজ্ঞে, হ্যাঁ······

রামহরি বাবু কহিলেন,—ভির্‌মি হয়েছিল। ওঁদের টেলিফোনে সে খপরটুকু দিলেই তো চলতো! আমি ভাবলুম, না জানি, কি···বেঁকি তো ছিলি ··এ বুদ্ধি তোর হলো না?

বেঁকি কহিল—প্রথম মুখে ভয় হলো। মা বললে, ভর্ত্তুকে ডেকে, বাবুকে টেলিফোন করে দিক...

রামহরি বাবু আমার পানে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন,—আমি চলে গিয়েছিলুম,—বাড়ীতে দুপুর-বেলায় পুরুষ মানুষ কেউ থাকে না কি না। বলে গিয়েছিলুম, যদি তেমন বোঝো, গুণময় বাবুদের বাড়ী থেকে টেলিফোন করে দিয়ো···

এত কথায় আর প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ডাক্তার সমেত রামহরি বাবুকে দৌড় করানোয় গৃহস্থের কোনো লাভ না হোক, আমার লাভ হইল এই যে, প্রাণসমা মনোরমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আর একবার মনে হইল, ভগবান আছেন! এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হইল!······

তারপর সুযোগ ছাড়িলাম না। পড়ার কেতাব খুলিয়া বসিতাম। মন কিন্তু ভরিয়া থাকিত মনোরমায়। দু'বৎসরে যে পরিমাণ কবিতা, গল্প-গান ঘাঁটিয়া বেড়াইয়াছি, তার ফলে মস্তিষ্ক খুলিয়া গিয়াছিল এবং কিছু সংবাদ গ্রহণের আগ্রহ লইয়া রামহরি বাবুর গৃহে নিত্য গিয়া উদয় হইতাম······

বেঁকির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত। কোনো দিন লজেঞ্জেশ লইয়া যাইতাম, কোনোদিন চকোলেট, কোনোদিন বা একটা মাসিকপত্র, কোনোদিন ছেলেমেয়েদের এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। বেঁকিকে বিশুকে গল্প বলিতাম। গল্প বিশুকে বলিলেও বেঁকি শুনিত! যে দিন বেঁকি শুনিত, সেদিন আমার গল্প একেবারে আরব রজনীর কুহক-স্বপ্নে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতাম।

দশ দিন পরের কথা। বেঁকির সেদিন জন্মদিন। আগের দিন বিশু বলিয়াছিল, দিদির কাল জন্মতিথি, দাশু বাবু!

আমি কহিলাম,—বটে!

রামহরি বাবুর স্ত্রী নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রে একটু মাছ মাংস হইবে। বলিলেন,—উনি আসতে পারবে না। তুমি এসো বাবা।

আমি কহিলাম,—আসবো।

জন্মতিথির দিনটা লেখাপড়ায় মন বসিল না। দুপুরবেলায় বসিয়া কবিতা লিখিলাম। তারপর বৈকালের দিকে বাজার ঘুরিয়া দুটা কাণের টপ কিনিলাম। কবিতা-লেখা স্লিপটা টপের সঙ্গে গুঁজিয়া আকাশের দিকে চাহিলাম, কহিলাম,—এসো শ্যাম সন্ধ্যা······

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণে বাহির হইলাম।

গৃহস্থ ঘর। আয়োজনে এমন কোন সমারোহ নাই! বিশু দিব্য দোতলার ঘরে 'পাওয়া' বার্ষিকী পড়িতেছিল। গজানন কোম্পানি পূজার সময় ছেলে-মেয়েদের জন্য 'বার্ষিকী' বাহির করিয়াছে, দু'টাকা দাম। একখানা আনিয়া উপহার দিয়াছিলাম। কিনিতে হয় নাই। 'মন্দার' পত্রিকার সম্পাদকের বই; উপহার—সমালোচনার্থে। দেখিব বলিয়া আনিয়া ফেরত দিই নাই; গাপ করিয়াছিলাম। সেই খানাই 'উড়ো খৈ' করিয়াছিলাম। বেঁকিও খুশী হইয়াছিল। আমার চুরি সার্থক ভাবিয়া আমারো খুশীর অন্ত ছিল না।

বিশুকে বলিলাম,—মা কোথায় বিশু?

বিশু কহিল,—রান্নাঘরে।

—দিদি?

বিশু ডাকিল,—দিদি···

নীচে হইতে জবাব আসিল—কেন রে?

বিশু বেইমান নয়। তা ছাড়া তার বুদ্ধি আছে। যে গল্প বলে, চকোলেট-লজেঞ্জেস উপহার দেয়, তাহার খাতির করা প্রয়োজন, তাহাও বোঝে! কাজেই দিদিকে কৈফিয়ৎ চাহিতে দেখিয়া একটু চড়া সুরে কহিল,—দাশু বাবু এসেচেন······ডাকচেন···

বেঁকি কহিল,—যাই······

এবং সে আসিল। আমি কহিলাম,—কি করছিলে? মা কোথায়?

বেঁকি বলিল,—মা রান্নাঘরে মাংস বাঁধচে।

আমি কহিলাম,—তুমি?

হাসিয়া একপাক ঘুরিয়া একরূপ নাচিতে নাচিতে বেঁকি বলিল,—মাংস চাখছিলুম। চমৎকার হয়েচে।

দেশের বা সমাজের সমস্যা লইয়া বেঁকি কখনো মাথা ঘামায় না। জানি না, কোন্ সমস্যা লইয়া সে আকুল। কিশোরীর প্রাণে এতখানি সারল্য! মনের এমন সহজ প্রকাশ, লীলা-ভঙ্গী। কাজ নাই বেঁকির সে সমস্যা লইয়া মাথা ঘামানোয়। সে মাংস চাখিয়াই বেড়াক। তাহাতে যে শ্রী খোলে!

কবিতা একেবারে ছন্দে দুলিয়া মাথায় কিল্‌বিল্ করিয়া উঠিল···সরীসৃপের মত।···

মুগ্ধ-নয়নে বেঁকির পানে চাহিয়া রহিলাম। বুক-খানার মধ্যে বায়োস্কোপের রঙীন ছবি ফুটিল। একটা নিশ্বাস চাপিয়া কহিলাম,—আজ তোমার জন্ম-দিন?

বেঁকি কি-সে দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল···আজিকার এই তিথিতে তার মনে নূতন কোনো ভাবের জন্ম হইল কি? এমন বিহ্বল-করা দৃষ্টি বেঁকির চোখে আগে দেখি নাই।

বেঁকি কহিল,—হ্যাঁ।

আমি কহিলাম,—বাবা-মা কি দিলেন?

বেঁকি জবাব দিবার পূর্ব্বে বিশু কহিল,—মা দিয়েচে মাদ্রাজী শাড়ী। বাবা কিছু দেয় নি···

বিশুর পানে চাহিয়া কহিলাম,—তুমি?

বিশু কহিল,—আমি পয়সা পাবো কোথায়? বা রে···

পকেট হইতে টপ্ বাহির করিয়া কহিলাম,—এই নাও···আমার উপহার।

বেঁকি অবাক্! বিশু লাফাইয়া কাছে আসিল, কহিল,—কি এ?

আমি টপ বাহির করিয়া দেখাইলাম, কহিলাম,—কাণে পরো···

বেঁকি কহিল,—মাকে দেখিয়ে আসি। আমার কেমন···

কথা শেষ না করিয়া বেঁকি টপ্ লইয়া ছুট দিল। বিশুও পিছনে চলিল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম···
···উৎকর্ণ···

নীচে কি কথা হইল। কথা বুঝিলাম না।

বেঁকি ফিরিয়া আসিল—আর এক মূর্ত্তি! শান্ত। সে নৃত্য-ছন্দ মিলাইয়া গিয়াছে! আমার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া বেঁকি প্রণাম করিল। আমি তার মাথায় হাত রাখিলাম। কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, বুঝিলাম না। শুধু হাতটা মাথায় রাখিলাম!···বিদ্যুতের শিখা ছুটিয়া গেল—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত!

শিহরিয়া উঠিলাম।

বেঁকি চলিয়া গেল। আমি বসিয়া রহিলাম। বিশু কহিল,—আপনি বসুন। মা আসচে···

বেঁকি আসিল, কহিল—একটা পরেচি। আর একটা পারচি না··

বেঁকি কাছে আসিল। আমি কহিলাম—দেখবো?

বেঁকি কহিল—পারবেন?

—পারবো।

—দেখবেন, লাগিয়ে দেবেন না!

কহিলাম,—না।

টপ্ তার কাণে পরাইতেছিলাম। কাণের এই ডগা-টুকু···ফুলের পাপড়ি বুঝি এমন কোমল নয়! আঃ··· দুনিয়ার আরাম যেন এই কাণের ডগাটুকুতে!

সহসা বেঁকি চীৎকার তুলিল,—উঃ···

ছিট্‌কাইয়া সে সরিয়া গেল; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—এমনি লাগিয়ে দেছেন। আমার কাণটাকে কি ভেবেছিলেন? মাটী? না, কাঠ?

সে-মিষ্ট রোষের মধুর ভঙ্গী! মন তাহাতে পাগল হইয়া যায়! আমারও গেল। কহিলাম,—মাটী কাঠ নয়···

—তবে? অপাঙ্গ দৃষ্টিতে হাসির আভাস!

কহিলাম,—ফুল!

বেঁকি চুপ করিল। চকিতে গম্ভীর!

আমি কহিলাম,—লাগবে না! এসো পরিয়ে দি···

বেঁকি আসিল। এবারে ঠিক পরাইয়া দিলাম। দিয়া কহিলাম,—বেশ দেখাচ্ছে।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বেঁকি আমার পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে প্রাণে সাহস আসিল। শক্তি পাইলাম।

কহিলাম,—এইটে লিখে এনেচি। নাও···

বেঁকি লইল, লইয়া দাঁড়াইল না; চলিয়া গেল।

কবিতার ছত্র। লিখিয়াছিলাম,—

আজকে তোমার জন্মদিনে
কত কি সব দিচ্ছে কিনে,
আমি গরীব—আমি কি আর পাবো?

সে দিন আর বেঁকির দেখা মিলিল না···

মিলিল পরের দিন।

সে চাপল্য নাই। অবিচল ভঙ্গী। চোখের দৃষ্টি অনিমেষ। তবে বড় সতর্ক! বুঝিলাম, যে-ঢেউ আমার বুকে উঠিয়াছে, তার হিল্লোল লাগিয়াছে বেঁকির বুকে!···আর একটা বৎসর আসিয়া তাকে অভিনন্দন করিয়াছে। যৌবনের পুষ্পদ্বারে···

কবিতা লিখিয়া আনিয়াছিলাম,···ডাকিলাম, —মনোরমা···

বেঁকি বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

বুঝিলাম, নাম ধরিয়া আহ্বানের জন্য! কহিলাম,

—এখন তুমি ডাগর হয়েচো। 'বেঁকি' নাম আর সাজবে না! তোমার অঙ্গে অঙ্গে এখন ফাগুনের সুষমা।

বেঁকি নীরব। আমি কহিলাম—কবিতাটা শুনবে?

বেঁকি জবাব দিল না। আমি পড়িলাম—

কাল ছিলে বালিকাটি।
নৃত্যে ছন্দে যেন নির্ঝরিণী!
আজিকে যৌবন-বান
অন্তরে আবেগময়ী প্রেম-মন্দাকিনী!

বেঁকি দাঁড়াইল না, পলাইল।...

আমার দশা...?

তার পরিচয় জাগিতে লাগিল—কবিতার পাতায়!...

সেকস্‌পীয়র, পিট, মেকলে অবহেলায় পড়িয়া রহিলেন শেল্‌ফে।

প্রেমে যদি পড়িতে হয় তো সে এই বয়সের কিশোরীর সহিত! মন যার পাকে নাই! কতকগুলা কবিতা বই পড়িয়া মনকে যে অহঙ্কারে মাতায় নাই! এমন ক্রীড়াময়ী—অথচ লীলার যার অন্ত নাই।

বেঁকির সঙ্গে নিত্য দেখা হইতে লাগিল। তাকে ও বিশুকে গল্প বলি। তার মধ্যে বিশুকে বলি,—তোমার জন্য লজেঞ্জেস আনিয়াছি। বিশু লাফাইয়া ছুটিয়া আমার ওখানে যায়। আমি বেঁকিকে কবিতা পড়িয়া শুনাই। বেঁকি স্থির হইয়া শোনে—কোনো কথা কয় না।

সে-দিন আকাশে-বাতাসে বসন্তের পূর্ণ মাধুরী জাগিয়াছে। আমার প্রাণে বসন্ত সাড়া তুলিয়াছে।... সঙ্গে সঙ্গে কি অধীরতা।......

বেঁকি একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়াছিল...

ডাকিলাম—বেঁকি... ..

বেঁকি বলিল,—মাসিমার বাড়ী নেমন্তন্ন যাচ্ছি ....

কহিলাম,—একটা কবিতা এনেচি। শোনো ..

বেঁকি না বা হাঁ কোনো কথা কহিল না। তার এ মৌনতার অর্থ আমি বুঝিয়াছি। দু'বৎসর ধরিয়া কবিতা লিখিয়া নারী-চিত্তের পরিচয় যদি না পাই তো মিথ্যা কবিতা লেখা!

কবিতা পড়িলাম। লিখিয়াছিলাম,

এ বসন্তে দুরন্ত এ-মন—
শান্ত তারে পারি না করিতে!
আসি যাই—আসি যে আবার,
ওগো লহো মনের তরীতে!
হে আমার প্রিয়তমা মনোরমা প্রিয়া
মনেরে করাও স্নান প্রেম-সুধা দিয়া!

বেঁকির চোখের দৃষ্টি স্থির...আমি চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, ও চোখে যেন মিষ্ট মধুর ইঙ্গিত!

আমার মাথায় কি যে হইল... শুধু ছন্দ আর ছন্দ। ভাবিলাম Now or Never।

বেঁকির দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া গদগদ-কণ্ঠে ডাকিলাম,—বেঁকি...

বেঁকি কথা কহিল না; নিস্পন্দ... যেন পাথরের পুতুল! সে মৌনতা আমাকে পাগল করিয়া তুলিল।

আমি কহিলাম,—আমি তোমায় ভালোবাসি... ভালোবাসি তোমার ঐ অধরের প্রেমসুধা...ঠোঁট নয়—দুটি যেন রাঙা গোলাপ!

বেঁকিকে বুকে টানিলাম। সহসা হাতে বিছার দংশন!

বেঁকি ঠিকরিয়া উঠিয়া সরিয়া গেল...। হাতের পানে চাহিয়া দেখি, হাতে রক্ত ঝরিতেছে...বেঁকি সজোরে একটা পিন আমার হাতে ফুটাইয়া দিয়াছে...

করুণ নয়নে তার পানে চাহিলাম।

বেঁকি কহিল—গোলাপে কাঁটা থাকে!

হাসিয়া বেঁকি চলিয়া গেল।

আমাকে আসিতে হইল। অমন শান্ত মেয়ে...এমন-ভাবে প্রেমের অপমান করে! মনে ধিক্কার জন্মিল।

দুঃখ হইল। দুঃখ নিজের জন্য তত নয়, যত এই বাঙলা-দেশের জন্য। অভাগা দেশ!

আবার বুঝিলাম, ভগবান আছেন!

নহিলে এমনভাবে চেতনার সঞ্চার হয়। বাড়ী গিয়া মেকলে সেক্সপীয়র খুলিয়া বসিলাম। তাঁরা অভিমানে এমন বাঁকিয়া আছেন, মনে প্রবেশ করিতে চাহেন না।...

আর তিন দিন পরে এগ্‌জামিন...

অসম্ভব! ছাদে উঠিলাম। বেঁকিদের বাড়ীর দিকে চাহিলাম...একখানা থার্ড ক্লাশ গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। বেঁকিরা সদলে গাড়ীতে উঠিতেছে...

সোমবারে এগ্‌জামিন। রবিবার সকালে পাড়ায় হঠাৎ শঙ্খধ্বনি! মা আসিয়া খড়খাড়র ধারে দাঁড়াইলেন, কহিলেন,—রামহরি বাবুর মেয়ের পাকা দেখা আজই তা'হলে!

একটা নিশ্বাস পড়িল। ভাবিলাম, সেই বেঁকি! একটা উকিল! নয় ডাক্তার! নয় ডেপুটি! নয় কেরাণী! এমনি কোনো লোকের হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয় মিশিয়া এক হইবে!

হোক! বেঁকি মানুষ নয়! মানুষ চিনে না! ডেপুটি-উকিলের দল পাশ করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যত্ব 'পাশে' নয়, কবিত্বে!

যাক্‌। বাঁচিয়া গিয়াছি! আমার চিত্ত...তা বুঝি বার শক্তি বেঁকির নাই! থাকিলে...

ভগবান আছেন! সত্যই আছেন।

হাতের পাঁচ

[কৌতুক-নাট্য]

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত;

প্রথম-অভিনয়-রজনী, শনিবার, ১৬ই পৌষ, ১৩২২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রহসন-কার

সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও সংস্কারক, রস-সাহিত্য রথী

৺দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

গ্রন্থকারের শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ উৎসর্গিত হইল।

পূর্ব্বকথা

এই ক্ষুদ্র
গ্রন্থখানি সম্বন্ধে
আমার একটি ক্ষুদ্র নিবেদন
আছে। প্রহসন বা কৌতুক-নাট্য
বলিলেই এ দেশের পাঠক ও সমালোচকগণের
মধ্যে কেহ কেহ লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি মৃদু ইঙ্গিত
করিয়া থাকেন। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের ব্যঙ্গটুকুর মধ্য হইতে কেহ যদি
কোনরূপ উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহেন, তাহা হইলে লেখকের
প্রতি তিনি অবিচার করিবেন। কারণ, এ গ্রন্থ লিখিবার সময় আমার মাথায়
কোনরূপ সুগভীর উদ্দেশ্য ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকগণের অল্পাধিক স্বাধীন
বিচরণের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাই বর্ত্তমান বঙ্গীয় প্রহসনাদির চরম লক্ষ্য। অথচ সে দিক্
হইতে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন প্রহসন বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে
বলিয়া, কৈ, আমার তো জানা নাই। এ গ্রন্থে ব্যাপারটার অপর দিক
দেখাইবারই আমি প্রয়াস পাইয়াছি। সামান্য কৌতুক-রস অব-
তারণা করাই—অবশ্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী—
আমার অভিপ্রায়। সেই জন্য বক্তব্য, এ
ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে কেহ অপর কোন-
রূপ মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত জড়িত
না করিলেই আমি
কৃতার্থ হইব।
ইতি

ভবানীপুর
২৩ পৌষ, ১৩২২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হাতের পাঁচ

চরিত্র

পুরুষ

অনিল মিত্র ... ... ধনাঢ্য শিক্ষিত যুবক

প্রকাশ দত্ত ... ... ঐ বন্ধু

সতীশ সেন ... ... বিলাত-প্রত্যাগত নব্য ব্যারিষ্টার

নীলমণি ... ... সতীশের খানশামা

পুরোহিত, ভৃত্য প্রভৃতি

নারী

মাধুরী }
স্নেহ } পিতৃমাতৃহীনা ধনাঢ্য-দুহিতৃদ্বয়

পিশিমা ... ... মাধুরীর সম্পর্কীয়া

মালতী ... ... ঐ দাসী

কাল—আধুনিক ; সংযোগ-স্থল—কলিকাতা।

প্রস্তাবনা

কোরাস।

তোমাদের ঐটি বিষম ভয় (ওগো)।
আমাদের শিখিয়ে পড়া,
তোমদের রান্নাঘরে ঢুকতে পাছে হয়।
ভাবো কমল-করে ধরলে কলম, ধরবো বেড়ি কি ?
লিখবো শুধুই কাব্য, করবো হা-হা-হক্কোহস্মি !
তা যে ঠিক নয়, ওগো ঠিক নয়, বঁধু ঠিক নয় !
তোমরা দুলিয়ে কোঁচা, বাগিয়ে টেরি, সেজে বিষম বাবু,
সেলাম দিতে গোলামিতে কভু কি হও কাবু ?
বলি ওগো, বলি ওগো, বলি ওগো মহাশয় !
আমাদেরো তেনো তেমন, মেসার্স প্রাণপতি,
সেলাম দিতে হবেই ও-পায়, নারীর যে তাই গতি,—
(কারণ) চাকরি করা হয়রাণী সে,—নারীর তা কি সয় !

প্রথম দৃশ্য

সজ্জিত কক্ষ ; পশ্চাতে তালাবদ্ধ অপর কক্ষ
মাধুরী ও প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। চাবি আমি খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আমার এক কথা, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি পছন্দ করি না। (পিছনের ঘরের চাবি খুলিয়া) নিন্। আমি আবার আসচি এখনি।

(প্রস্থান)

মাধুরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নেহর হাত ধরিয়া বাহিরে আনিল। স্নেহ নতমুখী ; তাহার মুখ দেখিলেই মনে হয়, এতক্ষণ সে ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল।

মাধুরী। স্নেহ—

স্নেহ। (মাধুরীর বুকে মুখ রাখিয়া) দিদি—

মাধুরী। আমি এ ব্যাপার জানতুম না, স্নেহ। রমেন বাবুদের জন্য খাবার তৈরি করছিলুম। তাঁরা খেতে গেলেন, কিন্তু তোকে দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, বুঝি উপরে কি করচিস। তার পর তাঁরা চলে গেলে উপরে তোকে খুঁজে পেলুম না—শেষ মালতী আমায় সব বললে। তখন আমি প্রকাশবাবুকে ধরে ঘর খোলালুম। কিন্তু এ কাণ্ড ঘটালো কেন ?

স্নেহ। রমেনবাবুর ভাই মাসিক পত্রে লেখেন না ? তা তাঁর সঙ্গে আজকালকার মাসিক-পত্র সম্বন্ধে দুটো কথা হচ্ছিল। রমেন বাবুর স্ত্রী তাতে ঠাট্টা-তামাসা করে যোগ দিচ্ছিলেন। প্রকাশ বাবু তিন চার বার ঘরটার সামনে দিয়ে আনাগোনা করলেন —তার পর মালতীকে দিয়ে আমায় ডাকিয়ে বললেন, এই ঘর থেকে রূপোর ডিপেটা বার করে দিতে। যেমন আমি বার করতে ঘরে ঢুকেচি, বাইরে থেকে অমনি উনি দোরে তালা এঁটে দিলেন।

মাধুরী। কি ভয়ানক লোক ! এমন লোককে আর বাড়ী ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়। আজই আমি এর বিহিত করবো,—একবার আসুন প্রকাশবাবু— এত বড় ওঁর আস্পর্দ্ধা ! এ রকম অপমান করবার ওঁর কি অধিকার আছে ?

স্নেহ। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে দিদি—

মাধুরী। ওঃ, কিসের ভয়? তবু যদি উনি স্বামী হতেন!

স্নেহ। কিন্তু—

মাধুরী। কিন্তু কি? প্রকাশ বাবুর সঙ্গে কখনই তোর বিয়ে হতে দেবো না।

স্নেহ। দলিলে আছে—

মাধুরী। দলিলে আছে, এঁরা দুজনে বিষয়ের ট্রাষ্টি, আর দুজনে আমাদের দুই বোনের অভিভাবক। আমাদের বিয়ের পাত্র ওঁরা পছন্দ করে দেবেন, নিজেরা ইচ্ছা হলে বিয়ে করতেও পারেন। কিন্তু তাই বলে তোর যদি ওঁকে বিয়ে করতে আপত্তি থাকে, তবু ওঁকেই বিয়ে করতে হবে, এমন আইন হতে পারে না।

স্নেহ। আমার অংশের সমস্ত টাকা তাহলে প্রকাশ বাবু—

মাধুরী। হাঁ, দলিলে আছে, প্রকাশ বাবুর অমনোনীত পাত্রে যদি তুমি বিবাহ করো, তাহলে তোমার অংশের টাকা বা বিষয়ে তোমার বা তোমার সেই স্বামীর কোন অধিকার থাকবে না। প্রকাশ বাবু সে-সব আপনার ইচ্ছামত কোন সদনুষ্ঠানে দান করতে পারবেন।

স্নেহ। তবে?

মাধুরী। তবে কি। অনিলবাবু সে-সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। একজন বড় ব্যারিষ্টার বলেছেন, প্রকাশ বাবু জোর করে বিয়ে করতে পারেন না।

স্নেহ। প্রকাশ বাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বাঁচবো না। দেখচো তো দিদি, এখনই কেমন ব্যবহার!

মাধুরী। তুই নেহাৎ ভালোমানুষ বলেই না আস্কারা বেড়ে যাচ্ছে! আমি হলে দু'দশ কথা শুনিয়ে দিতুম।

স্নেহ। একটু ছাদে ওঠবার জো নেই, জানলার ধারে দাঁড়াবার জো নেই, দু'খানা ভাল বই পড়তে পাবো না। পাগল হয়ে যাবার জো! আচ্ছা, সত্যি কি দিদি, লোকে আগে এই রকম ছিল?

মাধুরী। তা ঠিক বলতে পারি না। তবে পুরুষমানুষদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল, এখনও আছে, যাদের বিশ্বাস, মেয়েরা যদি একটু স্বাধীনতা পায়, তা হলেই তারা নষ্ট হয়ে যাবে।

স্নেহ। ছি, ছি, কি নীচ মন!

মাধুরী। মেয়েদের যারা সম্ভ্রমের চোখে না দেখে, এই রকম অসম্মান করতে পারে, তারা পশু!

স্নেহ। অনিলবাবু কিন্তু বেশ লোক, দিদি। আচ্ছা, অনিলবাবু তোমায় বিয়ে করবেন কি না, সে কথা স্পষ্ট করে বলেচেন?

মাধুরী। না।

স্নেহ। তাঁকে বিয়ে করতে তোমার মত আছে?

মাধুরী। আমার মতে কি এসে যায়, স্নেহ? ও কথা থাক্। তুই একটা গান গা।

স্নেহ। প্রকাশ বাবু এসে পড়লে বাক্যজ্বালার আর অন্ত থাকবে না।

মাধুরী। ওঃ, তবে তো মাথা একেবারে কাটা যাবে! দ্যাখ্, যথার্থ আমার দুঃখ হয়। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কতকগুলো বক-ধার্ম্মিকের সঙ্গে মিশে প্রকাশ বাবু আশ্চর্য্য বদলে গেছেন। এমন হবেন জানলে বাবা কখনও তাঁকে ট্রাষ্টি করতেন না। কি ভাবচিস, স্নেহ? গা—

স্নেহ। গীত

ছেলেবেলার কোমল ধরা কঠিন কেন হয়ে আসে?
কোথায় আজি রঙিন আলো? লুকালো সে কোন্ আকাশে?
মেঘে কারো পাইনে সাড়া, বাতাস কেন পরশ-হারা?
কালো আঁখির করুণ চাওয়া প্রাড়ে আছে কাহার আশে?
কোথায় সেই নিমেষ হারা আঁধার-রাতের পুষ্প-তারা?
আমার চোখে সকল আলো আজ কেন হায় নিবে আসে?
ফুলের মুখে, পাখীর স্বরে, যে স্বর ছিল যায় সে ঝরে!
কোথায় মোরে নিয়ে এলো বেঁধে কি এ কঠিন ফাঁশে!

অনিল ও যতীশের প্রবেশ

অনিল। মাধুরী, ইনি আমার বন্ধু যতীশচন্দ্র সেন এস্কোয়ার, বার-এ্যাট্-ল, যাঁর কথা সেদিন বলেছিলুম।

যতীশ। (অভিবাদনান্তে) আবার এস্কোয়ার কেন? হ্যাট্ নেই, কোট নেই, ধুতি পরা, জামা গায়—

মাধুরী ও স্নেহ। (প্রত্যভিবাদন)

অনিল। এঁর সঙ্গেও দলিলের কথা হলো। ইনিও ঐ কথা বলেন, বিবাহের উপর হস্তক্ষেপ করতে প্রকাশের বা আমার কোন অধিকার নেই। আইন তা গ্রাহ্য করবে না।

যতীশ। আসবার সময় সুন্দর গান শুনলুম,—কে গাইলেন?

মাধুরী। স্নেহ গাইছিল। ওর গলাটি বেশ—অন্ততঃ আমার মনে হয়।

যতীশ। কেন, আমারও বেশ মনে হলো।

মাধুরী। সে ওর সৌভাগ্য! স্নেহ, মিষ্টার সেনকে ধন্যবাদ দিলি নে?

স্নেহ। আঃ, যাও দিদি (লজ্জাবনতমুখী হইল)।

যতীশ। দেখুন, আপনারা যদি নিরীহ যতীশকে মিষ্টার সেন বলেন, তাহলে আমার আর লজ্জা রাখবার স্থান থাকবে না।

মাধুরী। মাপ করবেন, যতীশবাবু। আপনি যে

একঘরে, তা জানতুম না! যাঁদের সাতপুরুষে কেউ কখনো বোম্বাই কোন্ দিকে, তা জানেন না, বিলেত তো বহুদূর, তাঁরাও যে মিষ্টার নামের জন্ম লালায়িত, সেই মিষ্টারকে টাটকা বিলেত থেকে ফিরে আপনি বয়কট করেছেন, পরিচয় না পেলে এটা কেমন করে জানবো, বলুন?

যতীশ। হাঃ হাঃ, আপনি দেখছি, একজন wit.

মাধুরী। এটা fact—আমার এতে wit নেই।

যতীশ। আপনি বোধ হয় বেথুনে পড়েছিলেন?

মাধুরী। না। বাবার কাছে ঘরেই যা একটু-আধটু শিখেছিলুম। তার পর অনিলবাবু যথেষ্ট চেষ্টা-পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু জানেন তো, একটা কথা আছে, মোল্লার দৌড় মস্জিদ অবধি!

অনিল। ওহে যতীশ, তুমি যদি একজন মহিলার সম্মানের দিকেই অতিরিক্ত ঝোঁক দাও, তাহলে অপর জন ক্ষুণ্ণ হতে পারেন··

যতীশ। ওহো, মাপ করবেন, মিস্ বোস্।

মাধুরী। মিষ্টার কাটলেন যদি তো আবার মিস্ কেন?

যতীশ। ওঁর নাম,—এঁর নাম—

মাধুরী। ওঁর নাম ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন? ও ত বোবা নয়, বেশ accomplished.

যতীশ। আ-আ-আপনার নাম?

মাধুরী। বল্ না!

স্নেহ। শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী।

যতীশ। (স্বগত) Ah how fine!

অনিল। তাহলে আর তোমায় আটকে রাখবো না যতীশ, কোথায় তোমার পার্টি আছে, বলছিলে!

যতীশ। ওহো, থ্যাঙ্ক্স্। ভুলে গেছলুম। তাহলে আজ আসি, কিছু মনে করবেন না। আ-আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে হচ্ছে।

মাধুরী। আবার আসবেন।

যতীশ। নিশ্চয়!

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। ইনি এসেছিলেন কে?

অনিল। আমাদেরই এক বন্ধু, সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছেন···

প্রকাশ। তুমিও কি এঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে না কি, স্নেহ?

অনিল। শুধু ওঁর সঙ্গে কেন, মাধুরীর সঙ্গেও ওঁর বেশ আলাপ হলো।

প্রকাশ। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই—তবে অপর পুরুষমানুষের সঙ্গে স্নেহর এমনভাবে আলাপ-পরিচয় করা আমার পছন্দ নয়।

মাধুরী। তাতে অপরাধ?

প্রকাশ। আমার পছন্দ নয়। বাঙালীর ঘরের মেয়ের ব্যবহার বাঙালীর ঘরের মতই হবে।

মাধুরী। তার অর্থ?

প্রকাশ। তার আবার অর্থ কি! দোষের বলে আমি সেটা মনে করি। স্নেহ নেহাৎ ছেলেমানুষ নয় যে···

মাধুরী। দোষ! প্রকাশ বাবু, আপনি অন্যায় কথা বলচেন। স্নেহ ছেলেমানুষ নয়, সেজন্ম এ কথা আরও দোষের। স্নেহ আমার বোন, আপনি কি বলতে চান···

প্রকাশ। আমি বলতে চাই, আপনার চালচলন আমার কাছে বড় ভাল মনে হয় না।

মাধুরী। সাবধান হয়ে কথা বলবেন, প্রকাশ বাবু। বাবা আপনাকে স্নেহ করতেন বলে আপনার এই সব কথাবার্ত্তা শুনেও শুনতুম না—কিন্তু আর এমন কথা বরদাস্ত করবো না। আপনি মহিলার সম্মান বুঝে চলবেন।

প্রকাশ। আপনাকে কোন কথা বলছি না! স্নেহকে বলবার আমার অধিকার আছে। সে আমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী; নিজের স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছামত লোকে দেখতে চায়, তাকে মহিলার অনুচিত ব্যবহার করতে··

মাধুরী। প্রকাশ বাবু···

প্রকাশ। আপনি চোখ রাঙাচ্ছেন! জানেন, স্নেহের উপর আমার অধিকার আছে?

মাধুরী। অধিকার! কিসের অধিকার? কোনো অধিকার নেই! কে আপনি? আপনি বাইরের লোক, টুষ্টি আছেন, সেইভাবে চলবেন। আমাদের শিক্ষা, আমাদের চালচলন, সে সবের উপর ইঙ্গিত করা ভদ্রতা নয়।

স্নেহ। দিদি—(হাত চাপিয়া ধরিল)

মাধুরী। চুপ কর্, স্নেহ। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যার মন এমন ইতর, মানুষ বলে সে আপনার পরিচয় দেয়!

অনিল। মাধুরী, চুপ করো—আমার অনুরোধ!

প্রকাশ। অনিল, তুমি ভাগ্যবান! এমন তেজস্বিনী স্ত্রী পাবে, বক্তৃতা-মঞ্চ উজ্জ্বল হবে!

অনিল। আমিও বলছি, প্রকাশ, তুমি মহিলার মর্য্যাদা রেখে কথা বলো।

প্রকাশ। বেশ,—কথা আমি বেশী বাড়াতে চাইনে। আমার কথা হচ্ছে—বিবাহে আর বিলম্ব করা হবে

না! বড় বোনের বিয়ে না হলে যখন ছোটর হতে পারে না, তখন শীঘ্রই বিবাহের দিন স্থির করো। ২৭শে শ্রাবণ বিয়ের শেষ দিন— সেই দিনের মধ্যে আমি স্নেহকে বিবাহ করবো, সঙ্কল্প করেচি। আমার স্ত্রী হলে স্নেহকে নিজের মতে চালাতে গেলে কারো বাক্যবাণ বোধ হয় সহ্য করতে হবে না। আমি বলে গেলুম, ২৭শে শ্রাবণ, স্নেহর বিবাহ আমার সঙ্গে। এর নড়চড় হবে না, জেনো। আর স্নেহ, যে-স্ত্রীলোক স্বামীর অনভিমতে অপর পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, বিগ্‌ড়ে যেতে তার বড় বেশী দেরী হয় না! বুঝে চলবে। এ সব হিন্দু নারীর আদর্শ নয়।

(প্রস্থান)

মাধুরী। ওঃ, এই পাষণ্ড বর্ব্বরের সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হবে? কখনো না!

স্নেহ। (মাধুরীকে জড়াইয়া) দিদি…

মাধুরী। কাঁদিসনে স্নেহ। এ বিয়ে কখনই হবে না।

অনিল। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েচো, মাধুরী! এতে বাস্তবিক রাগও হয়।

মাধুরী। আপনি এ বিপদে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের ভরসা।

অনিল। মাধুরী, সত্যই আমি স্বার্থপর। কিন্তু না, আর নয়,—একটা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে সত্যই অপরাধ করেচি।

মাধুরী। অপরাধ! আপনি?

অনিল। হাঁ। তোমার জন্য পাত্র-অন্বেষণে আমার ত্রুটি…

মাধুরী। অনিলবাবু (লজ্জানতমুখী)

অনিল। মাধুরী…

স্নেহ। মালতী ডাকচে। (প্রস্থান)

অনিল। মাধুরী, আমি কিছুতে আমার মনকে বোঝাতে পারিনি। নিজের মনের সঙ্গে বিস্তর তর্ক করেছি, যুদ্ধ করেছি, তবু…

মাধুরী। (লজ্জিতভাবে) আমি যদি এতই আপনার ভার হয়ে থাকি…

অনিল। না, আজ থেকে তোমার সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎ করবো না। পাত্র-অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করবো। না হলে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার কাছে কি জবাব দেবো?

মাধুরী। (নতজানু) আপনার পায়ে পড়ি…

অনিল। এ কি মাধুরী! ওঠো…ছি!

মাধুরী। আপনাকে না দেখতে পেলে আমি থাকতে পারবো না। (দ্রুত প্রস্থান)

অনিল। মাধুরী তাহলে আমায় ভালোবাসে! মাধুরী যদি আমার স্ত্রী হয়! তা কি হবে?

স্নেহর পুনঃপ্রবেশ

স্নেহ। অনিলবাবু, দিদিকে বিয়ে করতে আপনার কোন আপত্তি আছে?

অনিল। আপত্তি! ও রত্নের যে অধিকারী হবে, স্নেহ, সে ভাগ্যবান্! মাধুরী কি…

স্নেহ। দিদি আপনাকে ভালোবাসে। আমি তা বেশ বুঝতে পেরেচি।

মাধুরীর পুনঃপ্রবেশ

মাধুরী। একটা কথা শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলুম! যতীশ বাবুর সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হতে পারে না?

অনিল। আমারও সেই কথা মনে হচ্ছিল।

মাধুরী। একবার সন্ধান নিয়ে দেখলে হয় না?

অনিল। আমিও তাই ভাবছিলুম। যতীশকে তুমি চিনতে পারলে না, মাধুরী? মহেশ সেন উকিল ছিলেন— তাঁর ছেলে। তোমার বাবার সঙ্গে মহেশবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

মাধুরী। মহেশবাবুর ছেলে! চোখে চশমা আছে বলে বুঝতে পারিনি। ছেলেবেলা ওঁদের বাড়ী বাবার সঙ্গে কতবার গেছি। উনি খুব টেনিস খেলতেন। তোর মনে পড়ে না স্নেহ? সেই যে শ্যামবাজারে প্রকাণ্ড গেট-ওলা বাড়ী—ঢুকতেই টেনিস কোর্ট; তার পাশে জালের বেড়ার মধ্যে হরিণ ছাড়া থাকতো।

স্নেহ। কে জানে? আমি আসচি। (প্রস্থান)

মাধুরী। প্রকাশ বাবুর সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হতেই পারে না।

অনিল। আমারও সেই মত।

মাধুরী। তা হলে দলিলটার সম্বন্ধে পরামর্শ?

অনিল। শীঘ্রই স্থির করে ফেলছি।…মাধুরী…

মাধুরী। কি বলচেন?

অনিল। তা হলে মনে আমি নিতান্তই দুরাশা পোষণ করি নি? (হস্ত ধরিয়া) বলো…

মাধুরী। (লজ্জানতভাবে কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া প্রস্থান করিল)

অনিল। ধন্য আমার জীবন! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রঙ্গপট

গীত

পুরুষ। এই আমরা—এই আমরা—
হুঁ হু—আছি বলে তাই তোমরা আছো,
না হলে কোথায় থাকতে!

নারী। ওগো, আমরা—এই আমরা
রেঁধে ঢেকে সব চালাই,—তাই!
নয় 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাকতে।

পুরুষ। আমরা পুরুষ কাছা-কোঁচা আঁটি,
রোজগার করি অর্থ!

নারী। খাইয়ে সাজিয়ে আপিসে পাঠাই,
নয়, সবই হতো ব্যর্থ!
নটায় ভাতটি ধরে না দিলে সে
চাকরি কি করে রাখতে?

পুরুষ। পথে ঘাটে তোফা বেড়িয়ে বেড়াই—
জানিনে ভয়—সে কি!

নারী। গোরা জুজু যদি দেখা দেয় পথে—
ওরে বাবা—ছি ছি ছি!
পেগের বড়াই,—মোরা আছি, তাই।
না হলে কি দিয়ে ঢাকতে!

পুরুষ। মোরা বক্তৃতা করি, দেশে দেশে ফিরি—
চড়ি যে মোটর গাড়ী!

নারী। এত বড় বীর। বলো নাকো আর,
ভয়ে ছিঁড়ে যাবে নাড়ী।
বচনে ভরা ও মুখগুলি। নয়, কত কালি-ঝুলি মাখতে!
(জায়গা যে নাই—ওগো, কত কালি-ঝুলি মাখতে!)

পুরুষ। আমরা যোগাই অন্ন-বস্ত্র—
তাই তো বাঁচিয়া আছো।

নারী। সাধে কি যোগাও? মারণ-অস্ত্র—
ছাড়ি যদি—কিসে বাঁচো?
এই পায়ের গোলাম হয়ে আছো, বঁধু,
ঐ প্রাণগুলি রাখতে।

তৃতীয় দৃশ্য

মাধুরীর বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা

মালতীর প্রবেশ

মালতী। এর জন্য আবার আইন আদালত! উকিল মোক্তার ডাকা! ঐ প্রকাশবাবুটাকে দেখলে আমারও কেমন গা জ্বালা করে! বাবা, ছোট্দিদিমণির ধন্যি সহ্যি। তবু ও কোথাকার কে? সোয়ামী হলে হতে পারে। আরে, সে তো দেশের লোক, মরুকগে, এই স্বজেতের মধ্যে সকলেই সোয়ামী হলে হতে পারে। তবেই আর কি—এই দেশের লোকের দাপট সয়ে থাকি! ইঃ, বাবু যেন পুলিশের দারোগা। জানলার ধারে যেয়ো না, তো যাবো না—ভালো কাপড়-জামা পরো না, তো পরব না! জোর জাখ না! হতুম আমি—ঐ বোঁচা নাকে ঝামা ঘসে দিতুম। দলিলের টাট্টু হয়েছেন! ওঃ, টাট্টু হয়ে আর কিছু হোক্ না হোক্, চাট ছোড়াটুকু খুব চলেছে।
(প্রস্থান)

যতীশ ও নীলমণির প্রবেশ

নীলমণি। এেই বাড়ী তো দাদাবাবু? আর বুঝুতে হবেক লা, আমি অ ঠিক ধরেছি। তা আমি ঘটক স্যাঙ্গে একবার ঘটকালী করছি, ছাখে লিয়ো।

যতীশ। আমি অনিলের ওখানে যাচ্ছি। তুই এখানে থাকিস্—যদি অনিলবাবু এখানে আসে তো অপেক্ষা করতে বলিস্—আমি আসচি। (স্বগত) স্নেহ—an angel!

(প্রস্থান)

নীলমণি। হাঃ, এ ঘটকালী যদি লা পারি তো আমার লামই লীলমণি লয়। (দ্বার-সম্মুখে বসিল) এই যে কে এ্যাটা আসে লা?

মালতীর প্রবেশ

মালতী। (স্বগত) মিন্সেটা দরজার সামনে এসে বসলো, কে ও? প্রকাশ বাবু শেষে চর পাঠালো না কি? (প্রকাশ্যে) কে গা তুমি?

নীলমণি। (এক-মুখ হাসিয়া) মুই লীলমণি।

মালতী। লীলমণি, তা এখানে কেন?

নীলমণি। এ্যাটা কাজে—মুই বস্তে আছি। তুমি বসবে তো বস না, দুটো-এ্যাটা মলের কথা কই!

মালতী। আ মর্, মিন্সে, মনের কথা কইবার আর লোক পাইনি। না? তোর সঙ্গে কইতে যাবো কেন?

নীলমণি। ক্যান্, দষ কি? তুমি কে?

মালতী। আমি যেই হই না কেন, তোর কি রে মিন্সে?

নীলমণি। আহা, রাগ কর কেল, ভাই?

মালতী। ইস, রস ধরে না যে!

নীলমণি। তা রসিকতা মুই এ্যাট্টু-আধটু জালি। সাত বছর মুই রসগল্লার দকানে কাম করেছি কি লা! তা তমার লাম কি?

মালতী। আমার লাম যাই হোক্ না কেন—তুই কে আগে বল্, না হলে বুঝলি! (ইঙ্গিতে ঝাঁটা বুঝাইল)

নীলমণি। অ বাবা! মর লাম লীলমণি। দাদাবাবুর খালসামা আমি—

মালতী। আর মর্, তোর দাদাবাবু কে?

নীলমণি। মর দাদাবাবু হেইগে মহেশবাবুর পুত্তুর—যতীশবাবু বেলাত থেকে বেলেস্তারা হয়ে এ্যাসেছে।

মালতী। বেলেস্তারা?

নীলমণি। হ্যাঁ, বেলেস্তারা। সে তমার গে উকিল মক্তারের উপর !

মালতী। ও হো হো—বুঝেছি, যতীশবাবু ! দিদিমণি যাঁর কথা বলছিলেন। তা এখানে কি চাই ?

নীলমণি। দাদাবাবু ত বিয়্যা করতে চায় না। হেত ম্যায়ে, হেত ম্যায়ে—স্যা ত ম্যায়ে লয়, যেন এ্যাট্টা-এ্যাট্টা গলাপফুল ! কত সাধাসাধি, পেড়াপেড়ি। মা-ঠাকরুণ এত কাঁদে কাটে, তবু না ! তা দাদা-বাবু বললে, জ্ঞানবাবুর ছোট ম্যায়েটিকে দ্যাখে ভারী পছন্দ হইছে, তাকে বিয়্যা করবে। তাই মরে বলে গেল, তুই বস্, যদি অনিলবাবু আসে, বলিস্, মুই আসছি। তাই মুই বস্যে আছি ! শুনলে তো ভাই ?

মালতী। ও ! (অঞ্চল হইতে একটি পাণ লইয়া খাইল ও দোক্তা মুখে দিল)

নীলমণি। আমায় এ্যাট্টা পাণ দাও না।

মালতী। মিন্সে ভারী ওস্তাদ, দেখছি। গায়ে পড়ে ভাব করে।

নীলমণি। তমার গড়ে পড়ি, এ্যাট্টা পাণ দাও না—দহাই তমার ! (অঞ্চল ধরিল)

মালতী। ছাড়্ ! ভালো গেরো ! এই নে ! (একটি পাণ দিল)

নীলমণি। (পাণ মুখে দিয়া) এ্যাট্টু দক্তা, ভাই !

মালতী। আবার দক্ষিণে চাই। (দোক্তা প্রদান)

নীলমণি। (দোক্তা মুখে দিয়া) তুমি বড় ভাল, ভাই। তা তোমার নামটি ?

মালতী। (স্বগতঃ) বেশ হয়েছে। যা চাই, তাই সামনে ! এ লোকটাকে হাত করে যতীশ বাবুকে দেখতে হবে ! কাজ ভারী সোজা হয়ে গেল ! আর বুঝবোই বা কি ! নিজে যখন নিজের বিয়ের ঘট-কালী লাগিয়ে দিয়েছে, তখন বোঝাবুঝির আর আছে কি ! বেশ হয়েছে, দিদিমণি চায় ছোট দিদি-মণির সঙ্গে যাতে যতীশ বাবুর বিয়ে হয়। আমি দিদিমণিকে বলবো, এ ঘটকালী আমি করবো, আমার এক ছড়া সোনার হার চাই !

নীলমণি। হ্যাঁ গা, নামটি বললে না ?

মালতী। আমার নাম মালতী।

নীলমণি। মলাতী ! বেশ নামটি ! কি বললে ? মলাতী, মলাতী ! তা মলাতী—

মালতী। তা, কি ?

নীলমণি। তমার কে আছে ?

মালতী। তা বেশ ! আমার সোয়ামী আছে !

নীলমণি। এ্যাঁ, সয়ামী আছে ?

মালতী। হ্যাঁ, তার আবার ভারী রাগী মেজাজ। কারো সঙ্গে, এই কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে, আমায় কথা কইতে দেখলে শুধু যে আমার মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে, তা নয়, সে পুরুষমানুষের শুদ্ধু দফা রফা করে দেবে।

নীলমণি। অ বাবা—কথায় থাকে সে ?

মালতী। কথায় আবার থাকবে। আমায় ছেড়ে আর কোথাও সে থাক্‌তে পারে না, কাজেই এখানে থাকে।

নীলমণি। অ বাবা !

মালতী। না হলে সত্যি বলতে কি, তুমি মানুষটি বেশ ! খাসা যত্ন-আত্তি জানো, আমার ভারী মনের মত !

গীত

ওগো, মনের মানুষ, পুরুষ-রতন !
তুমি আমার নীলমণিটি,—যাদু বাছাধন !

নীলমণি। হাহাহা-হ-হ-হ-হিহিহি,
দফা যে হল রফা, বল তুমি কি।

মালতী। বলবো কি আর ? প্রাণ-মন দিয়ে ফেলেছি—
ও আমার নীলমণিটি, নীলমণিটি,
ট্যাড়স-বদন !

নীলমণি। মুই নীলমণি—মুই নীলমণি।

মালতী। তা হেথা কেন ? যাও গয়লা-বাড়ী,
ফেলো কাড়, পাবে ননী।

নীলমণি। তুমি রাধা,—অগো, তুমি রাধা—

মালতী। লাঠি হাতে আছে পথে, আয়ান ঘোষ দাদা।

নীলমণি। ইস্ ঐ ত ভারী বাধা !

মালতী। তাই বলি হাঁদা, মানে-মানে পথ ত্যাখো এখন !
(মালতীর প্রস্থান)

নীলমণি। নাঃ, এ এ্যাক্কেবারে ম্যারে রেখে গ্যালো ! এ্যার সঙ্গে যদি মোর বিয়্যা হত ! অর সয়ামীটা যদি মরে ত ব্যাশ হয়। অ বিধবা হলি ত্যাখন মুই ওকে বিয়্যা করি !
(দীর্ঘনিশ্বাসান্তে প্রস্থান)

অনিল ও যতীশের প্রবেশ

যতীশ। প্রকাশবাবুর attitude যে রকম শুনচি, তাতে আইন-কানুন করতে গেলে একটা কেলেঙ্কারী রাষ্ট্র করা হবে, আর আমাদের লক্ষ্মীছাড়া বাঙলা খপরের কাগজগুলো অমনি শেয়ালের মত হুক্কা-হুয়া করে উঠবে, নাহলে কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ-বাবুকে ট্রাষ্ট থেকে remove করানো যায়।

অনিল। সেই জন্যেই আমি আর হাইকোর্টের ধারে যাইনি মোটে। আমার এক এটর্নি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম। সে যা এক মতলব দিয়েছে—আঃ, simply funny !

যতীশ। কি মতলব?

অনিল। পথে-ঘাটে সে কথা বলবো না—তবে জানতে পারবে তুমি। তাতে তোমারও সাহায্য দরকার আছে।

যতীশ। তা হলে তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে?

অনিল। ২০শে শ্রাবণ। দ্যাখো, মতলব যা বার করা গেছে, যদি ভেস্তে না যায়—তা হলে রীতিমত একটা নভেলের মত কাণ্ড দাঁড়াবে! ঐ দিনে প্রকাশ জানবে শুধু আমার বিয়ে, কিন্তু আসলে দুজনেই সেদিন ব্যাচিলর নাম ঘুচিয়ে ফেলবো। বুঝলে?

যতীশ। তাহলে ঐ মত নিয়ে পাত্র ঠিক করা! তার কি হবে?

অনিল। ওহে, আইন বাঁচিয়ে, মাথা বাঁচিয়ে, দলিল বাঁচিয়ে, বিষয় বাঁচিয়ে কাম ফতে করবো!

যতীশ। সব শোনবার জন্যে ভারী অস্থির হয়ে উঠছি যে!

অনিল। এসো ভিতরে, সব বলছি।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্নেহর কক্ষ

স্নেহ ও মালতী

মালতী। দিদিমণি যা ফন্দি খাটিয়েছে, সে বেশ হয়েছে। তাতে কিছু দোষ হবে না, ছোটদিদিমণি। দ্যাখো দিকিন্, যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা হয় কি না!

স্নেহ। তিনি যদি কিছু মনে করেন?

মালতী। কিছু মনে করবার অবসর তাঁর কি আছে? ছোট দিদিমণি! যাকে ভূতে পায়, সেও দু দণ্ড ভালো থাকতে পারে, কিন্তু এই ভালোবাসার নেশা ঘাড়ে চাপলে একদণ্ড আর সোয়াস্তি থাকে না। কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না!

স্নেহ। তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেচিস মালতী?

মালতী। সে সব কথা আর কেন? ছোট দিদিমণি!

স্নেহ। না মালতী, লক্ষ্মীটি, বল্।···ও কি ঘাড় নীচু করলি যে!

মালতী। আমরা গরিব ছোটনোকের মেয়ে ছোট-দিদিমণি—নেখাপড়া জানি না, মনের উপর কখনও জোর করতে শিখিনি। যে দিকে মন ছোটে, সেই দিকেই দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছি। তার পর তোমাদের এখানে অকূলে কূল মিলেছে, আপনার জন পেয়েছি। আমার কোথাও কেউ নেই দিদিমণি—আমাকে যেন তাড়িয়ে দিয়ো না!

স্নেহ। কাঁদিসনে মালতী। তোর যদি কষ্ট হয় থাক। বলতে হবে না!

মালতী। না ছোট দিদিমণি, আমি বলছি। আমার যখন বয়স চার বছর, তখন বসন্ত হয়ে বাপ-মা দুই মারা গেল। গাঁয়ের জমিদারের বাড়ী ঠাঁই পেলুম। তাদের ছেলে-মেয়ে নিতুম। তারা দুটি খেতে দিত। তারপর আরো আট-বছর কাটলো—জমিদার-বাড়ীতে সুখেই ছিলুম। বৌয়েরা বড় ভালোবাসতো, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দিদি বলে ডাকতো, আহ্লাদে আমার বুক ভরে উঠতো! তারপর এক নতুন নায়েব এলো, তার বয়স কম। ছেলেদের নিয়ে সকালে বিকেলে আমি বসে থাকতুম, সে এসে পাশে বসে বাপের কথা মার কথা জিজ্ঞাসা করতো; এ কথা সে কথা কয়ে কত আত্তি জানাতো। আমার কেমন তার কথা শুনতেও ভালো লাগতো। শেষে একদিন সে বললে,—তার মাথায় বাজ পড়লো না—সহায়হীন গরিব-দুঃখীর মেয়ে পেয়ে ভদ্দর নোক হয়ে এ পাপ কথা বলতে তার জিভ খশে গেল না? আমি কিছু না বলে উঠে গেলুম।

স্নেহ। আর থাক্ মালতী···

মালতী। না ছোট দিদিমণি, শোনো। এমন কিছুদিন যায়—আমি দেখি, সে শুকনো মুখে বেড়ায়, আমার কাছে আসতে তার সাহস হয় না। আমার প্রাণটা অস্থির হলো। শেষে একদিন নির্জ্জনে পেয়ে সে আমার পায়ে ধরলে, বললে, আমায় বিয়ে করবে; অন্যভাবে পেতে চায় না। যদি আমি রাজী না হই, তা হলে সে বিষ খাবে। শুনে আমার প্রাণটা শিউরে উঠলো! সোয়ামী-স্ত্রী কত সুখে ঘর করে,—রাঙ্গাদিদির বিয়ে হয়েছিল—আমার কাছে তার বরের কত কথা বলতো! শুনে সোয়ামী কেমন, জানবার জন্য আমার প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠতো। কখনো জানিনি, সোয়ামী কি! আমি রাজী হলুম। সে বললে, সেখানে বিয়ে হতে পারে না—অন্য জায়গায় সে চাকরি নেবে, বিয়ে করবে, কিন্তু তাহলে লুকিয়ে তার সঙ্গে চলে যেতে হবে!

স্নেহ। ও-সব কথা আর কেন, মালতী? থাক্!—

মালতী। একদিন শেষ-রাত্রে মনিব-বাড়ী থেকে চোরের মত আমি পালালুম, বুক কেঁপে উঠলো! করচি কি! রেলে চড়ে পরদিন ভোরে পশ্চিমের এক দেশে এলুম। সে বললে, এখানে তার চাকরি মিলবে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমি বললুম, বিয়ে হবে কবে? সে হেসে উঠলো—বললে, বিয়ে!

ঝীকে বিয়ে! আস্পর্দ্ধা কম নয়! আমি কেঁদে ফেললুম, বললুম,—তবে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? সে বললে,—উঃ, তার জিভ খসে গেল না, পুড়ে গেল না? সে বললে, আমার উপর তার নজর পড়েছিল, তাই! দুদিন আমায় নিয়ে খেলা করে ফেলে চলে যাবে! আমি কিছু বললুম না—ভয়ে চুপ করে রইলুম। শেষে যেয়ে যখন সে একটু অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমি ছুটে সে বাড়ী ছেড়ে পালালুম। খানিকটা এসেচি—হঠাৎ কে ধরে ফেল্লে...সেটা পুকুর-ধার। দেখি, সে—জানতে পেরে পেছু নিয়েছে। আমি হাত ছিনিয়ে নিলুম—কোথা থেকে দেহে হাতীর বল এলো। সে পড়ে গেল। গায়ে যত জোর ছিল, তত জোরে তখন তার মুখে লাথি মেরে আবার আমি ছুটলুম! সে কি ছুট। ছুটতে ছুটতে একটা বাড়ীর ধারে এসে পড়লুম—চাঁদের আলোয় সাদা বাড়ী ধব্‌ধব্ করচে। আমি কেঁদে এসে বাবুর পায়ে পড়লুম। মা-ঠাকরুণ ছুটে এলেন—আমার জ্ঞান ছিল না···

স্নেহ। আমাদের বাড়ী, না?

মালতী। হাঁ, বাবু তখন সেখানকার হাকিম। সেই অবধি তোমাদের আশ্রয়ে আছি! তোমার তখন খুব ব্যামো···

স্নেহ। মনে পড়েচে। দিদি এ সব জানে?

মালতী। হ্যাঁ।

স্নেহ। মালতী, আজ থেকে আমি তোকে আরো ভালোবাসবো। এমন তুই! এত দুঃখে এত বিপদেও ধর্ম্ম ভুলিসনে!

মালতী। হিঁদুর মেয়ে আমি, ছোট দিদিমণি। হই না গরিব; হিঁদুর মেয়ে কি ধর্ম্ম ছাড়তে পারে?

স্নেহ। অথচ এই হিঁদুর মেয়েকে মানুষ কুলুপ এঁটে রাখতে চায়!

মালতী। ঐ প্রকাশবাবু আসচেন। মনে আছে সব? লজ্জা করো না। আগে আপনাকে বাঁচাও—তাতে যদি একটু চাতুরী করতে হয় তো কোন দোষ নেই, ছোট দিদিমণি। আমি সরে যাই।

[প্রস্থান

স্নেহ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল;
প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? রাস্তা থেকে দেখা যায়।

স্নেহ। (সরিয়া আসিল) তাতে ক্ষতি কি?

প্রকাশ। ক্ষতি! ভদ্রলোকের মেয়ে পথের ধারে জানালার সামনে দাঁড়াতে আছে! লোকে ভাববে কি!

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

প্রকাশ। এই বেটা, একেবারে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলি যে?

ভৃত্য। (সভয়ে) আজ্ঞে, ঝাঁট দেবো।

প্রকাশ। ঘর ঝাঁট দিবি তো বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে আসতে পারিস না? এখানে মেয়েরা রয়েছে। ইয়ার্কি পেয়েচিস? বটে! বেরো, বেরো, বলচি—তোকে ঝাঁট দিতে হবে না। (ভৃত্য অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল) স্নেহ, মুখে ঢাকা দাও,—এই চাকর বেটা তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছে!

স্নেহ। (দৃপ্তভাবে) প্রকাশবাবু, এরকম ভাবে আপনি আমায় অপমান করবেন না। একটা চাকরের সামনে···

প্রকাশ। হোক চাকর!···পুরুষ মানুষ। এক বেটা ছোঁড়া চাকর—এ সব কি রকম বন্দোবস্ত! বেটা হন্‌হন্ করে ঘরে এসে ঢোকে!

স্নেহ। আপনি এ কি বলচেন?

প্রকাশ। বলচি, এ সব আচরণগুলো ভালো নয়। (ভৃত্যের প্রতি) আবার বেটা দাঁড়িয়ে রৈলি! বেরো (ভৃত্য গমনোদ্যত)—আর ছাখ্, শোন্, অন্দর-মহলে খপর না দিয়ে খবরদার ঘরে ঢুকবি না। যা, এখন। মেয়েদের সামনে এ-ভাবে আর কখনও যেন আসতে না দেখি,—এলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

ভৃত্যের প্রস্থান

স্নেহ। দেখুন, প্রকাশবাবু, আপনি যা করেন, তাতে কখনো আমি কিছু বলি নি। কিন্তু এ-সব উৎপীড়ন আমার সহ্য হয় না। আপনি ভাবেন কি? একটু হাওয়াতেও আমাদের অধিকার নেই?

প্রকাশ। লোকে নিন্দে করতে পারে। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কেউ যদি কোন নিন্দে করে, বেহায়া বলে, তা হলে সেটা সহ্য করতে বলো?

স্নেহ। আমি তো আপনার স্ত্রী নই!

প্রকাশ। আজ নও, দু'দিন বাদে তো হবে।

স্নেহ। ওঃ!

পত্র-হস্তে মালতীর প্রবেশ

মালতী। একবার আস্পর্দ্ধা দেখেচো, ছোট দিদিমণি! তোমার নামে খামে চিঠি পাঠায়—বলে, খুব গোপনে দিয়ো।

স্নেহ। কে?

মালতী। কে আবার! ঐ যতীশবাবু! বিলেত ঘুরে এসেছে কি না, সব খিষ্টানী ধরণ! এই যে প্রকাশবাবু—বলো তো বাবু···

প্রকাশ। দেখি। এ যে আবার রঙ-চঙে খাম। আবার (ঘ্রাণান্তে) ইঃ, গন্ধ মাখানো—এ তো ভালো নয়!

মালতী। বুকের পাটা ভাখো একবার। (স্নেহর সহিত চোখের সঙ্কেতাভিনয়)

স্নেহ। তুই নিলি কেন?

মালতী। ওগো, আমি কি সাধে নিয়েছি। যদি কোন চাকর-বাকরের হাতে দিয়ে যায় না নিলে—তারা কি ভাববে। এই জন্যে নিয়েছি। একবার সাহসখানা ভাখো, প্রকাশবাবু।

প্রকাশ। চিঠি পড়ে দেখতে হচ্ছে। (উন্মোচনে উদ্যত)

স্নেহ। না, না, ও খুলে কাজ নেই। তা হলে ভাববে, আমি বুঝি পড়েছিলুম—ও অমনি অমনি ফিরিয়ে দিন, আর কখনো সাহস করবে না!

প্রকাশ। এ নিয়ে এখনই পুলিশ-কেশ করতে পারি। পুলিশ কোর্টের এক বড় উকিলের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে। চালাকি নয়! কত বড় যতীশ সেন, একবার দেখে নি।

স্নেহ। না, না, তাতে কেলেঙ্কারী হবে। তার চেয়ে চিঠিখানা ফেরতই দেওয়া যাক্।

প্রকাশ। ঠিক বলেচো। আমি নিজে এখনই যাচ্ছি! দু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতেও ছাড়বো না! সব লেখা-পড়া শিখেচেন। মোদ্দা স্নেহ, রাস্তার ধারের ঘরে তুমি আর বড় একটা থেকো না। ২৭শে শ্রাবণ অবধি কোন মতে কাটাও, তারপর আমার বাড়ী নিয়ে যাবো। বাড়ী যা কচ্ছি, ওঃ, আগাগোড়া জানালা-খড়খড়ি সব লোহার জালে ঘিরে ফেলেছি।

[প্রস্থান

মালতী। তোমার জেলখানা তৈরী হচ্ছে—শুনলে?

স্নেহ। আচ্ছা, এরা ভাবে কি?

মালতী। ভাববে আর কি। নিজেদের মত সকলকে ভাবে। নিজেরা যেমন হাঁ করে পথ চলে, পথের দুধারে জানালা-খড়খড়ির দিকে চেয়ে,—তেমনি ভাবে, মেয়েরাও অমনি পর-পুরুষের গুঁপো মুখ দেখবার জন্যে বুক ফেটে মরে যাচ্ছে! ঐ তো মুখের ছিরি —ওতে আবার সিঁথে বাগিয়ে বাহার করা হয়! ভাবে, মেয়েরা দেখলে ভাবে ভোর হয়ে মূচ্ছো যাবে! মরণ আর কি!

স্নেহ। তুই যেন কি!

মালতী। কি আবার—আমি তোমায় চাক্ষুষ দেখাতে পারি! এই জানলার ধারে একটু দাঁড়াই দিকি,—পঞ্চাশ জন হতভাগা অমনি হাঁ করে উপর-বাগে চাইতে চাইতে যাবে! যেন সাত-জন্মে কখনও মেয়ে-মানুষের মুখ দেখেনি! মরণ হয় না হতচ্ছাড়াদের!

স্নেহ। থাক্, আমি চাক্ষুষ দেখতে চাই না, মালতী। ও চিঠিখানা কি রে?

মালতী। ও সেই যে বলেছিলুম। দিদিমণি যতীশ বাবুকে একটা চিঠি লিখেছেন। লিখেচেন, তোমাকে বিয়ে করতে তাঁর যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে শীঘ্র যেন দেখা করে তা জানান! তাঁর মাকে তাহলে এ বিষয়ে বলে ঠিক-ঠাক করে ফেলতে হবে! আর ঠিকঠাক করতে গেলে একটু চালাকির দরকার—সে বিষয়ে অনিল বাবুর সঙ্গে পরামর্শ চাই।

স্নেহ। খামখানার উপরে কারো নাম নেই যে?

মালতী। প্রকাশবাবুকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে। দ্যাখো না, প্রকাশ বাবুই এ বিয়ের ঘটকালী করবে'খন—তা না হলে আর মজা কি!

স্নেহ। কি জানি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মালতী। দিদিমণির কাছে যাও—জানতে পারবে। তোমাকেও কিছু করতে হবে কিন্তু—সেটুকু যেন কাঁচিয়ে ফেলো না। আমি এখন যতীশবাবুর ওখানে যাচ্ছি। তাঁর জবাব চাই তো।

[প্রস্থান

স্নেহ। সেদিন তাঁকে দেখে এমন লজ্জা হলো! বেশ মানুষ কিন্তু! সাধাসিধে, কোনো আড়ম্বর নেই! যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি মিষ্টি স্বভাব!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

যতীশের বাড়ীর বারান্দা।

নীলমণি আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল;
যতীশের প্রবেশ

যতীশ। ওরে নীলে, তোর হলো কি? এমনভাবে বসে আছিস যে! কোনো অসুখ-বিসুখ হল না ত?

নীলমণি। নাঃ—অসুখ নয়!

যতীশ। তবে?

নীলমণি। কিছু কাজ নেই, তাই বসে আছি।

যতীশ। একবার জ্ঞান বাবুর বাড়ী যা দিখিন্ তবে···

নীলমণি। গ্যান্‌বাবুর বাড়ী। সেই হুথাকে?

যতীশ। সেদিন যেখানে গেছলি—

নীলমণি। সেই মলাতীদের বাড়ী তো? (উত্থান) তা যাই।

যতীশ। মলাতী আবার কে রে?

নীলমণি। হা-হা সে মলাতী! মলাতী! আছে! খাশা লোক, দাদাবাবু, এই মলাতী।

যতীশ। আরে মর্—আবার মলাতী নিয়ে মরেছিস্!

নীলমণি। আর সে সব নয়, দাদাবাবু—মলাতীর একটা সয়ামী আছে—সেটা মলে মুই তাকে হাল আইনে বিধবা বিয়্যা করব। হয় না দাদাবাবু?

যতীশ। আরে, তার স্বামী আছে, বলচিস, তবে সে বিধবা হলো কি করে!

নীলমণি। না, বিধবা হয়নি এখনও। সয়ামী মলে হবে ত! তখন তাকে বিয়্যা করব। মনটা বড় খারাপ হয়েছে তার লেগে!

যতীশ। বিধবা হলে বিয়ে করবি! আর তার স্বামী মরবার আগে তুই যদি মরে যাস্?

নীলমণি। না দাদাবাবু, গড় করি, হমন কথা বলুনি! তাকে বিয়্যা না করে মুই মরতে পারবুনি।

যতীশ। তা তার স্বামী যদি না মরে?

নীলমণি। তাই ভাবছি বস্তে, দাদাবাবু, তার সয়ামীটে যদি ভালমান্সী করে না মরে!

যতীশ। ভালো পাগল বটে! বসে বসে একটা লোকের মৃত্যু-কামনা কচ্ছিস।

নীলমণি। নাহলে আমি বাঁচবো না! বিধবা বিয়্যা হয় না, দাদাবাবু, হাল আইনে?

যতীশ। বিধবা বিয়ে হবে না, কেন? কিন্তু তুই যে সধবা বিয়ে করতে চাস্—তা কি হয় বাঁদর?

(নীলমণি আবার বসিল)

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। আপনারই নাম, যতীশ বাবু?

যতীশ। হাঁ, আপনার প্রয়োজন?

প্রকাশ। আপনি না ভদ্রলোক? আপনি না শিক্ষিত?

যতীশ। আপনি যে আরও ভদ্রলোক দেখছি, বাড়ী বয়ে গাল দিতে এসেছেন!

প্রকাশ। এই দেখুন, তবে চিঠি। (পত্র বাহির করিল) এ চিঠি আপনি জ্ঞানবাবুর ছোট মেয়ে স্নেহলতাকে লিখেচেন?

যতীশ। (সবিস্ময়ে) চিঠি লিখেচি?

প্রকাশ। হাঁ, এই সে চিঠি। এ চিঠি সে ঘৃণার সঙ্গে ফেরত দিয়েচে—খোলে নি। এই নিন চিঠি। (সজোরে যতীশের মুখের উপর পত্র-নিক্ষেপ) জানেন, তার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে? সে আমার বাক্‌দত্তা স্ত্রী? তাকে চিঠি লিখে আপনি গর্হিত কাজ করেচেন। আপনি তাকে ভালোবাসেন?

যতীশ। (পত্র-হস্তে বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

প্রকাশ। বলুন, গোপন করবার কোন প্রয়োজন নেই।

যতীশ। তা…তা…

প্রকাশ। বলুন, ভালোবাসেন কি না?

যতীশ। বাসি। মিথ্যা বলবো না।

প্রকাশ। ওঃ! সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! ভালোবাসেন। বড় ভালো কাজ করেন। অপরের স্ত্রীকে ভালোবাসা খুব ভদ্রতা! না?

যতীশ। কিন্তু তাঁর তো বিবাহ হয় নি।

প্রকাশ। হয়নি, তাতে কি এসে গেছে? হবে তো। আর সে বিবাহ আমার সঙ্গে। আমি সব জানি। তার সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল, তারপর দু-তিন দিন আমি আপনাকে সেধারে ঘুরতে দেখেছি। উপরের জানলার দিকেও মাঝে মাঝে চেয়ে থাকেন …আর স্নেহও কখনো কখনো জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। থাক্, কিছু বলতে হবে না। তবে আমার এই কথা শুনে রাখুন, আর কখনো যেন এমন না দেখি! স্নেহ আমার স্ত্রী হবে—আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রতা লঙ্ঘন করবেন না। [প্রস্থান

যতীশ। আশ্চর্য্য লোক। অদ্ভুত ভদ্রতা! কিন্তু এ চিঠির মানে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না তো! দেখি পড়ে। (পত্র খুলিয়া পাঠ)

নীলমণি। (সহসা লাফাইয়া উঠিয়া) এই যে মলাতী! মলাতী এস, এস।

মালতীর প্রবেশ

দাদাবাবু, এই মলাতী।

যতীশ। তুমি কে?

মালতী। আমি জ্ঞানবাবুর বাড়ী থেকে আসছি। প্রকাশ বাবু আপনাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন?

যতীশ। হাঁ, এই সে চিঠি। প্রথমটা আমি ভারী অবাক হয়ে পড়েছিলুম, ব্যাপার কি? তার পর চিঠি পড়ে সব বুঝলুম। তা প্রকাশবাবু তো ভারী চোয়াড়ে লোক দেখলুম!

নীলমণি। (গোপনে মালতীকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত)

মালতী। হ্যাঁ। ছোট দিদিমণি যদি ওঁর হাতে পড়েন, তাহলে একদিন বাঁচবেন না! তা আপনি যদি…

যতীশ। আমি যদি কি মালতী?

মালতী। আপনিই তাঁকে রক্ষে করতে পারেন।

যতীশ। স্নেহ সে কথা তোমায় কিছু বলেছে?

মালতী। পষ্ট কিছু না বললেও তাঁর ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে বিয়ে হয়।

যতীশ। আমার কি সে সৌভাগ্য হবে?

মালতী। সে আপনার ইচ্ছে!

যতীশ। স্নেহ আমায় ভালোবাসে তা হলে? বেশ, আমি এখনই যাচ্ছি, অনিলের সঙ্গে দেখা কচ্ছি।

[প্রস্থান

মালতী গমনোদ্যত ; নীলমণি পা টিপিয়া আসিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল

মালতী। কে রে ?
নীলমণি। মুই নীলমণি।
মালতী। নীলমণি, তা আঁচল ধরিস্ কেন ?
নীলমণি। এ্যাট্টু বস্ না, মলাতী।
মালতী। আমার এখন বসবার সময় নেই। ছাড়্।
নীলমণি। দুটো পাণ খেয়ে য্যাও।
মালতী। না, না আমার সময় নেই।
নীলমণি। তোমার মনে এ্যাই ছিল মালতী!
মালতী। আমার মনে কি ছিল আবার ?
নীলমণি। একেবারে ভুলে গেলি—সেদিন এ্যাত কথা বল্‌লি। তা তর সয়ামীর অসুখ-বিসুখ কিছু হল ?
মালতী। মর্, জোয়ান শরীর—অসুখ হতে যাবে কেন ?
নীলমণি। তাই বলছি, তা হলে মর দশা কি হবে ?
মালতী। তোর দশা কি হবে, তা আমি কি জানি ? সর্, আমি যাই।
নীলমণি। মুই তোকে বড় ভালবাসি, মলাতী,—তরে না পেলে আমি বাঁচবো না—সত্যি বল্‌ছি।
মালতী। আহা, ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনে। তুই মাল কি বাঁচলি, তাতে আমার কি বয়ে গেল ? আমায় সেই ধরণের লোক পেলি না কি ?
নীলমণি। তা নয়, মলাতী, সে কথা নয়। সে দিকে না। আমি তোকে বিয়্যা করব, মলাতী। তা তোর সয়ামী যে বেঁচে!
মালতী। ও হতভাগা, তুমি বসে বসে আমার সোয়ামীর মরণ কামনা কচ্ছ! আমি বিধবা হলে আমায় বিয়ে করবে ? বটে!
নীলমণি। সত্যি বিয়্যা করব, মলাতী, সত্যি! তোরে মুই বড় ভালবাসি।
মালতী। তা কি হয়, নীলমণি ? আমার যে সোয়ামী আছে, যাদু।
নীলমণি। তাই তো মুই সারা হনু ভেবে।
মালতী। তা দেখে শুনে একটি বিয়ে না হয় করো না তুমি।
নীলমণি। না মলাতী, তা নয়—আমি তকে বিয়্যা কবব—আর কাউকে নয়, কাউকে নয়, কাউকে নয়। আমি তরে যে কি চোখে দ্যাখিছি।
মালতী। বুড়ো মিন্সের রকম দেখে হাসি পায়, দুঃখও হয়।
নীলমণি। মরে বিয়্যা করবি না মলাতী ?
মালতী। সধবার কি আবার বিয়ে হয়, সোনা ?
নীলমণি। সধবা নয়, সধবা নয়—বিধবা হলে।
মালতী। বিধবা হলে তখন না হয় দেখা যাবে!
নীলমণি। তুই কবে বিধবা হবি, মলাতী ? মুই সেদিন সত্যিনারাণের সিন্নি দেব—আর তোকে বিয়্যা করব।

গীত

আহা, সে দিনটি আসবে কবে ?
মরে সুখী করতে তমার সয়ামিটি
চিতেয় রবে ?

মালতী। চোখের জল মুছে দু'হাতে,
দাঁড়াবো ছান্‌লা-তলাতে।
ঘাট-কামানো,—শ্রাদ্ধ, সে সব
বিয়ের পর হবে!

নীলমণি। দেব বাজু-জশম, সোনার কাঁটা ফুল,
কানে তোর দুলিয়ে দেব দুল,...

মালতী। শুনে আহা প্রাণ জুড়ুলো—(পোড়া কপালে)
অত কি সবে!

নীলমণি। সয়ামীটে তর মরুক্।
মালতী। হাড়টা আমার জুড়ুক!
নীলমণি। সেদিন এ পায়ের লফর পায়ে লুটবো—
মালতী। পরের কথা পরে সে সব,—আজ আসি তবে।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্নেহর কক্ষ

স্নেহ, মাধুরী ও মালতী

মাধুরী। কেমন, পারবি ?
স্নেহ। আজ শ্রাবণ মাসের কঁউই হলো ?
মাধুরী। আজ ১৬ই। ২০শে আমাদের বিয়ের দিন।
মালতী। না হয় একদিন আগেই হয়ে যাবে! তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধে নেই।
মাধুরী। কেমন, পারবি ?
স্নেহ। আচ্ছা, দেখি।
মাধুরী। না, দেখি নয়, পারবতেই হবে। না হলে চলবে কেন, স্নেহ ?
স্নেহ। আচ্ছা, পারবো।
মালতী। না হলে চলবে কেন, ছোট দিদিমণি ? মেয়েমানুষের একটু ছল-চাতুরী চাই, না হলে আমাদের আর অন্য বল্ কি আছে, বলো ? চাবুকও মারতে পারবো না, বেতও ওঠাতে পারবো না!
মাধুরী। মালতী মিছে বলে নি।
মালতী। নাহলে যে গোঁয়ার জাত পুরুষ—ওদের বশে আনা কি সহজ ?

মাধুরী। তা হলে আমি এখন চললুম। প্রকাশবাবুর আসবার সময় হয়ে এল। আয় মালতী।

মালতী। যাচ্ছি দিদিমণি, তুমি এগোও। (মাধুরীর প্রস্থান) আমায় কি বলবে গা ছোট দিদিমণি ?

স্নেহ। তুই না কি বিয়ে করবি। মালতী ?

মালতী। ও কথা থাক্ ছোট দিদিমণি, আমার লজ্জা করে।

স্নেহ। এতে আবার লজ্জা কি, বল্ না আমাকে।

মালতী। না হলে সে যে বিষ খাবে, বলেছে, ছোটদিদিমণি ! একটা লোক সত্যি সত্যি মরে যাবে ?

স্নেহ। তুই তাকে তাহলে ভালোবেসেছিস, মালতী ?

মালতী। এ্যাঁ,—তা ঠিক নয়, তবে সে বড্ড ভালোবাসে। সে জানে, আমার বিয়ে হয়ে গেছে—বলে, আমি বিধবা হলে আমায় বিয়ে করবে।

স্নেহ। আচ্ছা, দেখ, অনিলবাবু কি বলেন !

মালতী। বাবুর মত না হলে বিয়ে হবে না। তবে সংসার-ধর্ম্ম করতে আমার এক-একবার সাধ হয়, ছোট দিদিমণি, রেঁধে বেড়ে স্বোয়ামীকে খাওয়াব— সে আমায় যত্ন-আত্তি করবে ! আমি জীবনে একজনও আপনার লোক কেমন, তা জানলুম না।

স্নেহ। কেন, মালতী, আমরা কি তোকে ভালো বাসি না ?

মালতী। তা বাসো বইকি, ছোট দিদিমণি। সে কথা না মানলে অধর্ম্ম হবে যে। তবে মাঝে মাঝে মনটা কেমন হয়ে যায়, ছোট দিদিমণি, তাই। তা বিয়ে করলে কি তোমরা আমাকে আর এমন ভালোবাসবে না ? ঘেন্না করবে ? তবে থাক্, আমি বিয়ে করবো না।

স্নেহ। না, না, মালতী—তোকে ঘৃণা করবো না ! তুই যে পাপের পথে না গিয়ে বিয়ে করে একটা আশ্রয় নিচ্ছিস, তার জন্য ঘৃণা করবো কেন তোকে ?

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। প্রকাশবাবু আসছে, স্নেহ।

স্নেহ। মালতী—তুই তবে যা।

(মালতীর প্রস্থান)

মাধুরী। (প্রকাশবাবুকে দেখিয়া) ওঃ আ-হা-হা ! (কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসত্যাগ ভাবাভিনয়ান্তে চকিতে প্রস্থান)

প্রকাশের প্রবেশ

স্নেহ। দেখুন, একটা বড় বিপদ হয়েছে।

প্রকাশ। কি বিপদ স্নেহ ? ইনি এমন করে গেলেন কেন ? কোন অসুখ করেনি তো তোমার ?

স্নেহ। না, আমার কিছু হয়নি—ঐ দিদির কথাই বলতে চাই। ওর সম্বন্ধে খুব গোপনীয় কথা আছে।

প্রকাশ। গোপনীয় কথা ?

স্নেহ। হ্যাঁ ! সেই যে যতীশবাবু বলে একজন অনিলবাবুর কাছে আসতো—সেই যে, যে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেই যে আপনাকে দিয়ে চিঠি ফেরত দেওয়ালুম···

প্রকাশ। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েচে।

স্নেহ। তা সেই যতীশবাবুকে দিদি ভালোবেসে ফেলেছে। তাঁর সঙ্গে যদি দিদির বিয়ে না হয়ে অনিলবাবুর সঙ্গে হয়, তাহলে দিদি বলেছে, দিদি বাঁচবে না !

প্রকাশ। এ্যাঁ, বলো কি ?

স্নেহ। আর বলি কি ? দিদি নিজের মাথা নিজে খেয়ে বসেছে—সর্ব্বনাশ করেছে।

প্রকাশ। তাই তো ! উপায় ?

স্নেহ। উপায় বড় সুবিধের দেখি না। অনিলবাবু এ কথা শুনলে অনর্থপাত করবেন।

প্রকাশ। আহা, বেচারা অনিল !

স্নেহ। কত আশা করেছিলেন—

প্রকাশ। বেশ হয়েচে, ঠিক হয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—হাতে হাতে ফল পাবেন না ? ঐ জন্যই মেয়েদের সম্বন্ধে আমি এমন আঁটাআঁটির ব্যবস্থা করি। তার জন্যে আমায় কম শুনিয়েছে ! তা তুমি কি বললে ?

স্নেহ। আমি ? আমি শুনে রেগে জ্বলে উঠলুম। অনিলবাবুর সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক—চারদিন পরে বিয়ে। আমি দিদিকে কত বললুম, কত বোঝালুম, তা চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। দিদি কাঁদতে লাগলো—বলে, যতীশ বাবুর সঙ্গে বিয়ে না হলে দিদি বিষ খাবে।

প্রকাশ। তাই—তো ! তা—আহা ! অনিল বেচারার জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

স্নেহ। মন যখন একজনকে চায়, তখন আর একজনকে বিয়ে করা কি ভালো ?

প্রকাশ। কখনো নয়। শেষে উল্টো ফল দাঁড়াতে পারে। তা হলে ব্যভিচারিণী হবে ! তা অনিলকে এ কথা বলে যতীশবাবুর সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া উচিত। বাইরে একজনের স্ত্রী হবে, অথচ ভিতরে ভিতরে আর একজনকে ভালোবাসবে, অনিল এ বিয়েতে সুখী হবে না !

স্নেহ। অনিলবাবুকে এ কথা বললে তিনি সহজে দাবী ছাড়বেন ? তিনিও তো দিদির বিষয়-সম্বন্ধে হস্তারক হতে পারেন।

প্রকাশ। না, না, হস্তারক হলে চলবে কেন ? বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যবস্থা করুন ! সে কি লম্ফ-ঝম্ফ ! বুঝলে ?

স্নেহ। মেয়েমানুষ, দুর্ব্বল মন—স্বাধীনতা দিলে তারা ঠিক থাকতে পারবে কেন? তারা তো আর পুরুষ মানুষ নয়—কাছা-কোঁচা দিয়ে কাপড়ও পরে না!

প্রকাশ। সত্যই তো। তা যতীশবাবুকে পাকড়ানো যাক্।

স্নেহ। সেদিকে আবার এক বিপদ! যতীশবাবু দিদিকে বিয়ে করতে চান না। তাঁর পছন্দ—

প্রকাশ। তোমাকে! বুঝেছি। না হলে চলবে কেন? ছোটটিকে দেখেছেন, কাজেই বড়টিকে—

স্নেহ। কিন্তু একটু ফিকির করতে হবে। দিদির সঙ্গে এ বিয়ে হওয়া চাইই!

প্রকাশ। তা তো চাই, কিন্তু যতীশবাবু তো খোকা নয়—তাঁর নিজের মত নেই যখন বলচো—

স্নেহ। সেই জন্যই বলছি—ফিকির চাই। তা আমি একটা মতলব ঠাওরেছি। আমাকে চিঠি পাঠিয়ে যেমন অপমান করেছিলেন, তেমনি চূড়ান্ত শোধ হয় তার।

প্রকাশ। কি, কি, খুলে বলো তো।

স্নেহ। আপনি একখানা চিঠি লিখুন,—আমার নামে। তাতে লিখুন, যেন আপনি যতীশবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য মত করেছেন! হায়, হায়, দিদির জন্য এতও করতে হলো। হাজার হোক্ সম্পর্কে দিদি—মেয়েমানুষ—তাকে রক্ষা করতে হবে তো!

প্রকাশ। এ আবার কি—এ আবার কি?

স্নেহ। আমায় আপনি সন্দেহ করছেন, প্রকাশবাবু? তবে আপনি আমাকে এতদিন যে শিক্ষা দিলেন, তার কি ফল হলো?

প্রকাশ। না, না, আমি তা বলছি না, তা নয় তা নয়—

স্নেহ। তবে? আমি এই কাগজ-কলম নিয়ে আসছি। দিদিকে বাঁচান, প্রকাশবাবু। স্বচক্ষে তার অবস্থাটা দেখলেন তো? যতীশবাবু বুঝবেন, তিনি আমাকেই বিয়ে করছেন। দিদি চেলির কাপড় পরে ঘোমটা টেনে থাকবে'খন—বিয়েটা তো হয়ে যাক্—তারপর দিদি বনিবনা করে নেবে! এ ছাড়া আর উপায়ও ত দেখি না। অনিল বাবুকে শেষে তাঁরই যুক্তি তর্কে এতে মত করিয়ে নোবো।

প্রকাশ। ঠিক বলেচো। We shall beard the lion in his own den.—যোদ্ধা আমার মন সরছে না কেমন।

স্নেহ। না, না, ও আর দ্বিধা নয়—(কাগজ-কলম লইয়া আসিল) নিন, লিখুন—

প্রকাশ। কি লিখবো, বলো। আমার কেনো বুদ্ধি আসছে না..

স্নেহ। লিখুন,—"শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী, আয়ুষ্মতীষু—" (প্রকাশ লিখিল) হলো? তার পর—হাঁ, একটু ফাঁক দিয়ে—হাঁ, ঐ। লিখুন,—"তুমি শ্রীযুক্ত যতীশ-চন্দ্র সেন বার-এ্যাট-ল'কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—" হলো? হ্যাঁ। তারপর, "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে আমার সহিত তোমার বিবাহ সঙ্গত নয়। তোমার শিক্ষা আমার আদর্শের সহিত খাপ খাইবে না। সুতরাং—" হাঁ,—লিখুন, "আদর্শের সহিত খাপ খাইবে না। সুতরাং" হাঁ, হয়েছে। "আমার ইচ্ছা, তুমি উক্ত যতীশ বাবু-কেই বিবাহ কর। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে, বিনানু-রোধে, স্বইচ্ছায় এই অনুমতি-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—" এইবার আপনার নামটা সই করুন। বাঁ কোণে আপনার ঠিকানা, আর আজকের তারিখটা লিখে দিন। ও কি, সই করলেন না?

প্রকাশ। এ আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, স্নেহ।

স্নেহ। এ আর বুঝতে পারবেন না? যতীশ বাবু এ চিঠি দেখে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ছুটে আসবেন, ভাববেন, আমার সঙ্গেই বুঝি বিয়ে হবে। শেষে দেখবেন, কি জালেই পড়েছেন। তারপর সাতাশে তারিখে আমাদের বিয়ে হবে। হ্যাঁ, সই করুন। বেশ হয়েছে। এতটুকু সন্দেহ হবে না তাঁর। দিন, আমি চিঠিখানা মালতীর হাতে পাঠিয়ে দি।

প্রকাশ। নাও। যোদ্ধা অনিলকে একবার খপরটা দিতে হবে।

স্নেহ। না, না, এখন থাক্। বিয়ের দিনও তিনি জান-বেন না। তারপর ব্যাপার বুঝে মাথা খুঁড়ুন!

প্রকাশ। বেশ হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা চালান, বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিন। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! এ বিয়ের ফুলের ভার আমি নেব। যাই, আজ আবার একবার লোহাপটি যেতে হবে। বেটারা এখনও লোহার জাল দিয়ে গেল না, এক-বার তাগাদা দিয়ে আসি।

[প্রস্থান

স্নেহ। কি করলুম! এতে কি হবে?

সপ্তম দৃশ্য

পথ

ভিন্ন-ভিন্ন দিক দিয়া অনিল ও প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। এই যে অনিল।

অনিল। তাই তো প্রকাশ যে। হন্-হন্ করে সন্ধ্যা-বেলায় কোথায় চলেছ?

প্রকাশ। বিশেষ কাজে।

অনিল। কি এমন কাজ হে? কাল আমাদের বিয়েতে এসে সব দেখচো শুনচো তো?

প্রকাশ। কাল বুঝি ২০শে! তা কাল আর বোধ হয়, কিছু দেখবার দরকার হবে না।

অনিল। দরকার হবে না! বাঃ! দরকার হবে না, কি হে? আমি তো আর বর সেজে দেখাশোনা করতে পারবো না।

প্রকাশ। সে কষ্ট আর তোমায় করতে হবে না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার উদার বন্ধু যতীশ বাবু তোমার হয়ে সে কষ্টটুকু আজই বোধ হয় সেরে ফেলবেন—এতক্ষণে বোধ হয়, সে কাজে লেগে গেছেন।

অনিল। কি বলচো, তুমি? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রকাশ। যাক্...সে জ্ঞানবাবুর বাড়ী একটু কষ্ট করে গেলে এখনই সব হাড়ে হাড়ে বুঝবে! তা তোমার বর্দ্ধমানের কাজ চুকলো? মকদ্দমার কি হলো?

অনিল। দেওয়ানী মকদ্দমা কি আর হুট বলতে চোকে রে ভাই? আবার মাসখানেকের জন্য মুলতুবি রইলো—তাদের খাতা-পত্র আনতে পারেনি বলে। তা তুমি যা সব বললে, তার অর্থ কি শুনি!

প্রকাশ। না, তোমায় না বলে থাক্‌তেও পাচ্ছি না। তবে বড় সুসংবাদ নয়—শুনলে যে তুমি আমায় সন্দেশ খাওয়াবে, এমন বোধ হয় না।

অনিল। আহা, বলেই ফ্যালো না!

প্রকাশ। বলি, ২০শে তো তোমার সঙ্গে শ্রীমতী মাধুরী দাসীর বিয়ের ঠিক ছিল? তা তাঁর অত বিলম্ব সইলো না! তুমি এখানে ছিলে না—মকদ্দমা করতে গেছলে, কাজেই তোমার বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়ে সম্প্রদান-ফম্প্রদান-গুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছেন। পিশিমাও এসে পৌঁছেচেন, কাজেই কিছু বাধেনি। আজ আবার পাঁজিতেও না কি একটা সুতহিবুক যোগ আছে বলে লিখছে!

অনিল। এ সব কি বলচো তুমি?

প্রকাশ। একেবারে যথাযথ ঘটনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। অনিলচন্দ্র, বলিহারি তোমার শিক্ষা! তার ফল আজ পাকা হয়ে ফলেছে হে! স্ত্রীদের স্বাধীন করো, মজলিসে নিয়ে যাও,—বাপ রে, ওদের কি কড়াক্কড়িতে রাখতে আছে? কোমল জাত—অন্দরের অন্ধকারে ভেপসে মারা যাবে যে! আলোয় নিয়ে যাবে না? লেখাপড়া শিখিয়ে মেম বানিয়ে তুলবে না? এখন ভোগো তার ফল।

অনিল। ভালো আপদেই পড়লুম—আরে, খুলেই বলো না!

প্রকাশ। অতিরিক্ত স্বাধীন হাওয়া পেয়েছেন কি না, কাজেই বাগ্‌দত্তা স্বামীটিকে ত্যাগ করে প্রণয়ীর ভুজ-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চান! আর ঘরের বদ্ধ বায়ুতে যাঁরা ভেপ্‌সে মারা যান, তাঁরা এই সব হতভাগা প্রণয়ীগুলোকে তাড়িয়ে বাগ্‌দত্ত স্বামীর পায়ে দাসী হয়ে লুটোতে চায়—এই আর কি!

অনিল। যাও, যাও, নিজের কাজে যাও—শুনতে চাইনে আমি। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রকাশ। (ধরিয়া ফিরাইল) চটেই চল্‌লে যে! আহা, শোনো, শোনো। মাধুরী তোমার বন্ধু যতীশকে মনে মনে ভালোবেসেচেন—কাজেই তুমি বরখাস্ত হচ্ছো। লজ্জায় তোমাকে সে কথা তিনি খুলে বলতে পারেন নি। আজ তুমি বর্দ্ধমানে আছ—জানতে পারবে না; তাই আজ যতীশবাবু টোপর মাথায় এসে মাধুরীকে বিয়ে করতে বসেচেন। গোধূলি লগ্নে বিয়ে! যতীশবাবু সেজেগুজে এসেচেন, দেখে এসেছি। আমি যাচ্ছি নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে—স্নেহ পীড়াপীড়ি করলে—

অনিল। এঁ্যা—না, না—এ যে অসম্ভব! যতীশ! আমার বন্ধু! মাধুরীকে আজীবন আমি শিক্ষা দিয়ে আসছি!

প্রকাশ। ভাই, সে শিক্ষার ফল হাতে হাতে পেলে তাই। এতে আর দুঃখ কি? মেয়েদের হাওয়া খাওয়ালে চলে কি—ধাতে সইবে কেন? আজ পাঁচশ বছর দেওয়ালের আড়ালে বদ্ধ বায়ু আর অন্ধকার যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাদের যদি ফশ্‌ করে আলোয় আনো, তাহলে চোখ খারাপ হয়ে যাবে যে! হাওয়ায় সর্দ্দির ব্যামো দাঁড়াতে পারে যে!

অনিল। এই নিয়ে তুমি ঠাট্টা করচো প্রকাশ?

প্রকাশ। ঠাট্টা নয়, অনিল,—যথার্থ তোমার এ নৈরাশ্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। তবু আমি তোমার বন্ধু—একটা সান্ত্বনা এই যে, তোমার সৌভাগ্য, মাধুরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হলো না! নাহলে বাইরে তোমার স্ত্রী হয়ে অন্তরে সে আর একজনকে ভালোবাসবে, এটা কি ভাল হলো?

অনিল। আগুন জ্বেলে দাও ভালবাসায়। মাধুরীর মনে এই ছিল!

প্রকাশ। তুমি বরং আমার বাড়ীতে এসো—একটু বসবে! আমি ধাঁ করে ফুলগুলো এনে ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবো'খন!

অনিল। যাও তুমি। আমি কিছু শুনতে চাই না।

(প্রস্থান)

প্রকাশ। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা—এ সবের উপর এই

জন্তেই তো আমি হাড়ে চটা। এ দেশের ধাতে ও সব সইবে কেন? (প্রস্থান)

মালতীর প্রবেশ

মালতী। যাই, চট করে ছিরিটা নিয়ে যাই। আঃ, আমার নীলমণি আজ যা সেজে-গুজে এসেছে! বলে, দাদাবাবুর বিয়ে, মুই মিত্‌বর! এই যে, পেছু পেছু এসেছে। নাঃ, মিন্সে জ্বালালে দেখছি।

নীলমণির প্রবেশ

এসেছিস্? ওরে, আমি মরবো এবার। এখনো বিয়ে হয়নি, এর মধ্যে এত! এর পর যে ভূতের মত আমার ঘাড়ে দিন-রাত চেপে বসে থাকবি, দেখছি।

নীলমণি। মুই তমায় ছেড়ে থাকতে পারব লা—মলাতী।

মালতী। আহা, যেন যশোদার ননীচোরা নীলমণি রে। তা আমি তো যশোদা নই যে, নীলমণি আমার আঁচল ধরে বেড়াবে।

নীলমণি। কাল কখন মদের বিয়্যা হবে, মলাতী?

মালতী। যখন তোমার গলায় মালা দেবো, বুঝলে! ভাবনা গেছে তো এখন? যাও তবে—

নীলমণি। তুমি কোথায় যাচ্ছ মলাতী? মুইও যাই লা!

মালতী। অমনি তুমি যাবে! বেশ, তুমিই যাও, আমি তবে ফিরি।

নীলমণি। রাগ করো না মলাতী—মর কান্না পায়।

মালতী। একটু কাঁদো। দুঃখু থাকে কেন? অমন করো যদি তো কখ্‌খনো বিয়ে করবো না।

নীলমণি। লা মলাতী, রাগ কর লা—মুই এই ফির‍্যা যাচ্ছি।

মালতী। যাও ফিরে—

নীলমণি। এই যে যাই (ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি—এক পা অগ্রসর হয় ও ফিরিয়া চায়)

মালতী। আবার ফিরে ফিরে চাইছ কি? যাও।

নীলমণি। এই যাই! (ফিরিয়া) মলাতী—

মালতী। কেন? কেন?

নীলমণি। তুমি এখনই আসবে?

মালতী। না, আমি আর আসবো না।

নীলমণি। রাগ কর কেন, মলাতী?

মালতী। সং! হাসিও পায়। (দাড়ি ধরিয়া) যাও যাদু, বাড়ী যাও—তোমার জন্তে কত সন্দেশ কিনে আনবো, খেলনা কিনে আনবো! লক্ষ্মী যাদু আমার, যাও, ঘরে যাও—নীলমণিটি, সোনামণিটি আমার!

নীলমণি। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ (হাস্য) মলাতী—মলাতী—

মালতী। দ্যাখো, সাধে সং বলি! বিয়ে হতে চলেছে—এখনো আমায় ঠিক নামে ডাকতে শিখলে না! ওগো, আমি মলাতী নই। আমার নাম, মালতী।

নীলমণি। এ্যাঁ, বলিস কি—মলাতী! এতদিন ভুল নাম ধরে ডেকে আসছি—তা হলে? হায়, হায়, হায়—তা—মালতী আমার, মালতী আমার—

মালতী। আহা, নীলমণি আমার, নীলমণি আমার—

আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল শামলা নেইক ঘরে—
শামলাদেব নীলমণিটি পথে কেঁদে মরে!
কি হয়েছে নীলমণিরে, কি হয়েছে তোর?
চোখ মুছে ফেল্ মাণিক আমার—দুঃখু কিসের ঘোর?
ছোলা ভাজা দেবো খেতে—চক্ষু মোছ ওরে!
শান্ত হ রে সোনা আমার,—ওরে আমার মাণিক,
রূপকথা যে বলবো ফিরে, একলা থাকো খানিক।
কেঁদোনাকো, কাঁদলে এবার আছাড় দেবো ধরে!

নীলমণি। ফিরতে দেরী কর লা, মলাতী।

মালতী। ওগো, না গো, না।

নীলমণি। লা হলে মন কেমন করবে মর।

মালতী। না, মনকে একটু বেঁধে রাখো।

(উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

মাধুরীর বাটী; সজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপ
দুই পার্শ্বে আসনে—একধারে অনিল ও মাধুরী; অপরধারে যতীশ ও স্নেহ উপবিষ্ট। অনিল ও যতীশের বরবেশ, মাধুরী ও স্নেহর বধূ-বেশ, চারি জনের গলায় পুষ্পমাল্য। সম্মুখস্থ আসনে পিশিমা। ভট্টাচার্য্য; ও সজ্জিত-বেশা মহিলাগণ।

পুরোহিত। (উঠিয়া) নাও, বর-কনে এখন বাসরে নিয়ে যাও। আগে অনিলবাবুদের রেখে আসুন, তার পর এঁদের নিয়ে যাবেন।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। পিশিমা, তুমি একটু জল খাবে, এসো। সারাদিন উপোস গেছে—এই গুমট! তেষ্টা পেয়েছে কত! ভটচায্যি মশাইও আসুন।

পিশিমা। আজ কি আমার ক্ষিদে আছে রে মালতী! আহা, বেঁচে থাকো সব, সুখে-ঘরকন্না করো, সোনার চাঁদ ছেলে-পুলে হোক্! আমার জ্ঞানের নাম বজায়

থাকুক ! আহা, আমার জ্ঞানের কত সাধের কত আদরের মেয়ে ! বেঁচে থাকো মা,—পাকা মাথায় সিঁদুর পরো, হাতের নো অক্ষয় হোক্‌ ।

(চারি জনে পিশিমাকে প্রণাম করিল)

ওরে, শাঁখটা বাজা না কেউ। (শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

পুরোহিত। তা হলে পিশিমা, আপনি একটু জলটল খান গে।

পিশিমা। এই যে, এরা বাসরে যাক। আমার সোনার চাঁদেরা আগে ঠাণ্ডা হোক্‌ !

১ মহিলা। ওদের জন্যে ভাবতে হবে না, পিশিমা। ওদের এমনিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আজ।

২ মহিলা। না হলে বর্দ্ধমান থেকে দৌড়ে এসেই কেউ ছানলাতলায় দাঁড়াতে পারে ?

৩ মহিলা। তা ছাড়া কাণমলা খেয়ে পেট ভরে গেছে।

অনিল। কাণমলা খেয়ে কি আমাদের আর পেট ভরে, পিশিমা ? ও'তো চায়ের মত নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে !

যতীশ। এমন মিষ্টি হাতের কাণমলা খাওয়া ভাগ্যের কথা, পিশিমা ! কাণটার যে এমন সৌভাগ্য হতে পারে, তা কি কখনো কল্পনা করেছিলুম !

পিসিমা। পাগল ছেলে সব।

১ মহিলা। দে'তো ভাই কাণটা আবার মলে। ওঁর আশ মেটেনি এখনো !

মহিলাগণ। (তথাকরণ)

যতীশ। আহা, কাণটার উপর যেন এক পশলা পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল !

মালতী। তুমি এস, পিশিমা—একটু মিছরির পানা অন্ততঃ মুখে দেবে এসো।

পুরোহিত। হাঁ, চলুন। এঁরা আমোদ-আহ্লাদ করুন।

(পিশিমা, মালতী ও পুরোহিতের প্রস্থান)

মাধুরী। আমার কষ্ট হচ্ছে, প্রকাশবাবুর জন্য।

যতীশ। আহা, বেচারা প্রকাশবাবু !

অনিল। মায়াবিনী স্নেহ !

স্নেহ। আবার আমায় কেন ?

অনিল। বেচারা fool ফুলের বোঝা বয়ে আনছে।

১ মহিলা। অথচ জানে না, কি ঢেঁকি তার বুকে পড়লো !

২ মহিলা। আর বকাবকি কেন ? অনিল মাধুরীকে বাসরে চালান দি, এসো না।

অনিল। আমি প্রকাশের জন্য অপেক্ষা কচ্ছি।

৪ মহিলা। একবার বাসরে বসে তারপর ফিরে এলেই ভালো হয় না ?

[মালতীর পুনঃ প্রবেশ। তার সঙ্গে একজন ভৃত্য ফুলের ঝুড়ি লইয়া আসিল]

মালতী। প্রকাশবাবু ফুল পাঠিয়ে দেছেন—তিনি বাড়ীতে কাপড় ছেড়ে সেজেগুজে আসছেন। একে দিয়ে ফুল পাঠিয়ে দেছেন, পাছে দেরী হয় !

২ মহিলা। ও বাবা, এ যে ফুলের পাহাড় একেবারে !

মাধুরী। বেচারা হনুমান গন্ধমাদন বয়ে আনলো আর কি !

অনিল। হনুমান বলা ঠিক নয়, মাধুরী—হনুমানের বিশেষত্বটুকু থেকে বেচারা একান্তই বঞ্চিত।

১ মহিলা। সেটা ভিতরে ভিতরে পাকিয়ে আছে।

যতীশ। নাঃ, এ রীতিমত মানহানি !

মালতী। নে, ফুলের ঝুড়ি এখানে রেখে তুই যা।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

৩ মহিলা। এসো ভাই, এদের এবার সাজানো যাক্‌।

১ মহিলা। ঠিক বলেচিস্‌, ভাই রেণু।

মহিলাগণ। (ফুল দিয়া সাজাইতে সাজাইতে)

সজনি, সাজাবো ফুলে।
যুঁইয়েরি মালা গেঁথে পরাবো চুলে।
মালতী দেবো দুটি, কাণে হবে দুল ;
বেলার কুঁড়ি নোলোক বলে হবে ভুল ;—
চামেলির মালা বাঁধি বাহু-মূলে।
গোলাপ-কলি দিব অলকে গাঁথি ;
চরণে কমল-মালা ; নখরে জাতী ;
তারা-হার গেঁথে দিব ঝরা বকুলে !

মালতী। ওগো দিদিমণিরা, বৌঠাকরুণরা, বরকনেদের বাসরে নিয়ে চলো না গো।

১ মহিলা। ঐ যে—প্রকাশবাবু আসচেন না ?

অনিল। হ্যাঁ। মাধুরী, আমরা আড়ালে যাই চলো। স্নেহ, বেশ করে ঘোমটা টেনে দাও, ঘোমটা টেনে দাও।

(অনিল ও মাধুরীর অন্তরালে গমন)

প্রকাশের প্রবেশ

(মহিলাগণের সঘন হুলুধ্বনি)

প্রকাশ। বিয়ে হয়ে গেছে ?

১ মহিলা। হ্যাঁ—নির্ব্বিঘ্নে সব চুকে গেছে।

প্রকাশ। স্নেহ কোথায় ? ফুল কেমন হয়েছে ?

২ মহিলা। চমৎকার !

প্রকাশ। আমায় ধন্যবাদ দিন যতীশবাবু। আমি সাহায্য না করলে আর এ বিয়ে হতো না মশায়।

যতীশ। জন্মে কখনও আপনার ঋণ শোধ দিতে পারবো না।

৩ মহিলা। আর জন্মে প্রকাশবাবু নিশ্চয় যতীশবাবুর কেউ ছিলেন।

৪ মহিলা। সতীন।

প্রকাশ। অনিলের সঙ্গে পথে আমার দেখা হলো। সব বললুম···বেচারার মনে বেশ চোট লেগেছে—সামলাতে পারলো না—

অনিলের প্রবেশ

অনিল। তাই তারই বেগে একদম এখানে ছুটে এসেছি।

প্রকাশ। এ কি। অনিল। তোমার পরণে—

অনিল। বর-বেশ দেখে অবাক হচ্ছ! কিন্তু তোমার মুখে যে খপর পেলুম, তাতে আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে চট করে এই বেশ ধরে ছুটে এসেছি। Sun set law ভারী strict দাদা, এসে পর সময়ে খাজনা দিয়ে ফেলেছি। আমার তালুক লাটে চড়ায় কে?

প্রকাশ। সে কি! মাধুরী

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। আমাকে ডাকচেন?

প্রকাশ। এ কি! ভেল্কি দেখছি আমি? এ তবে—

মাধুরী। যতীশবাবুর নবোঢা স্ত্রী—আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী। কনে সেজে কেমন মানিয়েছে, দেখুন। (স্নেহর ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইল)

প্রকাশ। এ কি! এ সবের মানে?

অনিল। যতীশবাবু সেজে গুজে এসেছেন—তার পর আমিও ঠিক সময়ে বর সেজে হাজির—আমার দাবী আমি ছাড়বো কেন ভাই? First mortgagee first charge আমার। সম্পত্তি দখল করলুম। যতীশবাবু ভদ্রলোক—ওঁকেই বা শুধু হাতে ফেরাই কি বলে? কাজেই স্নেহময়ী স্নেহলতাটিকে ওঁর হাতে তুলে দিলুম। দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে।

১ মহিলা। সাক্ষাৎ হরগৌরী!

২ মহিলা। সাক্ষাৎ বলে সাক্ষাৎ! একেবারে দু জোড়া হরগৌরী!

৩ মহিলা। না হলে ঘরের শোভা হবে কেন?

প্রকাশ। বুঝেছি, এ সব ফন্দি! আমাকে গাধা পেয়েচো, না? বেশ, আমি ছাড়চি না। এ বিয়ে তো null and void. আমি এখনি আদালতে গিয়ে injunctionএর order নিয়ে আসবো।

যতীশ। আদালত আজ এখন রাত্রে বন্ধ হয়ে গেছে, মশায়! তবে কাল, হ্যাঁ, দেখতে পারেন। বেশ, মশায়, caseটা আমায় দেবেন! এসে অবধি এখনও একটাও case পাইনি। আর পাবোই বা কোত্থেকে? এধারেই ঘুরছি—এটর্ণিপাড়ায় গেলুম কবে! আমি এক G. M.-এ আপনার application করতে রাজী আছি!

প্রকাশ। আবার ঠাট্টা!

অনিল। ঠাট্টা বলে ঠাট্টা। একেবারে ফৌজদারী ঠাট্টা! Culpable homicide amounting to murder!

প্রকাশ। আচ্ছা, বিয়ে cancelled না হয়, trustএর ব্যবস্থামত বিষয়ের দফা দেখছি!

অনিল। সেও যে ভাই case-dismiss-এর ব্যবস্থা নিজের হাতে করে রেখেচো। শুনলুম, তুমি নিজের হাতে স্নেহকে ফারখত লিখে যতীশবাবুর হাতে তুলে দিয়েচ।

প্রকাশ। ওঃ, এখন আমার চোখ খুলেছে। আমাকে দিয়েই সব সুবিধে করে নিয়েচ! আমি বাঁদর, তাই স্ত্রীলোকের কথায় ভুলেছিলুম—কিছু বুঝিনি! আমার বেকুবি, তাই স্নেহকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করেছিলুম! যাক্, আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যি যে এ বিয়ে হয়নি। নাঃ, সাধে মেয়েমানুষের সম্বন্ধে ঋষিরা কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন!

অনিল। মনের দুঃখে আর ঋষিদের সগোত্র বাপান্ত করো কেন?

প্রকাশ। উঃ, খুব বেঁচে গেছি—এ জীবনে কখনো বিয়ে কচ্ছি না, আমি। মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছু নেই, দেখছি! এই মেয়েমানুষকে লোকে বিয়ে করে, সুখে থাকবার জন্য। বেকুবী। যাক্, যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। অনিলবাবু, তোমাদের আমোদ-প্রমোদ সাঙ্গ হলে সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা করো—আমি আর trustee থাকতে পারবো না।

অনিল। এ ঘটনার পর ও কষ্টটুকু তোমাকে আর কোন্ মুখে সইতে বলি, বলো ভাই?

প্রকাশ। বেশ, তোমরা রঙ্গরস করো—আমি চললুম।

অনিল। সে কি। অমনি! না খেয়ে? একটু মিষ্টিমুখ না করে কি বিয়ে-বাড়ী থেকে যেতে আছে?

প্রকাশ। এ সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না, অনিল।

যতীশ। প্রকাশবাবু নেহাৎ যাবেন?

প্রকাশ। যতীশবাবু, আমার সঙ্গে আপনার তেমন আলাপ নেই, তবু বলি, কাজটা কি ভালো হলো?

যতীশ। আমার দোষ দিচ্ছেন, কেন! আমি যদি

আপনার চিঠি না দেখতুম, তাহলে কি আজ এখানে আসতুম ?

প্রকাশ। যান্, যান্, চালাকি করতে হবে না, মশায়।

অনিল। যতীশ, কিছুতেই ওঁকে ছেড়ো না। মিষ্টিমুখ করাতেই হবে। দুটো সন্দেশ নিদেন···

১ মহিলা। সত্যিই প্রকাশবাবু, আপনি হচ্ছেন মাধুরী-স্নেহের ভাইয়ের মত। এ সময় রাগারাগি করে চলে যাওয়া কি ভালো ? নেহাৎ যদি মিষ্টিমুখ না করেন ত আমাদের একটা কথা না হয় শুনে যান !

প্রকাশ। কি কথা ?

মহিলাগণ। কথাটা হচ্ছে—

গীত

একটু আলো, একটু বাতাস, প্রয়োজন আমাদেরো !
না হলে বাঁচবো কেন ? প্রাণ তো মেয়েদেরো !
আমাদের চন্দ্রবদন দেখে কেউ ফেসে যদি,
ভাবের ঢেউ উথলে প্রাণে যদি কার বয় গো নদী,—
সেটা কি মোদেরই দোষ ? তাদেরই বেঁধে মেরো।
এ যে গো বঙ্গ-হাসি, এ যে গো সজ্জা মোহন—
বোঝ না কেন এ সব ?·· না হলে উড়বে যে ধন !
আ মাদের অস্ত্র কি আর ? সাধে কি পেছু ফেরো ?
নারীকে বেঁধে বশে কখনো আনা না যায়—
বাঁধনে আপনি বাধে, তবে তো লোটে সে পায়,
(নয়) আঁটুনি কষ্‌বে যত, তত হায়, ফস্কা গেরো !

যবনিকা

নেপথ্যে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বন্ধু

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি-এল

করকমলেষু

পূর্ব্ব-কথা

একটা ফৌজদারীর মামলার উপর এই উপন্যাসের কাঠামো খাড়া করিয়াছি। প্লট্ নিছক কাল্পনিক নয়। জীবনের কয়টা টুক্‌রার উপর কল্পনার রঙ ফলাইয়াছি।

মানুষের বাহিরের কাজ দেখিয়া আইন তার দোষ-গুণের বিচার করে। মনের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভবও নয়। আইন-কারকে দোষ দিই না। তবে বড় বড় চুরি-জুয়াচুরি খুন-জালিয়াতির তুলনায় মানুষের মনের উপর মানুষের যে অত্যাচার সমাজের বুকে অহরহ চলিয়াছে, তার একটু আভাস দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

বিলাতের ডাইভোর্স-কেশের রিপোর্ট পড়িয়া অনেকে ঘৃণার হাসি হাসেন, কিন্তু দারুণ মর্ম্ম-দাহে অন্তর তাহাতে ভরিয়া উঠিবার কথা। মনের উপর কতখানি অত্যাচার হইলে বিলাতের স্বামি-স্ত্রী আদালতে ছোটে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! তেমন অত্যাচার এদেশেও কিরূপ অবাধে চলিতেছে, প্রহার না করিয়াও অবহেলা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিষে কত বালিকাকে এদেশের পুরুষ হত্যা করিতেছে, 'চুমকি'-চরিত্রে তাহারি একটু ইঙ্গিত দিয়াছি মাত্র। সমাজ কিন্তু অসাড় বসিয়া আছে! থাকুক,—নারীর এ ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস বৃথায় যাইবে না, এ বিশ্বাস রাখি।

১৭, মোহনবাগান রো, কলিকাতা;
১২ ফাল্গুন, ১৩২৯।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নেপথ্যে

আষাঢ় মাসের মেঘ ফাটিয়া অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। সারা দিন কেহ সূর্য্যের মুখ দেখে নাই। জলে-কাদায় চারিধারে এমন বিশ্রী কদর্য্য ভাব ফুটিয়াছে যে, যে-নভেলখানা খুলিয়া সার্শির ধারে বসিয়াছিলাম, বহু চেষ্টাতেও তাহাতে মন বসিতেছিল না। এই বাদলা-রাতের কাজল-কালো আঁধারে বিশেষ করিয়া মনে জাগিতেছিল, মামলাটার কথা—যে মামলা কোর্টে সত্ত করিয়া আসিয়াছি। বেচারা মেঘনাথ! তার সাজা হইয়া গিয়াছে। এক বছরের জেল আর পাঁচশো টাকা জরিমানা।

কিন্তু সে নির্দ্দোষ। তবে তার সে নির্দ্দোষিতা এখানকার আদালতে সাক্ষী ডাকিয়া প্রমাণ করা যায় না! মনের সে কি সবিস্তার কাহিনী! কত পল্লবিত ঘটনা। সে কথা আদালতে তোলা মূঢ়তা! আদালত হাসিয়া উঠিবে, ও-সব কথায় শুধু আদালতের সময় নষ্ট হয়,—ও সব প্রমাণ করা অসম্ভব! পাগলামি!

বই রাখিয়া ধোঁয়াটে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলাম। নিবিড় মেঘে আকাশ ঢাকা, আর ঝরঝর-ধারে বৃষ্টি ঝরিতেছে—যেন সমস্ত প্রকৃতির গা বেড়িয়া কে জলের জাফরি রচিয়া দিয়াছে!

সহসা স্ত্রী আসিয়া হাজির, হাতে একটা ডিশে বর্ষার উপযোগী বিবিধ মুখরোচক খাদ্য। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল।

স্ত্রী বলিলেন,—না বাবু, আর পারা যায় না। কেবল জল আর জল! সেই ভোর থেকে নেমেছে—এর আর বিরাম নেই!

আমি বলিলাম,—পথ-ঘাট যা হয়েছে, সে আর কহতব্য নয়। গাড়ী চলেছে, না, বজরা ভাসচে।

স্ত্রী বলিলেন,—কোর্টে তবু তো সেই পাঁচটা অবধি কাজ—পাঁচ মিনিট আগে বাড়ী ঢোকো নি। সেখানে কাজ-কর্ম্মের কমতি হয়নি তো! এই জলে মকর্দ্দমা করতে লোক আসতেও ছাড়েনি। ধন্যি সখ, বাবা!

আমি বলিলাম,—সখ করে কি কেউ আর মকদ্দমা করে! প্রাণের দায়ে, মানের দায়ে, টাকার দায়ে লোক মামলা করতে আসে।

স্ত্রী বলিলেন,—আর না এলে তোমাদেরই বা চলে কি করে, বলো? ...আজ এই বর্ষায় ক'জনকে ভাসিয়ে এলে?

আমার এই ব্যবসাটাকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রী প্রায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। প্রায় বলেন, আর কেন? ছেড়ে দাও বাবু ও কাজ! লোকের ঝগড়া-ঝাঁটিতে মাথা দিয়ে তাদের উস্কে তোলা বৈ নয়! লোকে সুখে-শান্তিতে থাকুক।...ব্যবস্থা বেশ—পাঁচজনে ঝগড়া করবে, আর-পাঁচজনে পয়সা খেয়ে সেই ঝগড়ার নতুন নতুন ফন্দী বার করে তাতে তাদের আরো মাতিয়ে তাতিয়ে তুলবে!

স্ত্রীর কথায় এক এক সময় মনে হয়, লেখাপড়া শিখিয়া আচ্ছা ব্যবসা ফাঁদিয়াছি বটে! প্রথম যখন এই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হই,—অর্থাৎ যখন একেবারে জুনিয়ারির যুগ,—তখন সিনিয়ারের কাছে গিয়া বেচারা আসামী মক্কেল যখন সামান্য ফীয়ে কাজ করাইবার ব্যাকুল নিবেদন লইয়া তাঁর পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়াছে আর সিনিয়ার-মশায় পাষাণ-বুকে সে নিবেদন সবেগে ঠেলিয়া বেচারাকে খেদাইয়া দিয়াছেন, আমার চিত্ত—কি বিদ্রোহী হইয়াই না তখন উঠিত! মনে হইত, সগর্জ্জনে বলি, সামান্য ক'টা টাকার মায়া ছাড়ুন না মশায়! বেচারা বিপন্ন!...কিন্তু সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারি নাই। আর এখন? সামান্য ফী কাটিবার কথা কেহ বলিলে তার কাগজপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিই! হায়রে, কোথায় গেল মিল স্পেন্সারের সেই বড় বড় কথা, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রাণের সে করুণ উচ্ছ্বাস! জীবনটায় কালিঝুলি মাখাইয়া এমন কদর্য্য কালো করিয়া তুলিতেছি, পয়সার সিমেণ্টে মাখিয়া প্রাণটাকে এমন কঠিন করিয়া গড়িতেছি, সে আর বলিবার নয়।

স্ত্রীর কথায় সেদিনকার মকর্দ্দমার কাহিনীটুকু বর্ষার এই বিপুল আঁধার-কালো বুকের পটে বিদ্যুতের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিল। বেচারা মেঘনাথ!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—আজ এই বাদলা দেখে যম যেমন তার চুলী-জ্বালায় কামাই দেয় নি, আমাদের চুলীও তেমনি জ্বালা ছিল।...একটা লোকের জেল হয়ে গেল এক বছর, আর জরিমানা।

স্ত্রী বলিলেন,—দোষ করে যদি জেলে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য দুঃখ করচো কেন? ভগবানও তো রেয়াৎ করেন না দোষীকে সাজা দিতে!

আমি কহিলাম,—জানি না, ভগবান এ দোষটাকে কি চক্ষে দেখবেন,—কিন্তু মানুষের গড়া আইন একে রেয়াৎ করলে না।

স্ত্রী বলিলেন,—কি করেছিল?

আমি বলিলাম,—আগাগোড়া ব্যাপারটা তবে বলি, শোনো। কাল খবরের কাগজে হয়তো এ মকদ্দমার কথা বেরুবে যে একটা লোক—নাম মেঘনাথ সাহা—মনিবের দু' হাজার টাকা ভেঙেছিল বলে তার এক বছর জেল আর পাঁচশো টাকা জরিমানা হয়েছে। সে একটা বদমায়েশ, শয়তান—এই বলেই তার পরিচয় লোকের মনে ছাপা হয়ে যাবে—সবাই তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে। কিন্তু তুমি শোনো সব, শুনে বুঝবে, এই মামলার ঐ ছোট্ট রিপোর্টটুকুর পিছনে কতখানি মিথ্যা, কতখানি নৃশংসতা,—মানুষের উপর মানুষের পৈশাচিক হিংসা কি ভয়ঙ্কর নৃত্য করছে, তার ইঙ্গিত পাবে। আরো বুঝবে, যারা জেলে যায়, তাদের সবাই শয়তান নয়। তাদের মধ্যেও এমন সাধু আছে, যাদের পেশে স্বর্গের সিংহাসন গর্ব্বে দুলে ওঠে!

২

—মানসনাথ চৌধুরী মস্ত জমিদার। জমিদারী রাজশাহী না মালদহ অঞ্চলে। জমিদার বাবু থাকতেন কলকাতায়। জমিদার বলতে সচরাচর যা বোঝায় অর্থাৎ গদিয়ানী চাল, অকর্ম্মার ঢিপি, মোটা-সোটা জবুথবু একটা জীব, ইনি সে ধরণের ছিলেন না। লেখাপড়ার চর্চ্চা এঁর বিলক্ষণ ছিল,—তা ছাড়া কলকাতায় শুধু মোসাহেব-বৃন্দে পরিবৃত হয়ে বাস করা, আর অস্থানে-কুস্থানে অর্থ ব্যয় করে বেড়ানোর দিকে এঁর কোনদিন খেয়াল হয় নি। কলকাতায় ইনি দু-চারটে কারবার ফেঁদেছিলেন,—আর সেই কারবারের ম্যানেজার ছিল আমার এই বেচারা মক্কেল মেঘনাথ সাহা। মেঘনাথ প্রায় বিশ বছর ধরে জমিদারের কাছে ম্যানেজারি করছিল। এর উপর বাবুর বিশ্বাস ছিল যেমন অগাধ, সে বিশ্বাসের অপব্যবহারও তেমনি তার দ্বারা কখনো হয় নি।

মানসনাথের স্ত্রী মারা যান পাঁচ ছ'বছর আগে। এই দুর্ঘটনার পর থেকে মানসনাথ সাংসারিক ব্যাপার থেকে মনকে ক্রমে গুটিয়ে নিতে লাগলেন। ছেলে তারকনাথের বয়স তখন বিশ-বাইশ বৎসর। ছেলেটি প্রেসিডেন্সিতে পড়ছিল। ছেলের পড়াশোনা আর স্বভাব-চরিত্রের উপর বাপের দৃষ্টি বরাবর বেশ প্রখর ছিল—অর্থাৎ তাঁর সাধ ছিল, ছেলেটিকে রীতিমত চৌকস করে গড়ে তুলবেন।

অকস্মাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হলে সংসারের উপর থেকে তিনি যেমন দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন, ছেলের উপর থেকেও তেমনি সে দৃষ্টি সরে গেল। ফল হলো এই যে, এতদিনকার একটা দৃষ্টির আবরণের পাশ কাটিয়ে ছেলে বাহিরের পানে চক্ষু মেলে চাইতেই আশ-পাশ থেকে এমন ভিড় এসে জমা হয়ে ছেলেটিকে ঘিরে দাঁড়ালো যে, সে যেন কেমন ধাঁধা হয়ে গেল। ভিড়ের দলে কারো হাতে প্রলোভনের জাল, কারো মুখে রঙীন হাসি! ছেলেটি এই নূতনত্বের মোহে একটু একটু করে নিজেকে এনে সেই ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে' গেল।

কিন্তু ভিড়ের এমন স্বভাব যে সে তার কৌতূহল নিয়ে কখনো স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—সে ঠেলতে ঠেলতে চলতেই থাকে। তবে কখনো এগিয়ে যায়, কখনো বা পেছিয়ে পড়ে। এমনি ঠেলায় এগুতে এগুতে পেছুতে পেছুতে তারকনাথ একদিন দেখলে যে সে বাপের সে-দৃষ্টির প্রাচীর লঙ্ঘন করে অনেক দূরে এসে পড়েছে,—সেখান থেকে চট করে ফেরা যায় না! ফিরতে গেলে ভিড়ের বাঁধনে টান পড়ে। তাছাড়া ভিড় টানে, ডাকে, বলে, চলো, চলো! এর মধ্যে ফিরবে কি!

বছরখানেক পরে ভিড়ের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি জাগিয়ে তারকনাথ যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো, তখন সে ভিড়ের মধ্য থেকে বিস্তর পাওনাদারও গণ্ডগোল করে উঠলো। অর্থাৎ তারকনাথ তখন এদের দলে সৌখীন বলে নাম কিনে ফেলেছে—এবং সে নাম রক্ষা করতে গেলে যে পরিমাণ টাকার দরকার, তারকনাথের হাতে তত টাকা জোটবার অবসর বা সুযোগ তখনো ঘটে নি। কারণ, বাপের টাকা-কড়ির তহবিল থাকতো এই মেঘনাথের কাছে।

বন্ধুদের পরামর্শে আর পাওনাদারদের তাড়নায় তারকনাথ একদিন ভৃত্য মেঘনাথের কাছে এসে দাঁড়ালো; বললে,—টাকা চাই।

মেঘনাথ মনিবকেই মানতো, মনিবের ছেলেকে নয়। সে বললে,—কিসের টাকা?

তারকনাথ আম্‌তা আম্‌তা করে বললে,—কিছু দেনা করে ফেলেচি!

দেনা! মেঘনাথ ভড়কে গেল। এ কথাটা এ সংসারে ঢুকে অবধি সে কাণে শোনেনি কখনো! সে বললে,—বাবুর হুকুম না পেলে টাকা দেবো কি করে?

তারকনাথ চোখ রাঙিয়ে বললে,—না হলে তারা নালিশ করবে?

মেঘনাথ বললে,—বাবুকে বুঝিয়ে বলি।

তারকনাথ ভয় পেলে; ভয় পেয়েও গর্জ্জন ছাড়লো না। বললে,—খবরদার! বাবার কাণে যদি এ কথা যায়, তাহলে তোমার চাকরি থাকবে না!

মেঘনাথ হাসলো এ কথা শুনে; বললে,—তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না!

তারকনাথ আবার চোখ রাঙিয়ে উঠলো,—আমি বিষ খাবো, টাকা না দিলে।

মেঘনাথ বললে,—তাহলে বাবুকে বলি।

তারকনাথ মেঘনাথের হাত চেপে ধরে বললে,—আমায় রক্ষা করো।

মেঘনাথ বললে,—বদ্ সঙ্গ ছাড়ো, বদ্ খেয়ালি ছাড়ো।

তারকনাথ বললে,—ছাড়বো। কিন্তু টাকা?

মেঘনাথ বললে,—কত ?

তারকনাথ বললে,—প্রায় দেড় হাজার।

একটু ভেবে মেঘনাথ বললে,—দেবো।

তারকনাথ বললে,—বাবা জানবে না, অথচ দিতে পারবে?

মেঘনাথ বললে,—পারবো।

তারকনাথ বললে,—কি করে সে হবে? কি বলে খাতায় খরচ লিখবে?

মেঘনাথ বললে,—বাবুর টাকা থেকে দেবো না।

—তবে?

—আমি নিজে থেকে দেবো।

তারকনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—সে কি করে হয়?

মেঘনাথ বললে,—আমার স্ত্রীর গায়ে গহনা আছে দু'একখানা।

তারকনাথ ইতস্তত করতে লাগলো, বললে,—সে হয় না।

মেঘনাথ হেসে বললে—কেন হবে না! না হয় ধার বলে নিয়ো। পরে শোধ করো।

খানিক ভেবে তারকনাথ বললে—বেশ! হ্যাণ্ডনোট লিখে দেবো।

মেঘনাথ বললে—হ্যাণ্ডনোটের দরকার নেই। তুমি মনিব, আমি চাকর!

তারকনাথ বললে—তাও কি হয়! হ্যাণ্ডনোট নিতে হবে, না হলে আমি জেলেই যাবো, আটকাতে পারবে না।

মেঘনাথ বললে—তাতে পৌরুষ নেই। আচ্ছা, হ্যাণ্ডনোটই দিয়ো। মোদ্দা চাল শুধরে ফ্যালো। না হলে এর পর আর টাকার জোগাড় হবে কোথা থেকে!

তারকনাথ বললে—নিশ্চয়! সে কথা আর বলতে!

টাকাটা জোগাড় হলো। তারক হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলে। মেঘনাথ সেটা হাতে নিয়ে একটু হাসলো।

৩

মাসখানেক তারকনাথ বেশ রইলো। কিন্তু সে ঐ মাসখানেক মাত্র। একবার যে বাহিরে আনন্দের স্বাদ পেয়েছে, সে কখনো থাকতে পারে সে বাহির ছেড়ে? খুব সতর্কভাবে আবার সে বাহিরে আনাগোনা সুরু করলো।

কথাটা ক্রমে কেমন করে আভাসে-ইঙ্গিতে কর্তার কাণে পৌছুলো। তিনি মেঘনাথকে ডেকে বললেন—তারকটা বয়ে গেছে, শুনচি।

মেঘনাথ যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু বললে না।

কর্তা তারকনাথকে ডাকালেন, বললেন—এত টাকা পাচ্ছ কোথায়?

তারকনাথ বক্র দৃষ্টিতে মেঘনাথের পানে একবার তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে গর্জ্জালো—বেইমান!

কর্তা বললেন—কলকাতা ছেড়ে সবাই দেশে যাচ্ছি, তোমার লেখাপড়াও সাঙ্গ করো। ঢের হয়েছে! আর এখানে থাকা হবে না।

বাপের মুখের উপর কথা কইবে, এমন সাধ্য ছেলের ছিল না। ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর সত্যই একদিন কর্তা তারকনাথকে নিয়ে দেশে চলে গেলেন, কলকাতার কারবার দেখতে রইলো শুধু মেঘনাথ।

পাঁচ-ছ মাস পরে মেঘনাথের ডাক পড়লো দেশে। তারকের বিবাহ।

এই বিবাহ-ব্যাপারের পিছনে মস্ত এক কাহিনী ছিল।

জমিদার-বাড়ীর অনতিদূরে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। কথকতা ছিল তার জীবিকা। কর্তা দেশে ফিরে বাড়ীতে কথা দিলেন, আর এই কথকতার সূত্রে ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে জমিদার-বাড়ীর বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হলো। কথকের নাম কেশব ঠাকুর।

কেশব ঠাকুরের সংসারে তার স্ত্রী, এক ছেলে, আর মেয়ে—চুমকি। চুমকির বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর। ছেলেটি ছোট; সাত-আট বছর বয়স। কেশব ঠাকুরের পয়সার অভাব খুব বেশী। জমিদার-বাড়ীতে প্রবেশ-পত্র পেতে চারিধার দিয়ে সে-বাড়ীটিকে সে ঘিরে ফেললো। কথকতার সময় স্ত্রী-কন্যাও জমিদার-বাড়ীতে আসতে যেতে লাগলো। আজ মেয়ের একখানা কাপড় চাই, কাল স্ত্রীর কি একটা ব্রত, তার খরচ চাই—এমনি নানা আব্দারে কর্তাকে সে ব্যস্ত করতো। তার কথকতায় তুষ্ট হয়ে কর্তা তার সে আব্দার রক্ষা করতেন।

কেশব ঠাকুর বুদ্ধিমান জীব। কর্তার শরীর একটু অসুস্থ হলে মেয়েকে তাঁর সেবা করতে পাঠাতো, নিজে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত—অর্থাৎ এ সবগুলোর দিকে তার এতটুকু শিথিলতা ছিল না। এরই ফাঁকে চুমকির সঙ্গে কখন এক সময় যে তারকের আলাপ

পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, সে খবর কর্ত্তা রাখেননি, রাখবার দরকারও তিনি বোধ করেননি। কারণ, তারক দেশে এসে বাপের কাছে বসা, বাপের ফাই-ফরমাস খাটা এমনি কাজে বাপের মনের নষ্ট-বিশ্বাসটুকুকে আবার জাগিয়ে তুলছিল।

চুমকির সঙ্গে মেলা-মেশা তার চলেছে, এ সংবাদ কেশব ঠাকুর আর তার স্ত্রীর অজানা ছিল না। কেশব ঠাকুর বাড়ীতে বসে আছে, তারক হুম্ করে গিয়ে হাজির। এসে তার কথকতার তারিফ করতে লাগলো। চুমকি পাণ সেজে আনতো, কাছে বসতো। কত গল্পই হতো। কেশব ঠাকুরের স্ত্রীও হয়তো গল্প সুরু করে দিলে, নিজেদের অভাবের কথা, দেশের কথা, এমনি পাঁচ কথা; তারকও সে কথায় প্রাণ খুলে যোগ দিত। তারপর বেলা পড়ে আসচে দেখে ঠাকুর কথকতায় বেরিয়ে পড়তো, তারকের গল্প আর শেষ হতো না—কাজেই সে থেকে যেত! ক্রমে চুমকির মাও সংসারের কাজে উঠে যেত, চুমকি তখন তারকের সঙ্গে গল্প সুরু করে দিত।

আলাপটার সূত্রপাত হয় এমনি ভাবে, কিন্তু ক্রমে সে আলাপ নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল। কথকতা সেরে বাড়ী ফিরে ঠাকুর কতদিন দেখেচে, কলকাতার ইন্দ্রজাল-ময় কাহিনী আর বড়মানুষীর প্রলুব্ধ গল্পের বর্ণনায় তারক যেমন তন্ময়, চুমকিও ঠিক তেমনি আগ্রহে সে সব গল্পের রস পান করছে! ঠাকুর এ সবের মধ্যে নির্দ্দোষ সরল ভাবটুকু দেখতো। তবে তারক তরুণ যুবা আর চুমকি তরুণী। এই সব গল্পের ফাঁকে ফাঁকে দুজনের মন যে দুজনের দিকে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, এ খপর কেউ রাখেনি। চুমকিও বোধ হয় নয়! সরলা গ্রাম্য বালিকা সে!

তারপর একদিন চুমকির বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে গেল পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। কর্ত্তা খরচ দিতে রাজী হলেন। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো!

বরের এক আত্মীয়া রমণী গায়ে হলুদের দু'দিন আগে কুটুম্ব-বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর দুর্দ্দমনীয় সাধ হলো, বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে মেয়েটিকে একবার দেখে আসবেন। ঐ তো ও-পাড়ায় ঘর।

রোদ তখন পড়ে এসেছে। চুমকিদের বাড়ীতে কেউ ছিল না! তিনি এসে দাওয়ায় বসে ছিলেন, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা শব্দ হতে তিনি উঁকি দিয়ে দেখেন, চুমকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তারকনাথ!

তারক বলচে,—আজ বিদায় নিতে এসেছি, চুমকি। তুমি পরের হতে চলেছ, আর কি তোমায় দেখতে পাবো!

আত্মীয়াটি পল্লীগ্রামে এলেও সে ধরণের লোক নন্। তাঁর রস-বোধ আছে—বাংলা উপন্যাসও দু'চারখানা পড়ে ফেলেছেন; এ রকম কথার অর্থ উপন্যাস পড়ে যথেষ্ট তিনি বুঝতে পারেন। এ কথাটুকু শুনে বাকী তিনি কল্পনার সাহায্যে বুঝে নিয়ে পালিয়ে এলেন! এসে এই ব্যাপার রাষ্ট্র করে দিলেন।

লোকের মুখে মুখে এ কথাটা পল্লবিত হয়ে কর্ত্তার কাণে এসে যখন পৌঁছুল, তখন তিনি তার মধ্যে একটা বীভৎসতারও ইঙ্গিত পেলেন!

সঙ্গে সঙ্গে কেশব ঠাকুর ফোঁশ্ করে এসে পড়লো, বললে,—বরেরা বলেছে, ও মেয়ে নেবে না। উপায়?

কর্ত্তা কিছু জানতেন বলে জিজ্ঞাসা করলেন,—কারণ?

কেশব ঠাকুর বললে,—তারক বাবাজী—বলেই সে কেঁদে উঠলো!

বিশ্রী কুৎসিত জনরব আর সঙ্গে সঙ্গে এই কান্না! কর্ত্তা বিষম জ্বলে তারককে ডাকালেন; বললেন—কৈফিয়ৎ?

তারকনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো! কর্ত্তা বল-লেন,—বলো—

তারকনাথ বললে—চুমকি নির্দ্দোষ নিষ্পাপ!

কর্ত্তা বললেন—আর তুমি?

তারকনাথ কোন ভয় না রেখেই বললে—মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা মাত্র! আরো বললে, এর আগে সে কখনো চুমকির অঙ্গ স্পর্শ করেনি বা এ-ভাব তার মনে কখনো জাগেনি!

কেশব ঠাকুর বললে—ও মেয়ের উপায়? বলেই সে চোখের জল মুছলো।

কর্ত্তা বললেন,—থামো! তারকনাথকে বললেন—চুমকিকে বিয়ে করতে পারো?

তারকনাথ চুপ। কর্ত্তা হাঁকলেন—বলো।

খুব আস্তে তারকনাথ বললে—বিয়ে?

কর্ত্তা বললেন,—নয় তো কি! উপন্যাসের খেলা খেলতে এসেচো! বটে! কাপুরুষ! জীবনটা উপন্যাস নয়।

তারকনাথ বললে—বিয়ে! তা কেন?

কর্ত্তা বললেন—বিয়ে তোমায় করতেই হবে! অত-বড় মেয়েকে তুমি যখন স্পর্শ করেচ, তখন সমাজে কেউ কি আর ওকে বিয়ে করতে চাইবে।

সকলে চুপ। কর্ত্তা আবার বললেন,—যদি বিয়ে করতে না পারো, তবে কেন গিয়েছিলে তার কাণের কাছে ও-সব কথা বলতে? তার সামনে প্রলোভনের জাল পাততে?...তোমায় বিয়ে করতেই হবে চুমকিকে। না হলে...

কর্ত্তা এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বললেন,—নাহলে আমি পণ করলুম,—তোমায় এক পয়সা দেবো না, ত্যাজ্য-পুত্র করবো। আর ঢ্যাঁট্রা দেব যে, চুমকীকে যে বিয়ে করবে, আমার এই সমস্ত সম্পত্তি তার।

সেখানে আমলা-গোমস্তা দু'চারজন আরো জড়ো

হয়েছিল। কারো মুখে কথা ফুটলো না—সকলে চুপ। কর্ত্তা বললেন,—জবাব দাও। বিয়ে করতে পারবে?··· বিয়ে করবে?

তারকনাথ ঘাড় তুলে বললে,—করবো!

কর্ত্তা কেশব ঠাকুরকে বললেন,—যাও ঠাকুর। বন্দোবস্ত সব ঠিক রইলো। আমি গিয়ে এখন তোমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে আসিগে, চলো। পরশুই গায়ে হলুদ—আর বিয়ের দিনও ঠিক রইলো। শুধু বর বদল হলো। বর আমার কীর্ত্তিমান পুত্র শ্রীমান তারকনাথ চৌধুরী।

কেশব কর্ত্তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। কর্ত্তা বললেন,—ভক্তি রাখো। ওঠো, বাড়ী যাও।

মেঘনাথ দেশে আসতে কর্ত্তা তাকে সব কথা বললেন। শুনে মেঘনাথ বললে,—বেশ করেছেন। আপনার যোগ্য কাজ।

রাত্রে মেঘনাথের ঘরে মেঘনাথ শুতে যাবে, এমন সময় তারক এসে কেঁদে পড়লো; বললে,—আমায় বাঁচাও। তোমার কথা বাবা শোনেন—বাবাকে বলো। নাহলে আমার জীবনটা চরমার হয়ে যাবে। একটা হা-ঘরের মেয়েকে বিয়ে! চুমকি হবে আমার স্ত্রী!—না, না।

মেঘনাথ বললে,—ঠাণ্ডা হয়ে বসো,—বোঝো ব্যাপার। সমস্ত ঘটনা খুলে বলো দিকিন।

তারক তখন মেঘনাথকে সব কথা খুলে বললে; কিছুই গোপন করলে না। শুনে মেঘনাথ বললে,—বলো দিকি তবে, তুমি তাকে বুকে জড়িয়ে ঐ সব কথা বলেছ, সে-ও যদি তোমায় ভালোবেসে থাকে?

তারক বলে উঠল,—ছাই, ছাই! পাড়াগেঁয়ে ভূত মেয়ে—সে অত বোঝে কি! আর বুঝলোই বা···

মেঘনাথ বললে,—তাই যদি তুমি তাকে পাড়াগেঁয়ে ভূত বলেই জানো, কেন গিয়েছিলে তবে ওরকম কেলেঙ্কারী করতে! পাঁচজনের কাছে মেয়ের যে নিন্দে হলো···

তারক বললে,—তোমায় সব বলছি, বাবাকেও বলেছি—মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা! ওর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। এমনও মনে হলো যে ওকে ভালোবাসি; ও পর হয়ে যাচ্ছে! তাই। কিন্তু বিয়ে······তা হতে পারে না।

মেঘনাথ বললে,—তার মানে? বিয়ে করবে না, অথচ ভালোবাসবে...অর্থাৎ?

তারক বললে,—অর্থাৎ-টর্থাৎ নেই, হঠাৎ মনে হলো। ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম,—ওকে দেখে মনটা কেমন হয়ে গেল, তাই।

মেঘনাথ বললে,—তাই, এত-বড় অবিচার তুমি করতে চাইছো! তোমার দুর্ব্বলতার জন্য সে একধারে পড়ে থাকবে,—আর রাজ্যের লোক আঙুল দেখিয়ে যত কুৎসিত কথা বলবে, বিশ্রী ইঙ্গিত করবে! ওকে এ অবস্থায় যদি তুমি ত্যাগ করো, তাহলে ওর দশা কি হবে বলো দিকি? অথচ ও কি করেছে? ও তোমার গলা ধরে বলতে যায়নি যে, ওগো তোমাকে না পেলে আমি মরি!

তারক চটে উঠলো; রেগে বললে,—তুমি আর বড় বড় কথা শুনিয়ো না। তোমার কাছে নীতি শিখতে আসিনি।...বাবাকে তাহলে আমার হয়ে বলতে পারবে না?···কিছু টাকা ফেলে দিলে একটা পাত্রের অভাব হয় কখনো! এখানে না হয়, কলকাতায় হাজার হাজার পাত্র পাওয়া যাবে'খন।

মেঘনাথ বেশ শান্তস্বরে বললে,—বাবু আমায় সব কথা বলেছেন, আমার মতও জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছি, তাঁর যোগ্য কাজ তিনি করেছেন।

—খোসাহেব, খোসামুদে—বলে তারকনাথ উঠলো। বললে,—আচ্ছা, এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। আমারো দিন আসবে, আসবে একদিন। বলে সে চলে গেল!

তারপর বিয়ে হয়ে গেল। কর্ত্তা ঠিক বধূর যোগ্য আদরে-সম্মানে চুমাকে ঘরে নিলেন। গহনায় তার সর্ব্বাঙ্গ মুড়ে দিলেন—মা বলে ডেকে তাকে বুকে চেপে ধরলেন। গরিবের মেয়ে রাজরাণী হলো।

তারকের সঙ্গে তার মনের সম্বন্ধ কেমন দাঁড়ালো, বাইরের লোক তা জানতেও পারলো না; তবে বাইরে তারকের এতটুকু বিদ্রোহের ভাব কেউ দেখতে পেলে না। তার পর সংসার যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো। মেঘনাথ কলকাতায় চলে এলো কার-বার দেখতে, আর কেশব ঠাকুর সপরিবারে এসে জমিদার-বাড়ীতে ঠাঁই নিলে।

এর বছরখানেক পরে মেঘনাথের ঘরে কন্যাদায় আসন্ন হয়ে উঠলো। বিস্তর খুঁজে একটি পাত্র জুটলো—কলেজে পড়চে—থাকবার বাড়ী একখানি আছে; দেশে জমিজমাও কিছু আছে। তারা চেয়ে বসলো, দু'হাজার টাকা।

এখন এ টাকার জোগাড় হয় কি করে! স্ত্রীর গায়ের গহনাগুলি তারকের দেনা মিটুতে সে তো বহুকাল খয়রাৎ করে বসেছে—তারক এখনো সে টাকা দেয়নি! সে নিজে ফেরৎ না দিলে মেঘনাথ কখনো মুখ ফুটে বলতে পারে,—টাকাটা দাও গো, দরকার পড়েছে? প্রাণ গেলেও মেঘনাথ সে কথা বলতে পারবে না!

শেষে একদিন একটা সুযোগ ঘটল। কর্ত্তা আবার হঠাৎ কলকাতায় এলেন সপরিবারে।

মেঘনাথ চুমকিকে দেখলো। যৌবনের স্পর্শে তার রূপ উথলে উঠেছে বটে, কিন্তু মুখখানি কি এক বেদনায় ভরা! মেঘনাথের মনে পড়লো, তারকের সে রাত্রের সেই সব কথা। স্ত্রী বলে চুমকিকে সে কি গ্রহণ করেছে? চুমকির মুখ দেখে তা তো মনে হয় না। তবে কি সেই শাসন—সেটাকেই সে মনের মধ্যে বড় করে রেখেছে? চুমকি কি সে রূঢ় বিরূপ মনকে নিজের দিকে ফেরাতে পারেনি?

সে একদিন বললে,—চুমকি মা, তোমার মুখখানি এমন শুক্‌নো দেখচি, কেন? তবে কি…

কথাটা মুখে বেধে গেল। প্রশ্ন আর করা গেলো না। চুমকি মৃদু হেসে বললে,—মুখ আমার শুকনো হবে কেন কাকা?

ছেলেবেলা থেকেই চুমকি মেঘনাথকে গ্রাম-সম্পর্কে বলে,—কাকা। গলাটা একটু সাফ করে মেঘনাথ আবার বললে,—তারক যত্ন টত্ন করে তো মা?

ছোট্ট কথাটুকু! এ কথার জবাব মিললো না। তবে এই কথার আঘাতে চুমকি কতখানি মুষড়ে গেল, মেঘনাথের নজরে তা এড়াল না।

চুমকি চলে গেল—আর মেঘনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

সেই দিনই রাত্রে কর্ত্তা মেঘনাথকে ডেকে বললেন,—তোমার বাড়ী গেছলুম হে আজ বিকেলে। হ্যাঁ, তা তোমার মেয়ে শিবা যে বেশ বড় হয়েছে, দেখলুম। ওর বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখচো?

মেঘনাথ তখন সব কথা খুলে বললে। কর্ত্তা বললেন,—দু'হাজার টাকা! বেশ, ও টাকা আমি দেবো। ধার নয়। ও টাকা তোমার পাওনাও। এতদিন তুমি কাজ করছো, কখনো কিছু 'বোনাস' দিইনি তো। ভেবেছিলুম, এখন থাক্—মেয়েদের বিয়ের সময় দেবো, সাশ্রয় হবে, কাজে লাগবে।

মেঘনাথ যেন স্বর্গ হাতে পেলে! কৃতজ্ঞতায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না!

তার পর কথায় কথায় আরো তিন মাস কেটে গেল। কর্ত্তা এর পর আর কোনদিন টাকার কথা পাড়েন নি—মেঘনাথও মুখ ফুটে সে কথা তুলতে পারে নি।

এমনিভাবে আরো ক'মাস কাটবার পর হঠাৎ একদিন কর্ত্তার ঘরে মেঘনাথের ডাক পড়লো। তারক সেখানে উপস্থিত ছিল। মেঘনাথ আসতে কর্ত্তা বললেন,—দ্যাখো মেঘনাথ, তোমাকে আমি একটা কথা বলে রাখি। আমি মারা যাবার পর কি হয় না হয় আমি দেখতে আসবো না; কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি, আমার হুকুম রইলো, তারকের জন্য যে মাসহারা বরাদ্দ করে দিছি, তার উপর এক পাই-পয়সা ওকে কেউ দেবে না। ওর চাল-চলন আবার একটু অন্য ধরণের হয়েচে, দেখচি। কাল·

তারক ঘর থেকে সরে পড়বার উদ্যোগ করছিল, কর্ত্তা বললেন—দাঁড়াও।

তারক দাঁড়ালো।

কর্ত্তা বললেন,—কাল রাত্রে বৌমার হঠাৎ খুব অসুখ করে। আমারো কেমন ঘুম হচ্ছিল না, ঝীকে ডাকালুম। সে আমার পা টিপে দিচ্ছিল; হঠাৎ একটা কাতরানি শব্দ শুনে সে বলে উঠলো, কে কাঁদচে, কর্ত্তাবাবু! বলেই সে উঠে গেল, ফিরে এসে বললে, বৌমা মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন হঠাৎ,—খাটের কোণে লেগে মাথায় খুব চোট পেয়েছেন। আমি উঠে গেলুম,—গিয়ে দেখি, মাথা কেটে গেছে; আর দেরাজটা খোলা! কি ব্যাপার? বৌমা বললেন না! কিন্তু আমি তখনি খোঁজ নিলুম, তারক বাবু কোথায়? রাত্রে উনি বাড়ী ছিলেন না। অবশ্য কেউ কিছু না বললেও এটুকু বুঝচি, বাবুর এই প্রথম বাহিবাস নয়। ঝীয়ের মুখে শুনলুম, আজ দুদিন বৌমার জ্বর,—তার উপর উনি এসে দেরাজের চাবি চেয়েছিলেন, বৌমা শুনতে পাননি—তাঁরও তর্ সয়নি—বৌমার আঁচল থেকে চাবি নিয়ে তিনি দেরাজ খুলছিলেন,—দেরাজ-খোলার শব্দ পেয়ে বৌমা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন, চোর ভেবে চীৎকার করেন, তখন বাবু তাঁকে ধাক্কা দিয়ে একছড়া সোনার হার নিয়ে সরে পড়েন। ব্যাপারটা তখনি আমি জানতে পারি নি—আজ কথায়-কথায় সব কথা প্রকাশ হলো। কাল যে জানিনি, এটা তারক বাবুর সৌভাগ্য। নাহলে তখনি আমি পুলিশে খবর দিতুম। যাক্, আমার সাফ কথা—তুমিও সাক্ষী থাকো—বিষয়-সম্পত্তিতে তারকবাবুর যদি বিন্দুমাত্র লোভ থাকে, তাহলে এই চৌর্য্যবৃত্তিটা বাড়ীতে না করে বাহিরে বরং তার চেষ্টা দেখুন। নাহলে সমস্ত বিষয় আমি বৌমার হাতে দিয়ে যাবো,—আর ওঁর জন্য দুবেলা দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা শুধু থাকবে!…আর তোমাকেও বলি, তোমার উপর আর একটি ভার দিলুম, আজ থেকে নজর রাখবে, সদর-দেউড়ী যেন রাত দশটায় বন্ধ হয়, আর তার পর ভিতর-দিকে চাবি বন্ধ হবে, সে চাবি থাকবে তোমার কাছে। সকালে উঠে আমি দেখতে চাই, রাত্রে কে বাড়ীতে ছিল, কে ছিল না। তা দেখা হলে আমার সামনে চাবি খোলা হবে। বুঝলে? তারপর তারকের পানে চেয়ে বললেন,—তুমি এখন যেতে পারো।

তারক চলে গেল। মেঘনাথও চলে আসছিল,—কর্ত্তা একখানা ইন্‌সিওর-খাম তার হাতে দিয়ে বললেন, এতে দু' হাজার টাকার একটা ড্রাফ্ট আছে, খাতায় জমা

করো। এটা ভাঙিয়ে তুমিই রাখো গে, তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা।

কৃতজ্ঞতায় মেঘনাথের বুক উথলে উঠলো। সে কর্তার পায়ে পড়বে ভাবছিল, কিন্তু ভয় হচ্ছিল, কর্তা এ-সব উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি পছন্দ করেন না! সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—এখন আপনার কাছেই টাকাটা এনে দি। দরকারের সময় নিয়ে যাবো।

কর্তা বললেন,—নাঃে না, বোঝো না, আমার মন যা হয়েছে, সব সময় ভুল হয়ে যায়। কখন্ ভুলে যাবো আর তুমিও হাজার দরকার হলেও মুখ ফুটে চাইতে পারবে না···

মেঘনাথের মুখে খানিকক্ষণ কথা ফুটলো না। কর্তা বললেন,—খাতায় হুণ্ডিখানা জমা করে নাও, তারপর খরচ···দাঁড়াও, হঁ্যা, ওটা একটু অন্য-রকম করে লিখো'খন। আচ্ছা, খরচ লেখা এখন থাক্···মেয়ের বিয়ের দিনই নাহয় তাকে আশীর্বাদী বলে' খরচটা ফেলা যাবে। ও টাকা তারই তো প্রাপ্য, তোমার নয়। সেই ঠিক হবে। কি বল? আচ্ছা, এখন যাও···

কথাটা বলে' মেঘনাথকে কৃতজ্ঞতা জানাবার তিলার্দ্ধ অবসর না দিয়েই কর্তা সে ঘর ত্যাগ করলেন।

৫

তারপর মেঘনাথের সঙ্গে তারকের কথাবার্ত্তা এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। মেঘনাথকে দেখলে তারক ভিতরে ভিতরে গর্জ্জাতে থাকতো, আহত সাপের মত। এই সরকারটার সামনে তার মাথা বার-বার হেঁট করানো! বাপের উপর রাগ হতো খুব, মাঝে মাঝে ভাবতো, এই-সব অত্যাচারের প্রতিশোধ সে যদি তুলতে পারতো! কিন্তু কেমন করে তোলা যায়? কেমন করে?

প্রতিশোধের আগুন ঠিকরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়তো বেচারী চুম্‌কির উপর। সেই তো এ বেড়া আগুনে তার জীবনকে দগ্ধে তুলেচে! তার সঙ্গে যদি দেখা না হতো, তাহলে মনের সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেতো না, আর চুম্‌কিকে নিজের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধেও ফিরতে হতো না! তারপর,—ঐ মেঘনাথ যদি একটু মনে করতো! কর্তা তার কথা শোনেন,—কর্তাকে একটু যদি সে বুঝিয়ে বল্‌তো যে, কলকাতায় হাজার হাজার পাত্র মিলবে চুমকির জন্য—সেখান থেকে একটা ধরে এনে চুমকিকে তার হাতে তুলে দেওয়া···হাজারখানেক টাকার ওয়াস্তা বৈ নয়—হাজার টাকা দিলে কত পাত্র লালায়িত হয়ে ছুটে আসতো! তা নয়, সে সময় উনি সাধু মন্ত্রী সেজে বসলেন! কাপুরুষ পাজী মোসাহেব!

তারক ভাবলে, যাক্, কর্তা অমর নন,—একদিন তার দিনও আসবে। এখন গোলমাল না করে সয়ে যাওয়া যাক্, তার পর সে দেখে নেবে, ঐ কথক কেশব ঠাকুরকে আর তার পাড়াগেঁয়ে মেয়েটাকে!

চার-পাঁচদিন পরে এক কাণ্ড হলো। তখন গ্রীষ্ম-কাল। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। সদরের দোরের পাশে বাড়ীর মধ্যে একটা চাতাল ছিল, তার একটা জানালা ছিল রাস্তার দিকে। সেই জানলা খুলে তারি পাশে মেঘনাথ একখানা মাদুর বিছিয়ে পড়ে ছিল—ঘুম হচ্ছিল না মশার কামড় আর গ্রীষ্মের জন্য। এমন সময় খুব চাপা গলায় বাইরে থেকে কে ডাকলে,—মেঘনাথ দা!

মেঘনাথ চম্‌কে উঠলো। এ যে তারক! হ্যাঁ, এ তারি গলা!

তারক পথে দাঁড়িয়ে ডাকছিল,—মেঘনাথ দা! সদরের দোর তখন ভিতর থেকে তালা বন্ধ, আর সে চাবি মেঘনাথের কাছে।

মেঘনাথ চারিদিকে চেয়ে বললে,—এ কি! তুমি আবার বাইরে বেরিয়েছ এই রাত্রে? কর্তার হুকুম···

মিনতি-ভরা স্বরে তারক বললে,—নেমন্তন্ন গেছলুম, তারা ছাড়লে না, দেরী হয়ে গেল।

মেঘনাথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কর্তার যা হুকুম! সে যে কর্তার আদেশ কখনো অমান্য করেনি! আর এদিকে তারক···বেচারা তারক! যত দুর্ব্বৃত্ত হোক্ সে, তবু মাতৃহীন! আহা, অবুঝ বেচারা! হাজার দোষে দোষী হোক্, সে যে এখনো ছেলেমানুষ! গৃহিণীর মৃত্যুর দিনের সেই করুণ দৃশ্য তার মনের পটে জ্বলন্ত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠলো। বিছানায় মার শিয়রে বসে ছিল তারক—তার দুই চোখে দর-বিগলিত অশ্রু-ধারা! সে সময় মেঘনাথই তাকে বুকে চেপে নিয়েছিল!···ভুল পথে সে গিয়েছে বটে, অন্ধ ঝোঁকে কাঁটার বনে গিয়ে পড়েছে—তাই বলে তাকে কি রক্ষা করা হবে না? না, না! মেঘনাথের সমস্ত অন্তর আবেগের এক প্রবল ঝড়ে দুলে উঠলো, না, না। আহা! ও যে এখনো ছেলেমানুষ! নেহাৎ মাতৃহীন বেচারী!

কিন্তু কর্তার বিশ্বাস! অমন অগাধ বিশ্বাস! তিনি যে তারককে শোধরাবার জন্যই এ-সব গণ্ডী টানচেন। এ তো নির্ম্মম বিচারকের বিচার নয়, এ যে স্নেহশীল পিতার স্নেহের শাসন! তার মঙ্গলের জন্যই যে এ বেড়া, এ বন্ধনের সৃষ্টি! মেঘনাথ মুস্কিলে পড়লো। কি করবে সে—কি করবে?

ওদিকে তারক বললে,—দরজাটা খুলে দাও···

মেঘনাথ উঠে জানালার ধারে এলো, বললে,—আর

কখনো এমন কাজ করবে না, বলো? কর্ত্তার হুকুম জানো তো!

তারক বললে,—জানি। কি করবো? তারা ছাড়লো না। সেখানে বলতেও পারলুম না যে বাড়ীতে বাবার এই ব্যবস্থা। কথাটা কি ভালো শোনাতো?

মেঘনাথ বললে,—তুমি জানো, কর্ত্তার কথা আমি কখনো অমান্য করি না। আজ সে কথা অমান্য করচি শুধু তোমার জন্য। যে পাপ এতে হয়, তা মাথায় নিতে পারি, যদি তুমি কথা দাও যে, আর কখনো বাপের কথা অমান্য করবে না!

কাঁদ-কাঁদ স্বরে তারক বললে,—হ্যাঁ, তাই, তাই হবে—মেঘনাথ দা। লক্ষ্মীটি, তুমি দোর খুলে দাও। উপরে যেন কার সাড়া পাচ্ছি!

মেঘনাথ উঠে দোর খুলে দিলে অতি সাবধানে। তার মনে হচ্ছিল,সে যেন আজ মনিবের কি মহামূল্য মণি-রত্ন অপহরণ করতে চলেছে!…ঠিক তো, চোরই সে! চোরের চেয়ে কোন্-খান্‌টায় কম! সেও যে আজ মনিবের অত বড় অমূল্য বিশ্বাস চুরি করতে চলেছে! তার গা কেঁপে উঠলো, পা টলছিল।

দোর খোলা হতে তারক বাড়ীর মধ্যে ঢ়ুকলো; আর একটি কথা না বলে একেবারে সে উপরে চলে গেল। মেঘনাথ দোরে চাবি লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

৬

পরের দিন মেঘনাথ এসে তার ঘরে হিসাব-পত্তর লিখচে, এমন সময় কর্ত্তা মানসনাথ সেখানে এলেন। এসে বললেন,—চাবি তো খুলে দিলে কাল, কিন্তু ওকে সামলাতে পারবে?

মেঘনাথ স্তম্ভিত! সে ভারী অপ্রতিভ দৃষ্টিতে কর্ত্তার পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। এমন কুণ্ঠিত সে হয়ে পড়েছিল, যেন কত বড় অপরাধ করেছে! আর তারি লজ্জায় সে একেবারে মরমে মরে আছে! তার মুখে কোন কথা ফুটলো না!

কর্ত্তা বললেন,—আমি ওকে শাসন করতে পারি না মেঘনাথ, এই হয়েছে মুস্কিল! তবে ও বিগড়োলে,—যাঁর সন্তান ও, আমার কাছে ওকে গচ্ছিত রেখে যিনি স্বর্গে গেছেন,—তাঁর কাছে এর পর দেখা হলে আমি ওর সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দেবো? তাঁর যে বড় সাধ ছিল, তাঁর ছেলে মানুষ হবে!…

একটু থেমে কর্ত্তা আবার বললেন,—কালও যে রাত্রে ও বাড়ী ফেরেনি, আমি তা জানতুম। একটু ভাবনাও হচ্ছিল,আমার এমন কড়া শাসন মানবে না? এ ভাবনাও হচ্ছিল, তুমি তো চাবি খুলবে না আমার কথা ঠেলে! মাঝে মাঝে শুচ্ছিলুম, আর বাহিরের বারান্দায় এসে দেখছিলুম, ও এলো কি না। তুমি দরজায় চাবী দিলে, সে শব্দ আমার কাণে গেল। আমি ভাবলুম, তাইতো, এখনো আসচে না! কি হবে? এরপর যদি বাড়ী ফেরে, কি করে দোর খোলাবে! তোমায় জানি, তুমি দোর খোলবার লোক নও!…এই বলে কর্ত্তা একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মেঘনাথ তখনো মাথা নীচু করে,—মাথা তোলবার তার সামর্থ্য ছিল না। কর্ত্তা বললেন,—তারপর একবার বারান্দায় আসতে তোমার কথা শুনলুম! কাণ খাড়া করে রইলুম। যে কথা বলে তুমি দোর খুলে দিলে, তাও শুনলুম! শুনে সে কি আনন্দ হলো—যে, হ্যাঁ, তুমি আমার কথার উপরই নির্ভর করোনি, আমার মনের ভিতরটা সবই জেনে ফেলেছ।

মেঘনাথ বললে,—আমায় ক্ষমা করুন। আপনার কথা ঠেলেছি বলে সেই অবধি আমার মনে অশান্তি জেগে রয়েছে। তার চোখ ছল-ছল করে এলো।

কর্ত্তা বললেন,—তুমি ঠিক করেছিলে। ও অবস্থায় বাড়ীর দোর খুলে না দিলে ও তো জাহান্নমের খোলা দরজায় গিয়ে তখনি ঢুকে পড়তো।

এই অবধি বলে কর্ত্তা থামলেন; মিনিট দুই পরে বললেন,—পারলুম না ওকে শোধরাতে!…সেই বিয়েই কাল হলো!…কেন হবে? বৌমার কোন অপরাধ নেই। লক্ষ্মী!…হতভাগা যদি তাকে ভালো না বাসবে, তা হলে তাঁর তরুণ মনের সামনে অত-বড় প্রলোভনের ফাঁদ পাততে গেছলো কেন!…না, এর জন্যে যদি ও উৎসন্ন যেতে চায় তো যাক্! তাঁর সন্তান হয়ে নারীর অমর্য্যাদা করবে? আমি তো প্রাণ থাকতে তা সহ্য করতে পারবো না।

পরের রাত্রে আবার তাই ঘটলো। ঠিক তেমনি সময়ে তারক এসে আবার ডাক্‌লো,—মেঘনাথদা—

মেঘনাথ আজ রেগে উঠলো,বললে,—কাল ঐ কথার পর আজ রাত্রে আবার তুমি বাইরে আছ! আমি আজ দোর খুলবো না, কিছুতে নয়।

তারক মিনতির স্বরে বললে,—আর এই আজকের রাতটি শুধু। আর কখনো হবে না।

ইচ্ছা না থাকলেও মেঘনাথের মুখ দিয়ে রূঢ় কথা বেরিয়ে পড়লো। সে বললে,—তোমার কথায় বিশ্বাস কি? তারপর দুজনেই চুপ। খানিকক্ষণ পরে তারক বললে,—দোর খুলবে না তা হলে?

মেঘনাথের অন্তর চিরে কি করুণ আর্ত্তনাদ উঠলো! সেটাকে কঠিনভাবে চেপে কোনমতে গলা সাফ করে

সে বলে উঠলো,—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। আমি কর্ত্তা-বাবুকে বলে আসি।

তারক বললে,—না, না। তা হলে দোর খুলো না, খুলে কাজ নেই। এই পথেই আমি রাত কাটাতে পারবো। সে বেশ নিরাপদ হবে'খন।

মেঘনাথ বললে,—রাগ করো না ভাই, আমি এখনি আসচি। কর্ত্তাবাবুর মত করাবোই।

তারক বললে,—হ্যাঁ, তারপর এই রাত্রে রেগে তিনি আমায় যা-ইচ্ছে-তাই শোনান্, আর নিশুতি রাতে তাঁর ধমকে পাড়াপড়শী চাকর-বাকর সবাই জেগে উঠুক, এবং আমার লাঞ্ছনা চোখে দেখে সকলে মুখ টিপে হাসুক—সে হবে তামাসা বেশ, না? কিন্তু আমার ও তামাসা দেখানোর সখ সম্প্রতি নেই। আমি চললুম, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চাবি সামলে ঘুমোও।

আর এক মুহূর্ত্ত না দাঁড়িয়ে তারক তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে জানালার পাশ থেকে সরে গেল। ব্যথিত শরাহত আর্ত্ত জীবের মত মেঘনাথ তখনই উঠে চাবি খুলে পথে এসে দাঁড়ালো—সারা পথ জনহীন, স্তব্ধ। গ্যাসের আলোগুলো সার-সার জ্বলছে—হিম-জর্জ্জর রাতের মত ম্লান!···কোথায় তারক!

মেঘনাথের মনে হলো, তার এই নিদারুণ অবহেলা আর বর্ব্বর হৃদয়-হীনতার সাক্ষী হয়ে আলোর থামগুলো দীপ্ত চোখে স্তম্ভিত দৃষ্টি নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে!

অনেকক্ষণ পরে মাতালের মত পা দুটো টান্‌তে টান্‌তে টল্‌তে টল্‌তে সে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো—ঢুকে কলের মত তালায় চাবি এঁটে মাদুরে গা গাড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

৭

সকালে কর্ত্তার কাছে গিয়ে সদরের তালা-চাবি তাঁর পায়ের কাছে রেখে মেঘনাথ কাতর স্বরে বললে,—এর ভার আর কাকেও দিন্। এত বড় বিশ্বাসের যোগ্য নই আমি! সে শক্তির আমার অভাব।

কর্ত্তা বললেন,—কাল বুঝি তারক আবার অনেক রাত্রে এসেছিল?

মেঘনাথ বললে,—হ্যাঁ। কিন্তু আমি দোর খুলে দিইনি তাকে।···সে চলে গেল ঐ রাত্রে। চারিধার তখন নিশুত···

মেঘনাথের চোখের কোণে জল এলো।

কর্ত্তা খানিক স্তব্ধ থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন,—হতভাগা!···তার ভাগ্য! না হলে তার অভাব তো কিছু ছিল না!··যাক্! এখনো বাড়ী ফেরেনি?

—না, আমি তাকে খুঁজতে যাবো। তাই আপনার অনুমতি চাইতে এসেচি। বলে মেঘনাথ কর্ত্তার মুখের পানে চেয়ে রইলো, নিতান্ত অধীর আগ্রহ নিয়ে।

কর্ত্তা বললেন,—যেতে পারো। প্রাণ খুলে আমি এ অনুমতি দিতে পাচ্ছি না,—তবে তোমার কর্ত্তব্য-বোধে যদি যেতে চাও তুমি, তাতে আমার আপত্তি নেই।

কাঁদ-কাঁদ গলায় মেঘনাথ বললে,—না, আপনি আপত্তি করবেন না। আপনার আপত্তি থাকলে আমি স্বর্গেও যেতে পারবো না।

অচপল শান্ত স্বরে কর্ত্তা বললেন,—যাও।

মেঘনাথ বেরিয়ে গেল। এখানে-ওখানে পাঁচ জায়গায় ঘুরে সন্ধান নিয়ে-নিয়ে যেখানে তারককে পাওয়া গেল, সেখানে পা দিতে তার সারা অঙ্গ শিউরে উঠলো। ঘৃণায় দুঃখে সে যেন মরে গেল! এই বিশ্রী পল্লীর মধ্যে, এই ঘরে, ইতর দলের সঙ্গে—ছি!

মেঘনাথকে দেখে তারক বলে উঠলো,—কি! দোরে চাবি লাগিয়ে রাখবে না? আমার আবার আস্তানার অভাব!

মেঘনাথ তারককে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, ধরে বললে,—এসো ভাই, ঘরে এসো! রাগ করো না।

—সরে যা ইষ্টুপিড্,—বলে তারক নিজেকে মেঘনাথের গ্রাস থেকে সবলে ছিনিয়ে নিলে। মেঘনাথ সে অতর্কিত ধাক্কা কোনমতে সামলে নিয়ে ছল-ছল কাতর চোখে বললে,—চলো ভাই, বাড়ী চলো।

তারকের এক কথা,—না, যাবো না। মেঘনাথও নাছোড়-বন্দা। তখন একদল ইয়ার—তারা সেইখানেই ছিল,—তারককে টেনে পাশের বারান্দায় নিয়ে গেল। তারক একা,—ওদিকে এতগুলি ছোকরা, সবাই এক-জোট। এর ভিতর থেকে তারককে কি করে উদ্ধার করা যায় ভেবে কোনো হদিশ না পেয়ে মেঘনাথ আকুল হয়ে উঠলো।

এমন সময় একটি কিশোরী সে ঘরে প্রবেশ করলো,—তার মুখে একটা সিগারেট। মেঘনাথ তার পানে চেয়ে শিউরে উঠলো। কিশোরী সুন্দরী, তার মুখে-চোখে কিসের কালি এমন ঘন ছোপ মেলেছে যে তার পানে হঠাৎ চোখ পড়লে কি এক আতঙ্কে সমস্ত প্রাণ হাহাকার করে বলে ওঠে,—নারীত্বকে কি কালিতেই তুমি ডুবিয়ে দিয়েচো! প্রাণের মধ্য থেকে সমবেদনার একটা আর্ত্ত স্বর ডুকরে কেঁদে ওঠে! তার ঠোঁটদুটো যেন কে আগুনে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে! কিশোরী এসে পুরুষালি ঢঙে দাঁড়ালো, একটা হাত কোমরে রেখে; দাঁড়িয়ে মেঘনাথের পানে চেয়ে বললে,—আমার ঘরে গুণ্ডামি করতে এসেচো!

মেঘনাথ অত্যন্ত ভীত স্বরে বললে,—না।

রমণী গর্জ্জে উঠলো,—না তো কি! ধরপাকড় হচ্ছিল কিসের?

মেঘনাথ বললে,—তারককে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেচি।

রমণী বললে,—তা যাও না নিয়ে। আমরা কি তাকে খাঁচায় পুরে রেখেছি না কি? গোলমাল দ্যাখো না—যেন চোর পড়েছে! না, ডাকাত পড়েছে! আমরা তোমার তারককে বাক্স-বন্দী করে রাখিনি—সে চুনী নয়, পান্না নয়—কোম্পানির কাগজ নয়! কত তারক অমন পায়ে পড়ে পিছ্‌লে সরে যাচ্ছে! হুঁঃ! তারপরেই সে বারান্দার লোকগুলির উদ্দেশে বললে,—মাইরী ভাই সুবল, যে যেতে চায়, তাকে যেতে দাও! ধরে রাখো কেন? এ সব চেঁচামেচি আমার ভালো লাগে না।

একজন ছোক্‌রা ঘরে ঢুকে বললে,—আমরা কি ওকে আটকে রেখেচি না কি, পাঁচু? ও যাবে না—এও ছাড়বে না।

রমণী ওরফে পাঁচুবিবি বললে,—তারক, তোমার যা কাজ চুকিয়ে ফ্যালো ভাই। যেতে হয় যাও, আর না যেতে চাও তো গোলমাল মিটিয়ে নাও।

তারক তখন সদলে ঘরে ঢুকলো—ঘরে ঢুকে বললে,—আমি বাড়ী যাবো না।

মেঘনাথ বলে' উঠলো,—তোমাকে না নিয়ে আমি তো ফিরব না।

—বটে রে ইষ্টুপিড্‌! বলে তারক আক্রমণের উদ্যোগ করলে। পাঁচু বললে, না বাবু, ও সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে হয় তো বাইরে গিয়ে করো। এখানে দাঙ্গা করো তোমরা, শেষে আমি মরি থানা-পুলিশ করে।

—পাঁচু! বলে তারক পাঁচুর হাত ধরলে, বললে,—তুমি বুঝচো না!

পাঁচুর হাতের পানে সেই দণ্ডে মেঘনাথের নজর পড়লো। এ কি! ঐ ঘড়িওলা ব্রেশলেট—ও যে চুমকির জন্য এই চার মাস আগে কর্ত্তা কিনে দিয়েছেন সাহেবদের দোকান থেকে! সেও কর্ত্তার সঙ্গে গিয়েছিল। পছন্দ করবার সময় সেও যে হাতে করে নেড়েচেড়ে দেখে ওর কারিগরির কত তারিফ করেছিল!

রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। ভাবলো, যাই চলে! কিন্তু না, কর্ত্তার কাছে বড় মুখ করে সে বলে এসেছে, তারককে নিয়ে সে বাড়ী ফিরবে! তাছাড়া এ ব্যাপারের জন্ম দায়ী সে-ই। সে যদি রাত্রে সদর খুলে দিত, তাহলে কি তারক এখানে এসে ভিড়তে পায়!

পাঁচু বললে,—না ভাই, আমার পষ্ট কথা, এ-সব ফ্যাসাদ আমি ভাল বাসি না।...মনে আছে সেই মিত্তিরদের বাড়ীর সুধীরের কথা? সেও এমনি এ-বাড়ী থেকে কিছুতে নড়বে না, তার বাপ মিন্সেও ছাড়বে না। শেষে আমার নামে পুলিশ-কেশ জুড়ে দিলে! আমার গয়না নিয়ে টানাটানি। বাপ মিন্সে নালিশ করলে কি, না,—ছেলে তার মায়ের গয়না চুরি করে এনেছে! ছোঁড়াকে আর আমাকে পুলিশ তখন থানায় টেনে নিয়ে গেল। পাড়ায় একেবারে কি সে ছি-ছিক্কার! সে-ও এই রকম প্রথমে সরকার আসে সুধীরকে ধরে নিয়ে যেতে! সে মামলায় আমার কম পয়সা গলে গেছলো! কি বে-ইজ্জতী! মাগো! শেষে রেহাই পাই সুধীরকে ছেড়ে দিয়ে!

এ কথায় মেঘনাথের একটু সাহস হলো। সে বললে,—বাবুর হুকুম আছে, আমি ওকে নিয়ে যাবোই,—তা সে যেমন করে হোক্!

পাঁচু বললে,—আমি বাবা কিছু জানি না। সুবল, ফ্যাসাদ চুকিয়ে দাও ভাই। আমি এ-সব ঝামেলা ভালোবাসি না। বলে পাঁচু ঘর থেকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারের দলও সরে পড়লো।

তখন মেঘনাথ বললে,—ঘরে এসো তারক। শুনচো তো অপমানের কথা!

পাঁচুর ঐ-সব ইঙ্গিতে তারকের একটু রাগ ধরেছিল। তারপর বন্ধুর দল তাকে মেঘনাথের হাতে সমর্পণ করে সরে পড়লো; পাঁচুও তার তরফ নিয়ে একটা কথা বল্‌লে না!

মেঘনাথ বললে,—চলো।

তারক বললে,—যাবো। কিন্তু বাড়ীতে নয়। বাবার সামনে নয়। তুমি বাবাকে বলেচো এখানকার কথা?

মেঘনাথ বললে,—এখানকার কথা তিনি জানেন না।

তারক বললে,—কি বল্‌বে?

মেঘনাথ বললে,—আমার বাড়ী চলো। তারপর কর্ত্তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা করে তোমায় নিয়ে যাবো।...কিন্তু একটা কথা...

তারক বললে,—কি?

মেঘনাথ বললে,—ওর হাতে যে ঘড়ি-ব্রেশলেট রয়েছে, ওটা তুমিই দিয়েচো?

তারক বললে,—তার মানে?

মেঘনাথ বললে,—চুমকি-মাকে ঐ রকম গহনা কিনে দেওয়া হয়েছিল—তাই জিজ্ঞাসা করচি।

তারক বললে,—ও আমি নিয়ে যাবো। টাকা দেবার কথা ছিল, হাতে ছিল না, তাই...

মেঘনাথের মনে হলো, তাকে যেন হাজার বৃশ্চিকে পাকে-পাকে জড়িয়ে একসঙ্গে দংশন করলে! সে বললে,—ছি!

এমন সময় ঝড়ের বেগে পাঁচুবিবি ঘরে ঢুকে বললে,—তুমি তো চললে, আর একটু পরেই যে খাট আসবে, তার টাকাটা রেখে যাও। নবাবী করে অর্ডার দিয়ে

এসেচো, এখন তার টাকা চোকায় কে? সে এসে চেঁচামেচি করবে, আর...

মেঘনাথ দেখলে, এ এক ফাঁদ পেতেছে মন্দ নয়! সে বলে উঠলো,—কত টাকা?

দরজার পাশ থেকে সুবল বললে,—তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা; আর কুলি-ভাড়া যা লাগে।

তারক করুণ দৃষ্টিতে মেঘনাথের পানে চাইলে। মেঘনাথ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিলে! সে বললে,—ভাবনা কি! আমি ঘণ্টা দুই পরে এসে টাকা দিয়ে যাবো। বিলখানা নিয়ে তোমরা রেখো! তারপর তারকের হাত ধরে বললে,—চলে এসো।

তারক যন্ত্র-চালিতের মত মেঘনাথের সঙ্গে বাইরে এলো। সিঁড়িতে পা দেবামাত্র ঘরের মধ্যে একটা অট্টহাসি উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুর ব্যঙ্গ স্বর জাগলো,—ট্যাকে নেই ইন্দি, ভজোরে গোবিন্দি! তারক জ্বলে উঠে মেঘনাথের হাত ছিনিয়ে তিন লাফে এসে ঘরে ঢুকলো, বললে,—কি বললে?

পাঁচু বিছানার দিকে সরে গিয়ে বললে,—মারবে না কি? যে রকম করে এলে...

মেঘনাথও তারকের সঙ্গে সঙ্গে এলো, বললে,—চলে এসো ভাই। বলেই সে তারকের হাত ধরে ফেললে! তারক থমকে দাঁড়িয়ে বললে,—ছোট লোক!

তারকের সে মূর্ত্তি দেখে পাঁচু ভয়ে চুপ করে রইলো। তারক বললে,—খাটের টাকা দেবো না—কি করবে তুমি?

পাঁচু বললে,—কি আবার করবো? যারা খাট পাঠাচ্ছে, তারাই যা করবার করবে'খন। ওঃ! চোখ রাঙাচ্ছেন, ছাখো না! বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর!

তারক বললে,—চোপ রও!

মেঘনাথ তারকের হাত ধরে একরকম হিঁচড়ে তাকে সেখান থেকে বার করে নিয়ে এলো। সামনেই একখানা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল—তারককে তাতে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে ড্রাইভারকে সে বললে,—শ্যামপুকুর চলো।

মেঘনাথের বাড়ী শ্যামপুকুরে।

৮

তারককে নিয়ে মেঘনাথ নিজের বাড়ীতে এলো! ট্যাক্সিকে বিদায় করে সে তেল আর তোয়ালে এনে বললে, —নাও দিকি, চান করে ফ্যালো। চান করে দুটি খাও —খেয়ে এখানে ঘুমোও। বিকেলে বাড়ী নিয়ে যাবো।

তারক বললে,—তুমিও নেয়ে নাও।

মেঘনাথ বললে,—আমি—আচ্ছা, নেয়েই নি। নেয়ে খেয়ে আবার ওখানে যেতে হবে তো, খাটের দামটা দিয়ে আসতে হবে। নাহলে এখানে যদি আসে...

কথাটা কি বলে শেষ করবে, মেঘনাথ তো ভেবে পেলো না।

তারক বললে,—হ্যাঁ, ঐ আবার এক ফ্যাসাদ আছে। টাকা আছে তোমার?

চোখের কোণটা কুঁচকে তাচ্ছল্যের স্বরেই মেঘনাথ বললে,—সে হয়ে যাবে জোগাড়! তুমি চান্ করো তো!

খেয়ে-দেয়ে তারক বাহিরের ঘরে শুয়ে পড়লো, মেঘনাথ ছুটলো সেই নরকে খাটের দাম নিয়ে। মেয়ের বিয়ের জন্য কর্ত্তা যে হুণ্ডি খানা তাকে দিয়েছিলেন, সেটা ভাঙ্গানো হয়েছিল, তা থেকে টাকা নিয়ে সে ছুটলো।

সারা পথ তার অসহ্য ভাবনা হচ্ছিল, খাট এখনো যদি না এসে থাকে, তাহলে প্রতীক্ষার সেই অসহ্য অধীর মুহূর্ত্তগুলো কি করে কোথায় সে কাটাবে! ঐ কদর্য্য জায়গায়? কিন্তু তার ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন ছিলেন। পথে সে খানিকক্ষণ পায়চারি করতেই খাটের মুটে এসে উদয় হলো। তাদের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে তাকে আবার ঢুকতে হলো—উপর-তলার সেই ঘরে। সে ঘরে তখন দক্ষযজ্ঞের অভিনয় চলেছে।

রমণী পাঁচুবালার কর্কশ স্বর কাপুরুষগুলোর মিশ্র স্বরকে ছাপিয়ে ভর্ৎসনায় জেগে-জেগে উঠচে, আর কাপুরুষের দল তার রোষের আগুনে মিনতির বারি বর্ষণ করচে। কথাবার্ত্তা যা চলছিল, তা তারককে নিয়ে। তারকের নামটুকু মেঘনাথের কানেও একবার গেল। মেঘনাথ উপরে উঠে ঘরের সামনে দাঁড়াতে তারা চম্‌কে একেবারে স্তব্ধ হলো।

মেঘনাথ বললে,—খাট এসেছে। বিল দাও।

হাস্যের উচ্ছ্বাসে ঘরখানাকে প্রকম্পিত করে বিলোল ভঙ্গীতে পাঁচু উঠে দাঁড়ালো; তার পর বাইরে এসে বললে,—ওমা, এই যে,—খাট এসেচে যে! তারপর একজনকে লক্ষ্য করে বললে,—দেখলি রে ভোলা, তুই বলছিলি, খাট আসবে না! সরকারটা মানা করে দিয়ে আসবে'খন!

ভোলা অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বলে উঠলো,—না, না, মরদ-কা বাত্, হাতী-কা দাঁত! হাজার হোক, ভদ্দর লোক কথা দিয়েছে...

তাকে বাধা দিয়ে পাঁচু বলে উঠলো,—থাম্ বাবু, তোর আর ভদ্দর্ত্তার ব্যাখ্যানা শুনতে পারি না।

মেঘনাথ বললে,—কথাবার্ত্তা তোমরা পরে কয়ো বাছা। এখন খাট নাও, আর বিল দাও। দাম ফেলে আমি বিদেয় হই।

এ কথায় পাঁচু একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লে,

বললে,—ও ভাই, শোনো এসে, একেবারে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে দাওয়ান মশাই এসেছেন!

অপমানের ভয়ে মেঘনাথ পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। ইয়ারের দল খাট নামিয়ে নিয়ে কুলিকে বললে,—বিল্ দাও ঐ বাবুটিকে।

কুলিরা মেঘনাথের হাতে বিল দিলে মেঘনাথ দাম চুকিয়ে তাতে সই নিলে, তারপর ঝড়ের গতিতে সে বাড়ী ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

বাড়ী ফিরে সে দেখে, তারক বিছানায় বসে আছে, ঘুমোয় নি। তাকে দেখে তারক বললে,—টাকা দিয়ে এলে নাকি?

মেঘনাথ তার পানে না চেয়েই বললে,—হ্যাঁ।

তারক বলে উঠলো,—ভারী অন্যায় হলো। তার চেয়ে গোলায় গিয়ে মানা করে দিলেই ভালো হতো। খাটখানা না হয় তোমার ওখানে আপাততঃ আসতো; সে বেশ হতো। ওদেরও জব্দ করে দেওয়া যেতো।

মেঘনাথ বললে,—না, তাতে তোমার অপমান হতো।

তারক বললে,—বয়ে যেত! ওদের কাছে আবার অপমান! যেমন পাজী, তেমনি উপযুক্ত ওষুধ হতো তাহলে। ভারী ভুল হয়ে গেছে।

মেঘনাথ শান্ত স্বরে বললে,—যাক ভাই, যা হয়ে গেছে, তার তো আর চারা নেই। এখন শুধরে যাও দিকি। কি লোকের কি বংশের ছেলে তুমি, ভাবো। ওরা তো পথের কুকুর! চাল নেই, চুলো নেই, ওদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা হয় না তোমার? এখন থেকে প্রতিজ্ঞা করো, আর ও পথে পা দেবে না।

—আবার! বলে তারক এক মিনিট বাহিরের পানে তাকিয়ে রইলো, তারপর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে মেঘনাথের হাত ধরে কম্পিত স্বরে বললে,—তোমার এ উপকার কখনো ভুলবো না! তোমার হাজার টাকা আমি ধারি, তার উপর এটা। সব এবার শুধে দেবো। তুমি একখানা কাগজ আনো, আর একখানা এক আনার টিকিট, টাকার জন্য একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দি।

মেঘনাথ বললে,—থাক, থাক, এর জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। সে হবে'খন।

উচ্ছ্বসিত আগ্রহে তারক বললে,—না, না, আগে আনো কাগজ আর টিকিট, তারপর অন্য কথা।

মেঘনাথ বললে,—সে হবে'খন গো। এখন আর দেরী করে না, কর্ত্তার কাছে যাই। সেই সকাল থেকে তোমার খপরের জন্য তিনি অমনি হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন ওদিকে··

তারক বললে,—কি বলবে বাবাকে?

মেঘনাথ বললে,—তাই ভাবচি।

তারক বললে,—আমায় বাঁচিয়ে বলো। বাবা যে-রকম রাগী···

মেঘনাথ বললে,—কোনো ভয় নেই। আমায় তুমি শুধু কথা দাও যে আর ও পথ মাড়াবে না!

মেঘনাথের দুই হাত চেপে ধরে তারক বললে,—না, কখনো না। এই তোমার দুটি হাত ধরে বলচি। এবারকারের মত আমায় বাঁচাও।

—বেশ। বলে মেঘনাথ ঘরের কোণ থেকে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

৯

ফাঁড়া তখনকার মত কাটলো বটে, অর্থাৎ মেঘনাথের কথায় কর্ত্তা শান্ত রইলেন; কিন্তু তারকের বিরুদ্ধে কতকগুলো দুষ্ট গ্রহ দারুণ চক্রান্ত পাকিয়ে তুলছিল। হপ্তাখানেকের মধ্যে এক বিপদ ঘটলো।

মেঘনাথকে দেখে পাঁচু যে একটু শিউরে উঠেছিল—তার একটা কারণ সেই ঘড়ি-ব্রেশলেট্। সেটার পানে মেঘনাথের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বারবার ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল, সেটুকু পাঁচুর নজর এড়ায় নি। তাছাড়া এ-রকম ব্যাপারে আরো একবার সে ভারী বিপদে পড়েছিল,—বিলাস বাবুর কাছ থেকে একখানা জড়োয়া গহনা উপহার পেয়ে। সে-বাবুটির হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হলো, ছুম্ করে একছড়া মুক্তোর কলার এনে দিলেন, তারপর ছ'মাস না যেতেই বাবু হঠাৎ আবার ছুম্ করে এসে বললেন, বাড়ীতে ও-গহনাটার দরকার পড়েচে, ওটা দাও! ওর বদলে অন্য কিছু দিচ্ছি। পাঁচু কিন্তু সেটা ছাড়তে পারে নি। বাবুর মিনতি-সুর বজ্র-গর্জ্জনে ধ্বনিত হলো, তবু না। বাবু তখন এক ফৌজদারী মামলা জুড়ে ওয়ারেণ্ট বার করে সে গহনা আদায় করেন। মেঘনাথকে এখানে দেখে ভয়ে তার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল—এ লোকটা তারককে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, নাছোড়বন্দা হয়ে। সে যদি এখন ফন্দী করে মামলা জুড়ে দেয় ঐ গহনার জন্য! এ পথে রোজগার যেমন এক নিমেষে হয়, তেমনি লোকসান আর বিপদের আশঙ্কাও প্রতি মুহূর্ত্তে! কত সতর্ক হয়ে যে চলতে হয়, তা সেই অন্তর্যামীই জানেন! সে নাকি বড় বাহাদুর মেয়ে···

ইয়ারেরা তখনি এক উকিল ডেকে আনলো; তারপর শলা-পরামর্শের পর পাঁচুকে ফরিয়াদী করে পুলিশ কোর্টে এক মামলা রুজু হলো, তারক আর মেঘনাথের নামে। পাঁচুর নালিশ হলো এই যে, তারক তার ঘরে এসে জুলুম করতো; পাঁচু তাই তাকে সেখানে আসতে মানা করে। তারক সে মানা না শুনে চাকর মেঘনাথকে নিয়ে সেখানে আসে, প্রথমটা গাল-মন্দ চলে, তারপর দুজনে

মিলে তার ঘরের ছবি, আলোর বাল্‌ব্‌ আর আয়না ভেঙ্গে দিয়েছে, তাকেও নির্দ্দয়ভাবে লাথি-জুতো মেরে একেবারে রীতিমত জখম করেছে। প্রমাণ-স্বরূপ অঙ্গে সে আঘাতের নানা চিহ্নও আদালতে দেখিয়ে এলো।

আইনের বাঁধা কল—হাকিম শুধু তার চাকাটি ঘুরিয়ে দেবেন বৈ নয়। সেই বাঁধা কল থেকে অমনি শমন বার হলো ছুজনের নামে, পেনাল কোডের ৩২৩, ৪২৭, আর ৪৩৮ ধারা-মতে। তদ্বিরের পাকা চাপে শমন চাপা পড়লো,—তখন আদালতের কলে ওয়ারেণ্ট বেরুলো —এবং হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে পুলিশ এসে মানস-নাথের দোরে হানা দিল,—আসামী হায় ?

হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাবে সমস্ত বাড়ী ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কর্ত্তার কাণেও খবর পৌঁছুতে বিলম্ব হলো না। তিনি ব্যাপার জানবার পূর্ব্বেই তারক আর মেঘনাথ গ্রেপ্তার হয়ে থানায় চালান হলো। বাড়ীর অন্য লোক-জন পাছু-পাছু ছুটে গিয়ে জামিন দাঁড়িয়ে তাদের খালাস করে নিয়ে এলো।

তারপর এই মামলা এলো আমার হাতে। আর সেই তখন থেকেই মেঘনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়।—

এইখানে বাধা দিয়া স্ত্রী বলিলেন,—সে মামলায় হলো কি ?

আমি বলিলাম,—ফেঁশে গেল : পাঁচুবিবি যে কটা সাক্ষী ঐ দল থেকে ঠিক করেছিল, তারা তো সব মিথ্যা সাক্ষী। ও-সব জায়গায় যারা কাঙালের মত ফেরে, তাদের বুদ্ধির দৌড় আর কতটুকু ! জেরার ভয় ছিল, —তাছাড়া গহনার ব্যাপার নিয়ে আমরা নালিশ করবো বলে ভয় দেখাতেই তারা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। তদ্বিরের অভাব হলো ! পাঁচুও মচ্‌কালো। সে আর আদালতে হাজির হলো না। মামলা গেল কেটে।

স্ত্রী বললেন,—নালিশ করে তোমরা সে ব্রেশলেট আদায় করলে না কেন ?

আমি বলিলাম,—ওরা রাজী হলো না ! তাছাড়া কর্ত্তার এমন অসুখ হলো যে কোন মতে আদালতের হাঙ্গামা কাটাতে পারলে এরাও বাঁচে ! সেই সময় কর্ত্তার কাছেই পরিচয় পাই, মেঘনাথ কত বড় বিশ্বাসী আর তার উপর কর্ত্তার কতখানি নির্ভর ! কর্ত্তা তো কাজ-কারবার কিছুই দেখতেন না, যা-কিছু ভার ছিল মেঘ-নাথের উপর। যদি মনে করতো তো আজ মেঘনাথ মোটর চড়ে সহরের বুকের উপর দিয়ে সতেজে চলতে পারতো।

স্ত্রী বললেন,—তারপর ?

আমি বলিলাম,—তারপরের ব্যাপার বড় করুণ !

১০

—কর্ত্তার মনে ছেলের জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা কাঁটার মত বিঁধে ছিল,—বেদনায় সমস্ত অন্তর তাঁর টন্‌টন্‌ করে উঠতো। যখন অসহ্য বোধ হতো তখন গুম্ হয়ে থাকতেন ; কারো কাছে সে বেদনা প্রকাশ করতেন না। এর উপর যখন ঐ পতিতা নারী-সম্পর্কিত মামলার বিশ্রী ব্যাপার পাড়ায় হৈ-হৈ করে এসে দেখা দিলে, তখন তিনি তার আঘাত সহ্য করতে না পেরে রোগশয্যা গ্রহণ করলেন। মেঘনাথ তখন কায়-মনে প্রভুর রোগশয্যার পাশটিতে এসে আশ্রয় নিলে,—কোথায় পড়ে রইলো তার নিজের সংসার-চিন্তা, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, তারকের উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি !

কর্ত্তার রোগটা দাঁড়ালো শেষে অ্যাপোপ্লেক্সি ! মাসে একবার হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়, তাতে এমন কাহিল হয়ে পড়েন যে, তার ধাক্কা সামলাতে এক মাস লাগে। কিন্তু সারবার জো কি ! মাসখানেকে যেই একটু ওঠবার সম্ভাবনা হয়, অমনি আবার মূর্চ্ছা দেখা দেয়। ডাক্তার বলে গেল, জীবন-ঘড়ির কল-কব্জা আগাগোড়া বিগ্‌ড়েচে, এ যা চলছে, কোনমতে দম খেয়ে, তেল পেয়ে—যে-কোন মুহূর্ত্তে ক্যট্‌ করে স্প্রাং কেটে একদম বিকল হতে পারে ! মেঘনাথ অকূল পাথারে পড়লো—এত বড় এষ্টেট ···দান-খয়রাতির উপর কতগুলো ছোট সংসার নির্ব্বাহ্নাটে চলে যাচ্ছে—এ কল থেমে গেলে অনেক কলই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হবে তো !

কর্ত্তার পাশটিতে বসে বসে সে অনেক কথা ভাবতো, —নিজের কথা, তারকের কথা, চুমকির কথা ! তারকের সম্বন্ধে তার সন্দেহ হতো—যে-রকম হালকা মন তার, অসম্ভব তার পক্ষে পুরানো দল ছেড়ে পুরানো পথ ছেড়ে ঠিক পথে চলা। তবু সেদিকটায় নজরও সে মাঝে মাঝে রাখছিল।

অসুখের মধ্যে কর্ত্তা একদিন মেঘনাথকে বললেন,—ভালো কথা। তোমার মেয়ের বিয়ের কি করলে ?

মেঘনাথ বললে,—আজ্ঞে, আপনার অসুখের জন্য ও-সব কথা বন্ধ রেখেচি।

কর্ত্তা বললেন,—পাগল হয়েচো তুমি ! আমার এ অসুখ সারবার নয়। তুমি বিয়েটা দিয়ে ফেলো। আমি দেখে যেতে চাই।

এ কথার দারুণ ইঙ্গিত এমন করুণ স্বরে বেজে উঠলো যে মেঘনাদ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার চোখের সামনে থেকে যা-কিছু আলো-হাওয়া সব যেন চকিতে কোথায় উবে গেল ! একটা জমাট অন্ধকার আর গুমট এসে নিমেষে দুনিয়ার যত কিছু আলো আর হাওয়ার বুকের উপর হিড় হিড় করে কালো পাথরের একখানা ভারী আবরণ টেনে

দিলে! কর্ত্তা বললেন,—তারকের কিছুই করতে পারলুম না। ও ভালো হবে না, হতে পারবে না। যাক—কেন ভাবা? কেউ কারো ভালো-মন্দ নির্দ্দেশ করে দিতে পারে না। চেষ্টা করেছি, কিছু হলো না। বলে তিনি একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর আবার বললেন,—তবু দেখো। তোমার ভরসা…তাই বা কি করে হবে? ওকে যদি সুবুদ্ধি দিতে যাও, ও কি তা কাণে শুনবে? তুমিই তাহলে ওর পরম শত্রু হবে। যাক, মিছে ভাবা! …ভালো কথা, তুমি তোমার মেয়ের বিয়ের ঠিক-ঠাক করো। দেরী করো না।

এরপর মেয়ের বিয়ের জন্ত আর অপেক্ষা করা মেঘনাথ উচিত মনে করতে পারলো না। কিন্তু একটা মুস্কিল ছিল। সেই হুণ্ডীর টাকা ভাঙ্গিয়ে সে তো পুরোপুরি দু' হাজার টাকা মজুত রেখেছিল—তা থেকে তারকের খাটের ব্যাপারে দাম-বাবদ তিনশোর উপর খরচ হয়ে গেছে। অথচ মাহিনার টাকা-কড়ি থেকে এমন কিছু বাঁচানো যায় না, যা দিয়ে পূরিয়ে তুলবে! এখন সে টাকা আসে কোথা থেকে? এদিকে কর্ত্তা প্রত্যহ তাগিদ দিচ্ছেন, দিন স্থির করো…!

অগত্যা মেঘনাথ গিয়ে ব্যাপারখানা তারকের কাছে খুলে বললে। শুনে তারক বললে,—তাই তো, এ কথা আগে আমায় বলনি! তাছাড়া ও খাটের দাম দিতে তোমাকে আমি বারণ করেছিলুম, তুমি শুনলে না। মোদ্দা, আমার জন্যই খরচ হয়েছে তো…তা উপস্থিত আমি দিতে পারছি না। তুমি কোনোখান থেকে জোগাড় করো, এর পরে আমি শুধে দেবো।

মেঘনাথ বললে,—জোগাড় করা সহজ হবে কি?

তারক বললে—ভালো কথা, এক কাজ করো। বাড়ী ভাড়ার যে টাকা আদায় হয়ে আসচে, তা থেকে তিনশো টাকা আমার নামে নয় হাওলাত বলে নাও, তারপর আমিই সেটা আস্তে আস্তে শুধবো।

মেঘনাথ বললে,—কর্ত্তাকে কি কৈফিয়ৎ দেবো?

তারক বললে,—তিনি কি আর খাতা দেখতে যাচ্ছেন এই শরীরে?

এই ভরসাতেই তারক এ কথাটুকু বলেছিল; কিন্তু মেঘনাথ তাতে রাজী হলো না।

তারক বললে,—আরে, টাকাটা না হয় নাই জমা করলে! এরপর আমার কাছ থেকে পেলে জমা করো, ব্যস, চুকে যাবে! এ তো আমারই নেওয়া—আমি হাত-খরচের টাকা থেকে ক্রমে ক্রমে শুধে দেবো, না হয় দিন দশ-বারোর মধ্যে আর কোথাও থেকে ধার করে তোমায় দিয়ে দেবো।

তারক অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, অথচ ঐ টাকার জন্ত বিবাহের দিন পেছিয়ে দিলে কর্ত্তা ব্যাপার-খানা জেনে ফেলবেন! তাইতো—

কিন্তু না, না, না! কর্ত্তার টাকা তাঁর অজানতে এমনভাবে নেওয়া…? না, এতবড় বিশ্বাসঘাতকের কাজ তার দ্বারা হবে না, মেয়ের বিয়ে না হয় যদি, তবু না!

বর-পক্ষকে মিনতি জানিয়ে একটু সময় সে চেয়ে নিলে, তারা রাজী হলো।

এবং একদিন মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের পরদিন মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে মেঘনাথ কর্ত্তার কাছে আসবে প্রণাম করতে, এমন সময় খবর গেল, ভোর থেকে কর্ত্তার অসুখ ভারী বেড়েচে। কোথায় রইলো তখন বাসি বিয়ে, মেয়ে-বিদায়! মেঘনাথ কম্পিত বুকে ছুটলো কর্ত্তাকে দেখতে। রাত্রে কর্ত্তার কাছে সে যেতে পারেনি, কর্ত্তাও মানা করেছিলেন। তবু কর্ত্তার জন্য নিবেদন করে খাবার সে এক ব্রাহ্মণের হাতে সন্ধ্যাবেলাতেই পাঠিয়েছিল। খবর পেয়েছিল, কর্ত্তা খুব হৃষ্ট মনে সে উপহার গ্রহণ করেছেন, আর মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

মেঘনাথ ছুটে এসে দেখে, বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমেছে—সারাদিন কল-চোঙা নানা যন্ত্রপাতি ছুঁচ ফোঁড়া নিয়ে ডাক্তারের দল হিমসিম খেয়ে গেল। কিছু ফল হলো না। সন্ধ্যার ঠিক পরক্ষণে কর্ত্তা ইহলোকের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে কোন্ অজানা লোকে যাত্রা করলেন!

এই মৃত্যুর ফাঁক পেয়ে এমন দারুণ অশান্তি চৌধুরী-পরিবারে শত্রু-বাহিনীর মত ঢুকে পড়লো যে, কর্ত্তার সুরক্ষিত দুর্গের অধিবাসীদের পক্ষে সেটাকে বাস্তব বলে অনুভব করতে কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

এই মৃত্যু-ব্যাপারের পর মেঘনাথের অদৃষ্ট-চক্র কোন্ রন্ধ্র দিয়ে কোথায় তাকে টেনে নিয়ে চললো, সে যেন একটা স্বপ্নের ব্যাপার! তবে এটার সূত্রপাত হলো চুমকিকে নিয়ে।

উপলক্ষ, কর্ত্তার মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে চুমকির মেঘনাথের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাওয়ার সময় কর্ত্তার কথায় সাজসজ্জা করে চুমকি যখন তাঁর ঘরে এলো তাঁকে প্রণাম করতে, কর্ত্তা তখন তন্ন-তন্ন করে চুমকির সজ্জাভরণ দেখতে লাগলেন। ঘড়ি ব্রেশলেটের কথা উঠলো—সেটা কেন পরা হয়নি? পরে এসো…। এ কথায় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ক্রমে চুমকিকে প্রকাশ করতে হলো যে, তারক সেটা নিয়ে গেছে, তার এক বন্ধু দেখতে চেয়েছিল, বন্ধুর স্ত্রীর জন্ত ঠিক ঐ প্যাটার্ণের একটা গড়াবে, তাই।

চুমকি চলে গেল নিমন্ত্রণ রাখতে, আর তার অসাক্ষাতে

ডাক পড়লো তারকের। হুকুম হলো, গহনা কে বন্ধু নিয়েছে, তাকে চিঠি লেখো, গহনা এখনই ফেরত চাই। এতদিন গহনা আটকে রেখে এ কেমন বন্ধুত্ব করা! কর্ত্তার মনে সন্দেহ যে জাগছিল না, এমন নয়, এ কথাও তিনি বললেন। তারক প্রথমে চিঠি লেখায় রাজী হয়ে সরে পড়ছিল, কর্ত্তা বললেন,—উঁহু, এইখানে বসে লেখো দরোয়ান যাক্ সে চিঠি নিয়ে গহনা আনতে। তখন তারক একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

রাত্রে চুমকি নিমন্ত্রণ থেকে ফিরলে কর্ত্তা তাকে ডাকালেন, ডাকিয়ে স্পষ্টই বললেন,—বৌমা, তুমি এ বাড়ীর গৃহিণী। ঐ বাউণ্ডুলে হতভাগাকে দেখো। সম্পত্তি তোমার, ওকে হাতে তুলে দেবে তবে ও পাবে—এই আমার আদেশ। কোনদিন স্বামী বলে ও যদি তোমার মনে শ্রদ্ধা জাগাতে পারে, তখন দান-পত্র করে এ সম্পত্তি ওকে ইচ্ছা হলে দিতে পারো। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি কল্‌কাতার কতকগুলো বদ্ ইয়ার আর বদ্ স্ত্রীলোকের পায়ে ডালি দেবার জন্য আমি যখের মত এতদিন রক্ষা করে আসিনি। আর তোমার সব কাজে পরামর্শ দিতে রইলো ঐ মেঘনাথ। তাকে তুমি বিশ্বাস করো,—তার মত এ পরিবারের হিতৈষী বন্ধু তুমি আর কাকেও পাবে না।

চুমকি তো অবাক! সে বেচারী খায়-দায়, পড়ে থাকে ঘরের একটি কোণে। তারক স্বামী বটে—বিবাহ হয়েছে, তাই স্বামী। না হলে স্ত্রীর দাবী, স্ত্রীর অধিকার নিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে যাবার স্পর্দ্ধা কোনদিনই হয় নি! সেই চুমকি হবে এত বড় রাজ্যের অধীশ্বরী! আর তারক—তারই কৃপালু ভিখারী! এর চেয়ে বড় পরিহাস দুনিয়ায় আর কি হতে পারে?

কিন্তু এ-সব কল্পনাতেই রয়ে গেল। হঠাৎ এক দিন কর্ত্তার মৃত্যু হলো; বিষয়-সম্পত্তির কোন ব্যবস্থাই করা হলো না। কাজেই উত্তরাধিকার-সূত্রে তারক হলো তার একমাত্র মালিক।

কর্ত্তা মারা যাবার পর তারক পূর্ব্ব-মূর্ত্তিতে জেগে তো উঠলোই, তা ছাড়া তার মেজাজে তখন এমন রৌদ্র রস ফুটলো যে তার আঁচের প্রাখর্য্যে প্রথমে জ্বললো চুম্‌কি, তারপর মেঘনাথ।

সেদিন দুপুর থেকে কর্ত্তার খাস্ বৈঠকখানায় ইয়ার-দের নিয়ে প্রকাণ্ড মজলিস চলেছে,—গান আর পান-ভোজনের ঘটা এমন জমলো যে কিছুর আর বাচ-বিচার রইলো না। চাকর-খানসামারা ফরমাস খাটতে খাটতে হায়রাণ হয়ে গেল,—চুম্‌কির সেদিন পুরোনো জ্বরটা আবার খুব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। মধ্যে মধ্যে তার জ্বর হচ্ছিল, কেউ সে খপর রাখ্‌তো না। কর্ত্তার চোখে তার শুষ্ক মূর্ত্তি দৈবাৎ ধরা পড়লে ডাক্তার আসতো, ওষুধ আসতো। এখন কর্ত্তা নেই,—কাজেই সে সব হাঙ্গামার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

জ্বরের ঘোরে অচৈতন্যের মত চুম্‌কি তার ঘরে পড়ে ছিল। মেঘনাথ কি-একটা কথা বলতে আসছিল,—এ অবস্থা দেখে সে চম্‌কে উঠলো। বাইরে উৎসবের ঐ উদ্দাম নৃত্য, আর এখানে—

সে তখনই বাইরে এসে হীরুকে ডাকলে, বললে,—শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্ দিকি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজছিল। হীরু বললে,—দাদাবাবু তাকে হোটেলে যেতে বলেছে গরম কাট্‌লেট ভাজিয়ে আন্‌তে।

মেঘনাথ জ্বলে উঠে বললে,—রেখে দে তোর কাটলেট। আগে ডাক্তার বাবুর কাছে যা,—বৌমার বড্ড জ্বর।

হাজার হোক্, হীরু কর্ত্তার আমলের লোক তো! বাবুদের জন্য কাটলেট এনে তাঁদের মন-জোগানোর চেয়ে বৌমার অসুখে ডাক্তার ডাকতে ছোটাই তার দরকার, এটা সে বুঝলো; তাই সে তখনি ছুটলো ডাক্তারের বাড়ী।

যথাসময়ে ডাক্তার এলো, প্রেসকৃপশন হলো; হীরু আবার চল্‌লো ওষুধ কিন্‌তে। বাবুরা বৈঠকখানায় তখন কাটলেটের দেখা না পেয়ে রেগে গরম হয়ে উঠেছেন। নতুন কর্ত্তাবাবুর ঝাঁজালো সুরে ডাক চলেছে ক্রমান্বয়ে,—হীরু হীরু, হীরে···

কোথায় হীরু? হীরু তখন ডিস্‌পেন্সারীতে।

উপরে বৌমার ঘরে মেঘনাথের হাতে ওষুধের শিশি দিয়ে এসে হীরু ভাবছিল, এবার যাবে কি হোটেলে,—এমন সময় এক বাবু তাকে দেখে বললেন,—এই যে হীরু। কাটলেট এনেছিস?

হীরু বললে,—না। আনতে যাচ্ছি।

বাবুটি বললেন,—আনতে যাচ্ছিস্! এখন?

তারক ভিতর থেকে বলে উঠলো,—কি হয়েছে হে?

বাবুটি বললেন,—তোমার খানসামা এখন যাচ্ছেন কাটলেট আনতে। এতক্ষণ তাঁর ফুরসৎ ছিল না!

—এখনো যায় নি?—বলে' তারক সক্রোধে বাইরে এলো। বৈঠকখানায় তখন কে নাচের সঙ্গে গান ধরেছে,—

চুনরিয়া লাল রঙি দে—

তারক বাইরে এসে হাঁকলো,—এখনো যাস নে তুই?

হীরু বেশ সহজভাবেই জবাব দিলে,—না। এই যাচ্ছি।

তারক গর্জ্জন করে উঠলো,—এতক্ষণ কি নবাবি করছিলি হতভাগা?

হীরু বললে,—বৌমার অসুখ, ডাক্তার বাবুর কাছে গেলুম—তার মুখের কথা মুখেই রইলো—

তারক এগিয়ে এসে তার চুলের ঝুঁটি ধরে বললে—আমার হুকুম অমান্য করে তোর কোন্ মনিবের আজ্ঞা মাথায় তুলতে গিয়েছিলি!

হীরু বলিল,—সেটা বেশী দরকারী।

—আবার মুখের ওপর কথা! বলে তারক ঠাস্ করে তার গালে এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলে। হীরু এটার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ঠিক্‌রে শান-বাঁধানো উঠানে মুখ থুবড়ে পড়লো। আর তার উপর তারকের প্রহার চললো সমানে, হুঙ্কার আর গর্জ্জনের সঙ্গে।

শব্দ শুনে বাড়ীর লোক-জন ছুটে এলো। মেঘনাথও এলো। তাড়াতাড়ি তারকের হাত থেকে হীরুকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে,—এ কি এ?

তারক বললে—অবাধ্যতার শাস্তি।

মেঘনাথ বললে,—কি অবাধ্যতা করেচে?

তারক বললে,—তোমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে, না কি? ছোটলোক পাজী! সব আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে বসেচো, বটে!···ও সব আর চলছে না! যে যেমন, সে তেমনি থাকবে, এই আমি দেখতে চাই।

মেঘনাথ গম্ভীর স্বরে বললে,—তারক···

তারক রূঢ় স্বরে বললে,—বাবু বলো।···তারক!··· আমি তোমার মনিব, এ কথা ভুলে যেয়ো না।

মেঘনাথ কোন জবাব দিলে না, গম্ভীর দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তের জন্য তারকের মুখের উপর নিবদ্ধ করে হীরুকে ধরে তুললে, বললে,—ওঠো হীরু! কলতলায় এসো। ঠোঁট্ কেটে রক্ত পড়চে—দুটো কুলকুচি করবে এসো।

অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে হীরুর হাত ধরে মেঘনাথ তাকে নিয়ে কল-ঘরের দিকে চলে গেল। ভালো করে আপনার তেজ দেখাবার অবসর পেয়েও তেমন করে সেটা দেখানো গেল না বলে তারক কতক নিরাশ চিত্তে বন্ধু-মজলিসে ফিরে গিয়ে বসলো।

তারপর গৃহে বন্ধুদের উৎসব-আনন্দ আর ফুরোয় না! তবে এর ধুম চলে রাত আটটা ন'টা অবধি; তারপরই বাহিরের আকর্ষণে একসঙ্গে কোথায় যে এরা অন্তর্ধান হয়ে যায়, তখন বাড়ী এমন স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে দেখে মনে হয় না, একটু আগে এই-খানেই আমোদ-প্রমোদের অমন বন্যা বয়েছিল।

চুমকির অসুখ বাড়ের মুখেই চলেছিল,—তার জন্য বাবুদের আমোদ-প্রমোদের কমতি হয়নি। মেঘনাথ আর হীরু সমস্ত প্রাণ-মন রোগীর সেবায় উৎসর্গ করে দিলে। হিসাব-নিকাশের কাজ অন্য সরকার দিয়ে চলতে লাগলো, মেঘনাথের সে দিকে মুক্তি মিলে ছিল। কর্ত্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই টাকার তহবিল নতুন বাবুর খাশ-দখলে গেল। চুমকির অসুখে ঔষধ-পথ্যের কতক দাম সরকারী তহবিল থেকে আসছিল, কতক মেঘনাথ নিজের গাঁট থেকে জোগান দিচ্ছিল। কিন্তু সেবার জামাই-বাড়ীতে একটা ভারী রকমের তত্ত্ব পাঠানোর হাঙ্গাম পড়লো, তখন তার পক্ষে পয়সা জোগানো এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাজেই একদিন সে আবার মাথা নত করে তারকের দরবারে হাজির হলো, বললে,—কিছু টাকা চাই।

তারক বললে,—কেন?

মেঘনাথ বললে,—বৌমার ওষুধ আর ডাক্তার···

তারক বললে,—ও বারোমেসে রোগের জন্যে আমি বিষয় লুটিয়ে দিতে পারি না।

দুই চোখে হঠাৎ আগুন জ্বেলে মেঘনাথ তার পানে তাকালো; পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলে, মিথ্যা এ ঝাঁজ দেখানো! তবু মরিয়া হয়ে সে বললে,—বেশ, আমার নিজের টাকাই খরচ করবো। তুমি লক্ষ্মীছাড়া কাজে টাকা খরচ করতে পারো···

তারক বাধা দিয়ে বললে,—জিভটাকে একটু রাশ সামলে চালিয়ো। ভুলে যেয়ো না, কার সঙ্গে কথা কইচো!

আবার!···কিন্তু না, উপায় নেই! মেঘনাথ ধৈর্য্য রেখে বললে,—বেশ, তোমার টাকা চাই না। তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে তো,—আজ সেইটে শোধ করো। তাতেই যা হয়, দেখা যাবে।

তারক বললে,—আমার কাছে পাওনা! তুমি যে অবাক করলে!

—মনে নেই?

—না, মনে পড়ছে না।

—হ্যাণ্ডনোট···

—হ্যাণ্ডনোট আছে না কি? নিয়ে এসো।

এ স্পর্দ্ধায় মেঘনাথ আজ জ্বলে উঠেছিল। সেও সহজে ছাড়বে না ঠিক করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হ্যাণ্ড-নোটখানা এনে হাজির করলে, সেই দেড় হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট।

তারক সেখানা নেড়ে-চেড়ে দেখে বললে,—এ যে তামাদি হয়ে গেছে।

—তা গেছে। ও হ্যাণ্ডনোট শোধ করবার কথা কখনো মনে হয়নি আমার। আজও বলতুম না,—তবে আজ তোমারই স্ত্রীর অসুখের জন্য দরকার হয়েছে···

তারক বললে,—তুমি অতি মহৎ, তাই চুপ করে ছিলে!—এর কত গুণ টাকা দু'হাত ভরে চালান করেচো?

—চুপ, চুপ, চুপ—মেঘনাথ গর্জ্জন করে উঠলো। সে বললে,—আর যা বলো, বলো, ও কথা বলো না। কর্ত্তাবাবু গেছেন, আজো তিন মাস হয় নি, তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস আজো এ বাড়ীর হাওয়ায় মিশে আছে এত বড় পাপ

কথা তোমার মুখে বেরুলে এ বাড়ীখানা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে তোমার মাথায় পড়বে।

তারক বললে,—শাপ-মন্যি দিচ্ছ আমাকে, আমার বাড়ীতে বসে?

মেঘনাথ বললে,—না। তবে তুমি এত বড় কুলাঙ্গার হতে পারো!···আজ ভুলে গেছ, একদিন ক'টা টাকার জন্য আমার কাছে কি মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছিলে! তারপর আরো কত ব্যাপারে কর্ত্তাকে নতুন উইল করাতে দিই নি! ভেবো না, তোমার জন্য সে সাহায্য করেছিলুম! যা করেছিলুম, সে শুধু তুমি স্বর্গীয় কর্ত্তার ছেলে বলে! পাছে তুমি অভিমানে তাঁর নামের মর্য্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দাও, তাই—আর কিছুর প্রত্যাশায় নয়।

তারক এ সব কথার ধাক্কা সামলাতে না পেরে কোন কথা না বলে মেঘনাথের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে গেল। মেঘনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইলো,—ভাবলো, মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সে এ কি ছেলে-মান্ষী করেচে! তারক সেদিনের ছেলে,—ছি, ছি!

১২

চুমকি ওদিকে বায়না নিলে, ওষুধ সে খাবে না, কিছুতেই নয়। কেন খাওয়া? কি হবে সেরে? কি সুখের আশায়?

মেঘনাথ বললে,—লক্ষ্মী মা আমার, খাও।

চুমকি বললে,—কেন খাবো, বলো তো কাকা? আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করচো কেন? কি আমার জীবনের দাম?

মেঘনাথ বললে,—নিরাশ হচ্ছো কেন মা?

চুমকি বললে,—এখনো আমায় আশা রাখতে বলো, কাকা?···স্ত্রীলোকের বিয়ে হয়, সে স্বামী পায়। আমি কি পেয়েছি?···আমার উপর যে প্রবঞ্চনা চলেছে···না কাকা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করো না। তুমি যদি আমার শুভার্থী হও, তাহলে এই আশীর্ব্বাদ করো, যেন শীগ্‌গির আমি মুক্তি পাই!

মেঘনাথ বললে—তোমার বাবা? মা?

—তাঁরা জানেন, আমি বড়লোকের বৌ, সুখে আছি। পাছে তাঁরা কিছু জানতে পারেন, এই জন্য এখানে তাঁদের আসতে আমি মানা করি, বলি,—ছি, জামাই-বাড়ী আসবে কি? আমার মাথা হেঁট হবে তাতে। শ্বশুর তাঁদের যে ব্যবস্থা করে গেছেন, তাতে তাঁদের অভাব হবে না কোনদিন।···আমি মলে তাঁরা ভাববেন, আমার বরাতে সুখ সইলো না, তবু ভাগ্যবতী, সিঁথেয় সিঁদুর বজায় রেখে মরেছি! ···বাঙালীর ঘরে এর চেয়ে মেয়ে-জন্মে সেরা ভাগ্য আর কি আছে?···কিন্তু এই সিঁদুর কতখানি চোখের জল, আর কি বুক-ভাঙ্গা বেদনা সয়ে রাখতে হয়, তার খোঁজ কে রাখে!···চুমকি একটা নিশ্বাস ফেললে। মেঘনাথের দুই চোখে জল ঠেলে এলো।

চুমকি বললে,—কাকা, এর চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা আর আছে? আমি গরীবের মেয়ে, আমি তো এ ঐশ্বর্য্যের লোভ একদিনও করিনি! আমার সমান-ঘরে যেতে পেলে বেঁধে-বেড়ে গতর খাটিয়ে সেখানে যে সুখ আমি পেতুম—চুমকির স্বর বেধে গেল।

মেঘনাথ চোখের জল মুছে বললে,—চুপ করো মা। ও সব কথা থাক।

একটা নিশ্বাস ফেলে চুমকি আবার বললে,—বড়লোকেরা সদয় হয়ে গরীবের ঘরের মেয়ে নিতে গিয়ে যখন মহত্ত্ব দেখান, তখন এটা কি তাঁরা ভাবে-ভঙ্গীতে বোঝান না যে, ওগো, আমাদের ঘরে মেয়ে দাও, ওকে সকল সুখে সুখী করে রাখবো। আর সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই গরীব বাপ তার বুকের কল্জে ছিঁড়ে মেয়ে দেয় না কি? তার পর যখন সে মেয়ে স্বামী পায় না, তখন—এ কি প্রবঞ্চনা নয়?

মেঘনাথ বললে,—চুপ করো মা, এ ত বাঙালীর ঘরে সর্ব্বত্র আছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার···

চুমকি বললে,—মার-ধরই অত্যাচার নয়, কাকা। এই উপেক্ষা, আর স্ত্রীকে এই স্ত্রী বলে মানা নয়, মানুষ বলে মানা নয়,—এর চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার কি আর আছে! দু'ঘা মার, মানুষের শরীরে তা সহ্য হয়—কিন্তু মনের উপর এই মার, এর জ্বালা কি অসহ্য···

মেঘনাথ বললে,—বুঝেচি মা, তোমার দুঃখের অন্ত নেই। তবু একটা কথা মনে রেখো—ভগবান দুঃখ অমনি দেন না, নিশ্চয় তার মধ্যে তাঁর মস্ত উদ্দেশ্য আছে। এই দুঃখে তোমার যা শিক্ষা হচ্ছে, তার ফলে তোমার বাকী জীবনের জন্য তুমি নিজের মন থেকেই বিপুল সান্ত্বনা আর সুখ সংগ্রহ করতে পারবে, সুখ-দুঃখের জন্য তোমার পরের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

—থাক্ কাকা, ও সব শিক্ষায় আমার সাধ নেই। রুচিও কোনদিন নেই।

—তবু মা, তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে তো সংসারের প্রতি। কর্ত্তা এ-সংসারের ভার তোমার হাতে দিয়ে গেছেন।

চুমকি বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—কিন্তু তা পালন করবার আমার কোনো শক্তি আছে কি? ঐ ব্র্যাকেটের উপর কাচের যে গোবা-পুতুলটা রয়েছে, ওটাকে যদি আপনি বলেন কাকা যে তুমি তোপ দেগে সামনের ঐ পাঁচিলটা উড়িয়ে দাও, বাড়ীটায় আলো আসুক, বাতাস আসুক,—সে কি তা পারবে? ঐ নির্জীব, প্রাণহীন

পুতুলটার কাছে এ-আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কি! আমাকে কর্ত্তব্য পালন করতে বলাও তেমনি!··· আমি নির্জীব। ঐ পুতুলের সঙ্গে এইটুকু শুধু তফাৎ যে, আমি খাই দাই, বসি দাঁড়াই, জেগে থাকি ঘুমোই,—ও তার কিছুই পারে না। নিজের ইচ্ছা কি সামর্থ্য বলে ওর যেমন কিছু নেই, আমারো তেমনি।

মেঘনাথ বললে—কিন্তু তুমি নিজেই বলেচো মা, তুমি জেগে থাকো, বসো, দাঁড়াও, সেগুলোয় নিজের ইচ্ছা খাটাও তো—তেমনি এ সংসারের কোনোদিকে কোনোদিন নিজের ইচ্ছা খাটিয়েচো কি?···তুমি বলবে,তারক তোমার পানে চায়ই না, তা তোমার কথা শুনবে কি? কিন্তু তুমি জোর করে তোমার দিকে তার চোখকে চাওয়াও নি কেন? স্ত্রী বলে চুপ করে এক কোণে পড়ে থাকলে চলে না তো। তুমি যখন স্ত্রী আর বাড়ীর বৌ, তখন দাঁড়াও দিকি সেই বাড়ীর বৌ আর তারকের স্ত্রীর মূর্ত্তি ধরে! জেনো মা, এ জগতে নির্জীবকে সবাই পায়ে দলে যায়; কিন্তু কেউ যদি প্রাণের স্পন্দন একটু দেখায়, তাহলেই লোকে তাকে ঠেলে চলতে পারে না। এই যে তার সাহস দিনে দিনে আস্পর্দ্ধার সীমা ছাড়াচ্ছে, এর একটা কারণ তোমার ঔদাসীন্য। তুমি জোর করে তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও, তার কাজে বাধা দাও, তার কথার মাঝে নিজের কথা ছুড়ে দাও, দেখবে, তারকের চমক্ ভাঙ্গবে! ক্রমে সে বুঝবে, না, একে হেলাফেলা করা চলবে না, একে মানতে হবে। তোমার অভিমানই তোমার এ দুর্দ্দশার কতক কারণ।

—তবে কি ভুল পথে চলেছি আমি? বেশ বাবা, যদি সেরে উঠি, একবার তোমার পথেই চলে দেখবো। দাও ওষুধ।

ওষুধ সে খেলে। তারপর থেকে ওষুধ-পথ্যি নিয়ে সে দ্বিরুক্তি করেনি—কিন্তু হায়রে, বহুদিনকার চাপা বেদনার স্রোতের ঘায়ে যে-মন যে-দেহ ভিতরে ফেটে চৌচির হয়ে ছিল, জোড়া-তালিতে কতদিন সে টিঁকে থাকে! শেষে একদিন চরম মুহূর্ত্ত এসে উদয় হলো।

এই মুহূর্ত্তটি শুধু যে চুমকির জন্যে মুক্তি বহন করে এলো, তা নয়, মেঘনাথের ভাগ্যটাকেও এমন এক বাঁধনে বেঁধে দিলে যে মেঘনাথের মুক্তির তাতে দম বন্ধ হবার সূচনা ঘটলো।

১৩

সে এই ফাল্গুন মাসের কথা। সেদিন দোল-পূর্ণিমা। সকাল থেকে চুমকি কেমন অচেতন অভিভূতের মত পড়ে ছিল। ডাক্তার আর ওষুধের ধূমে মেঘনাথ আর হীরু হিমসিম্ খাচ্ছে, তবু একটু অধীর হয় নি দুজনে। মেঘনাথ সপরিবারে এসে কদিন চুমকির প্রাণ নিয়ে যমের সঙ্গে লড়াই করছিল। ডাক্তার বলেছিল,—এই পূর্ণিমার ধাক্কা যদি কাটে, তবে আরো কিছুদিন যেতে পারে। অর্থাৎ ডাক্তার দু'চার দিন পূর্ব্বে স্পষ্ট বলেছেন, যক্ষ্মা-রোগের ওষুধ আজ পর্য্যন্ত বার হয় নি।

শুনে মেঘনাথ চমকে উঠেছিল, যক্ষ্মা! সর্ব্বনাশ! তার কোন লক্ষণ তেমন দেখা যায় নি তো! খুব কাশি, কি মুখে রক্ত ওঠা। তবে? সে কেমন হতভম্ব হয়ে কলের মত কাজ করে যাচ্ছিল।

বাগানে বাবুদের দোলের মাতন সেদিন সকাল থেকে পূর্ণভাবে জেগে উঠেছে। বেলা ফুরিয়ে আসতে বাবুরা আপাদ-মস্তক লাল-নীল রঙে রাঙ্গিয়ে বাড়ী ঢুকলেন—চাকর-বাকরকে হাঁক-ডাকের চোটে একটা হৈ-চৈ শব্দ পড়ে গেল। হীরু গেল মানা করতে, বৌমার অত্যন্ত অসুখ বলে', তারা সমস্বরে গান ধরে দিলে,—

আজু হোলি খেলে নন্দলালা!

মেঘনাথ তখন গিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো মাতালকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে বার করে দিলে।

মধুচক্রে খোঁচা দিলে যেমন হয়, তেমনি হলো তার-পরের অবস্থা। তারক চোখ রাঙিয়ে চাবুক ঘুরিয়ে বললে, নিকালো, আবি নিকালো।

মেঘনাথ বললে,—এই যে এখনি বেরুচ্ছি।···ওধারে উনি শ্বাস টানছেন, ওঁর জীবনটুকু সাঙ্গ হোক, ওঁকে বিস-র্জ্জনে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যাচ্ছি। একটু রেহাই দাও। বেচারী আগাগোড়া জ্বলেছে, মরণের সময় একটু শান্তিতে তাকে মরতে দাও। সতীর দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আমোদ-আহ্লাদ পুরো দমে জমিয়ে তুলো।

তারকের ভৈরব হুঙ্কারের আর বিরাম নেই! ওধারে চুমকি মৃত্যুশয্যায়, আর এধারে হৈ-হৈ ব্যাপার! মেঘনাথের মনে হলো, মৃত্যু যেন তার সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে আজ উৎসবে মেতেছে, দোরে হানা দিচ্ছে।

তারপর সব চুকলো। চুমকি গেলে সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাথ এ বাড়ীর ছায়া ত্যাগ করে গেল। হীরু দেশে চলে গেল, যাবার সময় বলে গেল, কলকাতার ছোকরা বাঙালী বাবুর চাকরি সে আর করবে না। যে বাবুরা গলাধাক্কা খেয়ে অপমান ভুলতে পারে নি, তারা তারককে ওস্কাতে লাগলো, শোধ চাই। নাহলে তারা ইয়ার্কি দিতে আসবে না! আমোদের নব নব লীলাভূমিও আবি-ষ্কার করবে না—এমনি নানা ভয় দেখাতে লাগলো। ইয়ারদের দল এক-কাট্টা হলো। শোধ চাই, নাহলে এখানকার মজলিসে ইস্তফা দেবে।

তারক তখন ফন্দী আঁটতে লাগলো।···

ঠিক! হুণ্ডীর কথাটা সে শুনেছিল মেঘনাথের মুখে।

খাতা খুলে দেখে, হুণ্ডী-খরচ মেঘনাথের নামে। খাতায় লেখা, তাকে হুণ্ডীর টাকা ভাঙ্গাতে দেওয়া হয়েছে। হুণ্ডী ভাঙ্গানোর পরে টাকাটা খাতায় জমা করা হয় নি। জমা করাই দস্তুর। কাজেই দাঁড়াচ্ছে, মেঘনাথের ঐ দু হাজার টাকার গোল, তাছাড়া সেই তামাদি হ্যাণ্ডনোট আর কিছু ধার। সেগুলোর জন্য যদি মেঘনাথ চেপে ধরে তাকে কোন দিন? তার আগে পথ করা চাই। উকিল এলেন; পরামর্শ চললো; পুলিশে খবর পাঠানো হলো। খাতা দেখে পুলিশ বললে, এ তো পাকা কেশ! সাদা নির্ঘাৎ। প্রমাণ খাতায়, আর সে খাতার লেখা মেঘনাথের নিজের হাতে।

মেঘনাথ বেচারী কাশী-বাসের উদ্যোগ করছিল,—ছোট মেয়েটির সেইখানেই বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। কাশী যাত্রার দু'দিন বাকী। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করলো। তারপর পুলিশ তাকে কোর্টে চালান দিল, বিচারের জন্য।

কোর্টে হঠাৎ তাকে আমি দেখলুম, আসামীর কাঠগড়ায়। আমি তো তাকে চিনতুম! খবর নিলুম—কষ্টে জামিন করানো গেল। তারপর মেঘনাথ এসে এই বৃত্তান্ত আগাগোড়া আমাকে খুলে বললে।

কিন্তু হায়রে, ঐ দু'হাজার টাকা কর্ত্তা যে তাকে দান করে গেছেন, তার মেয়ের বিয়ের বাক্সে খরচ লিখবেন বলেছিলেন শিবানীর আশীর্ব্বাদী বলে, তা আর হলো কৈ! এ সব কথার প্রমাণ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। লোকটার এত বড় আনুগত্য, এত দিনের চাকরি, খাটের দাম চোকানোর রসিদ, চুমকির রোগে সেবা—এগুলো প্রমাণ করা যায়, কিন্তু আইন ত তাতে সন্তুষ্ট হবে না! সে চায় ঐ দু'হাজারে দু'হাজার। টাকায় টাকা খাতার লেখায় মিলিয়ে দেওয়া চাই! হাকিমের দোষ কি! তিনি আইনের লাইন ধরে চল্‌তে বাধ্য—একটু বে-লাইন হবার জো নেই! তাছাড়া মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করবার সাধ্য কারো নেই! তার উপর জেরায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করলে তারক ভড়কে যে দুটো সত্য কথা বলে ফেলতো না, এমন বলা যায় না! হুণ্ডীর কথা এ মামলার ঢের আগে আমি শুনেছিলুম, সেই পাঁচুর মকর্দ্দমার সময়। জানতুম, তাই। আর এ কথা জানতো চুমকি, হারু; আর জানে তারক। কিন্তু সে ফরিয়াদী, মিথ্যা বলতে সে তো প্রস্তুত হয়ে এসেছে!···ফল?

আইনের ধারায় বেচারা মেঘনাথ জেলে গেল। আসামীর জবানবন্দী নেই, জেরা নেই। সাক্ষী-প্রমাণ হাজির না করলে তার কথায় বিশ্বাস করার পথও আইন নির্দ্দেশ করে দেয় নি। কাজেই আদালত কি করবে? কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে তার কি পরিচয়ই না আজ রটলো। তার যথার্থ যা পরিচয়, জগতে তা চির-গোপন থেকে গেল।

জেরা করায় তার মানা ছিল—তাতে মনিবের নামে কলঙ্ক পড়বে! প্রাণ থাকতে সে তা সহ্য করতে পারবে না। পাগল! না হলে তার আজ এ দুর্দ্দশা!—

কাহিনী শেষ করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিলাম, তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—একটা নির্দ্দোষকে বাঁচাতে পারলে না, অথচ ওকালতির ব্যবসা করতে এখনো প্রবৃত্তি হয়! ছি!

হতাশভাবে আমি বলিলাম,—দু'মুঠো অন্নের সংস্থান না হলে কিসে হয়?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্ত্রী বলিলেন,—এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ঢের ভালো!

মনের মিল

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দরদী কবি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বন্ধুবরেষু

মনের মিল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফুলছড়ি

কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ছোট গ্রাম—ফুলছড়ি। গ্রামখানি ছোট হইলে কি হয়, গ্রামের মধ্যে দলাদলি, দ্বেষ-হিংসার মাত্রা এমন প্রবল যে অনেক বড়-বড় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামও এ ব্যাপারে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। পাড়ায়-পাড়ায় স্বতন্ত্র দল—দলপতির প্রখর দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ উদ্যত,—কোথায় কি ত্রুটি ঘটিল, কার পাণ হইতে কতটুকু চূণ খসিল, সেই দিকে। বাঁধা আইন-কানুন, বাঁধা গণ্ডী এমন টানা যে তার বাহিরে কাহারো পা পড়িলে সর্ব্বনাশ। লাঞ্ছনা তিরস্কারের অন্ত থাকে না, গ্রামে মুখ দেখানো ভার হইয়া ওঠে; এবং দলপতির নির্দ্দেশ-মত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তবেই সে-যাত্রা রক্ষা!

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ পাড়ায় একটা-না-একটা বিষয়ের ঘোঁট চলিয়াছে। ও-পাড়ার শশী চক্রবর্ত্তীর বিধবা ভাজ গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া চরণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে না কি কথা কহিয়াছে! গ্রামের বৌ হইয়া এতখানি তার নির্লজ্জ আচরণ। অমনি শশী চক্রবর্ত্তীর নামে দলপতির পরোয়ানা জাহির হইল,—করাও বারোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন—নহিলে একঘরে হইতে হইবে। চরণ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য শুনা গেল না।

শশী এই সেদিন ভাইয়ের অসুখে ডাক্তারের জন্য নগদ একশোটি টাকা ধার করিয়াও ভাইকে ধরিয়া ইহলোকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। পাড়ার সবার ঘরে ভিটার দলিল লইয়া গিয়াও তার জোরে টাকা ধার পায় নাই। বিধু মুখুয্যে টাকার আণ্ডিল। এত বড় নির্লজ্জ সুদখোর যে তার আর জোড়া নাই। সে বলিয়া বসিল, দলিল লেখাপড়া ও রেজেষ্ট্রী না হইলে সে টাকা দিতে পারিবে না! তা ছাড়া শশী সুদের যে-হার বলিয়াছে, তা একেবারে অচল, দুঃসাধ্য ব্যাপার। শশীর পক্ষে সে সুদে টাকা ধার লইলে ভিটা বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

গৃহে ভাইয়ের প্রাণ তখন দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করিতেছে—তার পাশ ছাড়িয়া নড়া চলে না। সুদ না হয় খুব চড়া দিলাম, ভিট না হয় গেল। ভাইয়ের প্রাণের চেয়ে ভিটার দাম বেশী নয়! কিন্তু রেজেষ্ট্রী অফিসে ছোটা তো সহজ ব্যাপার নয়! সেখানে দলিল রেজেষ্ট্রী হইলে টাকা মিলিবে—তবে সেই টাকায় ঔষধ-পথ্য! দাদা অনেকের দায়ে মাথা দিয়াছে! পয়সার অভাবে সেই দাদা বিনা-চিকিৎসায় প্রাণ দিবে! বিধু মুখুয্যের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া দলিল আনিয়া শশী বেচারা শেষে এক পেশোয়ার-বাসী কাবুলীর দ্বারস্থ হইয়া টাকা ধার করিয়া ডাক্তারের পায়ে ধরিয়া দক্ষিণা দেয়! সে টাকা শোধ দেওয়া দূরের কথা—কাবুলীর পাগড়ি আর ঢিলা আলখাল্লা ঘুমে-জাগরণে তার আশে-পাশে ছায়ার মত কি বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরিয়া যে সারাক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিতেছে—আজও। এরা বলে কি না, বারোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও! তাও বিনা দোষে!

শশী খিঁচাইয়া উঠিল, বলিল—কভি নেহি! দামড়া গরুকো জাব্ নেহি খিলায়েঙ্গা!

বিধবা ভ্রাতৃজায়া বিন্দু স্বামি-বিয়োগের সদ্য বেদনার উপরে লজ্জার বোঝা মাথায় বহিয়া বলিল—ওঁদের মিছে কথা! চরণ ভটচায এমন ইতর রসিকতা করেছিল··· তার জবাবে ধমকে আমি বলেছিলুম—বুড়োর ঐ মুখ ঝাঁটার ঘায়ে থেঁতো করে দিতে পারতুম তো ঠিক হতো!···ব্যাপার ভাই, এই!

শশী বলিল—চরণ ব্যাটা হলো আবার সহু বাঁড়ুয্যের ইয়ার। ব্যাটা ভটচায্যি, না, চামার। দু-ব্যাটার ভেতরের কথা জানি তো···ইঃ, মগের মুল্লুক পেয়েচে! না? ইংরেজের রাজত্ব, এখানে চোখ রাঙাস্ কি সাহসে? কক্ষনো বামুন খাওয়াবো না আমি! কেন, কিসের জন্যে? তাও ঐ তো সব চামার বামুন!

বিন্দু কহিল,—কিন্তু ঠাকুরপো, ইংরেজের রাজ্য হলেও এরাই এ মুল্লুকের বিধাতা।

শশী কহিল,—তুমি ভেবো না বৌঠাকরুণ, কোনো দায়ে কোনো ব্যাটা কখনো মাথা দিতে আসে না—শুধু ঘরে বসে হুমকি ছাড়বে। কে রাখে ওদের তোয়াক্কা।

বিন্দু কহিল—ওরা একঘরে করবে, বলেচে!

শশী কহিল—বেঁচে যাবো। কোনো ব্যাটাকে বাড়ীতে ডাকতে হবে না—কোনো ব্যাটা ছেলের বিয়ের, পৈতের, ভাতে দু'খানা কাঁচা ময়দার লুচি দেখিয়ে দু'টাকা চার টাকা লৌকিকতা আদায় করতে পারবে না!

ভ্রাতৃজায়া কহিল,—তোমার দায়ে-অদায়ে···

শশী কহিল—কোনো ব্যাটা দেখেচে কোনোদিন?

দেখবে, তা আমি চাইনে! তবে আমিও ছাড়চি না। আমার মায়ের মত বড় ভাজ তুমি···তোমার নামে এত বড় মিথ্যা অপবাদ তুলেচে যে ব্যাটা, তাকে একবার দেখে নেবো আমি।

বিন্দু কহিল—তার মানে?

শশী কহিল,—মানে এখনো খতিয়ে দেখিনি বৌঠাকরুণ···তবে সে মানে যত ঘোরালোই হোক্, আমি ছেড়ে দেবো না।

বিন্দু গম্ভীর স্বরে ডাকিল,—ঠাকুরপো!

সে ডাকে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, এবং তার পিছনে কতখানি স্নেহের মাধুর্য্য যে মিশানো ছিল!···

শশী কহিল,—তোমার কোনো ভয় নেই, বৌঠাকরুণ। গাঁয়ে একটা মজা দেখচি বেশ, যার পয়সার জোর আছে, সে যা-খুশী তাই করে যাচ্ছে—দুর্ব্বল গরীবের উপরই শুধু যত জুলুম!

বিন্দুর চোখে নিরুপায়তার ছায়া আরো গাঢ় হইল। বিন্দু কহিল,—তবে?···তোমার তো পয়সার জোর নেই, লোক-বলও নেই! কাজেই···

শশী কহিল,—কাজেই, ওদের হুঙ্কার মেনে চলতে হবে? বাবোটা মর্কটকে পাত পেতে খাওয়াবো?

বিন্দু শান্ত স্বরে কহিল,—তা নয় ভাই ঠাকুরপো··· আমাকে নিয়েই তো কথা উঠেচে। আমি যদি এ ভিটে ত্যাগ করে যাই···

—বৌঠাকরুণ···

শশীর কথায় বাধা দিয়া ভ্রাতৃজায়া কহিল—জানি ভাই, এ ঘর ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কত শক্ত! এ ঘর আমার···বেদনায় ভ্রাতৃজায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শশীর বুকে এইটুকুই অনেকখানি আঘাতের বেদনা জাগাইয়া তুলিল। শশী কহিল,—এমনি অকথ্য অপবাদ মাথায় বয়ে তুমি থাকবে!···তা হবে না বৌঠাকরুণ...আমি মরদ-বাচ্ছা। ঐ ভটচায্যি বামুনকে আমি একবার তার টিকি আর নামাবলীর খোলোস ছাড়িয়ে সকলের চোখের সামনে ধরে দেবো,—এই আমার পণ!···তোমার কোথাও যাওয়া হবে না, ওদেরো কথা শুনবো না! কি করবে ওরা? কত শক্তি?···ওদের সঙ্গে মিশে পাঁচ ঘরের ঘর আমি করতে চাই না। ডোম চাঁড়ালের দোরে দাঁড়াবো দরকার হলে—তবু ও ইল্লতদের ঘেঁস কখনো সইবো না!

আলোচনায় দেবরের জিদ আরো বাড়িবে, কি করিতে শেষে কি করিবে,—এই ভাবিয়া বিন্দু চুপ করিল।

শশী তখন ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কাঁধে একখানা উড়ানি ফেলিয়া একটা ছাতা লইয়া ঘরের বাহিরে আসিতে বিন্দু কহিল,—কোথায় বেরুনো হচ্ছে, শুনি? বেলা এই বেড়ে উঠলো, আর এখন তোমার বার হবার সময়! তারপর কোন্ অবেলায় ফিরে কড়কড়ে ভাতগুলো খেতে বসবে! তার চেয়ে বাপু, স্নান করে খাও, আমি এখনি ভাত ধরে দিচ্ছি। বেরুতে হয়, খেয়ে বেরোও।

শশী হাসিয়া কহিল,—তুমিও যেমন! বেশী দূর নয়, আমি যাচ্ছি ও পাড়ায় নিতাইয়ের কাছে। এখনি ফিরবো।

বিন্দু কহিল,—তোমার ফেরা তো! বেরুলে কি আর তোমার ঘরের কথা মনে থাকে, ভাই!

বিন্দু থামিল, পরে হাসিয়া কহিল,—ঐ জন্যেই তো বলি, একটি বৌ এনে দি, নাহলে ঘরে মন বসবে কেন?

শশী ফিরিয়া বিন্দুর পানে চাহিল, কহিল,—ও কথা পুরোনো হয়ে গেছে, বৌঠাকরুণ···তোমার ভয় নেই, আমি এখনি ফিরবো এবং ফিরে শীগ্‌গির করেই নেয়ে-খেয়ে নেবো। কেন না, আমাদের মস্ত একটা কাজ আছে—তার কিনারা কতদূর হলো জানতে চলেছি।

বিন্দু কহিল,—কাজটা কি, শুনি···

শশী কহিল,—মাছ ধরা গো, মাছ ধরা···

বিন্দু আর কোন কথা কহিল না; শশীও ছাতা খুলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ও-পাড়ায় নিতাইয়ের বাড়ী। সেখানে যাইতে হইলে সতু বাঁড়ুয্যের বাড়ী পার হইতে হয়। শশী আসিয়া সতু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর সামনে পৌঁছিলে দেখিল, চরণ ভট্টাচার্য্য মহা উৎসাহে হাত নাড়িতে নাড়িতে সতুর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতেছে। সঙ্গে আছে আরো তিন-চারিটা টাক-মাথা সমাজ-রক্ষী। চরণকে দেখিবামাত্র শশীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। শশীকে দেখিয়া চরণ কহিল—এই যে শশী! তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনটা কবে হচ্ছে হে?

শশী কহিল,—যেদিনই হোক্, তোমার তো কোনো আশা দেখচিনে···

চরণ কহিল—তার মানে?

শশী কহিল—তোমার মত বিট্‌লেকে তো ব্রাহ্মণের দলে ডাকতে পারি না, অন্ততঃ আমার বাড়ীতে পাড়ায় বাগ্দী যদি কখনো নেমন্তন্ন করি, তাহলে তোমায় ডাকবো সেদিন।

রাগে বাক্য-হারা হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চরণ শশীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশী কহিল—তোমাকে খাওয়ানোর চেয়ে দুটো ছাগল-গরু খাওয়ালে পুণ্যি হয় অনেক বেশী।

এ-কথায় চরণ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

চোখে আগুন জ্বালিয়া চরণ কহিল,—ভারী তেজ দেখচি যে। চরণকে চেনো না? চরণ যদি মনে করে তো ও তেজ কোথায় থাকে, একবার দেখি।

শশী কহিল,—যেখানেই থাকুক, অন্ততঃ দুলে-পাড়ায় কি বাগ্‌দী-পাড়ায় তাকে পাবে না চরণচাঁদ ভট্‌চাজ!··· কথাটা বলিয়া চরণের উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া শশী চলিয়া গেল।

কথাটার মধ্যে অনেকখানি ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল। দুলে-পাড়ার সঙ্গে না হোক বাগ্দী-পাড়ার সঙ্গে চরণের একটু সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই তাহাকে সে পাড়ায় দেখা যাইত। কাহাকেও দেখিলে চরণ বলিত—এই সদু বাবুর পাওনা আদায় করতে আমার আসা।

অর্থাৎ বাগ্দী-পাড়ায় সদুর কয়েক ঘর প্রজা ছিল। তাদের কাছ হইতে খাজনা আদায়ের অন্য লোক থাকিলেও এ কাজটায় চরণ অগ্রসর হইয়া আসিত। এ জন্য গোপন অন্তরালে কেহ কেহ বাগ্দী-পাড়ায় কোনো একটি বিশেষ পরিবারের সহিত চরণের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত করিত। তবে সমাজে সদু বাঁড়ুয্যের প্রতিপত্তি বিলক্ষণ এবং চরণ তাঁর বিশেষ অনুগৃহীত—এই দুই কারণে ব্যাপারটা লইয়া প্রকাশ্যে উচ্চার বেশী আলোচনা করিতে কাহারো সাহসে কুলাইত না! কে জানে, এখানে ছোট একটি ইঁট ছুঁড়িলে কত বড় পাটকেল কোন্ দিক্ হইতে আসিয়া মাথায় পড়িবে।

আজ প্রকাশ্যে শশীর এ ইঙ্গিতে চরণ একটু চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল—টাকা আদায় করতে যাই বাগ্দী-পাড়ায়! তাতে কি হয়েচে! গঙ্গাস্নান না করে জল গ্রহণ করি না আমি। সন্ধ্যা-আহ্নিক, এমন নিষ্ঠা···গ্রামে আর কার আছে, দেখিয়ে দিক্ না! ফক্কড় ছোকরা, আমার সঙ্গে মস্করা করে! আমার উপর ঠেশ্ দিয়ে ঘরে বাস করবে—ঐ বিধবা কাঁচা-বয়েসী ভাজ নিয়ে! দ্যাখো মজা, কি হাল করি তোমার!···

কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশ! যাহার উদ্দেশ্যে এ আক্রোশ, সে তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। চরণ একবার পথের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর গভীর একটা অভিসন্ধি মনে মনে আঁচিয়া লইয়া আবার সদু বাঁড়ুয্যের গৃহে প্রবেশ করিল—বাকী সমাজ-রক্ষীর দল স্নানাদির বেলা হইতেছে বলিয়া বিদায় লইল। বিদায় লইবার সময় দেবু বলিয়া গেল,—যা হয় একটা স্থির করে ফ্যালো। এ সব সামাজিক ব্যাপারে গয়ং-গচ্ছ করতে নেই হে চরণ।

চরণ কহিল,—না, আজই হেস্ত-নেস্ত না করে নড়্‌চি না!···

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাই

নিতাইয়ের গৃহে নিতাই কয়টা হাঁসের পালক হইতে ফাৎনা কাটিয়া ছিপে বাঁধিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে শশী ডাকিল,—নিতাই আছো?

—কে? শশীদা···এসো!

নিতাইয়ের গৃহে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নাই, কাজেই তার দ্বার সর্ব্বক্ষণ অবারিত! শশী নিতাইয়ের গৃহে গিয়া কহিল,—বেরুবার আয়োজন পাকা তো?

নিতাই কহিল,—নিশ্চয়। তবে যাবার সময় একবার বাগ্দী-পাড়া ঘুরে যেতে হবে, দাদা।

—বাগ্দীপাড়া?

নিতাই কহিল,—হ্যাঁ। উমেশের এক ভাইপো আপিসে ছুটী নিয়ে এসেচে—তার শরীর খারাপ, এখনো সারতে পারে নি। সে কাজ করে বজবজের একটা পাট-কলে। তার ছুটী বাড়ানোর একখানা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যেতে হবে। নইলে চাকরী খোয়াতে পারে, নয় তো জরিমানা হতে পারে। বেচারা!

শশী কহিল,—আমাদের কতদূর যেতে হবে শুনি?

নিতাই কহিল,—নতুনপাড়ায়। ঐ যে পাদ্রী-সাহেবের নতুন ইস্কুল হয়েছে না? তার ঠিক পিছনে আব্‌দুলের পুকুর—মস্ত পুকুর দাদা, আর মাছও তাতে প্রচুর। ধরে সুখ পাবে।

শশী কহিল,—বাগ্দীপাড়া ঘুরে যেতে একটু ঘুর পড়বে না?

নিতাই কহিল,—কতটুকু বা। তেমনি আষাঢ়ের বেলা! অন্ধকার হতে তোমার যার নাম সাতটা। কত মাছ ধরবে, ধরো। এই আধ ঘণ্টা আগে দলু এসেছিল, বেচারী মিনতি করে গেল। তখনি লিখে দিতুম—কাজ চুকে যেতো; কিন্তু সে ওদের সাহেবের আর আপিসের নাম লেখা কাগজটা বাড়ীতে ফেলে এসেচে। বললুম, সেই তো বেরুচ্ছি খানিক পরে, যাবার সময় লিখে দিয়ে যাবো। তা তোমার ভয় নেই, দাদা। তোমাকে তাদের বাড়ী ঢুকতে হবে না, পাশে দাঁড়িয়ে থেকো! তোমায় জানি তো, বামুন মানুষ, তায় ভট্‌চায্যি বামুন—বাগ্দীর ছায়া মাড়ালে জাত যাবে।

শশী কহিল,—আমি তাহলে চানটা সেরেই তোমার এখানে আসবো। কি বলো নিতাই? তোমার কত দেরী এদিকে?

নিতাই কহিল,—রান্না আমার হয়ে গেছে।···

শশী কহিল,—দেখি, ছিপ কেমন হলো

নিতাই কহিল,—তোমারটা হয়ে গেছে, ঘরে আছে। আনাই। আমার হুইলটা লাগিয়ে নিলেই হয়।

এই কথা বলিয়া নিতাই ডাকিল,—কাশী ·

সে আহ্বানে দশ বছরের একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। নিতাই কহিল—আমার ঘরের কোণে যে ছিপটা তৈরী করে রেখেচি, নিয়ে আয় তো ভাই···

কাশী ছিপ আনিতে গেলে শশী কহিল,—এ ছেলেটিকে কৈ আগে তো দেখিনি !

নিতাই কহিল,—না। ও এই দিন কয়েক হলো এসেচে। এইখানেই আছে আমার কাছে। ত্নিয়ায় ওর কেউ কোথাও নেই। ওর আসল নাম হলো, কাশিম—জাতে মুসলমান।

মুসলমান ! শশীর আজন্মের সংস্কার একবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই এতটুকু হইয়া গেল। নিতাইয়ের যেন কেহ কোথাও নাই, সে গোঁয়ার-গোবিন্দ ! কিন্তু শশীর যে নিজের গৃহে ভাজ আছে, বিগ্রহ আছেন, তাছাড়া সমাজ ··সে-সমাজকে এই মাত্র প্রবল হুঙ্কারে গর্জ্জনে সে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে। যত তুচ্ছ করুক, তবু সমাজ নামটার সঙ্গে কতখানি বিভীষিকা জড়ানো আছে ! সমাজকে চক্ষে না দেখিলেও সে বিভীষিকাটুকুকে তো প্রাণের কোণ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারে নাই ! সে চট্ করিয়া কোন জবাব দিতে পারিল না।

নিতাই কহিল,—আমাদের বোটের মাঝি ছিল, হানিফ,—ও সেই হানিফের ছেলে। হানিফের বৌ তো অনেক দিন আগে মারা গেছে। হানিফটা এক বছর ধরে কালাজ্বরে ভুগে ভুগে সে দিন মারা গেল ! রোগে পড়ে অবধি এই ছেলের জন্ম ভেবে সে সারা হয়ে থাকতো। জাত-কুটুম কেউ এ-গাঁয়ে নেই, মারা যাবার সময় কাশিমকে আমার হাতে দিয়ে যায়—যাবার সময় বলে, দাদাবাবু, এটাকে মানুষ করে দিয়ো !

নিতাই একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর হাসিয়া কহিল,—মানুষ কাকে বলে, জানি না ! নিজেও মানুষ হলুম না কোনো দিন। আমি কি করে একে মানুষ করি, বলো তো দাদা ? যাক্, খেতে পরতে দিতে পারবো, তারপরে ওর নিজের হাত, মানুষ হওয়া।

কাশী ওরফে কাশিম ছিপ লইয়া আসিলে নিতাই কহিল,—এই তোমার ছিপ।

ছিপ তো আসিয়াছে ! কিন্তু ঐ মুসলমানের হাত হইতে সে ছিপ লওয়া ! কেমন এক অশুচিতায় শশীর মনটা রী-রী করিয়া উঠিল। এমন অনাচার ! নিতাই বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—ছুঁতে পারচো না ! গঙ্গাজল চাই না কি ? বলো···এনে দি !

নিতাই উঠিয়া ঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া ছিপ লইয়া সেটায় গঙ্গাজল দিল. পরে কহিল,—এইবার হয়েচে ? খাশা চীজ বানিয়ে রেখেচো দাদা, এই গঙ্গাজল ! একটু ছুঁলেই শুদ্ধি। খুন-খারাপী ছাড়া আর যা-খুশী করো। খুন-খারাপীটাও চলতো, কিন্তু আইন-পুলিশের বাজ্য কি না ! ভাবি তাই, গঙ্গাজল না থাক্‌লে সংসারের অর্দ্ধেক আনন্দ তো গয়াপ্রাপ্ত করতে হতো ! হাসি পায় দাদা এই ভেবে দাদা যে, সব মানুষকে এক বিধাতাই সৃষ্টি করেচেন তো ! তিনি যদি প্রতি হাতে গঙ্গাজল ব্যবহার করতেন, তাহলে কি ভগীরথের সাধ্য থাকতো, মা গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনেন ! ·· মাঝে থেকে আমরাই কেউ মস্‌জিদ্ বানিয়ে, কেউ গঙ্গাজল তৈরী করে আলাদা হচ্ছি ! কাশিমকে তৈরী করতে ভগবান কি অশুদ্ধ হয়ে গেছেন ?

কথাটা খুব সহজ। ইহাতে শাস্ত্রের হুঙ্কার নাই,—এবং শশীর মন সেটাকে গ্রহণ করিবার জন্ম নিমেষে উন্মুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু সংস্কার। ঘরের বিগ্রহের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁর মুখে বিবক্তির ঝাঁজ।···শশী কোনো জবাব না দিয়া ছিপটা পরীক্ষা করিল, তারপর নিতাইকে কহিল,—তাহলে আমি চান পূজো-আর্চ্চা, সব সেরে এখনি আসচি। মোদ্দা, তুমিও তৈরী হয়ে নাও ! ছিপটা এইখানেই থাকুক্। কেন মিছে বয়ে নিয়ে যাই ? এই পথ দিয়েই তো যাবো !

শশী চলিয়া গেল। নিতাই ছিপের কাজ সারিয়া উঠিল—এবং মাথায় তৈল লেপিয়া কাশীকে তেল মাখিতে বলিল ; কাশীর তেল মাখা হইলে তাকে লইয়া সে নদীতে স্নান করিতে গেল।

সারা পথ কাশীর কথা ভাবিতে ভাবিতে শশী গৃহে ফিরিল। বেচারা অনাথ। মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া তার এমন কি অপরাধ হইয়াছে যে সে ভাসিয়া যাইবে ? তার যদি পীড়া হয়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে যদি পথে পড়িয়া থাকে তো তাকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া সেবায় যত্নে তাকে আরাম করা···এটা বড় ? না, জাত বাঁচাইয়া তার কাছ হইতে সরিয়া পড়াতেই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় ? তবু মুসলমান ! গৃহে বিগ্রহ-পূজা করিতে হইবে। ···মস্ত এক সমস্যা শশীর দ্বিধা-হীন নিশ্চিন্ত মনের মধ্যে জাগিয়া এক বিশ্রী জোট পাকাইয়া তুলিল ! নিতাই কেমন অবলীলায় ঐ মুসলমানের ছেলেকে গৃহে আনিয়া ঠাঁই দিয়াছে ! এ সমস্যার মীমাংসাই বা কে করে ? কাহাকে প্রশ্ন করিলেই বা সমাধান মিলিবে ?

গৃহে ফিরিতে বিন্দু কহিল,—কি ভাগ্যি ! এর মধ্যে ফিরেচো।

শশী কহিল,—ফিরলুম। আমি স্নান করে আসি, এসেই পূজা সেরে নেবো। তুমি ছুটি ভাতের ব্যবস্থা করে রাখো, বৌঠাকরুণ।

বিন্দু কহিল,—তুমি আগে এসো তো। ভাত না পাও, তখন বলো।

শশী আর কালক্ষেপ না করিয়া স্নানে বাহির হইল। স্নানান্তে পূজা সারিয়া আহারে বসিলে বিন্দু কহিল,—কোথায় যেতে হবে, শুনি ?

শশী কহিল,—মাছ ধরতে। বলেচি তো।

বিন্দু কহিল,—ধন্যি সব যা শোক। ধরে নিজে তো খাবে কত! কতকগুলো মাছ ধরে একে-তাকে বিলিয়ে কি সুখ পাও, জানি না বাপু।

শশী হাসিয়া কহিল—আসল সুখ বিলুনোয় নয় বৌ-ঠাকরুণ, আসল সুখ মাছ ধরায়। ফাৎনার পানে চেয়ে যে বসে থাকি, লোকে হাসে—কি রাজ্য-জয়ের ফন্দী আঁটচি! তারপর যখন একটি টানে পাঁচ সের মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলি, তখনকার আনন্দ···ওঃ, রাজা রাজ্য জয় করে এসেও বুঝি এমন আনন্দ পায় না!

বিন্দু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা, অনর্থক এ প্রাণি-হত্যায় আনন্দ পাওয়া কি ভালো, ঠাকুরপো? জলের মাছ জলেই থাকুক না, বাপু···

শশী কহিল,—ক্ষেপেচো বৌঠাকরুণ, জলের মাছ জলে থাকবে যদি তো ছিপটার সৃষ্টি হলো কেন?

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—শোনো কথা। ছিপের জন্য মাছ, না, মাছের জন্য ছিপের সৃষ্টি!

শশী কহিল,—মন্দ বলো নি বৌঠাকরুণ! এমনি একটা কথাই এই কিছুক্ষণ আমার মনে জাগচে। সে কথা হলো এই যে, সমাজের জন্য মানুষ, না, মানুষের জন্য সমাজ!

বিন্দু কহিল,—ইস্, তুমি যে একেবারে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠলে!

শশী কহিল,—আমাদের ও-পাড়ার নিতাইকে জানো তো?

বিন্দু কহিল,—ঐ শ্রীধর চাটুয্যের ছেলে?

শশী কহিল,—হ্যাঁ। তা সে তো একা মানুষ। আজ তার ওখানে গিয়ে দেখি, দশ এগারো বছরের একটি মুসলমানের ছেলেকে সে ঘরে এনে ঠাঁই দেছে। মাঠের ধারে পড়ে থাকবার ঠাঁই সে নয়, একেবারে নিজের ঘরের মধ্যে। ছেলেটার মা-বাপ ভাই-বন্ধু কেউ কোথাও নেই—যে তাকে মানুষ করে।

বিন্দু কহিল,—মুসলমানের ছেলে?

শশী কহিল,—হ্যাঁ গো! তাকে দেখে আমি তো চমকে উঠেছিলুম। ছেলেটির নাম কাশিম—নিতাই তার নাম দেছে কাশী। অর্থাৎ মুসলমানের 'ম' অক্ষরটা ছেঁটে দেছে। তাই ভাবছিলুম, আমাদের এই সন্তু বাঁড়ুয্যের দল যদি টের পায়, তাহলে খাপ্পা হয়ে উঠবে।

বিন্দু শিহরিয়া কহিল,—সত্যি ভাই! এরা জানলে মারধর করতেও পারে বোধ হয়! নিতাই শুনেচি ভারী একরোখা ছেলে। নিজে যা ভালো বোঝে, তা করতে কারো চোখ রাঙানি গ্রাহ্য করে না।

শশী কহিল,—ওই জন্যই তো আমি ওকে সবার চেয়ে ভালোবাসি। ভাবছিলুম, আমাদের কথাটা ওকে নয় বলি···

এ কথার মধ্যে নিজের প্রতি কতখানি ইতর গ্লানির ইঙ্গিত আছে, সেটুকু মনে করিয়া বিন্দু সসঙ্কোচে কহিল,—ঘরের কথা তার কাছে নাই বা বললে ঠাকুরপো···

শশী কহিল,—আমি একা, আর তুমি মেয়েমানুষ—একজনকে পাশে সহায় পেলে আমার পক্ষে লড়া কত সহজ হয় বলো দিকিন! নিতাই কারো তোয়াক্কা রাখে না! ওকে বলি···; তারপর দু'জনে মিলে ঐ চরণ ভট্চা যটাকে দেখে নি একবার। ওর মোসাহেবির নিকেশ করি।

এই কথা বলিয়া নিতাইয়ের গৃহের পথে কিছু পূর্ব্বে সন্তুর বাড়ীর সম্মুখে চরণের সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেটুকুও শশী বিন্দুর কাছে বিবৃত করিল, করিয়া কহিল,—ব্যাটা চামার! ওর বাগ্দীপাড়ার খাতাপত্রখানা আবিষ্কার করতে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে শশী আরো উত্তেজিত হইবে এবং সে উত্তেজনা যে তাকে কেন্দ্র করিয়াই বাড়িয়া উঠিবে, বিন্দুর তা নিঃসংশয়ে জানা ছিল। এ উত্তেজনা-প্রকাশে কোনো ফল নাই, মাঝে হইতে পাড়ায় বাস করার ব্যাপারেও ক্রমে অশান্তি, শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা জাগিতে পারে, ইহা ভাবিয়া ও-প্রসঙ্গে বাধা দিয়া বিন্দু কহিল,—তা ও ছেলে-টিকে নিতাই পেলে কোথায়?

শশী কহিল,—বললে, তাদের এক বোটের মাঝি ছিল হানিফ—তার ছেলে। ছেলেটিকে দেখলে মুসলমান বলে চট্ করে ধরা যায় না।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—মুসলমান হলেই কি চেহারা উল্টো রকমের হবে? এমন পাগলের কথাও তো শুনিনি।

শশী কহিল,—আচ্ছা বৌঠাকরুণ, ঐ মুসলমানকে যদি আমি ছুঁই?

বিন্দু কহিল,—তার মানে?

শশী কহিল,—তার গায়ে পড়ে ছুঁতে যাচ্ছি না, অবশ্য। ধরো দৈবাতের কথা! যদি দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেলি···?

এই অবধি বলিয়া শশী একবার থামিয়া বিন্দুর পানে চাহিল। বিন্দু কোনো জবাব না দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে আবার কহিল,—তাহলে আমায় গোবরজলে নাইয়ে তবে বোধ হয় বাড়ী ঢুকতে দেবে···না?

বিন্দু বিস্ময়-ভরা স্বরে কহিল,—কেন?

শশী কহিল,—নয় ? সে যে মুসলমান। তোমাদের শাস্ত্রে মুসলমানকে একদম তফাতে রাখতে বলে ··

বিন্দু কহিল—আমি তো ভাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নই মুখ্যু মেয়ে মানুষ। অত আচার-বিচারের মানেও বুঝি না। মুসলমানকে যে-বিধাতা গড়েছেন, আমাকেও তো তিনি গড়েছেন। না, বিধাতারও স্বধর্ম্ম-বিধর্ম্ম আছে ?

প্রচুর উৎসাহে শশী কহিল,—লাখ কথার এক কথা। ঠিক বলেচো বৌঠাকরুণ। নিতাইও তাই বলছিল। অর্থাৎ আমার ছিপগাছটা সেই ছোকরা ধরে ছিল, সেটা ছুঁতে আমার কেমন বাধছিল। নিতাই তাই তাতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে হেসে আমার হাতে দিলে, দিয়ে ঐ কথা বললে। ·· আমার কিন্তু এমন সংস্কার যে এই সামান্য ব্যাপারে দ্বিধা বোধ করছিলুম। ভাবছিলুম, মুসলমানকে ছুঁয়ে বিগ্রহ পূজা করতে পারা যায় কি না !

বিন্দু কহিল,—কেন ভাই, তোমার দাদার কথা মনে পড়ে না ? সেবার মুসলমান-পাড়ায় আগুন লেগে যখন সব পুড়ে ছাই হচ্ছিল, গাঁয়ের অত সব মাতব্বর লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজাই দেখছিল শুধু—তোমার দাদা থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে তাদের চালে উঠে চাল কেটে দেন্ ! তাতে কতকগুলো চালা বাঁচে। তারপর মোড়লরা তাঁকে কত টিটকারী দেয়। তিনি বলেন, টিকি রক্ষে করে মানুষ মরচে দেখলে টিকির জাত যায় না ? আরে জাত যায় মানুষকে মরণের দোর থেকে হাত ধরে টেনে বাঁচাতে গেলে, না ? সেই অবধি সবাই তাঁকে তামাসা করতো, মৌলবী ভট্চায্যি বলে !

শশী কহিল,—তোমার কথা শুনে বাঁচলুম বৌঠাকরুণ। ঐ বিশ্রী সংস্কারটা আমার মনের সহজ ইচ্ছার উপর এমন চেপে বসেছিল যে স্নান করতে গিয়েও তাকে সরাতে পারিনি ! স্নান করতে করতে ভাবছিলুম, এই গঙ্গার অন্য ঘাটে মুসলমান স্নান করচে হয়তো, তাতে গঙ্গার কৈ জাত যাচ্ছে না, আর সেই গঙ্গার জল এনে ঠাকুরের পূজাও তো করচি।

বিন্দু কহিল,—ঠাকুর সকলের মধ্যেই আছেন ভাই। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, এ সব ভেদ তো মানুষের মনগড়া। ছোট ছেলেটি যখন জন্ম নেয়, তখন সে টিকি নিয়ে আসে না, কলমা পড়েও আসে না ! তার হাসি-খেলায় সব ধর্ম্মের সব-মানুষেরই প্রাণ গলে !

শশী কহিল,—মানুষ মানুষ—এ ছাড়া তার অন্য পরিচয় নেই—এই কথাই ঠিক। তার পর স্বভাবের গুণে কেউ হয় বড়, কেউ ছোট। ঐ যে চরণ ভট্চায্যি··· তার চেয়ে এই মুসলমান কাশিমের দিকেই মন আমার ঝুঁকচে বটে !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশন স্কুল

মস্ত পুকুর। দুই বন্ধুতে ছিপ ফেলিয়া ফাৎনার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া পণ্ডশ্রম সার হইয়াছে। নিতাইয়ের নির্দ্দেশ-মত কাশিম মাঝে মাঝে জলে চার ফেলিয়া মৎস্য-গোষ্ঠীকে সবিশেষ প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সে বেচারীও বড় আশা করিয়া আসিয়াছে, কত মাছ উঠিবে ! মাছ এ পর্য্যন্ত উঠিল না দেখিয়া নিতাই বা শশীর চিত্ত অস্থির না হইলেও, ছেলেমানুষ কাশিম নৈরাশ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মাছ ধরার ব্যাপারে তার উৎসাহ ক্রমে নিবিয়া আসিতেছিল। এক ফাঁকে সরিয়া আসিয়া সে পাদ্রীদের স্কুল-বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল।

মাঝারি আকারের একতলা বাড়ী। ফ্লোরের উপর দুদিকে কাঠের রেলিঙ আঁটা টানা বারান্দা, মাঝখানে ঘরগুলি। এই ঘরগুলিতে ছেলেরা পড়াশুনা করে। ·ই বাড়ীর পাশেই বাংলা প্যাটার্ণের ছোট একটি বাড়ী—আশে-পাশে সম্মুখে-পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা। এই খোলা জায়গার এক প্রান্তে ফ্লোরের উপর কতকগুলা ঘর। বোর্ডিং, ডিস্‌পেন্সারী, রান্নাবাড়ী সেইদিকে। এই স্কুল-গৃহের সামনে একধারে প্যারালেল বার, রিং, দোলনা প্রভৃতিতে সজ্জিত ক্রীড়াভূমি। আর এই স্কুলগৃহ, বাংলো প্রভৃতি সমস্তটা একই কম্পাউণ্ডে তারের বেড়ায় ঘেরা।

খেলার মাঠে দশ-বারো জন ছেলে ছুটিয়া মহা কলরবে খেলাধূলা করিতেছে। ছেলেদের বয়স সাত হইতে বারো বৎসর। কেহ দোল খাইতেছে, কেহ প্যারালেল বারে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে,—এবং কয়েকটি ছোট ছেলে একটা ফুটবল লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ইহাদের খেলাধূলার তদারক করিতেছে এক সুন্দরী কিশোরী বাঙালী—তার পরণে কালা পাড় শাড়ী, ক্রচে আঁটা, গায়ে সাদা ব্লাউশ, পায়ে জুতা-মোজা। কিশোরী পরম স্নেহে ছেলেদের খেলায় যোগ দিয়া তাদের খেলার আনন্দ অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বেড়ার ওধারে দাঁড়াইয়া কাশিম খেলা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল। সে যদি উহাদের ঐ দলে ভিড়িতে পারিত ! উহাদের ঐ হাসি-কলরবে নিজের কণ্ঠ মিশাইবার একটু সুযোগ পাইত।···এমনি দেখা আর ভাবার মধ্যে তার কিশোর চিত্ত একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।···

হঠাৎ ছেলেরা তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চমক ভাঙ্গিল। ছেলেরা কি বলিতেছে ?

ছেলেরা তাকেই ডাকিতেছিল—ওহে—এই...

চারিধারে একবার সে চাহিয়া দেখিল, না, কাছাকাছি আর তো কেহ নাই। এরা তবে···

ছেলেরা আগাইয়া আসিয়া কহিল,—আমাদের বলটা কুড়িয়ে দাও তো···

কাশিম তখন ব্যাপার বুঝিল, বুঝিয়া পাশে চাহিয়া দেখে, ফুটবলটা অদূরে পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া সে ছেলেদের দিকে ছুড়িয়া দিল। ছেলেরা বল পাইয়া মহানন্দে তাহাতে কিক্ মারিতে ছুটিল। আর কাশিম ? ঐ বলটা যে সে স্পর্শ করিতে পাইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই সে কৃতার্থ!

স্কুলের ঘরে ঘণ্টা পড়িল। কিশোরী তখন সকলকে আহ্বান করিল এবং ছেলের দল তার সে আহ্বানে এক মুহূর্ত্তে খেলা ছাড়িয়া স্কুল-গৃহের দিকে ছুটিল! কিশোরী ডাকিল—মহাবীর...

সাদা চাপকান পরা একটি বালক ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। বলটি তাহাকে কুড়াইতে বলিয়া কিশোরী স্কুল-গৃহে চলিয়া গেল।

কাশিম সেই স্কুল-গৃহের দিকে তেমনি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপর রৌদ্র তখন মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, সে দিকে তার হুঁশ ছিল না। ঐ পড়ার বই ধরিয়া সুর করিয়া ওরা ও-কোন্ কল্পলোকের কি-বার্ত্তা সংগ্রহ করিতেছে···কাশিমকে কে তাহা বলিয়া দিবে? ও-লোকেও এই আকাশ, এই বাতাস, এই গাছ-পালার দীঘল শ্যামল ছায়া, পুকুরের এই কালো জল,—এই সবই আছে? না, কেবল পরীর স্বপ্নে, দৈত্যের ভয়ে ও-কল্পলোক পরিপূর্ণ? কাশিমের সারা চিত্ত ঐ কল্পলোকের একটু পরিচয় পাইবার জন্য অসহ্য আকুলতায় গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ ঝর্‌ঝর্ করিয়া বর্ষার বারিধারা বিপুল বেগে ঝরিয়া পড়িতে কাশিম চমকিয়া স্কুল-গৃহের ফটক পার হইয়া একেবারে টানা বারান্দায় গিয়া উঠিল। ভিতরে ছেলের দল তাকে দেখিয়া চোখ ফিরাইল। কি মজাই না ওই ছেলেটির—এমন বর্ষায় বারিধারায় মাতন তুলিবার কি অবাধ অধিকার! কারো নিষেধ নাই, কোনো বাধা নাই! আর তারা···? কাশিম ভাবিতেছিল, এই মেঘের অন্ধকারে ছাওয়া দুনিয়ার মাঝে যেটুকু আলো, তা ঐ ঘরের মধ্যে ছেলেদের হাতের বইগুলার পাতাতেই বুঝি সব গিয়া জড়ো হইয়াছে।

বৃষ্টির বিরাম নাই। নিবিড় কালো মেঘ আরো নিবিড়, আরো কালো হইয়া আসিল। বর্ষার ধারা আরো বেগে নামিল। সে আঁধারে ঘরের মধ্যে বহির পাতায় ছাপা অক্ষরগুলা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সামনের ক্লাশে সেই কিশোরী পড়াইতেছিল। কাশিমকে লক্ষ্য করিয়া ক্লাশের একটি ছেলে বলিয়া উঠিল,—একটা ছেলে বারান্দায় ভিজচে···

কাশিমকে কিশোরী লক্ষ্য করিয়াছিল। কিশোরী বাহিরে আসিল, কাশিমকে দেখিয়া কহিল,—কোথা থেকে আসচো?

কাশিমের বিস্ময়ের মাত্রা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সে কোনো জবাব দিতে পারিল না। কিশোরী তার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিল,—তুমি তো আমাদের স্কুলে পড়ো না!

কাশিম এ কথায় থতমত খাইয়া গেল। হঠাৎ স্কুল-বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে—হয়তো এ মস্ত অপরাধ। কুণ্ঠিত স্বরে সে বলিল,—না।

কিশোরী কহিল,—কোথায় থাকো তুমি?

কাশিম কহিল,—দূরে—গাঁয়ে—ঐ বামুনপাড়ায়।

কিশোরী কহিল,—তোমার নাম?

কাশিম নিজের নাম বলিল। শুনিয়া কিশোরী বলিল,—কিন্তু তুমি তো মুসলমান। বামুনপাড়ায় থাকো যে।

কাশিম যেমন বুঝিত, তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—আমার বাবা মরে গেছে। কেউ নেই। তাই মনিব আমায় বাড়ীতে নিয়ে রেখেচেন।

কিশোরী কহিল,—লেখাপড়া করো না তুমি?

—না।

কিশোরী কহিল,—এই বৃষ্টিতে এখানে ভিজছিলে যে!

কাশিম বলিল, তার মনিব কাছের পুকুরে মাছ ধরিতে আসিয়াছেন, সেও সঙ্গে আসিয়াছে। তার ভালো লাগে নাই, তাই ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, তারপর বৃষ্টি নামিয়াছে···

কিশোরী কহিল,—বড্ড ভিজে গেছ যে। ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ হবে। ও-কাপড়টা ছাড়ো!

কাশিম কহিল, ছেলেবেলা হইতেই এ রকম ভেজা তার অভ্যাস আছে।

কিশোরী কহিল,—তা হয় না। ভিজে কাপড় ছেড়ে ফ্যালো ···কিছু খাবে?

কাশিম কহিল,—খাবো।

তার ক্ষুধা পাইয়াছিল। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির সামনে ক্ষুধার কথা বলিতে চিরদিন সে কুণ্ঠিত থাকে। হয়তো এখনো আহারের ইচ্ছা কিশোরীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিত না; কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া এই আবহাওয়া কিশোরীর এই দরদ-মমতা তার প্রাণে এমন আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছিল যে ইহাদের সঙ্গে মিশিতে, আলাপ করিতে, কথা কহিতে তার ঔৎসুক্যের আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

অদূরে উপবিষ্ট এক ভৃত্যকে কিশোরী ডাকিল,—বয়…

বয় আসিল। কিশোরী কহিল,—বিস্কিট, ওঁর লজেঞ্জেস্ লা'ও।

ভৃত্য আদেশ-পালনে ছুটিল।

কিশোরী কাশিমকে প্রশ্ন করিল,—তোমার মনিবের নাম কি?

কাশিম বলিল,—নিতাই বাবু।

—হিন্দু? না, ব্রাহ্ম?

ব্রাহ্ম কথাটার অর্থ কাশিম বুঝিল, ব্রাহ্মণ। সে জবাব দিল,—হ্যাঁ, বামুন।

কিশোরী অবাক হইয়া গেল। হিন্দু ব্রাহ্মণ হইয়া ফুলছড়ির মত পল্লীগ্রামে মুসলমান ছেলেকে আশ্রয় দেওয়া—এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে কহিল—তোমার মনিব কি করেন?

কাশিম জবাব দিল,—তেনার পাঁচখানা গাদাবোট আছে। পাটের কলে খাটে।

—তাঁর আর কে-কে আছেন বাড়ীতে?

কাশিম কহিল—আর কেউ নেই। বাড়ীতে শুধু তিনি আছেন, আর এই আমি থাকি, আর একজন চাকর আছে, গোবরা।

কিশোরীর শ্রদ্ধা হইল এই নিতাই বাবুটির উপর। আবাল্য পাদ্রীদের হাতে সে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলার কথা যতদূর মনে পড়ে, সেই জোন্‌স্ বাবা, —মস্ত দাড়ি, প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত চক্ষু, আর স্নেহভরা বুক! বড় হইলে বাইবেলে যীশুর কথা পড়িবার সময় তাঁর মূর্ত্তিই যীশুখ্রীষ্ট-রূপে বালিকার চোখের সামনে উদয় হইয়াছে এবং আজও যীশুর কথা মনে হইলে সেই একান্ত দরদ আর স্নেহভরা মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে! অতি-দরিদ্র অসহায় আতুরকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করা—এ শুধু তাঁহারি পক্ষে সম্ভব ছিল। তারপর খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশিয়া এই কথাই সে শিখিয়াছে, হিন্দুরা বিধর্ম্মীকে—শুধু বিধর্ম্মীকে কেন, ছোটলোকদের মধ্যে বহু জাতিকে হীন পশুর মত অস্পৃশ্য জ্ঞান করে।

মানুষের উপর মানুষের এ ঘৃণা তার বুকে বাজিয়াছে চিরদিন, এবং তাই এ ঘৃণা যতখানি পারে, কাটাইয়া সে ইতর-ভদ্রনির্ব্বিশেষ সকলের প্রতি দরদী হইবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে। এই জন্যই সে লেখাপড়া শিখিয়া সংসার-জীবনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ছেলে পড়াইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বেত লইয়া পড়া গিলাইবে, এ উদ্দেশ্য তার মোটেই নাই। স্নেহে-মায়ায় ছাত্রদের মন যাহাতে ভরিয়া তুলিতে পারে, ইহাই তার লক্ষ্য।

সম্প্রতি তাদের মিশন হইতে ফুলছড়ির এ পাড়ায় জমি লওয়া হয়; তাহাতে স্কুলও খোলা হয়। কিন্তু গ্রামের সাবধানী ভদ্র-সম্প্রদায় সে স্কুলে ছেলে পাঠাইতে নারাজ। ছেলেরা বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ভুলিয়া যীশু ভজিয়া খৃষ্টান্ বনিবে শেষে! কাছাকাছি আর কোনো স্কুল নাই, সেই দূরে বজবজে, না, কোথায় একটি আছে। ছেলেরা রৌদ্রে-ঝড়ে মাঠ ভাঙ্গিয়া, ট্রেণ ধরিয়া সেখানে যায় লেখাপড়া শিখিতে। ফুলছড়ির স্কুল কাজেই খালি পড়িয়া রহিল।

তখন মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য ছেলেদের জড়ো করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন—তারা বোর্ডিংএ থাকে এবং এই স্কুলে লেখাপড়া করে। স্কুলের কর্ত্রী হইয়া আসিল এই কিশোরী। কিশোরীর নাম সুচিত্রা। পাদ্রী জোন্স তার একটা বিলাতী নামও দিয়াছিল—সিসিল্। সুচিত্রা নাম তার মায়ের দেওয়া। ছেলেবেলায় সিসিল-সুচিত্রা নামটাই চলিত ছিল। বড় হইয়া সে যখন সব বুঝিতে শিখিল, তখন বিলাতী সিসিলটুকু বাদ দিয়া শুধু সুচিত্রা-নামই বজায় রাখিল।

মিশনের সঙ্গে অনেক তর্ক করিয়া সুচিত্রা বুঝাইয়া দিয়াছিল, ছেলেদের লেখাপড়া ও দেখাশুনার ভার পুরুষের হাতে দিলে ঠিক হইবে না। ছোটদের দেখাশুনার ভার দেওয়া উচিত নারীর হাতে। দরদে-স্নেহে চরিত্রকে গড়া যেমন সহজ হয়, ছেলেদের আব্দারও তেমনি মেয়েরা শুধু সহিতে পারে। তাদের সুখ-দুঃখের খুঁটিনাটি খপরও মেয়েরা রাখিতে জানে, এবং কাজেই সে খবর রাখিয়া চারিদিক বুঝিয়া তাদের মনগুলিকে বাঁকাইয়া নোয়াইয়া অনায়াসে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। মিশন এ-কথার মূল্য বুঝিয়া এ স্কুলের ভার তার হাতেই অর্পণ করিল।

তার সঙ্গে আর একটি মহিলা শিক্ষক আসিল, মেরি জ্যোৎস্না, এবং একজন শিক্ষক—নীলকণ্ঠ স্মিথ। স্কুলের সংলগ্ন যে তিন কামরা বাংলাখানি আছে, তারি দুটি কামরা সুচিত্রার; অপরটি জ্যোৎস্নার। স্কুলের বাহিরে ছোট একখানি বাংলা—সেই বাংলায় নীলকণ্ঠ স্মিথ বাস করে।

সুচিত্রা এখানে আসিয়া ভদ্র-পল্লীতে লোক পাঠাইয়া বহু সাধ্য-সাধনাতেও যখন স্কুলে ছেলে পাঠানোয় তাদের রাজী করাইতে পারিল না, তখন তার মনে বেদনা জাগিল। সে বেদনায় ধৈর্য্য না হারাইয়া সে ইতর পল্লীর ঘরে ঘরে গিয়া পল্লীবাসীদের প্রথমে মিষ্ট ব্যবহারে ও মিষ্ট বচনে বিমুগ্ধ করিল; পরে ভালো করিয়া বুঝাইয়া বিনা-বেতনে তাদের ছেলে-মেয়েদের আনিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। বেচারা অনাদৃত ইতর-সম্প্রদায় —দেশের লোকজনের কাছ হইতে দরদের এতটুকু ছোট দৃষ্টিও কোনো দিন লাভ করে নাই—তারা সুচিত্রার কথায় ও ব্যবহারে গলিয়া গেল এবং বিনা-খরচে

ছেলেগুলাকে লেখা-পড়া শিখাইলে, ভবিষ্যতে তাদের চাকরি মিলিবে, চাকরির এমন সুযোগ যখন আয়ত্তে, তখন সে সুযোগটুকু হেলায় হারাইয়া তাদের ভবিষ্যৎ পণ্ড করিতে তারা এক নিমেষ ইতস্ততঃ করিল না।

বয় লজেঞ্জেস ও বিস্কুট আনিয়া দিলে সুচিত্রা কাশিমের হাতে সেগুলা দিয়া কহিল,—খাও।

কাশিম বিস্কুট মুখে দিল। সুচিত্রা বলিল,—তুমি স্কুলে পড়বে? তোমার মনিবকে বলো, এখানে পড়লে পয়সা লাগবে না। বুঝলে?

কাশিম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, এ কথা সে মনিবকে বলিবে।

সুচিত্রা কহিল,—তোমার মনিবের বাড়ী তোমায় কোনো কাজ-কর্ম্ম করতে হয়?

কাশিম কহিল,—না।

সুচিত্রা ভাবিল, মনিব বেশ ভালো লোক তো। পরের ছেলেকে ঘরে রাখিয়া খাইতে দেয়, অথচ তাহাকে খাটায় না! এমন স্বার্থজ্ঞান-হীন লোকও এ গ্রামে আছে!

খাওয়া চুকিলে কাশিমের মনে হইল, বহুক্ষণ সে পুকুর ছাড়িয়া এখানে আসিয়া রহিয়াছে। সেখানে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে? ব্যস্ত হইয়া সে কহিল,—আমি যাই।

সুচিত্রা কহিল,—ভিজে কাপড় ছেড়ে তবে যাও।

কাশিম কহিল,—তাতে কি! আমাদের হামেশা জলে ভেজা অভ্যাস আছে।

সুচিত্রা কহিল,—তা হয় না। এই জলে ভিজলে সত্য অসুখ করবে,—বিশেষ ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ তোমায় থাকতে হবে! তার পর ঐ কাপড়েই তো বাড়ী ফিরবে। একটা ছাতাও আনিয়ে দি। নিয়ে যাও।

কাশিম আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল,—বৃষ্টি ধরে গেলে দিয়ে যাবো'খন। বেশ, ছাতাই দিন। ওখানে ওঁরাও ভিজচেন।

সুচিত্রা কহিল,—তোমার মনিব মাছ ধরতে এসেচেন—বললে না? তা এ বৃষ্টিতে কি মাছ পাবেন? বেশ, তুমি এক কাজ করো। ছাতা নিয়ে যাও—তাঁরা যদি পথে দাঁড়িয়ে ভেজেন, তাহলে এখানে আসতে বলো। তার পর বৃষ্টি ধরলে সব যাবেন।

ছাতা আসিল। কাশিম ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া গেল। পুকুর-ধারে গিয়া দেখে, নিতাই মস্ত একটা কচু পাতায় মাথা ঢাকিয়া ছিপ লইয়া তেমনি বসিয়া আছে, আর শশী এক গাছ-তলায় বসিয়া—শশীর পায়ের সামনে ক'টা মাছ।

মাছ দেখিয়া কাশিম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—কখন ধর্‌লেন? যেই আমি গেছি···না?

শশী কহিল,—একটা আমি ধরেচি, বাকীগুলো নিতাই ধরেচে।

কাশিম কহিল,—আপনি আর ভিজবেন না—ছাতা রয়েচে। নেবেন? কাশিম ছাতা আগাইয়া ধরিল।

মুসলমানের হাতের স্পর্শ! সংস্কার আবার মাথা তুলিল। শশীর ছাতার প্রয়োজন ছিল না। তবু ঐ সংস্কারকে চাপিয়া হত্যা করিবার জন্যই শুধু সে হাত বাড়াইয়া ছাতা লইল; তারপর কাশিমের পানে চাহিয়া কহিল,—আমি গাছতলায় আছি, তত জল পাচ্ছি না। ছাতাটা বরং নিতাইকে দাও—কচুপাতা ছেড়ে ছাতার তলায় মাথাটা ওর রক্ষা পাক্!

কাশিম ছাতা লইয়া নিতাইয়ের কাছে গেল। এত বৃষ্টি—নিতাইয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! সেই প্রচণ্ড বর্ষা মাথায় ধরিয়া ফাৎনাতে সমস্ত মন সঁপিয়া বসিয়া আছে! কাশিম অগত্যা ছাতা খুলিয়া নিতাইয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। আর আকাশ ছাপাইয়া বর্ষার অবিরাম ধারা ঝম্‌ঝম শব্দে মাতিয়া মহাসাগর-সৃষ্টির উল্লাস-কল্পনায় অঝোরে ঝরিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুচিত্রা

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি থামিল। পথ একেবারে নদী-নালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। মাছ ধরার পর্ব্ব শেষ করিয়া নিতাই কাশিমকে প্রশ্ন করিল,—এ ছাতা কোথায় পেলি রে?

কাশিম ছাতার বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাকে যে দরদ করিয়া স্কুলের মেম-মা খাবার খাইতে দিয়াছে, সে কথাও গোপন করিল না। শুনিয়া নিতাইয়ের মন স্কুলের মেম-মার প্রতি প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। তবে যে সে শুনিয়াছিল, বিবি-মা লজেঞ্জেসের জাল পাতিয়া এ দেশের ছেলেগুলাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আসক্ত করিয়া তুলিবার সঙ্কল্পে স্কুল খুলিয়াছে এবং এজন্য পল্লীর যত ইতরের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মোহিনী মায়ায় তাদের মুগ্ধ করিয়া ছেলে-গুলাকে বিনা-বেতনে স্কুলে ঢুকাইয়াছে—এ সব কথা অলীক রটনামাত্র! নহিলে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বাহিরের ছেলে কাশিমকে ডাকিয়া খাইতে দিবে কেন? আর এই জলে ভিজিয়া পাছে তার অসুখ হয়, ইহা ভাবিয়া তাকে বিশ্বাস করিয়া ছাতাই বা ছাড়িয়া দিবে কেন? নিতাই বলিল,—গোটাসাতেক মাছ আছে—তা···তোমার কটা চাই, শশীদা?

শশী কহিল,—একটা হলেই হবে। খাবার লোক তো আমি একমেবাদ্বিতীয়ং······

নিতাই কহিল,—পাড়ার কাউকে দেবে না?

শশী কহিল,—ঐ হতভাগাগুলোকে? রাম বলো!

নিতাই কহিল,—বেশ, আমি একটা নেবো। একটা দেবো গফুরকে,…তারই পুকুর কি না। বাকী থাকে তাহলে চারটে! এ চারটে কাশিমের ঐ মেম-মাকে দিয়ে যাই।…এতগুলি ছেলে স্কুলে পড়ে—তারা খেলে তৃপ্তি হবে। কি বলো শশীদা?

শশী কহিল—এত ভিজে এত মেহনৎ করে ধরা মাছ…তা খাবে ঐ খ্রীষ্টানগুলো?

নিতাই কহিল,—কাকে দিতে চাও, বলো? তোমার কোন্ পরম হিন্দু বন্ধু আছেন, বলো, যাকে দিলে তুমি তৃপ্তি পাবে?

শশী কহিল,—তা বটে! যত ব্যাটা স্বার্থপর বদ-মায়েস। খাবার নোলা যাদের এতখানি, তাদের দেওয়ার চেয়ে…

শশীর মুখের কথা লুফিয়া নিতাই কহিল,—এই নির্ব্বিরোধী খ্রীষ্টানদের মুখে দিলে তৃপ্তি…কেমন? আমিও তাই বলছিলুম। ভাবো তো শশীদা, ঘরে বসে পরচর্চ্চা করলে কি আরামেই এদের দিন কাটতো, তা না করে গাঁটের পয়সা ব্যয় করে যাদের মুখের পানে চাইতে কেউ নেই,—সেই সব বেচারীদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, বিদ্যা দান করচে! এত বড় বেকুব…তা এ মাছ ঐ বেকুবদেরই খাওয়ানো যাক্। এরা খেয়ে আর কিছু না করুক, অন্ততঃ এ কথা বলবে না যে, হতভাগা-গুলো খেটে মাছ ধরলে, আর তাদের ঠকিয়ে সে-মাছে আমরা রসনার কি পরিতৃপ্তিই সাধন করলুম!

শশী এ শ্লেষের অর্থ পূরাপুরি উপলব্ধি করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—বলেচো ঠিক কথা নিতাই! তাই চলো। কাশিমের তরফ থেকে এতে ধন্যবাদও ভালো রকম জানানো হবে।

নিতাই কহিল,—অন্ততঃ হিন্দু যে ছাতার ঋণ স্বীকার করে, এ কথাটা খ্রীষ্টানদের বোঝানো যাবে তো!

শশী এ কথার অর্থ ঠিক বুঝিল না, শুধু বলিল,—চলো তাহলে।

গাছে অনেকগুলা লতা দুলিতেছিল। একটা লতা ছিঁড়িয়া সেই লতায় বাঁধিয়া কাশিম মাছগুলা হাতে ঝুলাইতে নিতাই কহিল,—তুই একা পারবিনে, কাশী,—কতকগুলো আমায় দে। ছাতাটা বরং তুই নে। আর ছিপ, দুটো তুমি ধরো শশীদা।

তিনজনে তখন অগ্রসর হইল। স্কুলের ছুটী হইয়া গিয়াছে। কাছাকাছি যে-সব বাড়ী হইতে ছেলেরা স্কুলে রোজ পড়িতে আসে, তারা সকলে চলিয়া গিয়াছে। স্কুলের খেলার মাঠে ছেলেরা সেই বল লইয়া মাতামাতি করিতেছে; এবং দালানের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া একটা ভৃত্য আদুড় গায়ে দাঁড়াইয়া আছে।

তিনজনে আসিয়া স্কুলের ফটকের সুমুখে দাঁড়াইল এবং নিতাই সেই ভৃত্যকে হাতছানি দিয়া ডাকিল,—ওহে ছোকরা…

ভৃত্য কাছে আসিল। শশী নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—এর হাতে সমর্পণ করা ঠিক হবে না। কোথা থেকে মাছ এলো, কেন এলো, কেউ বুঝবে না। তাছাড়া ছাতাটা যদি উড়িয়ে ছায়—কি বলো?

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল,—দেশের লোক, স্বধর্ম্মী হয়তো, কিন্তু তাকে কতখানি অবিশ্বাস করি, বলো দিকিনি শশীদা!

শশী একটু অপ্রতিভ হইল, কহিল,—কি জানি ভাই, আমার মন হয়তো ভারী ছোট…

নিতাই কহিল,—মন ছোট নয়। অবিশ্বাস অমনি জাগে না, শশীদা। বহু পরীক্ষায় মন এই অবিশ্বাসকে স্থান দেছে। এ কতখানি দুর্ভাগ্য, বলো তো!

এইটুকু বলিয়া কাশিমের পানে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল,—মেম-মা বল্লি না?

কাশিম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

নিতাই তখন ভৃত্যকে কহিল,—মেম-মা কোথায় রে?

ভৃত্য পদ-মর্য্যাদা বুঝাইতে ঠোঁট একটু বাঁকাইল; তারপর অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিল,—বাসায়।

নিতাই কহিল,—বাসা কোথায়?

বাংলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভৃত্য কহিল,—ঐ।

নিতাই কহিল,—একবার সেলাম জানিয়ে বল্ যে, তিনটি লোক এসেচে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দরকার আছে।

ভৃত্য কহিল—এখন তিনি চান করচেন, তার পর চা-টা খাবেন—এখন দেখা হবে না।

নিতাই বিরক্ত হইয়া কহিল,—আরে মর্, রাশভারি করচে দ্যাখো। তারপর বেশ চড়া গলায় কহিল—চা খাচ্ছেন, কি কি করচেন, তোর অত বক্তৃতার দরকার কি? বলচি, দরকার আছে—তুই খপর দে দিকিনি! ছুঁচো কোথাকার!

নিতাইয়ের ঝাঁজালো কথায় ভৃত্য একটু বিচলিত হইল। সাহেব মনিবের কাছে সে কাজ করিতেছে, এমন ঝাঁজ দেশী লোকের কাছ হইতে কখনো প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু নিতাইয়ের বলিষ্ঠ দেহ আর সুদৃঢ় কণ্ঠস্বরে তর্ক বাড়াইবার সাহস তার হইল না। সে কহিল,—কাট্ আছে?

কাট! নিতাই একটু অবাক হইয়া ভাবিল! পর-ক্ষণে হো-হো-করিবা হাসিয়া কহিল,—ও, কার্ড! ব্যাটার সব দিকে কেতা দুরস্ত দেখচি!…কাট নেই,

তবে মাছ আছে, আর এই ছাতা—তোর মেম-মার ছাতা। যা, বল্ গে যা, ছাতা ফিরিয়ে দিতে এসেচি।

ভৃত্য কহিল,—তা দাও না!

নিতাই কহিল—তোর হাতে দেবো না। তারপর ভর্ৎসনার স্বরে কহিল—তুই খপর দিবি কি না বল্? নাহলে আমার যা করবার করি।

ভৃত্য এবার বিরক্তির স্বরে কহিল—আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি খপর দি। বলিয়া সে চলিয়া গেল বাংলার দিকে।

নিতাই কহিল,—দেখলে শশীদা, এই পুঁচকে চাকর ছোঁড়াটার স্পর্দ্ধা! তোর মনিবের সঙ্গে দেখা করতে এসেচে ভদ্দর লোক, তা গ্রাহ্য করবি নে! তাকে দাঁড় করিয়ে হাজার কথা তুলবি! সমাজের দোষ যে দাও সব ব্যাপারে—এখানে তো তোমার সমাজ নেই···তবু এ ব্যাটার এ রকম প্রবৃত্তি কেন, বলো তো? এ আর কিছু নয়—কুশিক্ষা আর কুসংস্কার একে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেচে যে একটুখানি সাহেব-মনিবের ঘেঁষ পেয়ে নিজেকে প্রবল প্রতাপান্বিত ঠাউরে নিয়েচে! কলকাতায় অনেক সাহেব-সুবোর সঙ্গে আমায় দেখাশুনা করতে হয় তো, সেখানেও দেখেচি, সাহেবরা আমাদের তত অগ্রাহ্য করে না, যতখানি করে তাদের চাকর-নফর-কেরাণী-চাপরাশির দল। তারা আমাদেরি দেশের লোক! দেশের লোককে দেশের লোক যেমন হীন চক্ষে দেখে, বিদেশী-লোকে তেমন দেখে না! ডোম-চাঁড়ালকে বামুন-কায়েত যে-চোখে দেখে, এই সব ডোমচাঁড়াল চাকর-বাকর সাহেবের তাঁবে দু-দশ টাকার চাকরি পেয়ে বামুন-কায়েতকেও ঠিক সেই চোখে দেখে। এ রহস্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করে দেখো,—এ সবের মূলে সেই এক কারণ—ক্ষমতার দর্প। তা সে ক্ষমতা যতই বাতাসে-ঝরা হোক, যতই পঙ্গু হোক্!

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না। নিতাই ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া যে-ছেলেটি ফুটবল লইয়া খেলা করিতেছিল, তাকে ডাকিল। সে কাছে আসিলে নিতাই প্রশ্ন করিল—তোমরা এই স্কুলেই থাকো?

সে বলিল,—হাঁ।

—তোমাদের মা-বাপ যে ছেড়ে দেছে?

—মা-বাপ নেই।

—কে আছে?

সে কহিল, তার এক মামা আছেন, তিনিই কোনো সূত্রে খপর পাইয়া তাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। আর একটি ছেলে কাছে আসিল; তাকে প্রশ্ন করিতে সে কহিল, তার বড় ভাই শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে—সেখানে তার থাকা দুঃসহ ঠেকিতে এখানে পাঠাইয়াছে।

নিতাই কহিল—তোমাদের খরচ-পত্র তাঁরা দেন?

দুজনেই কহিল, খরচ লাগে না। এখানে তাদের বিনা-খরচায় থাকিতে ও লেখাপড়া শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিতাই কহিল—ত্যাখো শশীদা, দেশের লোক,—নিজের ভাই, মামা যাদের পুষতে চায় না, কোন্ মুলুক থেকে বিধর্ম্মী এসে তাদের বুকে তুলে নিয়ে লালন-পালন করচে! সত্যি, এদের কথা শুনে এদের উপর আমার এমন শ্রদ্ধা হচ্ছে যে ভাবচি, সারা দেশের লোক যদি হুড়মুড় করে আজ জর্ডানের জল মাথায় দিয়ে খ্রীষ্টান হয় তো আমি হরির লুট দি! দূর, দূর, যত ব্যাটা সমাজপতি···খালি এক-ঘরের বন্দোবস্ত নিয়ে পড়ে আছে! এ জাতে আবার মানুষ, এ জাতের আবার সমাজ!

নিতাই অসংবদ্ধ অনেক কথাই বলিতে লাগিল। এমন কথা নিতাইয়ের মুখে শশী নিত্য শোনে, এবং শুনিয়া শুনিয়া সমাজকে হীনতার পঙ্কে মজ্জিত দেখিয়া তার বিরুদ্ধে শশীর মনও থাকিয়া থাকিয়া ফুঁশিয়া ওঠে! কিন্তু এমন করিয়া সব খুঁটিনাটিগুলা তার চোখে পড়ে না এবং সে খুঁটিনাটিগুলার সম্যক আলোচনাও তার দ্বারা সকল সময় সম্ভব হয় না।

নিতাইয়ের কথায় তার চোখের সামনে সমাজের শত-ক্ষত-জীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বীভৎসতায় ভরিয়া উদয় হইল যে, সে শিহরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, যদি তেমন শক্তি থাকিত তো প্রবল চপেটাঘাতে ঐ সমাজের দৃষ্টি এদিকে ফিরাইয়া ধরিয়া সে বলিত, এগুলা সারাইয়া তোল্, নহিলে তোর অস্তিত্ব দু'দিন পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! কিন্তু কাকেই বা সে এ-কথা বলিবে? তাই চুপ করিয়া নিতাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, মেম-মা এখনি আসিবেন এবং বাবুরা ইচ্ছা করিলে ঘরে আসিয়া বসিতে পারেন।

নিতাই কহিল,—থাক্, ভিজে কাপড়ে আর ঘরে ঢোকে না। এইখানেই দাঁড়াই। তোর মেম-মা যতক্ষণ না আসেন। তারপর শশীর দিকে চাহিয়া কহিল,—এখানে এই স্কুলটুকু খুলতে এদের কম বেগ পেতে হয়েচে, শশীদা! তুমি তো জানো সব! এই গ্রামে এত ভদ্রলোকের বাস, অথচ একটা স্কুল নেই। বাবা নিজে থেকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার হয়ে ঐ সত্ন বাঁড়ুয্যের দলকে সেধেছিলেন, সকলে মিলে কিছু কিছু টাকা দিয়ে একটা ছোটখাট স্কুল নিদেন খোলো। নাই হলো কোঠা-বাড়ী,—আটচালাতেই ছেলেরা পড়বে। একটা স্কুলের আবহাওয়ায় লোকের লেখা-পড়ায় প্রবৃত্তি জাগে কতখানি! তা সত্ন বাঁড়ুয্যের দল সে-কথা কাণে তুললে না। তারপর এরা যখন আমাদের পাড়াতে

জমি নিতে আসে, তখন গাঁয়ের লোক এককাট্টা হয়ে বললে, খ্রীষ্টান এসে বুকের উপর বসবে! আরে বাপু, তারা তো তোদের তলোয়ার দেখিয়ে বলচে না যে, সকলে খ্রীষ্টান হ'। যদিও এটা স্থির, তলোয়ার দূরের কথা, এরা একগাছা চাবুক দেখিয়ে যদি বলে, যে না খ্রীষ্টান হবে, তার বুকে এই চাবুক পড়বে, তাহলে ঐ চরণ ভট্চাযি, সহ বাঁড়ুয্যেই সবার আগে ছুটবে পাঁজি-পুঁথি ফেলে বাইবেল নিতে!...এরা এলো তোদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে। বিনা-পয়সায় লেখাপড়া শিখবে, তাছাড়া খেলাধূলা করবে—না, হিন্দু ধর্ম্মের যত ব্যাটা চূড়ামণি গর্জ্জে উঠলো, তিলার্দ্ধ জমি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করা হবে না! এরা তাই এলো এই মুসলমান-পাড়ায়,—এসে জমি নিলে, স্কুল খুললে। তাও না হয় ছেলেদের স্কুলে পড়তে পাঠা, তাতেও বাদ! ক্ষতি কার?

নিতাইয়ের কথা শেষ হইল না, তার পূর্ব্বেই সুচিত্রা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভৃত্যকে কহিল,—বাবুদের ভিতরে নিয়ে আয়।

তার আবির্ভাবে নিতাই ও শশীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কাশিম কহিল,—ঐ যে মেম-মা এসেচে।...

ইনিই মেম-মা!

যেন সাক্ষাৎ দেবী-বীণাপাণি তাঁর কমল-আসন ছাড়িয়া ইঠ-কাঠে-গড়া বাড়ীটায় আসিয়া দাঁড়াইলেন! চোখে জ্যোতি আর আশা একেবারে ঝলমল্ করিতেছে! ভার্জ্জিন মেরির ছবি নিতাই দু'চারিখানা বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছে...এ যেন ভার্জ্জিন মেরি স্বয়ং!

শ্রদ্ধায় তার মাথা আপনি নত হইল! সে সুচিত্রার পানে চাহিল।

মৃদু হাস্যে সুচিত্রা কহিল,—আপনারা ভিতরে আসুন।

নিতাই ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—ভিজে কাপড়...

সুচিত্রা কহিল,—তাতে কি! আসুন আপনারা। এই যে সে ছেলেটি। এসো...তারপর ভৃত্যকে কহিল,—তিনখানা চেয়ার নিয়ে আয় বারান্দায়।

ভৃত্য আদেশ পালন করিলে সুচিত্রা বলিল,—বসুন আপনারা।

নিতাই কহিল,—আপনি আগে বসুন।

সুচিত্রা আসন গ্রহণ করিলে নিতাই চেয়ার টানিয়া বসিল এবং শশীকে বসিতে বলিল। শশী বসিল। কাশিমকে দেখাইয়া নিতাই কহিল,—এই ছেলেটির মুখে আপনার করুণার কথা শুনে বড় শ্রদ্ধা হলো—তাই কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সামান্য ভেট এনেচি। এই মাছ-গুলি...যে ছেলেদের স্নেহে-মায়ায় আপনি এই বনবাস শিরোধার্য্য করেচেন, তাদের তৃপ্তির জন্য এই তুচ্ছ ভেট...তারা যদি খায়, আমাদের পরিশ্রম তাহলে সার্থক হবে।

সুচিত্রার মুখ এ-কথায় সস্মিত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—আপনার কথায় বুঝচি, আপনিই ঐ অনাথ মুসলমান ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েচেন। আপনারই নাম নিতাই বাবু?

নিতাই কহিল,—আমার নাম নিতাই। সামাজিক ভাবে শ্রীনিতাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ-সন্তান। গলায় যজ্ঞোপবীত...

সুচিত্রা কহিল—আপনার মহত্ত্বের পরিচয় কিছু পেয়েচি একটু আগে আপনার ঐ কাশিমের কাছে!

নিতাই লজ্জায় মাথা নত করিল; পরক্ষণে কহিল—মহত্ত্ব-টহত্ত্ব বড় বুঝি না—একটা অনাথ ছেলে, কেউ কোথাও নেই, অথচ নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের শক্তি হয় নি, রোগে দেখবে এমন জনেরও অভাব, তাই তাকে কাছে রেখে তার কষ্ট যতখানি হাল্কা করা যায়—এই শুধু!

সুচিত্রা কহিল—ক'জন তা করে?

নিতাই কহিল—সকলের প্রবৃত্তি সমান নয়। তা-ছাড়া তাদের সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। আমার এমন কেউ নেই যাকে দেখতে হয়। আমার বোটের কারবার—কতকগুলো মাঝি-মাল্লা আছে—তাদের কাছ থেকে হিসেব নেওয়া—ব্যস্! তারা আমাকে ভালোও বাসে, জুয়াচুরি-তঞ্চকতা করে না! অর্থাৎ লোকের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া শক্ত ব্যাপার নয়। একটু মিষ্টি কথা আর তাদের ব্যথায় একটু দরদ...ব্যস্।

এ লোকটির দুটা কথাতেই সুচিত্রা বুঝিল, কতখানি মহৎ প্রাণ ঐ শক্ত পেশীর নীচে বুকের মধ্যে টল টল করিতেছে! সে কহিল,—এ কথা ঠিক!

নিতাই তৎক্ষণাৎ কহিল,—এই আপনাদের কথা...যে শিক্ষা পেয়েচেন, এবং যে-ভাবে বড় হয়েচেন, তাতে অন্ততঃ ঘরে বসে আরামে আপনি সময় কাটাতে পারতেন! তা না করে এই সব ইতর লোক—ভদ্র-দল যাদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণায় দূরে সরে যায়—এ-ভাবে তাদের সঙ্গ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, তাদের নিয়ে যে এই বাস করচেন, এতে কতখানি মহত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, বলুন তো! আপনারা খ্রীষ্টান্—আপনাদের পাদ্রী সাহেবদের পরোক্ষে যে গভীর অভিসন্ধিই থাকুক, প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে, মনুষ্যত্ব আর মর্য্যাদা-বোধ শিখিয়ে তাদের কি উপকার না করচেন! পাদ্রীরা কি বোঝে না যে, একশোজন হিন্দু-মুসলমানকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার প্রচেষ্টা হয়তো একেবারে নিষ্ফল হবে! তবু এই দান, আর মমতা—এতে তো কখনো কৃপণতা করচে

না! দেশে দেশে এই যে-সব ইনষ্টিটিউশন তারা খুলেচে, তার গূঢ় উদ্দেশ্য যাই থাক, কতখানি লোক-সেবা হচ্ছে তাতে। আমাদের ঐ সব ছোট লোকেরা—আমাদের আরাম দিতে যাদের সৃষ্টি হয়েচে ভাবি, তাদের পোঁটা-ঝরা নোংরা ছেলেগুলোকে চোখে দেখলেই যে আমরা ঘৃণায় শিউরে সরে যাই। আর আপনারা তাদের নাকের পোঁটা মুছিয়ে কোলে তুলে নেন্!···ধর্ম্ম? আমাদের সমাজেও বহু ধর্ম্মধ্বজ আছেন, তাঁরা সেখানে হাঁকচেন—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, দুনিয়া অশুচি! আপনারা সেখানে বলচেন, কাছে এসো, কাছে এসো, ভাই, মিতা বন্ধু তোমরা!···তাই ভাবি, এতখানি দরদেও সারা দুনিয়া আজো কেন খৃষ্টান হয়ে যায় নি!

সুচিত্রা কহিল—আপনি ভাবচেন আমি খ্রীষ্টান? তা নই। আমার খুব ছোট বয়সে মা মারা যায়, খ্রীষ্টান পাদ্রীর হাতে আমি মানুষ হই। তিনি আমায় আদর করে সিসিল বলে ডাকতেন,—এই যা। কখনো খ্রীষ্টান হতে বলেন নি, মাথায় জল ছিটিয়ে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা দিতেও চান্‌নি কোনোদিন। অথচ তা করার কতখানি সুযোগ ছিল! করলে অপরাধও হতো না। এতখানি স্নেহ, এমন আশ্রয় যে পেয়েচে, কৃতজ্ঞতার জন্যও হয়তো সে খৃষ্টান হতে পারতো! বিশেষ, আমি খৃষ্টান হলে কোনো দিক থেকে যখন কোনো নিষেধ উঠতো না এবং খৃষ্টান-হিন্দু যখন আমার কাছে সমান! বাইবেল যেমন পড়েছি, তেমনি রামায়ণ-মহাভারতও চাইবামাত্র পড়তে পেয়েচি। আমাকে এঁরা এক দিনের জন্য প্রশ্ন করেন নি, আমি খৃষ্টান হবো কি না?

নিতাই একটু বিস্মিত হইল, কহিল,—আপনি তাহলে খৃষ্টান নন! আমার ধারণা ছিল, খ্রীষ্টান ছাড়া এখানকার কর্ত্তৃত্ব অখৃষ্টানের হাতে পড়তে পারে না! আশ্চর্য্য কথা বটে!

সুচিত্রা কহিল,—যাক, শুধু বাজে কথা হচ্ছে, অথচ আপনারা ভিজে কাপড়ে অপেক্ষা করচেন।

নিতাই কহিল,—আজ তাহলে আসি। আপনার বেয়ারাকে বলুন, মাছগুলো নিয়ে যেতে—আর এই ছাতাটা। এর আর দরকার হবে না। বৃষ্টি থেমে গেছে।

সুচিত্রা কহিল—একদিন দুপুরবেলা এসে স্কুল দেখে যাবেন। কি রকম কাজ হচ্ছে,···হাজার হোক, মূর্খ স্ত্রীলোক তো আমি!

হাসিয়া নিতাই কহিল,—আমায় বুঝি মস্ত পণ্ডিত পাকড়েচেন! সে যদি বলেন তো আমার এই শশীদা আছে। ওর দাদা কলকাতার কলেজে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ভারী উচু মন ছিল। মারা গেছেন। আর শশীদা আমার সঙ্গে মাছ ধরে বেড়ালে কি হবে, ওর পড়াশোনা বেশ আছে। ওকে বরং এই স্কুলে ভর্ত্তি করে নিন, ছেলে পড়াবার জন্য। দুপুর বেলায় পুকুরের মাছগুলো অন্ততঃ নিশ্চয় আরামে বাঁচবে তাহলে!

শশীকে নমস্কার জানাইয়া সুচিত্রা কহিল,—আপনিও আসবেন দয়া করে এঁর সঙ্গে স্কুল দেখতে।

শশী কহিল,—আসবো।

তার পর বিদায় লইয়া নিতাই, শশী ও কাশিম প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর

সদু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সেই পথ। সদুর রোয়াকে মজলিস জমিয়াছে। তামাকুর সঙ্গে অনেকের অদৃষ্ট পোড়ানোর নানা প্ল্যান চলিয়াছিল। হঠাৎ সেই পথে শশীকে মাছ হাতে আসিতে দেখিয়া কয়েকজন উদর-পরায়ণের নজর টাটাইল। শিবু কহিল,—তাইতো হে শশী, মাছ কোথায় পেলে?

শশী হাসিয়া কহিল,—ও-পাড়ার তাল গাছে।

—তাল গাছে মাছ! সে আবার কি কথা?

শশী কহিল,—এ মজলিসের যোগ্য কথা নয় কি? পুকুরে মাছ মেলে···তা তো বোঝেন! তবে জিজ্ঞাসা করচেন কেন?

শিবু কহিল,—জিজ্ঞাসার মানে, কার পুকুরে ধরলে? মাছটি তো নেহাৎ ছোট-খাট নয়।

শশী কহিল,—তাই বলুন। দান নিয়ে যাচ্ছি না এও বুঝচেন নিশ্চয়!···ওই খৃষ্টানী স্কুলের কাছে মস্ত পুকুর আছে, সেখানকার মাছ।

জ্ঞানশঙ্কর কহিল,—মুসলমান-পাড়ায়?

শশী কহিল,—হাঁ। এ মাছ চোখে দেখলেন, জাত গেল না তো? না, আমি ধরেচি বলে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হবে? তবে মাছটা মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, পরম হিন্দু! এই দেখুন কত বড় টিকি!

বলিয়া সে মাছ-বাঁধা লতাখণ্ডটুকু দেখাইল।

মজলিসে চরণ ভট্টাচার্য্যও বিরাজ করিতেছিল। সে এবারে কথা কহিল। চরণ কহিল,—সব কথায় ডেঁপোমি করা কেমন স্বভাব! না? নিষ্কর্ম্মার লক্ষণই তাই···

শশী কহিল,—কি করি বলুন, মোসাহেবি বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করতে পারিনি, আর বাগ্দীপাড়ায় ঘুরতেও শিখিনি!

চরণ কহিল,—বাগ্দীপাড়ায় ঘুরবে কি দুঃখে, বাপু? বাড়ী আছে তো···দ্যাখো, এবারে কি হাল করি!··· বুঝলেন সদুবাবু, এবার একটা বিহিত করুন।

শশী কহিল,—বল্ তোর সদুবাবুকে—আমি তার

তাঁবেদার নই, তার মোসাহেবি করেও আমাকে অন্ন সংগ্রহ করতে হয় না। কি ধার ধারি সত্ বাঁড়ুয্যের যে, কথায় কথায় সত্ বাঁড়ুয্যের নাম করিস্!···কথাটা বলিয়া শশী রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মজলিস তখন শশীর দম্ভের সমুচিত দণ্ডদানের জন্য বিবিধ উপায় আলোচনা সুরু করিল। যত তর্ক, যত আলোচনাই হোক, এটা স্থির যে, চাল কাটিলে বা ক্ষেতের ফশল নষ্ট করিলে ফলটা অত্যন্ত সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ হয় —কিন্তু ফশ্ করিয়া আদালতে যদি নালিশ করিয়া বসে? ইংরাজের রাজত্ব—সমাজের সে অপ্রতিহত শক্তি এই কারণেই মুষড়াইয়া আছে! এক-ঘরে করা? তাহাতেই বা এমন কি বাজিবে! বিবাহ দিবে, এমন একটা ভগ্নী বা কন্যাও নাই। এক ভাজ—বিধবা! তার নামটাতে কালি মাখাইয়া ধূলায় লুটাইয়া জবরদস্ত শোধ লওয়া যায়, কিন্তু যদি সেটা গায়ে না মাখে! শশীর নিজের পুষ্করিণী আছে, প্রজা আছে, বাগান আছে, আর স্নান করিবার জন্য আছে গঙ্গার ঘাট। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেও শশী ও তার ভাজ যে কোনো তোয়াক্কা রাখিবে, এমন মনে হয় না! চরণ সে পরিচয় ভালো করিয়াই পাইয়াছে। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কি হয়, ঐ ভাজের কি ঝাঁজ, কি তেজ! শশীকে জব্দ করিবার খুব সঙ্গীন-রকমের কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সত্ বাঁড়ুয্যের দল নিষ্ফল আক্রোশে গুমরাইতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া মাছটা উঠানে ফেলিয়া শশী ডাকিল—বৌঠাকুরুণ···

বিন্দু ছিল রান্নাঘরে—উনুনে আগুন দিতেছিল। শশীর আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল,—এই যে এসেচো! এ যে মস্ত মাছ! একা খাবে কি করে?

শশী কহিল—দেখো তখন, কি করে খাই। ভাজা করো, চচ্চড়ি রাঁধো, ঝোল রাঁধো···আমি সব মাছ খাবো! ব্যাটারা একঘরে করবে বলে শাসিয়েচে না? খাশা, খুব খাশা। স্ফূর্ত্তিতে খেয়ে বাঁচবো! কাকেও মাছের একটা আঁশ দান করতে হবে না।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—এই যে দার্শনিক তত্ত্বও বেশ শিখেচো, দেখচি!

শশীও হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নয় বৌঠাকরুণ? বাঁচা যায় তাহলে! কাঁঠাল এলো, দে ওকে। মাছ আনলুম, দে ভাগ তাকে। কেন রে বাপু, এসেচে, নিজে তৃপ্তি করে খাই! এক-ঘরের মজা কত, ওরা বুঝুক, আমরাও বুঝি। এবারে রোজ একটা করে মাছ ধরে আনবো, আর পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবো। বুঝলে বৌঠাকরুণ, মাছ আনছিলুম—দেখে শিবু গোঁসাইয়ের নোলায় জল ঝরছিল!

বিন্দু কহিল,—থামো, থামো, আর পরের কথা নিয়ে ঘোঁট করে না। মুখ-হাত ধোও, ধুয়ে কাপড় ছাড়ো। এই বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেছে—এখন অসুখ না হলে হয়! তুমি যাও, আমি বঁটি এনে মাছ কুটি। কুটে রান্না চাপিয়ে দি···

শশী মাছ রাখিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ভিজা কাপড় বদ্‌লাইল; বিন্দু তখন মাছ কোটায় ব্যস্ত। শশী কহিল,—একবার ঘুরে আসি বৌঠাকরুণ···

বিন্দু কহিল,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি...

শশী কহিল,—নিতাইয়ের কাছে। আজ এক মজা হয়েচে বৌঠাকরুণ···পাদ্রীরা একটা স্কুল খুলেচে না সেই মুসলমান পাড়ার ওদিকে?

বিন্দু কহিল,—হ্যাঁ, সেবারে ওলাবিবির তলায় যেতে দেখেচি বটে!

শশী কহিল,—সেই ইস্কুল আজ দেখে এলুম। একটি বাঙালী মেয়ে সেই স্কুলের কর্ত্তা নয়, কর্ত্রী। অর্থাৎ স্কুল দেখাশুনার ভার তাঁর উপর। মেয়েটি খ্রীষ্টান নয় দেখে এমন আনন্দ হলো। আমাদের বাঙালীর মেয়ে খালি রান্নাবান্না, বাটনাবাটায় মত্ত না থেকে এত বড় কাজ করচে, যে-কাজে অনেক পুরুষ এগুতে ভয় পায়। বাঙালীর মেয়ের এ-মূর্ত্তি···সত্যি বলচি বৌঠাকরুণ, আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যার দেবতাকে যে মেয়ে-মানুষ বলা হয়েচে, সে খুব ঠিক! অত দরদ করে মমতা করে বিদ্যা কে শেখাতে পারে? মেয়েটিকে দেখে শাস্ত্রকারের তৈরী দেবী বীণাপাণির স্তবটুকু মনে পড়ছিল···যা শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা, যা বীণা-বরদণ্ডমণ্ডিত-ভুজা যা শ্বেত-পদ্মাসীনা! তাঁকে দেখে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, স্কুলের চেয়ারে বসে নেই—মেয়েটি যেন শ্বেত-পদ্মে বিরাজ করচেন!

বিন্দু কহিল,—সত্যি?

শশী কহিল,—সত্যি বৌঠাকরুণ! ছাখো, ছোট ছেলেকে মা যখন হাতে-খড়ি দিয়ে ক-খ শেখান, তখন ছেলে কত সহজে শেখে! কিন্তু তারপর পণ্ডিতের হাতে পড়ার ভার যেই পড়ে, অমনি সেই ছেলে ফাঁকির ফন্দী আবিষ্কারে মাথা খাটাতে লেগে যায়! আমার মনে হয়, স্কুলে ছোট ছেলেদের পড়ানোর ভার যদি মেয়েদের হাতে দেওয়া যায়, ঐ গুঁপো মাষ্টার-পণ্ডিতদের তাড়িয়ে, তাহলে ঢের ভালো হয়। পুরুষ মাষ্টার শুধু শাসন করতে জানে। ছেলেদের আব্দার মেনে দরদে-স্নেহে তাকে পড়া শেখাতে পারে শুধু মেয়েমানুষ! এক তো, ধৈর্য্য না থাকলে ছেলেমেয়ে পড়ানো সম্ভব নয়—পুরুষ চিরদিন ধৈর্য্য-হারা! ধৈর্য্য যা, তা আছে শুধু মেয়েমানুষের!···

বিন্দু মৃদু হাসিল। তার মনে হইল, তার নিজের কথা! এই যে, সংসারে তার কি কাজ! রান্না-বান্না ঘর-সংসার

দেখা। কতটুকু সময় বা! তারপর দিনের দীর্ঘ অবসর! এ যে কি করিয়া কাটে! এ সময়টায় যদি দুই-চারজন ছেলে-মেয়েকে লইয়া তাহাদের পড়াইতে পারিত, তাহাদের হাসি-খেলা-ধূলায় সঙ্গ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার কাজও পাইত!

শশী কহিল,—তুমি ভাবচো, মেয়েটি খ্রীষ্টান? মোটেই নয়। আমরাও তাই ভাবতুম। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি খ্রীষ্টান নন্। অনাথা,—ছেলেবেলায় বাপ-মা হারিয়ে পাদ্রীদের ঘরে মানুষ হয়েচেন, লেখাপড়া শিখেচেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো কি না—তাই শুনলুম। একদিন তাঁর স্কুল দেখতে যেতে বলেচেন···

বিন্দু কহিল,—যেয়ো। আর ফিরে এসে আমায় তাঁর কথা বলো।

শশী কহিল,—নিশ্চয় বলবো।...তাহলে ঘুরে আসি···

বিন্দু কহিল,—শীগ্‌গির ফিরো ভাই। একলাটি থাকি···

শশী কহিল,—এখনি ফিরবো।

শশী চলিয়া গেল এবং বিন্দু মাছ কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল। দাওয়ায় একটা আলো জ্বলিতেছিল। আলোর সামনে সে একখানা বই খুলিয়া বসিল।

কতক্ষণ বই পড়িতেছে—হঠাৎ একটা শব্দে চমকিয়া চাহিয়া বিন্দু দেখে, উঠানে একটা ছায়া পড়িয়াছে। মানুষের ছায়া। বিন্দু সভয়ে প্রশ্ন করিল,—কে?

ছায়া নড়িল না। বিন্দু উঠিল। দাওয়ার এককোণে একটা লাঠি ছিল। লাঠিটি তার স্বামীর। সেই লাঠি হাতে লইয়া বিন্দু উঠানে নামিল,—গা একবার ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। ভয়ে! সে ভয় দাবিয়া বিন্দু কহিল,—কে? জবাব দাও।

তবু কোন সাড়া নাই,—ছায়া নিশ্চল। বিন্দু তখন আর একটু অগ্রসর হইল, কহিল,—জবাব না দিলে আমি এখনি চ্যাচাবো। বলো, কে···?

ছায়া এবার নড়িল। বিন্দু লক্ষ্য করিয়া দেখে, উঠানে বড় চাঁপা গাছের আড়ালে একজন মানুষ। সে চমকিয়া উঠিল, তারপর কহিল,—কে তুমি···? কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি উদ্যত করিয়া ধরিল এবং মনুষ্য-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সজোরে লাঠি চালাইল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ তুলিয়া মূর্ত্তি ভূলুণ্ঠিত হইল। আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রালোক—সে আলোয় ভালো কিছু লক্ষ্য হয় না। তাড়াতাড়ি আলো আনিয়া বিন্দু দেখে, লোকটা পড়িয়া আছে!

ভয়ে তার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ঘটিতে জল লইয়া সে তার মুখে-চোখে দিল। লোকটা চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখে বক্র কটাক্ষ। সর্ব্বনাশ—এ কে? কাহাকেই বা সে এখন ডাকে? পাড়ার কাহাকেও ডাকিলে কেহ আসিবে না—মাঝে হইতে···

কি করা যায়? শশীর উপর রাগ হইল। এত রাত্রি হইতে চলিল, তবু তার গল্প আর শেষ হয় না! বাহির হইলে ঘরের কথা এমনি ভুলিতে থাকিতে হয়!···

তবু উপায় যখন নাই, তখন ভয়ে নিশ্চল থাকিলেও তো চলিবে না! ভগবানকে স্মরণ করিয়া লোকটার পানে চাহিয়া সুদৃঢ় কণ্ঠে সে কহিল,—চোর! এখনো পড়ে আছো! যাও এখনি···

লোকটা কাতর ভাব দেখাইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—আমার পায়ে চোট্ লেগেচে। উঠতে পারচি না···

বিন্দু কহিল,—যেমন করে পারো, যাও। নাহলে এখনি লোক ডাকবো। শেষে থানায় যেতে হবে!

লোকটা কহিল,—আমায় ধরে যদি একটু তুলে দাও, তাহলে চলে যাই। পুলিশে দিয়ো না—দোহাই!

এ-কথায় বিন্দুর মমতা জাগিল। সে তার হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে উঠাইল। লোকটা উঠিয়া গায়ের কাদা ঝাড়িতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে হাঁকিল,—শশী আছো?

চরণ ভট্টাচার্য্যের গলা। বিন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। এক আপদ না যাইতে...

চকিতে চরণ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, তার পিছনে সদু বাঁড়ুয্যে, শিবু গোঁসাই প্রভৃতি। বিন্দু সসঙ্কোচে দূরে সরিয়া গেল। চরণ কহিল,—কে তুমি, বাপু?

লোকটা কহিল,—আজ্ঞে, আমি এঁদের আপনার লোক···অর্থাৎ—এবং এইটুকু বলিয়াই সে কোনমতে একটু অন্তরাল সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

বিন্দু অবাক! এইমাত্র যে উঠিতে পারিতেছিল না, সে এমন ফশ্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—আর ও কি বলিয়া! তবে কি···

এ যে কি, তা'ও তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইল চরণের পরের কথায়!

চরণ কহিল,—দেখলেন সকলে! আমি স্বচক্ষে দেখেচি, শশী চলে গেল, আর তার পরই ঐ লোকটা ফশ্ করে বাড়ীতে ঢুকলো! তাই আপনাদের খপর দিলুম। হুঁঃ! আমি চরণ ভট্‌চাজ—দু'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না করে জল গ্রহণ করি না—আমায় অপমান! আমায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা!

সদু বাঁড়ুয্যের দল সমস্বরে কহিল,—এ তো ভালো কথা নয়···ক্ষেত্তর আমাদের কি মানুষ ছিল। আর তার বিধবার এই রীত! গাঁয়ের বুকে বসে! আস্পর্দ্ধা কম নয়!

কথায় কথা বাড়িয়া উঠিতেছিল! এবং চরণের ইতর

ইঙ্গিত-ভরা টিপ্পনীর সঙ্গে সে সব কথা এমন জটিল ও দুঃসহ হইয়া উঠিল যে বিন্দু সে কথার আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। চোখের সামনে হইতে লণ্ঠনের আলো, আকাশের ঐ ক্ষীণ জ্যোৎস্না দপ্ করিয়া নিবিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে কখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল! সে কম্পিত দেহে রোয়াকের পাশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে শশী আসিয়া গৃহে ঢুকিল। উঠানে ভিড় দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল। পরে যখন দেখিল, সে ভিড় জমাইয়াছে চরণ ভট্টাচার্য্য ও সন্তু বাঁড়ুয্যের দল, তখন রাগে জ্বলিয়া সে চীৎকার তুলিল, —আমার বাড়ী ঢুকেচো সব কোন্ সাহসে? বেরোও, এখনি বেরোও,—নাহলে সব খুন করবো।

চরণ আপনার দেহকে একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া চাঁপাগাছের অন্তরালে সরিয়া পড়িল। সন্তু কহিল,—কি মিছে চ্যাচামেচি করচো, পাগলের মত। তোমার ভাজের ব্যবহার ক্রমশঃ যে অসহ্য হয়ে উঠলো,—সে খপর রাখো?

শশী কহিল,—আমার ভাজ...তাঁর খপর আমি রাখবো। তোমাদের সে খপরের জন্যে মাথা-ব্যথা কিসের?

শিবু কহিল—তুমি বাড়ী নেই, সে সময় অপর অচেনা পুরুষ এসে তোমার ভাজের সঙ্গে আলাপ করবে, এই বা গ্রামে থেকে আমরা সহ্য করবো কেন?

শশী হুঙ্কার তুলিল,—কি!

জ্ঞান কহিল,—কিসের চোখ রাঙাও! লোক-জন ডেকে আলাপ করার সখ যদি তাঁর হয় তো গ্রামের বাইরে চলে যান। এখানে আমরা এ-সব বরদাস্ত করবো না। এতে থানা-পুলিশ করতে হয়, স্বীকার!

বাড়ী-চড়া হইয়া এ ভাবে অপমান! শশী কহিল, —আমার ঘরে আমার লোক যা খুশী করবে, তোদের কি? বেরো সব, বলচি—নাহলে মাথা ফাটিয়ে দেবো ...বলিয়া সে পাগলের মত লাঠিগাছটা কুড়াইয়া একেবারে যেন নাচিয়া উঠিল। তার সে রুদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুর দল ভয় পাইল এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে দ্রুত অপসৃত হইল।

তারা চলিয়া গেলে শশী রোয়াকের দিকে ফিরিয়া দেখে, বিন্দু মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া আছে। এরা কি কোনো অত্যাচার করিয়া গিয়াছে? উঠানে দাদার লাঠি, ওধারে জলের ঘটী পড়িয়া...ব্যাপার কি? শশী তাড়াতাড়ি বিন্দুর কাছে গিয়া ডাকিল,—বৌঠাকরুণ...

বিন্দু চোখ মেলিয়া চাহিল, অতি ক্ষীণ স্বরে কহিল, —ঠাকুরপো—

শশী বিন্দুকে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিল। বিন্দু বসিল। কিন্তু এ কি চেহারা বিন্দুর! যেন কতকাল আহার নাই, কত দীর্ঘ দিন যেন মস্ত রোগে ভুগিয়াছে! চোখে-মুখে তেমনি কালির রেখা!

শশী কহিল,—কি হয়েছিল বৌঠাকরুণ?

লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে বিন্দুর যেন চেতনা ছিল না! অতি কষ্টে শশীর পানে চাহিয়া হতাশ ভগ্ন কণ্ঠস্বরে সে কহিল,—বলচি...আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরপো।

শশী বিন্দুকে ধরিয়া রোয়াকে আনিয়া বসাইল। তারপর উদ্বেগের উত্তেজনায় সে উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইল। বহুক্ষণ পরে বিন্দু ডাকিল,—ঠাকুরপো...

শশী কাছে আসিলে বিন্দু ধীরে ধীরে সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শশী রাগে ফুলিয়া উঠিল,—এবার শশী বামুনকেও ওরা দেখবে,—পড়ে পড়ে ধ্যাঁৎলানি খাবো, খেয়ে পালাবো বা দমবো, এমন শর্ম্মা আমি নই! ঐ যত ব্যাটা গোঁড়াকে পা দিয়ে চেপে একবার ভালো করে জানাবো, শশী বামুনের শক্তি কতখানি!—ঐ চরণে ব্যাটা...ফাঁসি-কাঠে ঝুলি যদি সেও আচ্ছা, ওকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো—ওর বামনাগিরির শ্রাদ্ধ করবো তবে ছাড়বো!

বিন্দু কহিল,—শোনো ঠাকুরপো, ও-সব পাগলামি ছাড়ো ভাই। তুমি একা, ওরা অত লোক! কি করবে? শেষে তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটে যদি? ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

এক অজানা আতঙ্কে বিন্দুর সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল।

শশী কহিল—তুমি কোনো ভয় করো না। বাড়ীতে আমি ছিলুম না বলেই ওদের ছাতি ফুলেছিল অতখানি! আমি বাড়ী ঢুকতেই ছুঁচোর মত সরে গেল! ওদের বড়াই শুধু দুর্ব্বল মেয়ে-মানুষের সামনে!...আচ্ছা, যে-লোকটা প্রথমে ঢোকে, তাকে তুমি চিনতে পারো?

বিন্দু কহিল,—না।

শশী প্রশ্ন করিল,—দেখতে কেমন?

বিন্দু কহিল,—তা কি দেখেচি লক্ষ্য করে! চোর ভেবে ভয়েই আবো সারা। তবু সাহস করে লাঠি নিয়ে এগিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, তোমার দাদার লাঠি! তাই কেমন বল পেয়েছিলুম। নাহলে আমায় তো জানো, চোরের নামে ভয়ে অজ্ঞান হই।

শশী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—লাঠি তার গায়ে লেগেছিল?

বিন্দু কহিল,—পায়ে লেগেছিল।

শশী কহিল,—তার চেহারা একেবারে লক্ষ্য করোনি?

বিন্দু কহিল,—মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখের নীচে কালি, খোঁচা দাড়ি, আর গালে সুপুরির মত একটা কালো তিল!

শশী কি ভাবিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, —হুঁ। ওদেরই দলের কেউ। সন্ধান নিচ্ছি। দেখি, তার বুকের পাটা কত-বড়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিজলী

সুচিত্রা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। স্কুল হইতে সোজা পথ গিয়াছে গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে কয়েকটা ইট-খোলা। ইট-খোলার পাশ দিয়া সে আসিয়া জেটিতে উঠিল।

ফুলছড়িতে একটা কটন্ মিলও আছে—মিড্ল্যাণ্ড কটন্ মিল। এ জেটিটি সেই মিলের সংলগ্ন। নদীর লাল ঘোলা জল বৃষ্টির পর শান্ত স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর বুকে কয়েকখানা নৌকা। ভূতের মত ক'জন লোক সে নৌকায় বসিয়া ইলিশ-মাছ ধরিতেছে। সুচিত্রা জেটিতে আসিয়া ঐ জলের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিল। জলের অগাধ প্রসার···মন তার কোন্ অজানা অসীমে ছুটিল।

সাম্‌নে ভবিষ্যৎ—তারো এমনি প্রসার। জীবনে চাহিবার তার কি আর আছে? এই ছেলেদের লইয়া খেলাধুলা করা, যতটুকু সাধ্য জ্ঞানের বাতি ধরিয়া এই সব অবহেলিত বালক-বালিকার চিত্তে আলো জ্বালিয়া তাদের জীবনে যতটুকু পাবে অস্পষ্টতার মাঝে আলো ধরিয়া দেওয়া···এ যে কত বড় কাজ! এরা যখন লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, ইতর অবোলা পশুর মত পরের সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব শিরোধার্য্য করিয়া শুধু দু'মুঠা অন্নের সংস্থান ঘটিলেই কৃতার্থ হইবে না, জীবনের অর্থ বুঝিয়া বিরাট কর্ম্ম-শালায় আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিবে··· সে শুভ উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যৎকে কল্পনার চোখে দেখিয়া সুচিত্রা কি তৃপ্তিই অনুভব করিল। কল্পনায় সে রঙীন ছবি দেখিয়া তার মুখ-চোখ সস্মিত হইয়া উঠিল! হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল,—সুচি··

চমকিয়া ফিরিয়া সুচিত্রা দেখে, পিছনে বিজলী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুচিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া কহিল—তুমি···!

বিজলী হাসিয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ। তুমি ভাবনায় এমন তন্ময় যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, তা জানতে পারো নি!...কি ভাবছিলে?

সুচিত্রা কহিল,—কত কি···

বিজলী অগ্রসর হইয়া সস্নেহে সুচিত্রার হাতখানি নিজের হাতে ধরিয়া কহিল,—কি ভাবছিলে, সুচি?

সুচিত্রা কহিল,—আমার স্কুলের কথা। ভাবছিলুম, এই যে ছেলেরা লেখাপড়া করচে, এরা যদি সত্য মানুষ হয়ে ওঠে কোনো দিন···জীবনের অর্থ বা লক্ষ্য যারা পুরুষানুক্রমে বোঝেনি···সে কি চমৎকার হবে!

বিজলী কহিল,—তোমার এ পরিশ্রম কখনো নিষ্ফল হবে না, সুচি। তোমার হাতে সেই রূপকথার সোনার কাঠি আছে। তুমি জানো না—সে সোনার কাঠির পরশ যে পাবে, মানুষ তাকে হতেই হবে।

সুচিত্রা বলিল—ও সব কথা থাক্। তুমি আজ এই সন্ধ্যায় হঠাৎ এখানে যে?

বিজলী কহিল,—নেহাৎ হঠাৎ নয়। রাটার সাহেব দেখা করতে বলেছিল তাই এসেচি।

সুচিত্রা কহিল,—রাটার সাহেব?

বিজলী কহিল,—ওপারে যে পাটের কল আছে, তারি বড় সাহেব রাটার। সে আজ আমায় আসতে বলে-ছিল···এই অবধি বলিয়া বিজলী একবার থামিল, থামিয়া পরক্ষণে কহিল,—ওই মিলে আমি চাকরির চেষ্টা করছিলুম। গাওয়ার সাহেব চিঠি দিয়েছিল···

সুচিত্রা কহিল,—তুমি তাহলে ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?

বিজলী কহিল,—হ্যাঁ। তাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির কি সম্ভাবনা আছে! স্কুল-মাষ্টারী করে কাটাবার জন্যই কি এ দুর্লভ নর-জন্ম গ্রহণ করেচি, সুচি? তার চেয়ে ঐ পাটের কলে ঢুকতে পেলে একদিন লক্ষপতি হবার সম্ভাবনা!

সুচিত্রা কহিল,—এ কি ভালো হলো?

বিজলী কহিল,—খুব ভালো। এই যে জীবনকে উপভোগ্য করবার জন্য চারিদিকে বিচিত্র আয়োজন পড়ে রয়েচে, পয়সা না থাকলে তার কোনোটাকেই আয়ত্ত করতে পারা যাবে না। খাওয়া-পরা নিয়ে উন্মত্ত থাক-লেই তো চলবে না! সে খাওয়া-পরার মধ্যে বৈচিত্র্য চাই। তাছাড়া ভালো বাড়ী, মোটর, দাস-দাসী···এ-সবের কল্পনা করার শক্তিও যে লোপ পেয়ে যাবে সুচি, স্কুলে মাষ্টারি করতে করতে! জীবনকে আমি উপভোগ করতে চাই—শুধু বয়ে বেড়ানো নয়··

এ-কথায় সুচিত্রার আজন্মের সংস্কারে বেশ আঘাত লাগিল। সে স্তব্ধ হইয়া বিজলীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ সেই বিজলী! পাদ্রী সাহেব যাকে অনাথ অসহায় দেখিয়া বুকে তুলিয়া নিজের গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন! সে আশ্রয় না পাইলে কোথায় কি দশায় যে থাকিত, তার কোন ঠিকানা নাই! পাদ্রী সাহেব কতদিন বলিয়াছেন,—তোমরা দু'জনে শিক্ষা-দানকেই জীবনের ব্রত করিয়ো। ভারতবর্ষে শিক্ষার বড় অভাব। এই শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্য আর মৃত্যু এত-বড় জাতিটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে, জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত করিতেছে!

সুচিত্রা কোন কথা না বলিয়া বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল। বিজলী কহিল,—কি দেখচো?

সুচিত্রা কহিল,—এর মধ্যে তুমি এতখানি বৈষয়িক হয়ে উঠেচো···তাই দেখচি।

বিজলী কহিল,—বৈষয়িক কথাটা ঠিক খাটে কি? তা নয়। যখন মানুষ হয়ে জন্মেচি, তখন মানুষের মত বাস করতে চাই।

সুচিত্রা কহিল,—বিলাসিতা না হলে কি মানুষের মত বাস করা চলে না? মানুষ আর বড-মানুষ···দুটো এক বস্তু নয়।

বিজলী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সুচিত্রা কহিল,—ফাদারের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি···

বিজলী কহিল,—প্রতিশ্রুতি আবার কবে দিলুম!

সুচিত্রা কহিল,—কথায় না দি, তাঁর ইচ্ছা ছিল···

বাধা দিয়া বিজলী কহিল,—জানি। কিন্তু শক্তি থাকতে দারিদ্র্য বরণ করবো কেন? এখন? একলা আছি। যদি বিবাহ করি···যদি কেন? বিবাহ তো করবো একদিন। একটা সংসার গড়ে তুলবো। সে সংসারের সব ভার, সব দায়িত্ব বহন করবার যোগ্যতা থাকা চাই। সে যোগ্যতা অর্জ্জন না করে বাহিরের কটি প্রাণীকে এনে সংসার গড়বার চেষ্টায় তাদের উপর অবিচারই প্রকাশ পাবে সুচি।···সংসারে একা থাকায় আর যার মতি থাকে, থাক্! আমি নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী নই। কাজেই আর্থিক অবস্থা ভালো করা চাই। আর্থিক অবস্থা ভালো হলে, শুধু নিজের নয়···আরো পাঁচজনের অনেক উপকার!

বিজলী সুচিত্রার পানে দীপ্ত নেত্রে চাহিল, সুচিত্রা বিজলীর পানেই চাহিয়া ছিল। দু'জনের দৃষ্টি মিলিলে বিজলী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—জানো তো সুচি, এ মনে কি আশা বয়ে আসচি···জীবনের পথে পা দেওয়া ইস্তক...

সুচিত্রার দৃষ্টিতে প্রশ্ন জাগিল। বিজলী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—তোমায় নিয়ে যে সংসার পাতবো, সে সংসার বইবার যোগ্যতা থাকা চাই···তোমার স্বাচ্ছন্দ্যে কোথাও না বাধে।

সুচিত্রার মুখের উপর কে যেন অতর্কিতে আঘাত করিল। লজ্জায় সে মুখ নামাইল। তার কর্ণ-মূল অবধি লজ্জায় রাঙা, তপ্ত হইয়া উঠিল।

বিজলী কহিল,—আমার এ আশা কি দুরাশা, সুচি? কথাটা বলিয়া সে সুচিত্রার হাত ধরিবার জন্যে অগ্রসর হইল।

সুচিত্রা দু'পা সরিয়া গিয়া কহিল,—তা ভেবে দেখিনি কখনো।...ও কথা থাকুক। এই অবধি বলিয়া সে অন্য কথা পাড়িল, কহিল,—এই স্কুলের কাজ আমার এত ভালো লাগচে যে, এ কাজ ফেলে অন্য কোনো দিকে আমি মন দিতে কখনো পারবো কি না, জানি না।··· কথাটা বলিয়া সুচিত্রা শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। বুঝি, তার চোখের সম্মুখে ভবিষ্যতের সে অপরূপ ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল!

বিজলী কহিল,—কিন্তু জীবনের সার্থকতা তাতেই নয়, সুচি। একটা গৃহ, সংসার পেতে বসা···তাতে প্রচুর আনন্দ। এ কাজ হয়তো কালে নীরস প্রাণহীন হবে একদিন—কিন্তু যে-কাজে স্নেহের স্পর্শ, সে-কাজ কখনো বিরস হবার নয়।

সুচিত্রা কহিল,—এর মধ্যে স্নেহের অভাব কোথায় দেখলে? এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে বাস করে স্নেহের অভাব কোনো দিন বোধ করবো না।

বিজলী কহিল,—যাক্, ও নিয়ে এখন তর্ক তুলতে চাই না। যদি কোনো দিন যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারি, সেদিন আমার প্রার্থনা নিয়ে তোমার দোরে এসে দাঁড়াবো। আমাদের জীবন এক সঙ্গে বেড়ে উঠে'চ···এর মধ্যে ভগবানের কি কোনো ইঙ্গিত নেই?

সুচিত্রা কহিল,—ও কথা থাক্। এখন তোমার কাজের কথা বলো। রাটারসাহেবের কাছে গিয়েছিলে?

বিজলী কহিল,—গিয়েছিলুম। সাহেব নিতে রাজী। কেনই বা নেবে না? একে মিশনারীদের কাছে মানুষ হয়েচি, তার উপর গাওয়ার সাহেবের সুপারিশ। সাহেব আমায় এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করবে। আপাততঃ দুশো টাকা মাহিনা। মাহিনা যাই হোক্—অন্য পাঁচ রকম রোজগার আছে বিলক্ষণ। সাহেব নিজেও সে-কথা বললে।

কথাটা বলিয়া বিজলী হাসিল। সুচিত্রা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল।

বিজলী কহিল,—কি ভাবচো?

সুচিত্রা কহিল,—আরো পাঁচ রকমের মানে? ঘুষ? বে-আইনী রোজগার?

বিজলী কহিল—বাইবেল মানলে সেই অর্থ দাঁড়ায়; কিন্তু ব্যবহারে এটা ন্যায়-সঙ্গত দাঁড়িয়েচে। মনিব মিলওয়ালা তা জানে। আর তা জানে বলেই মাহিনার হার দু'শোর উর্দ্ধে তুলতে চায় না। সাহেব স্পষ্ট বললে, দুশো টাকা মাহিনা হলে কি হয়, বুদ্ধি থাকলে মাসে হাজার দেড় হাজার টাকাও রোজগার করতে পারবে। তবে হুঁশিয়ার—কোম্পানিকে বাঁচিয়ে চলা চাই। তাহলে নিজেও বাঁচতে পারবে।

ধিক্কারে সুচিত্রার মন ভরিয়া উঠিল। সুচিত্রা কহিল,—ছি! লেখাপড়া শিখে এ কথা এমন অনায়াসে তুমি বলচো কি করে!

বিজলী কহিল—তোমার পুঁথি-গত জীবনেই তুমি বদ্ধ হয়ে রইলে সুচিত্রা! সংসারকে লোকে কর্ম্ম-ক্ষেত্র বলে কেন? কর্ম্মক্ষেত্রে নামলে পুঁথিক বুদ্ধিকে বহু কাট-ছাঁট করতে হয়—নাহলে জীবন হয়

গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে চলে, নয়তো জীবন-স্রোতে পঙ্গুতা আসে। মানুষ জড় পুতুল হয়ে দাঁড়ায়!

সুচিত্রা কহিল,—তোমার এ ফিলজফি আমি গ্রহণ করতে পারবো না, বিজলী!

বিজলী কহিল—ইস্কুলে ফিরবে?

সুচিত্রা কহিল,—একটু পরে ফিরবো।

বিজলী,—আচ্ছা, আমি যাই। আমার একটু কাজ আছে। চাকরিতে বাহাল হই, তারপর একদিন এসে দেখা করবো।

বিজলী চলিয়া গেল। সুচিত্রা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি তার শূন্যে নিবদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর-পর্ব্ব

গৃহের সম্মুখে উঠানে একটা কাঠের টুলে নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। প্রভাতে সূর্য্য পেয়ারা গাছের পত্রান্তরাল-পথে অজস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছে। নিতাইয়ের পায়ের কাছে কতকগুলা পরিষ্কার চাঁছা বাঁখারি।

কাশিম আসিয়া কহিল—কঞ্চি এনেচি।

নিতাই কহিল,—রেখে দে…

কাশিম কহিল,—ময়নাটা কোথায় রাখবো? খাঁচা যে এখনি চাই।

কাল ঝড়ের মুখে একটা ময়না পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়াছিল—একেবারে মূর্চ্ছিত দেহে! বহু যত্নে সেবায় পরিচর্য্যায় কাশিম তাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। ভোরে উঠিয়া নিতাই ও কাশিম দুজনে বাঁখারি চাঁচিয়াছে, ময়নার খাঁচা তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে। কাশিম গিয়াছিল নিতাইয়ের কথায় কঞ্চি-সংগ্রহে। ইতিমধ্যে নিতাইয়ের এই ভাবান্তর!

হঠাৎ নিতাইয়ের ঔদাস্য দেখিয়া কাশিম বিস্মিত হইল। সে কহিল—খাঁচা হবে না?

নিতাই কহিল,—হবে'খন! একটা কথা হঠাৎ মাথায় এলো রে কাশী।

কি কথা?

নিতাই কহিল,—কাল ঐ ইস্কুল দেখলি তো?

কাশিম কহিল,—দেখেচি।

নিতাই কহিল,—বেশ ইস্কুল। পণ্ডিতের জলবিছুটি নেই, বেত নেই, কি আদরে, কি যত্নে লেখাপড়া শেখাচ্ছে ঐ গরীব ছেলেদের…

কাশিম হাঁ করিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

নিতাই কহিল,—আমাদের ধর্ম্মে লেখাপড়ার যিনি মালিক—যাঁর দয়ায় মানুষ লেখাপড়া শেখে, তিনিও মেয়েমানুষ। তাঁর নাম জানিস?

কাশিম কহিল—না।

নিতাই কহিল,—তুই একেবারে গাধা। দেখিসনে সেই শীতকালে ওপাড়ার মাঠে বারোয়ারী করে পূজো হলো…সরস্বতী পূজো? সেই যে রে রাশ-রাশ গাঁদা ফুলের মালা…

কাশিমের মনে পড়িল—সেই আনন্দ-দীপ্ত উৎসব! সে কহিল,—হাঁ…

নিতাই কহিল,—সেই সরস্বতী ঠাকুর হলেন লেখাপড়ার দেবতা। ঐ ইস্কুলে সেই দেবতাকেই কাল দেখে এসেচি।

কথার মর্ম্ম কাশিম ঠিক বুঝিতে পারিল না।

নিতাই কহিল, মেয়েদের কাছে লেখাপড়া শিখলে শেখা যায়। তারা বিদ্যের ভয় ধরিয়ে দেয় না। তাই ভাবছিলুম, তোর দিনগুলো হেইয়ো-হেইয়ো করেই কাটচে। এ তো ঠিক নয়। তুই লেখাপড়া শেখ। পরে ভালো হবে।

কাশিম নিরুত্তর রহিল।

নিতাই কহিল,—ওই ইস্কুলে তোকে পড়তে পাঠাবো. ভাবচি। জাত যাবে বলে ভয়ে কেউ শিউরে উঠবে না, তোকে কেউ দূর-ছাইও কোরবে না ওখানে। পড়বি ভালো। পড়াশুনা করে এর পরে মানুষ হতেও পারবি—নিজের হাতে বোট ঠেলে দিন কাটাতে হবে না।

কথাটা কাশিমের মন্দ লাগিল না। বেশ একটি বড় দল… কত খেলা-ধূলার ব্যবস্থা আছে। ঐ যে মাঠের দু'ধারে কাঠ পোঁতা…ছেলেরা বল খেলে। তার উপর বাঙালী মেমের আদর করিয়া কত-কি খাওয়ানো! তিনিও তো স্কুলে পড়ার কথা বলিলেন!

সস্মিত মুখে কাশিম কহিল,—পড়বো।

নিতাই কহিল,—পড়বি তো নিশ্চয়। তবে ভাবচি, ওখানেই থাকবি, না, বাড়ী থেকে রোজ ইস্কুলে যাবি!

এ দুটার মধ্যে কোন্‌টা ভালো—কাশিমের বুঝিবার শক্তি ছিল না। কাজেই নিতাইয়ের পানে সে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল। নিতাইও সেই কথা ভাবিতেছিল।

এমন সময় দ্বারে শশীর গলা শুনা গেল। শশী কহিল,—নিতাই আছো?

নিতাই যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল…সহসা এ আহ্বানে জাগিয়া সে দ্বার-প্রান্তে চাহিল। শশী ততক্ষণে চৌকাঠ ছাড়াইয়া উঠানে পা দিয়াছে। নিতাই কহিল—এসো শশীদা। কি খপর?

শশী কহিল,—খপর গুরুতর,—তাই এসেচি। তোমাকে এর বিহিত করতে হবে ভাই। আমি একা… আমার দোসর চাই এ ব্যাপারে।

শশীর স্বরে উত্তেজনা! নিতাই বেশ একটু বিস্ময় বোধ করিল। নিতাই কহিল,—কি ব্যাপার, বলো তো! কাশিমকে সে আদেশ করিল,—আর একটা টুল আন্‌তো রে, কাশী।

কাশিম ছুটিল টুল আনিতে। নিতাই কহিল—তোমার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে···

কথা শেষ হইল না। শশী কহিল—গুরুতর ব্যাপার, বললুম তো!

কাশিম টুল আনিয়া দিলে শশী বসিল। বসিয়া কালিকার ঘটনা নিতাইকে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া নিতাই একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—বলো কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

শশী কহিল—থানায় যেতে পারতুম—কিন্তু ওদের পয়সার বল আছে, তাছাড়া দলে বড়।

নিতাই কহিল—থানা কিসের! আমরা কি ও ছুঁচোগুলোকে শিক্ষা দিতে পারি না—নিজেরা?

এ কথায় শশীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সে কহিল,—তাইতো তোমার কাছে এসেচি।

একটু পূর্ব্বে নিতাই বাণীর কমল-বনের স্বপ্ন দেখিতেছিল; শশীর কথায় সে স্বপ্ন ফাঁশিয়া গেল,—বাণীর কমল-বনে যেন বিদ্যুতের চমক বহিল! দুজনে বহুক্ষণ স্তব্ধ বসিয়া···

সহসা সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিতাই ডাকিল,—ওরে কাশিম···

কাশিম সেই বাঁখারির কাঠিগুলা লইয়া অদূরে নাড়াচাড়া করিতেছিল, নিতাইয়ের আহ্বানে মুখ তুলিয়া তার পানে চাহিল। নিতাই কহিল—তুই সেই চরণ ভট্‌চায্যিকে জানিস্?

কাশিম বিমূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—না।

প্রদীপ্ত স্বরে নিতাই কহিল,—জানিস্ বৈ কি! সেই যে ফেরি-ঘাটে সেদিন তোকে মারতে উঠেছিল,—তুই গঙ্গায় নেমে জল ছুড়ছিলি···আর সেই নৌকো থেকে নামতে যার গায়ে জল লাগে··

কাশিম উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—ও—তিনি? তেনাকে চিনি বৈ কি।

নিতাই কহিল,—তবেই আর কি! আচ্ছা, তোকে এক কাজ করতে হবে···

শশী কহিল,—মার-ধর করবে?

নিতাই কহিল,—যদি করি?

নিতাই গম্ভীর দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া রহিল। শশী কহিল,—ওরা মজা পাবে। না, না, মার-ধর নয়! শেষে ফ্যাসাদ বাধে যদি—

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল—দাঙ্গা চাও না তাহলে? বেশ,—দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবো না। তবে শিক্ষা দিতে হবে—এমন শিক্ষা চাই মোদ্দা, যাতে বাছাধনরা বোঝে, দলে ভারী না হলেও এরা ফন্দী-ফিকিরে ওস্তাদ!

শশী কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই। সেই হলেই ভালো হয়। তবে এক ঢিলে যদি সব-কটাকে মারা যায়···

নিতাই কহিল,—তাহলে একটু ভাবতে দাও। আমি ঐ খাঁচাটা তৈরী করতে করতে একটা উপায় ঠিক করি। খাঁচা না হলে কাশীর ময়না পাখী নিরাশ্রয় থাকবে কি না!

নিতাই উঠিল, উঠিয়া কহিল,—ওরে কাশিম, আয়··তোর খাঁচাটা আগে বানিয়ে দি···

কাশিম মহা-আগ্রহে নিতাইয়ের হাতে বাঁখারিগুলা তুলিয়া দিল। নিতাই খাঁচা তৈয়ারীর কাজে মনঃসংযোগ করিল।

গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল—কেমন তার উদাস সুর! সে সুরে শশীর মন এই সমাজপতিদের দৌরাত্ম্যের চিন্তা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে স্কুল-গৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই বাণীরূপিণী তরুণী···বিশ্বের আলোর শতদল ফুটাইয়া তাহারি পাপড়ির উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! সহসা নিতাই ডাকিল,—শশীদা...

শশী চমকিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই কহিল,—সেই বাগদীপাড়ায় যদি আমাদের ছাউনি ফেলি?

শশী কহিল,—সে কথা তো সবাই জানে। ওতে আর প্রতিকারের উপায় কি হবে?

নিতাই কহিল,—ওরি মধ্যে একটু রকম-ফের করে তোলা যায়!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শশী কহিল—কি রকমটা হবে, বুঝতে পারচি না।

নিতাই কহিল,—একটা ফন্দী মাথায় এসেচে! এমন জাল পাতবো, ভাবচি, যাতে সে জালে ওদের রুই-কাতলাগুলোকেও গাঁথতে পারি!···সহ্ বাঁড়ুয্যেও সেখানে যায় না, ভাবো?

শশী কহিল,—হয়তো যায়·· কিন্তু আমি ঠিক বুঝচি না, নিতাই, ওদিক দিয়ে কিছু করা যাবে কি না···

শশীর মুখের পানে নিতাই ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল,—সে লোকটাকে চেনো? যে ছুঁচোটা বাড়ীতে সেঁধিয়েছিল?

শশী কহিল,—তার নাম-ধাম জানি না, তবে দেখলে চিনতে পারবো বৈ কি। চোট লেগেচে, তার উপর গালে নাকি আব আছে।

নিতাই কহিল,—তবে চলো, এ-কাজটা সেরে এক

বার আমেরিকা আবিষ্কারে বেরুই। সে লোকটার পাত্তা যদি মেলে, তাহলে আমাদের প্রতিকারের অন্য উপায়ও স্থির করা যাবে।

শশী কহিল,—বেশ। তুমি তাহলে কাজ সেরে নাও।

ক্ষিপ্র কৌশলে নিতাই তখনি খাঁচা গড়িয়া ফেলিল, খাঁচা তৈয়ার হইলে কাশিমকে কহিল,—এই নে তোর খাঁচা—পাখীটাকে খাঁচায় রাখ্।···কিন্তু শুধু রাখলেই চলবে না। খাওয়ার কি ব্যবস্থা করলি?

কাশিম কহিল,—কেন? ছাতু। সকালেই আমি ছিকর দোকান থেকে কিনে এনেচি। খেতেও দিয়েচি!

নিতাই কহিল,—এক কাজ কর্···কলা দিস্—আর খুঁজেপেতে ত্যালাকুচো আন্ দিকি···ওরা খেতে ভারী ভালোবাসে। বুঝলি?

খাঁচা হাতে তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কাশিম কহিল—ত্যালাকুচো এখনি আনচি।

কাশিম চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে নিতাই কহিল—দাঁড়াও দাদা...আমি একটা জামা গায়ে দিয়ে নি। ভদ্র-পাড়ায় যাচ্ছি, ভদ্র-বেশে যাওয়াই উচিত।... কি বলো?

হাসিয়া শশী কহিল,—তা বটে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুচিত্রার স্বপ্ন

স্কুলের বারান্দায় বসিয়া সুচিত্রা একখানা চিঠি পড়িতেছিল। চিঠি ইংরাজীতে, টাইপ করা। মিশন্-হোম্ হইতে আসিয়াছে। সেক্রেটারী লিখিয়াছেন,—ফুলছড়ির স্কুলে বোর্ডিংয়ের জন্য পাকা ঘর তৈয়ারীর প্রস্তাব সোসাইটি মঞ্জুর করিয়াছে; এবং মিশন্-হোম তার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য এক হাজার টাকা শীঘ্র পাঠাইবে। তাছাড়া চাঁদার যে-প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে, হিসাবে দেখা যাইতেছে, তাহাতেও প্রায় সাত-আটশো টাকা সংগ্রহ হইবে। এ টাকাগুলা সুচিত্রার কাছে পাঠানো হইতেছে। কাজ সুরু করিয়া দেওয়া হোক্··· কন্ট্রাক্টারও শীঘ্র আসিবে। তবে সুচিত্রাকেই সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

সুচিত্রা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। ছেলেমেয়ের সংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে এ ঘরে কুলানো পরে সম্ভব হইবে না। তাছাড়া পাতার ঘর—বেশী জোরে জল-ঝড় হইলে ঘর রক্ষা করা দায়! এবং মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর চাই। কয়েক মাস ধরিয়া লেখালেখির ফলে মিশন্-হোম তার প্রস্তাব যে মঞ্জুর করিয়াছে, ইহাতে সুচিত্রার আনন্দের সীমা রহিল না।

একটা বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, ডুয়ারা গ্রামের যে-ছেলেটি জ্বর-গায়ে বাড়ী গিয়াছিল, তার সে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার বাপ, না খুড়া, কে আসিয়াছে দেখা করিতে। ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে নয়।

সুচিত্রা তখনি উঠিল। স্কুলের প্রান্তসীমায় ক্যাম্বেলের পাশ ডাক্তার সুহাস দত্তর আস্তানা। সুচিত্রা তার কাছে ছুটিল। ডাক্তার তখন ছোট্ট ডিস্পেন্সারিতে দাঁড়াইয়া একটা শিশি ধুইতেছিল। সুচিত্রা কহিল,—আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে ঐ ডুয়ারায়। স্কুলের একটি ছেলের খুব জ্বর···

সুহাস ডাক্তার কহিল—আমি দশ মিনিটে তৈরী হচ্ছি। তাদের ওখান থেকে লোক এসেচে?

সুচিত্রা কহিল—এসেচে। আমিও সঙ্গে যাবো।

—আপনি!

ডাক্তার সবিস্ময়ে সুচিত্রার পানে চাহিল।

সুচিত্রা কহিল,—বেড়াতে বেড়াতে যাবো'খন।

সুচিত্রা আসিয়া লোকটির সঙ্গে দেখা করিল, তাকে আশ্বাস দিয়া সংবাদ লইল, ডুয়ারা কত দূরে!

লোকটি কহিল, ফুলছড়ির পরেই ডুয়ারা।

সুচিত্রা নিজেকে সজ্জিত করিয়া লইল। তারপর ডাক্তার আসিল বাইসিক্ল লইয়া। বাইসিক্লে আর চড়া হইল না। তিন জনে ডুয়ারায় যাত্রা করিল। ফুলছড়ির বাগ্দী-পাড়া ছাড়াইয়া ডুয়ারা! মাঠের প্রান্তে কয়েকখানা পাতার কুঁড়ে—দারিদ্র্যের জীর্ণতায় ঘেরা। নোংরা পল্লী।

সুচিত্রা কহিল,—এ নোংরায় অসুখ করবে না?

সুহাস ডাক্তার কহিল,—এরা বেঁচে থাকে কি করে, সেইটেই ভাববার কথা!

সুচিত্রা কহিল—গ্রামের জমিদার শুধু খাজনা আদায় করে। এরা কিসে ভালো থাকবে, সেদিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই।

সুহাস হাসিল, হাসিয়া কহিল—তার কি দায় পড়েচে যে অত দেখবে! তার সম্পর্ক তো টাকার সঙ্গে···

সুচিত্রা কহিল—আমাদের স্কুল এ জায়গায় খুলে বড় ভালো কাজই করা হয়েচে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে তাদের দুর্গতি যদি ঘোচে···

রোগীর গৃহও তেমনি···যেন একটা ছোট গহ্বর! আলো-বাতাসের চিহ্ন নাই। ঘরে কে আছে, তাও লক্ষ্য হয় না।

আলো চাওয়া হইল—একটা কেরোসিনের ডিপা আসিল।

সুচিত্রা তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কহিল—নিয়ে যাও ও আলো। ওই কেরোসিনের ধোঁয়ায় রোগীর বিপদ ঘটবে।

রোগী দেখা হইল—কেশ্ নিউমোনিয়া। তবে খুব সাংঘাতিক হয় নাই। কিন্তু এ রোগের পরিচর্য্যা এখানে কি করিয়া হয়?

সুচিত্রা বুঝাইয়া বলিল, স্কুলে ছেলেটিকে লইয়া চলো—সেখানে হাসপাতাল আছে। ছেলের মা-বাপ সঙ্গে থাকিবে, চিকিৎসার সুবিধা হইবে!

বহু আলোচনায় তাদের রাজী করা গেল। সুচিত্রার মূর্ত্তি, সুচিত্রার মুখের কথা···তারা গলিয়া গেল। তাছাড়া তারা তো পরিচয় পাইয়াছে—গরীব-দুঃখী বলিয়া কেহ সংবাদ লয় না; আর ইনি কত সাধিয়া ছেলের লেখা-পড়ার ভার লইয়াছেন! এমন দরদ-ভরা কথা···গরীব-দুঃখী আর ইহাতে ভুলিবে না? এমন কথা তো তারা কখনো শোনে নাই—পরের কাছ হইতে পায় শুধু আদেশের হুম্‌কি, তাড়া, তিরস্কারের তীব্র হুঙ্কার!

সুচিত্রা কহিল—ডুলি পাওয়া যাবে?

ছেলেটির বাপ কহিল—আমি কোলে করে নিয়ে যাবো।

সুচিত্রা কহিল—বেশ টাকা দিয়ে নিয়ে চলো। ডাক্তার বাবু বাইসিক্লে যাচ্ছেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।···

কথাবার্ত্তা পাকা হইলে আয়োজনে বিলম্ব ঘটিল না। ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া তার বাপ সলীম্ তখনি পথে বাহির হইল। সুচিত্রা ও ডাক্তার সঙ্গে চলিল। সুচিত্রা কহিল—আপনি আবার হাঁটবেন কেন ডাক্তার বাবু? আপনি বাইসিক্লে চড়ে এগিয়ে যান্।

সুহাস কহিল—একসঙ্গে যাচ্ছি, মন্দ কি!

সুচিত্রা কহিল—আপনি আগেই যান্। এর বিছানার ব্যবস্থা করিয়ে ফেলুন। আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি···

সুহাস রাজী হইল না। সুচিত্রার অনুরোধের অন্ত নাই। অগত্যা সুহাসকে বাইসিক্লে চড়িয়া অগ্রসর হইতে হইল।

সুচিত্রা তখন সলীমের সঙ্গে তার ঘরকর্ণার কথা পাড়িল। বেচারী সলীম্! একটু ক্ষেত-খামার আছে। সংসারে নিজে আর বড় ছেলে—দু'জনে ক্ষেতে কাজ করে। কতকগুলা গরু আছে, হাঁস আছে। গরুর দুধ গ্রামের কেহ লয় না—জাতে সে মুসলমান ···তাই; ভিন্ন গ্রামের এক গোয়ালার কাছে দুধ বেচিয়া আসে। গরজ সলীমের, কাজেই দামে তার পোষায় না! হাঁসে ডিম দেয়—ডিম বেচিয়া দু' পয়সা আসে,—তবে জুলুমও আছে। ফুলছড়ির বাবুরা যা-খুশী দাম দেয়। জমিদার বাঁড়ুয্যের মেজাজ ভারী কড়া। খাজনার পয়সা ঠিক দিনে দেওয়া চাই। না দিলে অকথা, কুকথার অন্ত থাকে না···কথার উপর তার লোকের হাতে কাণ মলা প্রভৃতিও ঘটিয়া যায়, গরু-বাছুর অবধি লইয়া যাইতে কসুর করে না!

সুচিত্রা কহিল—গরু-বাছুর নিয়ে যায়? আদালতের হুকুমে?

সলীম্ কহিল—না। ওঁরাই আদালত, মা···

সুচিত্রা কহিল—বটে! তা তো নিয়ে যেতে পারে না। আইন নয়।

নিশ্বাস ফেলিয়া সলীম্ কহিল—ওঁরাই আইন-আদালত। গরীবের আর আইন-আদালত কোথায়?

সুচিত্রা কহিল—হুঁ···

এমনি কথায় কথায় সকলে যখন স্কুল-গৃহে আসিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। সুহাস ডাক্তার ব্যবস্থাদি করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটিল না।

সলীমের ছেলের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া সলীমের স্থান-নির্দ্দেশান্তে সুচিত্রা স্কুলে ফিরিয়া দেখে, বিজলী আসিয়া বসিয়া আছে। সুচিত্রাকে দেখিয়া হাসিয়া বিজলী কহিল—Good morning Miss Florence Nightingale...

সুচিত্রা কহিল,—তাঁর পায়ের ধুলো হবার যোগ্যতা যেন অর্জ্জন করতে পারি, সেই প্রার্থনাই করো বিজলী···

বিজলী কোনো কথা কহিল না··স্থির দৃষ্টিতে সুচিত্রার পানে চাহিয়া রহিল।

সুচিত্রা কহিল—কি খপর? চাকরি হলো?

হাসি-মুখে বিজলী কহিল—নিশ্চয়···

সুচিত্রা কহিল—ভালো।···তা, চাকরিতে না গিয়ে এখানে এ সময়?

বিজলী কহিল—একটু কাজ ছিল···

সুচিত্রা কহিল—কি?

বিজলী কহিল,—তুমি যে পুণ্য-ব্রতই নাও সুচিত্রা, একটা কথা শুধু মনে রেখো···

সুচিত্রা কহিল—কি কথা? বলো···

বিজলী কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ-রচনার এই যে আয়োজন, এ আয়োজনটুকু তোমারি সম্বর্দ্ধনার জন্য···

কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সুচিত্রা বিজলীর পানে চাহিল। বিজলী তার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—মানে, ছেলেবেলায় দু' দিক থেকে এসে দু'জনে একসঙ্গে মিশেচি। আমাদের হাসি-গল্প একসঙ্গে···স্বপ্ন অনেক গড়েচি, তাও একসঙ্গে ···আমাদের জীবনটুকু এমনি একসঙ্গে মিশে বয়ে যেন চলে চিরদিন·· সেই আশাটুকু যদি শুধু পাই...

সুচিত্রা দিগন্তের পানে চাহিয়া রহিল। তার দৃষ্টি উদাস। সে যেন কালের যবনিকার অন্তরালে বহু দূর ভবিষ্যৎ দেখিবার চেষ্টা করিতেছে!

বিজলী সুচিত্রার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল—সুচিত্রার একখানা হাত নিজের হাতে লইয়া ডাকিল—সুচিত্রা···

সুচিত্রা কেমন চমকিয়া উঠিল···ধীরে ধীরে হাত মুক্ত করিল।

বিজলী কহিল—বলো...

সুচিত্রা কহিল—সে-সব কথা কখনো ভেবে দেখিনি বিজলী···কি বলবো ?

বিজলী কহিল—কিছু নেই বলবার ? ফাদার তো এমন আভাসও···

সুচিত্রা কহিল—আমার নিজের ভবিষ্যতের কথা কখনো ভাবিনি তেমন করে ···

বিজলী কহিল—যাই ভাবো, নিজেকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ো না।...তোমার নিজের জীবনের দাম অল্প নয়। এ পৃথিবীতে ও-জীবনের দাম বোঝে, এমন লোকও আছে···

সুচিত্রা কহিল—ভেবে দেখবো··

বিজলী কহিল—তাই দেখো।

নবম পরিচ্ছেদ

তারিণী

সে লোকটির পাত্তা পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। তার নাম তারিণী। চরণের দূর-সম্পর্কের সম্বন্ধী। আর কোথাও আস্তানা না পাইয়া চরণের স্ত্রীর কাছে আসিয়া জুটিয়াছে—চরণের লাথি-জুতা অম্লান বদনে হাসিয়া সহিতে হয়! নিরুপায় দেখিয়া চরণ অগত্যা চুপ করিয়া গিয়াছে। পত্নী তার পক্ষ লইয়াছে - কাজেই চুপ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এখন, এই লোকটাকেই চরণ ধরিয়াছে—তার বদ-মায়েসীর অভিসন্ধিতে ঘুরাইবার জন্য। কথায় বলে, যাকে রাখো, সেই রাখে···এ কথা যে কতখানি খাঁটি, চরণ আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

তারিণীও যোগ্য সাকরেদ। চরণ এক পা আগাইতে বলিলে, সে চলে চার পা। সুতরাং তার পশার হইল—শুধু চরণের কাছে নয়, চরণের অভিভাবক শ্রীযুক্ত সদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও।

নিতাই আর শশী বাগ্দীপাড়ায় ঘুরিতেছিল ··সেই পাড়ার এক কুটীর হইতে অকস্মাৎ তারিণী বাহির হইল; তাকে দেখিয়াই শশী কহিল—এই লোক···

নিতাই কহিল—ঠিক বলচো ?

শশী কহিল—ভুল হতে পারে না। ঐ যে গালে আব।

ব্যস্! নিতাই অমনি গিয়া সবলে তার হাত ধরিল, কহিল—দাঁড়া···

তারিণী ভড়কাইয়া গেল। হঠাৎ এমন···

মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া সে কহিল—দুটো তরকারীর চেষ্টায় এসেছিলুম···

তরকারী! তাহা হইলে ইহার মধ্যে আরো গূঢ় রহস্য আছে!

নিতাই কহিল—হাত তো খালি দেখচি! তরকারী কৈ ?

সপ্রতিভ ভঙ্গীতে তারিণী কহিল—ওবেলায় নিয়ে যাবো, তাই বলতে এসেছিলুম···

—কার কাছে বলতে এসেচো ? চলো, মোকাবেলা করে দাও।

নিতাইয়ের স্বর কড়া—তাহাতে আদেশের সুর! তারিণী আবার ভড়কাইল।···করুণ দৃষ্টিতে সে নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই ছাড়িবার লোক নয়...বিশেষ ইহার অন্তরালে যখন রহস্যের আভাস পাওয়া গিয়াছে!···

তারিণীর পা আর চলিতে চায় না...অথচ চলিতেই হইবে! নিতাই ক্রমাগত ধাক্কা দিতেছে···নিতাইয়ের গায়ে বেশ জোর। আর এই নিমেষের দর্শনে তারিণী এটুকু বুঝিয়াছে, নিতাই লোকটি ভালো মানুষ নয়!

যে-দ্বার মাড়াইয়া এইমাত্র আসিয়াছে, সেই দ্বারে গিয়া আবার দাঁড়াইতে হইল। নিতাই কহিল—কে তোমার লোক, বলো।

তারিণীর চোখে আবার সেই করুণ দৃষ্টি। নিতাই তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়! তার মনে একটা কথা···

তারিণী কহিল—সে মেয়ে-লোক।

নিতাই হুঙ্কার দিল, কহিল—মেয়ে-লোকই হোক, আর যে-লোকই হোক, ডাকো। আমি মোকাবেলা করতে চাই। তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে, তোমার মতলব ভালো নয়।

তারিণী এ কথায় একেবারে অবাক হইয়া গেল। নিতাই তাকে ধাক্কা দিয়া কহিল—ডাকো...

তার চীৎকার গৃহমধ্যেও বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এক প্রৌঢ়া রমণী দ্বার-প্রান্তে উঁকি দিল, কহিল—কি হয়েচে গা ?

নিতাই কহিল—এ লোকটি এখানে তোমাদের বাড়ী কেন এসেছিল ? এ দেখচি, বামুন···

রমণী কহিল—এসেছিল, ওর খুশী। তার জবাবদিহি কিসের বলো তো, ঠাকুর ?

নিতাই পাড়ার ছেলে—তাকে সকলেই চেনে। নিতাই কহিল,—আমি জবাবদিহি চাই·· নাহলে একে এখনি টেনে নিয়ে যাবো সদু বাবুর কাছে।

রমণী কহিল—আমাদের ভট্‌চাযি্য মশাইয়ের একটু কাজ ছিল···তাই খাজনার তাগাদায় এসেছিল এ-পাড়ায়।

—বটে! নিতাই তারিণীর পানে চাহিয়া কহিল—কি গো, এ কি বলে?

তারিণী নিরুপায় দৃষ্টিতে নিরুত্তরে নিতাইয়ের পানে চাহিল।

নিতাই সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া রমণীকে কহিল—কত খাজনা দিয়েছো?

রমণী কহিল,—আজ দিইনি। আর একদিন আসতে বলেচি।

নিতাই কহিল—চেক্‌-মুড়ি কৈ? বলিয়া তারিণীর পানে চাহিল।

রমণী কহিল—সকালবেলা কি ঝামেলা করচো ঠাকুর আমার দোরে? আর কিছু কাজ নেই?

নিতাই দেখিল, রমণীর রসনা বেশ খর-ধার। স্ত্রীলোকের সঙ্গে তর্ক করিবে কি! সে তারিণীকে ধরিয়া হ্যাচ্‌কা দিল, দিয়া কহিল—চলো, তোমায় ছাড়চি না। একেবারে সতু বাবুর কাছে নিয়ে যাবো। চেক্‌-মুড়ি নেই, কিছু না,—এদের কাছে খাজনা চাইতে আসো, এ-কথা জানানো দরকার।

তারিণী প্রমাদ গণিল। সে এখানে আসে অতি নিঃশব্দে এবং গোপনে। তারিণীর এখানে আসা চরণ পছন্দ করে না···নিষেধ করিয়াছে, বলিয়াছে—ওরা ছোটলোক···ও-পাড়ায় যাস্‌নে, একঘরে হতে হবে!··কিন্তু সে কথার পরও···চরণের যাতায়াতে কৌতূহলী হইয়া তারিণী আসিতেছিল। আসিয়া ঐ ক্ষেত্রমণি ওরফে ক্ষেতুর যত্ন-সেবা, তার সাজা তামাকুর প্রসাদ...সে যেন রাজার আদর! ক্ষেতু তাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে, কোনো ভয় নেই, তুমি এসো ঠাকুর। আমি তোমারি। এখন ধরা পড়িয়া গেলে···

নিতাই তারিণীকে টানিয়া পথে বাহির করিল। ক্ষেতু দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কি কতকগুলা বকিতে লাগিল। নিতাই তা কানে তুলিল না···শশী শুধু ক্ষেতুর নাসিকার দোদুল প্রকাণ্ড নথটার পানে বার বার চাহিয়া দেখিতেছিল। ঐ মুখ...নাক আছে কি না, বুঝা যায় না—শুধু ঐ নথের প্রসাদে···সে ভাবিতেছিল, পুরাণে কথিত সেই সুদর্শন-চক্র! স্থান-কাল ভুলিয়া·বাই-চান্স পুতনার নাকে আসিয়া আটকাইয়া গেল কি করিয়া?···

মোড় বাঁকিতে ক্ষেতুর ঘর অদৃশ্য হইল। তারিণী তখন নিতাইয়ের পায়ে পড়িল, কাঁদিয়া কহিল—আমার আশ্রয়টুকু কেড়ে নেবেন না।

আশ্রয়! আশ্রয় কাড়িয়া লইব! বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে নিতাই তারিণীর পানে চাহিল!

দায়ে পড়িয়া তারিণীকে তখন সত্য কথা প্রকাশ করিতে হইল। সে চরণের সম্বন্ধী···তার কোনো কূলে কেহ নাই···অন্ন নাই, আশ্রয় জোটে না—জুটাইবার সামর্থ্যের অভাব। তাই গালি-প্রহার-লাথি·· সব সহিয়া এখানে চরণের গৃহে পড়িয়া আছে—আহার যা জোটে, বলিবার নয়। আর সর্ব্বপ্রকার বদমায়েশীতে···কি করিবে? সে একান্ত অসহায়, নিরুপায়! এখানে চরণের ফরমাশ খাটিতে আসিয়াছিল···এবং তার উপর ঐ ক্ষেত্রমণির কেমন নজর পড়ে! ক্ষেতু ভারী যত্ন করে, আদর করে, কাপড় কিনিয়া দিয়াছে, একজোড়া জুতা, এই ছাতাটা·· ক্ষেতু ভারী ভালো। চরণ সন্দেহ করিয়াছিল··কিন্তু ক্ষেতুর অত যত্ন···তাছাড়া তাকে একটু যত্ন করে, এমন লোক জগতে কেহ নাই!

নিতাইয়ের চিত্তে শয়তান বিজয়-গর্ব্বে নাচিয়া উঠিল। বাঃ, চমৎকার হইয়াছে। সে কহিল—এঁর বাড়ী সন্ধ্যাবেলায় উৎপাত করতে গিয়েছিলে?

তারিণী সব কবুল করিল, সবিনয়ে জানাইল, শুধু চরণের আদেশে!

নিতাই কহিল—হুঁ।··তারপর কি চিন্তা করিল; করিয়া কহিল—আমি তোমার আশ্রয় দেবো, টাকাও মিলবে, আমার একটি কাজ করতে হবে কিন্তু।

—কি কাজ? তারিণীর বুক দুলিয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—আমি চরণকে জব্দ করতে চাই!

তারিণী সোৎসাহে কহিল—তাতে আমি খুব রাজী। আমায় যা পীড়ন করে···দায়ে পড়ে সব সয়ে থাকি!

নিতাই কহিল—কোনো ভয় নেই। আমি তোমায় দেখবো! কিন্তু যদি বেইমানী করো—তা হলে হাড় ভেঙ্গে দেবো। আমি থানা পুলিশের ভয় করি না। আমার নাম নিতাই—কি রকম দুর্দ্দান্ত...পাঁচ-জনকে জিজ্ঞাসা করে জেনো।

নিতাই নামটি তারিণীর অশ্রুত নয়। সতু বাবুর আসরে এ নাম সে শুনিয়াছে···

তারিণী নিতাইয়ের পানে চাহিয়া কহিল—বেশ, আমি করবো, আমায় যা বলবেন...

নিতাই কহিল—পৈতে ছুঁয়ে বলো···

তারিণী তখনি হাতে পৈতা জড়াইল, কহিল—তুমি যা বলবে, শুনবো···

নিতাই কহিল—বলো, কখনো বেইমানী করবে না।

মন্ত্র পড়িবার ভঙ্গীতে তারিণী কহিল—কখনো বেইমানী করবো না।

নিতাই কহিল—আচ্ছা, তাহলে এসো এখন আমার বাড়ী···সেখানে গিয়ে সব কথা হবে।···

ঘণ্টাখানেক বসিয়া পরামর্শাদি করিয়া নিতাই

তারিণীকে বিদায় দিল; বলিয়া দিল,—আমার লোক তোমায় ডাকতে যাবে···সে শুধু বলবে, প্রভু ডাকচে; আমার নাম করবে না। ব্যস, অমনি তুমি চলে আসবে। অন্যথা না হয়···

কৃতজ্ঞ চিত্তে তারিণী কহিল—কখনো হবে না।

তারিণী বিদায় লইল। শশী কহিল—আমিও আসি। মতলব যা ফেঁদেচো···

হাসিয়া নিতাই কহিল—দাঁড়াও না, এই এক জালে সব ব্যাটাকে বন্দী করবো।

—তারপর?

নিতাই কহিল—তারপর যা,—তা ভাবতে দাও। অতদূর ভাবতে গেলে কাজ করা চলে না। ক্রমে ক্রমে ভেবে স্থির করা যাবে।

শশী কহিল—তাহলে আসি।

নিতাই কহিল—এসো।

শশী চলিয়া গেলে নিতাই ডাকিল—কাশী···

কাশিম কহিল—কেন?

নিতাই কহিল—চট্‌পট্ খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে। ওবেলায় স্কুলে যাবো—তোকে ভর্ত্তি করতে··

কাশিম কহিল—আজই?

নিতাই কহিল—হ্যাঁরে··শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়।

স্নানাহার সারিয়া ওবেলার প্রতীক্ষায় কিন্তু থাকা গেল না। নিতাই কহিল—কি কাজ আছে ঘরে? কিছু নেই তো···চ' এখনি যাই। স্কুলটি আমার ভারী ভালো লেগেচে।

কাশিমের মনও তাহা চাহিতেছিল! সেই কলরব, সেই আনন্দ!

সেই বারান্দা···সুচিত্রা বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল,—পাশে দুটি মেয়ে। তারাও একরাশ সূতার বাণ্ডিল পাকাইতেছে।

নিতাই আসিয়া কহিল—নমস্কার।

সুচিত্রা চাহিয়া দেখিল। তার মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল। সুচিত্রা কহিল,—আসুন···

সুচিত্রা চেয়ার দেখাইয়া দিলে নিতাই বসিল। সুচিত্রা কহিল—হঠাৎ···?

নিতাই কহিল—একটু কাজে এলুম।

সুচিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাইও চাহিয়াছিল···ঐ কালো দুটি চোখের তারা... ও যেন এই আঁধার-ভরা দুনিয়ার মাঝখানে আনন্দের দুটি দীপ...কি আশায়-রঙীন আলোর দীপ্তি ও দুই চোখে! ও দৃষ্টির সামনে সারা দুনিয়ার রঙ যেন বদলাইয়া যায়।

নিতাই কহিল—এই ছেলেটি···এর লেখাপড়া কিছু হচ্ছে না—শুধু আমার ফরমাশ খেটে দিন কাটায়। ওর সর্ব্বনাশ করচি—এ তো ঠিক নয়।

সুচিত্রার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নিতাই কহিল,—একে আজই আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করে নিন। বাড়ী থেকেই রোজ আসবে-যাবে। মাহিনা দেবো—অমনি-পড়বে না। কেন মাহিনা দেবে না? আমি যখন দিতে পারি···এমনিতেই তো আপনাদের কত খরচ—আমি ফাঁকি দিতে চাই না।

সুচিত্রা খুশী-মনে কহিল—বেশ··বলিয়া একটি ছেলেকে আদেশ করিল,—মতিবাবুকে ডেকে আনো তো···

মতিবাবু স্কুলের কেরাণী। ছেলেটি মতিবাবুকে ডাকিয়া আনিলে সুচিত্রা তাহাকে বলিয়া দিল—এ ছেলেটি ভর্ত্তি হবে···এর নাম-ধাম সব লিখে নিন। ফ্রী নয়; এঁরা মাইনে দেবেন···

মতিবাবু কাশিমকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। নিতাই উঠিতেছিল, সুচিত্রা কহিল,—আপনি বসুন···

নিতাই কহিল—ওর পরিচয়-টরিচয়গুলো·

সুচিত্রা কহিল—খাতা-পত্র নিয়ে মতিবাবু এইখানেই আসবেন।

তাহাই হইল। দু' একটি কথার পর নিতাই কহিল,—আমি যদি আপনাদের ফণ্ডে মাসিক চাঁদা কিছু দিতে চাই, নেবেন?

সুচিত্রা কহিল,—দরকার নেই। তার চেয়ে আপনি এদের খেলা-ধূলার আয়োজন করুন। আপনি নিশ্চয় স্পোর্টস্-ম্যান্···

হাসিয়া নিতাই কহিল—চেহারা দেখে তাই মনে হয়?...এককালে চর্চ্চা করেচি বটে···যখন কলকাতায় থাকতুম। তারপর চারিধার থেকে আত্মীয়-স্বজনরা খশে সরে পড়লো···এমন অকস্মাৎ···মন খারাপ হলো! লেখাপড়া, খেলাধূলা—সব ছেড়ে গাঁয়ে এসে বসলুম। এসে দেখি, এখানে সব জঞ্জালে ভরা। সে জঞ্জাল সরাতে গেলুম—পারলুম না। লোকগুলো ঐ জঞ্জাল আঁকড়েই থাকতে চায়। জঞ্জাল সরাতে গেলে বিভ্রাট বাধে। ধুত্তোর বলে ঘরে বসলুম। যা মনে আসে, তাই করি··· স্রেফ্ inodolent life!

প্রাণ-খোলা কথা। এ কথায় সুচিত্রা চমৎকৃত হইল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, নিতাই তার পূর্ব্বেই কহিল,—দৈবাৎ এ ধারে মাছ ধরতে এসে আপনার স্কুল দেখলুম! আপনাকে দেখলুম···যেন শ্বেত কমলদল-বাসিনী বাণী! মন সে অবধি কাজ চাইছে। জীবন যেন নূতন মূর্ত্তি নিয়ে জেগে উঠেচে। কুড়ের মত পড়ে থাকার জন্য জীবন নয়—যা তা করে কাটিয়ে দেবারও নয়। মানুষের করবার অনেক কাজ।...

বিশেষ আপনার এই কাজে যদি যোগ দিতে পারি—আপনাদের কাজে যদি মনের যোগ স্থাপন করবার সুযোগ পাই, তাহলে আমি বেঁচে যাই।

সুচিত্রা কহিল—শুনে ভারী আনন্দ হলো। কাজের লোক দরকার। আমি একা···আরো দু' এক জায়গায় চেষ্টা করেচি···কিন্তু কেবলি বিদ্রূপ পেয়েচি!···শুধু বিদ্রূপ নয়···

সুচিত্রা থামিল, পরে গম্ভীর স্বরে কহিল—ইতর টীকা-টিপ্পনীরও অভাব ঘটেনি! সকলে বলে, মেয়ে-মন্দ।

নিতাই গর্জ্জিয়া উঠিল—হতভাগা দেশ! নিজেদের ভালো নিজেরা কখনো করবে না। অপরে করতে এলে তাতেও সর্ব্বরকমে বাধা দেবে।

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, সেই সলীমের ছেলের জ্বর একটু কমিয়াছে। সে একটু ভালো আছে।

সুচিত্রা কহিল—চলুন, আপনাকে সব দেখাই! একটি ছেলে বাড়ীতে ভুগছিল—তাকে এখানে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েচে।

নিতাইয়ের মনে আনন্দের বান ডাকিল। প্রাণের আবেগে সে কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল।

সুচিত্রা ডাকিল—আসবেন?

—নিশ্চয়···

দুজনে চলিল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড···ডাক্তারখানায় সলীমের ছেলেকে দেখিয়া ফিরিবার সময় সুচিত্রা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,···ও কে?

একটা বড় গাছের দিকে সে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিল। নিতাই চাহিয়া দেখে, একজন লোক। ভদ্র বেশ। গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিতেছে।

কে? মনে একটা সন্দেহ আসিল। কেহ কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে···?

নিতাই দৃঢ়ভাবে গাছের দিকে চলিল। লোকটা···?

ছুটিয়া গিয়া নিতাই তার হাত ধরিল, সবিস্ময়ে ডাকিল···শশী···

তাই। সে-লোক শশী। নিতাই কহিল···লুকোচ্ছ যে?

—লুকোবো কেন?···এমনি এসেছিলুম···

—লুকোবার কিছু নেই সত্যি। এসে যা দেখচি,···চমৎকার। কাশীকে আজ স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলুম।···

কথার সঙ্গে সঙ্গে শশীর হাত ধরিয়া নিতাই তাকে একেবারে টানিয়া লইয়া চলিল। সুচিত্রা স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া। নিতাই কহিল—শত্রু-পক্ষ নয়···মিত্র। আমার সেই বন্ধু শশী।

দশম পরিচ্ছেদ

শয়তান

আরো সাত-আট দিন পরের কথা।

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে! সুচিত্রা নিস্পন্দ বসিয়া আছে। তার সামনে দাঁড়াইয়া বিজলী। বিজলীর মুখে-চোখে উদ্বেগ। চারিদিক স্তব্ধ···শুধু সুদূর আকাশ-চারী দু' একটা চিলের চীৎকার মাঝে মাঝে সেই স্তব্ধতার গায়ে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিজলী কহিল,—না হলে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ চুরমার হয়ে যাবে। মাসখানেকের জন্য শুধু···আমায় রক্ষা করো, সুচিত্রা।

বিজলী একেবারে সুচিত্রার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সুচিত্রা কহিল,—কি করো, বিজলী। ওঠো।

তার স্বর বেদনায় কাতর!

বিজলী কহিল,—ঐ স্কুল-ফণ্ডের প্রায় আড়াই হাজার টাকা তোমার কাছে আছে, পরশু ডাকে এসেচে। আমি জানি। তা থেকে শুধু এক হাজার···এক মাসের জন্য আমায় দাও—ধার। তোমাদের এখনো তিন মাস দেরী বাড়ী তোলবার। আমি এক মাসের মধ্যেই শোধ করে দেবো।

সুচিত্রা কহিল—কিন্তু ও-টাকায় আমার কি অধিকার! পরের টাকা···ও থেকে তোমায় কি করে ধার দি? এ যে কত বড় অন্যায়···

বিজলী কহিল,—তুমি এ-টাকা চুরি করচো না, খরচও করচো না···তোমার বাক্সে এ ক' মাস পড়ে থাকবে...কোনো দরকারে লাগবে না। আর এই একমাস ও-টাকা যদি আমার কাছে থাকে, তোমার লোকসান নেই,—অথচ আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তাতে গড়ে উঠবে···উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! একমাসের মধ্যেই এ-টাকা আমি শোধ দেবো। তার নড়চড় হবে না।

সুচিত্রা কোনো কথা কহিল না! বিজলীর কাকুতির অন্ত নাই। সুচিত্রা তবু অবিচল। শেষে বিজলী এক কাজ করিল। দেওয়ালের গায়ে একখানা বড় ছুরী টাঙানো ছিল, দেওয়ালের শোভার জন্য বটে, বিপদে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও বটে,—বিজলী চট করিয়া সেটা হাতে লইয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে কহিল,—এটুকু দয়া যদি না করো, তাহলে আমি বাঁচবো না···এই ছুরী বুকে বসিয়ে সব শেষ করে দেবো। যদি জীবনের এমন সুযোগ হারাই, তাহলে কি কাজ এ জীবনে···

কথাটা বলিয়া বিজলী বুকের উপর ছুরী ধরিল। সুচিত্রা দেখিল। সে চমকিয়া উঠিল, কহিল,—কি করো? আঃ!

বিজলী তেমনি অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, সুচিত্রা ·

সুচিত্রা খুপী কাড়িয়া লইল। বিজলী কহিল,—এ জীবন শেষ করতে আরো হাজার পথ খোলা আছে। সে পথ তো তুমি বন্ধ করতে পারবে না! ··

বিজলী থামিল, পরে স্বরে আরো চমক লাগাইয়া কহিল—যার ভবিষ্যৎ নেই, তার জীবনের প্রয়োজন থাকতে পারে না। ···এ জেনেও তুমি অটল···কিন্তু এর জন্য দায়ী তুমিই হবে সুচিত্রা।

বিজলীর দুই চোখে জল দেখা দিল। সে গমনোদ্যত হইল।

সুচিত্রার বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···সে ডাকিল,—বিজলী···

বিজলী ফিরিল।

সুচিত্রা কহিল—এ পরের টাকা···

বিজলী বলিল—আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? শুধু একমাস···এ টাকা জমা দিলে আমি কেশিয়ারী-চাকরিটা হাতে পাই। পাঁচশো টাকা মাহিনা।···কাজে বাহাল হলে একমাসের পাঁচশো টাকা মাহিনা আগাম চাওয়া শক্ত হবে না।···চাইলে তা পাবোই। লক্ষ্মীটি, দয়া করো, সুচিত্রা···আমায় রক্ষা করো···

সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রার পায়ে আবার সে লুটাইয়া পড়িল।

সুচিত্রার পায়ের তলা হইতে বিশ্ব-ভুবন কোথায় সরিয়া যাইতেছিল!···সেই বিজলী! সুচিত্রা চাহিয়া দেখে, বিজলীর চোখে জল! সুচিত্রার মন ভুলিল। সে কহিল—ঠিক এক মাসে দেবে? কিন্তু পরের টাকা· আমার বুক কাঁপচে।

বিজলী কহিল—আমি পাকা লেখাপড়া করে দিচ্ছি···

নারীর মন। সহস্র কর্ত্তব্যের মধ্যেও সে মমতা ছাড়িতে পারে না। চোখের জলে মনের মাটী ভিজিয়া গলিয়া যায়!···

যন্ত্র-চালিতের মত ঘরে গিয়া সুচিত্রা সিন্দুক খুলিল··· এবং একতাড়া নোট···তার মাথা ঘুরিতেছিল, চোখে সে অন্ধকার দেখিল!··

সেই অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যেই বিজলী কাগজ লইয়া তাহাতে কি সব লিখিল। লিখিয়া সুচিত্রার চোখের সামনে ধরিল···বিজলীর মুখে কৃতজ্ঞতার গদগদ বচন···ভগবানের নাম! সে যেন বিদ্যুতের একটা ঝলক বহিয়া গেল···তারপর যখন সচেতন সুচিত্রার চোখের সামনে বিশ্বভুবন আবার তার স্বরূপে দেখা দিল, তখন বিজলী চলিয়া গিয়াছে, এক হাজার টাকার বদলে পড়িয়া আছে একখানা হ্যাণ্ডনোট···টিকিটের উপর বিজলীর নাম সহি। সহিতে সেই অপূর্ব্ব কায়দা! সে যেন বিদ্রূপের হাসি!

সেটা সুচিত্রার হাতে রহিল। চোখের সামনে আলো আবার নিবিল। কাছে একখানা চেয়ারে অবসন্নের মত সুচিত্রা বসিয়া পড়িল; বসিয়া চক্ষু মুদিল।···

নিতাইয়ের আহ্বানে সুচিত্রা চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। একটা বড় নিশ্বাস কিছুতেই সে রোধ করিতে পারিল না। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! স্বপ্ন মিলায় না। আলোয় কালো কালো কি ও সব উড়িতেছে!

নিতাই কহিল—ও-লোকটা কেন এসেছিল? ঐ সুট্-পরা বাঙালী সাহেব?

সুচিত্রা কহিল—ও বিজলী।

নিজের স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। এ যেন কোন্ পাতালের অতল তল হইতে আর-কে কথা কহিল!

নিতাই কহিল—যেই হোক, ও ভারী বেশ-বাজ···

বেশ-বাজ! সুচিত্রার চোখে বিস্ময় ও আতঙ্ক··· সীমাহীন পাথারের মত।

নিতাই কহিল—ও আর ঐ মিলের অচিন্ত্য·· দু'জনে ভারী ভাব। কলকাতার মাঠে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ায় স্বপ্ন দেখে দিবা-রাত্র। চাকরি খুইয়েচে···ক্যাশ্ ভেঙ্গেছিল বলে। তারা ছাড়বে কেন? কাণ ধরে আদায় করে নিয়েচে·· পুলিশে খবর অবধি দিয়েছিল।

তাই। তাই। সুচিত্রার পায়ের তলা হইতে ভুনিয়া সরিয়া যাইতেছিল·· সে বুঝি কোন্ অন্ধকার রসাতলে নামিয়া যাইবে। পায়ের নীচে আশ্রয়ের চিহ্নও নাই!···

সুচিত্রা কহিল,—কত টাকা দিতে হয়েচে জানেন?

নিতাই কহিল,—শুনেচি হাজার বারোশো টাকা।... কিন্তু ও কি···আপনার মুখ যে সাদা হয়ে গেল। এর মানে? আপনার কোনো আত্মীয়?

সুচিত্রা একটা নিশ্বাস চাপিয়া কহিল,—এক রকম আত্মীয়ই। কিন্তু এমন উৎসন্ন গেছে। আমার স্বপ্নের অগোচর।···

সুচিত্রার মাথা ঘুরিতেছিল। সে চক্ষু মুদিল।···

পনেরো দিন পরের কথা।

এ পনেরো দিন সুচিত্রার কি ভাবে কাটিয়াছে, তা শুধু তার অন্তর্যামীই জানেন। নিতাই নিত্য আসে। তার সঙ্গে সুচিত্রার অনেক কথা...এ সব কথার অন্তরালে বেদনার কাঁটায় বেঁধা সুচিত্রার রক্তাক্ত মনের পরিচয় নিতাইয়ের অজ্ঞাত রহিল না। তবে কিসের বেদনা, এটুকু জানা গেল না। সে প্রশ্ন নিতাই কোনো দিন করিতে পারিল না···কেমন এক দ্বিধায় কণ্ঠ তার রুদ্ধ হইয়া আসে! অথচ জানিবার কি আগ্রহ!

সেদিনও কথা-বার্ত্তা হইতেছিল ··এমন সময় ডাক আসিল। টাইপ-করা একটা বড় খাম। হাতে লইতে সুচিত্রা কাঁপিয়া উঠিল! চিঠি খুলিয়া পড়িতে···সর্ব্বনাশ! সে অস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিল। নিতাই তার পানে চাহিল।

সুচিত্রা কহিল,—কি হবে? এ্যাঁ···

কথা শেষ হইল না। নিতাই তার পানে চাহিল। সুচিত্রার মুখ বিবর্ণ···যেন সে ভূত দেখিয়াছে, এমনি আতঙ্কে পরিপূর্ণ। সুচিত্রা চিঠিখানা তার হাতে আগাইয়া দিল।

নিতাই চিঠি পড়িল। মিশন্ হোম্ হইতে চিঠি আসিয়াছে। সাহেব লিখিয়াছেন, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিকে লইয়া কালই তিনি ফুলছড়িতে আসিতেছেন।···

সুচিত্রার দুই চোখে জল। সুচিত্রা কহিল,—উপায়?

নিতাই কহিল,—আমাকে সব কথা বলতে পারেন। আমি আঁচে যেন সব বুঝচি। কিন্তু...

সুচিত্রা সব কথা খুলিয়া বলিল···বিজলীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, তাও গোপন করিল না। শুনিয়া নিতাই কহিল,—বটে। আমি উপায় দেখচি।···

কিন্তু এক বিপদ বাধিল। তারিণীর সাহায্যে যে জাল পাতিয়াছে···সে জাল আজ টানা চাই। নহিলে সে কাজ ফাঁশিয়া যাইবে। অথচ বিজলীকেও চাই, আজই··· দুটাই সমান শয়তান। দুটাকেই আয়ত্ত করা চাই।

সুচিত্রার দুই চোখে জলের বিরাম নাই। নিতাই কহিল,—ভয় নেই। আমার শক্তিতে বিশ্বাস হচ্ছে না?···বেশ, প্রমাণ নেবেন। আমি তাহলে বসবো না। এখনি চলি তার সন্ধানে।

নিতাই উঠিল। উঠিয়া গৃহে ফিরিয়া সে দেখে, তারিণী আসিয়া বসিয়া আছে। তারিণী কহিল,—চরণকে ক্ষেতু রাজী করিয়েছে, ক্ষেতুর সেই বোন্‌ঝী এসেছে। তার এক ছেলে —সেই ছেলের অন্নপ্রাশন। আজ। ক্ষেতুর বাড়ীতেই হবে। খরচ-পত্র চরণ দিচ্ছে—সব ঠিক। এই থেকেই কায়দা করা সম্ভব হবে না?

নিতাই কি ভাবিল, ভাবিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—ঠিক হয়েচে! এক কাজ করো তারিণী...

তারিণী নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই কহিল,—চরণ ওখানে দেখা-শুনা করতে থাকবে নিশ্চয়?

তারিণী কহিল,—নিশ্চয়। আমিই বাজার করে দিয়েচি। ক্ষেতু বললে, আজই খাওয়া-দাওয়া। চরণকে সে বলেচে। চরণ রাজী না হয়ে করে কি! ক্ষেতু যা কাণ্ড বাধিয়েছিল —ওঃ, কলকাতার থিয়েটার দেখেচেন? একেবারে যেন সেই থিয়েটারের সেরা এ্যাক্‌ট্রেশের মত ভঙ্গী।

সোৎসাহে তারিণীর পিঠ চাপড়াইয়া নিতাই কহিল,—ঠিক হয়েচে। এক কাজ করো তারিণী···ক্ষেতুকে ঠিক রাখো, আড্ডার ধরে থাকে যেন! এই আনন্দের কাজে চরণকে ওখানে পোলাও খাওয়াতে হবে। তারপর···

তারিণী কহিল,—বেশ, আমি তাহলে এখন যাই। রাত্রে ভোজ।

নিতাই কহিল,—তুমি যাও। ক্ষেতুকে দিয়ে এই কাজটি করাতেই হবে—যেমন করে পারো। এ কাজ যদি পারো, তাহলে কেল্লা মার্ দিয়া।···তুমি শুধু এসে আমায় খপরটুকু দিয়ে যেয়ো—তারপর যা করবার, আমি করবো।

তারিণী খুশী-মনে চলিয়া গেল।

নিতাই তখন ডাকিল,—শশী—

শশী অদূরে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, কহিল,—কি?

নিতাই শশীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শশী তার পানে চাহিল।

নিতাই কহিল,—সদু বাবুকে খপরটুকু দিতে হবে। তারপর যত চাই-মশাইকে ও-বাড়ীতে নিয়ে খেতে পাবলে চরণের মরণ সুনিশ্চিত! যেমন ছুঁচো, পাজী···

শশী কহিল,—তা বলে বামুনের জাত মারবে?

হাসিয়া নিতাই কহিল,—জাতের ওর কি আছে? ক্ষেতুর হাতের অন্ন মুখে দিলেই বুঝি জাত যায়? অথচ ওর ঘরেই চরণের বাস। জাত-বিচারের চমৎকার আইডিয়া!

শশী কহিল,—তা বটে!

সদু লোকটির সহস্র দোষের মধ্যে একটি গুণ আছে —জাতের ব্যাপারে ভণ্ডামি করে না। দয়ামায়াবর্জ্জিত দুর্দ্দান্ত হইলেও জাতের সংস্কার বাঁচাইয়া চলে। চরণের সম্বন্ধে যে-কুৎসা রটিয়াছে, সেটা অতিরঞ্জিত ভাবিয়া সদু ক্ষমার চক্ষে দেখে।

নিতাই কহিল,—আমি একবার বেরুচ্ছি। তারিণী ফিরলে তাকে বসিয়ে রেখো। আমার সঙ্গে দেখা না করে সে যেন যায় না। কাজটি সুসম্পন্ন করা চাই। আজ রাত্রে। এমন সুযোগ আর মিলবে না।

শশী কহিল,—তা সুসম্পন্ন হবে।

—বেশ। বলিয়া কাঁধে চাদর ফেলিয়া নিতাই বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। শশী কহিল—কোথায় চললে?

নিতাই কহিল,—আর এক শয়তানের সন্ধানে। এও ভদ্রবেশী শয়তান। এর চাল আর-এক কাঠি উপরে···

কথার অর্থ না বুঝিয়া শশী নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল। নিতাই কহিল—কৌতূহল একটু সম্বরণ করো —পরে সব জানতে পারবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যা-দিগ্‌গজ

সারাদিন পাতি-পাতি খুঁজিয়াও বিজলীর সন্ধান মিলিল না। যে-মিলে সে চাকরির কথা বলিয়াছিল, সেখানে সন্ধান লইতে সংবাদ মিলিল, বিজলীর চাকরি এখানে হয় নাই। সাহেব তাকে দুদিন পরখ করিয়াই জবাব দিয়াছে।

সন্ধ্যার পর নিতাই স্কুলে ফিরিল। সুচিত্রা?...

ঘরে বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া সুচিত্রা পড়িয়া আছে। নিতাই দেখিল, তাকে ডাকিল না; ..নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া বসিল।

ছেলে-মেয়েরা স্তিমিত আলোয় ছায়া-মূর্ত্তির মত খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পড়িতে বসিল। নিতাই তেমনি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরের পর প্রহর অতীত হইয়া চলিল।..

রাত্রি সাড়ে ন'টা...জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। সুচিত্রা উঠিয়া বারান্দায় আসিল, আসিয়া নিতাইকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—সে আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলেছে। ও মিলে তার চাকরি নেই।

সুচিত্রা কহিল,—আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—তার পর?

—সে বলেচে, জেল বাঁচাতে সে-টাকা ব্যয় করেছে। তার হাতে কিছু নেই। টাকা সে এখন দিতে পারবে না।

নিতাই এমনি সাফাইয়ের কথাই ভাবিয়াছিল। সুচিত্রা কহিল—তার উপর সে হাঁকিয়ে দেছে। বলে,—এক মাসের কড়ারে টাকা নিয়েছি—পনেরো দিনের কড়ারে নয়! এক মাস পরে টাকা না পাও, নালিশ করো।

বিষম রোষে জ্বলিয়া নিতাই একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—কোথায় সে শয়তান?

সুচিত্রা কহিল,—ষ্টেশনের কাছে তার এক বন্ধুর বাড়ী—সেইখানে সে আছে। বন্ধুর নাম অক্ষয় বাবু। কাল সকালে কলকাতায় যাবে।

—পালাবে? পালাতে দিচ্ছে কে? বলিয়াই নিতাই উঠিল। সুচিত্রা কহিল,—কোথায় যাচ্ছেন?

—সেই অক্ষয়ের বাড়ী। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।...এখনো ক'ঘণ্টা সময় আছে, এ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করি। কিন্তু তার আগে শশীর একটা বরাত আছে।

সুচিত্রা নিষেধ তুলিতেছিল, সে নিষেধ তোলার পূর্ব্বেই নিতাই বীর-দর্পে দীর্ঘ দেহ লইয়া সরিয়া পড়িল। তাই তো,—ক্ষেতুর গৃহে আর এক শয়তানের খাসন ছিঁড়িবার আয়োজন বেশ পাকা করিয়া তোলা হইয়াছে। সে-কাজের এমন সুযোগ আর মিলিবে না! তারিণী, শশী প্রভৃতি সেখানে তার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে। বিজলীকে ধরিবার পূর্ব্বে সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। বিজলী তো কাল সকালে কলিকাতায় পলাইবে—তাকে বাগাইবার সময় এখনো নিঃশেষ হয় নাই! অথচ ক্ষেতুর গৃহে অন্ন-উৎসব...রাত প্রায় দশটা বাজিতে চলিল—এই তো মাহেন্দ্র-ক্ষণ!...

নিতাই গতির বেগ দ্রুত করিয়া বাগ্দীপাড়ার পথে চলিল। মাথার উপর আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না—বাতাসের দোলায় গাছের পাতায় মৃদু মর্ম্মর!

দূর হইতে অস্পষ্ট কলরব শুনা গেল। ঐ যে ক্ষেতুর গৃহ।...

নিতাই আসিয়া দেখে, বাহিরে এক গাছতলায় শশী ও তারিণী দাঁড়াইয়া আছে। নিতাইকে দেখিয়া তারিণী কহিল—আমি ভিতরে যাবো না। তবে ক্ষেতুকে সাফ বলেচি, এ কাজ যদি না পারো তো এ গাঁ থেকে আমায় বাস ওঠাতে হবে। ক্ষেতু দিব্য গেলেচে, চরণকে অন্ন সে খাওয়াবেই।

নিতাই কহিল,—সদু বাঁড়ুয্যেদের খপর দিয়েচো শশী?

শশী কহিল,—উড়ো চিঠি দিয়েচি। তাছাড়া সদুর এক মাসতুতো ভাই আছে না...রমানাথ? তাকে লোভ দেখিয়েচি, ঐ পাত্রীদের ইস্কুল দেখতে দিনের বেলায় যাবো। সে ভাব করতে চায় সুচিত্রার সঙ্গে...

নিতাই কহিল,—তার মানে?

শশী কহিল,—বেচারীর চাকরি নেই। বি-এ ফেল করে সে এসে সদুকে ধরে, কিছু টাকা ধার দাও...ব্যবসা করবো। তা সদু বলেচে, ধার দিতে রাজী আছে, রমানাথের একটু জমি আছে কলকাতায়, সে-জমি যদি তার কাছে রমানাথ বন্ধক রাখে। ঐ জমির উপর সদুর খুব লোভ। বেচারী বলছিল, যদি এ চাকরি পায়, তাহলে আর সদুর বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে তাকে পড়তে হবে না! অর্থাৎ ঐ জমির জন্য রমানাথকে সদু একটু যত্ন-আত্তিও করচে দুদিন।

নিতাই কহিল,—কি করে সে জানলে, আমরা স্কুলে যাই?

শশী কহিল,—সেখানে সে একদিন আমাদের দেখেছিল।...

নিতাই কহিল,—তা, রমানাথ কি করবে?

শশী কহিল,—সদুর দলকে গিয়ে সে বলেচে,—চরণ ভটচায্যি সকলের নাম ডুবুলো—ক্ষেতুর বাড়ী আজ নেমন্তন্ন খাচ্ছে! সদু বলেচে, স্বচক্ষে সে দেখতে চায়... রমানাথ এতক্ষণ এখানে ছিল,—দশ-বারো মিনিট হলো, সদুদের ডাকতে গেছে।

—বেশ! বলিয়া নিতাই তারিণীর পানে চাহিল, কহিল—এ যজ্ঞ আমরা দেখি কি করে?

তারিণী কহিল,—চুপি-চুপি আসুন—সে ব্যবস্থা করেচি। ক্ষেতুর ঘরের পাশে ঢেঁকিশালে একটা কাপড় টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েচে—পর্দার মত। ওদিকে ছোট জানলার গরাদ ভাঙ্গা—সেদিক দিয়ে ঢেঁকিশালে ঢুকে আমাদের বসে থাকতে হবে।...আসুন আমার সঙ্গে...

নিতাই কহিল,—তার পর সদুরা এলে...?

তারিণী কহিল,—আমি বাইরে থাকবো—খপর দেবো। ক্ষেতুকে ইশারা করলেই চরণের সামনে সে ভাতের থালা এগিয়ে দেবে ...

নিতাই ও শশীকে লইয়া তারিণী ঢেঁকিশালে ঢুকিল।

উঠানে কুটুম্বের দল আহারে বসিয়াছে। চরণ চুপ করিয়া ক্ষেতুর ঘরে তক্তাপোষে বসিয়া তামাক টানিতেছে।...তারিণী দ্বারে করাঘাত করিল। সন্তর্পণে... শুনিয়া ক্ষেতু বাহিরে আসিল।

তারিণী মৃদু-স্বরে কহিল,—শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন, ক্ষেতুরাণী?

ক্ষেতু হাত নাড়িয়া কহিল,—বামুনের জাত মারচি তোমার কথায়—এর পরে তুমি যেন আমায় পায়ে ঠেলো না, দেখো।

তারিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, না...

তারিণী নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। ক্ষেতু ঘরে গিয়া চরণকে কহিল—তোমার ভাত আনি...

চরণ চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কহিল,—ভাতটায় আমার তৃপ্তি, খাইয়ে তোমার তৃপ্তি—দু' নম্বর তৃপ্তি হয়ে যাবে।

ক্ষেতু কহিল,—ও-সব বিটকেলমি আমি শুনচি না। আজ একটা আমোদের কাজ· এতে যদি বাগড়া তোলো, তাহলে সত্যি বলচি, আমি তোমার মুখ দর্শন করবো না।

চরণ হতাশ দৃষ্টিতে ক্ষেতুর পানে চাহিল।

ক্ষেতু কহিল,—আমার কাছে বামনাই ফলিয়ো না, ঠাকুর। আমি তামাক সেজে দিচ্ছি, হুঁকোয় জল আছে—সে জল আমার ছোঁওয়া। আগুন আর জল... দুই আছে—তার সঙ্গে তামাক আর টিকে, কেমন তো? পোলাওতেও ঐ আগুন আর জল—শুধু তামাক-টিকের বদলে চাল আর মশলা—এই না...? তবে

চরণ কহিল,—এটা কাষ্ঠ-সংযোগে কি না...কথায় বলে, কাষ্ঠে জাত যায় না।...

হাসিয়া ক্ষেতু কহিল,—আচ্ছা বাবু, পিঁড়িতে বসে খেয়ো...কাষ্ঠের যোগ থাকবে তাহলে। না খেলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো...সত্যি! কে জানবে? শুধু তুমি আর আমি...

চরণ কহিল, আমায় আজ বঙ্কিমবাবুর সেই বিদ্যাদিগগজ না করে আর ছাড়বে না, দেখচি! যাক্, মহাজনের পথ। তার ছিল আশমানি, আর আমার তুমি।

—সে আবার কি?

চরণ কহিল,—সে এক মজার গল্প। বলবো'খন। এখন নাও, ছাড়বে না তো...তোমার সন্তোষের জন্য কি না করতে পারি!—তবে, চুপি চুপি...বুঝলে ক্ষেতু... আর পাঁচ বেটা-বেটি জানলে...

ভয় নেই গো ঠাকুরমশাই, সে জ্ঞান আমার আছে। বামুনের জাত মারচি জানলে এ গাঁয়ে কি আমায় কেউ আস্ত রাখবে? সে-ভয় আমার নেই?

—এই, এই, বোঝো তো এ গাঁয়ে শাসন কত কড়া!

ক্ষেতু চলিয়া গেল। চরণ বসিয়া চালের বাতা গণিতে লাগিল।

নিতাই ও শশী কথাগুলা শুনিল। নিতাই শশীর গায়ে ঠ্যালা দিয়া কহিল,—সমাজপতির কাণ্ড দেখচো?

শশী কহিল—চুপ!

ক্ষেতু থালায় অন্ন বাড়িয়া আনিল—মাটীর ভাঁড়ে ঝোল, থালায় বিবিধ তরকারী।

ক্ষেতু কহিল,—খাইয়ে দি, হাত অশুদ্ধ নাই করলে!—তাছাড়া হাতে গন্ধ থাকবে। শুধু মুখ দিয়ে খাবে বৈ তো নয়। আঁচিয়ে পাণ আর তামাক খেলেই চুকে যাবে।

চরণ কহিল—বেশ বুদ্ধি করেচো! কিন্তু দোরে খিল দাও। কেউ যদি এসে পড়ে?

ক্ষেতু কহিল,—কেউ আসবে না। ভয় নেই। তাছাড়া কেউ আসে তো ভাববে, আমি খাচ্ছি! আমার হাতে ভাত—তোমার হাত খালি দেখবে তো! তুমি ঐ পালঙেই বসে থাকো—আমি গরাস তুলে তোমার মুখে দি।...

তাহাই হইল। নিতাইয়ের অস্বস্তির অন্ত নাই। সে ওদিকে প্রহর গণিতে লাগিল...সদুবাবুরা কখন্ আসিবে!

চরণ আরামে গ্রাস লইতেছিল। ক্ষেতু কহিল—কেমন রান্না হয়েচে?

চরণ কহিল—বেশ। এমন কখনো খাইনি, ক্ষেতু —সত্যি বলচি। কে রাঁধলে?

ক্ষেতু কহিল—আমার বোনঝী-জামাই। সে হুগ-লিতে এক সাহেবের বাবুর্চ্চি কি না—রান্না-বান্না জানে।

চরণ কহিল,—বিলিতি খানা! তাই বলো! এমন খানা খায় বলেই না এরা রাজত্ব করচে! আর আমরা যেমন শাক পাতা খাই, তেমনি দাসত্ব করে মরচি।

ভোজ্যের স্বাদে চরণ জাতের কথা ভুলিয়া গেল। মাংস খাইতে খাইতে চরণ কহিল,—দাঁতের সে জোর

নেই ক্ষেতু···নাহলে···আচ্ছা, তোমার এই বোন্‌ঝী-জামাইটি কিছু দিন আছে তো এখন ?

ক্ষেতু কহিল,—না। ছুটী মেলে কৈ ? কালই বিকেলে চলে যাবে।

একখানা হাড় চিবাইবার লোভ চরণ ছাড়িতে পারিল না।···কাজেই তক্তাপোস হইতে নামিয়া হাত দিয়া সেটা বাগাইয়া ধরিল, ধরিয়া কামড় দিল।

বেচারী! সহসা দ্বারপ্রান্তে স্বর ফুটিল,—ইস্···এ যে সত্যই মহোৎসব লাগিয়েচো হে চরণ!

এ স্বর···? চরণ চমকিয়া উঠিল। কম্পিত হাত হইতে ছাগলের হাড় পড়িয়া গেল। চাহিয়া চরণ দেখে, সর্ব্বনাশ! দ্বারে দাঁড়াইয়া সদু বাঁড়ুয্যে, রমানাথ এবং ...কে সে নাই! ক্ষেতু কি ইহাদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছে ?

সদু কহিল,—খুব বামুন তুমি! বাঃ!

নিতাই ও শশী ঢেঁকিশাল হইতে বাহিরে আসিল। নিতাই কহিল,—আমরা সাক্ষী, বাঁড়ুয্যে মশাই। এই চরণকে দিয়ে দেশ-শুদ্ধ সকলের জাত মেরেচেন আপনি। এর সামাজিক বিহিত যদি না হয়, আমরা কাছারিতে নালিশ করবো। জাত-মারার অপরাধে জেলও হয় নাকি শুনেচি।

সদু কহিল,—আমি ছাড়বো না হে। এর বিহিত আমি করবোই।···চরণ···

আর চরণ! চরণ তখন একেবারে মাটীতে মিশিতে চলিয়াছে!

মাথায় ঘোমটা টানিয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে ক্ষেতু পাশ কাটাইয়া ঘর হইতে কখন যে ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছে···

নিতাই কহিল,—এর বিহিত যদি না করেন, তাহলে আমরা উপায় দেখবো। ঐ পাদ্রীদের ধরবো···জাত যদি যায়, তাহলে আমরা খৃষ্টান হবো।

সদু কহিল,—এইখানেই থেকে যাও চরণ। গাঁয়ে আর হাড়-চোষা মুখ দেখিয়ো না। দেখালে তোমায় রক্ষা করবার সাধ্য আমাদের থাকবে না।

নিতাই কহিল,—ওঁকে সৎপরামর্শ দিয়েচেন। তা উনি রাজী—উনি নিজেই বলছিলেন, উনি নাকি বিদ্যাদিগ্‌গজ আর ক্ষেতু ওঁর আশমানী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-চক্র

সারা রাত্রি নিতাইয়ের আর দেখা নাই!—রাত্রিটা সুচিত্রার যে-বিভীষিকার মধ্যে কাটিল...বুঝি নরক-যন্ত্রণা বলিয়া যে কথা আছে, সে নরক-যন্ত্রণাও তাহার কাছে অতি-তুচ্ছ!

সকালে সেই রৌদ্র, সেই বাতাস! তবু দুনিয়ার মুখের কালি আর ঘোচে না!—সাহেবের আসিবার কথা ন'টায়!···নাই, উপায় নাই,—কোনো উপায় নাই! এই কালি মুখে মাখিয়াই তাঁদের সামনে দাঁড়াইতে হইবে। নিজের মুখে সে কবুল করিবে, করিয়া বিচার চাহিবে—যত বড় কঠিন শাস্তি হোক, বুক পাতিয়া সে তা গ্রহণ করিবে!

চা-সমেত চায়ের পেয়ালা টেবিলে পড়িয়া রহিল। ছেলেরা আসিল। পড়াশুনা···

সুচিত্রা কহিল—আমার শরীর বড় খারাপ, আজ ক্লাশ নিতে পারবো না। তোমরা পড়ো গে।

ছেলেরা সুচিত্রার মুখের পানে চাহিল। ও-মুখ এমন মলিন তারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই! তারা বিদায় লইল!

খবর পাইয়া সুহাস ছুটিয়া আসিল। তার মুখ-চোখে উদ্বেগের ছায়া। সুহাস কহিল,—কি অসুখ?

সুচিত্রা মৃদু কণ্ঠে কহিল,—এমন কিছু নয়। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, তাই কেমন আলস্য···

সুহাস কহিল,—তাই বলুন। সময়টা খারাপ কি না—ভয় হয়েছিল।

মৃদু হাসিয়া সুচিত্রা কহিল—ভয়ের কারণ নেই। আপনি যান্।

সুহাস চলিয়া গেল। সুচিত্রা পথের পানে চাহিল; পরে ঘড়ির পানে। ঘড়ির ছোট কাঁটা আটটার ঘর পার হইয়াছে, ন'টার ঘর এখনি বুঝি ধরে। সুচিত্রা মুখ-হাত ধুইতে গেল।

সাফ হইয়া সে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, পথের পানে চাহিয়া রহিল। বড় বড় গাছ ছায়া মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাতাসে পত্র-পল্লব মৃদু দুলিতেছে! চারিদিকে জীবনের স্পন্দন! দীপ্ত শ্রী!···তার মনে শুধু সকালেই ভয়ের ছমছমানি!

ঐ না···ঐ···কতকগুলা শুভ্র মূর্ত্তি? তাই! সুচিত্রা চক্ষু মুদিল, একান্ত আগ্রহে ভগবানকে ডাকিল—O Father, That art in Heaven···

সাহেব আসিলেন—সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। সুচিত্রা তাঁদের অভ্যর্থনা করিল!

চারিদিক দেখিয়া সাহেব প্ল্যান খুলিলেন, কহিলেন,-

ইনি শীঘ্র কাজ সুরু করবেন! তুমি ওঁর হাতে টাকা দিয়ে যাও, সুচিত্রা। উনি তিন মাসে কাজ শেষ করে দেবেন। সাহেবের মুখ সস্মিত।

এঞ্জিনিয়ার বাঙালী। হাসিয়া তিনি কহিলেন—আপনার কি সুখ্যাতিই যে করছিলেন সাহেব···বল-ছিলেন, she is an angel।

সুচিত্রা গাঢ় কণ্ঠে কহিল—টাকা আনি!

সে ঘরে ঢুকিল···সিন্দুক খুলিল। Miracle···? তেমন miracle ঘটে না?···মহাভারতে সে পড়িয়াছে, দ্রৌপদী নারায়ণকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁর···লজ্জা রক্ষার জন্য! নারায়ণ সে ডাক শুনিয়াছিলেন! আজ তারও দ্রৌপদীর দশা! বুঝি দ্রৌপদীর চেয়েও বড় বিপদ। চোরের কাজ করিয়াছে সে। কত বড় কলঙ্ক! তাই সে ভাবিতেছিল, ভগবান কি তার ডাক শুনিবেন না? Miracle-এর সৃষ্টি করবেন না?

বুকখানা নিমেষের জন্য স্পন্দিত হইল। কিন্তু কিছু ঘটিল না! কোথায় miracle।··টাকা গণিয়া যতবার দেখে, ততবারই কম হয়—সেই এক হাজার কম। তার নিজের সঞ্চয়? গণিয়া দেখে, তিনশো বত্রিশ টাকা! বাকী ছ'শো আটষট্টি টাকা চাই!···কোনো উপায় নাই? ভগবান···ভগবান, তোমার অসাধ্য কিছু নাই। তুমি মনে করিলে···মান রাখো, মান রাখো, দুর্বল-চিত্তা নারীর মান ইজ্জৎ রক্ষা করো প্রভু।

কে শুনিবে? মানুষের শয়তানীর পর শয়তানী দেখিয়া ভগবান আজ চক্ষু মুদিয়াছেন। তাঁর বিরক্তি ধরিয়াছে, ঘৃণা ধরিয়াছে, মানুষের ডাক তাই তিনি আর কাণে তোলেন না।

উপায়?

দুনিয়া দুলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছপালা মাঠ-বাট···মাথার উপর ঐ রৌদ্র-আলোকিত নীল নির্মল আকাশও··!

উপায় আছে। একটিমাত্র উপায়! তাহাতে লজ্জা রক্ষা পাইবে—আর কিছু না হোক্!···সেই উপায়ই···

টেবিলের উপর টাকার থলি ও বিজলীর হ্যাণ্ডনোট রাখিয়া সুচিত্রা পিছনের দ্বার-পথে বাহির হইয়া গেল··· বুঝি নিতাইয়ের সন্ধানে। তার গতি চোরের মত সতর্ক কম্পিত।

দীর্ঘ পথ। খোলা মাঠ, বন, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ, পুকুর, ডোবা, খানা, নালা···কদর্য্যতার সঙ্গে চারু-তার বিচিত্র মিলন···। সুচিত্রার মনে হইল, শয়তানীর সঙ্গে করুণার মিলনের মত বড় মধুর!

কিন্তু নিতাইয়ের কাছে সে কেন চলিয়াছে? নিতাই কি করিবে? কেন করিবে?...কি বলিয়া সেই বা করুণা ভিক্ষা চাহিবে? বুকে তার তীব্র বহ্নি-দাহ! সে দাহে তীক্ষ্ণ জ্বালা!

সামনে ঐ পুকুর। বুকে কালো জল। পুকুর ডাকিতেছিল—তোমার ও জ্বালা আমি জুড়াইয়া দিব। এসো, আমার বুকে এসো।

নিমেষের ইঙ্গিত। কাণের কাছে মনও কহিল—তাই চলো। সব কুৎসা, সব গ্লানি জুড়াইবে চলো!

সুচিত্রা পুকুরে নামিল—আঃ, কি শীতল জল! কি আশার উল্লাসে ভরা। কি স্নিগ্ধ আরাম এ জলের কোলে···

দুনিয়ার আলো বিদ্যুতের চমক দিয়া পরক্ষণে দপ করিয়া নিবিয়া গেল। সব অন্ধকার...দিকে দিকে কেবলি ঘন কালো অন্ধকার।···

যখন সুচিত্রা চোখ মেলিল, ঘরে এক-ঘর লোক। সাহেব এঞ্জিনিয়ার, সুহাস ডাক্তার আর নিতাই। নিতাইয়ের চোখে তীব্র আগ্রহ!

সাহেব কহিলেন—জলে ডুবলো কি করে? ওদিকে গেল কখন্?

নিতাই কহিল,—টাকা এখানে রাখা নিরাপদ নয় বলে আমার কাছে রেখেছিলেন। তারপর আমার কাছে যাচ্ছিলেন, পিছল পথ—কেমন পা হড়কে জলে পড়ে যান। ভাগ্যে আমি ঐ পথে আসছিলুম···

সাহেব কহিলেন—Thank God; And He never means harm to the good.

নিতাই কহিল,—তাই।

সুচিত্রার লুপ্ত চেতনা ফিরাইতে বিলম্ব ঘটিল না। নিতাই খুব সময়ে এ পথে আসিয়াছিল! সুচিত্রা জলে হাবুডুবু খাইতেছিল—পথের ধারেই পুকুর। জলও খুব বেশী ছিল না। শুশ্রূষায়-সেবায় কলরবে সারাদিন কাটিয়া গেল। বৈকালে সাহেব সদলে বিদায় লইলেন।

নিতাই তাঁদের বিদায় দিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। সুচিত্রা দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে একটা পাখী উড়ি-তেছে, সুচিত্রা তার পানে চাহিয়াছিল। সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুচিত্রা কহিল—এত টাকা আপনি কেন দিলেন?

নিতাই কহিল, ও-কথা মুখে আনবেন না,—টাকা এমনি পড়েছিল বৈ তো নয়! তবে বিজলীকে শিক্ষা যা দিয়েছি, তা তার হাড়ে হাড়ে গাঁথা থাকবে।··সকাল অবধি যখন কিছু আদায় হলো না, তখন বাড়ী ফিরে এসে টাকার যোগাড় করে ফেললুম।

সুচিত্রা কহিল—কিন্তু এ ঋণ···

নিতাই সুচিত্রার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—সঙ্গে রেখে আপনার কাজে হাত দিতে দিলেই এ ঋণ শোধ হবে।

সুচিত্রা চাহিল,—তার মুখের পানে···দৃষ্টিতে গভীর কৃতজ্ঞতা!

নিতাই কহিল,—আমার ছন্নছাড়া জীবনের মাঝখানে আসতে বলতে পারি না, তবে আমার কর্ম্মহীন অলস জীবনে আপনি যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেচেন··· আপনার আদর্শ···

সুচিত্রার চোখের দৃষ্টিতে কি আবেগ! আবেগের অধীরতায় সে টলিয়া পড়িতেছিল! নিতাই ক্ষিপ্র তাকে ধরিয়া ফেলিল। সুচিত্রার দেহে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া গেল! মুখে রক্তিম আভা ফুটিল। নিতাই তা লক্ষ্য করিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই কহিল,—শয়তান কিন্তু একটা কথা ঠিক বলেছিল, জীবনের পথে সাথী চাই, মনকে সর্ব্বদা যে উদ্দীপ্ত রাখবে!

সুচিত্রার মুখ ফুটিল। সে কহিল,—সে যোগ্যতা কি আমার আছে?

নিতাই চমকিয়া উঠিল। সে কহিল,—যোগ্যতা! আপনার যোগ্যতা! আমিই অযোগ্য···তাই মনের স্পর্দ্ধা...

সুচিত্রা কহিল,—ও কথা বলবেন না। আমি আপনার পায়ে চিরদিন বিক্রীত রইলুম। কে আমি, অথচ কি দিয়ে আমার মান, আমার ইজ্জৎ আপনি রক্ষা করেচেন! কিন্তু··আমার দেবার কি আছে? তার উপর···

নিতাই সুচিত্রার হাত ধরিয়া কহিল,—তার উপর কি?

সুচিত্রা কহিল,—আমি অনাথা! খৃষ্টানের ঘরে খৃষ্টানের অন্নে প্রতিপালিত···

নিতাই কহিল,—হিন্দু-খৃষ্টান এ ভেদ মানুষের তৈরী। আমরা মানুষ···একই বিধাতার হাতে গড়া মানুষ। শুধু সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে এই হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের ভেদ রচে মস্ত ব্যবধান গড়ে তুলচি পরস্পরের মধ্যে। এ ভেদ আমরা মানবো না···। মানুষে-মানুষে মনের-মিল চাই। সে মিল ঘটাতে পারলে এ পৃথিবী সৃষ্টির সার্থকতায় ভরে উঠবে! সেই সার্থকতা যাতে লাভ করতে পারি, আসুন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন মিশিয়ে এক-লক্ষ্যে বইয়ে দি···

সুচিত্রা কহিল,—তাই হোক!

তার স্বর মৃদু, কোমল। সে-স্বরে রাজ্যের মাধুরী আর আরাম! আর দুই চোখের দৃষ্টি? আনন্দের আবেশে পরিপূর্ণ!

শেষ

মৃণাল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সুদূর

নবীন কবির পক্ষে ভক্ত পাঠক-লাভ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কমলের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিপিন ছিল কমলের আশৈশব বন্ধু। এক গ্রামে দুজনের বাস। কমলের বাপ গ্রামের জমিদার, বিপিন সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। গ্রামের স্কুলে বিপিনের শিরে সরস্বতীর কৃপা অকুণ্ঠিত ধারে বর্ষিত হইলেও কমলের ভাগ্যে তার অভাব ঘটে নাই। বিপিনের জন্য অনেকখানি কৃপা বর্ষণ করিয়া অবশিষ্টটুকু কমলকে দান করিয়া সরস্বতী দেবী প্রসন্ন ছিলেন। ক্লাসে বিপিন প্রথম স্থান অধিকার করিত, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানটিতে কমলেরই ছিল অপ্রতিহত অধিকার। স্কুলের ছুটির পর কমল যখন নিজেদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, বিপিনের তখন সে ছাদে অব্যাহত প্রবেশলাভ ঘটিত। বিপিন ধরাই দিত, কমল ঘুড়ি উড়াইত। সুতায় মাঞ্জা দিবার কল্পনা কমলের মনে উদিত হইবামাত্র বোতল-চূর ও বেলের আঠা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া বিপিন কোথা হইতে নিমেষ-মধ্যে আবির্ভূত হইত, তাহা দেখিয়া কমলেরও তাক্ লাগিয়া যাইত। সে শুধু বিস্ময়ে সম্ভ্রমে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিত।

এইরূপে অর্থগত দারুণ বৈষম্যের ব্যবধান-সত্ত্বেও দুটি তরুণ-হৃদয় আশৈশব একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা একই স্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল। তার পর এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দুই বন্ধুতে কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিল।

গ্রামের স্নিগ্ধ পবন-শিহরিত কুঞ্জ-তলে শ্যামার শিষের মধুর স্পর্শ যে-হৃদয়ে কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই, সহরের রুদ্ধ আকাশ ও রুদ্ধ বাতাস সে-প্রতিভা জাগাইয়া তুলিল। সহসা এক দিন নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে পাথর ঠেলিয়া কমলের প্রাণে নির্ঝরের মতই ভাব-ভাষা বিচিত্র ছন্দে কবিতার আকারে ঝরিয়া পড়িল। কমল কবিতা লিখিল। গ্রামের সেই ভাঙা ঘাট, জীর্ণ শিব-মন্দির, খেলার মাঠ ও নিভৃত ছাদের কোণ এক অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কমলের বিরহ-তপ্ত প্রাণে সজীব সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মায়ের আদর, ভাইয়ের ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ দূরত্বের ব্যবধান ঠেলিয়া কমলের মনকে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিল!

সে রাত্রে কমলের ঘুম হইল না। কখন্ সকাল হইবে, বিপিন আসিবে? কবিতা লিখিয়া সুখ নাই, কাহাকেও তা' পড়ানো চাই! সে পড়ানোও আবার যাকে-তাকে নয়। প্রাণের যে প্রিয়জন, প্রাণের সমস্ত অলি-গলির যে সন্ধান জানে, তাকে চাই। যে শুধু কবিতার ছত্র দেখিয়া তারিফ করিবে না, এই ছত্রগুলির অন্তরাল দিয়া একেবারে অতি সহজে কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে, তাকে, তাকেই পড়ানো চাই। সে লোক বিপিন।

এই রাত্রে যদি সমস্ত সহর-বাসী ছুটিয়া আসিয়া কমলকে বলে, ওগো তরুণ কবি, আমরা আসিয়াছি, শুনাও, শুনাও, তোমার কবিতা শুনাও! তাহাতে কমলের তত আনন্দ হইবে না, যতখানি হইবে, একবার যদি বিপিন শুধু আসে! নিভৃতে তার পাশে বসিয়া বিপিনকে যদি এ কবিতা সে পড়িয়া শুনাইতে পারে, তবেই তার কবিতা লেখা সার্থক হয়! অধীর আগ্রহে একরূপ বিনিদ্রভাবেই কমলের সে রাত্রি কাটিল।

সকালে বিপিন আসিয়া কমলের বাসায় উপস্থিত। নিত্য সে প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া কমলের এখানে চা খাইতে আসে; আজও আসিল। কিন্তু চায়ের সঙ্গে সে আজ কমলের কবিহৃদয়-নিঃসারিত যে আনন্দ-রস পান করিল, তাহাতে জুড়াইয়া গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুর ললাটে জয়-টীকা পরাইয়া বিপিন সে দিন যখন বিদায় লইল, তখন বেলা ন'টা বাজিয়া গিয়াছে।

সেদিন হইতে বিপিন ও কমলের মিলন-সূত্রে আর-একটা নূতন গ্রন্থি পড়িল। বন্ধন দৃঢ়তর হইল। তরুণ কবি বিহ্বল নেশায় কবিতা লিখিয়া যাইতে লাগিল এবং ভক্ত পাঠক নিত্য আসিয়া কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ চিত্তে কবির কণ্ঠে আশা-প্রশংসার বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিতে এতটুকু অবহেলা রাখিল না।

তার পর ঝড় উঠিল। মানব-জীবনে এ ঝড় নূতন নয়,—এ ঝড় নিত্য বয়। এ ঝড়ে নিকট দূর হইয়া যায়, দূর নিকটে আসে। এ ঝড় বন্ধুকে বন্ধুর পাশ হইতে ছিনাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, বন্ধুর সভায় নূতন আগন্তুককে টানিয়া আনিয়া মহা সমাদরে আসন বিছাইয়া বসাইয়া দেয়।

কমল ও বিপিনের জীবনেও এ ঝড় দেখা দিল। সহসা একদিন প্রাতে উঠিয়া কমল দেখে, বিপিন নাই!

পয়সার জন্য—সংসারের জন্য বিপিন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। এ দূরত্বকে চিঠির শৃঙ্খলে কিছুদিন বাঁধিয়া রাখা গেলেও চিরদিন বাঁধিয়া রাখা যায় না। চিঠি কাগজের শৃঙ্খল—কতটুকুই তার বল! সভায় এ দিকে নিত্য নূতন নূতন লোক আসিয়া দেখা দিতেছে—কত দিন তাদের ঠেকাইয়া রাখা যায়! তাদের কোলাহলে বাধ্য হইয়া তাদের পানে চাহিতেই হইবে। তাদের দাবী তারা ছাড়িবে কেন? যখন তারা পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাদের ঠেলিয়া চলিয়া যাইবার সাধ্য কি!

যশ! কি তাহাতে মোহ আছে। কি সে কুহক জানে। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া স্রোতের ফুলের মত ভাসিয়া যখন কমলের কবিতাগুলি বঙ্গবাসী নবনারীর অন্তর-তট ছুঁইয়া যাইতে লাগিল, তখন তার পক্ষে চিঠির দুর্গে বসিয়া দূর-গত বন্ধুর পানে চাহিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এখন কমল আর বিপিনের কবি নয়, এখন সে সকলের কবি, বাঙালীর কবি! বিপিন শুধু আর তার একটিমাত্র পাঠক নয়, এখন তার পাঠক-সংখ্যা বহু।

একের কাছে আগে সে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ধরিত, তাহাতে সুখ ছিল। এখন একের জায়গায় অনেক আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকেও সুখ আছে, তার উপর অনেকে আর-একটা অতিরিক্ত-কিছু—নেশা! নেশার শক্তি অসাধারণ—সে শক্তি এড়ানো তরুণ কবির সামর্থ্যের বাহিরে।

বেচারা বিপিন কোন্ সুদূর গৃহ-কোণে পড়িয়া আছে। যারা কলরব-কোলাহলের মধ্যে থাকে, তাদের একটা সুখ আছে—স্মৃতি তাদের জ্বালাইতে যায় না। স্মৃতি দুরন্ত হইলেও নারী; নারীর মতই তার সহজ কুণ্ঠা আছে। তাই সে ভিড়ে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু যারা বিরহ-ম্লান নীরব গৃহ-কোণে পড়িয়া থাকে, স্মৃতি তাদের বড় জ্বালায়! বিপিনেরও তাই ঘটিয়াছিল।

একা সে এক কোণে নিরালায় পড়িয়া থাকিত, স্মৃতি তাহাকে ছাড়িত না। নিভৃত বিজন ঘরের কোণ! বাহিরের কলরব সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। নীরব অবসরে সে তার স্মৃতির দেওয়া পুঁথিখানা খুলিয়া বসে। পুঁথি জীর্ণ হইয়াছে, তবু তার কয়টা পৃষ্ঠা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে! সেই পাতাগুলার পানে মৌন-মূক বিপিন চাহিয়া থাকে। চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। ঝাপ্‌সা চোখে পুঁথির পাতা মিলাইয়া আসে। নূতন ছবি অজ্ঞাতে তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। সে ছবি কমলের। পত্র-পুষ্পে খচিত আলোর লহরে ভূষিত বিরাট সভা-মণ্ডপ—সে মণ্ডপের এক পাশে উচ্চ বেদী। বেদীর উপর বসিয়া কমল গান ধরিয়াছে। শিরে তার মণিময় মুকুট, ললাটে চন্দন-তিলক, ওষ্ঠে হাসি, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি! আর তারই চারিধার ঘেরিয়া সারা বাঙ্‌লার লোক বসিয়া আবেশ-বিহ্বলভাবে সে গীতি-সুধা পান করিয়া ধন্য হইতেছে! সে সভায় সকলে আছে, সকলের উপর দিয়া কবির প্রসন্ন স্মিত হাস্য অজস্র ধারে বহিয়া চলিয়াছে! নাই শুধু সেথা বিপিন। কৈ, কবির চোখ বিপিনকে খুঁজিতেছে না তো!

না, আজ আর বিপিনকে তার প্রয়োজন নাই! সুর সাধিতে হয় নির্জ্জনে। সে সময় একজন,—একজনের শুধু পাশে থাকা প্রয়োজন! যদি ভুল হয়, সে শুধরাইয়া দিবে! যদি ঠিক হয়, সে তারিফ করিবে! আজ সুর সাধা হইয়াছে,—আজ আর তাকে কি প্রয়োজন!

উপরে উঠিবার সময় সিঁড়ির প্রয়োজন—কিন্তু উপরে উঠিয়া সিঁড়ির পানে চাহিয়া থাকা মূঢ়তা! সিঁড়ির কাজ তখন ফুরাইয়াছে। নামিবার যখন প্রয়োজন নাই, তখন সে সিঁড়ি রহিল কি গেল, তা দেখিয়া কাজ কি!

কমলের খ্যাতি কাব্যের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ক্রমে নাটকের ক্ষেত্রে দেখা দিল। দুই মাস ধরিয়া বাঙ্‌লার সংবাদ-পত্রে মাসিক পত্রে দুন্দুভি বাজিতেছিল, কবিবর কমলকুমার নাটক লিখিয়াছেন। বাঙ্‌লার প্রধান নাট্যশালা হীরক রঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় হইবে। মহাসমারোহে নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে।

সুদূর প্রবাসে বসিয়া বিপিন সে দুন্দুভি-নাদ কাণে শুনিল। তার মাথার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। এ সেই কমল! তার কমল! সে আজ বাঙ্‌লার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! আর সে⋯!

বিপিনের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! এই তার হস্তাক্ষর! এই তার হৃদয়! চিঠির পর চিঠি খুলিয়া বিপিন পড়িতে লাগিল। কৃপণের ধনের মতই চিঠিগুলিকে সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। এই সেই প্রথম চিঠি। আট পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া চিঠি! ভাদ্রের কূলে কূলে ভরা নদীর মত কমলের সমস্ত হৃদয়টুকু এই আট পৃষ্ঠায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে! তার পর⋯? চিঠির পাতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও গুড়াইয়া গিয়াছে! শেষে—আজ তিন বৎসর চিঠির আর দেখা নাই। শেষ চিঠিখানি তিন বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা! শুধু দুইটি ছত্র—"মাসিক-পত্রের তাড়ায় চিঠি দিতে অবসর পাই না। ক্ষমা করো! কেমন আছ?"

শুধু এই কয়টি কথা। 'অবসর পাই না!'—একখানা চিঠি দিবার অবসর হয় না? এত কাজ। বিপিনের সমস্ত বুকখানাকে নাড়া দিয়া একটা প্রবল নিশ্বাস ঝড়ের মতই বেগে ছুটিয়া বাহির হইল। এ চিঠি নয়, বিদ্যুৎ-শিখা। এ শিখা বিপিনের প্রাণখানাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বিপিন কলিকাতায় আসিল। সেদিন শনিবার। হাবড়ার পুল পার হইতেই রাস্তায় একটা বাড়ীর দেওয়ালের উপর বিপিনের নজর পড়িল। নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র করা বড় অক্ষরে ও কি লেখা।—কবিবর কমলকুমার রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক, মণি-হার।

উত্তেজনায় বিপিনের মাথার শিরা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে রক্ত নাচিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর নাট্যশালার সম্মুখে গিয়া সে দেখে, কি ভিড়। সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলের মুখে মণি-হারের কথা, কমলের কথা! দলে দলে লোক টিকিট কিনিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিতেছে। বিপিন উদ্‌গ্রীব-চিত্তে কার আশায় চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। আলোর চমক দিয়া ট্রামগাড়ী থামিয়া আরোহী নামাইয়া আবার ছুটিয়া চলিয়াছে। মোটর, জুড়ি সশব্দে আসিয়া নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইতেছে। বিপিন চারিদিকে চাহিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত সঙ্কুচিতভাবে আপনার মনিব্যাগ খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল। টাকাটি বাহির করিয়া আবার চারিধারে চাহিয়া দেখিল। যেন সে অতি-বড় অপরাধী।—যেন সে চুরি করিতে চলিয়াছে এমনি বিবর্ণ তার মুখ, এমনই দীপ্তিহীন তার দুই চোখ! তার মনে হইল, ভিড়ের মধ্য হইতে যত লোক ব্যঙ্গ-কৌতুকভরা দৃষ্টিতে যেন তারই পানে চাহিয়া আছে। বিপিনের পা কাঁপিতেছে, গা টলিতেছে। মাতালের মত টলিতে টলিতে গিয়া টিকিট-ঘরে কোনমতে টাকাটা ফেলিয়া দিয়া সে একখানি টিকিট কিনিল, কিনিয়া দ্রুতপদে নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

নাট্যশালা তখন লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। অধীর দর্শকের কলরব-কোলাহল বিপুল জল-কল্লোলের মত শুনিতেছিল। কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ পাণ খাইতেছে। সম্মুখে পটের পিছনে এখনই যে বিরাট ছন্দ জাগিয়া উঠিবে, নিঃশেষে তাহা উপভোগ করিবার জন্য সকলে যেন প্রস্তুত হইতেছে।

ঐক্যতান বাজিল। এইবার! বিপিনের অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতেছিল। একবার সে উপরের পানে চাহিল। ঐ যে রাজাসনে বসিয়া…কমল! পাশে তার অসংখ্য ভক্ত! কমলের মুখে কুণ্ঠিত স্মিত হাস্য-রেখা! দর্শকের পানে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতেই যেন সে চাহিয়া দেখিতেছিল? কমল কি তাকে দেখিবে না? বিপিন কোথা হইতে আসিয়াছে। কেন আসিয়াছে? কিসের আকর্ষণে? সে কি তা বুঝিবে না? যদি না বোঝে?

বিপিনের মনে হইল, একবার সে চীৎকার করিয়া বলে,—হে বন্ধু, তোমার এ শুভ আনন্দের মুহূর্তে তোমারই সহিত আনন্দের কণা উপভোগ করিতে আসিয়াছি। এই অযুত দর্শকবৃন্দের মুগ্ধ স্তুতি-কণ্ঠের সহিত আমি আমার কণ্ঠ মিলাইতে আসিয়াছি!

কিন্তু হায়, সে কথা কেমন করিয়া সে বলে! সে কথা কে মানিবে? রাজাসনে কবির পাশে আজ তার ঠাঁই নাই! সে আজ এই সাধারণ দর্শকের মত নিতান্ত একজন এক-টাকার দর্শক মাত্র!

পট উঠিল। একটা আনন্দ-সম্ভাবনায় দর্শকের দল স্তব্ধ হইল। অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অঙ্কের প্রতি দৃশ্যের মধ্য দিয়া দর্শকের মন তন্ময়ভাবে চলিয়া কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে বিলীন হইয়া গেল।

যখন অভিনয় থামিল, মুগ্ধ দর্শকদল সহসা তখন চেতনা-লাভে ক্ষুব্ধ লইল! এ গান এখনই থামিল! এ যেন কোন নিপুণ ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়া-যষ্ঠির বলে ম্লান ধরণী-তলে স্বর্গের এক উজ্জ্বল অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল! দর্শকের দল মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে নাট্যকারের জয়-গানে নাট্যশালা মুখরিত করিয়া তুলিল।

বিপিন আবার উপরের পানে চাহিল। কমল চলিয়া যাইতেছে—সার্থকতার বিরাট আনন্দে তার মুখ ভরিয়া গিয়াছে! বিপিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বাহিরে আসিল।

নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানা মোটর গাড়ী বিজয়গর্ব্বে যেন ফুঁশিতেছে! কমল আসিয়া গাড়ীতে বসিল, সঙ্গে আরও তিন-চারজন ভক্ত আসিয়া উঠিল। জমকালো পোষাক-পরা কয়েকজন দর্শক আসিয়া কমলের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল। প্রশংসার ঘটা পড়িয়া গেল। বিপিন দূরে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিল।

তাহার মনে একটা দারুণ জ্বালা গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! চোর! চোর ইহারা! কমলকে তার কাছ হইতে ইহারাই চুরি করিয়া রাখিয়াছে! প্রশংসা ইহাদের ওষ্ঠাগ্রে শুধু লাগিয়া আছে! হৃদয়ের গোপন তল অবধি তার শিকড়টা পৌঁছিয়াছে কি না, সন্দেহ!

ইহাদেরই কথায়, ইহাদেরই অলস চাটুবাণীতে কমল এতখানি ভুলিয়া রহিয়াছে! বিপিনের মনে হইল, দুরন্ত রোষে ইহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলকে সে তাড়াইয়া দেয়—কমলকে আপনার দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে চাপিয়া ধরিয়া বলে, বন্ধু, কাদের কথায় তুমি ভুলিয়া রহিয়াছ! ইহারা তোমার হৃদয়ের কি খপর রাখে। শুধু বাহিরের একটুখানি দেখিয়াছে বৈ নয়! তুমি এস আমার হৃদয়ের মধ্যে! যে-হৃদয়ে শুধু তোমারই আসন, তোমারই ঠাঁই! ইহাদের কাজ আছে, কলরব

আছে, আরও অনেক আছে! কিন্তু আমার শুধু তুমি আছ, শুধু তুমি আছ, শুধু তুমি! কবি তুমি, মানুষ তুমি, কমল তুমি···

কিন্তু কিছুই বলা হইল না! মোটর গাড়ী কমলকে বুকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিনের যখন চেতনা হইল, তখন সে দেখিল, দর্শকের দলে গাড়ী ভাড়া করিবার বিষম গণ্ডগোল চলিয়াছে এবং কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দভাবে সে নাট্যশালার গাড়ী বারান্দার একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার চোখের সন্মুখে পথের আলোগুলা কুয়াশা-মলিন নক্ষত্রের মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে এবং দর্শকের কোলাহল কানে আসিয়া বাজিতেছে স্বপ্নশ্রুত ধ্বনির মত অস্পষ্ট!

স্বখাত সলিল

বৈশাখ মাসে অনঙ্গর বিবাহ হইয়াছে। বধূ চুনি জমিদারের মেয়ে! ক'দিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আবার পল্লীগ্রামে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গর এবার পাশের পড়া—পাছে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেজন্য মা বৌকে আর আনেন নাই। ইচ্ছা থাকিলেও ছেলের পাশের পূর্ব্বে আনিবার জো নাই।

চুনি লেখাপড়া তেমন জানে না। বিবাহের কথা-বার্ত্তা চলিবার সময় তার বর্ণ-পরিচয় হয়। তবে ফুল-শয্যার রাত্রে অনঙ্গর কাতর মিনতিতে গলিয়া চুনি কথা দিয়াছে, এই ক'মাসের মধ্যে দিদির কাছে সে লেখাপড়া ভালো করিয়া শিখিয়া ফেলিবে। দিদি ননী বাল-বিধবা; পিত্রালয়েই থাকে। তাহাকেও অনঙ্গ পাকে প্রকারে জানাইয়াছে, লেখাপড়া যে না জানে,...তা সে পুরুষ হোক, আর নারীই হোক, তার জীবন একেবারে ব্যর্থ। এমন কি, তার সংস্পর্শে যে আসে, তার জীবনও ব্যর্থ হইয়া যায়। ননী ভরসা দিয়াছে, বাড়ীতে তেমন কোন কাজ নাই, চুনিকে সে নিজে ভালো করিয়া পড়াইবে এবং লেখাপড়া শিখাইয়া অচিরে তাহাকে অনঙ্গর যোগ্যা করিয়া দিবে!

চুনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে—হোক সে দু'দিনের আলাপ পরিচয়—অনঙ্গর দিন কি করিয়া কাটিতেছে, তা সে-ই জানে। জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—উঃ, চারিটা মাস গিয়াছে! না যুগ গিয়াছে! বৈশাখ মাসে চুনির সঙ্গে দেখা,—সে যে, স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়! আবার কবে দেখা হইবে, কে জানে!

পূজার সময় অনঙ্গর শ্বশুর বেয়ানকে বিস্তর প্রণাম জানাইয়া চিঠি লিখিলেন, বাড়ীতে পূজা, জামাতা বাবাজীকে একবার পাঠাইলে সকলে কৃতার্থ হন; দেশের লোকও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। অন্তত পূজার সময় ঐ ক'টা দিনের জন্য—অবশ্য বাবাজীর পড়ার যদি কোন ক্ষতি না হয়, বাবাজীকে পাঠাইতে পারিলে তাঁহারা অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার মাতৃদেবীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অনুমতি পাইলে তিনি লোক পাঠাইবেন।

অনঙ্গ আহারে বসিয়াছিল। মা আসিয়া শ্বশুরের চিঠি পড়াইয়া বলিলেন,—কি রে, যাবি?

অনঙ্গ জলের গ্রাস মুখে তুলিয়াছিল; একটা বিষম খাইয়া গ্রাস নামাইল। মা বলিলেন,—ষাট্, ষাট্! তা ভাখ্, বাপু, তোর যদি পড়ার ক্ষতি না হয় বুঝিস্—

পড়ার ক্ষতি! পড়া! পড়া! জীবনটা যেন শুধু নোট মুখস্থ করবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল! পরীক্ষায় পাশ হইলেই মানুষ চতুর্ভুজ হইবে! আর কোন কাজ নাই! মনটাকে আনন্দ-রস দিবার প্রয়োজন নাই! শুধু কলেজের কেতাবগুলা ষ্টীম-রোলারের মত মনটাকে অহোরাত্র পিষিয়া বিদ্যাটাকে হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিলেই দুর্লভ নব-জন্ম সার্থক হইবে আর কি!

অনঙ্গ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—কোথায় নামতে হয়, কি রাস্তা—

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোকে তো আর তত্ত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি না, বাপু—তাদের লোক এসে নিয়ে যাবে।

—কবে যেতে হবে?

—ষষ্ঠীর দিন না হয় যাস্—তাই লিখে দেবো।

—কিন্তু বিজয়ার প্রণাম আমি তোমার পায়েই করতে চাই, মা—সকলের আগে তোমায় প্রণাম করা চাই।

ছেলের কথা শুনিয়া মার মন ভিজিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—তা কতক্ষণেরই বা পথ! নবমীর দিন রাত্রের গাড়ীতে বেরুলে বিজয়ার দিন দুপুর বেলায় এখানে এসে পৌঁছতে পারবি'খন।

অনঙ্গর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এতখানি ভক্তি দেখাইয়া এটুকু সে বিলক্ষণ আশা করিয়াছিল যে, মাও স্নেহ-বাৎসল্য দেখাইবেন, এবং পূজার ছুটিটা শ্বশুর-বাড়ীতে কাটাইয়া আসিতে বলিবেন! আহা, তাদের কি সাধ যায় না, নূতন জামাইটিকে লইয়া দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ করে! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তখন সে ভাবিল, যাক্, কত দিন, কত দিন পরে চুনির সঙ্গে দেখা হইবে! সেই কবে বৈশাখের এক স্নিগ্ধ উষায় দুজনে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—চুনি যখন গাড়ীতে ওঠে, অনঙ্গ তখন নিজের ঘরে বিছানায় পড়িয়াছিল। আসন্ন বিরহ-বেদনায় বুক তার ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মম গৃহ! বিদায়ের পূর্ব্বে চুনির সঙ্গে দেখা করানোটা কেহ উচিত বলিয়া মনে করে নাই! তারপর চিঠি-পত্র লিখিয়া সেই সদ্য পরিচয়টুকুকে জাগাইয়া রাখিবারও কোন উপায় ছিল না! কে জানে, আবার নূতন করিয়া পরিচয় ঝালাইতে হইবে কি না! এখানে তাহার মন মুহূর্ত্তের জন্য চুনির কথা ভুলিতে পারে না—বই খুলিয়া সে বসে মাত্র, কিন্তু মন তার রঙীন্ ফানুসে চড়িয়া সেই অজানা পল্লীর কোন্ গৃহ-কোণে অহরহ এক বালিকার পিছনে

উতলা হাওয়ার মতই ঘুরিয়া মরে! চুনি কি সেখানে বসিয়া তার কথা এমন করিয়া ভাবে?

সপ্তমীর দিন বেলা বারোটার সময় অনঙ্গ শ্বশুর-বাড়ী পৌঁছিল। অভ্যর্থনার ধুম দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিশ্রামের পর স্নান-আহার সারিয়া লইতেই দিদি-শাশুড়ী বলিলেন,—একটু গড়িয়ে নাও, ভাই—রাত্রে গাড়ীতে ঘুম হয়নি ভালো।

এক সুমধুর সম্ভাবনায় অনঙ্গর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে নির্ব্বাক্ সম্মতি জানাইয়া দিদিশাশুড়ীর অনুসরণ করিল।

দক্ষিণের এক বড় ঘরের মেঝের উপর গদি-পাতা পাটি-বিছানো বিছানা ছিল। দিদি-শাশুড়ীর ইঙ্গিতে অনঙ্গ আসিয়া বিছানায় বসিল। দিদিশাশুড়ী তাহাকে শুইতে বলিয়া সঙ্গিনী বালিকার দলকে তর্জ্জনের সুরে আদেশ দিলেন,—তোরা সব চলে আয় দিকিন্—ও একটু ঘুমুক।

এক-জনের আসার আশায় এ-পাশ ও-পাশ গড়াইয়া অনঙ্গর শেষে বিরক্তি ধরিল—সে কিন্তু আসিল না। অনঙ্গর মনটা ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইল—এ কি ব্যবহার! সে কি তোমাদের এখানে দুইখানা লুচি খাইতে আসিয়াছে, না, তোমাদের জমিদারী-পূজার সমারোহ দেখাইয়া তোমরা তার তাক্ লাগাইয়া দিতে চাও! সে কোনটারই ধার ধারে না। সে আসিয়াছে শুধু মিলনের ব্যগ্র প্রত্যাশা লইয়া—বিরহের গ্লানি মুছিতে! সে কথাটা কেহই খেয়াল করিবে না?

অনঙ্গ ভাবিল, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সঙ্গে দেখা হইলে ইহার একটা বোঝা-পড়া সে করিয়া লইবে, শ্বশুরের পুত্র-দুটি নেহাৎ নাবালক—তারা তাদের এই নূতন ভগ্নীপতিটির কাছে ঘেঁষ দিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিল। দূর হইতে অনেকখানি সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই তারা তাদের কৌতূহল পূরণ করিয়া লইল। অনঙ্গ ভাবিল, তাহাদের একবার কাছে পাইলেও নয় চুনির কথাটা সে পাড়িয়া দেখে!

প্রকাণ্ড বাড়ী লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। নানা চেহারার বিচিত্র নর-নারী তাহাকে দেখিয়া কৌতূহল মিটাইয়া লইতেছে। কিন্তু হায়, কোথায় তার সেই আপনার জন—চিরবাঞ্ছিতা প্রিয়া! তার চিত্তে কি এক-বিন্দু কৌতূহল নাই! চুনি কি তাহাকে ভুলিয়া গেল? কথাটা মনে হইতে এক গূঢ় বেদনায় প্রাণ তার ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এমন সময় শুভ্রবসনা এক কিশোরী আসিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকিল,—অনঙ্গ—

অনঙ্গ ফিরিয়া দেখে, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা ননীবালা। সুন্দর মুখে সংযমের শান্ত মাধুর্য্য, ঠোঁটের কোণে সরল হাসির দীপ্তি! সমস্ত অবয়বে লজ্জার এক কমনীয় লালিত্য ফুটিয়া রহিয়াছে। ননীর হাতে শ্বেত-পাথরের ছোট একখানি রেকাবি। রেকাবিতে জলখাবার। ননী দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—আসন নিয়ে এলি বিন্দু?

এক প্রৌঢ়া দাসী আসিয়া আসন পাতিয়া দিল; ননী জলখাবারের রেকাবি নামাইয়া কহিল,—নাও ভাই, বসো। শ্বশুরবাড়ীর হৃদয়-হীন আচরণে একটু পূর্ব্বে অনঙ্গর ভারী রাগ ধরিয়াছিল। কিন্তু এ মূর্ত্তির এই স্নেহময় সরল কণ্ঠস্বরে সে রাগ মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। ইহার কথার প্রতিবাদ করা নিষ্ঠুরতা! অনঙ্গ গিয়া আসনে বসিল।

ননী কহিল,—ওবেলায় পূজোর কাজে ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারিনি, ভাই। কিছু মনে করো না। চুনিকে এত বোঝালুম, ঠাকুমা কত টানাটানি করলে, তা মেয়ে একেবারে লজ্জায় ঘাড় গুঁজে পড়ে রৈল। এত লোকজনের মাঝে—ছেলেমানুষ কি না—লজ্জায় আসতে পারলে না। এই গোলমাল! তা তুমি তো দু-চার দিন আছ!

অনঙ্গ ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল, না, কালই তাকে যাইতে হইবে—কাল নেহাৎ না ঘটে ত নবমীর দিনে যাওয়া চাই। বাড়ীতে বিস্তর কাজ—দু দিনের জন্য যে এই আসিতে হইয়াছে, সে একেবারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রি বারোটার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল। জমিদার-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান লোকে লোকারণ্য। শ্বশুর নব-জামাতাকে লইয়া আসরে বসিলেন; অনঙ্গ প্রমাদ গণিল। গেল যে, আজ রাত্রেও বুঝি চুনির সঙ্গে দেখার আশা একবারে ঘুচিয়া গেল! রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এ কি অসহ্য বেয়াদবি! হাতে পাইয়া এমন ভাবে অপমান করা! হও না তোমরা জমিদার—হোক্ না কেন তোমাদের লক্ষ টাকা আয়—দেশের লোক আর সরকারের কাছে থাকুক না তোমাদের খাতির। অনঙ্গ জামাই! তারও একটা প্রাপ্য খাতির আছে! সে তো আর পাড়াগাঁয়ের অজ ভূত নয় যে যাত্রার সং দেখাইয়া ভুলাইয়া দিবে! সে কি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তোমাদের এই পল্লীগ্রামের মজলিসে বসিয়া ঐ লক্ষ্মীছাড়া তামাসা দেখিবার জন্য?

অথচ এ বিষয়ে প্রকাশ্য কোন ইঙ্গিত করা ভালো দেখায় না—আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে। অনঙ্গ ভাবিল, একটা ফিকির করা যাক্!

সে সেই আসরে বসিয়াই নিদ্রার ভাণ করিল। ঔষধ ধরিল। শ্বশুর কহিলেন,—তোমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়োগে বাবা—

তখনই ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রচার হইল। ভৃত্য

জামাইবাবুকে উপরকার ঘরে আনিয়া খাটের উপর শয্যা দেখাইয়া দিল।

রাত্রেও আশার সেই নিষ্ঠুর ছল-অভিনয়! ঘরের বাহিরে কাহারও নূপুরের সরমের মৃদু রাগিণী বাজিয়া উঠিল না—কাহারও চরণ-শব্দ পাওয়া গেল না। অনঙ্গর বুকটা অসহ্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। শুইয়া শুইয়া রাগে সে ফুলিতেছিল। প্রতিশোধ লইবার দারুণ বাসনা মনের মধ্যে বিষম ঝড় তুলিয়া দিল। তীব্র জ্বালায় অস্থি-পঞ্জরগুলা জ্বলিয়া ছাই হইতে লাগিল। তার পর এই অকরুণ আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সহসা তার মনে হইল, পায়ের তলায় কে যেন আসিয়া বসিয়াছে! কার যেন কোমল স্পর্শ! চুনির? অনঙ্গ চোখ খুলিল?

না। পায়ের কাছে নির্ব্বাক মূর্ত্তি নির্ব্বাক-ভাবে বসিয়া রহিল। থাক্ বসিয়া—অনঙ্গ কখনই চুনির পানে চাহিয়া দেখিবে না, কোন কথা কহিবে না! রাত্রিটা কোন মতে পোহাইলে হয়, সকলের প্রাণে প্রতিশোধের এমন মুষল হানিয়া সে প্রস্থান করিবে! কাহারো সঙ্গে কথা কহিবে না—এখানে জল স্পর্শ করিবে না—দুই-চারিটা কথা যদি কহিতে হয়, ত তাহাতে এমন ঝাঁজ সে মিশাইয়া দিবে যে সকলে বুঝিবে, হাঁ, এ একটা মানুষ! ইহার খাতির করা চাই! জমিদারের জামাই বলিয়া সে যে অনাদর সহিয়া পোষা কুকুরটির মত নিরীহ আবদারে লেজ নাড়িবে, তেমন পাত্র সে নয়!

ঐ যে পদতলাসীনা উঠিয়া দাঁড়াইল! অনঙ্গ চোখ চাহিল না। চুনি আসিয়া তার বুকের উপর মুখ রাখিল, কহিল,—আমায় মাপ করো লক্ষীটি, লোকের ভিড়ে আমি আসতে পারিনি—পাছে সকলে ঠাট্টা করে!

অনঙ্গ তবু কোন কথা কহিল না। সে বড় বেদনা পাইয়াছে! এত বড় অপরাধ, এত সহজে তা ক্ষমা করা চলে না। চুনি বুকে মাথা রাখিয়া কহিল,—কথা কবে না?

রাগে অনঙ্গর সমস্ত মনটা তখনও জ্বলিতেছে। চুনিকে সজোরে ঠেলিয়া সে বুক হইতে সরাইয়া দিল। একটা শব্দ হইল। অনঙ্গর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সভয়ে উঠিয়া বসিয়া দেখে, কোথায় চুনি! কোথায় কে! এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের ঘোরে পাশ-বালিশটাকে চুনি কল্পনা করিয়া ঠেলা দিয়া একেবারে খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে! বাহিরে জুড়ির দল তখন চীৎকার স্বরে গান ধরিয়াছে,

ও রাই বসে আছ নিদ্রে ছেড়ে যার আসার আশায়—
ওগো, যামিনী সে পোহায় সুখে চন্দ্রাবলীর বাসায়।

যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে অনঙ্গ জানাইল, আজ তাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। না গেলে বিস্তর ক্ষতি হইবে! যাওয়া চাইই!

শ্যালিকা ননীবালা আসিয়া বুঝাইল, শ্বশুর বুঝাইলেন, দিদি-শাশুড়ীও বিস্তর কথা পাড়িলেন, কিন্তু অনঙ্গর সঙ্কল্প অটল, অচল। অগত্যা সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

বেলা তিনটায় ট্রেন। বারোটার সময় আহার শেষ হইলে ননীবালা চুনিকে অনঙ্গর ঘরে টানিয়া আনিল এবং একটা পুঁটুলির মত ঘরের কোণে ধুপ্ করিয়া তাকে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইতে চট্‌পট্ দ্বারে শিকল টানিয়া দিল।

অনঙ্গ কোন কথা না কহিয়া খাটের উপর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এমন-ভাবে কাটিয়া গেলে সে এক-নিশ্বাসে কহিল,—আমি চললুম চুনি, তোমার হাড়ে বাতাস লাগবে এবার। আর কখনো তোমার পথে বিঘ্ন হয়ে এসে দাঁড়াবো না। তুমি এখানে পরম সুখে নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকতে পাবে। ভেবো, তোমার লক্ষীছাড়া স্বামীটা মরেছে, তোমার আপদ দূর হয়েছে—আজ থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিলুম! তোমার ছুটি, ছুটি, চিরদিনের জন্য ছুটি!

এত বড়-বড় কথার খোঁচা যার প্রতি নিক্ষেপ করা হইল, সে খোঁচা কিন্তু তার গায়ে বিঁধিলও না! কাপড়ের আবরণে কুণ্ডলী পাকাইয়া সে বসিয়া রহিল।

অনঙ্গ ভারী ব্যথিত হইল। এমন কথাগুলা যে-কোন উপন্যাসে বা কবিতায় গুঁজিয়া দিলে কতখানি করুণ রস উথলাইয়া তুলিতে পারিত, পাঠকের শ্বাসরোধ হইয়া যাইত, চোখ ছল-ছল করিত—আর সেগুলা কি না এই মূর্খ অজ্ঞ বালিকার বাক্‌হীনতার কঠিন অঙ্গে ঠেকিয়া একেবারে ব্যর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! হারে অদৃষ্ট, এ কথায় পাষাণী প্রিয়া একটু চঞ্চল হইল না! এ দুঃখ যে রাখিবার ঠাঁই নাই।

অনঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া চুনির মুখের কাপড় টানিয়া সকরুণ কণ্ঠে ডাকিল,—চুনি—

চুনি চমকিয়া তার আয়ত নয়নের এমন একটি নির্ব্বাক সজল দৃষ্টি অনঙ্গর মুখের উপর স্থাপিত করিল যে, তাহাতে অনঙ্গর সর্ব্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে-চোখের ভাষা বড় করুণ, বড় তীব্র! সকল মৌনতাকে নিমেষে সে মুখর করিয়া তুলিল।

অনঙ্গ চুনির হাত ধরিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। বড় সুন্দর মুখখানি—নিদ্রা-হীনতার সুস্পষ্ট ম্লানিমা সে সৌন্দর্য্যে বেশ মধুর একটি লালিত্যের ছায়াপাত করিয়াছে।

অনঙ্গর সংযম টুটিল। সে সেই মুখখানি অজস্র

চুম্বনে ভরাইয়া দিল। তারপর অনেক কথা সে বলিয়া গেল—এ কয়মাস চুনির অদর্শনে কি অসহ্য যন্ত্রণা সে ভোগ করিয়াছে। পূজার নিমন্ত্রণে কতখানি আশা বুকে লইয়া সে এখানে আসিয়াছিল। পূজা দেখিতে সে এখানে আসে নাই, যাত্রা শুনিতে আসে নাই। সে আসিয়াছিল শুধু তার জীবন-সর্ব্বস্ব চুনির এই সুন্দর মুখখানি দেখিবার জন্য, তার সঙ্গে দুটা প্রাণের কথা কহিবার জন্য।

চুনি মাথা নীচু করিয়া সব কথা শুনিল—তারপর ম্লান চোখে স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। যেজন্য তাকে এ ঘরে পাঠানো হইয়াছে, সেটা কোনমতে বলিয়া ফেলিলেই দায়-মুক্ত হয়—সেটুকু বলিবার জন্য সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বেশীক্ষণ এ ঘরে থাকিলে গঙ্গাজলের কাছে প্রকাণ্ড কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এক-বাড়ী লোকের তীব্র বিদ্রূপ-দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইতে হইবে,—টিটকারী বড় অল্প সহিতে হইবে না! সে বড় গলা করিয়া সঙ্গিনীদের বলিয়াছিল,—বরকে দেখবার জন্যে আমার অমন প্রাণ ছটফট করে না।

বেশীক্ষণ এখানে থাকিলে এ দর্প কোথায় থাকিবে, তাই স্বামীর বক্তৃতা থামিলে প্রথম অবসরে সেই কথাটাই সে পাড়িয়া বসিল। অদর্শন, বিরহ-যন্ত্রণা,—এ-সবের কোন ধার সে ধারিত না—মা ও ঠাকুমার শেখানো বুলিই আওড়াইয়া গেল। চুনি কহিল,—আজ তোমার থাকবার কথা ছিল তো! সকলেই বলছে, থাকো না।

—থাকা হয় না, চুনি।

—মা বলছিল, ঠাকুমা বলছিল, দিদি বলছিল—আজ তুমি মনে করলে থাকতে পারতে।

—পারতুম, চুনি, কিন্তু এখন আর থাকা যায় না। কাল রাত্রে তুমি যদি একটিবার আসতে, তাহলে আজ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতুম।

—তবে যে বলছো, তোমার কি কাজ আছে—সেখানে!

চুনির মুখে কৌতুকের দুষ্ট হাসি ফুটিল।

অনঙ্গ বলিল,—সে কাজ এ ক'দিন পরেও হতে পারতো।

—তবে বুঝি কাজের কথা মিছে করে বলেছো? চুনির ঠোঁটের হাসিটুকু আরও স্পষ্ট হইল।

অনঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—তাই বটে! তোমার উপর অভিমান করেই বলেছি। কি জন্যে এখানে থাকবো? কেন থাকবো? তোমার সঙ্গে দু'দিন মোটে দেখা হলো না···কাল রাত্রে এলে না কেন? যাত্রা শুনছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

অনঙ্গ আবার একটা খোঁচা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল,—যাত্রা কেমন শুনলে?

সুস্পষ্ট সহজ স্বরে উত্তর মিলিল,—বেশ! তুমি উঠে গেলে কেন? বাবার কাছে বসেছিলে, আমি চিকের আড়াল থেকে দেখছিলুম! তোমার বুঝি ভালো লাগছিল না?

অনঙ্গ কহিল,—না। পরক্ষণে একটু হাসিয়া সে আবার বলিল,—তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে! সেই তো কবে দেখেচ!

চুনি হাসিয়া বলিল,—বা রে, তা বুঝি মানুষ চিনতে পারে না? তার উপর তোমার সে ফটোগ্রাফখানা মা যে বাঁধিয়ে আমাদের ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছে!

—সে ফটোগ্রাফ তুমি রোজ ছাখো! লজ্জা করে না? কেউ যদি ধরে ফেলে?

—সে ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাই তো লোক থাকে না!

এ কথায় অনঙ্গ আনন্দ পাইল। তবে তো চুনি পাষাণী নয়—তার হৃদয় আছে।

বাহির হইতে ননী কহিল,—তোমার গাড়ী তৈরি, অনঙ্গ।

চুনি খাট হইতে ঝাঁপাইয়া একেবারে দূরে সরিয়া গেল, মৃদু কণ্ঠে কহিল,—তাহলে আসি। মাকে তাহলে বলবো যে, আজ তোমায় যেতেই হবে?

এ কথার কোন উত্তর আর অনঙ্গ দিতে পারিল না। তার চোখে জল আসিয়াছিল। নিজের হঠকারিতায় নিজের উপর রাগও না ধরিয়াছিল, এমন নয়। নিজেই সে অধৈর্য্যের ঝোঁকে নিজের সুখটুকুকে পায়ে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে! তার কলিকাতায় ফিরিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? কিছু না! তবে? শুধু রাগের মাথায় কথার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বৈ নয়। কিন্তু সেই কথাটুকুর জন্যই যে কোনমতে আর থাকিয়া যাওয়া যায় না! লোকে কি ভাবিবে? প্রকৃত কারণটা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—সকলে পরিহাসের হাসি হাসিবে! ওদিকে আবার গাড়ী অবধি প্রস্তুত!

নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া তার প্রাণটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। বাস্তবাগীশ হওয়ার এই ফল! ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওরে ধৈর্য্যহারা, আর একটু যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতিস্! আর-একটু··· !

ননী ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—নেহাৎ চললে ভাই! আমাদের বড় কষ্ট রইলো কিন্তু! ভালো করে দুটো কথা পর্য্যন্ত কইতে পেলুম না! কি করবো বলো,—তোমার কাজের ক্ষতি হবে বলচো,—কাজেই আমরা আর জেদ করতে পারি না। মা কিন্তু বড্ড দুঃখ করছিলেন।

অনঙ্গ ভাবিল, না হয় সে কাজের কথা বলিয়া

ফেলিয়াছে, তাহাতে মহাভারত এমন অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে তোমরা আর-একটু স্বেদ করিতে পারো না? সকলে মিলিয়া আর-একটু স্বেদ করিলেই যে থাকিয়া যাই! ওগো, করো গো, একবার তোমরা একটু জেদের অনুরোধ করো!

কিন্তু হায়, সে অনুরোধ, সে জেদ কেহ করিল না। দিদিশাশুড়ী শুধু বলিলেন,—বড়দিনের ছুটীতে আবার এসো, দাদা—এবারে আমোদ-আহ্লাদ কিছুই হলো না!

শাশুড়ী পল্লীগ্রামের মেয়ে,—জমিদারী বাড়ীর পুরাতন প্রথা ঠেলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন না—অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেচারা অনঙ্গকে যাইতে হইল। যাইবার সময় দিদিশাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বাহিরে ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিলেও ভিতরটা তার ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল।

গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। পথের দুইধারে বাগানের সারি—বাগানের গাছ-পালা, শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীর এই শ্যামল শ্রী, সমস্তই অনঙ্গর চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকিতেছিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এখনও যে আশা মোটে নাই, এমন নয়! ট্রেণখানা যদি কোন-গতিকে ফেল করা যায়! আহা, তেমন ভাগ্য…

ঐ রেল-লাইন দেখা যায়। সিগনাল কৈ পড়িয়া নাই! অনঙ্গ ঘড়ি খুলিয়া দেখে, ট্রেণের সময় উৎরাইয়া গিয়াছে! তার আঁধার চিত্তে আশার একটু ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। আঃ!

কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া শুনিল, টাইম্ হইয়া গিয়াছে বটে, তবে ট্রেণ লেট্! শ্বশুরের যে কর্ম্মচারীটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কহিল,—আঃ, বাঁচা গেল। ট্রেণ ফেল করে ফেললে আজ আমায় কম বকুনি খেতে হতো! বাবু বিশেষ বলে দিয়েছেন, ট্রেণ ধরিয়ে দেওয়া চাই, নাহলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।

কর্ম্মচারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে ডিপা বাহির করিয়া একটা পাণ মুখে দিল, এবং বিড়ি কিনিবার উদ্দেশ্যে চুরুট-ওয়ালার সন্ধানে সরিয়া পড়িল।

অনঙ্গ অত্যন্ত হতাশভাবে প্লাট-ফর্ম্মের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। মনে হইল, চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোক-বিন্দুতে পরিণত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রেত-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে!

এমন সময় ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং রেলের কুলি হাঁকিল,—কলকাত্তা-যানে-ওয়ালা গাড়ী ছোড়া—টিকেট—টিকেট!

চিঠি

পাড়াগাঁয়ের অনেক দিনের পুরোনো ভাঙ্গা-চোরা একখানা বাড়ী। তারি শাণ বাঁধানো দাওয়া, মাঝে-মাঝে চটা উঠে গেছে। সেই দাওয়ার একধারে বারো বছরের একটি ছেলে, পাশে কড়ির দোয়াত আর শরের কলম; কাছে বসে এক বৃদ্ধা নারী। তাকে লক্ষ্য করে ছেলেটি বল্‌লে,—কি লিখতে হবে, বলো পিশিমা? আমি আবার এখনি ও-পাড়ায় যাত্রা শুনতে যাবো।

ছেলেটি যাকে পিশিমা বল্‌লে, ছেলের দল গ্রাম-সম্পর্কে তাকে পিশি বলে ডাকে। তা-ছাড়া তার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই।

বৃদ্ধা বল্‌লে,—আমার ফেলিকে একখানা চিঠি লিখতে হবে, বাবা। আজ চার বছর তার কোন খপর পাইনি।

ফেলি তার ভাইঝী; মা আঁতুড়ে মারা গেলে এই পিশিই তাকে কোলে তুলে নেয়, মানুষ করে। এই পিশিকেই সে মা বলে জানে।

বৃদ্ধার দুই চোখ ছল-ছল করে এলো। মনের মধ্যে চার বৎসর পূর্ব্বেকার এক করুণ বিদায়-দৃশ্য জেগে উঠলো। বাড়ীর সামনে তাল-নারকেলের ছায়ায়-ঘেরা খানিকটা খোলা জায়গা—সেইখানে পাল্কী নামানো ছিল। ফেলি শ্বশুর-বাড়ী যাবে। জামাই রোজগেরে হয়েছে, ফেলিকে এবার নিজের কাছে নিয়ে যাবে। জামাই গরদের কোটের উপর সোনার ঘড়ি-চেন ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে আশে-পাশে পায়চারি করে ফিরছিল। আঁচলে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে পিশি এসে ফেলিকে পাল্কীতে তুলে দিলে। মেয়েরও দুই চোখে সাগর বয়ে এলো। পাল্কী উঠিয়ে বেহারারা যখন শ্যাওলা-পড়া পুকুরটাকে বাঁয়ে রেখে মেটে রাস্তা ধরে জাম গাছের ওধারে মোড় বেঁকলো, মেয়ে ফেলি তখন পাল্কীর দুই দরজা ঠেলে সরিয়ে ঝাপসা-চোখে দূর থেকে পিশির পানে চেয়ে ছিল। সকালের উঠন্ত সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকু তাল-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখের উপর ঝরে-ঝরে পড়ছিল। পিশিমা নিজের চোখের জলে অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়েও তা বেশ স্পষ্ট দেখেছিল। সে-চোখের সে-দৃষ্টি এখনো তার মনে গাঁথা রয়েছে,—সে কি ভোলবার গা!……তারপর এই চার বছর ফেলির কাছ থেকে একখানি চিঠি আসেনি! পিশি নিজে লিখতে জানে না; পাড়ার একে-তাকে ধরে মাঝে-মাঝে অমন কত চিঠি যে লিখিয়েছে—তার একখানারও জবাব দিতে নেই?…সে কি সব ভুলে গেল? পিশির আর কে আছে? কেউ না! সেই পিশিকে খপর দিতে সে সময় পায় না! সে রইল কি গেল, তারও কোন উদ্দেশ নিতে নেই!……পিশির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—কে জানে, তার ফেলিই যদি না থাকে! থাকলে সত্যই কি আর সে পিশির খোঁজ নিত না!…পিশির নিজের যাবার উপায় নেই, সে হলো জামাই-বাড়ী! এত দিনে নাহলে সে অমন দশবার ছুটে যেত!

পাড়াগাঁয়ের ডাকওয়ালা হপ্তায় দু'দিন এসে চিঠি বিলি করে যায়। যে-যে দিন তার আসবার পালা, পিশি তার আশা-পথ চেয়ে বসে থাকে। দূর থেকে তাকে আস্‌তে দেখে প্রাণ যে কি আশায় ভরে ওঠে! উচ্ছ্বসিত আবেগে পিশি প্রশ্ন করে—আমার চিঠি এনেছ, বাবা?

ডাক-ওয়ালা তার থলি না দেখেই বলে,—না, চিঠি নেই গো।

বেচারীর সমস্ত মন অমনি নির্জ্জীব অচেতন হয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত বাঁধন যেন এলিয়ে আসে! সে ভাবে, আমি গরিব, আমার কেউ নেই, তাই কোম্পানির লোক ডাকওয়ালা আমাকে গ্রাহ্য করে না। চিঠি নিয়ে আসে না!

পাড়ার পাঁচজনকে তখন সে ধরে। তারা বলে, এখনো চিঠির জবাব আসবার সময় আছে!

এখনো সময় আছে! সময় আছে তাহলে! আঃ!

আশার আশায় দিনের পর দিন গিয়ে একটা মাসও যখন যায়-যায় হয়, তখন বেচারীর আর সোয়াস্তি থাকে না! আবার একজনকে ধরে বসে, ওগো, ঠিকানাটা ভালো করে পষ্ট করে এবার একখানা চিঠি বেশ গুছিয়ে লিখে দাও না গা!

এমনি আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়েই বুড়ীর দিন কেটে যায়!

আজ যে-ছেলেটির কাছে সে চিঠি লেখাতে এসেছিল, সে ছেলেটির লেখা-পড়ায় বেশ নাম-ডাক বেরিয়েছে। তাই শুনে চিঠি লেখাবার পক্ষে সে খুব পাকা লোক হবে ভেবেই বুড়ী তার বাড়ী এসেছিল, তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে! ছেলেটির নাম বিপিন।

বিপিন প্রথমেই 'কল্যাণবরেষু' পাঠ লিখে বুড়ীর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে,—কি লিখবো পিশিমা, বল?

বুড়ী বল্‌লে,—লেখো, তুমি কেমন আছ? জামাই কেমন আছেন? বাড়ীর সকলে কেমন আছে? অনেক

দিন কোন খপর পাইনি বলে আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। এবারে যেন সে চিটির জবাব দেয়। তারপর লেখো, আমি ভাল আছি। ছুজনকে আশীর্ব্বাদ জানাও, এই আর কি সব কথা।

বৃদ্ধা একটি-একটি করে কথা বলে যেতে লাগলো— আর বিপিন তার ছাত্রবৃত্তি-পাশ করা বিদ্যার বহরে সেই কথাগুলোকে বাড়িয়ে তার উপর ছু-পোঁছ রঙ দিয়ে লিখে চল্‌লো। পিশিমার যা লেখবার ছিল, সে সব কথা শেষ করে বিপিন বল্‌লে,—ঠিকানা কি লিখব ?

এই যে বাবা, ঠিকানা। বলে বৃদ্ধা আঁচলের খুঁট খুলে ভাঁজ-করা ময়লা একটা চিরকুট বার করলে। বিপিন সেটা দেখে ঠিকানা লিখলে।

বৃদ্ধা বল্‌লে,—মুড়ে ফেলচো যে! আর কিছু লিখবে না ?

—আর জায়গা নেই।

বৃদ্ধার বুক কেঁপে উঠল। জায়গা নেই! আর জায়গা নেই!

কিন্তু লেখবার যে এখনো অনেক কথা আছে। এরি মধ্যে জায়গা ফুরিয়ে গেল! কাল সারা রাত যখন চোখে ঘুম আস্‌ছিল না, তখন ফেলিকে কি লিখবে, সে সব কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল। সে যে অনেক কথা। চার বছরে খপর দেবার মত কত ঘটনাই গাঁয়ে ঘটে গেছে। নদীটায় চড়া পড়েছে, বোসেদের অত-বড় পুকুর ঝাঁজি হয়ে একেবারে সরবার অযুগ্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজন্য জলের ভারী কষ্ট হচ্ছে! তবে সে গাঁয়ের টেঁপি, পুঁটি, ভুতো, সারদা—এদের বিয়ে হয়ে গেছে; দাশুর ঠাকুমা মারা গেছে; ওদের নন্দর একটি ছেলে হয়েছে—এই সেদিন খুব শীল পড়ে দত্ত-পুকুরের অত যে মাছ সব মরে গেছে—এমনি কত ব্যাপার যে ঘটে গেছে। প্রত্যেক খপরটির দাম আছে। চার পাতা চিঠি লেখা হয়ে গেল, অথচ এতগুলো খপর,—সবই একেবারে বাকী রইলো!

একটা নিশ্বাস ফেলে খামে-মোড়া চিঠি নিয়ে বুড়ী উঠে দাঁড়ালো; তারপর বিপিনকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করে বেচারী সেই চিঠি হাতে করে চল্‌লো, চার ক্রোশ দূরে সদরের ডাক-ঘর, সে চিঠি ডাকে দিতে।

সহরের মধ্যে ছোট্ট ঝরঝরে পরিষ্কার বাড়ী। খাটের উপরে শুয়ে এক সুন্দরী কিশোরী একখানা উপন্যাস পড়ছে—পাশে অয়েল-ক্লথ-পাতা ছোট বিছানায় একটি কচি ছেলে ঘুমুচ্ছিল। কিশোরী উপন্যাস পড়চে, আর মাঝে মাঝে বুকে সে কি এক অসহ্য আবেগ নিয়ে চোখ তুলে কচি ছেলেটির পানে ফিরে ফিরে চেয়ে-চেয়ে দেখছে।

হঠাৎ এক তরুণ যুবা ঘরে এসে বল্‌লে,—তোমার একটা চিঠি গো। বোধ হয়, তোমার পিশিমা লিখেছেন।

কিশোরী উঠে চিঠি পড়তে লাগলো। অক্ষরগুলো কার হাতের, জানা নেই—কিন্তু কথাগুলো পিশিমার বটে! স্নেহের সেই শত কাকুতিতে ভরা, আবেগে অধীর…এ পিশিমারই চিঠি বটে!

কিন্তু এ অনুযোগ ঠিক নয়। চিঠি কি সে লেখেনি? না, লেখা হয় নি। আজ লেখা হলো না, কাল লিখবখ'ন এই বলে ফেলে-ফেলেই রেখেছিল, লেখা আর হয়ে ওঠে নি। তাইত!… একটু দেরী হয়ে গেছে বটে! কিন্তু সে দেরী খালি সময়ের অভাবের জন্যই না! সংসারের কাজ-কর্ম্ম আছে, চারধার দেখাশোনা, তারপর ঐ কচি ছেলের ঝক্কি,…ঝঞ্ঝাট কি কম!

স্বামীকে সে বললে,—হ্যাগা, একদিন পিশিমার কাছে গেলে হয় না?

স্বামী বললে,—কি করে হয়! এই ছোট্ট ছেলে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে যাওয়া…!

কিশোরীর মনে একটু ঘা লাগলো। সেই পাড়াগাঁয়ে তার জীবন কেটেছে! আর সে ভালোই কেটেছে! এই পাড়াগাঁয়েরই মেটে পথ, শ্যাওলা-পড়া পুকুর, শিউলি-তলা, ভাঙা মন্দির—তার কত আনন্দের জিনিষ ছিল! আর আজ সে পাড়াগাঁয়ে তার ছেলের যাবার উপায় নেই! পঞ্চাশ রকমের নিষেধ মস্ত বেড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

পিশিমা? আহা, বেচারী! সংসারে সে-ছাড়া তার যে আর কেউ নেই! তাকে কোলে-পিঠে করে, তারই মুখ চেয়ে পিশিমা এই বাঁধন-হারা সংসারে একটা মস্ত বাঁধন পেয়েছিল। সংসার আবার তার সামনে সহস্র প্রলোভন বিস্তার করেছিল। আজ পিশির আর কি আছে? কে আছে? কেউ না, কিছু না।

সে ভাবলে, আজ দুপুর বেলায় সে পিশিমাকে চিঠি লিখবে—মস্ত চিঠি। খোকার কথা, নিজের কথা সব লিখবে। তা-ছাড়া পিশিমাকে একবার আসবার কথাও লিখবে! কেন পিশিমা আসবে না? জামাই-বাড়ী। ওঃ,—ভারী বয়ে গেছে তাতে! খোকাকে পিশি দেখবে না? আহা, খোকার খপরও তাকে দেওয়া হয়নি!

দুপুর বেলায় সে চিঠির কাগজ নিয়ে বস্‌লো, পিশিমাকে চিঠি লিখতে। আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে সে অনেক কথা ভাবতে লাগলো। কি লিখবে, কি বলে কোন্ কথাটি দিয়ে চিঠি আরম্ভ করবে, মোলায়েম করে কি কি কথা লিখলে পিশিমার এত দিনের এই দীর্ঘ ব্যথা জুড়িয়ে দিতে পারবে,—ভেবে তার একটা নিশানা করে সে লিখলে,—

শ্রীচরণেষু…

স্বামী এসে সামনে দাঁড়ালো, বললে,—কি করচো গা?

—চিঠি লিখছি।

—এখন চিঠি লেখা থাক্। এসো, একটু বেড়িয়ে আসি। বরানগরে একটা বাগান ঠিক করা হয়েছে। আরো দু-তিনজন বন্ধু তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, সেখানে চড়ি-ভাতি হবে। নৌকা অবধি ঠিক। নাও, উঠে পড়ো।

—চিঠিখানা লিখে নি গো,—একটু দাঁড়াও।

—না, না, ফিরে এসে লিখো'খন।

চিঠি আর লেখা হলো না। ব্রাহ্ম ধরণে ঘুরিয়ে ভালো শাড়ী পরে তাতে ব্রুচ এঁটে কিশোরী তখন স্বামীর হাত ধরে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো, গাড়ী করে ঘাটে এসে নৌকো—নৌকোয় করে একেবারে বরানগরে বাগানের ঘাটে আসা হলো। বাসি, রেণু, তমাল, পরী—সবাই এসেছে। কতদিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা। আনন্দ সেখানে একেবারে যেন উছলে পড়ছিল।

সেই আনন্দের মধ্যে কিশোরী এসে আপনার মনটাকে ছেড়ে দিলে! এ আনন্দে কোথায় ভেসে গেল পাড়াগাঁয়ের সেই অনাড়ম্বর ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী-ঘরের ছোট্ট স্মৃতিটুকু! কোথায় ভেসে গেল স্নেহময়ী পিশিমার ভাবনায়-আকুল চোখের সে ছল-ছল দৃষ্টি বা!

সন্ধ্যার সময় সকলে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন অত আনন্দ-হাসি-গল্পের মধ্যে থেকে-থেকে একটা বেদনা কিশোরীর প্রাণে ভয়ানক বাজছিল!

বাড়ী ফিরে এসে দেখে, ছেলের গা গরম, পুড়ে যাচ্ছে! খুব জ্বর! কাজেই চিঠি আর সে-রাত্রে লেখা হলো না!

দাগী

তখন আমার জুনিয়রির পালা। সারাদিন কোর্টে ঘুরিয়া রৌদ্র ও ধূলা খাইয়া গৃহে ফিরি; প্রাণে বৈরাগ্যের বাসনা দেখা দিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে, সেদিন সকাল হইতে বাদলা সুরু হইয়াছে—পথে কাদা, আকাশে মেঘ, চারিদিকে বিষম নিরানন্দ ভাব,—হাতে কোন কাজ ছিল না। হাকিম সদানন্দ সেন একটা একশ'দশ ধারার মামলা করিতে-ছিলেন। একটু রস পাইবার আশায় তাঁর এজলাসে আসিয়া বসিলাম।

আসামী এক বাঙালী যুবা—গায়ের রঙ তামার মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে ময়লা কাপড়, অঙ্গে একটা তালি-দেওয়া ছিটের কামিজ। কাঠগড়ার রেলিঙে মাথার ভর রাখিয়া মুখ গুঁজিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল; পুলিশ হইতে প্রায় ত্রিশ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতে-ছিল। কয়েকজন দোকানদার, কয়টা পতিতা নারী, দুই-চারিজন পাণওয়ালা—সকলেই হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিতেছিল, আসামী এক ভীষণ গুণ্ডা, কোন কাজ-কর্ম্ম করে না; যখন তখন তাদের কাছে আসিয়া জুলুম করিয়া ভয় দেখাইয়া নেশা ভাঙ্ করিবার পয়সা আদায় করে—বে-গোছ দেখিলে নাকি ছুরি উঁচাইতে ছাড়ে না। প্রাণের ভয়ে সাক্ষীর দল কেহ চার আনা, কেহ সাত পয়সা, কেহ বা পাঁচ সিকাও কখনও কখনও তাহাকে দিয়া ফেলিয়া প্রাণে প্রাণে খুব রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। এই পয়সা কেহ দিয়াছে এক মাস পূর্ব্বে; কেহ বছর-খানেক, কেহ-বা আবার দেড় বছর পূর্ব্বে। উহার বিরুদ্ধে কোন দিন কেহ আদালতে নালিশ করে নাই বা পুলিশে কোন ডায়েরী লেখায় নাই!

লোকটার চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে চিররুগ্ন,—অত্যন্ত কৃশ দেহ, পেশীগুলা নিতান্ত ক্ষীণ দুর্ব্বল। অথচ সে এমন জুলুম-জবরদস্তি করিয়া এই সব যণ্ডা জোয়ান দোকানদার আর ভীমমূর্ত্তি বারাঙ্গনাদের কাছ হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে,—শুনিয়া প্রাণে কেমন একটা বিস্ময়-কৌতূহলের সঞ্চার হইল।

একজন বন্ধু কহিলেন,—এসো না হে, ওর হয়ে দাঁড়ানো যাক্!

আমি কহিলাম,—পয়সা দেবে কে?

বন্ধু কহিলেন,—কি এমন পাঁচশ' দশ রোজগার করা যাচ্ছে যে পয়সার দুঃখে মরে যাব! অমনি একবার পরখ করি। এই ত বাবিশ সাক্ষী—

অপর বন্ধু কহিলেন,—বিনা পয়সায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে জেলে ঠেলবো? পয়সা পেলে তবু নেমক-হারামি পাপটা ঘটতো না!

আমি কহিলাম,—মন্দ নয়। শাস্ত্রেও আছে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্য! তা এ হবে আমাদের নাম্বার ওয়ান্।

হাকিমের অনুমতি চাহিলাম। তিনি বিরক্ত চিত্তে কহিলেন,—ওর আবার উকিল দেওয়া কি! পাঁচ বারের দাগী।

আমরা নাছোড়বন্দা—আসামীকে জনান্তিকে রাজী করাইয়াছিলাম; হাকিম অগত্যা অনুমতি দিলেন। আমরা আসামীর জামিনটা একটু কমাইয়া দিতে বলিলাম। হাকিম বক্র দৃষ্টিতে সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আমরা অমনি মোক্তার নারাণবাবুকে আনিয়া পয়সা ব্যয় করিয়া তাহার জামিন করাইয়া লইলাম।

পুলিশের দারোগা তখন কোর্ট বাবুকে কি-একখানা মোটা কাগজ দেখাইতেছিল। হাকিমের সেদিকে নজর পড়িল। হাকিম কহিলেন,—কি ওটা?

দারোগা সসম্ভ্রমে হাকিমের হাতে সেটি দিয়া কহিল,—আসামীর কাছে সম্পত্তির মধ্যে এই ছবিখানা শুধু পাওয়া গেছে।

হাকিম ছবিখানার পানে চাহিয়া পরক্ষণে আসামীর দিকে চাহিলেন। চোরের মত কুণ্ঠিত দৃষ্টি। মুখ তাঁর নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বেশ স্পষ্ট স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার খাশ্-কামরায় উঠিয়া গেলেন; কোনোদিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। কি এমন ফটোগ্রাফ—কার ফটোগ্রাফ যে মুহূর্ত্তে এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি!

ফটোখানা হাকিমের টেবিলে পড়িয়াছিল। কোর্ট বাবুর খোসামোদ করিয়া চাহিয়া লইলাম। এক স্ত্রীলোকের ফটো—সুন্দর! কুঞ্চিত সজ্জিত কৃষ্ণ কেশ-দামের মধ্যে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরীর মুখ! ছবি-খানি অত্যন্ত পুরাতন—কালের নিশ্বাসে ঈষৎ অস্পষ্ট ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

পেস্কার, আমলা সকলেই কৌতূহলী হইয়া পড়িল।

এমন কড়া হাকিম—সাজা দিতে অদ্বিতীয়—সে বিষয়ে

বাপের খাতির যিনি রাখিতে জানেন না, এ ছবিতে হঠাৎ তাঁর এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন ?

সকলেই আসামীর পানে চাহিল—এ দিকে তার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জামিনের কাগজ সহি করিয়া নাবাণ মোক্তারের সহিত এক কোণে বসিয়া সে তখন দিব্য গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

পরদিন সকালে আসামীকে ধরিয়া পড়িলাম, ও ছবি কার? বলিতে হইবে।

আসামী প্রথমে কিছুতে বলিতে চাহে না—শেষে বিস্তর পীড়াপীড়িতে কহিল, ও ছবি তার মৃতা জননীর!

তারপর সে আপনার জীবনের কাহিনী বলিল। তার নাম মাখন।

মাখন বলিল,—আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমার মা মারা যান। বাবা পাগলের মত হইলেন। তিনি তখন এম-এ পড়িতেছেন; পরীক্ষা-পড়া সব ছাড়িয়া আমায় বুকে টানিয়া বাহিরের ঘরে দিবারাত্র পড়িয়া থাকিতেন। আত্মীয়-বন্ধুর দল ঘাড়ে পড়িয়া তাঁর সে ভীষণ শোকাগ্নি নিবাইবার চেষ্টা জুড়িয়া দিল।

পুরুষ মানুষের শোক, তায় আবার স্ত্রী-বিয়োগের—মুছিতে বড় বিলম্ব হয় না—তবে ঠিক ঔষধটি দেওয়া চাই। সেই ঔষধেরই ব্যবস্থা হইল। বাবা আবার বিবাহ করিলেন। নূতন মা এক বড় ঠাকুরের কন্যা। সমস্ত দুঃখ-বেদনা-নিরানন্দ মুছিয়া তিনি একদিন আমাদের গৃহে সাম্রাজ্ঞীর আসন পাতিয়া বসিয়া গেলেন। বাবার মুখে অচিরে আবার হাসি দেখা দিল—মাত্রা আগেকার চেয়েও বেশী!

আমি কিন্তু তাঁর পানে আর ঘেঁষ দিলাম না। প্রথম হইতেই কি কুবুদ্ধি ঘটিল। নূতন মার উপর রাগ ধরিয়াছিল। নিজের মাকে হারাইয়া একটা সান্ত্বনা এই ছিল, বাবাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছি! এতখানি লাভে মা-হারানোর লোকসানটা মনেও জাগ নাই! কিন্তু নূতন মা আমার কাছ হইতে বাবাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! আমার পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ বাবাকে তিনি দিতে পারিতেন না! আমার বেশ মনে পড়ে, মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, দুপুর-বেলা তিনি নিদ্রা গেলে আমি বাহিরের ঘরে জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম, দেখিতাম, ঠিক পথের অপর পাশে নিমগাছের তলায় একটু ছায়ার আড়াল পাইয়া একটা রুগ্ন কুকুর সেখানে পড়িয়া থাকে—অত্যন্ত রুক্ষ মূর্ত্তি—নিতান্ত নিঃসহায়, বেচারা! বাবার এই পরিবর্ত্তনে আমার নিজের মন ঠিক সেই কুকুরটার মত যেন এক অসীম বেদনায় ঘা খাইয়া তেমনই নিঃসঙ্গ কুণ্ঠিতভাবে পড়িয়া থাকিত। অথচ উপায় ছিল না। একদিন জোর করিয়া বাবার আদর কাড়িতে গিয়াছিলাম—নূতন মা তাড়া দিলেন,—পড়া নেই, শোনা নেই, বুড়োধাড়ি ছেলে, খালি ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছেন।

দুঃখে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া কান্না রোধ করিলাম—এই পাষাণীর কাছে চোখের জল ফেলিব? না, কখনও না! বাবার পানে একবার চাহিলাম, বাবার মুখ নিরুপায় কুণ্ঠায় যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! গতিক বুঝিয়া আমি সে ঘর ত্যাগ করিলাম।

বাড়ীতে আত্মীয় যে কেহ না ছিল, এমন নয়। তবে সকলেই নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। স্কুলে যাইতাম। ইংরাজী বইয়ে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম—কি-একটা দেশের তখন অত্যন্ত অরাজক অবস্থা। সে যেমন করিয়া পারে, শুধু নিজেদের জিনিষ-পত্র সামলাইতে দারুণ ব্যস্ত, আশে-পাশে কত নিরীহ দুর্ব্বল অত্যাচারে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কাহারও অবসর নাই,—আমাদের বাড়ীর দশা তখন ঠিক সেই রকম! মাথার উপর শক্ত অভিভাবক নাই,—বাবা বাড়ীর বড় ছেলে—অপরে জ্ঞাতি-কুটুম মাত্র, তারা উৎসব-আমোদের সময় দন্ত মেলিয়া সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে জানে, বিপদের লক্ষণ বুঝিলে নিমেষে কোথায় চম্পট দেয়।

এই ভাবে ভাঙ্গা নৌকার মত জীবনটাকে যখন টানিয়া লইয়া ফিরিতেছি, তখন সহসা এক দমকা হাওয়া দেখা দিল। বাবা এম-এ ফেল করিয়া বসিলেন এবং তার দুই-চারি মাস বাদে নূতন শ্বশুরের সুপারিশ ও জোগাড়ের জোরে এক দিন হাকিম হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমাকেও বাবার সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ যাত্রা-কালে নূতন মা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না। কারণ, হাকিমি চাকরি লইয়া বাবাকে সাত ঘাটের জল খাইয়া ফিরিতে হইবে—আমি সঙ্গে থাকিলে আমার পড়াশুনায় বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটুকু একদম মাটি হইয়া যাইবে, তার উপর বিদেশ-বিভুঁই, সেখানকার জল-হাওয়া আমার ধাতে সহিবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রীলোকদের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সহসা বাবার অত্যন্ত আস্থা দেখা গেল। কাজেই তিনি মাসহারার আশা দিয়া আমাকে জ্ঞাতির দলে রাখিয়া গেলেন।

আমি কোন কথা কহিলাম না। আমার কেমন তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ বিশ্ব-রঙ্গভূমে কোথায় কি অভিনয় চলিতেছে, আমার যেন তা শুধু

দেখিবার পালা। এ অভিনয়ে আমাকে নামিতে হইবে না! আমার জন্য এখানে কোন ভূমিকাই যেন নির্দ্দিষ্ট নাই! স্থাণুর মত অচপল চিত্তে আমি বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।

মাখন বলিতে লাগিল,—দুই-তিন বৎসর এক রকমে কাটিয়া গেল। তার পর একদিন বড় কাকা বলিলেন, —বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। তোমার বাবাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। আমরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছি—তোমার পক্ষে এখন তোমার বাবার কাছে যাওয়াই উচিত।

বড় কাকার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সাধারণ দশ বৎসর বয়সে বাঙালীর ছেলেরা এ-সব বিষয় বড় একটা বুঝিতে পারে না—কিন্তু মা-হারা ছেলে—বিশেষ আমার মত অবস্থায় পড়িলে বুদ্ধি তার একটু চট করিয়াই বাড়িয়া ওঠে।

সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় যাই? কি করি?

একবার ভাবিলাম, বাবার কাছে যাই। বাবা তখন খুলনার ওদিকে কোথায় এক মহকুমার হাকিম। কিন্তু পরক্ষণেই বিমাতার সেই রোষ-রুদ্র মুখ ও কঠিন দৃষ্টির কথা মনে পড়িতে সে বাসনা কর্পূরের মত উবিয়া গেল! ভাবিলাম, সেখানে যাওয়ার চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোতেও ঢের আরাম, ঢের সুখ!

ঘরের দেওয়ালে মার একখানি ফ্রেমে আঁটা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সারা রাত্রি প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় সেখানার পানে চাহিয়াই চোখের জল ফেলিলাম। মার শোক সে রাত্রে নূতন করিয়া বুকে বাজিল। শেষে সেই ছবিখানাকে মাত্র সম্বল করিয়া পরণের দুই চারিখানা কাপড় লইয়া ভোরের দিকে বাড়ী ছাড়িলাম।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত সেই পথে চলিতে সুরু করিলাম। মাথার উপর তরুণ স্নিগ্ধ সূর্য্য ক্রমে রুদ্র মূর্ত্তিতে রক্ত আঁখি মেলিয়া দেখা দিল। সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—সূর্য্য হার মানিয়া শেষে আবার শান্ত-শীতল মূর্ত্তি ধরিয়া মৃদু হাসিয়া দিগন্তের কোলে সরিয়া পড়িল, তবু আমি চলিয়াছি! হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে, দারুণ পিপাসা গলার মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটাইতেছে, এমন বেদনা বোধ হইতেছিল! কিন্তু কোথায় বসিব? এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার যে তিলার্দ্ধ স্থান নাই!

যাক্‌, সে পথের কষ্ট আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। শেষে আশ্রয় মিলিল। এক গৃহস্থের বাড়ী বাসন মাজার কাজে লাগিয়া গেলাম। চার বৎসর কাজ করিলাম। মন্দ লাগিত না। আরামও পাইতাম। এক একবার মনে হইত, আমার বাপ হাকিম। আর আমি? তখনই হাসি আসিত। কিন্তু একদিনের জন্য ক্ষোভ জাগে নাই।

আমার নিশ্বাসে বুঝি কি বিষ ছিল! নহিলে বাড়ীর কর্ত্তা একদিন গ্রামান্তর হইতে জ্বর গায়ে বাড়ী ফিরিয়া যে-বিছানা লইলেন, সে বিছানা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় না কেন? মৃত্যু তাঁকে আপনার কোলে টানিয়া লইল। পাখীর বাসায় ঢিল ছুড়িলে মুহূর্ত্তে যেমন তা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, মনিবের গৃহের দশা ঠিক তেমনি ঘটিল। আমি আবার পথে বাহির হইলাম। বাবা তখন কটকে,—আমার এক ভাইয়ের জন্মোৎসবের ধুমে আত্মহারা!

তার পর এই সহর কলিকাতায় আসিলাম। এ এক মজার দেশ! যারা এখানে সুখী, যারা বড় লোক, তারা কারও পানে ফিরিয়া না চাহিলেও দুঃখী-গরিবের দল সাধিয়া কথা কয়, ডাকিয়া দুই মুঠা খাইতে দেয়।

এক ঠাকুর-বাড়ীতে আস্তানা মিলিল। কিছুদিন সেখানে পূজারীর মন জোগাইয়া কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু টিঁকিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোথা হইতে এক অদৃশ্য রজ্জু কোন্ এক অজানা পথে আমায় টানিতেছিল!

তিন-চার বৎসর এখানে-ওখানে ঘুরিয়া একটা হোটেলে চাকরি করিতে আসিলাম। সেখানে বিশ্বের যত বিদ্বেষ, কলহ, নীচতা, স্বার্থ এক বিপুল ষড়যন্ত্র পাকাইয়া বসিয়া আছে, হিংসার জোট বিছানো আছে—তাহাতে পা বাধিল। সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আদালতের দ্বারে গড়াইয়া পড়িলাম।

হোটেলের কর্ত্তার এক প্রৌঢ়া প্রণয়িনী ছিল—আমার উপর না কি তার একটু অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। নেপথ্যে ইহার ইঙ্গিতাভিনয় চলিতেছিল, তার আভাসমাত্র আমার পাইবার সুযোগ ঘটে নাই—ইতিমধ্যে কর্ত্তার মনে কেমন করিয়া সন্দেহ হয়—সে একেবারে থালা-ঘটি-সমেত চুরির চার্জ্জ দিয়া আমাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিল। আমি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাপারখানা ভালো করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বে হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল—তিন মাসের জন্য আমার জেলের ব্যবস্থা।

জেলের গাড়ীতে বসিয়া সত্যই সেদিন প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলাম—বাঃ, আশ্রয়হীন আমি, আজ এখানে, কাল সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, ভগবান আজ আমায় দিব্য আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন তো! আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, পড়িয়া ঘুমাইবার জন্য ছাদ-ঢাকা একটু ঠাঁইও অনায়াসে মিলিবে!

তিন মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিত। একদিন রাত্রে বাজারে যাত্রা হইতেছে শুনিয়া সেই দিকে চলিলাম। পথে পাহারা-ওয়ালা পাকড়াও করিয়া থানায় চালান দিল। কাজ-কর্ম্ম নাই বলিয়া হাকিম ছ'মাসের জামিন চাহিয়া বসিলেন। কে আমার জামিন হইবে? ছ'মাসের জন্য আবার জেলে চলিলাম।

ছ'মাস পরে জেল হইতে ফিরিয়া আসিলাম। একটা মন্দিরের রোয়াকে পড়িয়া থাকিতাম। পূজারীর সহিত একটা যাত্রীর ঝগড়া বাধিল। পূজারী যাত্রীর বোচ্‌কা সরাইয়া রাখিয়াছিল। পুলিশ আসিতে দেখি, বোচ্‌কাটা আমার কাছে। আমি ঘুমাইতেছিলাম। গুঁতা মারিয়া পুলিশ ঘুম ভাঙ্গাইয়া বোচ্‌কা দেখাইয়া বলিল,—ব্যাটা চোর, চল্‌ থানায়।

আমি অবাক্‌! আবার জেলে চলিলাম।

এবার জেলে বসিয়া স্থির করিলাম, এই পথই ভালো। বাহিরে যখন নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই,—কাজ করিতে গেলে লোকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে, কাজের চেষ্টায় পথে বাহির হইলে হাকিম সদর্পে জামিন চাহিবে—তার চেয়ে জেলে থাকিলে বাঁধাবাঁধির আর ভয় থাকিবে না, রুলের গুঁতা হইতেও রক্ষা পাইব!

এবারে জেল হইতে ফিরিলাম,—অদৃষ্ট প্রসন্ন মূর্ত্তিতে অভ্যর্থনা করিল। এক বড়লোকের কাছে চাকরি মিলিল। জেলেই এক বন্ধু জুটিয়াছিল—আমার সমবয়সী। সে তার মনিবের খুব সুখ্যাতি করিত। তার মনিব ইসুফ কোকেন-ওয়ালা। সে তার অধীনে থাকিয়া কোকেন বেচিত। মনিবের যত্নের ক্রটী নাই। কোকেন বেচায় আশঙ্কা খুব, অথচ লাভের সীমা নাই। ধরা পড়িলে মনিব বেশ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া বড় উকিল লাগাইয়া বাঁচাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করে। বরাতে যদি জেল ঘটে, ঘটুক—ফিরিয়া কিন্তু মনিবের কাছে রীতিমত বখশিস্‌ মেলে!

সেই চাকরি লইলাম। দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধু ঠিক বলিয়াছিল, লাভ ইহাতে বিলক্ষণ! এই কোকেন লইয়া আরও দু'বার জেল খাটিয়া আসিলাম।

শেষবারে ফিরিয়া কিন্তু পুনর্মূষিক! কোকেন-ওয়ালা মনিব এক খুনী মামলার আসামী হইয়া বিচারে দ্বীপান্তরে চালান হইয়া গিয়াছে। আমি চারিধার অন্ধকার দেখিলাম। হাতে টাকা ছিল না। কোনমতে কিছু জোগাড় করিয়া একবার ভদ্রলোক সাজিয়া বাবার সহিত দেখা করিব, ভাবিলাম। তার পর একবার এমন একটা কীর্ত্তির কাজ করিব, যাতে দেশের বুকে আমার নাম চিরকালের জন্য ক্ষোদা থাকে, বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়!

একটা দল জড়ো করিলাম। রাত্রে উল্টাডিঙ্গির বিখ্যাত মহাজন ঘনশ্যাম সাধুখাঁর তহবিল চলিয়াছিল, লোকের মাথায়। তাদের ঘাড়ে পড়িয়া সেই তহবিলে ছোঁ দিলাম। মোটা টাকা হাতে আসিল।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার অবকাশ মিলিল না, পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল। এই হাকিমের কাছেই চালান দিল। এ হাকিম বড় কড়া—ভালো লোক বলিয়া নাম-ডাক আছে—আমার পূর্ব্ব-শাস্তির বহর দেখিয়া একেবারে দেড় বৎসরের জন্য জেলে আমার নিরাপদ নীড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তার পর এই উৎপাত! এবার কিন্তু এ সব কাল্পনিক ব্যাপার! দেড়মাস জেল হইতে ফিরিয়াছি—শরীর এই! দেহে বল নাই—মনে স্ফুর্ত্তি নাই। মার ছবি লইয়া একেবারে দেশে গিয়া সেই শ্মশানে পড়িয়া সব শেষ করিব ভাবিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু গোলযোগ ঘটিল। রাস্তার মোড়ে এক থার্ড ক্লাশ গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। এক জমাদার আসিয়া গাড়োয়ানের উপর তম্বি করে! গাড়োয়ান বেচারা সন্ত্রস্ত। আমি গায়ে পড়িয়া তার পক্ষ লইলাম। জমা-দারের কোপ পড়িল আমার উপর—তার এক জুড়িদার নিমেষে কোথা হইতে আসিয়া আমায় সনাক্ত করিল, এ ব্যাটা পুরানো দাগী। জমাদার আমায় ধরিয়া থানায় আনিল। দু' দিন কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইয়া এই একশো দশ ধারায় শেষে চালান দিয়াছে। সাক্ষীগুলা কোথা হইতে যে আসিল, কিছুই জানি না। আমি উহাদের কখনো চক্ষে দেখি নাই। যে পাড়ার লোক উহারা, সে পাড়ার পথেও কোনদিন হাঁটি নাই! অথচ উহারা সকলে হলফ লইয়া সটান্‌ জুলুম-জবরদস্তির কথা বলিয়া গেল!

মাখন চুপ করিল।

আমি কহিলাম,—তোমার বাবার নাম কি? তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

মাখন বলিল,—সে খপরে কি হবে, বাবু?

আমি কহিলাম,—হাকিমের কাছে প্রকাশ করে বললে সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারি।

মাখনের চোখ-দুইটা সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল, বজ্র-স্বরে সে কহিল,—কি বললেন? সুবিচার! এই হাকিমের কাছে? অসম্ভব! যদি সে আশা থাকতো, তাহলে আজ এজলাসে ওর ঠাঁই না হয়ে আমার পাশে সেই আসামীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে দেখতুম। আমার এ দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী? আমি, না, ও? যদি ভগবান থাকেন, তিনি এর বিচার করবেন! হাকিম হয়ে বসে লোকের বিচার করচেন উনি?

মাখন ফুঁপিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—থাক্ ও কথা। তোমার বাপের নামটা বলো না! কিছু উপায় হবে।

—কিসের উপায়? কোন উপায় করতে হবে না, বাবু! যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। ও কি করবে আমার? জেলে দেবে? দিক্। ভগবান সব লিখে রাখ-চেন! ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে ওঁর যদি পৌরুষ হয়, হোক!

আমি কহিলাম,—এ আবার কি বকতে সুরু করলে, মাখন?

—তবু বুঝতে পারচেন না, বাবু? ওই তো আমার বাপ, ঐ সদানন্দ সেন—আপনাদের হাকিম—

আমি চমকিয়া উঠিলাম। হাকিম সদানন্দ সেন! সেদিন ছবি দেখিয়া হাকিমের সে চিত্ত-বিকারের কথা মনে পড়িল। ব্যাপারটা জলের মত সাফ হইয়া গেল! আমি মাখনের পানে চাহিলাম। তার চোখ দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছে!

নিশীথে

গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকুল আর্ত্তনাদ উঠিল,—আগুন লেগেছে! আগুন।

সুপ্ত নর-নারী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায়?

আশঙ্কায় তাহাদের বুক কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি জানলার পানে সকলে ছুটিয়া আসিল। ঐ দূরে অগ্নির লেলিহান শিখা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে—চারিধার যেন কে লাল রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে! যেন নিশীথিনীর কমনীয় কোমল কণ্ঠে কে তীক্ষ্ণ ছুরি বসাইয়া দিয়াছে! নিশীথিনীর কণ্ঠ ছিঁড়িয়া উষ্ণ লোহিত রক্তধারা উৎসের মত ঝরিয়া পড়িয়াছে!

উন্মাদের মত ব্যগ্র লোকজন আগুন লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল।

সহরের প্রান্তে গরিবদের বস্তি—দীন-দুঃখীর মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, খড়ে-ছাওয়া জীর্ণ পাতার ঘর। তাহারই উপর হুতাশনের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। রক্ষা নাই—রক্ষা নাই। এ রুদ্র রোষানল থামাইবার এতটুকু সামর্থ্য জীর্ণ পাতার ঘরের শীর্ণ ঝঙ্কালের কোথাও নাই, কোথাও নাই!

সারা দিন ধরিয়া গরিবের দল, ধনীর চলিবার পথ হইতে কাঁটা বাছিয়া তুলিতে গিয়া দেহের রক্ত পাত করিয়া আসিয়াছে, বিলাসীর সজ্জিত ভবনে সম্ভোগের উপকরণ সাজাইয়া এক মুঠা অন্নের জোগাড় করিয়া ফিরিয়াছে। এখন প্রসন্ন চিত্তে স্ত্রী-পুত্রের মধুর সঙ্গ-লাভে বেচারা দিনের শ্রান্তি ভুলিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদের এ নিশ্চিন্ত নিদ্রা-সুখ নিষ্ঠুর ভাগ্য-দেবতার সহ্য হইল না,—তাই তাঁহার উষ্ণ নিশ্বাসে আজ উপায়হীন বান্ধবহীন দরিদ্রদের সর্ব্বস্ব বুঝি-বা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়!

মা ছেলেকে কোলে তুলিয়া, স্বামী স্ত্রীকে বুকে ধরিয়া পাগলের মত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিল। মৃত্যুর দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—ওরে, কে কোথায় আছিস্, আয়, আয়, মৃত্যু কোল পাতিয়াছে, ছুটিয়া আয়!

নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিল, মৃত্যুকে এখন সম্মুখে দেখিয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইবার জন্য সেও অধীর আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছে!

পাশাপাশি অসংখ্য ঘর। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনার রঙ্গভূমি। এই অসংখ্য ঘরে মুহূর্ত্তে একটা চাঞ্চল্য সাড়া দিয়া উঠিল। ভয়ের একটা নিকষ-কৃষ্ণ শিখা ঘর-গুলাকে বিদ্যুতের মতই চিরিয়া দিয়া গেল।

একটি ঘরে রুগ্ন স্বামী দুর্ব্বল দেহে পড়িয়া ছিল। স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বাহ্নে তার বিষম কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীকে অকথ্য গালি দিয়া স্বামী তাড়াইয়া দিয়াছিল। স্ত্রীও সতেজে স্বামীর মুখের উপর বলিয়া গিয়াছিল,—এই চল্লুম, যদি আর কখনও ফিরি—স্ত্রী একটা উৎকট শপথ করিয়া বিদায় লইয়াছিল।

এখন পথে দাঁড়াইয়া স্ত্রী আগুনের পানে চাহিল। চোখে পলক নাই। পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতই তাহার দুই চোখ। বুকের মধ্যে রুদ্ধ অভিমান হিংসার আবরণ পরিয়া সাপের মত ফুঁশিতেছিল।

আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় লাফাইয়া ছুটিয়াছে। সে যেন এক ভৈরবের উন্মাদ নৃত্য! প্রলয়ঙ্করী কপালিনীর তীক্ষ্ণ খর্পর যেন নিশীথের গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া ঝক্-ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! সহসা নারীর আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদের মত ছুটিয়া সে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দর্শকের দল তামাসা দেখিতেছিল। এই আগুনের মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য! নারীকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ তাহাদের ঠিক্‌রিয়া পড়িবার মত হইল। সকলে কলরব করিয়া উঠিল! কলরব করা ছাড়া আর উপায় ছিল না! দগ্ধ বংশখণ্ড ফট্ ফট্ করিয়া ফাটিয়া বাজির মত আকাশে লাফাইয়া উঠিতেছে। অগ্নির সাগর,—চারিধারে অনলের তরঙ্গ ছুটিয়াছে! ব্রহ্মার আজ ক্ষুধা জাগিয়াছে! যতক্ষণ না সে ক্ষুধার পরিতোষ হয়, ততক্ষণ মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, কাহারও মুক্তি নাই!

সহসা দূরে ঢঙ-ঢঙ ঢঙ-ঢঙ করিয়া ঘণ্টা বাজিল। ঐ···ঐ দমকল—দমকল আসিতেছে! আঃ, বাঁচা গেল! এতক্ষণে দর্শকের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মুক্তির আরাম ঐ গাড়ীখানার পিঠে চড়িয়া এতক্ষণে আসিয়া দেখা দিয়াছে!

গাড়ী আসিয়া পড়িল। নল চালাইয়া আগুন নিবাইবার উদ্যোগে সকলে লাগিয়া গেল। মুখে

কাহারও কথা নাই। হাত-পাগুলা কলের মত ক্ষিপ্র সহজ গতিতে কাজ সারিয়া যাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে ধরাধরি করিয়া সকলে একটা জ্বলন্ত পদার্থ বাহিরে লইয়া আসিল। দর্শকের দল ঠোঁট বাঁকাইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, গাঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ দুটি প্রাণী। একটি পুরুষ, অপরটি নারী। দর্শকেরা শিহরিয়া উঠিল। এ সেই নারী—উন্মাদের মত কিছুক্ষণ-পূর্ব্বে যে ঐ আগুনের মুখে ছুটিয়া গিয়াছিল! এই কতক্ষণ-পূর্ব্বে যে শপথ করিয়া স্বামীর কাছে চির-বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, স্বেচ্ছায় সে অনল-সাগরে ঝাঁপ দিয়া রুগ্ন স্বামীকে বাঁচাইতে আসিয়াছিল—না পারিয়া স্বামীর সহিত সহমরণে গিয়াছে।

আগুন নিবিয়া গিয়াছে। দেখিবার আর কিছুই নাই। দর্শকের দলও নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছে! দমকল চলিয়া গিয়াছে। এখনও দূর হইতে তাহার ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট আসিয়া কানে বাজিতেছে। দগ্ধ ভস্মস্তূপ রাত্রির কালিমাকে আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কৃষ্ণ ভস্মস্তূপের সম্মুখে আশ্রয়হীন-উপায়হীন নরনারীর দল পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক বসিয়া আছে! তাহারা গৃহহীন, রিক্ত, সর্ব্ব-হারা! এত দুঃখে কাঁদিতে কাহারও চোখে এক ফোঁটা জল অবধি নাই! সে জলটুকু আগুনের আঁচে শুকাইয়া গিয়াছে!

জড়পিণ্ডের মত মৌন মূক সকলে তাল পাকাইয়া বসিয়া ছিল! সব তাহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে। কাল আবার রাত্রি পোহাইয়া দিনের আলো দেখা দিবে, সে সম্ভাবনার কথা কাহারও মনে ছিল না! তাহারা শুধু ভাবিতেছিল, এত কোলাহল, এত লোকজন, আলো ও কোলাহলের এমন সমারোহ এইমাত্র যেখানে ফুটিয়াছিল, মুহূর্ত্তের অবসরে মৃত্যুর সঘন নিবিড় স্তব্ধতায় সে-সব কোথায় চাপা পড়িয়া গেল।

যেন একটা স্বপ্ন চকিতে সকলকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। লোক-জন, ছুটাছুটি, গোলমাল—সে যেন জোয়ারের জল—উচ্ছ্বসিত নদীবক্ষ ছাপাইয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছিল, এখন কৌতূহল-পরিতৃপ্তির অবসানে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। সে উচ্ছ্বসিত জলরাশি কোথায় সরিয়া গিয়াছে, আর তাহারা জলে ভাসা কাঠি-কুটাগুলার মতই তীরে আপনাদের কুৎসিত দৈন্যের মূর্ত্তি লইয়া পড়িয়া আছে। জল তাহাদের লইয়া যায় নাই, ধরণীর আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে!

ফেল-জামিন

আমি ক্যাম্বেলের পাশ নেটিভ ডাক্তার। সাত ঘাটের জল খাইয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলে বদল হইয়াছি।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাসার সম্মুখে একটু খোলা জায়গা ছিল; সেইখানে ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জেলে এক 'অ্যাক্‌সিডেন্ট কেশ' হইয়াছে। উমেশ কয়েদী পাথর-ভাঙ্গা মুগুর নিজের মাথায় মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। এখনই আমাকে যাইতে হইবে! ডাক্তার সাহেবের কাছেও লোক ছুটিয়াছে।

তাড়াতাড়ি জেলে ছুটিলাম। আমার বাসা হইতে জেল দশ মিনিটের পথ।

জেলে গিয়া দেখি, লোকটা বেহুঁশ হইয়া রহিয়াছে। কপাল ছেঁচিয়া গিয়াছে! রক্তারক্তি ব্যাপার!

একটু আশ্বস্ত হইলাম—মাথাটা একেবারে ভাঙ্গে নাই! তখনি প্রয়োজন-মত ঔষধ-ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিলাম। নাড়ী টিপিলাম, জ্বর আছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবও আসিয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া রিপোর্ট লিখিতে বলিয়া তিনি ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে—ঠিক তখন ভোর হইয়াছে,—সারা রাত্রি ধরিয়া চীৎকার করিয়া জ্বালাইয়া ছোট ছেলেটা সবেমাত্র ঘুমাইয়া ঘুমাইবার একটু অবকাশ দিয়াছে—আমিও ঘড়ির পানে চাহিয়া চক্ষু মুদিবার কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্ডার আসিয়া বহির্দ্বারে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—বাবু—

ভাল উৎপাত! বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া জানাইল, সেই উমেশ কয়েদী শেষরাত্রি হইতে বিষম বায়না ধরিয়াছে, ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও। কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না। বকিয়া বুঝাইয়া সকলে হার মানিয়া গিয়াছে! তাই শেষে—

লোকটার সবে জ্বর ছাড়িয়াছে। কাল রাত্রেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, অনেকটা ভালো আছে। আবার পাছে কোন উৎপাত বাধাইয়া তোলে,—কাজেই জামা গায়ে দিয়া জেলে চলিলাম।

উমেশের বিছানার পাশে আসিয়া দেখি, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া আছে। গায়ে হাত দিলাম, জ্বর নাই। উমেশ ফিরিয়া চাহিল, চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম, সে খুব কাঁদিয়াছে। আমি কহিলাম, কি হয়েছে উমেশ? ডাকছিলে কেন?

উমেশের চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপাইয়া সে কহিল,—বাবু, কেন আমায় বাঁচালেন? আজ ক'দিন মনের মধ্যে কি আগুন জ্বলছে, তা যদি বুঝতেন!

ভাবিলাম, লোকটার অনুতাপ হইয়াছে! সে কহিল,—মরণ কিছুতেই দেখা দেয় না! কত দিন জ্বলবো, তাও জানি না। সব তাই আমি শেষ করে দিতে গেছলুম, কিন্তু ধরে বেঁধে আবার টেনে তুললেন, কেন? মাথা জোড়া দিয়ে কি করবেন? মনকে আমার ঠিক করে দিতে পারবেন না তো।

তাহাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দুই-চারিটা হিত-কথা পাড়িলাম; কিন্তু উমেশ কহিল, ও-সবে কোন ফল নাই! যে গাছের শিকড় কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল-ঢালা কেন?

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। উমেশ কহিল,—এ সহরে আমার পানে কেউ ফিরে চায় নি, শুধু আপনি চেয়েছেন। আপনার প্রাণেই একটু মায়া আছে, দেখচি। আপনাকে সব কথা খুলে বলছি, শুনুন। শুনে বলুন, এত কাণ্ডর পর কেউ যদি মরতে চায়, তাতে বাধা দিতে আছে কি না!

সে তখন আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে সুরু করিল।

উমেশ বলিল,—সে আজ তিন বৎসরের কথা। রাণীগঞ্জের হাটে গিয়াছিলাম গরু কিনিতে। আমার বাড়ী জিয়ালিতে। দামোদরের উপরে জিয়ালি,—ছোট্ট গ্রাম।

গরু কিনিয়া ফিরিবার পথে এক মুদির দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেখানে এক লোকের মুখে শুনিলাম, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়াছে। এমন জল সে তল্লাটে কোনকালে কেহ চোখে দেখে নাই। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর সে জলের স্রোতে কোথায় সব ভাসিয়া গিয়াছে!

শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমার জিয়ালি? লোকটা কহিল, জিয়ালির কোন চিহ্ন নাই! বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া সে যেন সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে! কাটা ছাগলের মত প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল! জিয়ালি গিয়াছে? তার মানে,—আমার সব গিয়াছে? ঘরে রুগ্না স্ত্রী,

আদরের মেয়ে দুলালী, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর,—সব—সব গিয়াছে ? কিছু নাই ?

দোকানীর ঘরে গরু রাখিয়া ছুটিয়া পথে বাহির হইলাম। পেটে ক'দিন অন্ন পড়ে নাই, ক্ষুধায় নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছে—তবু সাত-আট ঘণ্টা পুরা দমে চলিয়া বর্দ্ধমানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম! তারপর মেঠো পথ জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! যে-ধারে চাই, কেবল জল। বড় মাঠ বিলের আকার ধারণ করিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে-মধ্যে দুই চারিটা বড় বড় গাছ স্তব্ধ প্রহরীর মত মাথা তুলিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছে,—তাহার সে লাল আলো জলে যেন সিঁদুর গুলিয়া দিয়াছে!

আমার চোখের সম্মুখে সে লাল জল রক্তনদীর মত টক্-টক্ করিতেছিল। পথ নাই, পথ নাই—চারিদিকে জল···জল! উপায় কি! মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। সাঁতরাইয়া গৃহে ফিরিব ভাবিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ফাঁড়ির এক চৌকিদার আমায় ধরিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিয়া মিনতি করিলাম,—ছাড়িয়া দাও গো,—আমার সব যায়।

সে কহিল, তাহার ছাড়িবার হুকুম নাই। পাছে কেহ জলে নামে, তাই রোধ করিবার জন্য সেখানে সে মোতায়েন আছে। আমায় ছাড়িয়া গাফিলির দণ্ডস্বরূপ দশটাকার চাকরি সে খোয়াইতে পারে না। চাকরির উপর তার জান-বাচ্ছার নির্ভর।

বেশী জিদ ধরিলে আমার সে থানার জিম্মা করিয়া দিবে, এমন ভয়ও দেখাইতে ছাড়িল না।

আমি কেমন হতভম্বের মত বসিয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী আঁধারে ভরিয়া গেল।

উমেশ বলিতে লাগিল,—কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া ছিলাম, জানি না—চোখের সামনে মাথার উপর দিয়া আঁধার রাত্রি পোহাইয়া গেল—আবার সূর্য্য উঠিল। সূর্য্যের তাপ গায়ে লাগায় আমার হুঁশ্ হইল। তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্য পথে চলিলাম। চৌকিদার বাধা দিল না।

তারপর কোনমতে কোনো খানে হাঁটু-ভোর জল ভাঙ্গিয়া, কোন খানে বা সাঁতরাইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু কোথায় গ্রাম! কোথায় ঘর! কোথায় স্ত্রী! কোথাই বা মেয়ে! দামোদর এক-নিশ্বাসে সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। মাথার মধ্যে ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। আমি শুইয়া পড়িলাম! ঘুমে চোখ ছাইয়া আসিল!

যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখি, এক কানাতের ঘরে শুইয়া আছি। পাশে একটি বাবু বসিয়া আছেন। প্রথমটা কিছু খেয়াল হইল না। কিন্তু পাশ ফিরিতে একটা নিশ্বাস পড়িল। অমনি মেঘের মত কালো স্মৃতি মনের উপর ঘনাইয়া আসিল। চোখে জল ঝরিল।

বাবুদের চেষ্টায় মেয়ে মিলিল। স্ত্রীকে পাওয়া গেল না। মেয়ে আসিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল,—মা ?

তেরো বছরের মেয়ে—তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! বুঝাইবই বা কি করিয়া! তাহাকে বুকে চাপিতে চোখের জলে বুক ভরিয়া গেল। সাজানো ঘর, সাজানো সংসার দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম—ফিরিয়া দেখি, ভোজবাজির মত কোথায় সব মিলাইয়া গিয়াছে! জীবনে দুঃস্বপ্ন মানুষ অনেক দেখে,—কিন্তু এ সত্য যে সে স্বপ্নের অগোচর!

ভাবিলাম, স্ত্রী যে পথে গিয়াছে, দুলালীকে বুকে করিয়া সেই পথের পথিক হই! সব যদি গেল তো এ গুঁড়াটুকুকে লইয়া কোথায় রহিব! চোখের একটি পলক-পাত—এ গুঁড়া উবিতে কতক্ষণ!

বাবুরা বুঝি মনটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন! তাঁহারা বলিলেন, মেয়ের মুখ চাহিয়া আবার আমায় গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে। গলা টিপিয়া ইহাকে মারিতে পারি না! মেয়ের পানে চাহিলাম, তাহার চোখের কোণে জলের দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই। সেই ঝাপ্সা জল-ভরা দৃষ্টিতে কি মমতাই মাখানো ছিল! মরা হইল না। তাহাকে হাতে করিয়া মারা—না, সে অসম্ভব!

কিন্তু কি দিয়া বাঁচাইব? ঘর নাই। ধূ ধূ প্রান্তরে কি দিয়া আবার ঘর বাঁধিব? কি খাইয়া বাঁচিব? এ বয়সে নূতন করিয়া সংগ্রহের আর সামর্থ্য নাই! তাহার উপর ডাগর মেয়ে, আজ বাদে কাল বিবাহ দিতে হইবে। পাহাড়ের মত দুর্ভাবনার ভারী বোঝা মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

বাবুর দল কহিলেন, সহরে যাও। কলিকাতার পথে পয়সা ছড়ানো আছে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া মেয়ের মুখ চাহিয়া নূতন করিয়া আবার সব গড়িয়া তোলো!

তাঁহাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহারা গাঁটের পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; সঙ্গে খরচ কিছু গুঁজিয়া দিতে ভুলিলেন না। চোখের জল মুছিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া সহর কলিকাতায় আসিলাম।

অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন। সকলেই ব্যস্ত, অধীর—এ এক সমারোহ ব্যাপার! এ ভিড়ের চাপে পড়িয়া পিষিয়া ধূলা হইয়া যাইতে হয়! যেদিকে লোক চলিয়াছে, সেই দিকে তাহাদের পিছনে চলিতে আরম্ভ

করিলাম। গঙ্গার প্রকাণ্ড পুল পার হইলাম। ভিড়ের আর বিরাম নাই! কোলাহল অবিরাম! কোন্ পথে যাই? কোথায় গিয়া একটু আশ্রয় পাই?

হাঁটিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। দুলালী আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আর চল্‌তে পারচি না বাবা। কোথাও একটু বসবে, চলো।

কোথায় বসি! বড় বড় বাড়ী—সব ছাদ গিয়া যেন আকাশে ঠেকিয়াছে! লোকের কোলাহলে চারিধার গম-গম করিতেছে! কোনো বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটু রোয়াক। সেখানেও বসিবার ঠাঁই নাই, রঙ-বেরঙের সামগ্রী লইয়া লোকেরা বেচা-কেনা করিতেছে। নিরুপায় হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম। জনস্রোতের প্রবল আঘাতে কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া গেলাম। দাঁড়াইবার সাধ্য কি! মেয়েটাকে ধরিয়া টানিয়া কোনমতে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে আসিলাম। দুলালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিছু খাবি, মা?

উদ্‌গ্রীব নয়নে দুলালী আমার পানে চাহিল। দোকানে ঢুকিয়া কিছু খাবার কিনিয়া তাহাকে দিলাম। নিজে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জল খাইলাম। একটু সুস্থ হইলে দোকানীর সহিত আলাপ সুরু করিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছি শুনিয়া দোকানী মহা-উৎসাহে আলাপে যোগ দিল। কেমন জল, কাহার কি রহিল-গেল,—তাহারই বিস্তৃত বিবরণ খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রোতা জুটিল বিস্তর। সকলেরই শুনিবার কি আগ্রহ! কি কৌতূহল! মনে মনে ভাবিলাম, আঃ, ভগবান খুব আশ্রয় মিলাইয়া দিয়াছেন! মেয়েটাকে লইয়া এবারে বুঝি জুড়াইতে পাইলাম!

কিন্তু কিছু পরে ভুল ভাঙ্গিল। শুনিবার সব কথা শেষ হইয়া গেলে দোকানী কহিল,—তা হলে এসো, কর্ত্তা। আমার দোকানে লোকজন আসচে—ঠাঁই জুড়ে চোপর দিন বসে থাকলে তো আমার চলবে না। পাশ দাও।

দুলালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বড় শ্রান্তির পর বড় আরামের ঘুম! সে ঘুম ভাঙ্গাইতে মমতা হইল। কিন্তু দোকানী পর, শুনিবে কেন?

তাহার অনুরোধের সুর ক্রমে চড়া হইয়া উঠিল। একটা ভর্ৎসনাও মিলিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া দুলালীকে উঠাইয়া আবার পথে বাহির হইলাম! ঘুমে সে ঢুলিয়া পড়িতেছিল—পা ভালো সরিতেছিল না। টানিয়া তাহাকে লইয়া ফুটপাথে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। দুলালী আমার গায়ে ঠেশ দিয়া চক্ষু মুদিল।

কিন্তু বরাত মন্দ—শান্তি মিলিবে কেন? এক পাহারাওয়ালা আসিয়া কহিল, রাস্তা বন্ধ করিয়া বসিলে চলিবে না! চোখ রাঙাইয়া সে উঠাইয়া দিল। আবার রাস্তায় দাঁড়াইলাম।

সেই রৌদ্রতপ্ত পথে কষ্টের আর সীমা ছিল না! বড় বাড়ী দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি,—এমন দাতা কেহ নাই যে শুধু-একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দেয়? বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে গেলে গালপাট্টাওয়ালা মোটা দরোয়ানের দল হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাড়া করে। দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া কত ঘুরিলাম, কোথাও আশ্রয় মিলিল না!

তৃতীয় দিনে এক গলির মধ্য দিয়া চলিয়া একটা বাড়ীর রোয়াকে আসিয়া বসিলাম। দু'চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়াছিলাম, মেয়ের মুখে দিলাম—নিজেও কিছু খাইয়া লইলাম। রাস্তার কলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তারপর একবার দেবতার নাম স্মরণ করিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলাম,—বাবু—

সম্মুখের ঘরে বসিয়া এক বাবু গড়গড়ার নল টানিতে ছিলেন। নিকটে বিছানার উপর বাঁয়া তবলা প্রভৃতি বাদ্যের সরঞ্জাম পড়িয়া আছে। চোখ তুলিয়া তিনি কহিলেন,—কি চাস?—

একটা লোক ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—বাড়ীতে ব্যামো, ভিক্ষে মিলবে না—পথ দ্যাখ্!

দুলালী জড়সড়ভাবে আমার বুকে মুখ লুকাইল। আমি কাতর স্বরে কহিলাম,—ভিক্ষে আমি চাই না, বাবা। চাকরি চাই।

বাবুটি কট্‌মট্ করিয়া চাহিলেন—মেয়ের পানেও একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। বাবু বলিলেন,—তোর জামিন কেউ আছে?

জামিন! কথাটা কানে নূতন ঠেকিল। অর্থ বুঝিলাম না। বাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বাবু বলিলেন,—তুই চোর কি ছ্যাঁচোড়—তার পরিচয় কে দেবে?

আমি কহিলাম, আমি চোর বা ছ্যাঁচোড় নহি। নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলাম। বাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—ও-সব লোককে চাকরি দেওয়া যায় না, বাপু। তোমাকে জানে-শোনে, এমন লোক আনতে পারো তো মিলতে পারে—আমার জামাইয়ের বাড়ী এক জন লোকের দরকার ছিল বটে। তা তোমার সঙ্গে দেখচি আবার একটা মেয়ে! বয়সও তার সুবিধের নয়!

কাঁদিয়া বাবুর পায়ে ধরিলাম—গৃহ-হীন আশ্রয়-হীন, নিতান্ত অসহায় আমি! বাবুর কিন্তু সেই এক কথা, অজানা অচেনা লোককে চাকরি দিয়া তিনি দায়ে ঠেকিতে পারেন না। তার উপর ঘাড়ে এক বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে!

মুখ চুণ করিয়া আবার পথে বাহির হইলাম। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিলাম। সব জায়গায় সেই এক কথা। অজানা অচেনা লোকের জন্য এ মুল্লুকে ঠাঁই নাই! তবে আমি যাই কোথা? খাই কি? এ কি ভীষণ শাস্তি, ভগবান!

ক্রমে গাঁটের পয়সা ফুরাইয়া আসিল। যেদিন শেষ পয়সাটি বাহির হইয়া আমায় একেবারে সম্বলহীন রিক্ত করিয়া দিল, সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিল। দুলালী কাঁদিতেছিল। ক্ষুধায় তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সারাদিন এক গলির মোড়ে বসিয়া রহিলাম; দুলালী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলাম। যাহার খাইতে কিছু জোটে না—নিদ্রা তাহার প্রতি বড় সদয়। নিমেষে দুলালী ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহার কপালের উপর হইতে কেশের গুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম! আমি গরীব চাষা—কিন্তু দেশে আমার দ্বার হইতে কোন ভিখারী-অতিথি অতৃপ্ত বুকে কোনদিন ফিরিয়া যায় নাই! সেই আমি,—আজ পথের কাঙ্গালের অধম! শেষে স্থির করিলাম, ভিক্ষাই করিব! দেখি, সহরে ভিক্ষা মেলে কি না!

সহরের উপর দারুণ অভিমান জন্মিয়াছিল। এত বড় বিরাট শরীর লইয়া সজ্জিত সহর পড়িয়া আছে—গলির মোড়ে সারাদিন বিষণ্ণ মুখে আমি বসিয়া—আমায় দেখিয়া লোকের দয়া না হোক—এই কচি মেয়েটার শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়াও কাহারও দয়া হইবে না! সারাদিন আমার সম্মুখ দিয়া এত লোক আসিল-গেল, কৈ কেহ তো একবার ফিরিয়া চাহিল না, জিজ্ঞাসা করিল না—কেন আমরা বসিয়া আছি? কি চাই? কি আমাদের দুঃখ?

আশ্চর্য্য! এ কি আমার সেই ছোট গ্রামে সেই দারিদ্র্যের পুরীতে সম্ভব হইত! পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া গায়ে পড়িয়া সাহায্য করিত! আর এই এত বড় সহর—পাষাণ—পাষাণ সহর! লোকের এখানে প্রাণ নাই, মন নাই, ভিতরে পাষাণ পুরিয়া নিজেদের লইয়া সব ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে!

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছিল। সম্মুখে এক বাবু চুরুট টানিতে টানিতে পথে চলিয়াছিলেন—গলায় ফুলের মালা, ফিট্-ফাট্ পোষাক! গলির মোড়ে আর কোন লোক নাই। তাঁহারই কাছে ভিক্ষার জন্য প্রথম হাত পাতিব স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম,—বাবু—

বাবু ফিরিয়া চাহিলেন। আমার জিভ কেমন জড়াইয়া গেল। কি বলিব? কখনও ভিক্ষা চাহি নাই—ভিক্ষা চাহিতে বাধ-বাধ ঠেকিল। তবু যখন কথা আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে! কোনমতে বল সংগ্রহ করিলাম, কহিলাম,—আজ দুদিন কিছু খাইনি বাবা, সঙ্গে এই মেয়ে—এর মুখের দিকে চেয়েও না হয়—

বাবু মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন দৃষ্টিতে ফিরিয়া চায়, দৃষ্টি ঠিক তেমনি! আমি সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলাম! সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। ইচ্ছা হইল, এখনই উহার টুঁটি টিপিয়া চোখ-দুটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিই!

বাবু বলিলেন,—তাইতো—মেয়েটি তোর দেখচি খাশা! তা এক কাজ কর্ না—পয়সার দুঃখ থাকবে না! আমার সঙ্গে আয় মেয়েকে নিয়ে। আমি থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দেবো। সুখে থাকবি দুজনে।

কথাগুলা যেন বাজের মত শুনাইল! কলিকাতার অনেক কীর্ত্তির কথা গ্রামে বসিয়া শুনিয়াছিলাম। আমি বাবুর পানে কটমট করিয়া চাহিলাম। বাবু ভড়কাইয়া সরিয়া গেল। আপদ চুকিল! আমিও নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমার মাথায় তখন একটা মতলব দেখা দিল। চমৎকার! ঠিক!

দুলালীকে উঠাইলাম। পথে মই ঘাড়ে করিয়া একটা লোক আলো জ্বালিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার তীরে যাইবার পথ কোন্ দিকে? সে বলিল, বাঁয়ে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিমে গেলে গঙ্গার তীরে পৌছিব।

দুলালীকে কোনমতে টানিয়া গঙ্গার তীরে আসিলাম।

স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সব জ্বালা জুড়াইয়া গেল। চারিধারে আঁধার নামিতেছিল। মাঝে গঙ্গায় দু-চারিখানি নৌকা হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া জলে পড়িয়াছে। তীরের কাছে কতকগুলা বোট বাঁধা—সেখানে মাঝিরা রান্নাবান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। দূরে এক জেটির উপর বসিয়া কে গান গাহিতেছে—বড় করুণ সুর! আমার তপ্ত প্রাণে সে সুর মাতিয়া উঠিল! চারিধার শান্ত, কি-এক আবেশে ভরা! ঘাটে তখন দুই-চারিটা কুলি স্নান করিতেছিল। আমি ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিলাম।

এই শান্ত নীরবতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। ঘরে-ঘরে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে—দিনের শেষে সকলে শান্তির কোলে মাথা গুঁজিয়া বিরাম পাইয়াছে।

অতীতের কথা মনে পড়িল। সারাদিন ক্ষেত-খামার দেখা-শুনার পর গৃহে ফিরিতাম—প্রদীপের আলোয় আলো-করা ছোট্ট ঘর —স্ত্রীর আদরে, মেয়ের আব্দারে সে ঘর উজ্জ্বল। সে ঘরে ঢুকিয়া দিনের

সব ক্লান্তি নিমেষে ভুলিয়া যাইতাম। সে কি সুখ—কি আরাম! কোন্ পাপে আমার সে ঘর—সে আশ্রয় কর্পূরের মত আজ উবিয়া গেল! গেল যদি তো এ-মেয়েটা কেন আটকাইয়া রহিল? এ যে শিকলের মত আমাকে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। না, এ শিকল কাটিতে হইবে—কাটিব। না কাটিতে পারি, এই শিকল গলায় বাঁধিয়া সব শেষ করিয়া দিব!

কুলিরা চলিয়া গিয়াছিল—রাত্রি তখন গভীর। বোটের উপর জীবনের কোলাহলটুকু নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। দুলালীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। মৃদু ঢেউ তটের কোলে আছড়াইয়া পড়িতেছে—সে যেন মুমূর্ষুর কাতর বিলাপের মতই করুণ, বেদনাময়! সে সুর আমাকে ডাকিতেছিল। প্রাণ আমার নাচিয়া উঠিল। কোমরভোর জল ছাড়িয়া আর-একটু অগ্রসর হইলাম। দুলালী ডাকিল,—বাবা—

আমি কহিলাম,—চুপ! ডুব দে। সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

দুলালী ডুব দিল না; কাঁদিয়া আবার ডাকিল,—বাবা—

আবার অমন করিয়া ডাকে! আমার রাগ ধরিল। তাহার ঘাড়টা টিপিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিলাম—বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম! একটা পৈশাচিক বাসনা মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—সে গর্জ্জন আমি স্পষ্ট কানে শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় খুন চাপিয়াছিল।

দুলালী প্রাণপণে যুঝিতেছিল। তাহার মরিবার ইচ্ছা নাই,—সে মরিবে না!

নিতান্ত অবুঝ হতভাগা মেয়ে! এত দুঃখেও তাহার বাঁচিবার সাধ! শেষে তাহারই জয় হইল। বোধ হয়, বাপের স্নেহ-দুর্ব্বল হাত মুহূর্ত্তের জন্য কেমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল! সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। আমি হারিলাম। তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জল খাইয়া উঠিয়া কাশিয়া সে ডাকিল,—বাবা, ও বাবা—মরে যাবো, আমি মরে যাবো গো!

আমি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলাম,—এত কষ্টেও তোর বাঁচবার সাধ হয়?

—আমি মরতে পারবো না, বাবা। দুলালী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কান্নায় আমার রাক্ষসের প্রাণ নিমেষের জন্য গলিয়া গেল। কিন্তু তখনই ভাবিলাম, না, এ মায়া ভালো নয়! দুলালীকে মরিতে হইবে—মরা ছাড়া উপায় নাই! সারা পৃথিবীর উপর রাগ ধরিয়াছিল!

মাথার উপর অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—আমি তীব্র নক্ষত্রগুলার পানে চাহিলাম। মনে হইল, মেয়েকে মারিয়া, নিজে মরিয়া দুনিয়ার এই এত-বড় শয়তানীর এতখানি নির্ম্মমতার চূড়ান্ত শোধ গ্রহণ করি—উহারা তাহার সাক্ষ্য থাকুক!

অনেক চেষ্টা করিয়া দুলালীকে ডুবাইতে পারিলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে সে জীবনের জন্য সংগ্রাম করিতেছে! মনে হইল, তাহাকে তুলিয়া ঐ শানের সিঁড়িতে আছড়াইয়া ফেলি!

দুলালীকে কোলে তুলিলাম। সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া—মাগো—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও কি! কাহাকে ডাকে? আমার হাত-পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহাকে আছাড় দিতে হাত আর উঠিল না। দুলালী আবার ডাকিল,—ও বাবা, আমায় মেরে ফেলো না গো, আমি মরতে পারবো না।

হায়রে অবোধ,—সে-কি অধীর আগ্রহে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমাকে সে চাপিয়া ধরিল। আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তাহার মুখে অজস্র চুমা দিয়া আমি কহিলাম,—না মা, মরতে হবে না। আয়, দুজনেই বেঁচে থাকি—যে-টুকু কষ্ট বাকী আছে, নিঃশেষে আয় তা ভোগ করি!

দুলালীকে লইয়া ঘাটে উঠিলাম। মরা হইল না। সে ক্ষণ কেন হারাইলাম! একটি ক্ষণ—না হারাইলে এ মনস্তাপ আজ সহিতে হইত না! জেলে বাস ঘটিত না!

উমেশ চুপ করিল। আমি কহিলাম,—চুপ করো, উমেশ। আর আমি শুনতে চাই না।

উমেশ কহিল,—না বাবু, আর একটু শুনুন—দয়া করে শুনুন—আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে!

আমি কহিলাম,—আচ্ছা, বলো।

উমেশ বলিতে লাগিল,—সে রাত্রি ঘাটের চাতালে পড়িয়া রহিলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি, দুলালীর চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হইয়া হইয়াছে—গা আগুনের মত গরম। প্রবল জ্বর।

সেদিন বুঝি কি-একটা যোগ ছিল। ভোর হইতে না হইতে ঘাটে খুব ভিড় দেখা গেল। ঘোমটায় মুখ-ঢাকা কচি বৌ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেহই আর ঘরে নিশ্চিন্ত ছিল না—সকলেই স্নান সারিয়া পুণ্য সারিয়া হাসিয়া হাসাইয়া আসিল,—চলিয়া গেল। দুই-চারিজন চালটা-আলুটা বিতরণ করিতে কার্পণ্য করিল না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। আমার ভাগ্যেও কিছু চাল ও তরকারী মিলিল। কিন্তু তা লইয়া কি করিব? কাঁচা চাল মানুষ কত চিবাইবে? কাঁচা আনাজ-তরকারীও কিছু খাওয়া যায় না।

মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। বেলা তখন আবার পড়িয়া আসিয়াছে, এক বোটের মাঝির কাছে গিয়া চালগুলা তাহাকে ঢালিয়া দিলাম, বলিলাম,—ভাই, চালগুলো নাও, নিয়ে এই আলু ক'টা আমায় পুড়িয়ে দাও! আজ দুদিন আহার জোটে নি।

মাঝি বাবু নয়, ভদ্র নয়—তাই সে অত জামিন-জানান সন্ধান করিল না—হিতোপদেশ দিল না; তাহার দয়া হইল। সে বলিল,—চালগুলো সেদ্ধ করে দেবো? কিন্তু জাতে আমি মুসলমান।

ভাবিলাম, তবে আমার জাত! আগে জান, না, আগে জাত! কিন্তু না, আমার দুলালী! জ্বরের ঘোরে পড়িয়া আছে—দু' দিন তাহার অন্ন জোটে নাই—আর আমি ভাত গিলিব কোন্ মুখে! বলিলাম,—না,—ভাত চাই না, শুধু আলু ক'টা পুড়িয়ে দাও।

সেই পোড়া আলু আনিয়া দুলালীকে ডাকিলাম,—মা—

অতিকষ্টে দুলালী চোখ মেলিল। আমি কহিলাম,—এই নে মা, খা,—

দুলালী আলু-পোড়া খাইল; আমায় বলিল,—তুমি একটা খাও, বাবা।

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পোড়া আলু মুখে দিলাম। সে যেন অমৃত!

সন্ধ্যার দিকে দুলালীর জ্বর ছাড়িল; সে কথাবার্তা কহিল। আমার প্রাণ একটু শান্ত হইল। দুলালী বলিল,—বাবা, চলো, বাড়ী যাই। এখানে এমন-করে ঘুরে কি করে বাঁচবো?

সে কথা আমারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ী কোথায় যে ফিরিব! জলের স্রোতে বাড়ীর চিহ্ন অবধি মুছিয়া গিয়াছে! আর ফিরিবই বা কি করিয়া? রেলের ভাড়া চাই—বিনা পয়সায় রেলে কেহ যাইতে দিবে না। সকল পথই আজ আমাদের বন্ধ! এই সহরের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে। না পারি, ঐ পাষাণের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরা ভিন্ন মুক্তির আজ আর-কোন উপায় নাই।

আবার রাত্রি আসিল। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র আসর জমকাইয়া বসিল। তাহারা নীরব নেত্রে যেন আমাদের পানে চাহিয়া আছে! মানুষ কত দুঃখ সহিতে পারে, সহিয়া বাঁচিয়া থাকে, বিদ্রূপ-ভরা চোখে বুঝি তাহারা তাহাই দেখিতেছিল।

তখন বোধ হয় মাঝ-রাত্রি—একটু ঘুম আসিয়াছিল—সহসা একটা দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া উঠিয়া দেখি, দুলালী পাশে নাই! কোথায় সে…দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিলাম—স্থির জল, মৃদু তরঙ্গভঙ্গে গান গাহিতেছে।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঘাটের উপরে যে চাতাল, সেখানে আসিলাম—দেখি, ঘাটের উপর পথে একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তিন-চারিটা লোক ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কহিল,—যাও—

স্তব্ধ আকাশে বাজ্ যেমন হাঁকিয়া যায়, ঠিক তেমনই শব্দ করিয়া গাড়ীখানা ছুটিল! আমার মনে হইল, গাড়ীর মধ্যে কে যেন 'বাবা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল! কাঁদিয়া নীরব হইল। এ কি, এ না আমার দুলালী? দুলালীকে চোরে চুরি করিয়াছে—সে গঙ্গায় যায় নাই!

পাগলের মত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া আমি ছুটিলাম। কিছু হইল না। দুর্ব্বল পা, কি তাহার শক্তি যে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবে! হাঁফাইয়া শেষে একটা মোড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম, আর কেন মায়া! শিকল যদি এমনি করিয়া ছিঁড়িল তো ছিঁড়ুক! সে শিকলের পিছনে ছুটিয়া কি ফল! যাক্—যে-ছোট সম্বলটুকু বাকী ছিল, তার বহুপূর্ব্বেই যাইবার কথা—তাহাকে ফিরিয়া পাইবার কথা নয়! গেল যদি—যাক্।

সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে! আজ কি মুক্তি—কি আরাম! এখন ঐ গঙ্গার কোলে পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিব! প্রাণে অত্যন্ত উল্লাস হইল—হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। সে হাসির শব্দে চারিধার দুলিয়া উঠিল! আমিও সে স্বরে কাঁপিয়া উঠিলাম! তারপর একবার প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম করিয়া লইব ভাবিয়া সেই রাস্তার একধারে শুইয়া চোখ বুজিলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন আমার সেই দেশের ঘরে পরম সুখে শুইয়া আছি, দুলালী আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে,—বাবা—

ধড়মড়িয়া উঠিলাম। একটা মানুষ সত্যই ঠেলা দিয়া ডাকিতেছিল,—এই-যো।

চোখ মুছিয়া চাহিলাম,—সে দুলালী নয়, লাল-পাগড়ী-মাথায় এক পাহারওয়ালা! সে আমায় ঠেলা দিয়া দাঁড় করাইল,—হাতটা আঁটিয়া ধরিয়া গালি দিল, কহিল, আমি পাকা চোর; আমাকে থানায় যাইতে হইবে!

কোন কথা বলিলাম না—তাহার ইঙ্গিতে চলিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর মধ্যে সে আমায় লইয়া আসিল। ছোট ঘর—টেবিল-চেয়ারে সাজানো! একধারে একটা বেঞ্চের উপর গাদাপ্রমাণ বাঁধানো খাতা। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, আর তাহার সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটা লোক

ঘুমাইতেছে। পাহারওয়ালা আমায় দাঁড় করাইয়া তাহাকে ডাকিল,—বাবু—

সে চোখ মেলিয়া চাহিল। পাহারওয়ালা সটান বলিয়া গেল, আমি পথে ঘুরিতেছিলাম। তাহাকে দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করি। সুবা হওয়ায় দৌড়িয়া গিয়া সে আমায় ধরিয়া ফেলে! 'কাজ-কাম' আমার কিছুই নাই!

বাবু খিঁচাইয়া আমায় গালি দিল, আমাদের জ্বালায় একদণ্ড তাহার চোখ বুজিবার অবসর মিলিবে না? প্রকাণ্ড খাতা টানিয়া কি-সব লিখিয়া বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার ঘর-বাড়ী কোথায়? কাজ-কর্ম্ম কিছু করি কি না?

আমি বলিলাম, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় সহরে আসিয়াছিলাম—তার পর যাহা ঘটিয়াছে, সব খুলিয়া বলিলাম। বাবুটি পাহাওয়ালাকে কহিল,—ঘাটে নিয়ে যা একে। তদন্ত করে আয়।

পাহারওয়ালা বিরক্ত চিত্তে আমাকে লইয়া বাহিরে আসিল, একটা দড়ি বাঁধিয়া পথে আমায় খানিকটা ঘুরাইয়া এক পানওয়ালীকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাহাকে দিয়া পাণ সাজাইয়া খাইয়া বিড়ি টানিয়া গল্প করিয়া আবার থানায় ফিরিল, ঘাটে গেল না।

তারপর আদালতে যথাসময়ে আমায় চালান দেওয়া হইল। সেখানে পাহারওয়ালাটা একটা কাঠের পিঁজরায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিল, যে আমার কাজ-কর্ম্ম কিছু নাই। অনেক রাত্রে পথে ঘুরিতেছিলাম—তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে সে আমায় ধরিয়া ফেলে! তার পর আমারই কথামত দুই-চারি জায়গায় ঘুরিয়া সে তত্ত্ব লয়—সকলে বলে, আমাকে চেনে না!

হাকিম জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে? তোর কাজ-কাম কিছু আছে?

ভাবিয়াছিলাম, কথা কহিব না—কিন্তু কহিতে হইল। এতক্ষণ হাজতে বসিয়া চোর-ডাকাতের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার জেল হইবে! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম—কি দোষ করিয়াছি যে, জেলে যাইব? খাইতে পাই না—ঘর নাই, আশ্রয় নাই। ভগবান নিষ্ঠুর বাজ ফেলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন, তাই মেয়েকে লইয়া পয়সা-উপার্জ্জনের চেষ্টায় সহরে আসিয়াছিলাম—সে পয়সাও গতর খাটাইয়া উপার্জ্জন করিব! সহরে ডাকিয়া কেহ একদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কোথা হইতে আসিলাম—কি চাই? চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া কেবল কটু কথা ও হিতোপদেশ শুনিয়া আসিয়াছি—তাহাতে কি এমন অপরাধ করিলাম যে, জেলে যাইব! হাকিমকে কহিলাম,—চাকরি নেই, হুজুর—তাই তার চেষ্টায় সহরে এসেছি! এসে কিছুই মেলে নি, একমুঠো অন্ন অবধি না! মেয়েটাকে শেষে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে!

হাকিমের মুখের ভাবে বোধ হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। হারে অভাগা—ভগবান যাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে, এমন আশা তুই এখনও করিস!

হাকিম কাগজে কি-সব লিখিয়া লইয়া আমাকে কহিলেন,—একে জেরা করবি? সাক্ষী দিবি?

জেরা! সাক্ষী! তার অর্থ? কিসের বা সাক্ষী?

আমি একবার চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিলাম। কাঠের পিঁজরার মধ্যে একটা দর্শনীয় পশুর মত দাঁড়াইয়াছিলাম। এক-আদালত লোক আমার পানে চাহিয়া—আমি মাথা নীচু করিলাম। হাকিম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—জেরা করবি?

আবার সেই উদ্ভট শব্দ। যে কথার অর্থ বুঝি না—তাহার কি করিব? বেকুবের মত আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাকিম হুঙ্কার তুলিলেন,—একে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাস্?

আমি ঘাড় নাড়িলাম—না। এমন করিয়া মিথ্যা যে সাজাইয়া বলিতে পারে, তাহাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? যাহার দিকে চাহিতে ঘৃণা করে—তাহার সহিত কথা কহিব?

হাকিম হুকুম দিলেন,—সে যেন গানের বাঁধা গতের মত এক-নিশ্বাসে তিনি বলিয়া গেলেন,—ছ' মাসের জন্য পঞ্চাশ টাকা জামিন, না দিলে ছ'মাস জেল।

ছোট ছেলেরা সাদা কাগজে যেমন কালির দাগ টানিয়া নিমেষে শুভ্র কাগজখানাকে কালো করিয়া দেয়, হাকিমের কলমের আঁচড় আমার ললাটে তেমনি করিয়া খানিকটা কালি লেপিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় আঁটা গাড়ীতে চড়িয়া অসংখ্য চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গী হইয়া আমি জেলে আসিলাম।

জেলে বসিয়া মৃত্যুর কথা কেবলই মনে হইত। এক এক সময় ভাবিতাম, মাথায় মুগুর মারিয়া, না হয় প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া সব শেষ করিয়া দি। কিন্তু একটা সাধ মনের মধ্যে উঁকি দিয়া আমায় মরিতে দিত না। সে সাধ—একবার শোধ তুলিব। যাহার মিথ্যা কথায় রিক্ত সকল-হারা হইয়াও স্বাধীন আমি এই-সব বদমায়েসের দলে পড়িয়া জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছি, আমার শুভ্র জীবনে ছয়মাস ধরিয়া কেবল কলঙ্কের কালো কালি মাখাইয়াছি,—সেই পাষণ্ডের সেই মিথ্যার একবার চূড়ান্ত শাস্তি দিব। জেলের সঙ্গীরা আমায় টিট্‌কারি দিত, আমি বোকা—মিছা জেল খাটিতেছি! ইহাতে মজা নাই, কেবল সাজা আছে। চুরি করিয়া, লোককে

মারিয়া-ধরিয়া জেলে আসিলে তাকেই বলে, জেল! নহিলে এ শুধু অদৃষ্টের ভোগ। তাহারা বেশ স্ফূর্তির স্বরে বলিত, যাহার উদরে অন্ন নাই, জেল তো তাহার কাশীর অন্নসত্র! কথাটা নেহাৎ মন্দ শুনাইত না।

ছয়মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই—সেই পথের কথা প্রথমে মনে পড়িল। জোর করিয়া মৃণালীকে ভুলিলাম—স্ত্রীকে ভুলিলাম—নিজের অতীত ভুলিলাম! সে সব কথা মনে পড়িলে মন দুর্ব্বল হয়, সমস্ত শক্তি উবিয়া যায়!

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর সেই পাহারওয়ালাকে দেখিলাম—সেই মোটা শরীর—বিপুল গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন বিশ্রী মুখ! সে সেই পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করিতেছিল। দেখিয়া আমার প্রাণে দৈত্য নাচিয়া উঠিল। বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলাম! দাড়ি ধরিয়া সবলে টানিয়া তাহাকে ভূমে ফেলিলাম—তার পর অজস্র কিল-চড় লাথিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলাম। আমার জ্ঞান ছিল না —চোখের সম্মুখে মহা কালী লোল রসনা-মেলিয়া নৃত্য করিতেছিল—করালিনী কালীকে সেদিন যেন আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। নৃমুণ্ড-মালিনীর সে কি ভীষণ নৃত্য! চকিতে সে দৃশ্য সরিয়া গেল—চোখের সম্মুখে রক্তের নদী বহিল।

বিস্তর লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল—পাহারওয়ালা তখন রক্তে স্নান করিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

তার পর আবার সেই আদালতে হাকিম, উকিল ও পেয়াদার ভিড়ের মধ্যে হাজির হইলাম। পাহারওয়ালাটা কোনমতে প্রাণে রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহার সে ভাঙ্গা নাক আর খাড়া হইল না।

আমার দুই বৎসর জেলের হুকুম হইল। স্থির হইয়াই সে শাস্তির আদেশ শুনিলাম। যখন ডক্ হইতে আমায় লইয়া গেল, তখন সে পাহারওয়ালা একদিকে দাঁড়াইয়াছিল—ভাঙ্গা নাক—কাটা কপাল—ফাটা মাথা —মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া আমি হাজতে আসিলাম। মনে আনন্দ হইল—জয়ের আনন্দ! সেবার বিনা-দোষে জেলে ঢকিয়াছিলাম! এবার মনে ক্ষোভ রহিল না, দোষ করিয়া জেলে চলিয়াছি।

উমেশ স্থির হইল। সে ফুঁশিতেছিল। চোখ দুটা জ্বলিতেছিল। সে আরও-কিছু বলিবে মনে হইতেছিল—একটু যেন জিরাইয়া লইতেছে! এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ কহিল,—বাবু—

আমি কহিলাম,—বেলা হয়ে যাচ্ছে উমেশ, এখ্নি আবার বেরুতে হবে—। কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে দুপুরবেলা এসে বাকিটুকু শুনবো'খন।

উমেশ কোন কথা কহিল না, আমার পানে চাহিয়া রহিল,—উদাস, করুণ দৃষ্টি!

মুক্তি

সেদিন রবিবার। ভোর হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ার দৌরাত্ম্যও অতিরিক্ত বাড়িয়াছিল। দোতলার বৈঠকখানার সার্শি প্রভৃতি রীতিমত আঁটিয়া সিগারেটের ধোঁয়ার সহিত বাঙলা মাসিক পত্রের প্রবন্ধের গবেষণাপূর্ণ ভাবগুলা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কলিকাতার রাস্তাগুলি ছোটখাট নদীর মত হইয়া উঠিয়াছে! দুই-একটা দুরন্ত পল্লী-বালক কলার ভেলা জলে ভাসাইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে সাঁতার কাটিতেছিল; তাহাদের সন্তরণের শব্দ ও উচ্চকণ্ঠের কলরোল মধ্যে মধ্যে আর্দ্র বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল।

এমন সময়ে বেহারী আসিয়া কহিল,—একটি বাবু এসেচেন।

এই বর্ষায় বাবু! কোনো দুরদৃষ্ট মক্কেল ছাড়া আর কে!

—উপরে নিয়ে আয়—বলিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলাম, এবং ফ্লানেল সার্টের বোতামগুলি আঁটিয়া গলাবন্ধে গলাটা একটু জড়াইয়া অতিথির জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিল। আরে, এ যে প্রিয়বন্ধু সতীশ! আমি সোৎসাহে চেয়ারখানা ঠেলিয়া দুই হাত সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি হে, সতীশ যে! কবে এলে আগ্রা থেকে?

সতীশ আগ্রায় ডাক্তারি করে।

—চার-পাঁচদিন হলো।

—তা এত বৃষ্টিতে কষ্ট করে এলে কেন? আর কি সময় ছিল না?

—না ভাই, বেশীদিন থাকতে পারব না! বিশেষ দরকারে পড়েই আসতে হয়েছে—আবার পরশু বোধ হয় যেতে হবে! এ ক'দিন আসতেই পারিনি; আবার যাবার সময় একবার শ্রীরামপুর হয়ে যেতে হবে।—

শ্রীরামপুরে সতীশের শ্বশুরালয়।

—ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—আগ্রায়।

তার পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আশৈশব বন্ধু-যুগলের সে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া কাহারও বিরক্তি-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না।

সে আজ প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। সতীশের পিতা তখন হুগলীর সবজজ ছিলেন; সতীশরা আমাদের প্রতিবাসী ছিল। পরস্পরের ছাড়াছাড়ির পর সতীশের সঙ্গে আমার কংগ্রেস-মণ্ডপে যা দু'-একবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে।

অনেক কথাবার্ত্তা ও কুশল প্রশ্নাদির পর সতীশ কহিল,—কাব্যচর্চ্চা চলছে কেমন?

সতীশ লোকটা কবি! সাহিত্য-সমাজে তাহার প্রতিপত্তি নিতান্ত অল্প নয়।

আমি কহিলাম,—মোটে নয়!

বিস্ফারিত নয়নে সতীশ কহিল—বলো কি হে?

আমি কহিলাম,—হাঁ গুরুদেব! সে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েচি!

সতীশ কহিল,—হঠাৎ?

আমি কহিলাম,—তেমন হঠাৎ নয় হে ভায়া। গূঢ় কারণ আছে!

—কি, বলেই ফ্যালো না।

সিগারেটের টিনটা সতীশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া আমি কহিলাম,—তবে শোনো—

যখন সতীশ ও আমি এন্‌ট্রান্স ক্লাসে পড়ি, প্রায়ই তখন Literaty Associationএ সতীশ স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলের নিকট বাহবা পাইত। সেই সময় ব্যগ্র কৌতূহলে একদিন সতীশকে বলিলাম,—আমাকে কবিতা লিখতে শেখাবে? সতীশ হাসিয়া বলিয়াছিল, —একটু ভাবতে শেখো, আপনিই লিখতে পারবে! ঐ দেখ চাঁদ, ঐ দেখ গঙ্গার ঢেউ, ঐ দেখ মেঘের ছুটোছুটি! একটু ভাবো। দেখবে, ও-সকলে কত কবিত্ব!

আমি গদ্‌গদ্ ভাবে ভক্ত শিষ্যের মত সতীশের কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট! সমস্ত চাঁদখানা নিংড়াইয়া সেই ছেলেবেলার কাপাশে বুড়ীর গল্প ছাড়া আর কোন ভাব পাইলাম না; নিরাশচিত্তে ভাবিলাম, আমার Brainটা কি dry!

লোকে বলে, যত্ন করিলে রত্ন মেলে! চেষ্টায় আজ অসভ্য জাপান সভ্যতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছে; এবং চেষ্টার বলেই নাকি বণিকের জাতি ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনার অমোঘ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে! দুর্ল্লভ-তপস্যানুগতা কবিতা-দেবীও দীর্ঘকাল আমার কালি-কলমের অত্যাচার নীরবে সহিতে পারিলেন না; তাঁহাকে দর্শন দিতে হইল!

যেদিন ভাল বাঁধানো খাতায় সযত্নে ও বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম,—

হে প্রতাপ ভারতের বীরচূড়ামণি,
অদ্ভুত বীরত্ব তব কেমনে বাখানি।

সেইদিন হইতে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোথা হইতে একটা গুরুত্ব আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল। সতীশ কবিতা দেখিয়া কহিল—বাঃ, এই যে কিছু কিছু ভাবতে শিখেচো! বুঝলে ভাই, Poetry লেখার প্রধান mystery হচ্ছে thoughtfulness, ভাবুকতা, তন্ময়তা!

আমি বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া কহিলাম,—সে কথা খুব বুঝি—আমাকে আর কি বোঝাবে ভাই?

তাহার পর দ্রুত

হে ঈশ্বর, অব্যক্ত অচিন্ত্য,
ধরণী না রহিলে কে তোমাকে জান্ত?
... ...
ওগো নদী, কোথা যাও কুলুকুলু বেয়ে?
কাহার উদ্দেশে, কহ, কোন্ গান গেয়ে?
... ...
ওগো সুন্দরী নীলবসনা,
শিথিল কবরী, কুন্দ ঝরিছে,
কি করিছ, অয়ি শোভনা।

প্রভৃতি রাশি রাশি কবিতা আমার মগজ হইতে বাহির হইয়া খাতার পৃষ্ঠায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন আমাকে বাধা দেয়, কার সাধ্য? গিরিদেহ ভেদ করিয়া একবার যখন স্রোতস্বতী ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন কে তাহার গতিরোধ করে? আমার কবিতা-প্রবাহিণীতে প্রকৃতই বান ডাকিয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া ভাঁটা পড়িল, তাহাই এখন বলিতে বসিয়াছি।

সতীশ সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—বলো, আমি খুব মন দিয়ে শুন্‌ছি।

আমি বলিতে লাগিলাম—

এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া তুমি লাহোর চলিয়া গেলে, আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়িব বলিয়া কলিকাতায় আসিলাম। হোষ্টেলে না থাকিয়া বেনেটোলার একটা কক্ষ অধিকার করিলাম, এ সকল সংবাদ নূতন করিয়া আর কি দিব? তুমি সমস্তই জানো।

এফ্-এ ক্লাশটায় আমার প্রতিভা তেমন স্ফূর্ত্তি পাইল না। নূতন কলিকাতায় যাইয়া মিটিং এ্যাটেণ্ড করিয়া ও থিয়েটার দেখিয়া কাব্যচর্চ্চার বড় একটা অবকাশ মিলিত না; সেই জন্য এফ্-এ পরীক্ষার ফলটা কিছু ভালো হইয়াছিল। পরে যখন বি-এ পড়িতে লাগিলাম এবং কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটু অভ্যস্ত হইয়া পড়িলাম, সহরের মত্ততা ও ব্যস্ত ভাব অবসাদের তুফান তুলিয়া আমাকে আকুল করিল, তখন আবার আমার সেই মরক্কো-বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি খুলিয়া কাব্যচর্চ্চায় মন দিলাম। মেসের সকল ছাত্রই এই আকস্মিক প্লাবনে অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই মেসে আমার পাশের ঘরেই গোপাল নামে একটি নিরীহ ছাত্র বাস করিত। সে রিপন কলেজে পড়িত। বেচারীর বাড়ী বারাশতে। আমার কবিতা-প্লাবন তাহাকেও কিঞ্চিৎ বিহ্বল করিয়াছিল—সে কেমন তন্ময় হইয়া আমার কবিতা পাঠ করিত, এবং প্রশংসমান নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া কহিত,—মন্মথ, এটার বড় excellent ভাব। কিন্তু সত্যনাথ নামক একটি ছাত্র তাহা শুনিয়া নিতান্ত অধীরভাবে বলিয়া উঠিত,—ভাব বলে ভাব! একেবারে যাদু ব'নে যেতে হয়। এ ভাব যখন জমাট বাঁধবে, তখন মাইকেল রবি যে কোথায় ভেসে যাবে, তার ঠিকানা নেই!

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া রাস্কেলের মৃত্যু কামনা করিতাম, এবং সেই অবসরে গোপালের সঙ্গে সত্যনাথের একটা ছোট-খাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। সত্যনাথ দূর সম্পর্কে বড়-বৌদির কি রকম ভাই হইত, সুতরাং আমি তাহার তীব্র মন্তব্যগুলি নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিতাম।

শুধু এইটুকু করিয়া যদি ক্ষান্ত থাকিতাম, তাহা হইলে বুঝি পরে আর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু আমি মাত্রা ছাড়াইয়া চলিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ও মেরি করেলি হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যোপন্যাসিক পরাণচন্দ্রের পুস্তক পর্য্যন্ত সবই আমি ক্রয় করিতে লাগিলাম। পাঠ্য পুস্তকগুলাকে নিতান্ত তাচ্ছল্য করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিতাম।

উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমি "প্রেমিকা" নামে একখানা নাতিবৃহৎ কাব্য লিখিয়া ফেলিলাম। গোপাল তাহা পড়িয়া বই হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল,—ওঃ, it is second বিদ্যাপতি! সত্যনাথ কিন্তু দু'পাত উল্টাইয়া কহিল,—

চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা-জলে।

আমি মনে মনে সত্যনাথের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া কম্পিত ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম—ষ্টুপিড্ রাস্কেল, তুমি যদি কখনও আমার লেখা পড়ো তো তোমার অতি বড় দিব্য আছে।

গোপাল আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,—সত্যর মত হিংসুটে যদি দুটি থাকে! সত্যনাথ কহিল,—তা বলে তোমার মত খোসামুদি করে আমি কারও মাথা খেতে পারি না।

যাক্—এটা তুমি বেশ জানো, উপন্যাসের আর একটা নাম প্রেমের শ্রাদ্ধ! এই এতগুলা প্রেম-কাহিনীর চর্চ্চা করিয়া আমার হৃদয়ে যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা মনে করিয়ো না। একে রোমান্সের কবি, তার

উপর এই সকল রাশীকৃত উপন্যাসের পুঞ্জীভূত প্রেম ভীষণ রুখিয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। আমি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতাম, কখন আমার এই স্কন্ধদেশ-পরিব্যাপ্ত সুরক্ষিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে পরিশোভিত কবি-জনোচিত মাধুর্য্য-পূর্ণ মুখখানির উপর কোন কিশোরী তাহার কজ্জলকৃষ্ণ নয়নের একটা কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ জখম করিয়া ফেলে! এ জগতে তরুণ কবিকে অনেক সামলাইয়া চলিতে হয়।

এই স্থানে চুরোটিকার ক্ষুদ্র জীবন ভস্ম হওয়ায় একটি নবীন চুরোটিকা গ্রহণ করিতে হইল।

সতীশ ব্যগ্রভাবে কহিল,—তার পর?

আমিও চুরোটিকাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া একটি দীর্ঘ 'আকর্ষণে'র পর কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া কহিলাম,—তার পর আর কি। এক দিন রবিবাবুর সেই—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?

গানটার অর্থ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

আমাদের মেশের সম্মুখে একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল। তাহার অধিকারী নন্দবাবু হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটী হইতে একটি সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস আমাদের মেশস্থ ছাত্রগণের পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইল। আমার কক্ষ হইতে নন্দবাবুর দ্বিতলের হল-ঘর বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। গোপাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে কহিল,—মনু শুনচো? কে গাইছে ভাই, দিব্যি গলা!

আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কহিলাম,—ঐ যে একটি মেয়ে গান গাচ্ছে।

বালিকা তখন গাহিতেছিল,—

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে
তবে তো ফুল বিকাশে।

গান শুনিয়া নন্দবাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমার এক সহপাঠীর নিকট নন্দবাবুর পুত্র শরৎকুমারের নাম শুনিয়াছিলাম; শরৎ মেডিকেল কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। তাঁহার সহিত আলাপের বেশ একটা সুযোগ ঘটিল। এক দিন ফুটবলের ম্যাচ দেখিব বলিয়া মেশ হইতে বাহির হইয়া দেখি, শরৎকুমারও ম্যাচ দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। অযাচিতভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম,—কোন্ কোন্ প্লেয়ার ভালো খেলে, কোন্ দলের জিতিবার সম্ভাবনা—প্রভৃতি। অল্পকালের আলাপে শরতের সহিত বেশ একটু সৌহার্দ্দ্য জন্মাইল। একদিন সন্ধ্যার সময় গোল-দীঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে শরৎকে আমি কহিলাম,—আপনাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে গান হয়, শুন্‌তে পাই। আপনি কি গাইতে পারেন?

শরৎ কহিল,—ও! আপনি গানের কথা বল্‌চেন! ও লীলা গায়, আমার ছোট বোন্। হ্যাঁ, নেহাৎ মন্দ গায় না!

আমি কহিলাম,—মন্দ কি? বেশ সুন্দর গায়। আমি পড়াশুনা ছেড়ে গান শুন্‌তে বসে যাই!

শরৎ কহিল,—সে গান আপনার এত ভালো লাগে! বেশ, কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী আপনার নিমন্ত্রণ রইলো। গান শুন্‌তে যাবেন, আর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে ঐখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন।

কিরূপ পুলক-কম্পিত স্বরে শরৎকুমারকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ!

শরৎ হারমোনিয়মে সুর প্রদান করিয়া লীলাকে কহিল,—লীলা, রবিবাবুর সেই গানটা গাও!

লীলা প্রথমে একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইল। আমি কহিলাম,—গাও না! লজ্জা কি?

এই কয়টি কথা বলিতে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে লীলা আমার কথায় একটুও মনোযোগ না করিয়া গাহিতে লাগিল,—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার!
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।

সেই সরলা বালিকার সরল কণ্ঠোচ্ছ্বাসে যে অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাহাতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। আমার মানস-নয়নের সম্মুখে একটি মাধুরী-মণ্ডিত স্বপ্নপুরী ফুটিয়া উঠিল। জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া, বালিকার অস্তিত্ব ভুলিয়া আমি মনে করিলাম, কোথায় কোন্ সুখময় নিভৃত কোণে একটি প্রণয়িনী নায়িকা তাহার সুন্দর হৃদয়রঞ্জন নায়কের উদ্দেশে প্রাণের অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্ছ্বাস নিবেদন করিতেছে! অনেক-গুলি গান হইল বটে, কিন্তু সেই হৃদয়-রঞ্জনের বন্দনাগীতির অপূর্ব্ব বীণাস্বর মোহের তুফানে আমাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট রাখিল।

মন্ত্র-চালিতের মত মেশে ফিরিলাম। সে রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া বার বার বালিকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। বেশ মেয়েটি! যেমন সুন্দরী, তেমন গুণবতী! আহা, লীলার সহিত যদি আমার বিবাহ হয়! আমার মনে হইল, তাহা হইলে বুঝি, আমি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হই এবং আমার এই মরক্কো-বাঁধা কবিতার খাতাখানি সমস্ত কবিতা-সমেত লীলার অঙ্গুলি-হেলনে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি।

মনে করিলাম, সকালে গোপালকে ডাকিয়া স্পষ্ট

বলিব, আমি লীলাকে ভালোবাসি; তাহারা আমাদের পাল্টা ঘর, বিবাহে বাধা নাই; কোন রকমে যোগাড় করিয়া তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটাইয়া দাও। কিন্তু সকালে গোপাল যখন আমার ঘরে চা পান করিতে আসিল, তখন তাহাকে দেখিয়া ভাবিলাম, ছি, ছি, এ কথাগুলো একে বল্লে এখনই আমাকে পাগল মনে করে হেসে উড়িয়ে দেবে। আট বৎসরের মেয়ে লীলা, তাকে দেখে একজন কবির প্রেম! মেসশুদ্ধ একটা কেলেঙ্কারী হয়ে পড়েছিল আর কি! ছি, ছি, সে যে লজ্জার কথা!

ইহার দুই একদিন পরে ষ্টার থিয়েটারে সকলে মিলিয়া মলিনা-বিকাশ ও বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয় দেখিতে গেলাম। পরদিন অভিনয়ের সমালোচনা হইতেছে, এমন সময় সত্যনাথ কহিল,—ওর ভেতর বিবাহ-বিভ্রাটটা খুব ভাল, মলিনা-বিকাশটা স্রেফ্ গাঁজাখুরি! খালি প্রেম, প্রেম! জ্বালাতন করে মেরেছিল!

আমি কহিলাম,—কি! প্রেম গাঁজাখুরি হলো! এমন না হলে বিছে।

সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—গাঁজাখুরি নয়তো কি দাদা? It is the production of an idle brain—কৈ, এ পর্য্যন্ত কাকেও প্রেমে পড়তে দেখ্‌লুম না তো!

আমি কহিলাম,—কবিদের কথাগুলো তবে সব উড়িয়ে দিতে চাও? কালিদাস, সেক্সপিয়র, বঙ্কিমবাবু এঁরা প্রেম নিয়ে এত মাথা ঘামালেন—

এই সময় আমার মুখের কথা লুফিয়া গোপাল বলিয়া উঠিল—সে সব হলো গাঁজাখুরি, আর আমাদের সত্যনাথ বাবু যা বল্লেন, তাই ধ্রুব সত্য!

আমি গদগদ স্বরে কহিলাম,—প্রেম মিথ্যা! আহা, যদি জগতে কিছু সত্য থাকে তো সে প্রেম।

সত্যনাথ আবার হাসিতে হাসিতে কহিল,—কি হে ভায়া, অত রাগ কেন? কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?

আমি মুখ বিকৃত করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম,—যাও, যাও, তোমার সকল কথায় তামাসা ভালো লাগে না।

বাস্তবিক, প্রেমের মহিমায় আমি কেমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম!

মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ হউক বা যে কারণে হউক, যে-গোপাল আমাকে উচ্চমঞ্চে চড়াইয়া প্রশংসাকুল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমি সেই উচ্চ মঞ্চে বসিয়া সেই নিরীহ বেচারির কর্ণমর্দ্দন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতাম না। বাস্তবিক ইদানীং আমি গোপালের উপর যথেষ্ট উপদ্রব করিতাম। এক দিন সন্ধ্যার সময় সামান্য একটা তামাসায় গোপালের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল। হতভাগা গোপাল, যাহাকে আমি প্রথম ভাগের গোপালের মত সুবোধ ও শান্ত মনে করিতাম, সেই কি না বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া সত্যনাথকে সব বলিয়া দিল! এই জন্যই কথায় বলে, ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিমর্ষভাবে আপনার কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় সত্যনাথ আমার কক্ষে প্রবেশ করিল; সত্যনাথ কহিল,—হ্যাঁরে মনু, এ কি শুনছি? আমি বিরক্তভাবে কহিলাম,—কি আবার? সত্যনাথ কহিল,—শুনচি, তুই নাকি প্রেমে পড়ে গেছিস্? আমি উদ্ধতভাবে কহিলাম,—মিথ্যা কথা। কে বললে? সত্যনাথ কহিল,—গোপাল বললে! তুই নাকি তাকে সব কথা বলেছিস্!

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম,—পাজি, শুয়ার মিথ্যা কথা বলেছে।

সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—আমিও তাই বলি! দেখিস্ ভাই, হুঁশিয়ার! সামনে এগ্‌জামিন—প্রেমে পড়তে হয়তো এক্‌জামিনের পর পড়িস্, এখন নয়।

আমি কহিলাম,—ছাখো সত্যনাথ, আমার সম্বন্ধে তোমার অত মাথা ব্যথা করা আমার বড় খারাপ লাগে। কেন তুমি আমাকে জ্বালাতন করো?

সত্যনাথ গম্ভীরস্বরে কহিল,—কারণ তোমাদের সঙ্গে আমার একটু সম্পর্ক আছে;—আমি প্রকৃত তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমি উত্তেজিত স্বরে কহিলাম,—You are too impertinent তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক স্বীকার করি না।

সত্যনাথ ধীরে ধীরে আমার কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেবার পূজার ছুটিতে বাড়ী গেলাম না; দাদাকে লিখিলাম, বাড়ীতে নানা গোলমালে পড়ার ক্ষতি হইতে পারে, এখানে পড়াশুনা নির্ব্বিঘ্নে চলিবে বলিয়া আশা হয়—ইত্যাদি। দাদা লিখিলেন,—যাহা ভালো বুঝিবে তাই করিয়ো।

বিজয়ার দিন আমি কতকগুলো সেন্ট্ সাবান আর একখানি রবিবাবুর গানের বহি লইয়া শরৎদের বাড়ী চলিলাম। শরতের সহিত দেখা করিয়া এসেন্সের বাক্সটা দিয়া কহিলাম,—ভাই পূজার উপহার। শরৎ হাসিয়া কহিল,—এ আবার কি পাগলামি! এ-সব কেন?

আমি কহিলাম,—পূজার দিনে আত্মীয়-বন্ধুকে উপহার দিতে হয়। পরে কহিলাম,—লীলা কোথায়? শরৎ কহিল,—কেন? ওগুলো দেখি!—সাবানের বাক্সের গায় ও বইখানার উপর লেখা ছিল, "শ্রীমতী লীলার জন্য

পূজার উপহার।" শরৎ কহিল, লীলাকে আবার এ-সব দেওয়া কেন?

সত্যই তো, শরৎকে উপহার দিবার অধিকার আছে, কিন্তু লীলাকে এ সব কেন? ইহার কি সদুত্তর দেওয়া যায়? সত্য কথাটা বলিব? ছি!

সহসা একটা উত্তর যোগাইল। তাড়াতাড়ি কহিলাম,—সে বেশ গান গাইতে পারে কিনা, তাই তার appreciation করে তাকে পুরস্কার দেওয়া যাচ্ছে--এক বাক্স দেশী সাবান আর একখানা রবিবাবুর গানের বই!

এমন সময় লীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লীলা কহিল,—বড়দা, বাবা তোমাকে ওপরে ডাকছেন—আমাদের ভাসান দেখতে নিয়ে যেতে হবে।

—ওরে লীলা, তোর জন্যে কি প্রাইজ্ এসেছে দেখ্—বলিয়া শরৎ উপরে চলিয়া গেল।

আমি তখন লীলার হস্তে উপহার দ্রব্য দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলাম,—লীলা, এগুলি তোমার!

লীলা প্রফুল্ল ভাবে কহিল,—বাঃ, এ বেশ তো! এ বুঝি দিশী সাবান? বেশ গন্ধ—না মনুবাবু?

আমি কহিলাম,—হাঁ!

অল্পক্ষণ পরে লীলা কহিল,—কিন্তু মনুবাবু, ছোটদা জান্‌তে পারলে আমাকে মেরে ধরে এ সাবান কেড়ে নেবে। সেদিন বড়দা' আমাকে কেমন একটা পুতুল কিনে দিয়েছিল, ছোটদা কেড়ে নিয়েছে। ছোটদা বড় মারে আমাকে।

আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম,—না না, কেড়ে নেবে না, আমি শরৎকে বলে দেবো অখন।

—তাই দেবেন। বলিয়া লীলা তেলের শিশিটা দেখিতে লাগিল।

মৃদু বায়ু কুন্তলগুচ্ছ উড়াইয়া তাহার কপালের উপর ফেলিতেছিল, আমি মুগ্ধভাবে তাহা দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে আবার ডাকিলাম,—লীলা—

—কেন মনুবাবু?

—তুমি আমাকে ভালোবাস?

—হ্যাঁ।

—কত ভালোবাস?—

—খু-উ-ব্!

সরলা বালিকা—এ তো প্রেমিকার কথা নয়। এ কথাটা আমার দিকে অম্লান বদনে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলে! এতটুকু সঙ্কোচ হইল না? প্রেম যে সঙ্কোচময়! হায়! এটা বুঝি তবে উপহার-দানের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ একটা নীরস কর্ত্তব্য-পালন। আমি নাছোড়বান্দা ভাবে আবার কহিলাম,—লীলা, আমি তোমার বিয়ের জন্য খুব ভালো সম্বন্ধ করচি।

—ধ্যেৎ! বলিয়া লীলা ছুটিয়া পলাইল; অবশ্য পলাইবার সময় উপহার দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতে সে ভুল করিল না। হায়, এ জগতে নারী-হৃদয় কি স্বার্থপর!

ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই। "গায়িকা" কাব্যখানা লিখিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল; তাহার ফলে দাঁড়াইল এই যে, সে-বৎসর পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ই equilateral triangleএর তিনটি sideএর মত সমানভাবে ফেল হইয়া বসিলাম! সত্যনাথ ডবল অনার লইয়া পাশ হইল। ফেল হইয়া যখন জানিলাম যে, গোপালটা ফেল হইয়াছে, তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। সে হতভাগা যদি পাশ করিত, তাহা হইলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল আর কি!

দাদা বলিলেন,—আমাদের কেউ কখনও ফেল হয় নি, তুমি প্রথম ফেল হলে।

আমি অবনত মস্তকে কহিলাম,—বি-এটা আজ কাল বড় stiff হয়েছে, পাশ করাটা কেবল chance!

—সেজন্য তুমি ফেল হওনি তোমার ফেল হবার কারণ, তুমি একটুও পড়নি

আমি কিছু বলিলাম না। দাদা আবার বলিলেন,—খালি ছাই ভস্ম লিখলে কি চলে? ও সব পাগলামী যাবে কবে? যদি একটুও লিখ্‌তে পার্‌তে, তাহলেও না হয় কথা ছিল। কবি হওয়া যতটা সহজ ঠাওরাও, তত সহজ নয়।

দাদা আবার বলিতে লাগিলেন,—তোমার উপর অনেকটা বিশ্বাস করেছিলুম, কিন্তু তুমি তেমনি শাস্তি দিয়েছ। বেশ, বড় হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে, যা' ভালো বুঝবে, তাই করো।

দাদা চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে মেজদাদার কথা শুনিলাম। মেজদাদা বলিলেন,—খালি বখামি করবে, তা' পাশ হবে কেমন করে? এতো ছেলে-খেলা নয়! তুমি কড়া করে দুটো কথা বলতে পার্‌লে না? দাদা গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—এত বড় ছেলেকে কি আর বল্‌বো! যার নিজের একটু আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নেই, তাকে বলেই বা ফল কি! মেজদা বলিলেন,—এবার হুগলীতে পড়ুক, অমন ছেলেকে কলিকাতায় পাঠিয়ে আর বিশ্বাস নেই।

এত বড় কথা! একে ফেল হওয়ার অসহ্য দুঃখ, তাহাতে একবিন্দু সান্ত্বনা নাই, কেবল লাঞ্ছনা! আমি বড় ক্ষুব্ধ হইলাম, প্রবল ধিক্কার আসিয়া আমার সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিল; আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে বৌদি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—ছি ভাই ঠাকুরপো, কাঁদতে আছে কি? ফেল কি হয় না? ও সব অদৃষ্ট।

রুদ্ধস্বরে আমি কহিলাম,—না বৌদি, অদৃষ্টের কোন দোষ নেই! আমার নিজের সমস্ত দোষ।

বৌদি অঞ্চল দিয়া আমার অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন,—তোমার দাদা বড় দুঃখ করছিলেন। উনি বলছিলেন, তুমি যে ফেল হবে, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ও সব পাশ-ফেল হওয়া অদেষ্টে করে ভাই। তার জন্য কাঁদে না। ছি! এ বছর হয় নি, আর বছর হবে।

আমি কহিলাম,—না বৌদি, দাদার কাছে কি বলে মুখ দেখাবো। মেজদা কত গাল দিলেন।

বৌদি বলিলেন,—মেজ ঠাকুরপো রাগ করেছে, তার কারণ আছে। তোমাদের মেশের একটা ছেলে বড় দিনের সময় ওকে লিখেছিল যে, তুমি নাকি কোন্ উকিলের মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেচো। তার নামে পদ্য লেখো, সাবান-টাবান কত কি কিনে উপহার দাও, তাদের বাড়ী গান শুনতে যাও, পড়াশুনা করো না,—সেইজন্যই ও-সব কথা বলেছে। সত্যি, এ রকম ঠাট্টা করা তার পক্ষে ভারি অন্যায় হয়েছিল।

বৌদিকে আমি মার মত ভালোবাসি। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া লজ্জায় আমি মস্তক নত করিলাম। আমার মনে হইল, আজ বুঝি বিশ্বের লোক লাঞ্ছনার দণ্ড তুলিয়া আমাকে চূর্ণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে!

রুদ্ধ স্বরে আমি কহিলাম,—বৌদি, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এ বৎসর সব আমোদ-আহ্লাদ বিসর্জ্জন দেবো, হুগলিতেই পড়বো। যদি পাশ হই, তবেই সকলের সঙ্গে মিশবো, নাহলে—

আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বৌদি কহিলেন,—এখন এসো, তোমাকে ডাকবার জন্য মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার কথা তুমি কোন দিন অগ্রাহ্য করনি—আমাকে তুমি চিরকাল ভালবাস,—আমার উপর কখনও রাগ করো না! এসো লক্ষ্মী ভাইটি, এস, স্নান করবে এসো।

বৌদির অমূল্য স্নেহে আমি তাঁর ক্রীতদাস—তাঁর স্নেহের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না।

সেই দিন রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আমি শ্রীমতী কবিতা সুন্দরী ও শ্রীমান্ প্রেম-সুন্দরকে প্রণাম করিয়া কহিলাম,—দোহাই দেবী, দোহাই দেব! এ লাঞ্ছিত দীন দরিদ্রকে মুক্তি দাও। আমাকে লইয়া যথেষ্ট খেলা করিয়াছ। এখন অনুগ্রহ করো, মুক্তি দাও।

তার পরদিন হইতে উভয়েই অন্তর্দ্ধান হইলেন!

তবে শ্রীমতী জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমান কিন্তু বেলা দেবীর অঞ্চল ধরিয়া আসিয়া আবার আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন।

সতীশ কহিল,—আর লীলা?

আমি কহিলাম,—আমার বিবাহের ছ' মাস পরে আমারই যত্নে ও আগ্রহে আমার একমাত্র শ্যালকসুন্দরের সঙ্গে তার পরিণয় সম্পাদিত হয়েছে। বাঙালীর মেয়ে ডেঁপোমির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ. এ কথাটা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করে না,—সেই তো লীলা, এখন শ্বশুর-বাড়ী গেলে তারই practical joke-এর চোটে আমাকে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়!—হাঁা, ভালো কথা হে! আজ এখানেই খেয়ে যাও। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি-টিচুড়ি হচ্ছে। শ্রীমতী বেলা নিজের হাতে সব তৈরী করছেন।

সতীশ কহিল,—চমৎকার বলেচো তো! সে খাসা হবে। যোদ্দা, বেশ একটি romantic comedyর যোগাড় করে তুলেছিলে!

আমি হাসিয়া কহিলাম,—হাঁা, তবে comedyটা কিছু farcical!

বোমায় বেকুবি

ছিলুম মিহিজামের সুন্দরপাহাড়ীতে শিবরাম বাবুর অতিথি হয়ে। সকালে-বিকালে প্রাণপণে বেড়ানো, দুপুরে আর রাত্রে নলিনীর গান শোনা,—দিনগুলো বেপরোয়া কেটে যাচ্ছিল। সেদিন সকালে চায়ের সঙ্গে মিহিজামের উৎকৃষ্ট জিলাপী ভোজন করছি, এমন সময় মধুপুর থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র এসে হাজির! নলিনী গেয়ে উঠলো,—যদু-পতি, মধুপুর চলো।

ট্রেন বেলা আটটায়। চট্‌পট্‌ সকলে তোয়ের হয়ে ষ্টেশনে ছুটলুম। ষ্টেশনের দক্ষিণে রূপনারাণপুরের বাঁক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রূপ ধরে পড়ে আছে—পাহাড়গুলো ওধারে দাঁড়িয়ে তাদের ভীমকান্তি রূপ নিয়ে। গিরিজা বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালে, নলিনী টিকিট কিনতে গেলো—১১১ নম্বরের, অর্থাৎ থার্ড ক্লাশের টিকিট। আমি প্লাট-ফর্ম্মে পায়চারি করতে লাগলুম।

যথাসময়ে ট্রেন এসে হাজির হলে তিনজনে ইউরো-পীয়ান ছাপ আঁটা একখানা থার্ডক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলুম। সে-কামরায় একটা অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি লোক বসে-ছিল। মাথার চুল তার উস্কোখুস্কো, পাংলা লম্বা দাড়ি—সেগুলোর দিকে দাড়ির মালিকের মোটে লক্ষ্য ছিল না—নেহাৎ বুনোভাবে অযত্নের মধ্যে তার স্বাভাবিক গতিতে সে দাড়ি বেড়ে উঠেছে। তার গতি রোধ করবার বা তাকে ছেঁটে-কেটে দেবার জন্য কোন দিন তার মালিক যে হাত উঠিয়েছে, তা মনে হয় না। লোকটার মূর্ত্তি সংয়ের মত!

ট্রেনে চড়ে নলিনী গান ধরে দিলে,—আজ আমাদের ছুটী রে ভাই আজ আমাদের ছুটী!

গিরিজা তন্দ্রাস্তিমিত-নেত্রে সে-গানের মাধুর্য্য উপভোগ করতে লাগলো, আর আমি সেই লোকটাকে খুব সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করছিলুম।

লোকটার আকৃতি থেকে মনে সন্দেহের কেমন একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল। এ-গানের দিকে তার হুঁশ্‌ ছিল না। কামরায় গান চলেছে, এ ব্যাপারটি যেন সে বোঝে নি! সে বাইরের পানে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে, আর আমাদের উপর দিয়েও থেকে থেকে এক-একবার দৃষ্টির পশলা বুলিয়ে নিচ্ছিল। সঙ্গে তার একটা পুঁট্‌লি, ময়লা কাপড়ে বাঁধা। কখনো বা সেই পুঁটলির গায়ে কাণ পাত্‌ছিল, যেন অত্যন্ত কাহিল রোগীর বুকের কাছে কাণ নিয়ে গিয়ে কোন নিপুণ ডাক্তার তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করছে,—তেমনি অখণ্ড মনো-যোগে তেমনি সন্তর্পণে!

ট্রেন জামতাড়া ছাড়িয়ে কর্ম্মাটাঁরে পৌঁছল। লোকটা বরাবর ঠিক এক ভাবে বসে—একই ভঙ্গীতে। নড়া-চড়া তার রহিত, যেন মাটীর পুতুল!

ট্রেন কর্ম্মাটাঁর ছাড়ালে লোকটা ঘুমে ঢুলে পড়লো।

আমি তখন চঞ্চল হয়ে উঠলুম—কর্ম্মাটাঁর আর মধু-পুরের মাঝখানে মদনকোটার কাছে পাঞ্জাব মেল সেদিন যে তিন-তলার সমান উঁচু লাইন ছেড়ে একেবারে মাঠের গভীর গহ্বরে ঝরে পড়েচে, তাই দেখবার জন্যে!

ট্রেন চলেছে মৃদুমন্দ গমনে—সামনে অবারিত মাঠ পড়ে আছে দিগন্ত-রেখার তট ঘেঁসে, অঙ্গে তার সবুজের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ মাথার উপর বিরাট স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাই দেখচি। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ট্রেন ক্রমে জয়ন্তীর পুলে উঠলো। উপরে একটা ঘড়-ঘড় শব্দ সুরু হলো, আর নীচে, বহু নীচে কোথায় কোন্ পাতাল-পুরীর বুকে বালির বিপুল বিস্তার—তার গা চিরে চিরে জলের সরু ধারা কোথাও বয়ে চলেছে,—কোথাও বা বদ্ধ জল। এত নীচু যে চেয়ে দেখতে গেলে চোখ ঠিকরে যায়! আকাশে বকের পাঁতি উড়ে চলেছে—ধানের ক্ষেতে কোথাও বা তারা বসছে। ট্রেন ক্রমে মদনকোটা পেরুলো। তার পরেই লাইনের পশ্চিম দিকে গাড়ীর চাকা, ভাঙা এঞ্জিন।

আমার শরীর শিউরে উঠলো। উঃ, কি প্রকাণ্ড হত্যা-শালা এখানে গড়ে উঠেছিল সেদিন সেই গভীর রাত্রে! আমার গা ছম্‌ছম্ করছিল—ফিরে বন্ধুদের বললুম—এখনো ভাঙ্গা গাড়ী পড়ে আছে হে!

কিন্তু কে শোনে, সে কথা! গায়ক আর শ্রোতা দুজনে তখনো গানের সুরে, সুরের নেশায় বিভোর মশ্‌গুল। নলিনী তখন গাইছে,—

মেঘের কোলে কোলে
যায় রে চলে বকের পাঁতি!

তখনি আবার সেই উদ্‌ভুট্টে যাত্রীটির পানে আমার নজর পড়লো। সে বেশ ঘুমুচ্ছে. তার সেই পুঁটুলিটির উপর একখানি হাত রেখে। পুঁটুলির মধ্য থেকে একটা বাদামী কাগজের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আমার ভারী

কৌতূহল হলো, কি চীজ যে এত যত্নে ওটাকে আঁকড়ে রয়েচে! নিশ্চয় চোরাই মাল! কিছু চুরি করে দেশে পালাচ্ছে। কিন্তু না—দেশ কি—এ তো দেখছি, বাঙালী! তবে?

অন্যায় কৌতূহল, সন্দেহ নাই—তবু সে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না। আস্তে আস্তে উঁকি দিয়ে তার তল্পী পরীক্ষায় অগ্রসর হলুম। একটু ঝুঁকতে শুনি, পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা কি আওয়াজ হচ্ছে! যেন কি কল চলছে!

ফশ্ করে মনে হলো—তাইতো, মধুপুরের সামনে ট্রেন ডি-রেল করবার জন্য স্ট্রাইকাররা চেষ্টা করেছিল, এ তাদেরই একজন নয় তো? হয়তো আর কোথাও আর-কোন বড় রকমের বিপদ বাধাবার জন্য অগ্রসর হয়ে চলেছে! ওর পুঁটলিতে বোমা নেই তো?

গা ছম্ ছম্ করে উঠলো। মদনকোটার ঐ শ্যাম-প্রান্তরে অমনি আহত নর-নারীদের রক্তাক্ত মুখগুলার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে তার দারুণ লোমহর্ষণ ছবি ফুটিয়ে জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হীরোর রূপে সারা দেশের সামনে ফুটে ওঠবার এক দুর্দমনীয় লোভও জন্মালো। এই লোভ মুহূর্তের জন্য আমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললে—আমি যেন জ্ঞান হারালুম!

তারপর কখন্ যে নিমেষের মধ্যে আমি তার হাতের গ্রাস থেকে সেই পুঁটলিটা ছিনিয়ে নিলুম,—সেটা হাতে ভারী ঠেকেছিল,—আর সে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে দাঁড়িয়ে উঠে আমায় সিংহের মত বিক্রমে আক্রমণ করলে, আমি তার সে আক্রমণ ব্যর্থ করে পুঁটলিটা ছুড়ে বাইরে ফেলে দিলুম—তার কিছুই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ জ্ঞান হলে দেখলুম, গিরিজা আর নলিনী দুজনে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সে লোকটা পাগলের মত কখনো মাথা চাপড়াচ্ছে, কখনো বসে পড়ছে, কখনো বা দাঁড়িয়ে উঠে রুক্ষস্বরে আমায় গাল দিচ্ছে! আমি তো হতভম্ব।

হঠাৎ লোকটা বিড়বিড় করে কি বকে ট্রেনের এ্যালার্ম সিগ্‌নাল টেনে দিলে—মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনখানা খট্ করে থেমে গেল। তারপর বিপুল গণ্ডগোল বাধলো।

গার্ড, ড্রাইভার, যাত্রী—সদলে ছুটে এলো এবং সেই বিপর্যয় গণ্ডগোল থেকে আসল ব্যাপার বোঝা গেল, লোকটা ঘড়িওয়ালা—মধুপুরে কোন্ রাজা বাড়ী তৈরী করাচ্ছেন, তাঁর বাড়ীর টাওয়ারে একটা ঘড়ির জন্য অর্ডার দেন কলকাতায়। লোকটা সেই ঘড়ি দস্তুরমত রেগুলেট করে সযত্নে নিয়ে আসছিল মধুপুরে, সেটাকে টাওয়ারে বসাবার জন্য। আমি তার সেই ঘড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি!

আমার কৈফিয়ৎ তলব হলো। আমি বললুম, মদন-কোটার সেই কাণ্ডের চিহ্ন দেখে আমার মাথা কেমন বিগড়ে গেছলো! আমি ভেবেছিলুম, লোকটা স্ট্রাইকার, আর তার তল্পীতে বোমা! তাই সেটা ফেলে দিয়েছি।

দু'চারজন কুলি গিয়ে ঘড়িটা তুলে আনলো। আচ্ছা জান্ তার! প্যাকেট খুলে দেখা গেল, ঘড়িটা দিব্য চলছে—কোনোখানে জখম হয়নি!

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হলো না—জের গড়ালো আদালত পর্যন্ত। সেখানে লড়ালড়ি করার পর হাকিম আমায় ছেড়ে দিলেন—mistake of facts বলে।

পশ্চিম-যাত্রাটা সেবার খুব দীর্ঘ হয়েছিল—এখন তিন বছর আর ওধারে পা বাড়াবো না, স্থির করে রেখেছি।

দেশের জন্য

১

জানুয়ারি মাস। মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসে হাড় অবধি ঝন্ ঝন্ করিতেছে। অতিরিক্ত বরফ পড়ার দরুণ শীতটা খুবই বাড়িয়াছিল!

পাড়াগাঁ। মেটে রাস্তা দিয়া কতকগুলি লোক শব বহিয়া আনিতেছিল। বেহারাদের স্কন্ধে ঝোলা; তাহারই মধ্যে মৃতের দেহ; ঝোলার চারিধার ধব্‌ধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা।

ঝোলার পিছনে একটি লোক; বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। সে একখানি রিক্‌শ গাড়ী টানিয়া আনিতেছিল। গাড়ীতে ছোট দুটি ছেলে—মুখ দুটি শুকাইয়া গিয়াছে—গায়ে একখানি লাল কম্বল জড়ানো, তবু তাহাদের শীত ভাঙ্গিতেছে না।

ঝোলার মধ্যে তাহাদের মার মৃত দেহ। যে রিক্‌শ টানিতেছিল, সে তাদের বাপ। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে তারা চাহিয়া দেখে, ছোট ঘরখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছে, মার মুখে কথা নাই—আর মার হাতখানি ধরিয়া মার বিছানায় বসিয়া তাহাদের বাপ কাঁদিতেছিল।

তারপর বাপ যখন একটিও কথা না বলিয়া, তাহাদের মুখে চুমা দিয়া রিক্‌শতে বসাইয়া দিল, তখন তাহারা মনে করিল, বুঝি অন্য দিনের মত বেড়াইতে চলিয়াছে। কিন্তু অন্য দিনের মত বাপের মুখে আজ হাসি নাই—মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে রিক্‌শ টানিতেছিল, মুখে কথা নাই। দেখিয়া শুনিয়া ছেলেদুটির মন কি এক দুঃখে ভরিয়া আছে।

অনেকক্ষণ পথ চলিয়া সকলে সহরের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। চারিধারে তখন আঁধার নামিতেছে, এবং ছেলেদুটির চোখও ঘুমে ভরিয়া আসিয়াছিল!

চোখ মেলিয়া তারা দেখে, মন্দিরের মেঝেয় মাদুরের উপর শুইয়া আছে। উঠিয়া ছোট দুটি থালায় দুইজনে ভাত খাইল, আর ছোট পেয়ালা ভরিয়া দু' পেয়ালা চা।

তারপর রিক্‌শ চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসা। আহা, বাড়ী। সুখের বাড়ী! কিন্তু মা কোথায়? মার বিছানা খালি পড়িয়া রহিয়াছে যে। কোথায় মা? ছোট খোকা মাকে না পাইয়া কাঁদে! সূর্য্যের আলো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। জানালার ধারে বাপ দাঁড়াইয়া আছে, তার চোখে জল!

২

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। আকাশে-বাতাসে বসন্তের ঢেউ লাগিয়াছিল। বারান্দায় ছোট গাছগুলিতে নীল ও সাদা রঙের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মিষ্ট গন্ধে সমস্ত গ্রামখানি ভরপুর।

রিক্‌শ গাড়ীর আড্ডায় 'তক্‌তকে' সাজানো গাড়ীগুলি। পাশে বেহারাগুলা বসিয়া-দাঁড়াইয়া 'পাইপ' টানিতেছে—কেহ-বা গল্প করিতেছে। দূরে ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। ব্যাপার কি জানিবার পূর্ব্বে একটি লোক 'খবর!' 'খবর!' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল।

সকলে বিদ্যুতের মত কাঁপিয়া উঠিল! যে যেখানে ছিল, খবর কিনিবার জন্য সকলেই ছুটিয়া আসিল। দুইটি করিয়া "সেনে'র বিনিময়ে এক এক খণ্ড কাগজ কিনিয়া ফেলিল। পথে রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল।

যুদ্ধ বাধিয়াছে! যুদ্ধ! সকলের প্রাণে জোয়ার বহিয়া গেল! নারী, বালক, যোদ্ধা—সকলের মনে বাজনা বাজিয়া উঠিল! উত্তেজনায় রক্ত নাচিয়া উঠিল! দেশের জন্য আজ কাজ করিবার সময় আসিয়াছে!

সকলের ডাক পড়িয়াছে। সকলকে যাইতে হইবে। বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র, আতুর ও নারী ভিন্ন সকলকেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। টোকিচিকে তো বটেই! এখন এই ছেলেগুলির ভার কে লয়! আর, এই মাতৃহারা ছোট শিশুটি? কাহারো হাতে ইহাদের ভার দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে যাওয়া যায়!

সারা দিন ধরিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরিয়া বেড়ানো সার হইল,...কেহই ছেলেগুলির ভার লইতে চাহিল না!

পরদিন খোকাকে থলির মধ্যে লইয়া পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, বড় ছেলেটিকে রিক্‌শতে বসাইয়া সে পথে পথে ঘুরিল; আজ চিরদিনের জন্য ছেলেগুলিকে সে বিলাইয়া দিবে! কিন্তু লইবে কে? সকলেরই নিজেদের ঝঞ্চাট আছে—বেচারাকে কেহই সাহায্য করিল না।

৩

কাল তাহাকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হইবে। নহিলে কারাদণ্ড। বিচারে সকলের সম্মুখে কুকুর-বিড়ালের মত তাহাকে গুলি করা হইবে! বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু!

কি সে লজ্জা, কি সে অপমান। কথাটা ভাবিয়া তার বুক হু-হু করিয়া উঠিল! মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিল!

ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল। ছেলে তিনটি ঘুমাইতেছিল। ঘরের আলো নিভ-নিভ হইয়া আসিয়াছে—ছেলেদের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু বড় ছুরিখানা কোথায় থাকিত, টৌকিচির তাহা মনে ছিল!

হাঁ—এই সে ছুরি! বাঁট দেওয়া বড় ছুরি, তাহার শৈশবের সঙ্গী! ইহারই সাহায্যে কত জঙ্গল সে পরিষ্কার করিয়াছে, কত চোরের প্রাণ নিয়াছে! হাত বুলাইয়া টৌকিচি দেখিল, এখনও ধার পড়িয়া যায় নাই! তবে এক-আধ জায়গায় মরিচা ধরিয়াছে। শাণ দিলে ভালোই হয়। ধীরে ধীরে শাণ-পাথরখানি খুঁজিয়া সে বাহির করিল।

'শুষষ'! পাথরে ছুরি ঘষা হইল। ছুরিখানা জীবন্ত মানুষের মত শব্দ করিল, 'শুষ্‌স্‌'! সেই নিভ-নিভ আলোতে একবার সে ছেলেদের মুখের পানে চাহিল। কি নিশ্চিন্ত ঘুম! নিশ্বাসের শব্দটুকু শুধু শুনা যাইতেছে, আর কিছু না, এমন নিস্তব্ধ।

দূরে মন্দিরের ঘণ্টায় বারোটার ঘা পড়িল। কি ভীষণ শব্দ! একটি ছেলে পাশ ফিরিল। তাহার হাতখানা লেপের বাহিরে পড়িল। টৌকিচি তাহাদের শিয়রে স্থির হইয়া বসিল। ঘরের আলোটুকু দপ করিয়া নিভিয়া গেল!

অন্ধকার! চোখে কিছু দেখা যায় না। আগে খোকা! কি জানি, যদি তার হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যায়! যদি সে চীৎকার করিয়া ওঠে! সে শব্দে আর দুইটির ঘুম ভাঙিতে পারে! তাহা হইলে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

আহা, ছোট গলাটুকু! কি নরম! ঠিক জায়গাটি! জাপানীরা জানে, কোথায় ছুরি বসাইলে ব্যথা অল্প লাগে।

তার পর, মেজোটি! শীঘ্র—এখনো হাতে বল আছে, হাত দৃঢ় আছে! বড়টির ঐ ঘুম ভাঙিল না?

না। সে আরামে ঘুমাইতেছে! এইবার তার পালা! এইটিই না প্রথম? আর এখন শেষ চিহ্নটুকু। এই তো সে দিনের কথা। নাম-করণের জন্য কিশোরী স্ত্রীর কোলে ছেলেটি নিয়া সে মন্দিরে গিয়াছিল। তাহার হাতে কবচ বাঁধিয়া দেওয়া হইল—কবচের গুণে হৃদয়খানি সকল গুণে ভূষিত হইবে,—মন সাহসে পূর্ণ হইবে। সে তো এই সেদিনের কথা! কিন্তু আজ? আহা!

হাত কাঁপিয়া উঠিল! একবার!

কপাল হইতে এক ফোঁটা ঘাম ঝরিয়া ছুরির বাঁটে পড়িল। ছুরিখানা হাত হইতে পিছলাইয়া যায়! তবে কি পারিবে না? এত দুর্ব্বল হাত! না! কখনও না।

শেষ! সব শেষ! বলি শেষ! দেহগুলি কম্বলে জড়াইয়া সে রিক্‌শতে তুলিল—তার পর রিক্‌শ ঠেলিয়া পথে বাহির হইল!

আর কিছুদিন পূর্ব্বে এই পথেই সে বাহির হইয়াছিল। সে দিন তাহার চোখে জল ছিল, কিন্তু আজ নাই! সে দিন আপনার বলিতে যেন কিছু ছিল, আজ কিছু নাই, কেহ নাই—আছে শুধু নিজের জন্মভূমি। দেশ! সোনার দেশ!

তখন রাত্রি শেষ। পাহাড়ের পিছনে চাঁদ উঠিতেছিল! তাহারই আলোকে কবরের স্থানটুকু খুঁজিয়া লওয়া যায়।

ছেলে তিনটিকে তাহাদের মায়ের পায়ের কাছে শোয়াইয়া সে কবরে মাটী চাপা দিল; উপরে ছোট ছোট তাদের চারা রোপণ করিল। কি আরামেই ছেলেগুলি এখন ঘুমাইয়া বাঁচিবে! আঃ! সে-ও যদি আজ তাদের পাশে একটু স্থান করিয়া লইতে পারিত!

কিন্তু না! তার জন্য বিদেশের সমরক্ষেত্র বুক পাতিয়া রাখিয়াছে, সেইখানে সে বিরাম লাভ করিবে। এখানে তার স্থান নাই! চলো টৌকিচি, এখানে নয়।

টৌকিচি হাঁটু গাড়িয়া ভগবানকে একবার ডাকিল।

৪

ভোরের আলো ফুটিতেছে। ধীরে ধীরে টৌকিচি মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরে সোপানের নিম্নে পাথরের চৌবাচ্ছায় জল ছিল। দেব-দর্শনে আসিয়া পাপীরা এই জলে হাতের কালিমা ধুইয়া ফেলে। ভালো করিয়া এই জলে সে হাত ধুইল।

হাত ধুইয়া সে আচার্য্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একে একে সব কথা বলিল। আরো বলিল,—এখানকার কাজ আমার শেষ। এখন রাজার জন্য নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব। এখানি নিন—এই শেষ! আর আমার কিছু নাই। মন্দিরের দ্বারে আমার রিক্‌শ আছে, সেখানিও রাখিবেন! এখন আমি রিক্ত—সর্ব্বস্বান্ত।

কথা শেষ করিয়া লাল কম্বলখানি আচার্য্যের হাতে সে তুলিয়া দিল, তার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৫

মার্চ্চ মাস। স্নিগ্ধ প্রভাত। সমস্ত সহর সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। দশ হাজার পতাকার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। পথে আবার লোকের ভিড়। সৈন্য-বারিকের ফটকের সম্মুখে ভিড় আরও বেশী! এখনি সৈন্যদল বাহির হইবে।

ভেরী বাজিয়া উঠিল। সৈন্যদের নাম-ডাক আরম্ভ হইল। স্বদেশে বুঝি এই শেষ নাম-ডাক।

—টোকিচি মৎসুসিমা!

—হাজির!

দশ মিনিট মাত্র! উৎসাহে, আনন্দে, গর্ব্বে, সৈন্যদল বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সবার চেয়ে অধিক আনন্দ, অধিক উৎসাহ, অধিক গর্ব্ব, আজ টোকিচির!

খুনী? হাঁ, অপরের চক্ষে খুনী হইতে পারে! কিন্তু আপানীর চক্ষে সে মহাপুরুষ! জন্মভূমির বেদীর সম্মুখে সে কি আজ আপনার অস্থিচর্ম্ম অবধি বলি দেয় নাই? দেশের জন্য কি আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নাই? আপনার বলিতে আজ আর সে কিছু রাখে নাই। দেশের জন্য সব,—সমস্ত দান করিয়াছে!

* * * *

দূরে পাহাড়ের ধারে ছোট গ্রামে এক আচার্য্য কবচ বিতরণ করেন। এ কবচ ধারণ করিলে নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কবচগুলি তিনি স্বহস্তে রচনা করেন। সেগুলি এমন কিছু অদ্ভুত সামগ্রী নহে, ছোট রূপালী সূতায় জড়ানো রক্ত-মাখা কম্বলের টুকরা।

লক্ষ্মীলাভ

১

জুল্ সিকো একজন পাকা ব্যবসাদার। কড়াক্রান্তি-টুর তাহার হিসাবে বাদ পড়িত না। লোকে বলিত, জুল সিকোর লক্ষ্মীশ্রী আছে! কিন্তু এই লক্ষ্মীশ্রীটুকু অর্জ্জন করিতে জুল সিকোকে কি পরিমাণ বুদ্ধি খেলাইতে হইত, লোকে তাহার বড় খোঁজ রাখিত না।

সিকোর বাড়ীর পাশে মাগ্রোরের বাগান-বাড়ী। মাগ্রোর বৃদ্ধ—সংসারে পুরানো চাকর জন ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় সঙ্গী নাই।

মাগ্রোরের জমিটুকুর উপর সিকোর লোভ পড়িয়াছিল। কিন্তু মাগ্রোর কিছুতে সেটুকু ছাড়িবে না। সে জিদ ধরিয়া বসিয়াছে,—এখানে জন্ম লইয়াছি, এখানেই মরিব!

মাগ্রোরের বয়স বাহাত্তর বৎসর। হাড় কয়খানি এখনো বেশ মজবুত। তাহার দেহপিণ্ডটাকে এখনো কিছুকাল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ বলিয়া মনে হইত।

মাগ্রোরের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া সিকো প্রায় তাহার খবর লইত। কোনদিন সে মাগ্রোরকে এতটুকু অপ্রসন্ন দেখে নাই, ইহাই ছিল সিকোর প্রধান বেদনা!

একদিন সিকো আর স্থির থাকিতে পারিল না। মাগ্রোরের নিকট আসিয়া ডাকিল,—মাগ্রোর!

—কেন?

—তুমি তা হলে তোমার জমিটুকু বেচবে না? তোমারি ভালোর জন্য বলছিলুম।

না! বার বার ও কথা আর কেন?

সিকো কহিল, বেশ!—তা আচ্ছা, একটা বন্দোবস্ত করলে হয় না? দু'পক্ষেরই তাতে লাভ আছে।

মাগ্রোর কহিল,—কি?

—তুমি জমিটুকু আমাকে বেচে ফেল—অথচ দখল ছেড়ো না। অর্থাৎ, কথাটা এই—

মাগ্রোর বসিল।

সিকো বলিল,—ব্যাপারটা তবে খুলে বলি—প্রতি মাসে তুমি আমার কাছ থেকে নব্বই টাকা পাবে—অথচ তুমি এই জমিতেই বাস করবে—কোন তফাৎ নয়—ঠিক এখন যেমন আছ! কেবল প্রতি মাসে ঐ টাকাটা পাবে। বুঝেছ?

মাগ্রোর কথাটা ভালো বুঝিল না, তবে এইটুকু বুঝিল যে, ইহার মধ্যে বেশ একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে!

সে কহিল,—তা বুঝলুম, কিন্তু তোমার লাভ? তুমি তো জমি পাচ্ছো না!

সিকো মৃদু হাসিল। সে কহিল,—"তাতে কি এসে যায়? যত দিন তুমি বেঁচে থাকবে, তত দিন কে তোমার দখল ছাড়ায়? কেবল তুমি উকিলের বাড়ী গিয়ে একখানি দলিলে সহি করে দেবে যে, তোমার মৃত্যুর পর এই জমিতে আমার অধিকার, ওয়ারীশনক্রমে। তোমার পুত্র-পৌত্র নাই, মৃত্যুর পর কোথাকার দূর-সম্পর্কীয় কতকগুলা ভাইপো-ভাইঝী, যারা তোমার সুখ-দুঃখের কোন খোঁজ-খবর ন্যায় না—তারা এই জমি নেবে! তাদের দেবার চেয়ে আমাকে দেওয়াটা সঙ্গত নয় কি? বিশেষ, আরো যখন তুমি মাসে মাসে আমার কাছ থেকে এই টাকাটা পাবে? লাভটি তোমারই মাগ্রোর—আমার শুধু ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা!

বৃদ্ধ বিস্মিত হইল! এতগুলা টাকা! কোন ক্ষতি নাই—বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই! মাগ্রোর কহিল,—"একটু ভাবিয়া দেখি সিকো, কাল তোমাকে জানাবো!"

সিকো মৃদু হাসিয়া গৃহে ফিরিল। তাহার আজ খুব আনন্দ হইয়াছিল—যুদ্ধ-জয়ের পর জয়ী নৃপতির যেমন আনন্দ হয়, সিকোর আনন্দ তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে!

সেদিন রাত্রে মাগ্রোরের ভাল নিদ্রা হইল না! প্রস্তাবটা লোভনীয়, কিন্তু অযাচিতভাবে সিকোর এতখানি ক্ষতি স্বীকার করায় সার্থকতা কি! মাগ্রোর অস্থির হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রত্যুষে মাগ্রোর চুপি চুপি একজন উকিলের নিকট গিয়া ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল।

উকিল কহিল,—মোটে নব্বই টাকা? তাহাকে বলো, একশ কুড়ি টাকা মাসে চাই—যদি রাজী হয়, এখনি লেখাপড়া করিয়া ফেল! দলিলখানা আমি দেখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি!

এক কথায়, মাসে একশ কুড়ি টাকা!

মাগ্রোর ভাবিতেছিল, সিকো কেন আসিতে দেরী করিতেছে!

সিকো শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। মাসে একশ কুড়ি টাকা! না, না! একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে!

মাগ্রোর বুঝাইল, কদিনই বা সে বাঁচিবে? আর বড়

জোর পাঁচ ছয় বৎসর! তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাহা হইলে, মাসে একশ কুড়ি টাকা করিয়া ধরিলে, বৎসরে এক হাজার চারশ চল্লিশ টাকা! ছয় বৎসরে, আট হাজার ছ'শ চল্লিশ টাকা মাত্র! তেমনি সম্পত্তির দাম যে পনেরো হাজার টাকা! ধরিতে গেলে, সিকোর লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। এই সেদিনই যে, সন্ধ্যার সময় মাগ্রোরের বুকে হঠাৎ ব্যথা ধরিয়াছিল, খুব সামলাইয়া গিয়াছে। তেমন ব্যথা আর একদিন ধরিলেই সব শেষ হইয়া যাইবে! তখন ...।

সিকো কহিল,—না, না, তোমার যা শরীর—তুমি এখনো পনেরো কুড়ি বৎসর বাঁচবে। তুমি ত আমাকেই মরতে দেখবে! ইত্যাদি।"

পরদিনটা টাকার আলোচনায় কাটিয়া গেল। মাগ্রোর কিছুতে ছাড়িবার পাত্র নহে—অগত্যা সিকো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাগ্রোরের সর্ত্তে সম্মতি দিল।

উকিলের বাড়ী দলিল লেখাপড়া হইয়া গেল।

২

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাগ্রোরের শরীর ও স্বাস্থ্য, সিকোর আশা-আনন্দের পরিবর্ত্তে, দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ে সিকোকে কোন দিন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই, কিন্তু এখন এ কি বিপদ!

যখনই সিকো মাগ্রোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, তখনই আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া ওঠে। তাহার সমস্ত হৃদয় ধ্বনিত করিয়া বাসনা গর্জ্জাইতে থাকে,—কবে তুমি মরিবে!

সিকো কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। তাহার মনে হয়, মাগ্রোরের বুকে ছুরি বসাইয়া দেয়! রাত্রে নিদ্রা নাই। জীবন-ভার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল।

সিকো আসিয়া মাগ্রোরকে কহিল,—আজ আমার বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ। কি বলো, মাগ্রোর?

মাগ্রোর আপ্যায়িতভাবে কহিল,—ধন্যবাদ, সিকো!

আবার, ধন্যবাদ! দুষ্ট, জুয়াচোর—মরিবার নামটি নাই, তোমার! ধন্যবাদ?

সিকো হতাশ হইল। মাগ্রোর অধিক কিছু আহার করিল না—শুধু একটু ফলমূল—একটু রুটি-মাখন, আর একটু ঝোল!

সিকো অনেক পীড়াপীড়ি করিল, এত আয়োজন—এমন পুডিং, রোষ্ট ফাউল, মটন চপ্,—কফি, কিছু না? একটু ব্র্যাণ্ডি?

মাগ্রোর কহিল,—একটু! এক পাত্র—শুধু তোমার অনুরোধে।

সিকো হাঁকিল,—বোজালি, ব্র্যাণ্ডি! খুব ভালো ব্র্যাণ্ডি—স্পেশ্যালটা—"

মাগ্রোর এক নিশ্বাসে পান করিল। সিকো আবার গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালিল! মাগ্রোর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, কহিল,—চমৎকার!

সিকো কহিল,—তোমাকে কিছু পাঠিয়ে দেবো। তোমার এই শরীর—একটু-আধটুতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা!

কিছুদিন পরে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, এই বৃদ্ধবয়সে মাগ্রোর অতিরিক্ত ব্র্যাণ্ডি পান করিতেছে। সে নিজে বোতল রাখিয়া দিয়াছে—কেহ জানে না, কোথায় রাখে!

সিকো প্রতিবেশীর কাছে কহিল,—বড় দুঃখের কথা! এত বারণ করি, কিছুতে শোনে না। ব্র্যাণ্ডি পায় বা কোথা? আনিয়া দেয় কে? হায়, হায়, এমন করিয়া শরীরটাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে!

* * *

ইহার ঠিক পরদিন প্রত্যূষে মাগ্রোরকে শয্যা হইতে উঠিতে না দেখিয়া, পুরানো ভৃত্য কোনমতে দ্বার খুলিয়া দেখে, শয্যার উপর মাগ্রোরের মৃতদেহ! তাহার মুখে সাদা ফেনা জমিয়া রহিয়াছে। মাথাটা বালিশের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে! শয্যার নিম্নে একটা খালি বোতল—সেটি সাধারণ ব্র্যাণ্ডির বোতলের মত নহে।

সংবাদ পাইয়া সিকো ছুটিয়া আসিল। চাকরের সাহায্যে বাক্স খুলিয়া দলিলখানি পকেটে রাখিল। ক্রমে পাড়ার লোকে ঘর ভরিয়া গেল!

শিরে করাঘাত করিয়া সিকো কহিল,—আমার যেন আজ পিতৃ-বিয়োগ হয়েছে। বুড়াকে আমি নিজের বাপের মত দেখতুম! আহা—কোথা থেকে এই লক্ষ্মী-ছাড়া ব্র্যাণ্ডি ধরে নিজের মৃত্যু ডেকে আন্‌লে!

সিকো রুমালে চোখ মুছিল। তাহার এই উচ্ছ্বসিত ভক্তির আতিশয্যে পাড়ার লোক চমৎকৃত হইয়া গেল।

বৃষ্টি

১

সম্রাট লি-ও-এ মর্ম্মর প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বয়স অল্প, কাজেই মনটি করুণায় ভরা! চারিদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য, আমোদ, বিলাস, তবু দীন-দুঃখীর কথাটুকু তিনি কখনও ভোলেন না।

বৃষ্টি পড়িতেছে! মুষল ধারে, অবিশ্রাম বৃষ্টি! চারিধারে, গাছপালা ফুলপল্লব যেন চোখের জল ফেলিতেছে।

সম্রাটের হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। পথের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন, কহিলেন,—আহা, ঐ লোকটির কি কষ্ট! এই অবিশ্রাম বৃষ্টিতে পথে চলেছে, মাথায় একটা টুপি নাই! পশ্চাতে ফিরিয়া বয়স্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি জানিতে চাই, আমার পিকিনে এমন হতভাগ্য ক'জন আছে—মাথায় একটা টুপি দিবারও যাদের সামর্থ্য নাই!

অবনত শিরে সুঙ্-হি-সাঙ্ উত্তর দিল,—সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, সর্ব্বশক্তিমান রাজরাজেশ্বর, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এ সংবাদ রাজগোচরে আসিবে!

সম্রাটের মুখে হাসি দেখা দিল। সুঙ্-হি-সাঙ্ নিমেষে প্রধান মন্ত্রী সান্-চি-সানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখনো তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না—ব্যস্ততাবশতঃ শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম। প্রধান মন্ত্রীর প্রাপ্য ন্যায্য সম্মানটুকু তাঁহাকে প্রদান করিতে রাজবয়স্য ভুলিয়া গিয়াছিল!

কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া সুঙ্-হি-সাঙ্ কহিল,—বিশ্বের আনন্দ, আমাদিগকে সর্ব্বময় প্রভু আজ বিরক্ত হইয়াছেন! এত বড় বেয়াদব এই লোকগুলা, মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে! সম্রাট তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন! তিনি জানিতে চান, এমন লোক পিকিনে কতগুলা আছে।

এতদূর স্পর্দ্ধা, তাদের? সান্-চি-সান্ ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। তখনি সেনাপতি পি-হি-ভোর তলব পড়িল।

পি-হি-ভো নতশিরে মন্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে মন্ত্রী কহিলেন—দুঃসংবাদ আছে। মহারাজ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়াছেন!

বিস্ময়-স্তম্ভিত পি-হি-ভো উত্তর করিল,—"সে কি? রাজ্যে এমন একটা ছায়া-নিবিড় কানন নাই, যা' পিকিনের পথ ও প্রাসাদের মধ্যে আবরণের সৃষ্টি করে?"

সান্-চি সান্ কহিলেন,—কেমন করিয়া এ ব্যাপার ঘটিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই যে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে, ইহাদের জন্য সর্ব্বময় সম্রাট আজ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন! পিকিনে এমন বদমায়েশ লোক কতগুলা আছে, তিনি আজই জানিতে চাহেন। ব্যবস্থা করো।

স্বস্থানে ফিরিয়া পি-হি-ভো অনুচরবৃন্দকে আদেশ দিল,—ডাকো সেই বুড়া কুকুর জুব-সাঙ্ টাকে! এখনি!

নগর-রক্ষক বৃদ্ধ জুব-সাঙ্ কম্পিত দেহে, শঙ্কিত মনে সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া যখন তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া দাঁড়াইল, তখন পি-হি-ভো তিরস্কার-বাণে তাহাকে রীতিমত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

—বেয়াদব, পাপী, বিশ্বাসঘাতক, তোমার জন্য কি আজ আমরা সকলে রাজরোষানলে দগ্ধ হইব?

জুব-সাঙ্ সভয়ে কহিল,—হুজুরের ক্রোধের কারণ জানিলে সমস্ত নিবেদন করিতে পারি। নচেৎ আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না!

—বুড়া কুকুর, এত বড় নগর রক্ষা কি তোমার কাজ? কতকগুলা শূকরের পাল চরাও গিয়া! চীন-সম্রাট স্বয়ং নগরে বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! পথে কতকগুলা বেয়াদব ঘুরিয়া বেড়ায়—মাথায় তাহাদের টুপি জোটে না! সূর্য্যাস্তকাল সময় দিলাম—এমন বেয়াদব পিকিনে কতগুলা আছে, সংবাদ আনো!

ভূমিতে তিনবার শিরস্পর্শ করিয়া জুব-সাঙ্ কহিল, এখনি প্রভুর আজ্ঞা পালিত হইবে।

কথা শেষ করিয়া জুব-সাঙ্ নিমেষে সে স্থান ত্যাগ করিল। তখন অবিলম্বে বাহিরে বৃহৎ ঘণ্টায় চৌকিদারদিগের তলব পড়িল।

—হতভাগা, ভূতের দল, তোমাদের জীয়ন্ত পুড়াইয়া মারিলেও রাগ মিটে না। এমনি করিয়া তোমরা সহরে চৌকী দাও! বৃষ্টিতে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে, নজর রাখো না? যাও, এখনি এক ঘণ্টার মধ্যে মাথায় যাদের টুপি নাই, তাদের ধরিয়া আমার কাছে হাজির করো!"

চৌকিদারের দল গালি খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং চকিতে পিকিনের পথে-ঘাটে টুপিহীন লোক ধরিবার জন্ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল।

—ধরো, পাকড়াও—শব্দে সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিড়াল যেমন করিয়া ইন্দুর ধরে, তেমনি করিয়া চৌকিদারগুলা লোক ধরিতে লাগিল! প্রাচীরের পাশে, বাগানের বেড়ার পিছনে, নদীর ধারে, বৃক্ষের শাখায়, যেখানে যে-বেচারা লুকাইয়া ছিল, কোন স্থানই চৌকিদারদিগের তীব্র দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে পিকিনের কারাপ্রাঙ্গণ এই সব টুপিহীন অভাগাদের করুণ আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

জুর-সাঙ্ সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল,—গুণ্তিতে কত হবে?

চৌকিদারেরা কহিল,—বিশ হাজার আটশ একাত্তর জন!

জুর-সাঙ্ হুকুম দিল,—সবার মাথা কাটো···

আধ-ঘণ্টার মধ্যে কারাপ্রাঙ্গণে বিশ হাজার আটশ' একাত্তর জন হতভাগ্য চীনবাসীর শিরোহীন দেহ গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সংবাদ লইয়া, জুর-সাঙ্, পি-হি-ভোর সম্মুখে উপস্থিত হইল। পি-হি-ভো আসিয়া সান্-চি-সান্কে, ও সান্-চি সান স্থঙ্-হি-সাঙ্কে সংবাদ-জ্ঞাপন করিল।

২

সন্ধ্যা নামিতেছিল। নম্র, শান্ত সন্ধ্যা। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। বায়ুস্পর্শে বৃক্ষপত্র ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছে এবং পল্লব হইতে হীরার টুকরার মত বৃষ্টি-বিন্দু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। স্নিগ্ধ বাতাসে পাখীর গানে, মধুর পুষ্প-সুরভিতে সারা আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাগান যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে! কেমন-একটা ঔজ্জ্বল্য ও আনন্দ যেন চারিধারে ঠিকরিয়া পড়িতেছে!

ঈশ্বরের পুত্র ও প্রতিনিধি স্বয়ং সম্রাট লি-ও-এ বাতায়নে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। চারিধারে এত শোভা! এমন সৌন্দর্য্য! তবু তিনি সেই অভাগাদের কথা ভুলিয়া যান নাই।

স্থঙ্-হি-সাঙের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন,—ভালো কথা! সেই অভাগাদের সংবাদ নিয়াছিলে? আহা, বেচারারা একটা টুপি অবধি মাথায় দিতে পায় না!

মস্তক নত করিয়া স্থঙ্-হি-সাঙ্ কহিল,—ভৃত্যগণ প্রভুর আজ্ঞা তখনি পালন করিয়াছে!

—এমন অভাগা ক'জন আছে? সত্য করিয়া বলো, মিথ্যা বলিয়ো না।

এক হাত আপনার বক্ষে রাখিয়া, অপর হাত আকাশের দিকে তুলিয়া, স্থঙ্-হি-সাঙ্ অকম্পিত কণ্ঠে স্পষ্টস্বরে বলিল,—সারা পিকিনে এখন এমন হতভাগা একজনও নাই, যার মাথায় টুপি দিবার সামর্থ্য নাই! প্রভুর সম্মুখে শপথ করিয়া এ কথা বলিতেছি!

অপূর্ব্ব উল্লাসে সম্রাটের প্রশান্ত বদন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল! মুগ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—সুখের রাজ্য। সোনার দেশ! আর কি সুখী আমি যে, আমার রাজ্যে দৈন্য নাই, দারিদ্র্য নাই, দুঃখ নাই! ইঙ্গিতে প্রজার দুঃখ-ক্লেশ দূর হয়।

স্থঙ্-হি-সাঙ্ বারবার আভূমি প্রণত হইয়া সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিল।

সম্রাটের মুখে হাসি দেখিয়া প্রাসাদের সকলে আজ আনন্দ লাভ করিল!

প্রজাবর্গের প্রতি সমধিক স্নেহানুরাগের পুরস্কার-স্বরূপ সান্-চি সান্, পি-হি ভো ও জুর-সাঙ্ বিশিষ্ট রাজোপাধিতে ভূষিত হইল। সমগ্র নগরে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল! বিংশ-সহস্রাধিক নর-কঙ্কালে সমগ্র পিকিনের আনন্দ-কোলাহল এতটুকু রোধ করিতে পারিল না।

সহযাত্রিণী

সংবাদপত্রে যেদিন সিবির সহিত আমার বিবাহ-বার্ত্তা ঘোষিত হইল, সেদিন আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। আমার বিবাহ? যে চিরকাল বিবাহিত জীবনকে একটা ভার বলিয়া তর্ক করিয়া আসিয়াছে! এবং বিবাহ কাহার সহিত? না, নিতান্ত আত্মপরায়ণা এক নারী, যাহার সহিত কাহারো কখনো বনিবনা নাই! হুলস্থূল বাধিবার কথা বটে!

বন্ধু সিসিল আসিয়া কহিল,—ব্যাপার কি, বলো দিকি? প্রেমের ফাঁদে দুজনে পা দিলে কেমন করে?

আমি কহিলাম, ট্রেণে।

সিসিল কহিল,—ট্রেণে? অমন বিশ্রী জায়গা—নাকে-চোখে কয়লার গুঁড়া অনর্গল প্রবেশ করছে—একটা কর্কশ ঘট-ঘট ট্রেণের শব্দ—না আছে পাখীর গান, না আছে গাছের ছায়া—প্রাণটা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে। সে স্থানটা প্রেমের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠলো?

সিসিল হাসিতে লাগিল।

আমি কহিলাম,—প্রেমের পক্ষে সব চেয়ে সুন্দর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে ঐ ট্রেণ। কেউ কোথাও নাই, বাহিরে কর্ম্মস্রোতের বিপুল গর্জ্জন, ভিতরে দুটি প্রাণী—এমন সুযোগ, এমন অবসর, কি নিতান্ত লোভনীয় নয়?

কবিত্ব আমাকে মোটে স্পর্শ করিত না—কিন্তু ইদানীং কথাগুলা কেমন সাদাসিধা গোছের হইত না!

সিসিল কহিল, ব্যাপারখানা খুলে বলো।

একটা সিগার ধরাইয়া সিসিল চেয়ারখানি টানিয়া আমার পাশে ঘেঁসিয়া বসিল।

আমি কহিলাম,—এমন বিশেষ কিছু বলিবার নাই! তবু শোনো,—

আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—এই সেদিনের ঘটনা! ফেব্রুয়ারি মাসের কথা! 'নাইসে' মেলা দেখিবার জন্য বেলা ৮-৫৫ মিনিটের ট্রেণে উঠিলাম—রাত্রের ট্রেণ আমি মোটে পছন্দ করি না। ঘুম হয় না! তাই প্রথম রাত্রেই ট্রেণ মার্সেল পৌঁছিলে নামিয়া রাত্রিটার মত সেখানে ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করিব, স্থির করিলাম!—এবং পরদিন সকালের ট্রেণ ধরিয়া বেলা দুইটা নাগাদ নাইসে পৌঁছিব।

ষ্টেশনে উঃ সে কি ভীড়! ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুগ্রহে একখানি কামরা বেশ দখল করিয়াছিলাম। সে কামরায় সঙ্গীর মধ্যে কেবল লম্বা-কোট-পরা আর একটি ভদ্রলোক! তিন-চারিটা ষ্টেশনের পর তিনি নামিবেন, তখন সম্পূর্ণ কামরাখানি একলা আমারি অধিকারে আসিবে! একেলা! কেবল ট্রেণে চড়িবার সময় এই স্বার্থপর নিঃসঙ্গ ভাবটি এত আরামের, এত আকাঙ্ক্ষার!

ঢুটা ঘণ্টা পড়িয়াছে—ট্রেণ এখনি ছাড়িবে—এমন সময় কামরায় সম্মুখে রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল!

একটি স্ত্রীলোক—পরিষ্কার কণ্ঠে তীব্রস্বরে কহিতেছে,—না, মশায়, না—আমার ঘুমোবার জন্য স্বতন্ত্র কামরা চাইই। ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহাকে বুঝাইতেছে—এখানে সে কামরা দেওয়া যাইতে পারে না—এখন সকল সাড়ে আটটা! সন্ধ্যার সময় সে কামরা মিলিবে!

—কোথায় মিলিবে? আমাকে কতদূর যাইতে হইবে! ইত্যাদি মৃদু ভর্ৎসনায় স্ত্রীলোকটি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

এমন সময় তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল। স্ত্রীলোকটি প্রচুর লগেজ লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই কহিল,—এ কি, কামরায় দুজন লোক!

ষ্টেশন-মাষ্টার বিরক্তির সহিত কহিল,—তা বলে, আপনার জন্য একখানা পুরা গাড়ী তো ছাড়িয়া দিতে পারি না।

—বেশ—টেলিগ্রাম করো—যেন ঘুমোবার গাড়ী পরের ষ্টেশনে পাই। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

স্ত্রীলোকটির সহিত পাঁচ ছয়টা ব্যাগ এবং শীতের কাপড়চোপড় প্রভৃতি অসংখ্য!

তখন প্রচণ্ড শীত। কুয়াশায় সারাদিন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কামরার সার্শি বন্ধ—তাহারি ভিতর দিয়া যতদূর দেখা যায়, কেবলই কুয়াশা—কুয়াশা! বাহিরটা আগাগোড়া যেন কে জমাট বরফে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রীলোকটি সত্যই দেখিতে বেশ! সেই 'রাগ-রাগ' ভাবে মুখখানিকে যেন আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

সঙ্গীটি খুব গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। খপরের কাগজের মধ্যে তিনি এমন নিবিষ্টচিত্ত যে, জগতের আর কোনদিকে চাহিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। প্রবৃত্তিও বুঝি নাই!

তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। ষ্টেশনের কুলি অভ্যস্ত বুলি হাঁকিয়া গেল, লারোচি।

আমাদের গম্ভীর সঙ্গীটি কাগজের তাড়া প্রভৃতি লইয়া নামিয়া গেলেন। 'ষ্টেশন-মাষ্টার', 'ইনস্পেক্টর' প্রভৃতি শব্দে স্থানটা মুখরিত করিয়া স্ত্রীলোকটি আবার স্থির হইয়া বসিল। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে স্ত্রীলোকটি কামরার এক-কোণে বসিয়া রহিল। আমি কাগজ রাখিয়া দিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত তাহার প্রতি কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। কি সূত্রে আলাপ করা যায়, ইহাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা।—"জানালাটা খুলিয়া দিব?" শীত প্রচণ্ড—এ সব মামুলি ভূমিকা নিতান্ত অসঙ্গত। জানালা বন্ধ আছেই,—শীতে খুলিবার কথা তোলা নির্ব্বুদ্ধিতার চিহ্ন।

ক্রমে নিস্তব্ধতা অসহ্য হইয়া উঠিল। একটা নূতন রকমে আলাপের সূত্রপাত করিতে হইবে। কিন্তু কি কথা কহিব? কি কথা?

ভাবিয়া উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় ট্রেণ টোনারে আসিয়া পৌঁছিল। কুলি হাঁকিল,—টোনার—এখানে পঁচিশ মিনিট ট্রেণ থামিবে।

আমার সহযাত্রিণী ধীরে ধীরে ব্যাগ নামাইয়া, লগেজ প্রভৃতি গণিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে নামিল। তখন বেলা তিনটা। ক্ষুধায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহযাত্রিণী কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমিও ভোজনালয় উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিলাম।

টেবিলে বিলক্ষণ ভিড়। নানারঙের পোষাকে, নানারূপ মূর্ত্তি হাসি-গল্প-গুজবের সহিত ভোজনে ব্যস্ত। কিন্তু এ সকলের প্রতি আমার আদৌ দৃষ্টি ছিল না—পাশের ঘরে ভোজনরতা সহযাত্রিণীর প্রতি আমার আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল।

ভোজনাদি শেষ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে আমার কামরার সম্মুখে আসিয়া আমি সিগারেট ধরাইলাম। পঁচিশ মিনিট শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাত্রীরা দলে-দলে আসিয়া আপন আপন কামরা অধিকার করিতেছে। আমিও আসিয়া বসিলাম। সহসা দেখিলাম,—আমার সহযাত্রিণীটি ওধারের প্ল্যাটফর্ম্মে বুকষ্টলে বহি কিনিতে ব্যস্ত!

আমি শঙ্কিত হইলাম! ট্রেণ এখনি ছাড়িবে। প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে এ সময়টুকুর মধ্যে আসিয়া-পড়া অসম্ভব! সর্ব্বনাশ! বেচারীর ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি এখানে পড়িয়া। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে, সারারাত্রি এ শীতে কি অসহ্য কষ্টই হইবে!

গার্ডের বাঁশী বাজিল—আর উপায় নাই! আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে ছুড়িয়া দিলাম। নিকটে একটা কুলী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে কহিলাম, মেমসাহেবের জিনিস!

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—আমি প্রাণপণ বলে তাহার লগেজ প্ল্যাটফর্ম্মে ছুড়িতেছি!

—এ কি, এ কি, মশায়!

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, আমারি সহযাত্রিণী!

উঃ, আমি কি ভুল করিয়াছি! বুকষ্টলের স্ত্রীলোকটিকে আমার সহযাত্রিণী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম! কি বিপদ!

সহযাত্রিণী কহিল, আমার ব্যাগ? লগেজ? কে চুরি করিল?

সে আমার প্রতি চাহিল। কি সে উগ্র, জ্বালাময়ী দৃষ্টি! জীবনে তাহা ভুলিব না।

আমি কহিলাম,—আমার স্বর বাধিয়া যাইতেছিল—ভুল করিয়া আমি প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিয়াছি⋯

—ভুল। আমার লগেজ?

—হাঁ, ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছি! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম—আপনি বুঝি ট্রেণ ধরিতে পারিলেন না—এই প্রচণ্ড শীতে আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই আমি আপনার জিনিসপত্র প্ল্যাটফর্ম্মে একটা কুলির জিম্মায় সব ছুড়িয়া দিয়াছি। পরের ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিয়া দিব। কোন ভাবনা নাই। আমি নিজে না হয়, টোনারে ফিরিয়া আপনার লগেজ লইয়া আসিব! আপনার মত পোষাক-পরা, এমনি সুন্দরী আর একটি মহিলাকে দেখিয়া, আমি ভুল করিয়া বসিয়াছি। ক্ষমা করিবেন! একনিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেলাম।

স্ত্রীলোকটি কহিল,—বেশ করিয়াছেন, মশায়,—এখন আমার উপায়? এই প্রচণ্ড শীতে আমার একখানা গরম কাপড় নাই!

কথাটা ভাবিবার বটে! আমি কহিলাম, আমার আলষ্টার—যদি কিছু মনে না করেন—খুলিয়া দিতেছি, আর আমার এই ব্যাগখানা বেশ গরম! বোধ হয়, বিশেষ অসুবিধা হইবে না!

ধন্যবাদ! কোন প্রয়োজন নাই, মশায়! স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া রহিল!

আমার মনের অবস্থা তখন? মনে হইতেছিল, ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ি! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

আমি কহিলাম,—যদি কিছু মনে না করেন, তো—আমার ব্যাগখানা।

কোন দরকার নাই। আমি তো আপনাকে কিছু বলি নাই, মশায়।

আঃ, কি জ্বালা সে স্বরে!

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম! কহিলাম,—আপনি যদি এই ব্যাগ ও আলষ্টার না লন্ তো আমি এখনি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িব, এখনি—

আমি কামরার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলাম।

সত্যই, হয়তো লাফাইয়া পড়িতাম! মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছিল, কোন জ্ঞান ছিল না—

স্ত্রীলোকটি আমার হাত ধরিল, ব্যগ ও আলষ্টার গ্রহণ করিল। আমি যেন কতক আশ্বস্ত হইলাম!

স্ত্রীলোকটি কহিল,—আপনার যে শীত লাগছে।

আমি কহিলাম,—কিছু না!

শীত খুবই প্রচণ্ড বটে! কিন্তু আমার পাপের ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

তার পর নানা কথাবার্ত্তা! ভালো মনে নাই, কারণ, তখন আমার অসহ্য শীত লাগিতেছিল! কিন্তু আমি প্রাণ দিতে উদ্যত ছিলাম, এত শীত আমার কাছে অতি তুচ্ছ।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় ডিজনে পৌঁছিলাম। টোনারে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম। শীতে একেবারে জমিয়া যাইবার উপক্রম!

রাত্রি সাড়ে আটটায় মেকান! যাত্রিণী শয়ন-কামরার কথা ভুলিয়া গিয়াছে!

রাত্রি সাড়ে ন'টায় ভালে। মহিলাটির কথা অস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। আমার হাতে-পায়ে কোন সাড় ছিল না! নাক জ্বালা করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল! তার পর আর কিছু মনে পড়ে না।

যখন চোখ চাহিলাম, তখন দেখি, সজ্জিত কক্ষে শুইয়া আছি! পাশে—আমার সহযাত্রিণী! আমি কহিলাম,—আপনি? আপনার লগেজ?

সে কহিল,—আমার জিনিষ-পত্র আমি পাইয়াছি,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। এমন করিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হয়?

সে স্বরে কি আশ্বাস, কি করুণা! স্বর্গের বীণাও বুঝি এমন মধুর নয়!

অচেতন অবস্থায় সিরি আমাকে মার্শেলে আত্মীয়ের বাটী লইয়া আসিয়াছে! পরদিন নাইসে গেলাম। সহযাত্রিণী সিরি এবারও আমার সঙ্গিনী। আর বেশী কি বলিব? এক সপ্তাহ পরে বিবাহ!

সিসিল আমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল,—সাবাস।"

প্রায়শ্চিত্ত

১

রল্‌ফের সহিত যখন এশ্‌বি গ্রামের সুন্দরী বালিকা কারেণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন প্রতিবেশিবর্গ একটা ভাবী বিপদের সূচনা আশঙ্কা করিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে সুপাত্রের অভাব ছিল না! সুন্দর, সবল, অবস্থাপন্ন সকল পাত্রই আনন্দের সহিত কারেণের পাণিগ্রহণে উৎসুক ছিল। তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া বনবাসী কাঠুরিয়া রল্‌ফ্‌কে বিবাহ করিতে কারেণের এত আগ্রহের কারণ কি, ইহা ভাবিয়া প্রতিবেশিবর্গ অত্যধিক বিস্ময় প্রকাশ করিল।

কারেণের মাতা বা পিতা কেহই জীবিত ছিল না। সে পিতৃব্যের সংসারে ভারের মত হইয়া উঠিয়াছিল—তাই তার বিবাহে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী মুক্তির আভাস পাইয়া সানন্দে সম্মতি দান করিল। রল্‌ফের সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, নয়নের স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল্য গ্রামের অন্য পুরুষ অপেক্ষা সহজেই কারেণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। রল্‌ফের প্রকৃতি ছিল উগ্র, কিন্তু কারেণের প্রেমের অনাবিল ধারায় সে উগ্রতার তাপ শান্ত হইবে না কি? সেই জন্যই প্রতিবেশিনীবর্গের বিদ্রূপ ও বিরাগের মধ্যে একটি নির্ম্মল প্রভাতে স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার বন-ভবনে যাইবার সময় কারেণ হৃদয়ে এতটুকু দ্বিধা বা আশঙ্কা করে নাই!

রল্‌ফ্‌ কাঠুরিয়া। লোকালয়ের বাহিরে বনের মধ্যে তার ক্ষুদ্র কুটীর। নিকটে দ্বিতীয় মনুষ্যের বাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহারও সহিত রল্‌ফ বড় একটা মিশিত না—মন্তপ রল্‌ফের অশান্ত উগ্র প্রকৃতির কাছে অপরে ঘেঁষিতে চাহিত না। এই রল্‌ফের হাত ধরিয়া, ইহার উপর প্রেমের অসীম নির্ভর স্থাপন করিয়া কারেণ স্বামিগৃহে পদার্পণ করিল!

গ্রীষ্মকাল। নির্জ্জন বনের কোলে জীবন বড় মধুময়! সারাদিন রল্‌ফ্‌ বনে-বনে কাঠ কাটিয়া বেড়ায়; কারেণ এধার-ওধার ঘুরিয়া ফলমূল কুড়ায়,—কখনো বা ছায়া-ঘেরা কুটীরের সম্মুখে বসিয়া জামা কাপড় শেলাই করে, কোন দিন দূর হইতে রল্‌ফের কুঠারের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন দিন বা তাহা শুনা যায় না! তার পর সন্ধ্যার আঁধার নামে, কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, স্বামীর জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় কারেণ পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণতলে বসিয়া থাকে, গাছের আড়ালে, রাঙ্গা মেঘের মধ্যে স্নিগ্ধ সূর্য্য হারাইয়া যায়—চারিধার চন্দ্রের রজতরশ্মিধারায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, রল্‌ফ্‌ আসিয়া কাঠের বোঝা নামাইয়া কারেণকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়—তার সুন্দর ছোট মুখখানিতে চুম্বন করে! জগতে তখন কারেণের আর কোন অভাব থাকে না।

গ্রীষ্মের পর শরৎ আসে। বিহ্বল পবন মাতোয়ারা হইয়া ওঠে—গাছের ডাল নাড়া দিয়া, বিকট হাসিতে সে সকলের ত্রাস জাগাইয়া তোলে! দিনগুলিও ক্রমে হ্রস্ব ও নীরস হইয়া আসে; এবং হিমের প্রবলতায় কারেণ অগ্নিকুণ্ডের পাশে আশ্রয় লয়! রাত্রে কম্পিত দেহে শয্যায় কারেণের চোখে কিছুতে যখন ঘুম আসে না, তখন বাহিরে বায়ু গর্জ্জিতে থাকে, এবং কারেণের মন কি এক ভয়ে আকুল হইয়া ওঠে!

রল্‌ফের মনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তার মুখে এখন আর সে হাসি নাই! দিনান্তে কাজের শেষে সে যখন গৃহে আসে, স্ত্রীর জন্য সে হাসি-আনন্দটুকু আর সে লইয়া আসে না। এখন তার মুখ গম্ভীর—কারেণ যাচিয়া আদর লইতে গিয়া প্রায় নিরাশ হয়। বেচারী কারেণ!

কারেণের মনে সুখ নাই! তার সে উজ্জ্বল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পাখীর মত অসঙ্কোচে সে কত গান গাহিত—শৈশবের সে মধুর গানগুলি এখন আর গাহিতে পারে না। কে যেন বক্ষে আঘাত করে; কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! কি যন্ত্রণা—কি দুঃখ! কারেণ ভাবে, বৃথা এ জীবন! কখনো সে ভাবে, কোথাও পলাইয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় যাইবে? পিতৃব্যের গৃহ মনে পড়ে—সহস্র অযত্ন-অনাদরের মধ্যেও শৈশবের সে গৃহ আজ স্বর্গের মত তার কাছে স্নিগ্ধ মনোরম বলিয়া মনে হয়! কিন্তু সে যে বহু দূরে—দুর্গম পথ—প্রচণ্ড শীত—কাজেই মনের সাধ মনে থাকিয়া যায়।

নববর্ষের শুরু সন্ধ্যায় কারেণের এক কন্যা জন্মিল। চোখের জল মুছিয়া কারেণ কন্যার মুখে চুম্বন করিল। কন্যা দেখিয়া রল্‌ফ্‌ বিরক্ত হইয়া উঠিল। যদি পুত্র হইত, তাহা হইলে কি করিত, বলা যায় না—কিন্তু এ যে কন্যা! সে কি শুধু এই অপদার্থ নারীগুলার জন্য খাটিয়া মরিবে আর ইহারা আরামে বসিয়া তাহার শ্রমলব্ধ আহার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে? একটা স্ত্রী,—সে-ই ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহার উপর আবার কন্যা! রল্‌ফ্‌ উগ্রস্বরে স্ত্রীকে কহিল,—শেষে একটা কন্যা প্রসব করিয়া বসিলে?

কারেণ চক্ষু মুদিল। সে কি বিধাতার নিকট কায়মনোবাক্যে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করে নাই? কিন্তু হায়, এ যে কন্যা! একান্ত দুর্ভাগিনী সে! নিতান্ত উপায়হীনা, অসহায়া।

মেয়েটি তখন এক মাসের। বল্‌ফ্‌ সকালে বাজারে গিয়াছিল—রাত্রে আর গৃহে ফিরে নাই। সারারাত্রি কারেণ মেয়েটিকে বুকের মধ্যে লইয়া অধীরভাবে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ চীৎকার, আর ভিতরে কম্পিত চিত্তে বসিয়া কারেণ একাকিনী!

সে বৎসর শীত প্রচণ্ড ছিল, এবং এই ক্ষুধিত পশুগুলা আহারের সন্ধানে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না!

স্বামীর নিকট বসিয়া কারেণ কত নিরাশ্রয় পথিকের করুণ কাহিনী শুনিয়াছে! এই দারুণ শীতে গৃহহারা, পথহারা পথিক বরফের মধ্যে অবশতনু লইয়া ক্ষুধাতুর অবস্থায় নেকড়ের মুখে প্রাণ দিয়াছে। শিশুর কলহাস্য-মুখরিত কত কুটীর শিশুহারা হইয়াছে। সুখশয্যা-শায়িত কত দম্পতী নেকড়ের নিষ্ঠুর গ্রাসে পড়িয়াছে! তাই স্বামীর জন্য ভাবিয়া একাকিনী কারেণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে সারারাত্রি কি কষ্টই ভোগ করিয়াছে!

ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল। তুষারাবৃত বনের উপর সূর্য্যের রশ্মি ছড়াইয়া পড়িল, কারেণের মনে জীবনের আশা আবার নূতন করিয়া জাগিল।

দিবা দ্বিপ্রহরে বল্‌ফ্‌ গৃহে ফিরিল। বদ্‌ সঙ্গীগুলার সহিত সারারাত্রি বসিয়া সে মদ্যপান করিয়াছে। তাই, মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ। সে আসিয়া দেখে, কোণে বসিয়া কারেণ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে; কপালে শীর্ণ হাতখানি বুলাইতেছে। কারেণ চাহিয়াই দেখিল, স্বামীর কি এ রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি! মুখে না আছে কোমলতা, না আছে লালিত্য। একটা ক্রূর হিংসায় বল্‌ফের চোখ দুটা যেন জ্বলিতেছে। কারেণ ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া কন্যাকে পার্শ্বের বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল!

বল্‌ফের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কার্য্যে অপটু এই মেয়েটা পুতুলের মত অসার, কুৎসিত! সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি? সমস্ত দিন তুমি বসে থাকবে, কোলে ঐ মেয়েটা! আর কোন কাজ নাই তোমার! নেকড়েগুলা তোমাকে গ্রাস করে না কেন? যাও, আমার জন্য খাবার নিয়ে এসো। না হলে এখনই ঐ মেয়ে-শুদ্ধ তোমাকে বরফের মধ্যে তাড়িয়ে দেবো! যাও, দাঁড়ালে চলবে না!

আহারাদি শেষ করিয়া স্কন্ধে কুঠার লইয়া বল্‌ফ্‌ বনে বাহির হইয়া গেল। রুদ্ধ বেদনায় কারেণ গৃহের কোণে বসিয়া রহিল, আহার করিল না। আহারে রুচি নাই, জীবনেও তার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া মরা যায়! দুর্ব্বিসহ এ জীবন-ভার বহিবার ক্ষমতা তার নাই! আর সহ্যও হয় না! ঐ ক্ষুধার্ত্ত নেকড়েগুলা,—একবার তাহাদের সম্মুখে গিয়া ডাকি,—'তোরা আয়, আয়, আমার এ ব্যর্থ জীবন লইয়া তোদেরও ক্ষুধার শান্তি হোক্‌, আমারো সকল জ্বালা জুড়াক!'

কিন্তু মেয়েটি! আহা, সুন্দর মুখখানি তার! মিটি-মিটি চাহনিতে কতখানি নির্ভরতা, কতখানি আশ্বাস! ছোট হাতটি নাড়িয়া-চাড়িয়া সে মায়ের আদর কুড়াইতে চায়! আহা, অবোধ! জানে না, তার মায়ের শক্তি কতটুকু! বুকের মধ্যে চাপিয়া তার কচি রাঙা ঠোঁটে অজস্র চুমা ছাড়া হতভাগিনী মায়ের দিবার যে আর কিছু নাই রে বাছা, কিছু নাই!

শীতের ছোট বেলা নিমেষে ফুরাইয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া কারেণ দীপ জ্বালিল। ধীরে ধীরে জানালার কাছে সেটি রাখিয়া দিল। তাহারই ক্ষীণ আলোক রেখায় পথ চিনিয়া স্বামী গৃহে ফিরিবে। ঘুমে কারেণের চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে—শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। ঠাণ্ডা বাতাসে কারেণের হাড় অবধি কাঁপিয়া উঠিল। রাসিয়া চোখ মুছিয়া সে দেখে, বল্‌ফ্‌। মূর্ত্তি তার আরো ভীষণ, আরো কঠোর! বল্‌ফ্‌ কুঠারখানা ভূমিতে ফেলিয়া দিল! কাঠ কাটিতে গিয়া আজ তার একটা আঙুলের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল! তখনও ক্ষতস্থানে জ্বালা ছিল! রাগের মাত্রা তাই বাড়িয়াছিল। বল্‌ফ্‌ কহিল,—কি? আর কোন কাজ নাই, শুধু ঘুম! আর ঐ মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে! কষ্ট করিয়া একটুকরা রুটী যদি আমি সংগ্রহ করি, তাতে আবার তুমি ভাগ বসাইতে চাও! যাও, বাহির হইয়া যাও, এ ঘরে আর এক দণ্ড নয়! নিজে রোজগার করিয়া লইয়া এসো, আমি আর পারিব না।

ভীত কম্পিত কণ্ঠে কারেণ কহিল,—কিন্তু—কিন্তু বল্‌ফ্‌, আমি আজ কিছুই খাই নাই—

বল্‌ফ্‌ কহিল,—"কোন কথা শুনিতে চাই না। খাও বা না খাও, এ ঘরে থাকা হইবে না! যাও!

কারেণ কাঁদিয়া ফেলিল, —"বল্‌ফ, বল্‌ফ, আমাকে তাড়াইয়া দিবে? তুমি জানো, এ রাত্রে বনে বাহির হইলে নেকড়েরা এখনি আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে! আরো জানো, আমার শরীর এখন অসুস্থ, চলিতে পারি না—দুর্ব্বল আমি! তার উপর আমি চলিয়া গেলে তোমার মেয়ের অবস্থাই বা কি হইবে? আমারি বা কোথায় আর স্থান আছে?

রল্‌ফ কহিল,—কি? তুমি মনে করেছ, আমি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে বসে থাকব! কখনো না! ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও! তোমাদের কারো এখানে স্থান নাই! কোথায় যাবে, তা আমি জানি না। তবে এখানে থাকা হবে না! এসো, বেরিয়ে এসো।"

কারেণের হাত ধরিয়া রল্‌ফ আকর্ষণ করিল, কহিল, নাও, তোমার মেয়েকে নাও।

কারেণ মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। রল্‌ফ কারেণের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল।

বাহিরে বাতাসে কারেণ দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তুষারের কণাগুলি তার মুখে-চোখে বার-বার উড়িয়া পড়িতেছিল। প্রাণপণ বলে কম্পিত-কণ্ঠে কারেণ ডাকিল, —রল্‌ফ—রল্‌ফ—আজ রাত্রিটা শুধু থাকিতে দাও! কাল সকালে চলিয়া যাইব। আজ রাত্রি—রাত্রিটুকু শুধু! স্ত্রী-কন্যাকে এমনভাবে হত্যা করো না। রল্‌ফ—রল্‌ফ—

কারেণ ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। কিন্তু কোথায় রল্‌ফ?

সে বসিয়া পড়িল। তার হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বার বন্ধ করিয়া রল্‌ফ অগ্নির সম্মুখে আসিয়া বসিল। পকেট হইতে ছোট শিশি বাহির করিয়া লোহিত তরল পদার্থটুকু সে গলাধঃকরণ করিল। তার পর একটা পাইপ ধরাইয়া নিজের মনে কহিল,—আঃ! একটা রাত্রি আরামে কাটাইব। অসুখ—অসুখ—চারিধার হইতে একটা নিরানন্দ ভাব যেন আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল!

বাহিরে বায়ু গর্জ্জিতেছে। তুষারের টুকরাগুলা দরজা-জানালায় টিক্‌টিক্‌ করিয়া আসিয়া ঘা দিতেছে। ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ চীৎকার স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শুনা যাইতেছিল!

একটা বোতলের ছিপি খুলিতে খুলিতে রল্‌ফ কহিল,—বাঃ চারিধারে যেন আজ আনন্দের উৎসব লাগিয়াছে!

৩

পরের বৎসর—তেমনই প্রচণ্ড শীত। ঘরের বাহির হওয়া যায় না! অনশনে নেকড়ের গ্রাসে গ্রামের লোক প্রাণ হারাইতেছে।

প্রতি নেকড়ের মাথা-পিছু যথেষ্ট পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে! শিকারীর দল বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—শীতজর্জ্জর নিস্তব্ধ রাত্রে তাদের বংশীধ্বনি ও কুকুরগুলার চীৎকার এই ভীষণতার মধ্যেও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে!

রল্‌ফের বাড়ীর পাশ দিয়া তারা চলিয়া যায়—পুরানো কাহিনী মনে পড়ে, তাদের কঠোর প্রাণ শিহরিয়া ওঠে!

কারেণ ও তার কন্যার অন্তর্দ্ধানের পর গ্রামের লোক রল্‌ফের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল। রল্‌ফ বলিয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া সে দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে পথে সে রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড ও কয়েক-টুকরা অস্থি দেখিতে পায়। তাহা দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারে—কারেণ হয়তো, বনে রল্‌ফের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। তার পর, নেকড়ের গ্রাসে—হায়, হায়, কি দুরদৃষ্ট রল্‌ফের!

গ্রামের লোক কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করে না। তারা বলে, রল্‌ফই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া পথে অস্থি ও বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে! নিশ্চয়।

৪

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। রল্‌ফ আগুনের কাছে বসিয়া হাত-পা গরম করিতেছে! সহসা সে শুনিল, দ্বারে কে আঘাত করিতেছে!

কোন পথহারা পথিক আর কি! তার জন্য রল্‌ফ এ বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতে পারে না। এখনও দ্বারে ঘা দিতেছে? আবার? কি নির্লজ্জ!

রল্‌ফ দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল,—দাও ঘা, যত ইচ্ছা, দাও। আমার বাড়ী আমার নিজের জন্য—বরফ-মাখা ভিখারীগুলার জন্য নয়।

কিন্তু নারীকণ্ঠে কে ঐ ডাকে না? বেশ সুস্পষ্ট, মিষ্ট সুর!

রল্‌ফ, রল্‌ফ, দ্বার খোল। শীঘ্র দ্বার খোল। বড় দরকার!—

এ কি, তাহারই নাম ধরিয়া ডাকে যে! রল্‌ফ ভাবিল, কে এ নারী? কি চায়? একাকিনী অসহায় অবস্থায়, এই ভীষণ সন্ধ্যায় নারী পথে বাহির হইয়াছে! আবার রল্‌ফের বাটীতে আশ্রয় চায়! বিস্ময়ের কথা! এ কি তাহারই কোনও পূর্ব্ব-প্রণয়িনী! প্রেম-অভিব্যক্তির পক্ষে কাল ও স্থান বেশ অনুকূল বটে! এই প্রচণ্ড শীত! ভীষণ সন্ধ্যা! কি এ প্রহেলিকা!

রল্‌ফ ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে গরম কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃতা, মুক্তকুন্তলা অপূর্ব্বোজ্জ্বলা কিশোরী মূর্ত্তি! কেশদাম আগুল্‌ফ লুণ্ঠিত! এই ঘন-তুষারপাতের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলেও কি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী!

রল্‌ফ অনেকক্ষণ স্থির নয়নে দেখিতে লাগিল, পরে কহিল,—"তুমি আশ্রয় চাও? কিন্তু ভীষণ রাত্রে একাকিনী বাহির হইয়াছ যে! বড় দুঃসাহস তোমার! ঐ শোনো নেকড়ের চীৎকার।"

কিশোরী মৃদুকণ্ঠে কহিল,—দুঃসাহস নয়! এই বনেই আমি থাকি! রাত্রি ভীষণ বটে, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য

কঠোর! আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্ম এসেছি! এখন এস রল্‌ফ, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।

রল্‌ফের দেহের মধ্য দিয়া একটা সুদূর ভয়ের বিদ্যুৎ-শিখা যেন বহিয়া গেল। ভয় কি, তাহা জীবনে বোধ হয় রল্‌ফ্ আজ প্রথম অনুভব করিল!

রল্‌ফ কহিল, কিন্তু—

—চুপ!—কিশোরী কহিল,—কিন্তু না! এস—এখনই—।

'না' বলিবার শক্তি যেন রল্‌ফের ছিল না। সে যন্ত্রচালিতের মত দ্বিতীয় বাক্য ব্যতিরেকে কিশোরীর অনুসরণ করিল।

*　　*　　*

বনের মধ্যে ঝড় বহিতেছে—গাছপালা যেন ভাঙিয়া পড়িবে! তাহার উপর, এই কন্‌কনে বাতাস হাড়ে গিয়া বিঁধিতেছিল।

রল্‌ফ্ কাঁপিতে-কাঁপিতে কহিল,—উঃ, কি শীত।

কিশোরী রল্‌ফের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—হাঁ, খুব শীত। যেদিন কারেণকে তার শিশুর সহিত গৃহের বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেদিনও ঠিক এমন শীত ছিল!"

রল্‌ফের দেহ কম্পিত হইল। এ অপরিচিতা নারী কারেণের কথা কি করিয়া জানিল?

কিছুক্ষণের জন্ম কাহারও মুখে কথা নাই। পায়ের কাছে বরফ পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে! দূরে হঠাৎ নেকড়ের চীৎকার শুনা গেল। রল্‌ফ্ কহিল,—ঐ নেকড়ে! আঃ, আমি যদি আমার বন্দুক বা কুঠারটা সঙ্গে আনিতাম! শেষে নেকড়ের মুখে প্রাণ দিব!

কিশোরী কহিল,—সেদিনও নেকড়েগুলা এমন ক্ষুধিত ছিল, তাদের দংশন এমনি ভীষণ ছিল, যেদিন কারেণ ও তার কন্যা এই বনে প্রাণ হারায়!

রল্‌ফ চীৎকার করিয়া উঠিল,—কে তুমি, বলো!

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—এখনি জানিবে, ব্যস্ত হয়ো না।

আবার দুজনে চলিতে লাগিল। বাতাস আরও গর্জ্জন করিতে লাগিল, শীত আরও প্রচণ্ড হইল। রল্‌ফের দেহ অবশ হইয়া আসিল। তার নাক-মুখ বহিয়া টস্‌-টস্ করিয়া দু' ফোঁটা রক্ত পড়িল।

বরফের উপর রল্‌ফ বসিয়া পড়িল, রুদ্ধস্বরে কহিল,—আমাকে মারিয়া ফেল, আর আমি হাঁটিতে পারি না।

হঠাৎ রল্‌ফ চাহিয়া দেখে, এ সেই স্থান! এইখানে কারেণের রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল! এত তুষারপাতেও সে রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই! ঐ না ওখানে বরফটা এখনো লাল টক্‌টক্ করিতেছে! উঃ!

কিশোরী কহিল,—রল্‌ফ, মনে পড়ে?

রল্‌ফ দেখিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে কিশোরীর চোখ দুটি যেন তারার মত জ্বলিতেছে। জানুলুণ্ঠিত কেশের উপর স্বর্ণ ঝরিতেছে!

রল্‌ফ কহিল,—কি?

কিশোরী কহিল,—এই স্থান—মনে পড়ে?

রল্‌ফ চীৎকার করিয়া উঠিল,—কে তুমি? বলো, বলো, তুমি দানবী, না দেবী, না উন্মাদিনী। কি তুমি চাও? কেন তুমি আমাকে এখানে টানিয়া আনিলে? তুমি কি জানো না, এখনই হয় প্রচণ্ড শীতে, নয় নেকড়ের গ্রাসে প্রাণ হারাইব? আঃ! এই ভয়ঙ্কর সময়ে এখনও তোমার মুখে হাসি? ওঃ! কে তুমি? পাষাণী, নারী তুমি?

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে, এই স্থানে অসহায় অবস্থায়, এমনই ভাবে কারেণ কি প্রাণ হারায় নাই? রল্‌ফ, তার কথা এত শীঘ্র তুমি ভুলিয়া গেলে। বেচারী কারেণ!

রল্‌ফের আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কিশোরীর হাত ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোথায় লুকাইল? সে কি তবে ছায়া? বিভীষিকা? কাহার অনুসরণ করিয়া সে এতদূর আসিয়াছে? রল্‌ফের শির তখন বরফের উপর লুণ্ঠিত হইতেছিল। কাতর মৃদু কণ্ঠে রল্‌ফ কহিল,—তুমি কে, তা বলিবে না?

রল্‌ফ শুনিল, দূর হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্টকণ্ঠে কে কহিল,—আমি নিয়তি। যে কাজ করেছ, তার প্রতিফল দেবার জন্য আমি এসেছি! পাপ করে কেউ বিধাতার রাজ্যে পরিত্রাণ পায় না। নির্দ্দোষ বা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে পরিত্রাণ নেই! কেহ শীঘ্র ফল ভোগ করে, কেহ বা দু'দিন পরে! আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! ঐ শোনো, নেকড়ের চীৎকার! আরও কাছে! ঐ দেখ, দূরে ছায়ার মত কি ছুটিয়া আসে! আমি আসি…!

দিনের আলোয় গ্রামের লোক দেখিল, বরফের উপর কতকগুলা অস্থিখণ্ড ও একটা রক্তাক্ত জামা পড়িয়া রহিয়াছে। এ জামা রল্‌ফের না? কিন্তু বন্দুক বা কুঠার ফেলিয়া রল্‌ফ এমন অবস্থায় বনে আসিল কেন? অনুতাপের জ্বালায়? না, চিন্তার তাড়নায়? কে উত্তর দিবে? রল্‌ফের মৃত্যুর কারণ কি, কেহ জানিল না! মূক বনানী সে গোপন রহস্য মানুষের কাছে ভাঙিল না! শুধু পত্রমর্ম্মরে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা ভাবিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল!

মুক্তার মালা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কুশী-লব

ব্রজেন্দ্র	... ...	ধনাঢ্য যুবক—বয়স ত্রিশ বৎসর।
লীলা	... ...	ঐ স্ত্রী—বয়স একুশ বৎসর।
বিন্দু	... ...	লীলার দাসী।

দৃশ্য—লীলার কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

[কক্ষমধ্যে একধারে একখানি বৃহৎ দর্পণ, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লীলা সাজসজ্জায় ব্যস্ত। পাশে অলঙ্কারাদি ছড়ানো রহিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের মাতুলালয়ে তাহার মামাতো ভাইয়ের বিবাহোপলক্ষে প্রীতি-ভোজন, সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণে যাইবে। সংসারে ব্রজেন্দ্র-নাথের বিধবা মাতা ও অন্যান্য পোষ্যবর্গ আছেন। লীলা ধনি-কন্যা, আদরের বধূ এবং শিক্ষিতা।]

লীলা। যত তাড়াতাড়ি করতে যাই, ততই একটা না একটা বিভ্রাট ঘটে! ব্রুচটা আবার কোথা গেল? ভালো জ্বালা! (খুঁজিয়া ব্রুচ আঁটিতে লাগিল) এঁরো আজ দেখা নেই! যাবার আগে একটু দেখা হবে, তার জো কি! কি মহাকাজে ঘোরেন, তাও বুঝি না। দিবারাত্রি টো-টো-টো। ভালো লাগে? দু'দণ্ড আমার সঙ্গে কথা কবার সময় হয় না, পাছে স্ত্রৈণ হয়ে পড়েন! ঐ যে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে! কোকিলের ডাক শোনা গেছে! বসন্ত তা হলে আসছেন! (ব্লাউশের বোতাম আঁটিতে লাগিল।)

ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবেশ

ব্রজেন্দ্র। মরি, মরি এ কি রূপ হেরি!
জীবন্ত মাধুরী,—
দেবী কোন্ পশিয়াছে গেহে
লাবণ্য উথলে, সারা অঙ্গ বাহি—

না, আর পারি না। বাপ! কাব্য কি ভীষণ ব্যাপার!

লীলা। থামো, থামো। বাঙলা সাহিত্যের গলা টিপে আর খুন করো না।

ব্রজেন্দ্র। যথা আজ্ঞা, সুলোচনে।

লীলা। তুমি যে দেখছি, অভিনয় আরম্ভ করে দিলে।

ব্রজেন্দ্র। বটে! এটা অভিনয়-মঞ্চ নয়! আমার ভুল হয়েছিল! তুমি এমন সাজ্জিত সুন্দর দেহে, ব্রজেন্দ্র-গেহে 'লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্তি-র্নয়নয়ো' হয়ে দাঁড়িয়ে আছ —সে দিন টাব্রু দেখে এসেছি—এখনো তার নেশা ছাড়েনি।

লীলা। বেশ, আর বিভ্রমে কাজ নেই! প্রকৃতিস্থ হও।

ব্রজেন্দ্র। যথা আজ্ঞা! তবে অকস্মাৎ এ অধীনকে মোহিনীবেশে প্রলুব্ধ করবার এমন কি প্রয়োজন ঘটলো জানতে পারি?

লীলা। তুমি মজার লোক দেখছি। হাবুঠাকুরপোর বিয়ের আজ বৌভাত না? ভুলে বসে আছো, যাবে না বুঝি?

ব্রজেন্দ্র। (উদরে হস্ত রাখিয়া) সেটা একেবারে ভুলে বসেছিলুম। ছাখো না, না হলে গাঁটের পয়সা বার করে হোটেলে কতকগুলো কুপথ্য গলাধঃকরণ করে এলুম!

লীলা। এমন পেটুক যদি জন্মে দেখে থাকি! এক মুহূর্ত্ত যদি না খেলেন, তো মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম।

ব্রজেন্দ্র। অপবাদ যখন দিলে, তখন স্পষ্টই বলি, সম্প্রতি একটু অধর-সুধার জন্য কাতর হয়ে পড়েছি। (লীলাকে চুম্বন করিল)

লীলা। আঃ,—ছাড়ো। (মুখ সরাইয়া লইল।)

ব্রজেন্দ্র। ইতর জনকে মিষ্টান্ন থেকে বঞ্চিত করতে চাও? হা রে পাষাণী!

লীলা। ছাখো, তোমার ও সখের থিয়েটার-মিয়েটার-গুলো ছাড়ো দিকি? দুদণ্ড সুস্থির হয়ে কথা কবার জো নেই—নাটকের গৎ আওড়াতে বসলে!

ব্রজেন্দ্র। তবে দেখুন—মহীয়সী মহিলে, এ অধম আপনারি কাজে গেছলো—(পকেট হইতে ছোট বাক্স বাহির করিয়া মুক্তার মালা বাহির করিল) এই নাও।

লীলা। বাঃ বেশ তো! এ তোমাদের টেটের নকল মুক্তো বুঝি? ছোট খুড়ির গলায় সে দিন দেখেছিলুম—দেখে কিছু ধরা যায় না।

ব্রজেন্দ্র। তুমি যে জহুরী হয়ে উঠলে! কারো অন্ন আর রাখবে না দেখছি।

লীলা। তার মানে?

ব্রজেন্দ্র। এটি আসল মুক্তোর মালা। তোমার জন্য কিনে আনলুম। সত্যেনের স্ত্রীর ছিল, জড়োয়া গহনা সে আগাগোড়া বেচবে। তাই আনলুম। তোমার যদি পছন্দ হয় রাখি। কি বলো?

লীলা। কত দাম?

ব্রজেন্দ্র। দাম শুনলে তবে বুঝি পছন্দ হবে! বাঃ! পছন্দর standard বেশ। তা এর দাম নেহাৎ মন্দ নয়।

লীলা। কত?

ব্রজেন্দ্র। আটশ' টাকা।

লীলা। আটশ' টাকা?

ব্রজেন্দ্র। সন্দেহ হচ্ছে?

লীলা। মা দেখেছেন?

ব্রজেন্দ্র। না—দেখিয়ো তুমি! মা সেদিন মুক্তোর মালার কথা বলছিলেন।

লীলা। তাহলে নেওয়া যাক্। আজই দাও, হাবু-ঠাকুরপোদের বাড়ী গলায় দিয়ে যাই।

ব্রজেন্দ্র। এখনো দাম দেওয়া হয়নি। তা এখন শোনো, দোহাই তোমার—ও নকল হীরে-মুক্তোগুলো আর পরো না। ছি! যে একটু জানে, তার চোখে ধরা পড়তে দেরী হয় না!—কি যে ঢেউ উঠেছে। টেটেরা পয়সা বড় লুঠ করলে না! কতকগুলো ধুলোমাটি যা-তা দিয়ে—আচ্ছা টাকাটা কামালে!

লীলা। ছোট খুড়ি অনেকগুলো জিনিস নিয়েছেন—ঠিক এই রকম সুন্দর মালা নিয়েছেন—দাম মোটে ষোল টাকা! (গলায় পরিল)

ব্রজেন্দ্র। ছাখো লীলা, এখন আসল কথা শোনো—জিনিসটা কিনতে কিছু পয়সা লেগেছে—এটি যেন ইয়ারিং আংটির মত হারিয়ে বসো না,—জিনিসপত্রে একটু যত্ন শেখো। জিনিস হারানোর জন্য যদি খেতাব মেলবার সম্ভাবনা থাক্‌তো তো তুমি 'মহারাজা'-টাজা গোছ একটা খেতাব পেতে। অন্ততঃ 'কাইসার-ই হিন্দ' সোনার মেডেল। এবছর কটা জিনিস হারিয়েছ দেখি,—আংটি দুটো, পাথর বসানো, আর সেই সাপ মুখোটা,—আর ইয়ারিং একটা, সোনার শাঁখা, চিকণি। ওঃ, এ যে সংখ্যা করা যায় না।

লীলা। আচ্ছা, আচ্ছা, থামো। আমি কি ইচ্ছে করে হারাই?

ব্রজেন্দ্র। না। তাদের হাত-পা আছে, জোর জবরদস্তি করে সব ছুটে পালায়।

লীলা। আচ্ছা গো আচ্ছা—আর ঠাট্টা করতে হবে না—এবার খুব যত্ন করে রাখবো, তখন দেখো!

ব্রজেন্দ্র। বেশ, তোমরা তবে যাও। হাবুদের বাড়ী আমি রাত্রে যাব, এখন আবার ইলেক্‌ট্রিক লাইন সারবার জন্য লোক এসেছে। দেখিগে, বাইরে বসে আছে। তোমরা ফিরতে বেশী দেরী করো না।

[প্রস্থান।

লীলা। (দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) নাঃ—আমারই দোষ! কেমন যে কুড়েমি ধরে—গহনাগুলো খুলে কোথায় ফেলি, কিছু হুঁস থাকে না। এবার থেকে আগে গহনাগুলোর ব্যবস্থা করবো, (মুক্তার মালা খুলিয়া টেবিলে রাখিল) রুমালখানা বার করি।

বিন্দু। ওগো বৌদিদি, মা একবার ডাকছেন—তাঁর কি দরকার—এখনি তুমি একবার এসো।

লীলা। কেন রে?

বিন্দু। তা আমি জানি না;—বললেন, শীগ্‌গির একবার আসতে বল্।

লীলা। চ'!

[লীলার প্রস্থান

বিন্দু। বাঃ, বেশ হার দেখছি! দাদাবাবু বুঝি আজ কিনে এনেছেন। কই, এত দিন দেখিনি। তা' হ'লে আমাদেরো বখশিস্ নোবো, বৌদির কাছ থেকে। গহনা হারালে বকুনি খাবো, আর নতুন গহনা হলে বুঝি বখশিস্ পাবো না? বা রে! যাই বলিগে।

[প্রস্থান

(ব্রজেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। বকিয়ে মারলে বেটারা! (মুক্তার মালা দেখিয়া) দেখেচো, এত করে সাবধান হতে বললুম—তা গ্রাহ্য নেই! এখানে বেশ ফেলে রেখে চলে গেছে! নূতন চাকর-বাকর! এখনি যদি কেউ তুলে নেয়! যদি

না নেয়, তা'রা গাধা! নাঃ—লীলাকে নিয়ে আর পারা গেল না! ভাগ্যে আমি এলুম! দাঁড়াও—জব্দ কর্‌ছি। (মুক্তার মালা হাতে তুলিয়া) কোথায় এখন লুকিয়ে রাখি? (পকেট হইতে রূপার ডিবা বাহির করিয়া) বেশ হয়েছে—এর মধ্যে পুরে পকেটে রেখে দি। ভারী জব্দ হবে'খন। (ডিবার মধ্যে হার রাখিবে, এমন সময় বিন্দুর পুনঃ-প্রবেশ)

বিন্দু। ও কি গা, দাদাবাবু? ডিপের মধ্যে হার রাখ্‌চো কেন? ও—বুঝেচি—লুকিয়ে রাখ্‌চো?

ব্রজেন্দ্র। কে? বিন্দু! দেখ দেখি তোর বৌদির আক্কেল! সামনে এমনি ফেলে গেছে, নতুন লোক-জন এখনি কে নেবে'খন— তারপর থানা-ফৌজদারী করে মরি আমি! তুই তাকে বলিসনি যে আমি রেখেছি! যদি তোর বৌদি খোঁজ করে বলিসনি। আমি যে এ ঘরে এসেছি, তাও বলিসনি। যদি জিজ্ঞাসা করে বলিস্—আলো সারাবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক আলো-ওয়ালা এসেছিল।

বিন্দু। বাঃ, বাঃ, বেশ হবে। কিন্তু আমার বখশিস্ চাই!

ব্রজেন্দ্র। আচ্ছা, আচ্ছা।

[প্রস্থান।

বিন্দু। ঐ বুঝি বৌদিদি আসছে—আমিও লুকোই একটু।

[প্রস্থান।

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

লীলা। (টেবিলের নিকট আসিয়া) কৈ—মালাছড়া কোথায় গেল? বাঃ, কোথা রাখলুম আবার? এই খানেই রেখে গেছলুম! নাঃ, আমার মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে! মাগো! শুনলে এখনি কি বলবে! তা বলে একটুও ঘর থেকে কি মানুষ বেরোবে না? আচ্ছা, গেরো! (চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) কোথাও যদি পাই! টেবিলের উপর রেখেছিলুম, বেশ মনে আছে আমার! চোর যেন ওৎ পেতে বসেছিল! নাঃ, এমন হলে আর পারি না! বাবা রে,—আমার ডাক্ ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে!—বিন্দু—বিন্দু—
(নেপথ্যে—বিন্দু। কেন গা বৌদি?)

(বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। ডাকচো?

লীলা। আচ্ছা, আমি চলে যাবার পর, এ' ঘরে কেউ এসেছিল?

বিন্দু। আমি বাবু পানক'টা ধুতে গেছলুম।

লীলা। আহা, তোকে বলছি না। বলি—আর কেউ এসেছিল কি না, জানিস?

বিন্দু। আমি কি করে জানবো গো? আমার তো আর ঘাড়ে পিঠে চোখ নেই!

লীলা। আ মর, আবার চেঁচায়! বলি, দেখেছিস্ কি কাউকে?

বিন্দু। কেন গা, বৌদি?

লীলা। এমনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—(টেবিলের নীচে খুঁজিতে লাগিল)

বিন্দু। কিছু হারিয়েছ নাকি, বৌদি?

লীলা। দেখ, কাউকে বলিসনি, মস্ত বিপদে পড়েছি আমি! মুক্তোর হার,—নতুন,—একবারে আট'শ টাকা দাম, তোর দাদাবাবু এখনি এনে দিয়েছেন—মা এখনো দেখেন নি! এই খানে রেখে আমি মার কাছে গেছলুম —এসে আর দেখতে পাচ্ছি না। কে নিলে? আমারো যেমন গেরো—যদি সঙ্গে নিয়ে যেতুম!

বিন্দু। ও মা, বলো কি গো? ঐ যে মিন্সেরা বেরিয়ে গেল, তাহ'লে তাদেরি কাজ নয় তো বৌদি?

বিন্দু। কোন মিন্সে?

বিন্দু। কেন, ঐ যে আলোওয়ালা মিন্সে গো বৌদি, ইলেক্ট্রি আলো সারে। ও মা, দিনে ডাকাতি?— আস্পর্দ্ধাও কম নয়। এ কথা এখনি দাদাবাবুকে বলতে হবে—থানা-পুলিস ডাকুক। ও মা, এ কি কথা গো!

লীলা। কিন্তু, এখন তুই চুপ্ কর্! তুই কাকেও বলিস নে কিছু! সে আমি বলবো'খন! আগে তুই এক কাজ কর্ দেখি! ছোট খুড়ির কাছে চট্ করে যা— তাঁর কাছ থেকে তাঁর মুক্তার মালা ছড়াটি চেয়ে নিয়ে আয়—আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি!

বিন্দু। তা যেন যাচ্ছি বৌদি, কিন্তু এত টাকার জিনিসটা! দেরী করা কি ভালো? কি জানি বাবু তুমি কি বোঝো! বড় মানুষের বড় কথা!

লীলা। আয় তুই, আমি চিঠি দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বিন্দু। ও মা, এ কি কথা গো—(বলিতে বলিতে সবিস্ময়ে লীলার অনুসরণ করিল।)

(ব্রজেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। কৈ? কোথায় গেল? হাবুদের বাড়ী চলে গেল না কি? হারের খোঁজ না করেই? নারী-চরিত্র বটে! এখনি একটা বক্তৃতা করে ফেলতে পারি কিন্তু শ্রোতার অভাব। আরে, এই যে

আসছেন। বাঃ! গলায় মুক্তার মালাও দেখছি—কিমিদমিন্দ্রজালম্?

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

কি গো, এখনো তোমরা যাওনি? তোমাদের সাজসজ্জা করতে যে কর্ম্মবাড়ীর লুচি-তরকারী ফুরিয়ে গেল।

লীলা। না—এই যে যাচ্ছি! দেখি, মার দেরী কত!

[প্রস্থান

ব্রজেন্দ্র। তাই তো! এ মালা পেলে কোথায়? ফস্ করে আমি জিজ্ঞাসা করতেও পাচ্ছি না। এই যে বিন্দু—

(বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। ও মালা কোথায় পেলে?

বিন্দু। আমাকে বলতে মানা করেছে বৌদি।

ব্রজেন্দ্র। নে—বল্—একটা টাকা দোবো'খন।

বিন্দু। আমাকে বুঝি ঘুস্খোর পেলে—দাদাবাবু?

ব্রজেন্দ্র। আবার ন্যাকামি করে! বল্ না।

বিন্দু। হার খুঁজে না পেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কে এসেছিল এ ঘরে। আমি বললুম, ইলেক্ট্রিক্ আলা-ওলা। তখন চুপিচুপি ছোট খুড়ির কাছ থেকে তাঁর হার আনতে বললে। আমি এনে দিলুম। এই যে বৌদি—

ব্রজেন্দ্র। আমার জন্য পান আন্ তো বিন্দু।

[বিন্দুর প্রস্থান

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

লীলা। এই যে তুমি! মা তোমাকে ডাকছেন—বৌ দেখবার জন্য গিনি চাই—না—কি চাই!

ব্রজেন্দ্র। এখনো তোমাদের হলো না—ষ্টেজে নামতে যাচ্ছ না তো!

[প্রস্থান।

(বিন্দুর পান লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। দাদাবাবুর ডিপে কোথা গা বৌদি? পান চাইলেন!

লীলা। দে আমার কাছে। (পান লইল) তুই কিছু বলিস্নি তো বিন্দু?

বিন্দু। তুমি ক্ষেপেচো বৌদি? তেমন বিন্দু পাওনি।

লীলা। তাই তো বিন্দু, যেতে আমার একটুও পা সরছে না। অত টাকার জিনিষটা হারালুম—বুড়ো মাগী! ছিঃ, ছিঃ!

বিন্দু। তাই তো বৌদি!

লীলা। রাত্রে ফিরে এসে বলবো—এখন বললে হৈ চৈ পড়ে যাবে, এসে আর একবার ভালো করে খুঁজবো! না হলে মার খেয়ে মরবে সব চাকর-বাকরগুলো!

বিন্দু। সে আর পেয়েচ! যে মিন্সে পাকা চোর!

লীলা। পালাবে কোথায়? অত টাকার জিনিস! যাই আমিই পান নিয়ে!

[প্রস্থান

(ব্রজেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। মেয়েদের নিয়ে সংসার করার চেয়ে বনে যাওয়া ভালো! সময়ের গলা টিপে খুন করতে এমন আর জুটি নেই? জ্বালাখ্যাপার দল সব! কই, পান কই?

বিন্দু। বৌদি যে নে' গেল। বাঃ!

ব্রজেন্দ্র। (টেবিলে ডিবে রাখিয়া জামা খুলিয়া বসিল এবং সিগারেট ধরাইল; পরে, মনে-মনে গান ধরিল—

"কেন ধরে রাখা সে যে যাবে চলে,
মিলন-যামিনী গত হলে।"

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

লীলা। এই যে তুমি! পান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি—যেন লুকোচুরি খেলা!

(বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। দাদাবাবু, মাখ্না বললে, সঙ্গীত সমাজ থেকে কে একজন বাবু এসেছেন।

ব্রজেন্দ্র। (লাফাইয়া উঠিল) ভণ্টু! আঃ, বাঁচলুম! রিহার্সালের তারিখটা এবার ঠিক করে ফেলা যাবে! ওগো, তোমরা আর দেরী করো না।

লীলা। না। এই যে মা আহ্নিকটা সেরে নিলেই আমরা যাচ্ছি!

[ব্রজেন্দ্রনাথের প্রস্থান

দেখচো, পান নেবেন, তা আর হুঁস নেই! এই যে ডিপে। বিন্দু, পানগুলো বাইরে পাঠিয়ে দে তো—আরো গোটাকত বেশী করে দিস্— কে সব ভদ্রলোক এসেছেন! (ডিপে খুলিয়া) বাঃ, এই যে আমার মুক্তোর মালা। এ তবে ওঁরি কাজ! বিন্দু, এই দেখ আমার হার। তোর দাদাবাবু লুকিয়ে রেখে জব্দ করছিল!

বিন্দু। তুমিও জব্দ করে দাও, বৌদি!

লীলা। আঃ, প্রাণটা বাঁচলো! দেখদেখি অন্যায়! উঃ, আমাকে একটু আভাষ দিলেন না। দাঁড়াও, আমিও জব্দ করছি। ডিপেটা বারাণ্ডার ধারে রেখে দিইগে, খালি ডিপে ওখানে দেখে বাবুসাহেব চমকে উঠবেন! বিন্দু, তুই অন্য ডিপেতে পান পাঠিয়ে দে। নিজের মালা গলায় দি। ছোটখুড়ির মালাছড়াটা তারপর দিয়ে আসিস!

বিন্দু। যা বলবে বৌদি আমি তাই করবো!

লীলা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে!

(ব্রজেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। ডিপেটা কোথায় রাখলুম! তাই তো!

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

তোমার গলায় টেটের মুক্তো কেন?

লীলা। টেটের মুক্তো! তুমিই বললে, আসল!

ব্রজেন্দ্র। সে তো আমি যে ছড়া এনেছিলুম।

লীলা। বাঃ, এই তো সে ছড়া।

ব্রজেন্দ্র। আমার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়! হীরা জহরৎ দেখে বুড়ো হয়ে গেলুম।

লীলা। বেশ বাবু, তুমিই বললে, আসল মুক্তো, দাম 'আটশ' টাকা।

ব্রজেন্দ্র। আর লুকোচ্ছ কেন? ছোটখুড়ির কাছ থেকে হার চেয়ে এনেছ! আমি কি জানি না?

লীলা। কে বললে?

ব্রজেন্দ্র। বিন্দু।

লীলা। ও সে তো একবার এনেছিলুম—ছটো মিলিয়ে দেখবার জন্য!

ব্রজেন্দ্র। বটে! বিন্দু বললে দাদাবাবু, বৌদির নতুন হার চুরি গেছে, পুলিশে খবর দাও। বৌদি ভয়ে বলেনি—ছোটখুড়ির কাছ থেকে চুপিচুপি তাঁর হার চেয়ে আনালে।

লীলা। সত্যি এ তোমার হার।

ব্রজেন্দ্র। আবার, মিছে কথা।

লীলা। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

ব্রজেন্দ্র। (গম্ভীর কণ্ঠে) লীলা—

(বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। দাদাবাবু, তোমার ডিপে ঐ বারাণ্ডার কোণে পড়েছিল।

ব্রজেন্দ্র। (সাশ্চর্য্যে) এ্যাঁ। (ডিপে লইয়া তাহা খুলিয়া খালি দেখিয়া) লীলা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

লীলা। কি?

ব্রজেন্দ্র। চুরি! চুরি—

লীলা। ও মা, কি চুরি হলো?

ব্রজেন্দ্র। তবে খুলে বলি! তোমার হার টেবিলে পড়ে ছিল, তোমাকে শিক্ষার দেবার জন্য আমি ডিপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম—তারপর ডিপেটা কোথায় ফেলেছিলুম, মনে ছিল না। এখন দেখছি, কে ডিপে খুলে সে হার নিয়েছে। এখনি সমস্ত চাকর-দাসীর ঘর-বাক্সে তল্লাস করবো। দারোয়ানকে বলে দি, সদর খিড়কী সব বন্ধ করে দিক্—কেউ যেন না বাহিরে যায়।

বিন্দু। ও মা কি সর্ব্বনাশ গো! সেই বামুন ছোঁড়া নতুন এসেছিল—সে যে এইমাত্র মিনিকারণে মাকে বলে চলে গেল। তার কাজ নয় তো?

ব্রজেন্দ্র। এ্যাঁ! তবে এ তারি কাজ! দারোয়ান—

[শশব্যস্তে গমনোদ্যত।

লীলা। চুপ চুপ! বিন্দু, তুই দরোয়ানকে বলগে যা ত…

[বিন্দুর প্রস্থান

ব্রজেন্দ্র। এখন ডেকো না—আমি নিজে যাই।

লীলা। শোনো…

ব্রজেন্দ্র। কি?

লীলা। আমাকে মাপ করো! সে হার আমি নিয়েছি।

ব্রজেন্দ্র। ডিপে থেকে?

লীলা। হাঁ। এই যে গলায় রয়েছে আমার।

ব্রজেন্দ্র। ছোটখুড়ির হার?

লীলা। বিন্দুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। হার খুঁজে না পেয়ে ভাবলুম, রাত্রে এসে আর একবার খুঁজবো। তারপর তোমাকে বলবো। আবার ভাবলুম, দাদাকে দিয়ে আমার দু-চারখানা সোনার গহনা বিক্রী করে চুপিচুপি মুক্তোর মালা কেনাবো। তুমি এই ঘরে ডিপে রেখে গেছলে—বাহিরে পান পাঠাবার জন্য তোমার ডিপে খুলে দেখি আমার সেই মুক্তোর মালা তার ভিতরে রয়েছে। তাই, তোমাকে একটু জব্দ করেছি। তুমি আমাকে জব্দ করছিলে, তারি শোধ দিয়েছি আমি!

ব্রজেন্দ্র। বেশ করেছো!

লীলা। এখন দেখলে, ভুল সকলেরই হয়!

ব্রজেন্দ্র। আঃ, তবু ভালো যে পাওয়া গেছে!

লীলা। নিপুণ জহুরী—হীরে-জহরৎ চেনো খুব, না? টেটের হার নয়?

ব্রজেন্দ্র। যাক্ সে কথা—তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আমাদের জয়লাভ যে অসম্ভব। লীলা, এখন এসো সন্ধি করা যাক্!

লীলা। বহুৎ আচ্ছা!

[ব্রজেন্দ্র লীলার অধরে চুম্বন করিল।]

ব্রজেন্দ্র। (সুর করিয়া)—

"আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত!
তব চরণ-কমল রতন রেণুকা—"

লীলা। চুপ্!

(নেপথ্যে বিন্দু। বৌদি, মার আহ্নিক সারা হয়েছে —তুমি এসো।)

লীলা। তবে আসি!

ব্রজেন্দ্র। যথা আজ্ঞা!

যবনিকা

দু'দিক

[নাটিকা]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দু'দিক

দৃশ্য—পশ্চিমের এক বাংলা-বাড়ীর সামনে ঢাকা-বারান্দা। দুধারে রেলিং। বারান্দার সিঁড়ির উপর কয়েকটি টবে তালী ক্রোটন প্রভৃতি; দালানে ইজি চেয়ার, বেতের ক'খানা চেয়ার, টীপয়। ইজিচেয়ারে বসিয়া শিবানী গান গাহিতেছে। শান্তি মাঝে-মাঝে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছে,—কখনো চায়ের পেয়ালা, কখনো খাবারের ডিশ্ বহিয়া। তিনটি পেয়ালায় চা ও দুধ ঢালিয়া সে চিনি মিশাইল; পরে শিবানীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিবানীর গান থামিলে তবে সে কথা কহিল।

শিবানী। গান

তুমি আসবে পাশে, জানি, জানি!
আমার আশা সফল হবে, মানি, মানি।
তবু দূরে রহো যখন, পায় না আঁখি—
আমার নিখিল আঁধারে যে আসে ঢাকি!
বেদনে মন দোলে, বুক হারায় বাণী!
তোমা-হারা-নিমেষে যুগ অনুমানি।

শান্তি। নাঃ, তোমরা বেশ মজার লোক! কেউ আরামে গান গাইচো—কারো এখনো দেখা নেই! বেশ! কখন্ কি হবে, বুঝতে পারচি না!

শিবানী। তুই মোদ্দা ভারী ধড়ফড়ে, শান্তি। ছাখ্ না দু'দণ্ড ঐ আকাশের পানে চেয়ে! দেশে তো আকাশ দেখতে পাস্ না! আর এখানে...

শান্তি। তুমি থামো। আমার ও সব কাব্যি ভালো লাগে না। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) তোমার হলো? হ্যাগা, শুনচো?

[নেপথ্য হইতে অনাদি। এই যে, স্নান সেরে বেরিয়েচি—মাথা আঁচড়াচ্ছি]

শান্তি। এদিকে চা জুড়িয়ে শরবৎ হয়ে গেল। দূর হোক্ গে—যার যা-খুশী করো! আমি দাঁড়াতে পারি না। খাই। এইনাও তোমার পেয়ালা, শিবুদি।

শিবানী। আমি এখন খাবো না। উনি...

শান্তি। তোমার উনি আবার এখন কোথায় রোমন্থন করতে লাগলেন! না বাপু, যত দায় যেন আমারি! ...আমি খাই। অত নিষ্ঠা আমার নেই...

(চেয়ারে বসিয়া চা-পানে রত)

শিবানী। একটা কাজে বেরিয়েচেন...

শান্তি। আমরা এলুম,—অতিথি! অতিথির খাতিরে কাজে না হয় দু'দিন একটু ঢিল্ দিতেন! চিরদিন তো থাকবো না...

শিবানী। তা বটে,—তুই হলি সম্পর্কে শ্যালিকা.. নব-ফুল-মালিকা! তোর একটু খাতির দরকার। তা আমি জানি। তবে মানুষটাকে চিনিস্ তো...চাল-ভারি!

শান্তি। (চা-পান) আজ আসুন অনন্ত বাবু...বোঝা-পড়া করবো। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) তুমি কি মুজরোয় যাবে না কি—হ্যাঁ গা? তোমার চুল বাঁধা যে আর শেষ হয় না!

[গায়ে গেঞ্জি, পায়ে স্যাণ্ডাল, সজ্জিত-কেশ অনাদির প্রবেশ; তার কাঁধে তোয়ালে; তোয়ালেয় সে কাণের জল মুছিতেছিল]

অনাদি। ইস্, ভয়ানক চটিতং! না?

শান্তি। বয়ে গেছে! তুমি কি মানুষ যে তোমার উপর চটবো! তা নয়···চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!··· তাই বলা। খাও এখন ঐ ঠাণ্ডা চা। আমি আর ফিরে-ফিরতি তৈরী করতে পারবো না।

অনাদি। দেখ্ চেন দিদি···আপনার ভগ্নীর স্বামি-সেবার নিদর্শন!

শান্তি। থামো। স্বামী আছো, স্বামীই আছো—তা বলে চাব্বিশঘণ্টা অত গলবস্ত্র হয়ে মশাই-মশাই করতে পারবো না আমি। সেবার যদি এতই কাঙাল ছিলে তো আমায় টপ্ কে শিবুদিকে বিয়ে করতে পারো নি!

অনাদি। (গম্ভীর কণ্ঠে) শান্তি···

শান্তি। এতে আবার শান্তি কি! শিবুদির নিষ্ঠা দেখচো? অনন্তবাবু আসেন নি, শিবুদি বসে বিরহ-সঙ্গীত গাইচে! চাটুকুও মুখে দেবে না। তাঁর খাওয়ার আগে খেলে পৃথিবী পাছে ভূমিকম্পে দুলে ওঠে! সূর্য্য পাছে কক্ষচ্যুত হয়! আমার অত নিষ্ঠা নেই। স্বামী স্বামী—খাওয়া খাওয়া—যার যেমন কদর, তাই করবো! আমি চা চেয়ে নিয়েছি।

অনাদি। বেশ করেচো। চা-ই খাবো।···(চা-পানে রত)

শান্তি। চা খেয়ে নাও—তার পর আজ কি বন্দোবস্ত হয়েচে, জানো?

অনাদি। কি?

শান্তি। আমরা যাবো এখন জলঙ্গী পাহাড়ে। সেখানে বৈকালিক জলযোগ···

অনাদি। কৈ, শুনি নি তো!

শান্তি। তোমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা ব্যবস্থা করেচি। অনন্তবাবু তো বলেছিলেন, দেড়টা নাগাদ ফিরবেন—আজ তাঁর কোর্টে তেমন কাজ নেই।

অনাদি। তাহলে তিনি গৃহ-পথে যাত্রা করেচেন। এলেন বলে...

শান্তি। ওরে উচ্ছ্ব···

বেয়ারার প্রবেশ

টিফিন-বাক্স গুছিয়ে নিয়েচিস্?

উচ্ছ্ব। ওরফে উৎসব। হ্যাঁ···

শান্তি। তোরা তাহলে এগিয়ে যা। ষ্টোভটা নিস্ সঙ্গে, আর স্পিরিটের বোতল।

[বেয়ারার প্রস্থান

শান্তি। অনন্তবাবুর এখনো দেখা নেই! মক্কেলের পকেট কাটতে এমন মত্ত যে দুনিয়া ভুলে বসেচেন!

অনাদি। পকেট কাটতে হয় তোমাদের জন্য! তা সে কথা থাক! আমায় কিছু খেতে দিতে বলুন দিদি, আমার ভারী ক্ষিদে পেয়েচে।

শান্তি। মা গো! তোমার হয়েচে কি! বেলা এই এগারোটায় খেয়ে বেরিয়েছিলে···মাংস, ডিম···এখন বেলা দুটো বাজে।

অনাদি। তাই নাকি! আমার মনে হচ্ছে, মাস-খানেক কিছু মুখে দিইনি!

শান্তি। শুনচো ভাই!

শিবানী। দে না শান্তি দু'খানা লুচি ভেজে···

শান্তি। না। এখন আর খাবে না। কোথায় কি! তা ছাড়া এদের পাঠালুম—আবার এখন লুচি ভাজার হাঙ্গাম! না, তা হবে না। চা খেয়েচো, আর ঐ রুটী আছে—দু'খানি পেতে পারো। ব্যস!

অনাদি। অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!··· ·· বোঝো না তা, পশ্চিমের হাওয়ায় খিদে চতুর্গুণ হয়েচে!

শান্তি। না, এ সব লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড আমি দেখতে পারি না।

অনাদি। শুনলেন দিদি!

শিবানী। এ তোর অন্যায়, শান্তি। তুমি বসো ভাই, আমি লুচি ভেজে দিচ্ছি। (উঠিল)

শান্তি। (হাত ধরিয়া নিবৃত্ত করিয়া) না, খবর্দ্দার। তোমায় তো বারো মাস ওকে নিয়ে ঘর করতে হবে না, শিবুদি! চাল বিগড়ে শেষে আমার মাথা খাবে!

শিবানী। ভয় নেই রে! তোর ঘরকন্নায় ভাগ বসাতে যাবো না আমি!···কি খাবে, ভাই? বলো···

অনাদি। (সানশ্বাসে) নিরুপায়!...জলঙ্গীতে যেতেই হবে?

শান্তি। কেন—তাতে কোথায় বাধচে, শুনি?

অনাদি। সেজন্য নয়। মানে, দাদার যদি কোনো কাজ থাকে···

শান্তি। কাজ থাকলেও আমি শুনবো না! (অনাদির হাতে রিষ্ট-ওয়াচ দেখিয়া) দুটো বাজতে দশ মিনিট! আর দশ মিনিট অনন্ত বাবুর জন্য অপেক্ষা করবো। তার মধ্যে না আসেন, আমরা চলে যাবো। কি বলো শিবুদি?

শিবানী। তোরা এগোস্—আমি ওঁকে নিয়ে যাবো'খন উনি এলে।

শান্তি। তা জানি। একটু আমোদের ব্যবস্থা করেচি আমি, তাতে বিঘ্ন ঘটবেই। আমার অদৃষ্ট

অনাদি। কথাটা আমায় ঠেশ দিয়ে হলো—না?

শান্তি। কাকেও আমি ঠেশ দিইনি। নিজের অদৃষ্টের কথা বলচি।

অনাদি। কেন—তোমার অদৃষ্টটা মন্দ কোন্‌খানে? আমার মত স্বামী পেয়েচো···নারী-জন্মের যা চরম সৌভাগ্য। আপনি কি বলেন, দিদি?

শিবানী। নিশ্চয়! তোর কত দাপট সয় বল দিকিনি বেচারা। চব্বিশ ঘণ্টা ওর সঙ্গে তুই যা করিস···সর্ব্বক্ষণ তোর মেজাজ তেতে আছে।

শান্তি। বেশ, বেশ! আমি বদ, আমি পাজী, আমি সকলের সুখের কাঁটা!···কাকেও যেতে হবে না আমার সঙ্গে। তোমরা থাকো—বসে বসে আনন্দ পাও! আমি—আমি—(স্বর কম্পিত হইল; সে দ্রুত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল)

শিবানী। (বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

অনাদি। দেখলেন তো দিদি! আচ্ছা, আপনি বলুন, আমার কি অপরাধ?

শিবানী। তুমিই ভাই আদরে-আদরে ওর মাথাটি খেয়েচো!···এঁদের তো দেখচো···এ কালের হলে কি হয়—কি ভয় করি আমি!

অনাদি। দেখি, কোথায় গেলেন।

শিবানী। আমার কথা শোনো—তুমি বসো। আপনি আসবে'খন।···ঐ যে উনি এলেন···

[কোর্টের ফেরত অনন্তর প্রবেশ; চাপকান-আঁটা। শিবানী উঠিয়া অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইল; অনন্তর পায়ের জুতো-মোজা চাপকান খুলিয়া দিল, ও বাতাস করিতে উদ্যত; সেই অবস্থায় অনন্তর কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ—শিবানী পিছনে চলিল]

অনাদি। দাদা বেশ আছে। দিদিকে কি বশীভূতই করেচেন! দাদা যদি বলেন, জল উঁচু—অমনি দিদি বলেন, তাই। সর্ব্বদা মুখে মুখে আছেন! আর আমার ইনি? হায় রে, কলেজে যাওয়ার সময় কি কল্পনাই করতুম! সংসার পেতে বসবো, কাজ থেকে ফিরলে স্ত্রী এসে সাদরে অভ্যর্থনা করবে, এমনি করে জামা-জুতো ছাড়বো গিয়ে—ছুটে শরবতের গ্লাস এনে মুখে ধরবে! (নিশ্বাস) স্ত্রী এমন বাধ্য হয়—কোনো নভেলে পড়িনি। পুরাণেও নয়—mythological dramaতেও না। সংসার পাতলুম। কাজে বেরুই, কাজ থেকে ফিরি···কিন্তু সে কল্পনার আদরটুকু চিরদিন অজানা রয়ে গেল! এখানে এসে দিদির তাতে দাদার সেবা দেখে মনটা লোলুপ হয়ে ওঠে! শান্তির ঐ মেজাজ তিরিক্ষি···

[কোঁচা গুজিতে গুজিতে অনন্ত; সঙ্গে শিবানীর প্রবেশ]

অনন্ত। শান্তি অমন গুম্ হয়ে বসে কেন গা? এক পর্ব্ব হয়ে গেছে বুঝি!

শিবানী। হলো বৈ কি। (পাখার বীজন)

অনন্ত। সহরের চাল! ভায়া ওকে মাটী করেচে! এ রকম ছিল না ও।

অনাদি। আপনি আর এ দোষ দেবেন না, দাদা। আমি মাটী করিনি। উনি মাটী ছিলেন। সে মাটীতে ওঁকে গড়তে পারলুম না আপনার মতন।

অনন্ত। (হাসিয়া) গড়বার বুদ্ধি চাই হে—কৌশল চাই!

শিবানী। (সবিনয়ে) চা দেবো?

অনন্ত। দাও। পেয়ালায় ঢালা কার চা?

শিবানী। ওরা খেয়েচে। আমার পেয়ালা, শান্তি দেছে।

অনন্ত। খাও নি?

শিবানী। তোমার আগে? আমার তো ভীমরতি ধরেনি।···আমি চা করে আনি। হ্যাঁ, আর কি খাবে? লুচি ভেজে দেবো?

অনন্ত। না। শুধু দুটো ডিম পোচ্ করে দাও···

শিবানী। আনি। (প্রস্থান)

অনন্ত। তার পর···কি নিয়ে হলো আজ?

অনাদি। কিছু হয়নি দাদা। খাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি বললুম, লুচি খাবো। দিদি বললেন, ভেজে দি। শান্তি বললে,—না। এই।

অনন্ত। এতে আপত্তিটা কিসের?

অনাদি। এঁরা ঠিক করেচেন সকলে জলঙ্গীতে আজ যাবেন। বৈকালিক জলযোগ হবে সেখানে। চাকরদের পাঠিয়েচেন। শান্তি বললে, আবার এখানে খাওয়ার ফ্যাসাদ করা! এই আর কি! একটু পরিহাস মাত্র—মানে, ঠিক seriously নয়।

অনন্ত। (হাসিয়া) তুমি ভারী স্ত্রৈণ! শান্তির দোষ যদি-বা শোধরাতো—তোমার এই ভাবেই সে আরো জোর পায়। স্ত্রীলোক যতই প্রাণের প্রিয় হোক, তাকে দাবে রাখা চাই, ভায়া। না হলে অশান্তির সীমা থাকে না। ওদের কথা রেখে একটু চলেছো, কি, অমনি পেয়ে বসেচে! ভারী বিশ্রী জাত...

অনাদি। দাদার ভূয়োদর্শিতা আছে।

অনন্ত। আরে ভাই, ভূয়োদর্শিতা নয়। আমাদের হলো superior intellect—এটা মানো তো? ওরা যত লেখাপড়াই শিখুক—reasonএর

facultyটা মোটে জাগে না। এই ছাখো না, আমাকে কিছু বলতে হলো না—তোমার দিদি ছুটলো নিজে থেকে খাবার তৈরী করতে! কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। থাকে না—এ জিনিষটা শিখ্‌তে হয়।

অনাদি। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য-জ্ঞান সজাগ রেখে বাস করতে হলে সংসার যে গুরু মশায়ের পাঠশালা হয়ে উঠবে। স্বামী সর্ব্বদা বেত উঁচিয়ে থাকবে, আর স্ত্রী ভয়ে তটস্থ!

অনন্ত। উপায় কি! এখানে ঘর করতে হচ্ছে inferior or no-intellectএর সঙ্গে। পুরুষে-পুরুষে ঘর করা হতো, তা হলে এমনিতে সামঞ্জস্য ঘটতো—both equal intellects!

অনাদি। সামঞ্জস্য! ওরে বাপ রে—এর চেয়ে ভীষণ অসামঞ্জস্য মহামুনি বেদব্যাসও কল্পনা করতে পারতেন না!

শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। এইখানেই খাবে? না—আজ আবার শান্তি ধরেচে, সকলে জলঙ্গীতে যাবো···সেইখানে?

অনন্ত। এখন জলঙ্গীতে? কৈ, সে কথা তো ছিল না। আমি জানি না। তোমরা দুই বোনে বুঝি স্থির করেচো?

শিবানী। শান্তির বড় সাধ···

অনন্ত। তোমারো? কিন্তু···আমি যেতে পারবো না তো! আমার এক বন্ধু আসচেন···

অনাদি। সে কি—সব যে ঠিক।

অনন্ত। তোমরা যাও—আমার যাওয়া হবে না। কি করে যাই?

শিবানী। তা হলে আমিও যাবো না, ভাই। তোমরা মিছে দেরী করো না। শান্তির ইচ্ছা হয়েচে, যাও দু'জনে। (অনন্তর প্রতি) তুমি খাবে এসো... আমি গরম গরম ভেজে দেবো।

[অনন্ত ও শিবানীর প্রস্থান

অনাদি। কিছু বুঝতে পারি না। এক এক সময় মনে হয়, শান্তির বাড়াবাড়ি। কিন্তু দাদার মত অতখানি গাম্ভীর্য্য আর কর্ত্তব্য-জ্ঞান···নাঃ, সমস্যা!···যাই হোক, বেচারী রাগ করেচে,—ডাকি। জলঙ্গীতে যাই। একটু আমোদ চায় শান্তি...আহা! এই যে আসচে।···

শান্তির প্রবেশ

অনাদি। ওগো, একটা কথা শুনচো?

শান্তি। (টেবলের উপর হইতে কাপ প্রভৃতি লইতে উদ্যত) কি?

অনাদি। দাদা যাবেন না, সুতরাং দিদিও। তাই বলছিলুম—(শান্তি স্থির দৃষ্টিতে অনাদির পানে চাহিল) আজ না হয় জলঙ্গী যাওয়া থাক···

শান্তি। আমি যাবো। তোমাদের যার খুশী হয় যেয়ো, যার খুশী না হয় যেয়ো না। আমি তো পায়ে ধরে কাকেও যাবার জন্য সাধচি না।

অনাদি। সব-তাতেই রাগ করো কেন—তাই না দুঃখ! তা নয়। বলছিলুম, ভালো দেখাবে কি? আমরা ওঁদের অতিথি···

শান্তি। এতে রাগারাগির ব্যাপার কি আছে! অনন্ত-বাবুর কাজ আছে—তাই যেতে পারবেন না। আমার কাজ নেই, যাবো।

অনাদি। আমার কেমন-কেমন বোধ হয়।

শান্তি। তাহলে যেয়ো না···

অনাদি। তুমি?

শান্তি। যাবো।···(পেয়ালা প্রভৃতি লইল; গমনোদ্যতা)

অনাদি। একলা যাবে? আমি না গেলেও?

শান্তি। হাঁ।

[প্রস্থান

অনাদি। এইখানে বাধে। ওঁরা দুটিতে কেমন! দাদা যাবেন না—দিদি তাই গেলেন না। রাগ তো করলেন না! আর শান্তি···? না,—দাদার কথা ঠিক।···কিন্তু এখন কি ফেরানো সম্ভব?··· এইটুকু যা অস্বস্তি···শান্তি কেন যে এ অশান্তি জাগিয়ে তোলে!···

(চেয়ারে বসিয়া শূন্যপানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিল)

শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। তোয়ালেখানা দাও তো, ভাই। (তোয়ালে লইয়া) শান্তি চললো যে! তুমি যাবে না?

অনাদি। না।

শিবানী। সে কি! ও জানে, তুমি যাবে না?

অনাদি। জানে।

শিবানী। তবু? (ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তোয়ালে-সহ প্রস্থান)

অনাদি। এরা কি ভাবে?···স্ত্রৈণ? হবে! আমি যে কড়া হতে পারি না! স্ত্রী—তাকে চোখ রাঙাবো? অসম্ভব! শান্তির কোনো ইচ্ছায় কখনো বাদ সাধিনি, তা চাই না। তবে আমি চাই, শান্তি আমায় একটু মানুক···আমার প্রাণের পানে একটু চেয়ে দেখুক! কথায় কথায় রাগ, এটা যায় কিসে! দিদিদের ধরি···ওঁরা যদি পোষ মানিয়ে দিতে পারেন।

অনন্ত ও শিবানীর প্রবেশ

অনন্ত। গেল তো?

অনাদি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ।

অনন্ত। (হাসিয়া) তুমিই ওকে বিগড়ে দেছ! স্বামীর ছায়া হবে স্ত্রী···স্বামীর ইচ্ছায় ওঠা-বসা করবে।··· তোমার দিদিকে দেখচো তো?

অনাদি। দেখচি বৈ কি।

শিবানী। থাক, আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই। শান্তি কি মানুষ! পাগল। যত বয়স হচ্ছে, ততই পাগলামি বাড়চে।

অনন্ত। তুমি একটু শক্ত হও। এই তোমার দিদি— আমার সেবায় ওঁর জীবন অর্পণ করেচেন! ওঁর সামনে বলা উচিত নয়, কিন্তু সত্য কথা বলেই বলচি, এই হলো এদেশের নারীর আদর্শ।···তবে এ-আদর্শে স্ত্রী-জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে হলে স্বামীরও তেমনি হওয়া চাই—অর্থাৎ শক্তিমান—পুরুষ!

অনাদি। হুঁ! (বলিয়া গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিল)

অনন্ত। বোধ হয় মান-ভঞ্জনে গেল!

শিবানী। হবে! (দীর্ঘশ্বাসান্তে শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিল]

অনন্ত। তুমি তোমার ভগ্নীকে একটু বুঝিয়ো—সত্যি! সমবয়সী—দুজনে, ছেলেবেলা থেকেই তোমাদের অন্তরঙ্গতা···

শিবানী। দু'দিন আমার এখানে বেড়াতে এসেচে। তার মধ্যে এত সদুপদেশ ··

অনন্ত। উপদেশ সব সময়ে দেওয়া চলে। হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।···আমার মাথার পাকা-চুলগুলো দেখে দাও তো!

শিবানী। (পাকাচুল তুলিতে ব্যস্ত)

অনন্ত। ভালো কথা, আজ যে নিশীথের ওখানে নেমন্তন্ন গো, রাত্রে—মনে আছে? কমিশনার সাহেবকে সে পার্টি দিচ্ছে। যাবে তো তোমরা?

শিবানী। তুমি যদি বলো···

অনন্ত। আমার বলা কেন! তোমাকেও তো নিমন্ত্রণ করেচে নিশীথ।

শিবানী। তোমার অনিচ্ছায় কবে আমি কি করি?

অনন্ত। তা করবে না। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বও কিছু রাখবে না তা বলে?

শিবানী। (কিছু বলিল না, একবার আকাশের পানে চাহিল, পরে চুল তোলায় ব্যস্ত)

উচ্ছার প্রবেশ

অনন্ত। কি রে?

উচ্ছা। নথমল ববুর কছ হতে লোক অসচি, খতা-পত্র নিয়ে।

অনন্ত। জ্বালালে!

শিবানী। এখনি আবার ঐ-সব নিয়ে বসবে? জিরুলে···

অনন্ত। (বাধা দিয়া) না। উপায় নেই। কর্ত্তব্য আগে! তাছাড়া এতে দু' পয়সা ঘরে আসবে।

[উচ্ছা ও অনন্তর প্রস্থান

শিবানী। (স্থির হইয়া দেখিল, পরে বিরক্ত হইয়া ইজি চেয়ারে বসিল) এই হলো স্ত্রীর কর্ত্তব্য! মুখের পানে চাইতে কেউ নেই। উনি কেবল কাজ নিয়ে ব্যস্ত! আমি? একলা মানুষ কি করে থাকবো, বোঝেন না। কেবল হুকুম তামিল করো! জীবনে আর কিছু নেই! আমোদ নয়, আহ্লাদ নয়—শুধু হুকুম পাবার জন্য তৈরী থাকবো সারাক্ষণ···নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে। অনাদি আর শান্তি—দুজনে যত খিটিমিটি বাধুক, তবু মনের সুখে আছে। আমি শুধু আদর্শ নিয়ে বাস করচি। ভাগ্যে একটু গান গাইবার অনুমতি ছিল। না হলে গেছলুম আর কি! (গুণ-গুণ করিয়া গান ধরিল)

[পায়ে-চোট অনাদি ও তার হাত ধরিয়া শান্তির প্রবেশ; শিবানীর গান বন্ধ হইল]

শিবানী। [উদ্বিগ্নভাবে] কি হলো?

শান্তি। বাইসিকল থেকে পড়ে পায়ে চোট লাগিয়েচেন। একদণ্ড যদি আমার স্বস্তি থাকে!

শিবানী। বাইসিকল্ চড়তে গেল কেন?

শান্তি। হং! বললেন তো, উনি অনুসঙ্গী যাবেন না, আমি চলে গেলুম। শেষে আবার আমার পিছনে ধাওয়া করলেন। মায়া উথলে উঠলো, বোধ হয়!··· তা না হয় গেলেন! কিন্তু বাইসিকলে যাবার কি দরকার ছিল! পথে এক পাল গরু আসছিল। ব্যস্, তাদের বাঁচাতে গিয়ে পড়লেন উল্টে! সারা পথ ধরে আনচি।

শিবানী। বাইসিক্ল?

শান্তি। যাদের গরু, তাদের একটা লোক বয়ে আনলে! শত্তুর···শত্তুর! তুমি জানো না শিবুদি, আমায় কি জ্বালাতন করে! সংসারে অরুচি ধরে গেল!··· (অনাদির প্রতি) নাও, বসো দয়া করে!···দিদি ভাই, তোমার ঘরে আম্বাক আছে?

শিবানী। আছে।

শান্তি। দাও তো ·না, থাক, আমিই আনছি।

[প্রস্থান

শিবানী। খুব লেগেচে?

অনাদি। (চারিদিকে চাহিয়া) চুপ! বিশেষ লাগেনি। ওর মেজাজ না চটে, অথচ জলঙ্গী বন্ধ হয়, তাই একটা ধাপ্পা! চালাকি!

শিবানী। তুমি তো খুব লোক, দেখচি।

অনাদি। সত্যি দিদি, কি যে ওর গোঁ। বেশ তো বাপু, আজ যখন কেউ যাচ্ছে না, তখন না হয় থাক —বিশেষ, রাত্রে আবার নিশীথ বাবুর বাড়ী পার্টি আছে·· (স্বচ্ছন্দভাবে বসিল,—পায়ের কথা ভুলিয়া গেল)

শিবানী। হুঁ! তাহলে···

(শান্তির প্রবেশ, তার হাতে জাম্বাক। অনাদিকে সহজভাবে বসিতে দেখিয়া শান্তির বিস্ময়)

শান্তি। পা সেরে গেছে—এই যে! একটু আগে পা মুড়তে পারছিলে না···

অনাদি। না, না, না—ভারী ব্যথা গো। উঃ!···দিদি বললেন, চোক ব্যথা, পা মোড়বার চেষ্টা করো —না হলে আড়ষ্ট থাকতে হবে। তাই···

শান্তি। তাই! বটে! আমি নেকি—কিছু বুঝি না?

[দ্রুত প্রস্থান

অনাদি। নাঃ, মুস্কিল বাধলো দেখচি।

শিবানী। তোমারো অন্যায় আছে। তুমিও খিটিমিটি বাধাতে কম ওস্তাদ নও! সেই বেরিয়েছিলে, না হয় জলঙ্গীতে যেতে!

অনাদি। হুঁ। তাই ব । দেখি, বড্ড রাগ করেচে!

[প্রস্থান।

শিবানী (দেখিয়া) এদের জীবনই জীবন!···

অনন্তর প্রবেশ

কাজ চুকলো?

অনন্ত। মুক্তি পেয়েচি। কাল সকালে আসবে।

শিবানী। এখন তো কাজ নেই?

অনন্ত। না।···অনাদির কি হলো? খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলো...

শিবানী। পায়ে চোট লেগেচে।

অনন্ত। কোথায় গেল?

শিবানী। শান্তি বুঝি জাম্বাক মালিশ করচে।

অনাদির প্রবেশ

অনাদি। নাঃ, দুর্জ্জয় গোঁ। আর পারা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে যদি এমন বিদ্যুৎ চমকায়···(হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল, Hopeless!

অনন্ত। নিশীথের ওখানে রাত্রে যাচ্ছো তো ভায়া?

অনাদি। যেতে হবে বৈ কি! ও আবার আমার বন্ধু—বহু দিনের বন্ধু।

শিবানী। শান্তির সঙ্গেও কথাবার্ত্তা কয়···

অনাদি। হ্যাঁ। আমার ওখানে বহুবার অতিথি হয়েচে। অর্থাৎ কলকাতায় গেলেই···দিদির গানও শুনেছে সে দিন। ভারী সুখ্যাতি করছিল।

অনন্ত। বটে। কৈ, আমায় তো সে কথা বলেনি! (শিবানীর প্রতি) তুমিও আমায় বলোনি!

শিবানী। এমন বড় কথা তো নয়! তাছাড়া গাইছিলুম, হঠাৎ এসে পড়লেন...

অনন্ত। হুঁ! (চিন্তাবিষ্ট)

শিবানী। অপরাধ হয়েচে?

অনন্ত। গান শোনানো অপরাধ নয়—তবে আমি জানতুম না। (গম্ভীর ভাব)

শিবানী। সত্যি আমার মনে ছিল না।

অনন্ত। মনে থাকা উচিত ছিল। স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোনো বিষয়ে গোপনতা থাকবে না।

শিবানী। আর কখনও হবে না। এবার মাপ করো।

অনন্ত। করবো। পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাও।··· (শিবানী কথামত পায়ে হাত দিল).. তাই বটে আমায় বলছিল, শিবানী দেবীও পার্টিতে আসচেন তো?

শিবানী। (স্থির লক্ষ্যে স্বামীর পানে চাহিল)

অনন্ত। শান্তি কোথা গেল? রাগ? গোঁসা-ঘর?

অনাদি। আমায় দীক্ষা দাও দাদা!—তুমি আমার গুরু —কি করে শান্তিকে বশ করি, বলো!

অনন্ত। (সহাস্যে) মাসখানেক তা হলে সস্ত্রীক থেকে যাও এখানে।·· আর ছ্যাবলামি ছাড়ো···গম্ভীর হও···স্ত্রীর তরিবৎ স্ত্রী-বশ করার বিষয়ে প্রথম সূত্র হলো ঐ গাম্ভীর্য্য—হাস্যরস মোটে নয়। কৌতুক-পরিহাস বিষের মত ত্যাগ করা চাই।

অনাদি। মুস্কিল!

অনন্ত। শান্তিকে ডাকো তো···

শিবানী। ঐ আসচে। উদাসিনীর বেশ!

(উদাসভাবে শান্তি আসিয়া চেয়ারে বসিল; তার মূর্ত্তি গম্ভীর)

অনন্ত। কোথায় পড়লে হে অনাদি? লাগলো কোথায়?

অনাদি। পায়ে···

অনন্ত। শান্তি কোথায় ছিল?

অনাদি। হাত দশেক আগে—আমি পড়ে গেলুম···

অনাদি। শান্তি···(শান্তি ফিরিয়া চাহিল, তার মুখে হাসি)

শান্তি। সে যা মূর্ত্তি! ধপাস করে পথের উপর পড়লেন!

সর্ব্বাঙ্গে ধুলো! গরুগুলো ভয় পেয়ে কষে দৌড় দিলে। প্রথমে হেসে উঠেছিলুম। তখন কি জানি, উনি!

অনাদি। তুমি হাসচো! আমার লাগলো। অমন দুর্ঘটনা! আর তুমি আমার স্ত্রী!

শান্তি। বা রে, কিছু হয়নি তো। সত্যি অনন্ত বাবু, সে-মূর্ত্তি যদি দেখতেন! ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর গান আছে না? ঠিক তেমনি!

অনাদি। (গম্ভীর স্বরে) শান্তি···

শান্তি। কেন? না বাপু, হাসতে দাও...আমি সে চেহারা ভুলতে পারচি না!

অনাদি। এ হাসি স্ত্রীর উচিত? স্বামীর দুর্দ্দশা স্ত্রীকে হাসির খোরাক জোগাবে?

অনন্ত। (জনান্তিকে) বেশ, বেশ। এমনিভাবে সুরু করো। সুযোগ মিলেচে।

অনাদি। শান্তি···

শান্তি। বাইসিক্‌ল্‌টা ছিটকে কোথায় গিয়ে পড়েচে! ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। দেখে হেসে বাঁচিনে। শেষে দেখি, আমারি জীবনবল্লভ—দুর্লভ ছবি ফুটিয়েচেন। হাঃ হাঃ হাঃ।

অনাদি। তোমার হাসি আমার ভালো লাগে না, শান্তি। এতটুকু দরদ নেই, মায়া নেই! হাসচো?

শান্তি। এখন হাসবো না কেন? বা রে! যদি পায়ে চোট লাগতো··

অনাদি। লাগেনি বলে দুঃখ হচ্ছে—না?

শান্তি। সত্যি ভাই দিদি, সে ছবি যদি দেখতে! হাঃ—হাঃ! না, আমি হাসি চাপতে পাচ্ছি না, আমি হেসে নি। হাঃ—হাঃ—হাঃ (হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

অনাদি। অসহ্য! সত্যি · (উঠিয়া দাঁড়াইল)

শিবানী। অনাদি ··শোনো।

অনাদি। শোনবার কিছু নেই, দিদি। সংসারে আমার সীতবাগ ঘটচে!···কে জানে, এই চোট্ ভিতরে যদি serious হয়ে থাকে? তা থেকে টিটেনাস্ হতে পারে···আর শান্তির ঐ হাসি!

শিবানী। না ভাই, চোট্ লাগলে তুমি এমন সহজভাবে চলাফেরা করতে পারতে না।···সে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি, সত্যি!

অনাদি। শান্তি আপনার বোন্—তাই এ কথা বলচেন আপনি! তাছাড়া শান্তি তো জানে না, ভিতরে কি injury হয়েচে। সেজন্য একটা দুশ্চিন্তা নেই? যদি দাদা এমন পড়ে যেতেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন? না, এমন ভাবে হাসতেন?

অনন্ত। Impossible! তবে বলি, শোনো একদিনের কথা···

দাসী মুক্তার প্রবেশ

মুক্ত। মাসিমা তোমায় ডাকচেন, মা।

শিবানী। আমায়? যাচ্ছি—বল্‌গে। (মুক্তার প্রস্থান) বোধ হয়, নিজের অন্যায় বুঝেচে। কেন ডাকে, শুনে আসি।

অনাদি। দিদি··

শিবানী। শুনে এখনি আসচি। তুমি মিছে রাগ করচো, ভাই। তোমার কিছু হয়নি। আমি শান্তিকে ডেকে আনচি। [প্রস্থান

অনাদি। আপনার পায়ের ধুলো দিন, দাদা। আপনি ভাগ্যবান—হ্যাঁ, আপনাদের দাম্পত্য-জীবন বাঙালীর আদর্শ!

অনন্ত। শুধু হাতের গুণ, ভায়া! আমি কখনো স্ত্রীর কাছে তরল হই না। সেই ফুলশয্যার রাত্রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলুম, বলেছিলুম, আমি চাই স্ত্রীর কাছ থেকে কর্ত্তব্য-পালন।

অনাদি। কিন্তু আমিও তো স্ত্রীকে মাথায় তুলে নৃত্য করে বেড়াচ্ছিনে···

অনন্ত। তুমি ওকে বোঝাও যে, স্ত্রী স্বামীর ছায়া—দাস্যবৃত্তি ছাড়া স্ত্রীর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নেই! এ আমাদের সনাতন আদর্শ! বিলিতি আব-হাওয়ার সখী-ভাব সংসারে অশান্তি আনে!

অনাদি। কিন্তু···

অনন্ত। এর মধ্যে কিন্তু নেই। স্বামীকে কড়া হতে হবে। মিষ্টি হয়েচো কি স্ত্রীজাত আপনি পিঁপড়ের মত সে মিষ্টিটুকু গ্রাস করে বসবে। স্ত্রী যা ধরবে, তার ঠিক উল্টোটি করবে।···তাঁর মতকে স্বীকার করা মূঢ়তা—তাতে নিজের যদি বাধে, তবু। এই হলো পলিশি··· বুঝলে?

অনাদি। আচ্ছা, যে ক'দিন এখানে আছি, প্রাকৃটিশ করি। তবে কি জানেন দাদা, ভয় হয়···

অনন্ত। ভয়!

অনাদি। হ্যাঁ, যদি রাগ করে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে বসে!···যে-রকম অভিমানী! কলকাতায় অভিমানের ফলে দু' একটা এমন কাণ্ড যে ঘটেনি, তা নয়।

অনন্ত। রেখে দাও তোমার কেরোসিন! প্রাণ জিনিষটার মায়া সামান্য নয়, ভায়া!···

অনাদি। অভিমানে দেওয়ালে যে-রকম মাথা ঠোকে, দেখেন নি তো!···তবু দেখি, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। আপনার কথা মেনেই চলবো এখন থেকে।

অনন্ত। হুঁঃ! স্ত্রীকে যদি আঙুলের ডগায় রেখে না

ঘোরাতে পারলুম, তা হলে পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন? আর বিবাহই বা করলুম কেন?

অনাদি। হুঁ। যা বলেচেন।...এই যে আসচেন...

অনন্ত। নরম হয়ো না...খবর্দ্দার! আমি শাসন করতে পারতুম! কিন্তু কি জানো, একে ছোট, তায় শালী—তায় এখানে দুদিনের অতিথি! তার উপর আজ সে অপরের স্ত্রী!...তুমি কড়া হও। স্ত্রী দেখবে পায়ে লুটিয়ে থাকবে। দেখচো তো তোমার দিদিকে!

অনাদি। দেখচি বৈ কি।

শিবানী ও শান্তির প্রবেশ

শিবানী। আর ছেলেমানুষী করিস নে শান্তি...সত্যি!

অনন্ত। গলে যেয়ো না, ভায়া...

শিবানী। এবার তোমাদের সন্ধি হোক, অনাদি...

অনন্ত। এ বিষয়ে তোমার মধ্যস্থতা ঠিক নয়, শিবানী। অনুরোধে ঢেঁকি গেলা গেলেও স্বামি-স্ত্রীর মনান্তরে..

শিবানী। আচ্ছা।

অনাদি। (লক্ষ্য করিয়া) আশ্চর্য্য...একটু ইঙ্গিত! দিদি অমনি চুপ। রাগ নয়। বাঃ, মন্ত্রশক্তি একেই বলে!

অনন্ত। (জনান্তিকে) ঠিক থেকো...টলো না। খবর্দ্দার!

অনাদি। (জনান্তিকে) না!

অনন্ত। শিবানী, এসো তুমি আমার সঙ্গে। শান্তি, স্বামীর অবাধ্যতা ঠিক নয়। তোমার দিদিকে পাশে দেখেও তুমি নারীর কর্ত্তব্য বুঝলে না! অনাদির কাছে তুমি অপরাধী—মাপ চাও।

[অনন্ত ও শিবানীর প্রস্থান

অনাদি। শান্তি...(হাত ধরিল)

শান্তি। যাও...! (হাত ছাড়াইয়া) কি করেচি মহা-পাপ যে অনন্ত বাবুর কাছে আমায় এমন অপদস্থ করা...

অনাদি। সত্যি, আমি কিছু জানি না।

শান্তি। না, জানো না!...কি...তুমি চাও কি। দাস্য?

অনাদি। না।

শান্তি। চাইলেও আমি তা করতে পারবো না—আমার স্পষ্ট কথা। আমি মানুষ—তা ছাড়া সে ভাব গোড়া থেকে আমায় বোঝাওনি কেন?...স্ত্রী স্বামীকে ভালো বাসবে, যত্ন করবে, আদর করবে—এই বুঝি। তাবলে তার হুকুমের চাকরাণী নয় সে...

অনাদি। আহা, ভুল বুঝো না, শান্তি...আমি, অর্থাৎ অনন্তবাবু...মানে, বুঝচো কি না, তোমার দিদি...

শান্তি। কোনো মানে বুঝতে চাই না।...আসল কথা, অমনি দাস্য চাও যদি, বেশ...তাই হবে। তা হলে হাসি চেয়ো না, গান চেয়ো না, গল্প চেয়ো না। শুধু অনুগত দাসের ভক্তি নিয়ে খুশী থাকতে হবে।

অনাদি। রামচন্দ্র! আমি তা চাই না—চাইনি কোনো দিন। আমি তো টিকিধারী গুরুজী নই, আমি স্বামী।

শান্তি। কেন—ভোল বদলাবার দরকার কি! উপদেশ পেয়েচো। গুরুর উপদেশ! তাই আমি হবো। তোমার পড়ার কথায় হেসেছিলুম, সে-হাসির জন্য মাপ করো। জীবনে আর কখনো এমন পাপ করবো না। কখনো আর আমায় হাসতে দেখবে না!

অনাদি। কে তা চাইছে?...শান্তি...

শান্তি। কি আদেশ? বলো...

অনাদি। তোমার ও-গম্ভীর কথা শুনতে চাইছি না...

শান্তি। (করজোড়ে) কি করতে হবে, শুনি...

অনাদি। (সহসা কাতরভাবে) পায়ের সেখানটা... উঃ না, দেখচি, তুচ্ছ নয়—বুকটা অবধি কেমন যেন টেনে ধরচে।

শান্তি। এ্যাঁ!..কিন্তু পায়ের কোথাও ছড়ে যায়নি তো।

অনাদি। কে জানে, ভিতরে হেমরেজ...পা হঠাৎ টেনে-টেনে ধরচে যেন। Heart এ rush করবে না তো সমস্ত রক্ত! উঃ (পায়ে হাত দিয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া রহিল)

শান্তি। (উদ্বিগ্ন ভাব) ডাক্তার ডাকাই?

অনাদি। না, না, ব্যস্ত হবার মত নয়। মাথাটা একটু কেমন টিপ্ টিপ্ করচে! (পাল্‌স্ দেখিয়া) জ্বর...? না, নয়। পাল্‌স্‌টা তবে...

শান্তি। শোবে চলো...আমি ডাক্তার ডাকাতে বলি।... ওগো, শুনচো?

অনাদি। না, না—আমি বসতে চাই! শোবো না। তোমার কথায় শুতে হবে? বটে! না। আমায় স্ত্রৈণ ভেবেচো? না। আমি স্ত্রৈণ নই। না, আমি শোবো না।

শান্তি। রাগ করচো কেন?

অনাদি। রাগ কিসের! আর যদি করি?...তোমার কথায় রাগ ত্যাগ করতে হবে?

শান্তি। (চোখের দৃষ্টিতে কাতরতা)

অনাদি। (হাসিল) ..দুঃখ হলো?...আমারো এমনি দুঃখ হয়, যখন তুমি সামান্য কথায় ঝঙ্কার তোলো। কি! এখনো গম্ভীর! বেশ বাপু, চলো...শুতেই যাই। হুঃ, এইখানেই আমার দুর্ব্বলতা! আর সে দুর্ব্বলতার সুযোগ...খাসা আছো!...থাকো, তাই থাকো! এখন ধরো হাত...নিয়ে চলো...যাচ্ছি।

[শান্তির হাত ধরিয়া অনাদির প্রস্থান]

অনন্তর প্রবেশ

আসিয়া একখানা চেয়ারে সে বসিল, মুখ গম্ভীর।

[নেপথ্যে শিবানী। আয় না ভাই শান্তি—ত্যাখ না, কোন্ শাড়ীখানা পরে পার্টিতে যাবো। এই হেলিওট্রোপখানা? না, ঐ লাল ক্রেপ-ডিশীন?

শান্তি। হেলিওট্রোপে তোমাকে চমৎকার মানায়।

শিবানী। সত্যি? না।...লাল ক্রেপ-ডিশীনটা বুঝি মানায় না? ত্যাখ্ তো।]

[অনন্ত উৎকর্ণ হইয়া এ কথা শুনিল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।]

অনাদি। দাদা যে ধ্যানস্থ হলেন! সহসা এ ভাব?

অনন্ত। (নিশ্বাস ফেলিয়া) ভাবচি।

অনাদি। কিসের ভাবনা? কোনো মক্কেল জাল ফশ্-কাবার চেষ্টা পাচ্ছে বুঝি?

অনন্ত। তোমার ছ্যাবলামি ছাড়ো হে! জীবনটা লঘু নয়। কর্ত্তব্যের কাঁটা চারিদিকে।

অনাদি। আপনি কর্ত্তব্য ভাবুন, আমি হালকাভাবেই পথে চলি। এতে খোঁচা ফোটে, তবে সে মশক-দংশনের মত। একটু জ্বালা, একটু ফোলা—তখনি ভুলে যাই। কিন্তু কর্ত্তব্যের কাঁটা। বাপ রে, হাসি-খুশী ঘুচিয়ে কেবল কাঁটা বেছে পথ চলা! Life would not be worth living!

শিবানী ও শান্তির প্রবেশ

শিবানীর হাতে লাল ক্রেপ শাড়ী, শান্তির হাতে হেলিয়োট্রোপ শিল্ক শাড়ী।

শান্তি। আচ্ছা, আপনি দেখুন তো অনন্ত বাবু। আমাদের দুই বোনে তর্ক হয়েচে। আমি বলচি, রাত্রে নিশীথ বাবুর ওখানে নেমন্তন্নয় এখানা পরে যেয়ো, মানাবে ভালো। শিবুদি বলচে, লালখানায় ওকে ভালো দেখায়। বলুন তো আপনি!

অনন্ত। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শিবানীর পানে চাহিল, কোনো কথা কহিল না; সে দৃষ্টিতে শিবানী কাঁটা হইয়া উঠিল। তার মুখের হাসি চকিতে মিলাইয়া গেল)

অনাদি। আমি বিচার করচি। নিজের চোখের তৃপ্তির জন্য তো সাজ-সজ্জা নয়। সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্য হলো, পরের চোখে ভালো লাগা!

অনন্ত। (গম্ভীর স্বরে) শিবানী...

শিবানী। (মলিন নয়নে অনন্তর পানে চাহিল, পরক্ষণে দৃষ্টি নত করিল)

অনন্ত। নিশীথ গান শুনে তারিফ করেচে, তাতে সন্তুষ্ট হওনি! সাজে তাকে আরও বিমুগ্ধ করতে চাও...না?

শান্তি। (রূঢ় স্বরে) অনন্ত বাবু...

অনন্ত। (সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া) তুমি পার্টিতে যাবে না! আমার আদেশ...(কথাটা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল)

শান্তি। এ কি বল্‌চেন আপনি! এ-ভাবে শিবুদিকে অপমান...

অনন্ত। অপমান!

শান্তি। নিশ্চয়।...আমার স্বামী যদি এমন কথা আমায় বলতো...

অনন্ত। তোমার কথা হচ্ছে না, শান্তি। তুমি যদি স্ত্রীর আদর্শ পালন করতে...

অনাদি। মাপ করবেন, দাদা। এ বিচার আপনার Jurisdictionএর বাইরে।...দিদি...

অনন্ত। তোমরা এমন চঞ্চল হলে কেন! যাকে এ-কথা বলেচি, এ আদেশ পালন করতে তার কোথাও বাধে না। আমার শিক্ষায় মনকে বাসনা-বর্জ্জিত করবার শক্তি সে প্রচুর অর্জ্জন করেচে।

শান্তি। কি গো, গুরুর কাছে এ শিক্ষা নিচ্ছ তো!... আমি মোদ্দা এমন আদর্শ-পত্নী হতে পারবো না। তা তুমি আমায় ত্যাগ করো, আর যাই করো!

অনাদি। (চোখের দৃষ্টিতে শান্তিকে ইঙ্গিত জানাইল)

অনন্ত। কাপড় রেখে দাও গে, শিবানী। ভালো কথা, আমার একটা বাঙলা দলিল তোমায় নকল করে দিতে হবে। বড় দলিল। তোমায় দিই। লিখতে সুরু করবে, চলো।...

[অনন্ত ও তাহার পিছনে ছায়ার মত শিবানীর প্রস্থান

অনাদি ও শান্তি অপলক নেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণেকের জন্য উভয়ের মুখে কথা বাহির হইল না]

অনাদি। শান্তি...

শান্তি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনাদির পানে চাহিল)

অনাদি। কি ভাবচো?

শান্তি। এখানে না এলেই ভালো করতুম! এই কি কপোত-কপোতীর প্রেম? এরই নাম নিষ্ঠা? তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি, কথা-কাটাকাটি করি...

অনাদি। (বাধা দিয়া) উত্তম করো। চিরদিন তাই করবে। এ শ্রদ্ধা-ভক্তির চেয়ে সে কলহ-বিবাদ ঢের ভালো। স্ত্রীর বুকের উপর বুট-জুতো পরে দাঁড়িয়ে তাঁর বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছ থেকে এ বশ্যতা আদায় করতে আমি চাই না। জীবন অসহ্য হবে। কি নিয়ে বাস করবো তা হলে?

যবনিকা

নয়া যুগের নাট্য-ঠাট

(নক্সা)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নয়া যুগের নাট্য-ঠাট

বাঙলায় নাটক নাই। তার কারণ, কোনো মনস্বী লেখক নাটক লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। এ আমার কথা নয়। এ-কথা ছাপার অক্ষরে মাসিক-পত্রে এক দিগ্‌গজ লেখক লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, বাঙলায় নাটক লেখার শক্তি আছে তাঁর, আর তাঁর দুটি বন্ধুর! এই ত্রিমূর্ত্তি ছাড়া নাটক লেখার শক্তি বাঙালীর মধ্যে আর কারো নাই! নাটক যে কি পদার্থ, তা শুধু এঁরাই জানেন। তাঁরা যে-সব আলোচনা করেন, সে আলোচনায় কি পাণ্ডিত্য! তাঁদের লেখা বাঙলা ঠিক বুঝা যায় না। কারণ, তাঁদের কলমের ধাক্কায় ব্যাকরণ, idiom একেবারে মুখ থুবড়াইয়া আছাড় খাইতে থাকে! প্রতিভার লক্ষণই এই নিজের প্রভাব এমনি ভীষণভাবেই সে প্রকটিত করে।

তাঁদের বক্তব্য আমি প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। একটা কথা বেশ বুঝিয়াছি, অর্থাৎ যাহাই লেখো না কেন, প্রব্লেম্ থাকা চাই। জিওমেট্রির প্রব্লেম নয়, এ্যালজেব্রার প্রব্লেম নয়—এ প্রব্লেম্, বার্ণার্ড´শ'র প্রব্লেম, ইবশেনের প্রব্লেম্, ফ্রয়েডের প্রব্লেম। *

এঁরা একটা কথা বলেন,—যে, বাঙলায় নাটকের আকারে ছাপা যে সব বই নাটক নাম ধরিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে শুধু সেই সীতা-সাবিত্রীর পা ধরিয়া টানা, নয় শিবাজী-প্রতাপসিংহ, আকবর-ঔরংজীবকে ঘোড়ায় চড়াইয়া চীৎকার করা আছে। এ-সবে নাটক হয় না। যদি বলেন সেক্সপীয়র, মার্লো, গ্যেটে, ভিক্টর হুগো—তাঁরাও এমনি সব ব্যাপার লইয়া নাটক লিখিয়াছেন? কিন্তু আপনারা এ খবর রাখেন, এই সব প্রতিভার বর-পুত্ররা সেক্সপীয়রকে আমোল দিতে নারাজ? নাটক হয় বাঙালীর প্রাণ লইয়া মোচড় দিতে পারিলে। কিন্তু বাঙালীর জীবনে কোন্ সমস্যা প্রবল? আমরা জানি, অন্ন-সমস্যা সব চেয়ে বড় সমস্যা! কিন্তু হা-অন্ন যো-অন্ন করিলে নাটকে রস-বস্তুর সন্ধান মিলিবে না। Sex চাই। অথচ বিবাহের পূর্ব্বে বাঙালীর লভ্ হয় না। মেয়েদের খুব ছেলেবেলায় বিবাহ দেওয়া হয়—এই জন্য বিবাহে সাহিত্যের বড় ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু বক্তৃতা দিয়া

* ইঁহারা ভাবেন, এই সব বড় বড় নাম ফাঁদিলে লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে! আমারো তাক্ লাগিয়াছিল—তারপর দেখি, হা ভগবান্, বার্ণার্ড´শ, ইবশেন এঁদের লেখা বই বাজারে পাওয়া যায়; দাম বেশী নয়—এবং যে-ইংরাজী ভাষায় এ-সব বই লেখা, তা আপনি-আমিও পড়িয়া বুঝিতে পারি। আমি পড়িয়া দেখিয়াছি। অতএব নাটক লেখার বিদ্যা আমারই বা কেন আয়ত্ত না হইবে? ঐ সব বই পড়িয়া সেই সব বইয়ের প্রব্লেম বাঙলা ভাষায় নাট্যাকারে ছাড়িলেই বাঙলা নাটক বনিবে! সামাজিক নর-নারীর নাম থাকিলেই হইল,—তাদের dialogueএ হাইড্ পার্ক, হাম্বুর্গ যতই থাকুক—বাঙালীর মুখের কথা বাঙলায় দিলেই ব্যস্! তবে একটা কথা, এই যে বেচারা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাটক লিখিয়া গেলেন, সেগুলার কি গতি হইবে? নাটক কি, না বুঝিয়া তাঁরা কি লিখিয়া গিয়াছেন, কে তাহা বুঝাইয়া দিবে?

যখন এ দোষ দূর করা যাইবে না, তখন থাকুক বাল্য-বিবাহ। সাহিত্যকে অগত্যা illicit love লইয়া তার কর্ত্তব্য-পালন করিতে হইবে। সেইটাই হইবে প্রব্লেম। অতএব সে-কথার আলোচনা না করিয়া একেবারে ক'খানি প্রব্লেমাত্মক নাটকের আদর্শ পাঠক-পাঠিকার সামনে ধরিতে চাই। দেখা যাক, নাটক-হীন বাংলা সাহিত্যে বাঙলা নাটকের পত্তন তাহাতে করা যায় কি না। Sexই একমাত্র মানব-জীবনের সমস্যা। বাঙলা দেশ আজ এ কথা মানুক,—দুশো, পাঁচশো, নয় হাজার বৎসর পরে তাকে এ সমস্যা মানিতেই হইবে। কেন মানিবে? সে জবাব পরে। কেন মানিবে না, আগে তার জবাব আপনারা দিন তো।

আজগুবির সাধনা করা? ভুল। এ ভুল ধারণা ভুলিতে হইবে। যাহা আজ নাই, তাহা কাল আসিবে না—এ-কথা কে বলিতে পারে? কালো হ্যয়ং নিরবধি-র্বিপুলা চ পৃথ্বী। এই যে এ দেশে এককালে নিউমনিয়া ছিল না, প্লেগ ছিল না, কালে আসিয়া উদয় হইয়াছে; ইনফ্লুয়েঞ্জা—তাও আসিয়াছে! এমনি কত নব নব রোগ আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিয়াছে। অত বড় জাপানী-মাপের ভূমিকম্প আসিল! প্রব্লেমও তেমনি আসিবে। কবির কাজ কল্পনার সাহায্যে অনাগতকে 'স্বাগত' অভ্যর্থনা করা। অতএব আপনাদের যুক্তিতে সারবত্তা নাই। ভুলিয়া গেলে নাটক ফাঁদিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করা যাক।

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক কি লেখা চলে না? খুব চলে। তবে তাহাতে modern note চাই। যেমন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কাহিনী ধরা যাক।

'সীতাকে লইয়া নাটক লিখিতে গেলে চাই সীতাকে নব্যা নারী বানাইয়া তোলা। সীতাকে রাম অগ্নি-পরীক্ষা দিতে বলিলে সীতার অমন কাঁদিয়া পাতাল-প্রবেশ চলিবে না। নয়া যুগের নয়া আইনে সীতা ফোঁশ্ করিয়া বলিবে,—পরীক্ষা? আমার পরীক্ষা চাও তুমি? পরীক্ষা চেয়ে আমার নারীত্বের অপমান করবে? আমি দেবো না পরীক্ষা। সামনে এই বিপুল পৃথ্বী…এই পৃথ্বীর বুকে বিচরণ করবো আমি আমার এই পিপাসু হৃদয় নিয়ে …ইত্যাদি।

'সাবিত্রী'কে লইয়া নাটক লিখিতে হইলে ঐ অন্ধ দ্যুমৎসেনকে কারাগারে পুরিয়া রাখিতে হইবে। সত্যবানকে ছাড়িয়া দাও সেনা সংগ্রহ করিতে বক্তৃতার সাহায্যে। সাবিত্রী তার বাপকে বলিবে,—আমার বিয়ের ভাবনা তুমি ভাববে কি জন্য? আমি নিজে স্বামী বেছে নেবো। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী গৃহত্যাগ করিবে; নারীর অধিকার লাভের জন্য দেশে দেশে নারীর দল লইয়া উত্তেজক বক্তৃতা করিবে। তারপর হঠাৎ এ দলের সঙ্গে সত্যবানের দলের দেখা; এবং দু'দল মিলিয়া অন্ধ দ্যুমৎ-সেনকে উদ্ধার করিবে; এবং 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা হইলে সত্যবানের গলায় সাবিত্রী বরমাল্য দিবে—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পুরস্কার-স্বরূপ।

'দময়ন্তী' নাটকে চাই হংস-মারফত নলের সহিত দময়ন্তীর প্রেম-পত্র চালানো—সে কথা ফাঁশ হইবার ভয়ে দময়ন্তীর পিতা বিবাহের আয়োজন করিবেন, ইত্যাদি।

কিন্তু পৌরাণিক নাটক পরের কথা। আগে চাই রক্ত-মাংসের নাটক। সে নাটক লেখা চাই বাঙলার Slum-life লইয়া। নহিলে সবজান্তার দল গর্জ্জন তুলিবে। তারা রবীন্দ্রনাথকেও এ-ঔদাস্যের জন্য ছাড়িয়া দেয় নাই। তা ছাড়া এ-পথে ধাঁ করিয়া পশার জমিবে।

নাটকের পাত্র-পাত্রীর তালিকা চাই সর্ব্বাগ্রে। আমি সে তালিকা গোপন করিব না।

মোধো ছুতার—নায়ক; তার স্ত্রী বিরাজী—নায়িকা। মোধোর বিধবা মা আছে—সংসারের আবর্জ্জনা। নাটকে তার কাজ, চড়া সুর তোলা—যাহাতে নায়িকার চিত্তে বিরোধ-হেতু Pathos জমাট বাঁধে। সেই উদ্দেশ্যে নাটকে তাকে স্থান দিতে হইবে। আরও কতকগুলা পল্লীবাসী জীব চাই—এরা নায়িকার চরিত্র ফুটাইবে; আর থাকিবে এই অন্ধকারের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি ছিটাইতে তরুণ কবি বিজলীলাল।

প্রথম অঙ্ক

মোধো ছুতারের ঘর। সন্ধ্যাকাল। বিজলী খোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে ফুল গুঁজিতেছে। এমন সময় মোধো মদ খাইয়া ঘরে ফিরিল।

ফিরিয়া ডাকিল,—কৈ…?

বিরাজী। কেনে?

মোধো। দুখানা শসা কুচিয়ে দে তো!…আর এই বোতলটা রাখ্…

বিরাজী। (মুখ-ঝামটা দিয়া) আমাকে কেনা বাঁদী পেয়েচিস্! বটে! ওই বিষ গিলে আসবি, আর…

মোধো। বিষ নয় রে, এতে মজা আছে। সারাদিন কাটার পর এ খেলে আরাম মেলে! বোতল রাখ…

বিরাজী। (খোঁপায় ফুল গুঁজিতে গুঁজিতে) আমি পারবো না! কি হাওয়াই বইছে…আমি এখন ঘাটে যাবো…গা ধুতে!

মোধো। বটে! ঘাটে তোর কে আছে যে…

বিরাজী। ছোট নোকের মত বকো না বলচি!

মোধো। ছোট নোক! কে ছোট নোক, বিরাজী? আমি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওরে, এই ছোট নোকই

রাজ্য চালাচ্ছে···এই ছোটনোকই মহাত্মা গন্ধীর মাথার মণি আজ!

[এ কথায় Depressed classএর উপর দরদ জাগানোর ইঙ্গিত সকলে লক্ষ্য করিবেন!]

বিরাজী। তা হোক। আমি তোর ইতরুমিতে সহায় হতে পারবো না।

মোধো। তার মানে?

বিরাজী। ও মদের বোতল ছোঁবো না।

মোধো। বটে! এ শিক্ষা কোথায় পেলি? বিরাজী···

বিরাজী। খবর্দ্দার! ডাকতে হয়, বিরাজ বলে ডাক্··· বিরু বল্। বিরাজী নয়!···আমার চিত্ত আজ জেগেছে এই ফাগুনের হাওয়ায়! সে নিজেকে খুঁজে পেয়েচে···তার কি পিপাসা, কিসের ক্ষুধা···

[নেপথ্যে গান; এ গান বিজলীলাল গাহিতেছিল]

(গান)

ফাগুন হাওয়ায় মন জ্বলে রে, মন জ্বলে।
বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ছন্দ হা রে ঝমঝমে কৈ, ঝমঝমে!

[গান শুনিয়া বিরাজী চঞ্চল হইয়া উঠিল। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল]

মোধো। কোথা যাস্?

বিরাজী। ঐ! ঐ আমার ডাক এসেচে··

(গান)

আমার মন মানে না রে
উধাও হয়ে ভাসচে সে যে
সুরের কিনারে!
ঘরে এই অন্ধকারের হাহাকারে
মন ভরে রে, মন ভরে।
সে হাঁপিয়ে মরে, হাঁপিয়ে মরে।
বাইরে যাই রে, চাই রে তাই রে
পরশ দিয়ে বাঁচাই তারে!

[আপনারা যদি বলেন, ছুতোরের ঘরে ছুতোরের বৌ এ গান গায় কি বলিয়া? তার উত্তরে আমি বলি, ছুতোরের ঘরে থাকিলে কি হইবে, বিরাজী নারী, eternal নারী; তার বুকে ক্ষুব্ধ নারীত্ব ঘুমাইয়া ছিল; আজ কবির গানে সে সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে! জাগরণীর পালিশে ভাষায় জোলুশ্ খোলে। দস্যু রত্নাকরের সুপ্ত চেতনা জাগিতে সেও একদিন গাহিয়া উঠিয়াছিল,—মা নিষাদ ইত্যাদি। নজীর আছে।]

মোধো। আরে মর্—ক্ষেপলি যে!

বিরাজী। এত দিন ক্ষেপেছিলুম—আজ ক্ষ্যাপামি সেরে গেছে। আমি চল্লুম···

মোধো। ঘর-দোর?

বিরাজী। প্রাণ যখন জেগেছে, তখন কি সে এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে আর থাকতে পারে? আজ সারা দুনিয়ায় আমার ঘর···আমি নারী! আমি তরুণী!

[প্রস্থান

মোধো। বাঃ—এ যে ভেল্‌কি! যাক্—কে কার! এ দুনিয়ায় বোতলই সার! (মদ্য পান)

(মোধোর মা শ্যামা প্রবেশ করিল)

শ্যামা। বৌ গেল কোথায় রে?

মোধো। ওর প্রাণ জেগেচে···ওকে আটকো না···

শ্যামা। তা বলে ঘাটে ছুটবে—এই সন্ধ্যেবেলায়? বৌ মানুষ!

মোধো। বৌ নয়, মা, মানুষ। আগে মানুষ, তার পর বৌ···মানুষকে মানো মা। মানুষের বড় কেউ নয়।

শ্যামা। কিছু বুঝি না এ-সব হেঁয়ালি। উনুন জ্বলে যাচ্ছে, ভাত চাপাবে, তা না বৌ চললো প্রাণ জেগেছে বলে ঘাটে। অনাছিষ্টি কাণ্ড।

[প্রস্থান

মোধো। এ সংস্কার। কাটা সহজ নয়। বাঁধনের পর বাঁধন আসে। এ বাঁধন কাটতে পারলে সব ফর্শা! ···বাঃ! (মদ্যপান)

তৃতীয় অঙ্ক

নদীর ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া বিজলীলাল বাঁশী বাজাইতেছে। বিরাজী আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশী থামিলে খোঁপা হইতে একটি ফুল লইয়া সে বিজলীলালের হাতে দিল। বিজলী উঠিয়া বিরাজীর হাত ধরিল। তার পর কথাবার্ত্তা সুরু।

বিজলী। তুমি এসেচো?

বিরাজী। এসেচি। ও গান, ও বাঁশী শুনলে কি আর ঘরে থাকা যায়?

বিজলী। ঠিক। এ মুক্তির ডাক! বাঁধন-কাটার মন্ত্র!

বিরাজী। সে যুগে রাধার এই দশা ঘটেছিল; শ্যামের বাঁশী শুনে···

বিজলী। ঠিক তা নয়। সে বাঁশীর মধ্যে কামনার সুর ছিল। আজকের এ সুরে নিছক মুক্তির হাওয়া···

বিরাজী। এ হওয়ার পরশ আমার সব বাঁধন শিথিল করেচে। দেখচো না, আমি কাঁপচি?

বিজলী। স্থির হয়ে বসো, বিরাজ!···আকাশের পানে চেয়ে ছাখো···কি দেখচো?

বিরাজী। একটি, দুটি, তিনটি তারা···

বিজলী। ঠিক···তিনটি মাত্র তারা। চারটি নয়, দুটি নয়! এর মানে বোঝো?

বিরাজী। না। বলো···

বিজলী। নারী, নারীর স্বামী, আর প্রণয়ী···নিখিলে আছে এই তিন জন।

বিরাজী। (বিহ্বল দৃষ্টিতে বিজলীর পানে চাহিল)

বিজলী। তাই নারীর চিত্তে দুটি ধারা অজর অমরকাল ধরে প্রবাহিত। একটি ধারা স্বামীর ঘরকর্ণার কাজে গিয়ে মিশেচে—যে স্বামী অন্ন জোগায়, বস্ত্র জোগায়, থাকবার ঠাঁই দেয়; আর এক ধারা ঐ চিত্ত-সাগরে গিয়ে মিশেচে, প্রণয়ী—যে শুধু প্রাণ-মনের খোরাক দেবে, বচনে-চুম্বনে অনুরাগের পশরা বয়ে প্রাণ-মন পুলকে তৃপ্ত করবে। এই প্রণয়ীর সঙ্গেই নারীর যা কিছু প্রাণের কারবার। সংসারের সব কলরব-কোলাহল ঠেলে রেখে দিনান্তে নিশীথে এই প্রণয়ীর পাশে নারী আসবে গ্লানিমুক্ত চিত্ত নিয়ে.. আলো-হাসি-গানের উৎসব জাগাতে!

বিরাজী। (পুলক দীপ্তিতে দুই চোখ ভরিয়া উঠিল) তাই হোক, কবি! আমি এসেচি···

বিজলী। এসেচো আমার প্রাণের প্রিয়া···আমার শত যুগের সাধনার প্রিয়া···এসো, এসো (বক্ষ-লগ্ন করিয়া চুম্বন)

(নেপথ্যে মোধো। কোথায় গেলি বৌ?)

বিরাজী। ঐ আসচে···ধরো, ধরো আমায়···(বিজলীকে আরো জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল)

বিজলী। আসচে। তাই তো! উপায়?

মোধোর প্রবেশ

মোধো। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি মাতাল···আমি স্বামী। ···বিরাজী···

বিরাজী। তোমার সংসারের সব কর্ত্তব্য সেরে তবে আমি এসেছি। আমার মন, নারীর মন··সেও তৃপ্তি চায়...

মোধো। চায়? এই নাও তৃপ্তির গেলাস··· (মদ্য দান)

বিরাজী। যাতে পুরুষের তৃপ্তি, নারীর তৃপ্তি তাতে নয়···তাতে নয়···

মোধো। কিন্তু এর জন্য তৈরী ছিলুম না। তা··· বেশ, ভাবতে হলো···(মদ্য পান)

বিরাজী। তুমি ভাবো···আমরা এই গোধূলির রাগে প্রাণের কলগুঞ্জন···

বিজলী। বাঁশী শুনবে?

বিরাজী। না। গান···প্রাণের গান। এমন গান গাও কবি, যাতে ভেঙ্গে দুমড়ে আমি তোমার বুকে মিশে যাই!

বিজলী। (গান ধরিল

গান

বাঁশের বাঁশী···তার সুরে ফাঁশি···
ফাঁশ্ লাগাই গো, নীরব প্রাণে!
কাজে লাজ দে, আয় ছুটে সই
অকাজে আয় গানে-গানে!
টাকার পিছে-পিছে ধাওয়া, মাথা খাওয়া,
মাথা—সে অতি তুচ্ছ!
তায় ইজ্জৎ কি, খুব বুঝেচি,
ভয় কি লোকের কুচ্ছ!
নারীর প্রাণের ভালোবাসা,
চোখে তার চাউনি খাসা—
বাঁধি সব এই সুরের তানে!

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এ দেখেও মদ গিলচিস? কোথাকার নির্ঘিন্নে তুই!

মোধো। চুপ কর্ মা··আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে!··· কিছু বুঝতে পারচি না··বুঝতে দে (মদ্য পান)

বিরাজী। পিয়, পিয়···

বিজলী। পিয়া, পিয়া···

(বৃক্ষশাখে পাপিয়া ডাকিল—পিয় পিয় পিয়)

ঐ শোনো···সারা নিখিল পিয়ার জন্য আকুল আর্ত্তরব তুলচে! সুন্দর নিখিল! আমরাও সুন্দর হবো।

তৃতীয় অঙ্ক

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। দৃশ্য—মোধোর গৃহ। দাওয়ায় বসিয়া মোধো, বিজলী, বিরাজী।

বিজলী। ভাবা শেষ হলো?

মোধো। হয়েচে। তোমাদের কথাই ঠিক। নারীর চিত্তে দুই ধারা,—এক ধারা সংসারে; আর এক ধারা পরদেশী সেঁইয়ার···

বিরাজী। নাথ, স্বামী···

মোধো। প্রিয়তমে, স্ত্রী।

বিরাজী। তুমি সত্যি মহৎ।

মোধো। এতে মহত্ত্ব নেই, বিরাজী। এ কালের ভেরী-রব। স্বামী সংসারের অভাব মেটাবার জন্য। প্রাণের সঙ্গে তার কোনো কারবার নেই। প্রাণ সেখানে সঙ্কুচিত হবে, সঙ্কীর্ণ হবে। প্রাণের কারবার বাইরে প্রণয়ী-জনের সঙ্গে—ঐ আকাশের মত যার মুক্ত দরাজ প্রাণ, তাকে এই ছোট্ট সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখবার চেষ্টা মূঢ়তা!

বিজলী। তাই। বিরাজ…

বিরাজী। বিজলী…আমার অন্ধকার প্রাণের আকাশে তুমি বিজলীর চকিত-চমক…তবু তার আলোয় ছুনিয়া আমার আলো হয়ে উঠেচে।

মোধো। এ ভোরের আলো, বিরাজী…

বিরাজী। আমার প্রাণ তাই বিভোর হয়েচে! একটু পরে রবি-কর দীপ্ত প্রখর হবে।

বিজলী। সংসার এ দিবালোকে তোমায় ডাকচে, যাও… তার পর সংসারের দাবী চুকিয়ে তোমার কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ো সন্ধ্যায়, আমার প্রতীক্ষায়…চাঁদ আলোর হাসি হেসে কাণের কাছে গাইবে…জাগো, জাগো…

বিরাজী। তখন প্রণয়ের আহ্বান!…এইখানেই নারী নারী…খুড়ি, ভুল হচ্ছিল নব নারী!…প্রেমের অভিষেক হয়েচে তার। এই রূপে নারী জেগে উঠুক পচা গলিত সংস্কারের বাঁধন কেটে মুক্তির ধারায় নব-স্নাত হয়ে…

বিজলী। তাই হোক…

মোধো। মাভৈঃ! মাভৈঃ!

যবনিকা

এ নাটক লিখিবার শক্তি সম্যক্ বিকশিত করিতে হইলে ছেলেদের নব-বর্ণ-পরিচয়ের প্রয়োজন। তারো একটি খশড়া দিলাম। আমাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে নব-বর্ণপরিচয়ে পোক্ত হইলে অতি তরুণ বয়সেই Sex-তত্ত্বে অসীম জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলিবে। নিম্নে তপশীলে নব-বর্ণপরিচয়টুকু বর্ণিত হইল।

নবপর্য্যায় বর্ণ-পরিচয়

"অ—য় অজগর আসচে তেড়ে; আ—য় আমটি আমি খাবো কেড়ে"—অধুনা বাতিল হইয়াছে। তার বদলে

(স্বর-বর্ণ)

অলক ছুঁয়ে বইছে বাতাস।
আল্‌তা পায়ে পরাণ মাতাস্॥
ইয়ারিং দুটি দুলছে কাণে।
ঈক্ষণে তীর-গুচ্ছ হানে॥
ঋতুরাজের মলয় ঝরে।
ঌ-লি ঌ-লি প্রণয়-জ্বরে॥
এলো খোঁপায় মানস দোলে।
ঐ বাঁশীতে পরাণ ভোলে॥
ও-বাড়ীর ঐ জান্‌লা খোলা।
ঔরৎ দোলায় প্রাণের দোলা॥

(ব্যঞ্জন-বর্ণ)

কাজল-চোখে চাউনি মিঠে।
খোঁপার বাহার চিনির ছিটে॥
গজল-গানে লাগায় ফাঁশি।
ঘুলঘুলিতে ঠোঁটের হাসি॥
ঙ-বাঁদড়া, নেইকো ভাষা।
চুড়ির বাজে চিত্ত ঠাশা॥
ছাদের পানে চেয়েই আছি।
জান্‌লাতে মুখ দেখলে বাঁচি॥
ঝলক-হাসির আরাম কত।
ঞ-র ব্যাদ্‌ড়া ঙ'র মত॥
টুকটুকে দুই নিটোল গাল।
ঠোঁট দু'খানি ডালিম-লাল॥
ডগমগ-বুক প্রেম-স্বপনে।
ঢল্ নাই তার সুযৌবনে॥
ণয় নিজস্ব দিল্-পরাগ।
তরুণ প্রাণে সবজী-বাগ্॥
থমকে থামা চলার কালে।
দরদ জানায় পুরো চালে॥
ধন্য আমি তোমায় পেলে।
না, দূর ছাই যাই গে জেলে।
পর নারী গো, পরাণ প্রিয়া।
ফরদা প্রাণ, দরাজ হিয়া॥
বাঁধন নাই, না মান্ বাধা।
ভরসা যুগ, আর প্রাণ সাধা॥
মন যে রূপের ধ্যান-পাগল।
যুগ-বাণী,—ভাঙ্গ, ভাঙ্গ আগল॥
রঙ-নেশায় বুঁদ্ দিল্ নুমান।
লাল ঠোঁটে তুই ভর্ চুমায়॥
বিলোল চোখ দিল্ ভাতায়।
শাড়ীর পাড় চোখ মাতায়॥
ষাট বছর? তায় লজ্জা কি?
সঙ্গে চাই দিল্-সঙ্গিনী॥
হাতনে হাত দে, দিলমে দিল্।
ক্ষয় না প্রণয় একটি তিল॥

এই ভাবে নব-পর্য্যায় বর্ণ-পরিচয় ঘটিলে বাঙালীর কামনা পূরিবে, অর্থাৎ ছ'সাত বৎসর বয়সে বাঙালী বালক Sex-তত্ত্বে তত্ত্বভূষণ হইবে এবং তার ফলে যে গান, যে কবিতা, যে গল্প উপন্যাস বা নাটক সে গড়িবে, তার ধাক্কায় দুনিয়া ঘূর্ণীচক্রে দুলিয়া সেই বৈকুণ্ঠলোকে গিয়া ঠেকিবে—সে সম্বন্ধে অকুতোভয়ে ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার করিতেছি।

জাতীয় নাটকের প্লট

(নক্সা)

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জাতীয় নাটকের প্লট

আজ বাঙালীর দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে। বাঙালী বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় দম্ভভরে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। বাঙালী এত দিনে তার নাটকের অভাব মোচন করিয়াছে। বাঙলা নাটকের নামে বঙ্গমঞ্চে যে গদার আস্ফালন, কোদণ্ড-টঙ্কার, যে প্রণয়-রাস-রঞ্জিত নূপুর-নিক্বণের আমদানি হইয়াছিল, তাহা যে বাঙলার নিজস্ব বস্তু নয়, তাহাতে যে বাঙালীর পরিচয় কোনো দিন পরিস্ফুট হয় নাই, এ কথা আমরা তারস্বরে বারবার ঘোষণা করিয়াছি এবং বৃন্দাবনের শ্রীরাধার মত পথের পানে চাহিয়া আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া ডাকিতেছিলাম—কোথায় আছো হে বাঙলা নাট-মঞ্চের শ্যামসুন্দর, এসো। এসো তোমার বাঁশী লইয়া, বাঙলা ব্রজের গোপ-গোপিকার প্রাণের কথাটুকু সে-বাঁশীর সুরে বাঙলার গগনে পবনে ভরিয়া তোলো।

আজ আমাদের সে পথ চাওয়া সার্থক হইয়াছে! বাঙলার নাট-মঞ্চে শ্যামসুন্দর আসিয়াছেন। জানেন পাঠক, তিনি কে? তিনি আমাদের তরুণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বেচারাম গুপ্ত। তাঁর নব-নাটক "মুক্ত বক্ষ-দ্বার" বাঙলা নাট্য-কলার গলায় আজ "গার্লাণ্ড" দুলাইয়া দিয়াছে!

শুধু শ্যামসুন্দর আসেন নাই! তাঁর চেলাবর্গ—সেই শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁদের লেখা নাট্য-সমালোচনার নামাবলী আজ ঘুড়ি হইয়া বাঙলার আকাশে উড়িতেছে! দেখিয়া কাক-চিলেরা ভয়ে বাসায় গিয়া ঢুকিতেছে!

প্রথমে আমরা 'বক্ষ-দ্বার' নাটকের আলোচনা করি। সেদিন হংসেশ্বর রঙ্গমঞ্চে তার যে অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি, তার আর তুলনা নাই! A nation is known by its theatre. যে নাটক সদ্য দেখিয়াছি, সে নাটকে বিশ্ব-সভায় বাঙলার প্রবেশ কেহ আর আটকাইতে পারিবে না। এমনি নাট্যচর্চ্চা ছাড়িয়া যতই খদ্দর পরুন, যতই লবণ তৈয়ারী করুন, দেশমাতা জাগিবেন না, জাগিবেন না!...

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলাম,—কি প্রচণ্ড ভিড় ঠেলিয়া! উঃ, রথের মেলায় এমন ভিড় দেখি নাই। অমন যে চৈত্রের সঙ্ বাহির হইল সেদিন, তা দেখিতে লোকের ভিড়ে কলেজ ষ্ট্রীট আগাগোড়া ভরিয়া গিয়াছিল—তার চেয়েও বেশী ভিড়। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিলাম, হাঁ, জাগিয়াছে, দেশবাসীর নাট্য-কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে! জীতা রহো বাঙালী দর্শক...তুমি এত সহজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে মজিয়া এমন মাতনে মাতিতে পারো—ধন্য, ধন্য তুমি হে!

সাড়ে সাতটায় অভিনয় হইবার কথা, কিন্তু প্রথম রজনী কি না, কাজেই রাত্রি পৌনে দশটায় যবনিকা উঠিল। এই দীর্ঘ কালটুকু পর্দ্দার বাহিরে দর্শকের নাট্য-রস পিপাসা বাড়াইবার এই যে ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা খুব সমীচীন! সর্ব্বতোভাবে আমরা এ ব্যবস্থার সমর্থন করি। প্রথম পটোত্তোলন হইলে দেখি—সজ্জিত ড্রয়িং-রুম। সোফা, কৌচ, পিয়ানো, রেডিও-সেট্—অর্থাৎ সরঞ্জাম একেবারে আপ্-টু-ডেট। কাণের পাশে কে এক বিমূঢ়াত্ম কহিল—এ কি সাধারণ বাঙালীর ঘর?

সামনের শীট হইতে আর এক জন কহিল,—সাধারণ বাঙালীর ঘরে শুধু ধামা আর কুলো! তা নিয়ে নাট্য-রচনা হয় না বাপু। তুমি থামো···

দুটা কথার টুকরা মাত্র। কিন্তু দুটি কথাতে আমার মনে চিন্তার সমুদ্র আলোড়িয়া উঠিল। সাধারণ বস্তু নাটকের subject হইতে পারে না ঠিক! নাটকে চাই অসাধারণের ব্যঞ্জনা···কিন্তু যাক্ সে কথা!

নাটকের গল্পটুকু এখন খুলিয়া বলি। মাঝে মাঝে কোটেশন দিব। তাহা হইতে বাঙালী বুঝিবে, তার নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার কি ব্যবস্থাই হইয়াছে!

প্রথম দৃশ্যে ড্রয়িং-রুম। ঘরে একটি টেবিল। টেবিলের উপরে স্তূপাকার চিঠি, খবরের কাগজ···টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া অয়স্কান্ত। প্রোগ্রামে লেখা ছিল, প্রথম দৃশ্যে অয়স্কান্ত; তার পাশে একটি খানসামা···।

পট উঠিবামাত্র অয়স্কান্ত ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিগুলা লইয়া পড়িতে লাগিল। যত বড় চিঠিই হৌক, হাতে ধরিবামাত্র পড়া শেষ! তুচ্ছ ব্যাপার। নিপুণ অভিনেতার এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে বুঝিলাম, অয়স্কান্ত ত্বরিতকর্ম্মা ব্যক্তি···দু'একখানা চিঠির দু'চারিটা ছত্র অয়স্কান্ত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিল···

"গন্ধনাথ কি লিখচে? তিশিগুলো বিক্রী হয়েচে, পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ···হুঁ···।

হাপাগঙ্গার কুমার-বাহাদুরের বাড়ী নাচের গানের জলসা···বুধবার। আচ্ছা···

বালিগঞ্জের বাড়ী···তোফ্‌সার নবাব ভাড়া নিচ্ছে· মাসে ভাড়া দেড় হাজার···এক মাসের ভাড়া আগাম দেছে। বটে ···"

আমরা চমৎকৃত! দু'চারিটা নিপুণ ইঙ্গিতে নাট্যকার বুঝাইয়া দিয়াছেন, অয়স্কান্ত টাকার কুমীর—চারিদিকে তার ব্যবসার প্রসার··মা-লক্ষ্মী বাঙলা দেশ জুড়িয়া আঁচল পাতিয়াছেন, আর রাজ্যের টাকা সে-আঁচলে বাঁধিয়া এই অয়স্কান্তের গৃহে···বাঃ, এই তো চাই! মৃদু ইঙ্গিতে অসীমের এমন আভাস! যাঁরা নাটক লিখিতে চান, তাঁরা এ মর্ম্মটুকু হৃদয়ঙ্গম করুন।

একটা বেয়ারা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল,—জী···

অয়স্কান্ত মুখ তুলিলেন, কহিলেন,—বাক্স···?

—জী হুজুর··

কাগজপত্রের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া অয়স্কান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে কহিলেন,—তোর বহু-জী এসেচেন?

—জী···

—আর কেউ এসেছিল···?

—অশোক বাবু...

—আচ্ছা, যাও···

বেহারা চলিয়া গেল। এই যে সাহেবী কেতায় সাজানো ঘর, অথচ অয়স্কান্তের পরণে ধুতি এবং স্ত্রীকে মেম-সাহেব না বলিয়া বহু-জী বলিয়া নির্দেশ—ইহাতে কতখানি শক্তির পরিচয় পাই! চমৎকৃত হইলাম। এই তো জাতীয় ভাবের বিকাশ! অপূর্ব্ব! তার উপর ঐ মৃদু ইঙ্গিত···'বহু-জী।' অয়স্কান্ত প্রৌঢ়; স্ত্রীর সম্বন্ধে 'গিন্নী-মা' না বলিয়া বলিলেন, 'বহু-জী'। আর ঐ অশোক বাবু! দুনিয়ায় এত লোকজন থাকিতে ঐ অশোক বাবুর নামটুকু···কি নিবিড় রহস্য সূচিত হইয়াছে ···এই তো নাটকের সমস্যা—ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় দর্শকের মনে এ সমস্যা ছায়া বিস্তার করে!···

অয়স্কান্ত একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া পাতায় পাতায় দৃষ্টি ছুটাইলেন—মোটরের বেগে···

পিছনের ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, কর্পূরা।···

প্রোগ্রামে পরিচয়-লিপি দেখিলাম, কর্পূরা···কে? "অয়স্কান্তের বিবাহবন্ধনাবদ্ধা পত্নী!"

পরিচয়-লিপিতে ঐ যে বিশেষণটুকু 'বিবাহ-বন্ধনবদ্ধা পত্নী'। পত্নী-মাত্রেই তো 'বিবাহ-বন্ধনাবদ্ধা,' তথাপি এ বিশেষণ! ঐ দিকটায় মন সচেতন হইল··· বিবাহবদ্ধা নয়! 'বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা—ঐ 'বন্ধন' কথাটুকু···এ যুগের, এ যে অমোঘ সমস্যা। বাঃ! হৃদয়ের পাঞ্চজন্য-নিনাদ।···

কর্পূরা দেখিতে সুশ্রী···বয়সে তরুণী···ছিপছিপে দেহ···যেন সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা! বাঙলার নাট্য-মঞ্চে এমন সূক্ষ্ম দেহ দেখা যায় না! কেমন হাওয়ার গুণ ··বাঙলা রঙ্গমঞ্চে রতি, শচী, শ্রীরাধা—এতদিন যাদের দেখিয়াছি, সকলেরই স্থূল বপু! এ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষের বাহাদুরি আছে—এমন সূক্ষ্মশরীর-ধারিণী অভিনেত্রী পাইয়াছেন।

কর্পূরা আসিয়া প্রচণ্ডভাবে একটা কৌচে বসিয়া পড়িলেন...

পাশে একটা শঙ্কপক্ষীয় দর্শক ছিল। সে মন্তব্য করিল,—এ কোম্পানি কাকেও মাহিনা দেয় না। তাই এদের 'হীরোইন' এমন রোগা।

অয়স্কান্ত কাগজ রাখিয়া কাজ রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন, কর্পূরার একখানি হাত নিজের হাতে সাদরে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন,—বড় শ্রান্ত হয়েচো···

হাত নাড়িয়া অধীরভাবে কর্পূরা কহিলেন,—শ্রান্তি, শ্রান্তি, সুগভীর শ্রান্তি...

অয়স্কান্ত শশব্যস্তে কহিলেন—চা আনতে বলবো? লিমনেড? আইসক্রীম··

কর্পূরার মুখে বিরক্তির চিহ্ন! তিনি কহিলেন,—না, না, না,···

অয়স্কান্ত কহিলেন—কোথায় গেছলে?

কর্পূরা কহিলেন—মিটিংয়ে। আজ আমাদের

নারীমুক্তি প্রচারিণী সভার মিটিং ছিল।···তা তুমি কি এখনি বেরুবে ?

তাঁর চোখে আগ্রহ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

অয়স্কান্ত কহিলেন—হাঁ, আমাদের দরিদ্র-নারায়ণ সভার স্পেশ্যাল মিটিং আছে। একবার···

কর্পূরা কহিলেন—যাও। নিষ্ঠুর পুরুষ··

অয়স্কান্ত কহিলেন—কঠোর কর্ত্তব্য আরো কঠিন হয় তোমার ভ্রূকুটি-স্পর্শে। ভেবেছিলুম, বায়োস্কোপে যাবো তোমায় নিয়ে···টেলিফোন করছিলুম দুটো শীটের জন্য···

বাধা দিয়া কর্পূরা কহিলেন—থাক্, থাক্, কোনো প্রয়োজন নেই·

কর্পূরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর টেবিলের উপরকার কাগজপত্র ঘাঁটিলেন···পরক্ষণে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—অশোক তোমার সঙ্গে যাবে ?···

অয়স্কান্তর চোখে মমতার দৃষ্টি...দু'সেকণ্ড নীরবে চাহিয়া তিনি কহিলেন—কেন ?

কর্পূরা কহিলেন—না···এমন কিছু কারণ নেই,··· তবে বায়োস্কোপের কথা তুললে। তাই। সে থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম···

অয়স্কান্ত স্থির দৃষ্টিতে কর্পূরার পানে চাহিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তুমি জানো কর্পূর, ঐ অশোকের চিন্তায় আমি কতখানি কাতর। দেখেচো ওর মুখের ভাব ? চোখের ভঙ্গী ? কি বেদনায় ও দিনান্তের ফুলের মত ম্লান, মলিন হয়ে থাকে! আমাদের স্নেহে ওর বেদনা মুছে নিতে পারচি না···

কর্পূরা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিলেন।

অয়স্কান্ত কহিলেন—ও কেমন স'রে স'রে থাকে! কি ভাবে! দীর্ঘনিশ্বাসে ওর বুকের বেদনা পুঞ্জিত হয়ে ওঠে···প্রাণপণে ও তাকে চেপে ধরে···ওর বুকের মধ্যে অহর্নিশি একটা সংগ্রাম চলেছে···বিপুল সংগ্রাম। আমার কি সন্দেহ হয়, জানো ?

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কর্পূরা কহিলেন—কি সন্দেহ ? তাঁর মুখ বিবর্ণ হইল, দেহ-লতা ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল।

অয়স্কান্ত কহিলেন—বেচারা বোধ হয় প্রণয়-বিষে জর্জ্জরিত হচ্ছে। সে বিষ···

কথা শেষ হইল না। অয়স্কান্ত টেবিলের উপর হইতে কতকগুলা কাগজ-পত্র গুছাইয়া হাতে লইলেন··· কর্পূরা এ দিকে মুখে-চোখে ভাবের বিচিত্র বিদ্যুৎ বহাইতে লাগিলেন···বুকে হাত দিলেন, বুঝি, বুক ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে! সেটা সামলাইলেন, তার পর ভ্রূ কুঞ্চিত, পরক্ষণে বিস্ফারিত চক্ষু···আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁর ভাব ফুটিতে লাগিল···অয়স্কান্ত সে দিকে চাহিলেন না···

একসঙ্গে দুজনে দুরকম ভাবাভিনয়···এ যে কত বড় নাটকীয় আর্ট— যাঁরা বার্ণার্ড শর নাটকের বাঙলা সমালোচনা লেখেন, তাঁরাই শুধু বুঝিবেন।

সহসা কাগজপত্র টেবিলের একধারে রাখিয়া অয়স্কান্ত কর্পূরার কাছে আসিলেন, সস্নেহে ডাকিলেন,— কর্পূ···

কর্পূরা চমকিলেন,—স্বামীর পানে চাহিলেন,—মুখে কোনো ভাব নাই···স্থির দৃষ্টি!

অয়স্কান্ত কহিলেন,—বেচারা! একা থাকে নিজের মনে। তুমি কাছে ডেকে দরদ-ভরে দু'চারটে কথা বলো···তার কি বেদনা···অতি মৃদু স্নেহের পরশে তা জানতে চেয়ো!

অয়স্কান্ত স্তব্ধ হইলেন, তার পর স্বগত (উচ্চকণ্ঠে) কহিলেন,—ওর মাকে আমি বলেছিলুম, আমি ওকে দেখবো। দুর্ভাগিনী···

কর্পূরা অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,— অশোককে তুমি আগে থেকেই জানতে ?

—ওকে নয়, ওর মাকেও জানতুম। বেচারী লালিমা···

—ওর মা···?

—হ্যাঁ, ওর মায়ের নাম লালিমা। বহুকাল পূর্ব্বে··· তখন আমার প্রথম যৌবন···দুনিয়া রঙে রঙীন—শুধু ফাগুনের হাওয়ায় দিনগুলো সাবানের ফেনার মত উড়ে-উড়ে চলেছে···(দীর্ঘশ্বাস) তার পর তার বিয়ে হলো ···সে চলে গেল দূরে···বিদেশে, বহুদূরে···আমি তখন প্রোবেট নিয়ে সম্পত্তি হাতে পেয়েচি···তার সে রূপশ্রী··· রক্ত কমলের মত আঁকা আছে এ চিত্ত-পটে···আজো, আজো···এতটুকু বিবর্ণ হয়নি··

কর্পূরা বুকে হাত রাখিলেন, তার পর আপনাকে সম্বরণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—তার পর আর ছাখোনি তাকে ?

—না।

—তোমাকে কোনো চিঠি লেখেনি ?

—একখানি মাত্র। তাতে লিখেছিল, তার দুঃখের অন্ত নেই। বেদনায় তার শরীর-মন অসহ্য যাতনা ভোগ করচে অহর্নিশি···অশোকের চিন্তায় সে কাতর···

—তার পর ?

—তার পর তুমি জানো—সেই মধুপুর যাচ্ছিলুম —হাবড়ার পোলের উপর···উদাস মনে অশোক চলেছিল, আমার মোটরে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। চোট্ লাগেনি। আমি তাকে গাড়ীতে তুলে নিলুম। তার পকেটে ছবি ছিল। একখানি ফটো! দেখে আমি চম্‌কে উঠলুম··· জিজ্ঞাসা করলুম, কার ছবি ? অশোক বল্লে,—তার মা'র···স্নেহময়ী মা'র···দুঃখিনী মা'র! সে ছবি দেখে আমি তাকে চিনলুম···সে ছবি লালিমার।

কর্পূরী কহিলেন,—মনে পড়ে···আমার বিয়ের ছ'মাস পরের কথা। অশোক জানে··?

—কি?

—যে তুমি তার মাকে জানো?

—না। তার মা'র কথা আমি কোনো দিন ভুলিনি।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। অয়স্কান্ত কহিলেন,—চারটে বাজলো। উঃ! আমার দাঁড়ানো চলে না। চললুম···

অয়স্কান্ত চলিয়া গেলেন। কর্পূরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর গান ধরিলেন,—

কোন্ ফুলের আজ মন ছুঁলে হায়,
দিল্ ভুলে যায় দুঃখ তার?
গন্ধ-ভাগল ফাগুন-পাগল মনের আগল ছিন্নাকার!···

খাশা গান! যেমন কণ্ঠ, তেমনি স্বর! গজলে মশ্‌গুল্ সকলে!...

গানের শেষে ধীরে ধীরে এক তরুণের প্রবেশ। দীর্ঘ কেশ উস্ক-খুস্ক—মলিন মুখ...জীর্ণ বেশ···উদাসীন মূর্ত্তি। মেলো-ড্রামার তরুণ তাপসের মত···আর একালের কবিতার-খাতা-হাতে সম্পাদকের দ্বারে-ঘোরা তরুণ কবির প্রতিচ্ছবি!

কর্পূরী তাকে দেখিয়া ছুটিয়া তার বক্ষে মাথা রাখিল, ডাকিল,—অশোক···প্রিয়তম···

বুঝা গেল এই সে অশোক, লালিমার পুত্র, হাবড়ার পুলে যাকে অয়স্কান্ত মোটরের তলা হইতে কুড়াইয়া ঘরে আনিয়াছেন!

অশোক দু'পা হঠিয়া গিয়া কহিলেন,—চুপ। এ কি বলচো···নারী?

কর্পূরী উন্মাদের মত অধীর কণ্ঠে কহিলেন,—নারী! নারী বলেই এ কথা বলতে পেরেচি। পুরুষ ভীরু কাপুরুষ, আর নারী সাহসিকা শক্তি, তাই বলতে পেরেচি! শোনো তরুণ অশোক, এই নারীর প্রণয়-পদাঘাতে তোমার হৃদয়-পুষ্প মুঞ্জরিত হবে! নারীর এ কণ্ঠ নীরবতা মানবে না···এই ফাগুন হাওয়ায় ঐ ফুলবনের পাপিয়ার মত সে গেয়ে উঠেচে—বিনা-আয়াসে তার বুকের সঞ্চিত বাণী···এ আর সহ্য হয় না, অশোক···জীবন অসহ্য হয়েছে···আমার! এই প্রাসাদ, এই উপবন, মোটর, দাসদাসী...বিলাস-ভূষণ···

কর্পূরী অশোকের হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে কৌচে বসাইল, এবং নিজে তার পায়ের কাছে বসিয়া কহিল—মনে পড়ে সেই হাবড়ার পুল···চারিদিকে ধূ-ধূ-প্রসারী আকাশ, নীচে কলনাদিনী গঙ্গা···গঙ্গার বুকে সেই অসীম আকুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস···আমার পানে বেপথু দৃষ্টিতে চাইলে! আমার প্রাণ-গঙ্গায় অমনি কি কলরব উঠলো···কি ঢেউ ছুটলো! সে ঢেউ বুকে বেঁধে আর থাকতে পারি না···তোমার ও-দৃষ্টিতে ভগীরথের আহ্বান বাজচে অহরহ... শিবের জটাজাল আমার এই বুক-গঙ্গাকে আর ধরে রাখতে পারচে না···

অশোক নির্ব্বাক। নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মত তার চোখের দৃষ্টি।

কর্পূরী কহিল,—চলো···চলে যাই আমরা লোকালয় ছেড়ে দূরে ··বহুদূরে। যেখানে পাখীর প্রেম-কাকলী—বন্য-জন্তুর অবাধ মিলনের স্বর বাজচে···যেখানে মানুষ কঠিন হাতে বড় আইন দিয়ে বিধি-নিষেধ তুলে প্রাচীর গড়তে পারেনি···চীন, জাপান, তিব্বত, ইরাণ, আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল···যেখানে বলবে···নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে···

অশোক বাতাহত গাছের পাতার মত কাঁপিতে লাগিল।

কর্পূরী উচ্ছ্বসিত আবেগে কহিল,—প্রথম সেই দু' চোখের দৃষ্টি যখন মিললো, আমার মনে হলো, জগতে যেন আজ প্রথম আমার দৃষ্টি উন্মীলিত হয়েচে!···দুনিয়া রঙে রঙীন দেখলুম।...

এই অবাধ বলিয়া কর্পূরী অশোকের বুকে মুখ ঢাকিল। অশোক তাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—যাবো, যাবো, তোমায় নিয়ে চলে যাবো·· যেখানে বলবে, কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমশৃঙ্গে···যেখানে আজ দ্যুলোকের সন্ধান চলেছে! ল্যাপল্যাণ্ড গ্রীণল্যাণ্ড—মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়, কবির মনোমন্দির · যেখানে বলবে প্রিয়তমে, যেখানে··· খুশী··

দুজনে মিলন-পাশে প্রেমস্বপ্নে বিভোর, এমন সময় মহা-বিরক্তি-ভরে সশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিলেন অয়স্কান্ত ···তিনি বলিতেছিলেন,—তাড়ার সময় সব ভুলি··· দরকারী কাগজগুলো···

অয়স্কান্ত টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজ টানিতে উদ্যত·· তাঁর দৃষ্টি পড়িল মিলন-পাশে আবদ্ধ স্বপ্নলোক-যাত্রী দুটির দিকে ··কর্পূরী তখন বলিতেছিল,—তাই যাবো, তাই যাবো. প্রিয়, তোমার সঙ্গে···নিষেধের বিশ্রী পাষাণ প্রাচীর ভেঙ্গে প্রেমের কাকলী-ভরা কাব্যে-রচা সেই অমর লোকে···

যথেষ্ট! অয়স্কান্ত বিস্মিত! তার দুই চোখের দৃষ্টি পলকহীন···

কিন্তু নাট্যকার এমন দরদে এ situationটুকু রক্ষা করিয়াছেন, দেখিয়া তাজ্জব বনিতে হয়! অয়স্কান্ত বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাদের ঘাড়ে পড়িলেন না, পিস্তল ছুড়িলেন না, একটা কাগজের বাণ্ডিল ভূমে নিক্ষেপ করিলেন,মনোযোগ-আকর্ষণের জন্য! এমন সুভদ্র স্বামীর ছবি বিশ্বের কোনো নাটকে দেখি নাই! দুজনে চমকিয়া অয়স্কান্তের পানে ফিরিয়া চাহিল। তিন জনের তিনজোড়া চোখের দৃষ্টি মিলিল—ভাবের একেবারে ত্রিবেণী-সঙ্গম!

এমনটি আর কোনো যুগের কোনো নাট্য-সাহিত্যে দেখি নাই !

বাহুর মালা সরাইয়া সরিয়া আসিয়া কর্পূরী কহিলেন, —তুমি !···ফিরে এলে · !

অশোক কহিল,—আপনি···। মিটিংয়ের দেরী হবে যে···!

অয়স্কান্ত কহিলেন,—হাঁ, আমি···কাগজগুলো ভুলে ফেলে গেছলুম।···কিন্তু কর্পূরী, তুমি···

উত্তেজিত স্বরে কর্পূরী কহিল—হ্যাঁ, আমি··· ভালোবাসি, ভালোবাসি অশোককে...আমার প্রাণের জন ···তুমি অনেক দিয়েচ, অনেক গহনা, কাপড়, ব্লাউশ... কিন্তু ভালোবাসা ? তা কখনো পাইনি···ভালোবাসার পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক ! শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে···

অয়স্কান্ত স্তব্ধ ! আর দর্শকমণ্ডলী ? চক্ষু তাঁদের ভাঁটার মত গোল ! বহু নাটকের অভিনয় তাঁরা দেখিয়াছেন, এমন ব্যাপারে তাঁরা পিস্তলের গুলিই চলিতে দেখিয়াছেন—বিশেষ সেই 'ভ্রমরের' জমাট শীন··· সেই গোবিন্দলালের হাতের পিস্তলের গুলিতে রোহিণী, ...তাঁরা তেমনি একটা কিছু কল্পনা করিতেছেন, তাঁরা তো জানেন না, বাংলার নাট্যগগনে নূতন ভাস্কর উদিত হইয়াছে,—বাংলার আর্ট-মঞ্চে প্রতিভাধর শিল্পীর লেখা নাটক দেখিতেছেন···

অতএব অয়স্কান্ত পিস্তলের সন্ধান করিল না। নাটকের এই সুরুতেই প্রথম দৃশ্যে পিস্তল চলিলে সে যে ডিটেকটিভ ড্রামা হইবে ! তা তো আর্টের অন্তর্গত নয় !···

কর্পূরী কহিল,—আমার তরুণ মনকে উপেক্ষায় ছেঁচে একেবারে বাটা বাটনা ক'রে দিয়েচো···নিয়ে যাও তোমার এই গয়নাগাঁটি···নিয়ে যাও তোমার শিল্কের শাড়ী, আলমারী-ভরা বেনারসী···

অয়স্কান্ত একটা সোফায় বসিয়া পড়িলেন, ডাকিলেন, —অশোক··

অশোক অপ্রতিভের মত একবার চাহিল, কহিল,— তরুণ মনের কেন্দ্রিত ক্ষুধা ··স্পন্দিত বাসনা—

কর্পূরী তাকে ধমক দিয়া কহিল,—খবরদার, কোনো কৈফিয়ৎ নয়! অবাধ মুক্ত মন—সে নিষেধের বাঁধন মানবে না ! সে যা চাইবে, তাই তাকে দিতে হবে। না হ'লে নব-নারীত্ব মূর্চ্ছিত মৃত হবে !

এক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—একখানা চিঠি ডাকঅলা দিয়ে গেল···

অয়স্কান্ত চিঠি পড়িলেন, বেশ চীৎকার স্বরে···

"সে মারা গেছে। আমার ছুটী ! মুক্তি মিলেছে বন্ধু··· আমি শীঘ্র ফিরছি তোমার দ্বারে। দেখা হলে সব কথা বলবো ··ইতি লালিমা।"

কর্পূরী কঠিন দৃষ্টিতে চাহিল অয়স্কান্তর পানে। অশোকের স্থির ভাব—আর অয়স্কান্ত চিঠি পড়িয়া অট্ট-হাসি-রবে নাট্যমঞ্চ মুখরিত করিয়া তুলিল।

এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ।···

এই একটি দৃশ্য দর্শকের চিত্তে এমন গভীর ভাবের তরঙ্গ তুলিল যে, তাঁরা ভুলিয়া গেলেন উঠিয়া বাহিরে গিয়া সিগারেট পান কেনার কথা, গল্প-গুজবের কথা··· সকলে একেবারে নিস্পন্দ, নির্জীব, নিস্তব্ধ নিথর !... দর্শকের মনে এ সমস্যা ভারী পাথরের মত বসিয়া গিয়াছে। পান-চুরুটওয়ালা তার নিত্যকার পালা গাহিতে সুরু করিয়াছিল, একজন দর্শক নিঃশব্দে তার পিঠে মোটা লাঠীর ঘা বসাইতে সে চট্ করিয়া বাহিরে পলাইল। উপরের মহিলা-আসনে ছোট শিশুটা অবধি স্তম্ভিত— ট্যাঁ ট্যাঁ চীৎকার তুলিতে আজ সে ভুলিয়া গিয়াছে। বাঙলা নাট্যমঞ্চে তারাও আজ জাতির প্রাণের সাড়া পাইয়া বিমুগ্ধ, বিমূঢ়।

তার পর আধ ঘণ্টা বাদে পট উঠিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হইল। "একটি কক্ষ।" বলিহারী নাট্যকার ! কার কক্ষ, কোথাকার গৃহের কক্ষ, প্রোগ্রামে তার একটুকু নির্দ্দেশ নাই ! এমনি রহস্যে আচ্ছন্ন করা··· এ কি কম শক্তিমানের কাজ !

সজ্জিত ঘর—আগাগোড়া প্রাচীন মোগল ষ্টাইলে সাজানো। যেন হারেমের কক্ষ। মনে হইল, ষ্টেজ-ম্যানেজার ভুল করিল না কি ? কোনো ঐতিহাসিক নাটকের শীন্‌খানা গোঁজামিল দিয়া·· কিন্তু পরক্ষণে বুঝিলাম, তা নয়, ঐ যে কক্ষের কোণে পিয়ানো, একটা গ্রামোফোনও···ধন্য মঞ্চশিল্পী ! একটু ইঙ্গিতে কি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছ, যার চোখ আছে, সেই বুঝিবে। যার নাই, সে খপরের কাগজে বাঙলার আর্নল্ডদের লেখা নাট্যসমালোচনা পড়িয়া বুঝুক।

একটা খানশামা আসিয়া বলিল—মোগলাই হোটেলের সব মোগলাই কাণ্ড!

তার পর প্রবেশ করিল এক দাসী—চন্দ্রশেখরের সেই কুলসমের মত পোসাক তার গায়···দাসী আসিয়া খানশামাকে ডাকিল—বকাউল্লা···

খানশামা কহিল—কি বলচিস্ জুলেখা ?

দাসীর নাম জুলেখা। জুলেখা কহিল—একখানা গান গা না ভাই বকাউল্লা···

বকাউল্লা কহিল—তুই গা···

জুলেখা গান ধরিল,—রবি বাবুর গান।···একটু বিস্মিত হইলাম। বিস্ময় ভাঙ্গিল গান থামিলে বকাউল্লার কথায়। বকাউল্লা কহিল—ঐ বাঙালী বহুজীব কাছে তুই এ গান শিখেচিস · না ?

জুলেখা কহিল—হাঁ।

এ ইঙ্গিতে বুঝা যায়, নাটকের দাস-দাসী কুলী-পাচক অবধি কাল্‌চারের স্পর্শ পাইয়াছে···তার পর কক্ষে প্রবেশ করিল কর্পূরা···তার পিছনে অশোক। দাস-দাসী বিদায় লইল। এখানে নাট্যকার অনায়াসে আবু হোসেনের দাই-মশুর বা আলিবাবার আবদালা-মর্জ্জিনার মত ঐ দাস-দাসীর দ্বারা ডুয়েট গান গাওয়াইতে পারিতেন—তা গাওয়ান নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁর প্রতিভা গ্যালারির দাস্য জানে না···তাঁর মৌলিকতা অসাধারণ!

অশোক হাঁকিল—চা···বান্দা···

কর্পূরা হাঁকিল—আইস-ক্রীম—বাঁদী··

তার পর কথাবার্ত্তা··কোন্ চাঁদিনী যামিনীতে কাবেরীর তীরে পাখীর গান ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কাশ্মীরে ঝাউয়ের বনে কবে কোন্ অপরাহ্নে বাতাসে মর্ম্মরধ্বনি জাগিয়াছিল, মনে আছে? দু'জনেই বলিল, মনে আছে। তার পর নর-নারীর মনের বহু সমস্যার কথা,···তার আলোচনা; সেই সঙ্গে সে আলোচনায় স্ত্রীণ্ডবার্গ, বার্গশঁ, ফ্রয়েড, দরিদ্র-নারায়ণ, যৌন-সমস্যা, আর সদ্যপ্রকাশিত আঁতুড়ে-গন্ধ-গায় ক'খানা মাসিকের নাম অবধি—পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা একেবারে! মাসিক-পত্রের প্রবন্ধেও এমন গবেষণা দেখা যায় না!

তার পর অশোক কহিল—একখানা গান গাও কর্পূর···

কর্পূরা কহিল—শোনো, গানের সুরে বাঙলার নারীর মর্ম্ম-বেদনার করুণ কাহিনী···

কর্পূরা গান ধরিল—

ছিল এক নারী, ওগো, তরুণ নারী।
আহা সে দুঃখিনী গো, খুব ব্যাচারী।
স্বামী তার ব্যাদ্‌ড়া বড়, আপিস যেতো;
ফিরে ফের সন্ধ্যাবেলায় তামুক খেতো।
দুপুরে বাতায়নে, নারীর হায় দু'নয়নে ঝরতো বারি॥
গলির ঐ ওপাশে এক মেসের বাসে তরুণ কবি—
কলেজে পড়ে বি-এ, নয়ন দিয়ে দেখতো সে এ করুণ ছবি!
কবে হায় চোখ-ইসারায় বেদনে বুকে তুললো তারি।
পরে এক ঝড়ের দিনে বিকেল বেলা
এলো এক ট্যাক্সি—যেন স্বপন-ভেলা!
দুজনে চ'ড়ে তাতে চল্‌লো দূরে সুরের পুরে—
অতীতের প্রণয়-ডোরে হিয়া বাঁধা, শুক ও সারী!
কূলহারা আজ কূল পেলো! জয় গাও হে তারি॥

অশোক কহিল—খাশা গান···বাঃ! এ গান পথে সুরের তাঞ্জাম চড়ে ঘুরে বেড়াবে···বাঙলার মূক মৌন নারীত্ব এ সুরের সাড়ায় ভাষা পেয়ে ভেসে উঠুক···

সহসা সেই বকাউল্লা খানশামা এক চিঠি আনিয়া অশোকের হাতে দিল। অশোক খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িল, পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—এ কি!

কর্পূরা কহিল—কার চিঠি?

অশোক কহিল,—মা'র··

কর্পূরা কহিল—তোমার মা? আমাদের কথা তিনি জানেন?

অশোক কহিল,—না।

কর্পূরা কহিল—তবে আমাদের ঠিকানা পেলেন কি করে?

অশোক। জানি না! তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি। আমাদের এ অজ্ঞাত-বাস···ঠিকানা কাকেও বলিনি, পাছে কোনো বিপদ ঘটে···

এই অবধি বলিয়া অশোক পায়চারি করিতে লাগিল, তার মুখে স্বগত উক্তি,—এখন কি করা যায়? কি করি আমি?

এই জায়গায় এই দুটি মাত্র প্রশ্ন···মনের মধ্যে এই যে আকুল চিন্তা—এ প্রশ্নে মনে পড়ে হ্যামলেটের সেই ছত্র To be or not to be···বাঙলা নাটকে এই প্রথম হ্যামলেটের ঐ ছত্রের সঙ্গে পাল্লা দিবার মত অমর ছত্রের দেখা পাইলাম। ধন্য নাট্যকার!

কর্পূরার চোখে-মুখে দ্বিধা-সংশয়-ভয় প্রভৃতি নানা বৃত্তির ছায়াপাত ঘটিতে লাগিল···কর্পূরা ডাকিল,—প্রিয়তম···

অশোক। ডাকচো?

কর্পূরা। হ্যাঁ···একটি মাত্র উপায় শুধু আছে!

অশোক। মা'র কাছে অকপটে সব কথা প্রকাশ করে বলবো··কি গভীর আমাদের ভালোবাসা··কি অসীম অগাধ আমাদের প্রেম?···

কর্পূরা। বলো, সব কথা তাঁকে খুলে বলো। কোন লজ্জা নাই এতে। ভালোবাসায় লজ্জা কি, বন্ধু? আমার হৃদয়-পাত্র তাঁর সামনে উন্মুক্ত করে দেখাবো, আমি কত ভালোবাসতে জানি। তিনি বিচার করবেন···

অশোক একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, শিহরিয়া জবাব দিল—না, না। আমি পারবো না, পারবো না, সখী। মা বুঝবে না··· মাগুলো চিরদিন ভীরু, বুঝলে। শুনবে এ চিঠি?

কর্পূরা। পড়ো···

অশোক। শোনো···(পত্র-পাঠ)

"অশোক, আজ আমার ছুটি মিলেচে। আমার পায়ের শৃঙ্খল টুটেছে! আমার কাছ থেকে দূরে দূরে আর তোমায় থাকতে হবে না। যাকে তুমি তোমার পিতা বলে ডাকতে, আমাদের সে মহাশত্রু আজ ইহ-জগতে নাই। আশা করি, তোমার মনটি তেমনি

অমলিন আছে! শীঘ্র দেখা হবে। অনেক খবর নিয়ে আমি যাচ্ছি···বসন্তের পুলক-ভরা খবর। ইতি তোমার মা।"

কর্পূরা। এ চিঠির মানে কি অশোক?·· ঐ কথা··· যাকে তুমি ·· ?

অশোক। চুপ, চুপ, চুপ করো নারী···

অশোক একেবারে লাফাইয়া উঠিল। তার পর তিন হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া গিয়া কহিল,—জানি না, আমি কিছু জানি না। কিছু জানতে চাই না। সে গেছে · এটুকুই যথেষ্ট। তার বেশী আর কিছু জানতে চাই না ·· কিন্তু···মা যে এখনি এসে পড়বে! আমি, আমি···

কর্পূরা। আমার স্বামী তোমার মাকে জানতেন।

অশোক। জানি না, দুনিয়ার কোনো খবরে আমার লোভ ছিল না···

কর্পূরা। তুমি আমাদের কথা তোমার মাকে বলবে না?

অশোক। না, না পারবো না। আমায় কোথায় যেন বাধচে, কর্পূরা···আমায় একটু ভাববার সময় দাও···

কর্পূরা। তা হলে আর কোথাও যাও। এখানে ভাববার অবসর মিলবে না···এর মধ্যে তিনি যদি এসে পড়েন?

অশোক। কি করবো? কি করবো? কোথায় যাবো তবে?

কর্পূরা। সহরের দক্ষিণে মস্ত মাঠ আছে···মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়ে দিয়ো তোমার মন ···তার পর···

অশোক। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেচো। আমি আর দেরী করবো না···

কর্পূরা। দাঁড়াও। বেয়ারা, একঠো ট্যাক্সি জলদি বোলাও···

তাড়াতাড়ি কর্পূরা একটা থার্মোফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়ার আনিয়া দিল, কহিল—এতে চা, আর এর মধ্যে কিছু রুটী টোষ্ট, আলু সেদ্ধ, আর কাটলেট আছে···

অশোক। প্রিয়তমে, এই ক্ষিপ্র গুণেই আমায় কিনে রেখেচো তুমি···

অশোক চট্‌ করিয়া টিফিন-ক্যারিয়ার ও ফ্লাস্ক লইয়া বিদায় হইল···

কর্পূরা ডাকিল—বাঁদী···

সেই বাঁদীর প্রবেশ। জুলেখা। কর্পূরা কহিল— শীগ্‌গির আমার ছোট বেতের ব্যাগটা এনে দে···

বাঁদী। বহু-বিবি চলে যাচ্ছেন?

কর্পূরা। হাঁ, হাঁ, এখনি—এই দণ্ডে। না হলে আমার যাবার পথ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে···

বাঁদী। খানা?

কর্পূরা। না না···

বাঁদী। চা···?

কর্পূরা। না, না,—কিছু না। জলদি একটা এক্কা ···ঐ যায় খালি এক্কা। ডাক্···এখনি যাবো। আমার বেতের ব্যাগ···? এই যে।

ঝড়ের বেগে কর্পূরাও প্রস্থান করিল।

এইখানে কি গতির বেগ। নাটকের action চলিয়াছে যেন ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে···একেই বলে নাটকের গতি!

কর্পূরা প্রস্থান করিবামাত্র ভিন্ন দ্বার পথে আসিয়া দেখা দিল, লালিমা—অশোকের মা।

সরু পাড় ধুতি পরা···মুখে বিষাদের ভাব। কুঞ্চিত কেশে ছোট ছোট ঢেউ···সুন্দর শ্রী।···

লালিমা আসিয়া শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিল, তার পর চারিদিকে চাহিল, মৃদু-স্বরে ডাকিল—অশোক···

বাঁদী জুলেখার পুনঃ-প্রবেশ। লালিমা কহিল— আশোকের ঘর এ?···আমার ছেলে অশোক? স্নেহহারা নীড়হারা অশোক?

বাঁদী কহিল—জী।

লালিমা। অশোক কোথায়?

বাঁদী। চলে গেছেন একটু আগে ট্যাক্সিতে···

লালিমা চারিদিকে আবার চাহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিল, পরে সহসা তার নজর পড়ল একটা চেয়ারে পরিত্যক্ত একখানা শাড়ীর পানে·· উঠিয়া সেটা হাতে লইয়া বাঁদীর পানে চাহিল, লালিমা কহিল—এ শাড়ী কার?

এই ছোট ব্যাপারে নাট্যকার কি কৌশল আর শক্তি যে প্রকাশ করিয়াছেন!···

বাঁদী কহিল—এ শাড়ী বহু-বিবির···

লালিমা কহিল—বহু-বিবি?

বাঁদী কহিল—হাঁ, তিনিও এই মাত্র এক্কায় চড়ে চলে গেছেন···

লালিমা কহিল—চলে গেছে···? একটু বিলম্ব সইলো না?···ওঃ! (একটি দীর্ঘ নিশ্বাস)

দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া তদ্দণ্ডে ঘরে ঢুকিলেন অয়স্কান্ত। তাঁহার হাতে একটা বড় হাত-ব্যাগ···চাহনি উদাস··· [এই দৃশ্যে ভুম্ করিয়া সকলকে জড়ো করায় কি unity of action ফুটিয়াছে। এইটিই তো নাটকের আর্ট!]

লালিমা যেন সাপ দেখিয়াছে এমনি ভাবে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—তু-তু-তুমি—কোন্ স্মৃতির অতল কূপ থেকে উঠে এলে সহসা···আমার অতীতের শত-স্বপন-জড়িত সুখের ছবি গো!

—একটু দেরী হয়ে গেছে। বলিয়া অয়স্কান্ত হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

লালিমা অয়স্কান্তর কাছে আসিয়া তার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল। কহিল,—দেরী হয়ে গেছে —সত্যই দেরী বন্ধু ?···

অয়স্কান্ত হাসিয়া কহিল,—তা নয়, তা নয়, তবে তোমার কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি তো···হাতের স্পর্শে সেই উত্তাপ···আজো আমার শিরায়-শিরায় সেই কোকিলের কূজন ছুটিয়ে দিয়ে গেল। লালিমা···

লালিমা কহিল,—অয়স···

অয়স্কান্ত। এ দীর্ঘকাল তোমারি মুখ ধ্যান করেচি।

লালিমা। আর আমি ? আগুনে পলে পলে দগ্ধ হয়েচি···দুর্ব্বৃত্ত স্বামী, জানোয়ার, এ দেহ তার গ্রাসে তুলে দিলেও মন···এ মন, ওগো বন্ধু, তোমারি পরশ-কল্পনায় বিভোর ছিল, তন্ময় ছিল···

লালিমা ও অয়স্কান্ত দুজনে চক্ষু মুদিল।···কি সুগভীর আবেশ !

তার পর লালিমা ডাকিল—অয়স, কালো মেঘ কেটে গেছে—আলো ফুটেচে। সে আলো বুকে ধরে তোমার কাছে এসেচি। আজ আমার পাশে দাঁড়াও—হে আমার এক, হে আমার ধ্রুব···

অয়স্কান্ত কহিল—হুঁ···

লালিমা কহিল—অশোক ? তোমার অশোক ? বেচারা, অসহায়, একা···

অয়স্কান্ত কহিল—না, না, সে আজ একা নয়, একা নয়···

লালিমা কহিল—জানি। কিন্তু তুমি তাকে রক্ষা করো। তার হৃদয়ে উদয় হয়েচে এক নারী—ঐ তার শাড়ী···অশোককে রক্ষা করো সে-নারীর গ্রাস থেকে। সে আমার ছেলে, কোনো দিন ছেলে বলে তার স্পর্শ বুকে অনুভব করতে পাই নি। এই নারীকে দূর করে দাও। ছেলেকে একবার পেতে দাও। ছেলে সব ছেড়ে আমায় পাক আজ—

এ কথায় মাতৃত্বের বিকাশ চমৎকার !

হঠাৎ কর্পূরা আসিল, আসিয়া অয়স্কান্তর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—ঠিক, ঠিক, ঠিক! তাই হবে। মস্ত পাপ করেচি আমি। প্রকাণ্ড অন্যায় ! তার প্রতিকার করতে চাই। যত বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত হোক, তবু তা করবো। তোমার প্রতি অন্যায়, এই নারীর প্রতি অন্যায়, দুনিয়ার প্রতি অন্যায়—আমি অবিশ্বাসী, আমি প্রলয়ঙ্করী, আমি···কর্পূরা পাগলের মত অট্টহাসি তুলিল। তার পর কহিল—এইটুকু তার হাতে দিয়ো, এই চিঠিটুকু··· আমি চলে গেলে···আমার সামনে দিয়ো না। শুধু এ-টুকু···এ আমার শেষ অনুরোধ। একদিন এ বাহু যদি পুষ্পমাল্যের পরশ দিয়ে তোমার অন্তর অমৃত-সিক্ত করে থাকে, সেই অমৃত-স্মৃতির অনুরোধে···

চিঠিখানা অয়স্কান্তর হাতে দিয়া চোখে আঁচল চাপিয়া কর্পূরা চলিয়া গেল।

লালিমা কহিল,—কে এ নারী। কি ও বলে গেল ? বলো, বলো, আমার বুক কাঁপচে···অসহ্য যাতনা··· বন্ধু···

অয়স্কান্ত কহিল,—হাঁ বলবো, বলবো, তোমায় বলবো সখী। এ নিয়তি। কে তাকে রোধ করবে ? দুবছর পূর্ব্বে আমি বিবাহ করেছিলুম।

লালিমা। এই নারী···

অয়স্কান্ত। আমার স্ত্রী ছিল। আজ নেই। আজ তুমি আবার ফিরে এসেচো ! এক গেল, আর এক এলো —ওঃ, ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি আছো ! আমি তোমায় মানি, আজ মানি।

লালিমার অবসন্ন দেহ সোফায় ঢ়লিয়া পড়িল। অয়স্কান্ত যেন কাঠের পুতুল···নিষ্কম্প, স্থির, অবিচল !

এমন সময় অশোকের প্রবেশ।

অশোক কহিল—কর্পূরা, প্রিয়তমে···তার পর চাহিয়া দেখে, সামনে অয়স্কান্ত, আর ঐ লালিমা, তার মা ···!

অশোক চমকিয়া উঠিল,—ডাকিল—তুমি মা···মা··· আর তুমি প্রতাপশালী জমীদার অয়স্কান্ত। কিন্তু সে কোথায় বেচারী অভাগিনী প্রেম-পিয়াসিনী ?···বলো, বলো···

অয়স্কান্ত কহিল,—এই চিঠি সে দিয়ে গেছে···

ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিখানা কাড়িয়া অশোক পড়িল। উচ্চ রবেই পড়িল (নহিলে অপরে জানিবে কি করিয়া ?)

অশোক কহিল—শোনো, তোমরাও শোনো, সে কি লিখেচে···(পত্র পাঠ)

"অশোক প্রিয়তম—আমায় বিদায় দাও। আমি মরিতে চলিলাম। এ পৃথিবী বড় অকরুণ, প্রেমে এখানে অনলের দাহ, সুখ এখানে মরীচিকা ! আমার সেই কাশি ···ডাক্তার বলিয়াছে···যক্ষ্মা। মাঝে মাঝে মনে করিয়া চোখের জল ফেলিয়ো, একান্তে, নীরবে। আমার পাখী-টাকে উড়াইয়া দিয়ো·· বেচারী খাঁচার পাখী ! মুক্তির আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করো না ! বিদায় প্রিয়তম— তোমার দুঃখিনী কর্পূরা ··"

অশোক। শুনলে ! শুনলে এ চিঠি ! বাজও এমন নির্দ্দয় রোলে বাজে না। বুঝেচি, এ চক্রান্ত ! হায়, হায়, হায়, হায় ! শয়তানী, এ তোর কাজ ! কেন তাকে মরণের পথে তাড়িয়ে দিয়েছিস ? কেন এ তরুণ বয়সে তাকে মরণ-পথের যাত্রী করলি, শয়তান ? সে আমার। তুই বিয়ে করেছিলি তাকে...তাতে বয়ে গেছে। তোর মত শুকো-কাঠ মড়ার জন্য সে মঞ্জু-লতার সৃষ্টি হয় নি। তুই তাকে বিয়ে করে হত্যা করেচিস···শয়তান·

আমি তাকে ভালোবেসে প্রাণ দিতে চেয়েছিলুম! শয়তান…

ফশ্ করিয়া একখানা ছোরা বাহির করিয়া অশোক হাসিয়া উঠিল। ভয়ে অয়স্কান্তর মুখ এতটুকু। লালিমা ছুটিয়া আসিয়া অশোকের হাত চাপিয়া ধরিল…কহিল—অশোক, কি করতে চাও তুমি?

অশোক। খুন! ঐ বৃদ্ধ পশুকে। ঐ শয়তানকে…

লালিমা। চুপ, চুপ, অমন কথা বলিস নে। আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—দুনিয়া ধ্বসে পাতালে সেঁধুবে! আমার কথা শোন্…

অশোক। শুনবো না। কে তুমি?

লালিমা। আমি তোর মা…

অশোক। কিসের মা!…এ প্রেম। হৃদয়ের অবাধ মুক্ত প্রেম…প্রেমের এ গঙ্গা—মা-ঐরাবত হলেও এর তোড়ে ভেসে যায়। সরো তুমি। আমার হৃদয়াগ্নির জ্বালা নিবোতে দাও নারী। ওই শয়তানের রক্ত-ধারায়…

লালিমা। না, না। তা হবে না। হতে দেবো না আমি…

আশোক। কেন হবে না? কেন দেবে না?

লালিমা। তবে শোন্…যে কথা চিরদিন গোপনে হৃদয়-তলে চাপা থাকবে ভেবেছিলুম, সে কথা তবে প্রকাশ করি…এই প্রকাশ্য জন-সভায়…কাল দৈনিকে-সাপ্তাহিকে সে কথা ছাপা হয়ে যাক্…

অশোক। কি কথা?

লালিমা। ইনি তোর জন্মদাতা পিতা…কৈশোরে এঁরই প্রেমের সাধনায় এঁকে পরিচর্য্যা করে তোকে পেয়েচি আমি…ওঃ…

লালিমা দুম্ করিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল। অয়স্কান্ত যেন দাঁড়-করানো কাঠ! আর অশোক হাতের ছোরা ফেলিয়া লালিমার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া মা, মা, মা, মা, মা বলিয়া আর্ত্ত রবে কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক এইখানে শেষ। তার পর তৃতীয় অঙ্ক।

অয়স্কান্তর সেই ঘর। অয়স্কান্ত মোটা খাতা লইয়া কি সব হিসাব দেখিতেছে। লালিমা ব্রহ্মচারিণী বেশে আসিয়া প্রবেশ করিল। লালিমা কহিল—কি করচো?

অয়স্কান্ত কহিল—তরুণ সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখচি। বার্ষিক অধিবেশন সামনে। তাই…

লালিমা। এত খাটলে মারা যাবে যে। নাইতে খেতে হবে তো…

অয়স্কান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আর তুমি? তোমার নিজের পানে চেয়ে দেখেচো?

লালিমা। আমি যে নারী…

অয়স্কান্ত। এখনও অভিমান!…লালি…

লালিমা। আর অমন করে ডেকো না…আমার সব এখন কালি হয়ে গেছে…লালিমা মরেচে। যাকে দেখচো, সে কালিমা! এখন ওঠো, নাইবে, খাবে চলো।

অয়স্কান্ত। নাইবো খাবো—যদি একটা কথা রাখো।

লালিমা। কি কথা?

অয়স্কান্ত। আমার পাশে পাশে থাকবে চিরদিন? আর ছেড়ে যাবে না?

লালিমা। এখনো এ আশা?

অয়স্কান্ত। ছাড়তে পারি না! বিয়ে করেছিলুম—তাকে রাখতে পারিনি…বিয়ে না ক'রে যাকে পেয়েছিলুম, তাকেও ছাড়বো? তবে এ দুনিয়ায় বাঁচা কিসের জন্য লালিমা? প্রাণের যা সাধ…

লালিমা। ছেড়ে দাও ও-কথা। এদের কোনো খপর পেলে?

অয়স্কান্ত। অশোক ঢাকায় আছে। সেখান থেকে মাসিক পত্র বার করচে। আমি এক হাজার গ্রাহক করে দিয়েচি, বার্ষিক মূল্য গাঁট থেকে দিয়ে।

লালিমা। আর কর্পূরা?

অয়স্কান্ত। সন্ধান পেয়েচি, বোম্বায়ে এক ফিল্ম্ কোম্পানীতে ঢুকেচে। তাদের কোম্পানীতে আমি বিশ হাজার টাকার শেয়ার কিনেচি। সে তা জানে না। এতেও প্রায়শ্চিত্ত হবে না?

লালিমা। হুঁ…তবু সেই দীর্ঘশ্বাসের সাগর তাদের মধ্যে…

অয়স্কান্ত। উপায় নেই। বেচারা অশোক তার খপর পায় নি। তা ছাড়া…

লালিমা। তা ছাড়া কি?

অয়স্কান্ত। ঢাকায় সে প্রেম-চর্চ্চার সুযোগ পেয়েচে।

লালিমা। কর্পূরা?

অয়স্কান্ত। এক ভাটিয়া তার সহায়…

লালিমা। আমার কাজ তবে শেষ। আমায় এবার বিদায় দাও, বন্ধু।

অয়স্কান্ত। কোথায় যাবে?

লালিমা। জাপান।

অয়স্কান্ত। জাপান?

লালিমা। হৃদয়ে যে আগ্নেয়গিরির আগুন—এত আগ্নেয়গিরি জাপান ছাড়া আর কোথাও নেই! এই আগুনে আগুন লাগাবো আমি।

অয়স্কান্ত। আর আমি?…

লালিমা। আমায় আবার সেই বিয়ের-আগেকার সেই লালিমা ভাবতে পারো? দেহের কথা ভুলে যেয়ো…চোখ বুজে ভেবো, আমি! সেই মন, শুধু মন…

অয়স্কান্ত। আমায় যদি তুমি তেমনি দেখতে পারো…

লালিমা। জীবনটা কিছুই দেখা হলো না। আর একবার দেখবো তবে ?…কিন্তু না, আমায় যেতেই হবে। এমন একটা কিছু করবো, যাতে…থাক সে কথা —বন্ধু…

অয়স্কান্ত। লালিমা…

লালিমা। বিদায় দাও—এক-একবার শুধু মনে করো আমায়…এক দুর্ভাগিনী নারী…কি যাতনা সয়ে ছিল—দেহ একজনকে দিয়ে, মন আর-একজনের কাছে বন্ধক রেখে…

অয়স্কান্ত। কিন্তু আমি তোমায় যেতে দেবো না। নারীর কাজ সেবা। আমি একা, আমায় দেখবার মত নারীর মহত্তর ব্রত আর কি আছে এ দুনিয়ায়, লালিমা…?

অয়স্কান্ত লালিমার হাত ধরিল; লালিমা অয়স্কান্তর বুকে মুখ রাখিল। তার পর কহিল—নারী চিরদিন দুর্ব্বল…

অয়স্কান্ত ডাকিল—লালিমা…

এমন সময় দ্রুত প্রবেশ কর্পূরার। কর্পূরা কহিল—আমি এসেচি…

অয়স্কান্ত। কর্পূরা…

কর্পূরা। হাঁা, আমি ফিল্‌ম্ তোলার পর ছুটী পেয়েচি।

লালিমা। তোমার যক্ষ্মা ?

কর্পূরা। সেরে গেছে। বলো, বলো! কোথায় আছে অশোক ? বলো…

অয়স্কান্ত। ঢাকায়।

কর্পূরা। ত' হলে আসি (টাইম-টেবল দেখিল)। ইস্, আর পনেরো মিনিট পরে ঢাকা মেল ছাড়বে…

অয়স্কান্ত। এই নাও টাকা…ট্রেণের ভাড়া…

কর্পূরা বেগে প্রস্থান করিল। তখন অয়স্কান্ত ডাকিল, —লালিমা…

লালিমা। অয়স…লালিমার চোখে জল।

অয়স্কান্ত। প্রেম অমর—প্রেমে দুনিয়া ভ'রে উঠুক! এমনি মুক্ত, অবাধ প্রেম! বাঙালীর প্রাণ খদ্দরে নয়, ভদ্দরে নয়,…বাঙ্গালীর প্রাণ প্রেমে!

দুজনে দুজনের হাত চাপিয়া ধরিল গভীর আবেগে! এবং এই খানে নাটকের যবনিকা-পাত।

অভিনয় শেষ হইলে বাসে আসিয়া চড়িলাম। বাসে থিয়েটার-ফেরতের দল প্লটটুকু লইয়া বেশ বাদানুবাদ জুড়িয়া দিয়াছে। এক দল বলিল,—স্রেফ ঠকিয়েছে। হ্যাণ্ডবিলে লিখেচে, বাঙালীর জাতীয় নাটক! এই কি বাঙালীর ঘরের ঘটনা? কোনো থার্ড-ক্লাশ বিদেশী নাটক ছাঁকা বাঙলা হরফে তর্জ্জমা করে ষ্টেজে চড়িয়েচে। বিদেশী কেউ এসে যদি এ নাটক দেখে বলে, এই কি বাঙালীর পরিচয়? যেমন abnormal creatures, তেমনি abnormal ঘটনা! ছি!

রাগে আমার রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিল, কহিলাম, —মূর্খতার চরম। বাঙালীর ঘরের ঘটনা চাই নাটকে? বটে! বাঙালীর ঘরের ঘটনা কি আছে? সকালে নাওয়া-খাওয়া, আপিস যাওয়া, ছেলে-ঠ্যাঙানি, স্ত্রীকে গালি ও প্রহার, নয় স্ত্রীর মুখের ভর্ৎসনা-ভোগ! যেমন শাক-পাতা খায় বাঙালী—বৈচিত্র্যহীন ভোজ, তেমনি তার জীবনও বৈচিত্র্যহীন! তাতে নাটক লেখা চলে না! সমস্যা—জানেন মশায়, সমস্যা চাই! সমস্যা না হ'লে নাটক হয় না।

সে লোকটি বেশ ঝাঁজালো স্বরে কহিল,—এ সমস্যার স্বপ্নও বাঙালী দেখে না! যে সমস্যা নেই…

তার মুখের কথা লুফিয়া আমি কহিলাম—সে সমস্যা গ'ড়ে নিতে হবে। প্রতিভা তবে কি!…আপনাদের জন্যই বাঙলায় নাটক গড়ে উঠচে না! বোঝেন না, নাটকের নাটকত্ব কি চীজ্?…

দু-চারিজন লোক সমস্বরে বলিল—আজ্ঞে, কি করে বুঝবো বলুন! পয়সা খরচ করে থিয়েটার দেখতে আসি। আপনার মত ফ্রী-পাশের কারবার নয় তো! ফ্রী-পাশ পেলে নাটক বোঝবার সামর্থ্য ঘট্‌তো!

এ কথার পর কথা কহিতে গেলে ফল সাংঘাতিক হইতে পারে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। মন কিন্তু বিদ্রোহে তাতিয়া রহিল…

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

ভ্রমণ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

রাওয়ালপিণ্ডি পৌছে আমাদের আগের কাজ হলো, গাড়ী দুখানি এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির ওয়ার্কশপে দেওয়া! কোথাও কোনো স্ক্রু আল্‌গা, বা কলকব্জা কোথাও ঢিলা হলো কি না, দেখে ঠিকঠাক করা আর ব্রেকে কোনো খুঁৎ না থাকে—এই সব পরখ করানো। কারণ, এবার সুদীর্ঘ পাহাড়-পথে পাড়ি! পাহাড়ের বাঁক, গোড়েন পথ,—ব্রেক যদি একটু বিগড়োয়, তাহলে গাড়ীশুদ্ধ সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘট্‌তে পারে। কাজেই এখান থেকে শ্রীনগর-যাত্রী সকলের গাড়ীর অঙ্গরাগ-পর্য্যবেক্ষণ একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সদ্য কাচিয়ে নেবার জন্য রজক ডাকিয়ে তার কাছে সব কাপড়-চোপড় পাঠানো হলো। এখান থেকে ছেলেরা আমাদের সহযাত্রী হবে—তাদের সঙ্গে মোট-ঘাট আছে বিস্তর। বড় ট্রাঙ্ক প্রভৃতি অনেক জম্‌লো। অথচ গাড়ী যথাসম্ভব হাল্‌কা রাখা সঙ্গত আর নিরাপদ! কাজেই একখানি পৃথক গাড়ী ভাড়া করা হলো এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির কাছে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর অবধি সে গাড়ীর ভাড়া পড়লো ৯০ নব্বই টাকা। স্থির হলো, নেহাৎ প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া, বিছানা-পত্র বাসন-কোসন প্রভৃতির মোট সেই ভাড়া-গাড়ীতে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে একটি পাচক ব্রাহ্মণও ট্রেনে এসেছিল—সে আর আমাদের সাথী নেপালী বয়,—এরা দুজনে এই মোটঘাটের সঙ্গে সেই গাড়ীতে যাবে। গোটা-চারেক ভারী ট্রাঙ্ক নিয়ে শেষে সমস্যা বাধলো! রাধাকিষণ কোম্পানির ভারবাহী প্রকাণ্ড লরি ভোরে শ্রীনগর যাত্রা করছিল—ভারী ট্রাঙ্ক ক'টা সেই লরিতে চাপানো হবে, স্থির হলো। এ-সবের মীমাংসা সেরে সারাদিনটা গোছগাছ কর্‌তে কেটে গেল। রাধাকিষণ কোম্পানির অংশীদার এম্, কে, শেঠী মহাশয় আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এমন মনোযোগী হলেন যে তাঁর খাতিরের ঘটায় আমরা অপ্রতিভ হয়ে পড়ছিলুম! কিন্তু তিনি নাছোড়বন্দা…আমাদের কোনো প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। শেঠী-সাহেব পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এম, এ—তাঁর ভদ্রতা, তাঁর আতিথেয়তা অপূর্ব্ব!

বৈকালে তিনি বললেন,—চলুন রাত্রে কিং-কার্ণিভালে। আমরা বললুম, এই দীর্ঘ পাড়ির পর রাত্রি জাগা ঠিক হবে না। আবার সামনে এই দীর্ঘ পাড়ি পড়ে আছে। তখন তিনি ছাড়ান্ দেন!

তাঁর কাছে শুনলুম, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অর্থাৎ মোটরে তিন-চার ঘণ্টার পথে তক্ষশিলা… দেখবো না? এই তক্ষশিলা ছিল সূর্য্যবংশীয় ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী। জন্মেজয় রাজার সর্পযজ্ঞও এইখানে হয়েছিল। তাছাড়া ঐতিহাসিক যুগের বহু প্রাচীন শিলালিপি, ইমারতের ধ্বংস-স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে! দেখার লোভ প্রবল হলেও আমরা বললুম, আমাদের লক্ষ্য এখন শ্রীনগর, সেখানে যেতে পথের উপর যা-কিছু দেখবার থাকবে, দেখে যাবো। আপাততঃ অচল পথে কোনো কিছু দেখবার থাকলেও দায়ে পড়ে সে লোভ সম্বরণ করতে হবে। ফেরবার মুখে তক্ষশিলা, পেশোয়ার প্রভৃতি দেখে যাবার বাসনা আছে।

পেশোয়ার হিন্দু আমলের পুরুষপুর। সবক্তাগিন রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন এইখানে। তার কিছু

দূরে সিন্ধুনদের ওপারে শুনলুম, প্রাচীন গান্ধার রাজ্য। মনটা চন্‌মন্ করে উঠলো! ভারতের একেবারে সীমান্তে এসে পড়েছি! প্রাচীন গৌরবের লীলাভূমিগুলি এত কাছে, হাতের নাগালে বললেই চলে! এই পঞ্জাব হলো মহাভারতের লীলাক্ষেত্র! মহাভারতের মদ্র, শিবিরাজ্য, রামায়ণের কেকয়—সব এই পঞ্জাবে। শতদ্রু আর বিপাশা (বিয়াস্) নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূখণ্ড ছিল কেকয় রাজ্য। রাজগির কেকয় রাজ্যের রাজধানী। রাজগির এখনো বর্ত্তমান আছে;—প্রাচীন সমৃদ্ধির কঙ্কালের মত। চন্দ্রভাগা (চেনাব) আর ইরাবতীর (রাভী) মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ছিল সেকালের মদ্র দেশ; আর বিতস্তার (ঝিলাম্) তীরবর্ত্তী প্রদেশ ছিল শিবিরাজ্য।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে মোটরে চড়ে রাওয়ালপিণ্ডি দর্শনে বেরিয়ে পড়া গেল। শেঠী মহাশয় পথের সাথী হলেন; ওখানকার নানা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রঘুনাথজীর মন্দির; বিখ্যাত টোপি পার্ক···মানুষের হাতে গড়া নয়—প্রকৃতির বুকে আপনি জেগে উঠেছে তার অপূর্ব্ব শোভা আর ঐশ্বর্য্য নিয়ে! 'টোপি' কথাটি কোথা থেকে এলো? কেউ কেউ বলেন, 'টোপি' স্তুপের অপভ্রংশ। হতে পারে, কারণ, পার্কটি বেশ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত।

রাওয়ালপিণ্ডি খুব প্রাচীন সহর নয়; তবে মস্ত ক্যান্টনমেণ্ট। সিটি আর ক্যান্টনমেণ্টের মাঝে ছোট একটি নদীর ব্যবধান—নদীটির নাম লেহ। প্রাচীন হিন্দু নগর গজীপুর বা গাজনীপুরের উপর এই ক্যান্টন্‌মেণ্টের সৃষ্টি। গজীপুর ছিল ভট্টি-রাজাদের রাজধানী। মোগল-আমলে রাওয়ালপিণ্ডির নাম ছিল ফতেপুর বাওরী। পরে ঘক্কর-সর্দ্দার ঝাণ্ডা খাঁ রাওয়ালপিণ্ডির পত্তন করেন। এই রাওয়ালপিণ্ডিতে কাবুলের নির্ব্বাসিত আমীর শাহ সুজা তাঁর ভাই শাহ-জামানের সঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ সর্দ্দার ছত্তর সিং ও শের সিং গুজরাট-যুদ্ধের পর ব্রিটিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। সীমান্ত-রক্ষা-কল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাওয়ালপিণ্ডিকে প্রকাণ্ড মিলিটারী ক্যান্টনমেণ্টে পরিণত করেছেন।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ন' মাইল দূরে মঙ্গল পাশ্। এইখানে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জন্-নিকলসনের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি স্তম্ভ ও জলের ঝর্ণা তৈরী করা হয়েছে। জন নিকল্‌সন্ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অবরোধের সময় নিহত হন।

রাওয়ালপিণ্ডির পার্কগুলি, ম্যাশি গেট, রঘুনাথজীর মন্দির, ইস্‌লামিয়া কলেজ ও হষ্টেল, জমা মসজিদ প্রভৃতি দেখবার জিনিষ। তাছাড়া এখানে পথ-ঘাট চমৎকার—সে কথা আগে বলেছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা আটটায় স্নানাহার সেরে আমরা রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করলুম। প্রশস্ত পথ। রেলোয়ে ব্রিজের তলা দিয়ে সোজা উত্তর-মুখে চললুম। দুধারে প্রশস্ত ক্ষেত, সামনে বহুদূরে পাহাড়ের প্রাচীর। পাঁচ-সাত মাইল আসবার পর দেখি, পাহাড় আপনার শরীর এমনি বিসর্পিত করে পড়ে আছে যে, দেখলে মনে হয়, ঐখানেই বুঝি পথের শেষ! ভারতবর্ষের সীমারেখা চেপে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দীঘল পাহাড়ের শ্রেণী। এত উঁচু, মনে হয়, ওধার থেকে এধারে অন্তরীক্ষ-পথ দিয়ে কোনো খেচরেরও বুঝি কোন কালে আসবার সম্ভাবনা হবে না! গাড়ী যত এগোয়, পাহাড় তত সরে-সরে যায়—যেন লোভ দেখিয়ে আমাদের নিজের কবলে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে পথের চিহ্নমাত্র অনুভব করা যাচ্ছিল না। আর তা যাচ্ছিল না বলে বুক কেমন ছম্‌ছম্ করছিল,—না জানি, কি দুর্গম পথ পাবো পাহাড় উত্তীর্ণ হতে! রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৩ মাইল দূরে পথ একটু চড়াই—উঁচুতে উঠছি, তা বোঝা গেল। ১৭ মাইলে বরাকো—এখানে পথটা হুশ্ করে বাঁয়ে বেঁকে পড়েছে। শেষের চার মাইল গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ শ্যামল। বরাকোতে তিনখানি গাড়ীর জন্য টোল দিতে হলো ৬৷৵০, অর্থাৎ গাড়ী পিছু ২৷৵০ করে। যাত্রীদেরই টোল্ দিতে হয়। টোল-ষ্টেশনের ধারে চায়ের দোকান—গরীব সবাই-খানার মত। তার সামনে ধূলিধূসর কাষ্ঠ-ফলকে লেখা আছে—Welcome. "Tea Shop Very clean."

বরাকোয় বাঁয়ে বেঁকে একেবারে পাহারের গায়ের উপর উঠলুম। ডাইনে উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর, তার পায়ের তলায় পথ, আর বাঁদিকে ২০০।৩০০ ফীট গভীর গহ্বর, গহ্বরের ওপারে পাহাড় আর পাহাড়···ছোট বড় মাঝারি পাহাড়—যেন নগাধিরাজের ধনী গৃহস্থ আর গরিব প্রজার দল সপরিবারে বাস করছে! দৃশ্যে বৈচিত্র্য খুব। বরাকোর টোল-ষ্টেশন একেবারে পাহাড়ের বুকে। বরাকো থেকে পথ উঁচু হয়ে চলেছে,—খুবই গোড়েন—উপরে মার্ব্বেল রাখলে গড়িয়ে পড়ে। বরাকোর ছ' মাইল পরে পাহাড়ের উপর ছত্তর গ্রাম। ছত্তরে নানা ফল-ফুলের মনোহর বাগান আছে। ছত্তরে বিশ্রাম-বাসের ব্যবস্থাও খাশা। এখান থেকে আবার চড়াই—ঠিক কোমরবন্ধের মত পথ ঘুরে উঠেছে! আরো চার মাইল পরে অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে তেইশ মাইল দূরে একটি নদী পেলুম। নদীর নাম শৈলগা। নদীর উপরে পুল আছে—নিরাপদে সে পুল পার হয়ে আবার চড়াই। দস্তুরমত উঁচু পথে উঠতে লাগলুম; ইংরাজী S হরফের মত বাঁকা পথ। গোটাচারেক বাঁক পার হয়ে চেয়ে দেখি, প্রায় চার-পাঁচতলা উঁচু পথে উঠে পড়েছি!

এইখান থেকে পথের ধারে পাইন গাছের শ্রেণী নজরে পড়তে লাগলো। গাড়ী থামিয়ে এঞ্জিনে জল নেওয়া হলো। পাহাড়ের গা ফেটে মাঝে মাঝে ঝরণা ঝরেছে—কোথাও বা পাইপ দিয়ে ঐ ঝর্ণার জলকে সরু ধারে বহাবার চেষ্টা করা হয়েছে—লোকে যাতে এই জল সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারে। পাইপের মুখে বালতি পেতে যত-খুশী জল নাও। জল নেওয়া হলে গাড়ী চললো। পথ ক্রমে যত উঁচুতে উঠছে, বিভীষিকার মধ্যে তার গোপন সৌন্দর্য্য-মাধুরীও তত ফুটে বেরুচ্ছে! পথের একধার উঁচু পাহাড়ে ঘেরা—অপর দিকে চীর গাছের ঘন-জঙ্গল। এই চীর গাছের নির্য্যাস থেকে টারপিণ তেল তৈরী হয়। আমাদের এখানে যেমন তাল বা খেজুর গাছের গলার কাছে খানিকটা ছাল কেটে ভাঁড় বেঁধে তাল-খেজুরের রস সংগ্রহ করে, চীর গাছের গায়ে মাঝে মাঝে কেটে তেমনি সরু তার দিয়ে ছোট ছোট মাটীর গ্লাস বেঁধে দেছে—সেই সব গ্লাসে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়। চীরের কি ঘন জঙ্গল? অথচ থাকে থাকে কে যেন গাছগুলিকে সাজিয়ে পুঁতেছে! বিলাতী ঝাউয়ের মত দেখতে গাছগুলি—পাতার গাঢ় সবুজ রঙে বাহার যা খুলেছে, চমৎকার!

অবশেষে ট্রেট্ বলে এক জায়গায় এসে পৌঁছুলুম। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ট্রেট সাতাশ মাইল। ট্রেটে ডাক-বাংলা আছে, তার উপরে বরাকোর মত চায়ের দোকান তিন-চারখানি। সামনে লেখা আছে,—Your Refreshment Room—to the left, ডাহিনেও তাই। দোকানগুলির দেওয়াল মাটীর—মানুষ-ভোর উঁচু। পাহাড়ের গায়ে লাল-নীল-হলদে হরেক রঙের ফুলের গাছ; তাছাড়া ডালিম গাছের ঝাড়। কোনো ঝাড় ডালিমের লাল ফুলে আলো হয়ে রয়েছে, আবার কোনো ঝাড়ে থলো-থলো ডালিম ফলেছে। বাংলার সেই মিঠে ছড়াটা মনে পড়ছিল, "ডালিম-গাছে তোতা পাখী"…কিন্তু তোতা পাখীর দর্শন মিললো না। একটু পরেই দেখি, একটা পাহাড়ের মাথা এমন উঁচু—যে, সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে যায়! তিন-তলা, চারতলা পাহাড়ের বুকে বিস্তর আবাদ-ক্ষেত, লোকের বসতি! পাহাড়ের গায়ে ছাগল চরছে। প্রকাণ্ড ছাগল…গায়ের বড় পাঁশুটে আর কপালের উপর মস্ত বাঁকা শিং। আকারে রামছাগলের মত এবং বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট! এ জায়গার নাম শুনিব্যাঙ্ক! শুনিব্যাঙ্ক হলো ৬০৫০ ফুট উঁচু—এখানে একটা মদের ভাঁটী আছে (Brewery)! শুনিব্যাঙ্কে টোল দিতে হলো ৪ চার টাকা। যারা ম্যরিতে যাবে, এ টোল তাদের দিতেই হবে। যারা ম্যরিতে থাকবে না, ম্যরি পেরিয়ে আরো এগিয়ে যাবে, তারা রসিদ দেখিয়ে ম্যরিতে এ টাকা ফেরত পায়। বরাকো থেকে এই যে পাহাড়ের বুকের উপরকার পথ দিয়ে চলেছি, এ পথের নাম হলো ঝিলাম-ভ্যালি রোড। এই পথ রক্ষা করবার জন্তই যাত্রীদের কাছ থেকে টোল সংগ্রহ করা হয়। যেখানে টোল দিলুম, সেখানে এক কাশ্মীরী মুসলমান বসে সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল। পাহাড়ের উপর এমন জায়গা, আর তার সেই মিঠে সুর…আমাদের একেবারে বিমুগ্ধ করে তুললে! খানিক অপেক্ষা করে তার সুর উপভোগ করে বেলা এগারোটায় শুনিব্যাঙ্ক পার হলুম। শুনিব্যাঙ্কের দেড় মাইল পরে ম্যরি। ম্যরি সব-চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর; ৭০০০ ফিট উঁচু। ম্যরি ক্যাণ্টনমেণ্ট মস্ত সহর—হাট, বাজার, বিলাতী দোকান, ফৌজের ছাউনি, চার্চ্চ, হোটেল, সিনেমা-হাউস, অভাব কিছু নাই! ম্যরিতে পৌঁছুলুম, ঠিক বেলা দুপুরে। ম্যরি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস, তাছাড়া ফৌজের মস্ত ছাউনি আছে। এখানে রৌদ্রের তাপ প্রচণ্ড হলেও কষ্ট হচ্ছিল না। ম্যরিতে এসে দেখি, যে-সব পাহাড়, বন-জঙ্গল আমাদের মাথার বহু উপরে প্রায় আকাশের গায়ে ঠেকছিল, সেগুলো আমাদের কত নীচে যে নেমে পড়েছে! চীর গাছের জঙ্গল, পাইনের শ্রেণী—আর ঘোরা-বাঁকা পথ, নীচে খাদ খুব গভীর—সে যেন পৃথিবীর বুকখানা ফেটে পাতালের কোন্ বিরাট গহ্বর প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে হাঁ করে পড়ে আছে! দেখলে শুধু চক্ষু স্থির নয়, মাথা অবধি ঘুরে যায়! যদি গাড়ী একটু বেসামাল হয়, ড্রাইভার যদি একটু অন্যমনস্ক হয়, তা হলে গাড়ীশুদ্ধ কোথায় কত নীচে যে গিয়ে পড়বো,—কারো হাড়-পাঁজরার চিহ্ন থাকবে না, গাড়ী-সমেত গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে! তার পর পাহাড়ও কি অমন একটা! পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পর পাহাড়! সংখ্যা নেই! আতঙ্ক হলো এই ভেবে যে, এত পাহাড় পার হয়ে কোথায় সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—সেখানে পৌঁছুনো কি আর সম্ভব হবে! অথচ পেছুবার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে! এই সাত হাজার ফিট উচু পাহাড় থেকে গড়ানে বাঁকা পথে নামতে হবে। গা শিউরাবার কথা! এ পথে দুর্ঘটনা খুবই হয়! এলাহাবাদে ললিত বাবুর কাছে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে শেঠী সাহেবের কাছে শুনেছিলুম, ড্রাইভারের গোঁয়ার্তুমি বা বেহুঁশিয়ারিতে কিম্বা গাড়ীর কলকব্জা ঢিলে হয়ে কত গাড়ী—কত লরি—কত লোকজন মালপত্র-সমেত যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নেই! তাছাড়া উল্টো-মুখ থেকে হু-হু হাওয়ার গতিতে মোটর আসছে। কোথায় কোন্ বাঁকের মুখে হর্ণ না দিয়েই একদম সামনে পড়লো—এমন হয়। এ-পথে একটা জিনিষের দিকে

হুঁশিয়ার হয়ে চল্‌লে কতক নিরাপদ—সামনে পথে ধুলোর ঘূর্ণাচক্র দেখলে বুঝতে হবে, আগে গাড়ী আছে। তাই বুঝে হর্ণ দিয়ে সতর্কভাবে গাড়ী চালানো চাই, না হলে বিপদের আশঙ্কা। কাজেই আতঙ্ক হবার ত্রুটি ছিল না।

ম্যরি থেকে পথ আবার নামতে সুরু হলো। সে কি নামা—বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে নেমে চলেছি তো নেমেই চলেছি। ভাগ্যে গাড়ীর নামা, তাই রক্ষা! মানুষকে এমন ছুটে নামতে হলে কখন্ হয়তো বেদম্ হয়ে উল্টে ঠিকরে পড়তো! সে পথ-নামার ভঙ্গী খুব রোমাঞ্চকর ব্যাপার। নেমে নেমে একটা পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে বেলা সাড়ে বারোটায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে লুচি-তরকারী ফল-মূলে টিফিন সারা হলো। তারপর ঝর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ১২-৫৫ মিনিটে আবার গাড়ী চড়লুম। ম্যরী থেকে দশ মাইল পরে দেওয়ালী—দেওয়ালী ২৫০০ ফিট উঁচু। ৭০০০ ফিট থেকে একেবারে ২৫০০ ফিটে নামা—যে নেমেছে, সেই জানে, আতঙ্কের সঙ্গে আমোদ এতে কতখানি! সামনে পিছনে আশে-পাশে সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়ের দৃশ্য আগাগোড়া রমণীয়। এইখান থেকে আবার উঁচুতে ওঠা। যাকে বলে Zigzagging, এ পথে তাই। গাছের ছায়া নেই—পাহাড়ের পথ এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে। দেওয়ালী থেকে প্রায় আট মাইল পরে ঝিলামের সঙ্গে দেখা হলো। দুধারে উঁচু পাহাড়—মাঝখানে বড় বড় শিলা-পাথরে গতি প্রতিহত হয়ে নাতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনী বিপুল স্রোতে নেমে নেমে চলেছে। সে স্রোতে কাঠ ভেসে আসছে—পঞ্জাবে ঝিলাম ষ্টেশনের কাছে যেমন দেখেছিলুম। বেলা দুটায় কোহালায় এসে পৌঁছুলুম। কোহালার বাঁ দিকে পাহাড়ের কাঁধে ডাক-বাংলা, পোষ্ট অফিস—ডাহিনে ঝিলাম নদী সগর্জ্জনে শিলাস্তূপে তরঙ্গের আঘাত দিতে দিতে বয়ে চলেছে। কোহালা হলো ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা। কোহালায় মস্ত পুল ঝিলামের ওপারের পাহাড়কে আঁকড়ে ধরেছে—কোহালার ওপার থেকেই কাশ্মীর রাজ্য! এখানেও টোল দিতে হলো। এখানে পেট্রোল পাওয়া যায়। আমরা পেট্রোল নিলুম—তার পর বেলা ২-৫৪ মিনিটে পুলের উপর উঠলুম। পুল পার হয়ে বেলা ২-৫৬ মিনিটে কাশ্মীরের হিন্দুরাজ্যে পদার্পণ করলুম। হিন্দুরাজ্য! নিমেষে প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল্ করে উঠলো।

ঝিলাম এতক্ষণ ছিল আমাদের ডাইনে—এবার আমরা এলুম ডাইনে, ঝিলাম বাঁদিকে পড়লো। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করবামাত্র গাড়ীর ড্রাইভারদের নাম আর গাড়ীর নম্বর একজন কর্ম্মচারী note করে নিলেন। এঁর আফিস-ঘরটি ঠিক পুলের প্রান্তে। পাকা ঘর। পথের ধারে লেখা আছে, Beware of Boulders. লেখা দেখেই গা ছমছমিয়ে উঠলো। এতক্ষণ যে পথ দিয়ে এলুম, সেখানে উঁচুতে ঝুলন্ত পাথর পাহাড়ের গায়ে দেখেছি বটে—কিন্তু সে পথে পথিককে সতর্ক করার জন্য কোনো লেখা ফলক দেখিনি। এখন অকস্মাৎ লেখা দেখে মনে হলো, এ পথের ঝুলন্ত পাথর তাহলে একদম্ অচঞ্চল নন্—তাঁর গড়িয়ে পড়ার অভ্যাস তাহলে রীতিমত আছে। নাহলে হুঁশিয়ার করার দরুণ এ ফলক পাথর থাকবে কেন? এ পথে প্রায় পাঁচ মাইল আসার পর এক টানেল পার হলুম—তাছাড়া ছোটখাট কয়েকটি পুল পার হতে হলো। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, মাঝখানে গভীর খাদ—এই পুল ছাড়া পার হবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে দেখলুম, পুরানো পুল ভেঙ্গে পড়ে গেছে, তার কাছে নূতন পুল তৈরী হয়েছে অর্থাৎ পাহাড়ের উন্নত অবয়ব আর ঐ খাদ, গহ্বর, নদী—এ যেন প্রকৃতির খেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। দরদ জানে না, মমতার ধার ধারে না—যখন খুশী খেলার ছলে ভেঙ্গে ধ্বসে পড়লেই হলো—তাতে মানুষ বা গাড়ী চাপা পড়ুক বা তাদের অদৃষ্টে যাই ঘটুক।

কোহালার বারো মাইল পরে দুলাই। দুলাইয়ে ঝিলামের দিকে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত ডাকবাংলাখানি দেখতে যেন ছবির মত। লেডি রিপন এই বাংলায় কিছুদিন বাস করেছিলেন; তিনি এর নাম দেন Honeymoon Cottage. Honeymoon-যাপনের পক্ষে এ কটেজ—যেন কোন্ কল্পনায় গড়া মায়াপুরী! এখানকার পথ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী। অল্প বৃষ্টি হলে প্রায় পাহাড় ধ্বসে পড়ে। দুলাই থেকে পথ ঘুরে ঘুরে গেছে—কখনো নেমে ঝিলামের জলের কাছে গিয়েছে, আবার হঠাৎ বন-জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বহু ঊর্দ্ধে অমন আট-দশ তলার সমান উঁচুতে উঠে গেছে! দুলিয়া থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ডোমেল। ডোমেল ২১৭১ ফিট উঁচু। এখানেও ডাক-বাংলা এবং পোষ্ট অফিস আছে। বেলা ৪-১৫ মিনিটে আমরা ডোমেলে পৌঁছুলুম। ডোমেলে ঝিলামের সঙ্গে কিষণগঙ্গা ও কোন্‌হার নদী মিশিয়াছে; বাঁয়ে চমৎকার পুল। সেই পুল পার হয়ে বাঁদিকে যে পথ, সে পথ গেছে এ্যাবটাবাদ—সিধে পথ শ্রীনগরে গেছে। পুলের অদূরে কিষণগঙ্গা নদীর তীরে বিষ্ণু-মন্দির; তার পিছনে এক প্রাচীন শিখ-কেল্লা আছে।

ডোমেলে কাষ্টম অফিস। এখানে টোল দিতে হলো—তার পরে সরকারী খাতায় আমাদের নাম-ধাম, কোথায় যাচ্ছি, কতদিন থাকবো, সঙ্গে বন্দুক আছে

কি না, কার্টরিজ আছে কত, এই সব পরিচয় লিখিয়ে, বন্দুকের লাইসেন্স দেখিয়ে পাঁচমিনিট পরে আবার গাড়ী ছাড়া হলো। আঁকা-বাঁকা পথে কখনো উপরে উঠি, কখনো নীচে নামি—এইভাবে খানিক এসে এক সুন্দর ঝর্ণা দেখলুম। ঝর্ণার নাম যশকুল। বেলা পড়ে আসছিল—বেলা ৫.২০ মিনিটে পৌঁছুলুম গড়হি। গড়হির ডাক-বাংলাখানি একেবারে পাহাড়ের গায়ে। পথের বাঁ দিকে ঝিলাম। ঝিলাম এখানে বেশ প্রশস্ত হয়েছে। গড়হির ওপারে পাহাড়ের ধারে হাতিয়ান্ গ্রাম, হাতিয়ান্ কাশ্মীর ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। ওপারে নদীর ধারে কাশ্মীরী রমণীরা এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করছিলেন,—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটা, আর তাঁদের অঙ্গে ঐ দুধে-আলতার রং, বাহার যা খুলেছিল…নদীর জলে যেন কমলের মালা ভাসছে! যেমন রূপশ্রী, তেমনি দেহের গড়ন—সুডৌল, সুঠাম, নাক-মুখ-চোখ একেবারে নিখুঁত! নদীর তীরে ঘাগরা খুলে রেখে সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণে তাঁরা জলে নাইছিলেন এমন অসঙ্কোচে যে, দেখলে অবাক হতে হয়! তীর-পথে লোক চলেছে—সেদিকে লক্ষ্যমাত্র নেই!

গড়হির ডাকবাংলাটি খুব প্রশস্ত—বারো-চোদ্দটি কামরা, বহু বাথরুম—তাছাড়া য়ুরোপীয় ও কাশ্মীরী খানার বন্দোবস্ত আছে। রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা পাতবো স্থির করে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করলুম! হিন্দু কিচেনে কাশ্মীরী খানার ফরমাশ দেওয়া গেল। তারপর গরম জলে স্নান সেরে আহারাদি করে শয়ন করা গেল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গতে কাশ্মীরী খানা ও টিফিনের ফরমাশ করলুম। আগের রাত্রে খুব বৃষ্টি-বজ্রাঘাত হয়ে গেছলো। ভোর থেকে এমন শীত পড়লো যে গরম গেঞ্জি, ভায়েলা সার্ট, গরম কোট, ওভার কোট, এমন কি, মাফলার পর্য্যন্ত বার করতে হলো। তারপর তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারবার পালা! হিন্দু-কিচেনে খাবার বন্দোবস্ত খুব ভালো। লোকজন সামনে বসে যত্ন করে খাওয়ায়। কি চাই? যত খুশী খাও! কেল্নারের বা য়ুরোপীয় আদর্শের বাঁধা-ধরা গোণা রকম খাওয়ানো নয়। ডাল, রুটী আর মাংস—এ তিনটি রান্নাও ভারী পরিপাটী।

আহারাদি সেরে বেলা ঠিক আটটায় গড়হি ছাড়লুম। গড়হিতে একটা ঠাকুর-বাড়ী আছে; সেখানেও যাত্রীদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা আছে।

গড়হির একটু আগে ঝিলামের উপর ঝোলা পুল। নদীর অপর পারে একটা পুরানো দুর্গের ধ্বংস-স্তূপ পড়ে আছে। শিখদের সঙ্গে এখানে পাহাড়ীদের এক যুদ্ধ হয়েছিল সেকালে। পাথর ছুড়ে পাহাড়ীরা বহু শিখকে জখম করে।

গড়হি থেকে ষোল মাইল পরে চেনারি। চেনারিতে একটি বড় ঝরণা আছে। এখানে পথ বহুবার ধ্বসে ভেঙ্গে গেছে, এবং বারবার সরকারকে সে পথ সাফ করিয়ে নতুন পথ তৈরী করাতে হয়েছে। সর্ব্বক্ষণ পথ পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য বহু কর্ম্মচারী মজুৎ আছে। যেখানে ভাঙ্গছে বা ধ্বসে পড়ছে, সেখানে অমনি লোক লাগছে পথ মেরামত করতে।

চেনারির আঠারো মাইল দূরে উরি। উরির দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের আর তুলনা নেই! চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়…এর পাশ দিয়ে ওর গা ঘেঁসে সে-সব পাহাড় ঘুরে এসে নদীর তীরে বাজারের সামনে দাঁড়ালুম। বেলা তখন দশটা। ডানদিকে বাজার; বাজারের অপরদিকে সুদৃশ্য ডাকবাংলা। এখানে সাদা কাক দেখলুম। তাছাড়া দেখি, উরিতে বহু মোটর আর লরি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মেল-ভ্যানের একজন কর্ম্মচারী আমাদের জানালেন, আগের রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড় ধ্বসে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে—প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে—তবে পথ সাফ হবে। তখন গাড়ী থেকে নেমে চারিধারে বেড়ানো গেল। বাজারে ঢুকে আপেল, নাশপাতি, আখরোট, বাদাম প্রচুর কিনলুম। আখরোট দু' আনা চার আনা করে শ'। খোলা এমন নরম—দু আঙুলে টিপে ধরলেই ভেঙ্গে যায়! এগুলোকে বলে কাগজী আখরোট, কি তার স্বাদ! তেলা গন্ধ মোটে নেই!

দেড় ঘণ্টা পরে পথ সাফ হয়েছে শুনে আবার অগ্রসর হলুম। পথ তখনো সাফ হচ্ছে। সন্তর্পণে সে জায়গা পার হয়ে আবার গাড়ীর গতির বেগ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পথ একই রকম…সেই ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা। উরির পর ঝিলামের শরীর আবার শীর্ণ হয়েছে। দূরে পীর-পাঞ্জাল পাহাড়ের দীর্ঘ শ্রেণী। উরি থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে পথের ধারে এক ভাঙ্গা মন্দির—মন্দিরটার নাম ব্রাঙ্কুটীর। ব্রহ্ম-কুটীর নয় তো? মন্দিরের পর থেকে পথ একটু সমতল হয়েছে। এর একটু আগে রামপুরের ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউশ। এখান থেকে শ্রীনগর অবধি ইলেকট্রিকের তার গেছে কাঠের ঢাকার মধ্য দিয়ে। এখানে একটি চমৎকার পুল পার হলুম। পুলের নীচে মস্ত ঝর্ণা বয়ে চলেছে, নাম ওপিনালা। একটি জীর্ণ মন্দির দেখলুম, ভনিয়ার মন্দির। মন্দিরের দু' মাইল আগে নৌশেরা গ্রাম।

নৌশেরার তিন মাইল আগে থেকে ঝিলামের অঙ্গ আবার প্রশস্ত হয়েছে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে লুপ্ত হয়ে এলো। শুধু কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের একটা অংশ নাঙ্গা পর্ব্বত (২৬৯০০ ফিট উঁচু) আর হরমুখ শৃঙ্গ (১৬৯০০ ফিট উঁচু) মাথায় তুষার-কিরীট পরে দাঁড়িয়ে

আছে! সূর্য্যের কিরণ শুভ্র তুষারের উপর পড়ে তার রংটাকে কতক ঘোলাটে মেটে গোছ করে তুলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথায় কে অজস্র চূণ ছড়িয়ে রেখেছে! মাঝে মাঝে কাশ্মীরী বস্তী। বস্তী পার হবার পর দুধারে পাহাড়ের কপাট কে যেন খুলে দিল! সামনে সমতল প্রান্তর—সবুজ তৃণ-লতায় সমাচ্ছন্ন! শস্যের প্রাচুর্য্যের সীমা নেই। ক্রমে বারামূলায় পৌঁছুলুম।

বারামূলায় বহু লোকের বাস। ঝিলামের বুকে ক'খানা হাউস-বোট দেখা গেল; তার পর ফলের বাগান। পথের দুধারে অসংখ্য বাগান··· আপেল-নাশপাতির ভারে গাছের ডাল একেবারে নুয়ে পড়েছে! এমন লোভ হচ্ছিল···বাগানে ঢুকে পড়ে সেই তাজা পাকা ফল পেড়ে খাবার জন্য! ডাইনে পথের ধারে কাষ্ঠফলক। তাতে লেখা Way to Gulmarg. ডানদিকে তুষার-মণ্ডিত গুলমার্গ পর্ব্বতও দেখা গেল।

বারামুলা থেকে পথের দুধারে পপলার গাছের শ্রেণী। গাছগুলি সোজা সুপুরি গাছের মত উঠে গেছে—মাথার কাছে ঝাঁকড়া পাতার গোছা···ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি। পথের দুধারে এই গাছ যেন সুদীর্ঘ পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথে চেনার গাছের দেখা মিললো। গাছগুলি আমাদের বট-অশথের মত। পাতাগুলি বড় বড়, আঙুরের পাতার মত দেখতে।

এই চেনার গাছ পারস্য থেকে আমদানি। এ গাছ বাদশাহ জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে আমদানি করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লাহোরে এই গাছ পুঁতিয়েছিলেন, কিন্তু লাহোরের মাটীতে এ গাছ গজালো না! কাশ্মীরেই এ-গাছের প্রাচুর্য্য, তা'ও বারামুলা থেকে! বারামুলা থেকে বাঁয়ে পথ গেছে সোপুর। সোপুর থেকে উলার হ্রদে যেতে হয়।

বারামুলা থেকে প্রায় ১৭ মাইল পরে পাটন গ্রাম। পাটনে বড় বড় মাঠ চেনার গাছে ঘেরা। মাঠে তরুণী কাশ্মীরী রমণীরা ঝুড়ি হাতে কেউ কাঠি-কুটো, গাছের ভাঙ্গা ডালপালা কুড়োচ্ছে, কেউ বা রৌদ্রে-দেওয়া ঘুঁটের তদ্বির করছে! পরণে রঙীন ঘাগরা আর রূপের প্রভায় দেহের গড়নে ঐ মুক্ত প্রান্তরে যেন কোন্ পরী-রাজ্যের বিচিত্র স্বপ্ন-কাহিনীর আভাস জাগিয়ে তুলেছে! কাশ্মীরী নারীর রূপের খ্যাতি ভুবন-জোড়া...সে খ্যাতির মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নেই! এই সব গরিব কাঠ-কুড়ানির মেয়েরা কোনো রাজার সিংহাসনে বসলে সিংহা-সন তাদের রূপের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! তারা ডাগর চোখ তুলে ব্রীড়াহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে আমাদের গাড়ীর পানে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তাদের দেখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দে মন থেকে প্রশ্ন জাগছিল,···

কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!

প্রান্তর-বুকে এই রূপ-সুষমা কবির চিত্রকরের কল্পনায় ঝর্ণা বইয়ে দেয়!

পাটন থেকে ১৮ মাইল পরে শ্রীনগর। শ্রীনগরের সীমায় এসে দেখি, সামনে ঝিলাম। দু'ধারে পথ দুখানি হাতের মত ডাহিনে আর বাঁয়ে বিস্তারিত রয়েছে। কোন্ দিকে যাবো, প্রশ্ন করবো বলে গাড়ী থামানো হলো। অমনি দলে দলে লোক এসে ছেঁকে ধরলে। রবিবাবুর সেই কবিতা মনে পড়ছিল—লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত! লোকগুলো কত আশাই যে দিতে লাগলো—হাউসবোট দেবে, হোটেল দেবে ইত্যাদি। আমরা জানালুম, রাওয়ালপিণ্ডির এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির অফিসে আমরা যেতে চাই। একটা ছোকরা গাড়ীর ফুটবোর্ডে চট্ করে বসে পড়লো, বললে,—আমি পৌঁছে দেবো, জী হুজুর।

তাকেই গাইড করে গাড়ী ছাড়লুম।

ডান দিকে বেঁকেই শ্রীনগরের বাজার। বাজার পার হয়ে বেঁকে আমীরা কাদাল বা ফার্ষ্ট ব্রিজ। এই পুল পার হয়ে শ্রীনগরে প্রবেশ করলুম। পুল থেকে বাঁ দিকে নদীর গায়ে মহারাজার প্রাসাদ দেখা গেল। কাদাল অর্থে পুল। ঝিলামের উপর এই শ্রীনগরে সাতটি পুল আছে।

অচিরে এন্, ডি, রাধাকিষণের অফিসে এসে পৌঁছুলুম। পরিচয় পাবামাত্র তাঁদের এক কর্ম্মচারী গাড়ীর সঙ্গে এসে আমাদের চেনার-বাগে নিয়ে গেলেন। চেনার-বাগের মধ্যে চেনার নালা। এই চেনার নালায় আমাদের জন্য দুখানি হাউসবোট তাঁরা ঠিক করে রেখেছিলেন। একটির নাম Cutty Shark, অপরটির নাম Vishnu Vavan. দুখানি হাউস-বোটের সঙ্গে দুখানি কিচেন-বোট এবং দুখানি শিকারা আছে। শিকারা ছোট পান্সীর মত, তবে পান্সীর চেয়ে ছোট এবং ঢের হাল্কা। এই শিকারার অর্থ Pleasure boat, এতে চড়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও।

বেলা তিনটার সময় হাউস-বোট অধিকার করলুম। ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়েছিলুম—১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগর। পথে বিশ্রামের জন্য বহু সময় ব্যয় করেছি; তার দরুণ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ভোগ করতে হয়নি—একদিনের জন্য মাথা কারো ধরা বা কোন অস্বস্তি বোধ হয় নি। এই দীর্ঘ পনেরো দিনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত...সুদীর্ঘ পাড়ি—নব নব দৃশ্যে প্রাণে কি আনন্দ পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

তারপর শ্রীনগর······তার শোভা-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কাশ্মীরকে কেন যে ভূস্বর্গ বলা হয়, সে-কথা বলবো বারান্তরে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সভ্যতা-প্রশস্তি

সকাল বেলায় ফুটলো আভা নীল আকাশে !
শ্যামলিমা বাগ-বাগিচায় ঘাসে-ঘাসে !
শাখে-শাখে উঠলো গেয়ে কতই পাখী,
সাজলো বনে ফুল-পরীরা গন্ধ মাখি।
বইলো বাতাস ঢেউ তুলিয়ে নদীর জলে—
কি মাধুরী জাগলো মরি জলে-স্থলে !

পাঁচ'শ বছর পরে এ-সব থাকবে কি রে ?
বনে লতা পুষ্প-মুকুল শোভায় ঘিরে ?
দীঘির কালো জলের বুকে কমল-ডালা ?
পাখীর গলায় বুক-জুড়ানো স্বরের মালা ?
মানুষ যত শক্তি পেয়ে উঠচে ফুলে—
আরাম-খোঁজে গর্ব্বে মেতে উপড়ে তুলে
ফেলচে বনের লতা-পাতায়—মূল্য কি তার ?
স্বপন বুনে চুল আনে—সব তুচ্ছ-অসার।

ওই যে ভাখো উচ্চ গিরি গগন ছুঁয়ে।
অস্ত্র-পাশে চূর্ণ করি পাড়বে ভুঁয়ে।
গিরির সকল চিহ্ন মুছে ধরার বুকে
কল বসাবে, ফ্যাক্টরি-মিল হাস্য-মুখে !
সবুজ বনের শ্যামল রেখা ; গাছে গাছে
গাইছে পাখী,—চাঁপা-বকুল ফুটে আছে ;
দেখলে মরি, চিত্ত জুড়ায়, মুগ্ধ আঁখি—
ভাঙ্গবে সবই—রাখবে না রে কিছু বাকী।

বারুদখানা গড়বে হোথায় ; তোপের পরব
বানাবে—নব দিগ্বিজয়ে খর্ব্ব গরব।
কল্লোলিয়া ওই যে নদী হাস্যমুখী
চপল স্রোতে চলেছে ঐ উপল রুখি—
বন্ধ-বাধা জানে না সে, মানে না কো—
লৌহ-পাশে বাঁধবে তারে,—তুলবে সাঁকো।
জাহাজ-প্লেনে ফেলবে ছেয়ে অঙ্গ উহার—
থমকে থেমে থাকবে নদী কর্দ্দম-ভার !

হীরার মালা দুলিয়ে বুকে নির্ঝরিণী—
দুষ্ট মেয়ে তুলচে লীলায় কলধ্বনি !
মুক্তা-ঝুরি হাসিতে তার পড়চে ঝুরে—
রৌদ্র মেখে রাম-ধনুকের রঙের সুরে।

কিন্তু ও সব তুচ্ছ খেলা ! নেহাৎ অসার !
বসাবে পাম্প, ইলেক্‌টিরির মস্ত পাওয়ার !

মুক্ত আকাশ-তলে বিপুল হাওয়ায়-লোটা
মুক্ত বিশাল প্রান্তর অই অবাধ-ছোটা—
শান্তি-ভরা স্নিগ্ধ আঁচল ধরণী-মার,—
ঘর-ছাড়া হায়, কত জীবের শয্যা-বিথার !
প্রান্তর ওই মিলিয়ে যাবে দু'দিন পরে,
কারখানা মিল—বস্তীতে বুক উঠবে ভরে।

পল্লীর বাট, কুঁড়ে, পুকুর, মুক্ত হাওয়া—
ঘোমটা-মুখে বৌদি-দিদির জলকে যাওয়া—
ঘাটের কূলে বাবলা-মূলে বাঁধা তরী—
ছায়ায় ঢাকা আম-কাঁঠালের বাগান, মরি,—
সবই যাবে। রয় যদি হায়, রইবে স্মৃতি
কবির মনে ছন্দে-গাঁথা পুরাণ-গীতি !
ধরার বুকে মিলিয়ে যাবে গাঁয়ের রেখা—
ট্রামের রেলের লাইন শুধু থাকবে লেখা !
আকাশ-নীলে ঢাকবে ধোঁয়া, ঢাকবে ধুলা,—
স্বপ্নভোলা ব্যস্তবাগীশ মানুষগুলা
খুঁজবে কোথায় আরাম-প্রীতি দয়া, মায়া ?
মাথায় চড়া তপ্ত রবি—কোথায় ছায়া ?
সভ্যতা তার উড়িয়ে ধ্বজা হাঁকবে জোরে—
হাসি-বাঁশী ভাঙ্গো—ভাঙ্গো অকেজোরে।

সেকাল ও একাল

সেকালে মানুষ বনে-জঙ্গলে মৃগয়ায় হতো বার—
মারিত সিংহ, হরিণ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, গণ্ডার।
হরিণের শিং, বাঘের চামড়া, ভাল্লুকের শির আনি
ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাতো ; মেঝেয় বিছাতো সজ্জা মানি।
যে দেখিত, তার কি তাক্ লাগিত—বিস্ময়ে সচকিত !
দুরন্ত পশু—তারে মারিয়াছে ! বীর্য্য সে বাখানিত।

একালে সে বনে বসেছে সহর—বড় বড় পথ খোলা—
চলে লোকজন—পিছনে মোটর ছোটে কামানের গোলা।
তার ড্রাইভার—যেন বাদশাহ ! দৃক্‌পাত নাহি কারে—
বাতাসের বেগে চালায় মোটর—পথে চাপা দিয়া মারে
কুকুর-বিড়াল, মোরগ-ছাগল, নর-নারী কত শত—
তাদের অস্থি-পঞ্জরে-শিরে—জয়মালা গাঁথে না ত।

জয়-গাথা

মশাল জ্বালিয়া দামামা-নিনাদে চলে যে বিজয়ী-বীর—
তাহার শৌর্য্য-বীর্য্য বাখানি শ্রদ্ধায় নত শির!
আকাশে আঁধার—আঁধার ধরণী—আঁধারে মলিন রাত্রি—
বারেক দেখি না, সে আঁধার-পথে নীরবে কে চলে যাত্রী!

পাহাড় কাটিয়া রচিছে নগর—সেতুতে সাগর বাঁধে—
কামানের গোলা বুকে লয়—তার জয় গাহি কারু ছাঁদে।
ব্যথায় আতুর, অভাবে দলিত যে-জন চলিছে পথে—
কম্পিত পায়ে, দুরু-দুরু বুকে ব্যর্থ যে মনোরথে—
চলার বিরাম তবু নাহি তার—লক্ষ্য হয়েছে দূর—
আশার রাগিণী জীবনে শোনেনি—জানে বেদনার সুর!
তার পানে ফিরে চাহো গো বন্ধু, বারেক নোয়াও মাথা—
অটল ধৈর্য্য—অবিচল প্রাণ—গাহো তার জয়-গাথা।

স্বীকার

সুখে-দুখে রচা ধরণী বন্ধু, পথে তার আলো-ছায়া—
রবি-শশী-তারা-খচিত আকাশ—জল-ঝড় মেঘ-মায়া!
গ্রীষ্মের দাহ, শীতের হিমানী, শ্রাবণের বারিধারা—
ফাগুনে ফুলে ধশলে মাধুরী মলয় বেদনা-হারা!
হাসি আছে হেথা—আছে গো অশ্রু—বিরোধ,মমতা,স্নেহ;
বন্ধুর পাশে রয়েছে শত্রু; নীরে তীর—মরু-গেহ!
সবারে স্বীকার করিয়া পান্থ, এ পথে চলিতে হবে!
জীবনের ডালি তবে তো পূর্ণ রস-বিচিত্র রবে!

প্রকৃত ধনী

দিয়েছ আশা প্রাণে, স্বপন সীমাহীন—
ইহার বেশী হেথা চাহি না কোনো দিন!
অভাবে-নিরাশায়—আশা সে দিবে সব;
স্বপন রচিবে গো বিভব নব-নব।

প্রার্থনা

দেবার শকতি চাহি। কারো মোরে দাতা।
ভুলে যাই কারো কাছে দুটি হাত পাতা!
অপূর্ণ যেথায় যার আছে এইখানে—
পূরণ করিতে যেন পারি মোর দানে!

বাঙলা উপন্যাস

মেশের বাসায় পাশের পড়া—
রঙীন আশায় কাশ্‌ল্‌-গড়া!
পাশের বাড়ীর জানলা খোলা—
শাড়ীর আঁচল—ঈষৎ দোলা।
মিষ্টি মুখের একটু হাসি!
গভীর পুলক-ছন্দ রাশি!
দৃষ্টি উদাস, আবছা-দেখা—
শুধুই হুতাশ ভাগ্যে লেখা!
বন্ধ কেতাব—পড়ায় ছাই!
কেশের গন্ধ—পাই, না পাই!
গেজেট খুলি—নাই'কো নাম!
আসল ভুলি—প্রেমের দাম।

সামনে বাড়া—বিরাট ধুম!
বাজনা-গাড়ীর দো-হুম্‌-হুম্‌!
সাঁঝের বেলায় খোনের পর
ভিড়ের মেলায় আস্‌লো বর।
বাজছে শাঁখ—বাজ্‌ শানাই!
বেজায় হাঁক—"রামকানাই!"

রোশনি-রূপ, রূপ-সাগর!
গোল থামায়। বাসর-ঘর।
ঝুমুর-ঝুম্‌ বাজছে মল—
নাইকো ঘুম—সুর পাগল!
"গাও গো বর"—"চাও কনে"—
প্রাণ পাথর। বাজ মনে।

হোথা সুর-বাহার খুব মাতায়!
হেথা বুক-আঁধার। প্রাণ যে যায়!

পঞ্চাঙ্ক নাটক

(থিয়েটারী ছন্দ)

প্রথম অঙ্ক। উঠলো পট।
নদীর তীর—কক্ষে ঘট
সুন্দরী—সে নিচ্ছে জল।
হুহুঙ্কার—ঐ মোগল।
"ওরে পিশাচ"—ধর-পাকড়!
নায়ক ধরে—"মার চাপড়!
ভাগ ডাকাত!" (হাত তালি।
ভীষণ গোল—ঘোর গালি)
নায়িকা চায়, মূর্চ্ছা যায়—
জল চোখে—বীর লুকায়।
দুয়ের অঙ্ক। উঠলো পট!
কে সে? কে প্রাণের নট!
গান করুণ—মন অবশ;
চোখ সজল, মুখ বিরস।
প্রাণ পাগল,—ঘর শ্মশান—
ক্ষোব-প্রবোধ—কোরাশ-গান।

বন-পথে ঐ যায় দেখি
ঐ লুকায়। সখি—সে কি ?
পতন—মূর্চ্ছা—উন্মাদী—
হায় বিধি আজ বাদী।

তিনের অঙ্ক জম-জমাট।
মোগল-দলে সাজলো ঠাট।
খোঁজ রে খোঁজ—চাই যে শোধ !
ফাঁড় পাহাড়—দুর্গ বোধ।
লাগ্ ফটক—লুঠ-তরাজ—
হান্ কামান—দিল দরাজ !
ভাগ্ রে তীর—কাট্ রে ট্রেঞ্চ—
নয় দেশী—হোক্ সে ফ্রেঞ্চ !
তাই বা কি—জম নাটক—
যুদ্ধে নাই আটক !

চারের অঙ্ক। উঠলো শান্।
রাজসভায় নাচ ঝিনন্।
গান চলে, প্রাণ মাতায়।
দূত প্রবেশ। দিল্ তাতায়।
সাজরে সাজ ! নাচ থামে।
ঝন-রণন ডান্-বামে !
ঘোড়-সওয়ার, কুচ-কাওয়াজ—
'জয় রাজার'—ঘোর আওয়াজ।

গেল, গেল ! না, না—জিত সে ঠিক।
ভীষণ রণ—অন্ধ দিক।
ঝন-রণন্ ঝন্-রণন্
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে সৈন্যগণ।
খাড়া অসি হান্, মোগল, হান্—
ভূমে লুটায় রে বক্ষে বাণ।
রাজা অবাক ! কে ? মারিল কে ?
আসে উন্মাদী ধনু-হাতে।
"তুমি।" "রাজা তুমি !" আলিঙ্গন—
নায়ক-নায়িকা-মধু-মিলন।

ওল্টায় পট—দুরুম-দুম !
আলোয়-আলোয় বাস্ কি ধুম !
ফুলের আসনে রাজা ও রাণী—
নাচের গানের কি কারদানি !

কাজের কাজী

ব্যবসাতে শ্রী দিনে-দিনে বাড়চে প্রাচুর্য্যে—
রাত্রি-দিবস খাটচে বিষম মাখন চাটুর্য্যে !
লেখাজোখা নাইকো—টাকা আসচে লাখে-লাখ ;
খাবার শোবার সময় নাহি—খাটার নাহি ফাঁক !

গৃহিণী সে ঘরে আছেন—আছে ছেলে-মেয়ে—
সময় নাহি—তাদের পানে দেখেন বারেক চেয়ে।
মেলের তাড়া—ইন্ভয়েসে কোথায় বাধে গোল—
ডকের মালটা খালাস গেল—সারা প্রহর রোল !
সবাই বলে,—চিরকালটা কাজে মত্ত রবে ?
টাকার পাহাড় জমলো যে এই—ভোগ করবে কবে ?
চাটুয্যে কয়—এই যে দাদা, একটু জমাই পুঁজি—
তখন জিরেন নিয়ে আরাম করবো নয়ন বুজি।
দিনের পরে দিন চলে যায়—বছর ঘুরে চলে—
কাজে কামাই নেই। চাটুয্যে খাটচে অসুর-বলে।

সেদিন রাতে জ্বলছে বাতি—সবাই নিঝুম ঘুমে।
খাতার কাঁড়ি খুলে মাখন হিসাব মেলায় ধুমে !
লাখের পরে লাখ চড়েছে—জমার অঙ্ক মোটা—
'নেট-প্রফিটে' পাহাড় যেন দাঁড়িয়ে আছে গোটা !
মাখন দেখে,—যতই দেখে, বক্ষ ওঠে দুলে—
এমন পড়তা—বাজারে নাম—চলতি হিসেব তুলে
ছুটী নেবার সময় কোথায় ? সে তো হাতেই মজুৎ—
চলবে নিলে যখন খুশী—শরীর তো নয় বেজুৎ !

কালের চাকা চলছে ঘুরে—তারি ঘুরণ পাকে—
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ ছুঁয়ে যাচ্ছে মর্ত্ত্যটাকে।
বুলায় তুলি আকাশে নীল, কভু সজল মেঘে—
সে দিকে নাই নজর—মাখন ব্যবসা চালায় বেগে।
খাতা-মেলান, বিলের তাগিদ—গেল কখান্ লবি—
ব্যস্ত তারি চিন্তাতে যায় দিবস-বিভাবরী !
রূপে-রসে-গন্ধে ভরা ধরণী যে এমন—
জানবে না—সে মানবে না কো—এ যেন তার পণ !

সবাই বলে—খাটচো কেবল ! চিনির বলদ কি হে ?
এত পয়সা—দু'দিন আমোদ করবে না তা নিয়ে ?
চাটুয্যে কয়—এই যে দাদা,—আর দুটো দিন খাটি !
তার পরে পা মুড়ে নেবো বোটকখানায় মাটি।
সেদিন রাতে চাটুয্যে শোয়—ভাবে, ছুটীর পালা—
কাল থেকে ভোগ করবো ঠিকই থাকবে না কো জ্বালা !
ঘুমায় মাখন। কাল থেকে তার বিরাম খাটার কাজে।
সকাল হলো। জগৎ জুড়ে প্রাণের সাড়া বাজে।
কাজের চাকা ঘুরলো আবার—জীবন্ত ঘর্ঘর—
মাখন ওঠে না কো—ঘুমায়। রৌদ্র হলো খর।
বাড়ীর লোকে অবাক—ভাবে, রকম কেমন-ধারা ?
অবশেষে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো তারা।
মাখন তবু ঘুমায়—সে ঘুম ভাঙ্গে না কার ডাকে !
মেলে না চোখ—কয় না কথা—পেলো কি আজ তাকে !
যত ডাকে, দ্যায় না সাড়া ! ছুটি নেছে খাঁটি—
জাগবে না, সে খাটবে না আর—জিরেন পরিপাটী।

শেষ